তাফসীরে মাযহারী

পঞ্চম খণ্ড

নবম, দশম ও একাদশ পারা

(সুরা আন্‌ফাল, সুরা তওবা ও সুরা ইউনুস)

কাযী ছানাউল্লাহ্‌ পানিপথী (রহঃ)

মাওলানা এ.বি.এম.মাঈনুল ইসলাম অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনূবাদক ঃ মাওলানা এ.বি.এম মাঈনুল ইসলাম

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।
প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা-১২০৩।
ফোন ঃ ২৩৯৪৯০, ২৩১০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯৯ ইং রবিউল আউয়াল. ১৪২০ হিজরী
ইমাম বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ রহঃ এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষে (ইন্তেকালের তারিখ ৩রা রবিউল আউয়াল, ৭৯১ হিজরী)।

বিনিময় ঃ তিন শত টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI – Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Maulana A.B.M. Mainul Islam and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Three Hundred only. US$20

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জীবন এখানে শুরু হয়নি। শেষও হবেনা এখানে। আমরা সৃষ্ট হয়েছি আত্মার জগতে। সেখানে অঙ্গীকারাবদ্ধও হয়েছি। যখন বলা হয়েছে, আমি কি তোমাদের প্রভুপালয়িতা নই? তখন সমস্বরে জবাব দিয়েছি, অবশ্যই। তারপর একে একে এসে পড়েছি পৃথিবীতে। এসেছি। আসছি। আসবো। আমাদের এই মহাঅভিযাত্রা সতত সচল। শুধু যাত্রা। কেবলই সম্মুখযাত্রা। সময়ের সংগুপ্ত রহস্য ভেদ করে আমরা কেবলই চলেছি। পৃথিবীর জীবন নিয়ে পৃথিবীর মৃত্যুর দিকে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের দিকে। মহাজীবনের

মহিমা নিয়ে। সুখ ও দুঃখ শোভিত শত সহস্র মৌনতা ও মুখরতা নিয়ে। সজল ও সচল সফলতা নিয়ে— ব্যর্থতা নিয়ে। অস্তিত্বের অপার রহস্য ও রোদন নিয়ে। প্রেম, প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন নিয়ে। স্মৃতি-বিস্মৃতি, অনুসৃতি, অভিমান ও মান্যতা নিয়ে।

মানুষ আমরা। আমাদেরকে দেয়া হয়েছে দায়িত্ব-দীপিত জীবন। দেয়া হয়েছে অনুরাগ, সংরাগ, সমর্পণেচ্ছা ও সংক্ষোভ। আমাদের অক্ষপাতে আঁধার ও আলোকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। প্রবৃত্তি চায় সুখদ অন্ধকার। তাৎক্ষণিকতার তুর্য-নাদ। মোহন সাময়িকতা। আর হৃদয়ে রয়েছে পিপাসা অনন্তের জন্য। গভীর, গভীরতর রহস্যের জন্য। প্রবৃত্তি চায় পার্থিবতা। আত্মা চায় অপার্থিবতা। আমরা তবে কাকে মান্য করবো? প্রবৃত্তিপিষ্ট কামনা বাসনাকে? না হৃদয়জ অনন্ত তৃষ্ণাকে? অবিশ্বাসকে? না বিশ্বাসকে? শূন্যতাকে? না পূর্ণতাকে? পতনকে? না উত্থানকে? মানুষ আমরা। সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ। নিসর্গের নায়ক। তাই পতনের সাময়িক আনন্দ আমাদের জন্য নয়। স্থবিরতাও নয় শোভন। পতনপ্রবণতাকে অতিক্রম করতেই হবে আমাদেরকে। যেতে হবে অক্ষয়তার দিকে। সাধনা-সংকুল সিদ্ধি ও ঋদ্ধির দিকে। জাগ্রত জীবনের দিকে।

অতএব মানুষ জেগে ওঠো। পথের দুঃখ তোমার ললাট-লিখন। কিন্তু তুমি পথপ্রদর্শকবিহীন নও। তোমার পরিত্রাণকে নিশ্চিত করবার জন্যই তো যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন মহামানবেরা— প্রেরিত পুরুষেরা। অবতারিত হয়েছে আকাশজ বাণীবৈভব। শেষে পেয়েছো চরম, পরম ও সর্বশেষ মহাকল্যাণ — মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এই মহা আয়োজনকে তুমি অস্বীকার করো কী করে? কী করে প্রশ্রয় দাও উদাসিনতাকে, অস্বীকৃতিকে? তুমি তো মানুষ!

সামনে তাকাও। দ্যাখো অনড় অস্তাচল ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। দিনান্তের দুঃখ তোমাকে পেতেই হবে। ছেড়ে চলে যেতেই হবে পার্থিবতা, প্রয়োজন, সঙ্গী, সঙ্গিনী ও স্বজনকে। সমাধি-অভ্যন্তরে তখন তুমি একা। তারপর মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচারের দিবসের মহামানবিক সমাবেশ। তারপর? তবে তুমি সাবধান হও হে বিস্মৃতি ও সম্ভোগপ্রবণ মানবতা। অনন্ত আবাসের চিরস্থায়ী সুখ দুঃখ নির্বাচন করো এই মুহূর্তে। এখনই। বেলা তো বয়েই চলেছে।

এবার তবে এসো অক্ষয়তার পথে। স্নাত হও প্রেম ও প্রজ্ঞার জারক রসে। মগ্ন হও। মুখর হও। পান করো অভিজ্ঞানের অনন্ত অমিয়। জেগে ওঠো আত্মার উৎসবে। জাগো। জাগ্রত হও।

যথাভাষ্য ছাড়া মহাগ্রন্থ আল কোরআনের পবিত্র বাণী হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই কোরআনুল কারীমের যথা ব্যাখ্যা দানের নিয়ম চলে এসেছে শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই। তিনি স. নিজে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেই ব্যাখ্যার আলোকেই পথ চলেছেন সম্মানার্হ সাহাবায়ে কেরাম। সেই আলোরই আক্ষরিক বিস্তার ঘটিয়েছেন পরবর্তী সময়ের প্রাজ্ঞ তাফসীরকারগণ। এভাবে গড়ে উঠেছে তাফসীর শাস্ত্রের এক বিশাল মহীরুহ। তাফসীরে মাযহারী সেই অক্ষয় মহীরুহেরই এক অবাক পুষ্প। বিরল কমল। এতে ঘটেছে বর্ণনা পরম্পরাগত বিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির বিস্ময়কর সম্মিলন। খুলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান-গৃহের সব ক'টি দুয়ার ও বাতায়ন। বিদগ্ধ পাঠক তাই তাফসীরে মাযহারী পাঠ করে মুগ্ধ, অভিভূত ও উজ্জীবিত না হয়ে পারেন না।

প্রজ্ঞার এই মহাআয়োজনটি সুসম্পন্ন হয়েছে প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে। ভারতের বর্ণাঢ্য মুসলিম শাসনে যখন গোধুলির রঙ লাগতে শুরু করেছে, তখন এই কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থটির শ্রদ্ধার্হ গ্রন্থকার ছিলেন ইতিহাসখ্যাত পানিপথ শহরের স্বনামধন্য বিচারপতি। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইনের উত্তর পুরুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বজনমান্য ইমাম। অনুসারী ছিলেন হানাফী মাজহাব এবং মোজাদ্দেদিয়া তরীকার। জবানী ও কলবী এলেমের এই দুই সুউচ্চ শিখর থেকে জ্ঞান ও ফয়েজ আহরণ করেছিলেন বলেই তাঁর এই মহান কীর্তিটি অধিকতর পরিণত ও উন্নত। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী রহঃ এর সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলাসূত্রটি এ রকম ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী— শায়েখ মাযহারে শহীদ জাঁনে জানা— শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদাউনি— শায়েখ সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী— খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী— হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমতুল্লাহি আ'লাইহিম আজমাঈন।

এই খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন এ নগন্য ফকিরের প্রিয় রূহানী ফরজন্দ মাওলানা এ.বি.এম. মাঈনুল ইসলাম। আর এর নেপথ্যে রয়েছে সযত্ন ও সতর্ক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সম্পাদন কর্মীরা, খানকাবাসী জ্ঞান পিপাসুরা। প্রকৃত পক্ষে এই কল্যানমুখী যুথবদ্ধতা আমাদের পরম প্রেমময় প্রভু-প্রতিপালকের এক অনিন্দ্যসুন্দর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বারো খণ্ডে সমাপ্তব্য এই মহান তাফসীর গ্রন্থটির সম্পূর্ণ প্রকাশ নিশ্চিত যাতে হয়, সেজন্য আমরা সকলের দোয়া প্রার্থী। নিশ্চয় যোগ্যতার আলো দিয়ে আমাদের মতো অধম সেবকদের অযোগ্যতার অন্ধকারকে অপসারিত করা হয়েছে। না হলে এই মহতী মহা-আয়োজনটি বঙ্গবক্ষকে এভাবে আলোকিত করে চলেছে কী করে! সকল পবিত্রতা ও প্রশংসাই তো তাঁর।

হে আমাদের অপরিসীম দয়ালু দাতা! আমরা তোমার অক্ষয় ও আনুরূপ্যবিহীন কৃপার কালাতীত আশ্রয়ের অভিলাষী। আমাদেরকে গ্রহণ করো। আমিন। আমরা তোমার প্রিয়তম রসুলকে ভালোবাসি। ভালোবাসি তোমার নৈকট্যভাজনদেরকে। আমরা আমাদের অন্তরোৎসারিত অসংখ্য দরূদ ও সালাম পাঠালাম প্রিয়তম রসুলের প্রতি। তাঁর প্রিয় পরিবার পরিজন বংশধর অনুচরবর্গ ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি। আমাদের মহান পীর ও মোর্শেদ হাকিম আব্দুল হাকিম আউলিয়ার প্রতি। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

তাফসীরে মাযহারী রচিত হয়েছিলো আরবীতে। আমরা অনুবাদ করেছি দিল্লীর নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈমের উর্দু তরজমা থেকে। আর একটি জ্ঞাতব্য এই যে, বঙ্গানুবাদটি আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহন করেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে।

সহৃদয় পাঠকদের নিকটে উপরোধ— কোথাও ভুল চোখে পড়লে জানাবেন। আমরা দোয়া ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধিত হবো।

প্রারম্ভে এবং অবশেষে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

নবম পারা — সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১ — ৪০

দশম পারা — সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪১ — ৭৫

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১ — ৯৩

একাদশ পারা — সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯৪ — ১২৯

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১ — ১০৯

তাফসীরে মাযহারী

পঞ্চম খন্ড

নবম, দশম ও একাদশ পারা
(সুরা আন্‌ফাল, সুরা তওবা ও সুরা ইউনুস)

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১ — ৭৫
সুরা তওবা ঃ আয়াত ১ — ১২৯
সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১ — ১০৯

নবম পারা

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَنۡفَالِ ؕ قُلِ الۡاَنۡفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصۡلِحُوۡا

ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ ۪ وَاَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ○

❑ লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রসূলের; সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজদিগের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপন কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর।'

সুরা আন্‌ফালের আয়াতের সংখ্যা ছিয়াত্তর অথবা সাতাত্তর। আলেমগণ বলেছেন, 'ওয়া ইজ ইয়াম্ কুরু বিকা' থেকে (৩০ আয়াত থেকে) সাতটি আয়াত (৩৬ আয়াত পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। অবশিষ্ট সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায়। বিশুদ্ধ মত এই যে, ওই সাতটি আয়াতে বর্ণিত ঘটনাগুলো মক্কায় সংঘটিত হলেও আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায়।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইবনে আবী শায়বা, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে আবেদ,ইবনে আসাকের এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন, শত্রু পক্ষের কাউকে বধ করলে অথবা বন্দী করলে তার পরিত্যক্ত সকল সরঞ্জামের মালিক হবে হত্যাকারী অথবা বন্দীকারী। আর এক বর্ণনায় এসেছে, কালাবীর মাধ্যমে ইবনে মারদুবিয়া, আবু সালেহ সূত্রে ইবনে উজলানের মাধ্যমে ইকরামার সূত্রে আতা হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ করেন, রসুল স. যখন ঘোষণা করলেন, মুসলিম যোদ্ধা কোনো কাফেরকে বন্দী করলে, অথবা হত্যা করলে তার যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রীর অধিকার লাভ করবে সে-ই। এই ঘোষণা শুনে যুবকেরা বীরদর্পে এগিয়ে গেলো সম্মুখের দিকে। বৃদ্ধরা বললো, আমাদেরকেও তোমাদের গণিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের) অংশ দিয়ো। কারণ আমরাইতো নিশ্চিত করবো পশ্চাদ্ভাগের নিরাপত্তা। যুবকেরা বৃদ্ধদের কথায় প্রতিবাদ করলো। এই

নিয়ে শুরু হয়ে গেলো বাক বিতণ্ডা। শেষে মীমাংসার জন্য রসুল স. সকাশে হাজির হলো সকলে। ইত্যবসরে হজরত আবুল ইয়াসির রা. দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে এলেন সেখানে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনিতো বলেছেন, বন্দী ও নিহত শত্রুর সম্পদের অধিকারী হবে বন্দীকারী অথবা হত্যাকারী। এ কথা শুনে দণ্ডায়মান হলেন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এভাবে সকল কিছুইতো সৈন্যদেরকে দিয়ে দিলেন। আপনার নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। আমরাওতো রণপ্রান্তরে এসে যুদ্ধরত অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা শত্রুর আক্রমণাশংকায় কাটাচ্ছি। অথচ আমরাও রইলাম বঞ্চিত। আমরাওতো জীবনের মায়া ত্যাগ করে এসেছি যুদ্ধের ময়দানে। হে আমাদের প্রিয় রসুল! গণিমতের লোভে সবাই আপনাকে একাকী ফেলে চলে গিয়েছিলো সামনের দিকে। আপনার নিরাপত্তা হয়ে গিয়েছিলো বিঘ্নিত। অথচ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধানতম কর্তব্য ছিলো না কি? এভাবে যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে বাদানুবাদ চলতেই থাকলো। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি।

প্রথমেই এরশাদ হয়েছে—'ইয়াসআলুনাকা আ'নিল আন্‌ফাল কুলিল আন্‌ফালু লিল্লাহি ওয়ার রসুলি' (লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ ও রসুলের)। এখানে উল্লেখিত 'আনফাল' শব্দটি 'নফল' শব্দের বহুবচন। নফল অর্থ অতিরিক্ত। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ব্যবসা, কৃষি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অর্জিত সম্পদ নয়। তাই এই সম্পদকে বলা হয়েছে আনফাল বা অতিরিক্ত। উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম হচ্ছে — আল্লাহ্‌তায়ালা এরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় রসুল: লোকেরা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের। সম্পদের মালিকানা আল্লাহ্‌র। অতএব যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানাও তাঁরই। আর তাঁর রসুল ওই সম্পদের ব্যয় করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনিই আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশানুসারে যথাসময়ে যথাস্থানে তা বণ্টন করবেন। হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর অধিকার সাধারণ মানুষের নিকট থেকে নিয়ে রসুল স.এর হাতে ন্যস্ত করেছেন। রসুল স. সমতা রক্ষা করে সকলের মধ্যেই তা বণ্টন করেন। আল্লাহপাকের ভীতি,রসুলের আনুগত্য ও মানুষের পারস্পরিক আচরণ বিশুদ্ধকরণই ছিলো আয়াতের উদ্দেশ্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করো, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' এ কথার অর্থ — হে যোদ্ধৃবৃন্দ! আল্লাহ্‌তায়ালা গণিমতের মাল অধিকার করে তাঁর রসুলের হস্তে অর্পণ করেছেন। যথা সময়ে তিনি তা সুষ্ঠুভাবে তোমাদের মধ্যে বণ্টন করবেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। অযথা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ো না। প্রতিষ্ঠিত করো পারস্পরিক সম্প্রীতি। তোমরা বিশ্বাসী হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকম বলেছেন।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. প্রথমে ঘোষণা দিয়েছিলেন শত্রু নিধন করলে অথবা তাকে বন্দী করলে তার সকল সম্পদের অধিকারী হবে মুসলিম যোদ্ধা। এই ঘোষণা শুনে তরুণ যোদ্ধারা বীর বিক্রমে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিহত করলেন সত্তর জনকে। সত্তর জনকে করলেন বন্দী। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ছিলো অপ্রতুল। অন্যান্য সরঞ্জামও ছিলো পুরোনো। পশ্চাৎভাগে ছিলেন প্রবীণেরা। তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বীরদর্পে। কিন্তু অগ্রভাগে ছিলেন না বলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাঁরা পেলেন না। তরুণ যোদ্ধাদেরকে লক্ষ্য করে তাঁরা বললেন, আমরা পশ্চাদ্ভাগে দৃঢ় ব্যূহ রচনা না করলে তোমরা নিরাপদে ফিরে আসতে পারতে না। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাদেরকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার করা। তখন অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করে সকল যোদ্ধার মধ্যে বন্টন করে দেন।

বায়যাবী লিখেছেন, উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের সময় সেনাপতি সৈন্যদেরকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক নয়। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও পরিণামের প্রেক্ষিতে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভেঙে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত দানের অধিকার রয়েছে সেনাপতির। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইমাম আহমদ, আবদ্ বিন হুমাইদ এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে আমার ভাই উমায়ের শহীদ হলেন, আর আমি সাঈদ বিন আসকে হত্যা করে হস্তগত করলাম তার তলোয়ার। তলোয়ারটির নাম ছিলো যুলকুতাইফাহ্। তলোয়ারটি নিয়ে আমি হাজির হলাম রসুল স. এর খেদমতে। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! মুশরিককে খতম করতে পেরে আজ আমার অন্তর প্রশান্ত। গণিমত হিসেবে লাভ করেছি এই তলোয়ারটি। আমার নিবেদন, দয়া করে তলোয়ারটি আপনি আমাকে দিয়ে দিন। আপনিতো আমার সম্পর্কে অবগত (হে আল্লাহ্র রসুল! আপনিতো আমার ইমান ও বীরত্ব সম্পর্কে ভালো করেই জানেন)। রসুল স. বললেন, তলোয়ারটি তোমার নয়— আমারও নয়। সুতরাং ওটা রেখে দাও। আমি তাই করলাম। ভাবলাম, তলোয়ারটি কার হাতে গিয়ে যে পড়ে! শেষ পর্যন্ত আমার মতো বীর নয় এ রকম লোকের হাতে গিয়ে পড়বে— এ কথা ভেবে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। মনে হলো আমার ভাই শহীদ হয়েছে তলোয়ারটিও হস্তচ্যুত হয়েছে। আমার মতো হতভাগা আর কেউ নেই। মনোকষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি পুনরায় গেলাম রসুল স. সকাশে। পুনরায় জানালাম তলোয়ার প্রাপ্তির আবেদন। এরপর বেশ

জোরে ধমক দিলেন রসুল স.। মন ভার করে আমি চলে যাচ্ছিলাম। কয়েক পা যেতে না যেতেই অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে এ কথা প্রচার করে দিলেন। আর আমাকে ডেকে দিয়ে দিলেন তলোয়ারটি। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হঠাৎ আমার নিকটে এসে বললেন, আমার কাছে তলোয়ার প্রার্থনা করেছিলে তুমি। কিন্তু আমি তো তলোয়ারটির মালিক ছিলাম না। তাই দিতে পারিনি। এখন আল্লাহ্পাক আমাকে মালিকানা দান করেছেন। তাই তলোয়ারটি তোমাকে দিতে পারলাম।

ইমাম বোখারী তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, আমি ও একজন আনসারী গণিমত সংগ্রহের জন্য এগিয়ে গেলাম। একটি তলোয়ার পেলাম আমরা। আমি বললাম, তলোয়ারটি আমার। আনসারী বললেন, না আমার। বাদানুবাদ চলছিলো। একটু পরেই এলেন রসুল স.। তিনি সব শুনে আমাকে বললেন, হে সাঈদ! তোমাদের দু'জনের একজনও তলোয়ারটির মালিক নও। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত— 'ইয়াস আলুনাকা আ'নিল আন্ফাল' (তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্বন্ধে)। অবশ্য পরে এই আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে— 'ওয়ালামু আন্না মা গানিমতুম মিন্ শাইয়্যিন ফাইন্নামা লিল্লাহি খুমুসাহূ ওয়া লির রসুলি ওয়ালিজিল্ কুরবা' (আর জেনে রেখো তোমরা যুদ্ধে যা কিছু সামগ্রী অর্জন করো, এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র, রসুলের এবং রসুলের আত্মীয়দের জন্য)।

ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর একমাত্র অধিকারী ছিলেন রসুল স.। সেখানে আর কারো কোনো আধিপত্য ছিলো না। যা কিছু হস্তগত হতো মুসলিম যোদ্ধৃবৃন্দের, সব জমা হতো এক জায়গায়। যদি তিল পরিমাণ বস্তুও কেউ রেখে দিতো, সেটা পরিগণিত হতো চুরিতে। জনগণ রসুল স. সকাশে নিবেদন করেছিলেন — গণিমত থেকে আমাদেরকে কিছু দান করুন। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গণিমতের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন রসুল স.। সূঁচের পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা কম সম্পদও নিজের কাছে রাখলে তা হয়ে যাবে চুরি। কেউ কেউ গণিমত প্রার্থনা করেছিলো। তখন অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, হে মুজাহিদ বৃন্দ! গণিমতের মাল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুলই তা বণ্টন করবেন। সুতরাং তোমরা এই মুহূর্তে আল্লাহ্র ভয়ে বিতণ্ডা পরিহার করো। সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করো নিজেদের মধ্যে। পরে অন্য একটি আয়াতের মাধ্যমে এই আয়াতটি রহিত হয়।

রহিতকারী ওই আয়াতে বলা হয়েছে— 'গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রসুলের, রসুলের স্বজনদের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের।' বাকী চার অংশের এক অংশ পদাতিক সৈন্যের জন্য, তিন অংশ অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য অর্থাৎ অশ্বের জন্য দুই ও যোদ্ধার জন্য এক।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, যখন রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সকলের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করার নির্দেশ দিলেন তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ নিবেদন করলেন— আয় আল্লাহ্‌র রসুল! ওই অশ্বারোহীকে আপনি সেই পরিমাণ গণিমত প্রদান করলেন, যে তার স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে অতন্দ্র প্রহরী। একই পরিমাণ দান করলেন ওই দুর্বল লোককে যে নিজের হেফাজতেরও যোগ্যতা রাখে না। তিনি স. এরশাদ করলেন— তোমার মাতা তোমার জন্য রোদন করুক! তুমি এতটুকুও অবগত নও যে, এই দুর্বলদের দোয়ার বরকতে অর্জিত হয় বিজয়। তখন হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অশ্বারোহীরাইতো লাভ করলো সবচেয়ে বেশী। ঘোড়ারও ভাগ পেলো তারা। যুদ্ধ করতে অসমর্থ লোকদেরকেও তো আপনি গণিমত দান করলেন। অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের এতোটুকুও অংশগ্রহণ নেই। রসুল স. বললেন, তোমাদের জননীরা কিভাবে প্রতিপালন করেছে তোমাদেরকে? তোমরা কি এতটুকুও অবগত নও যে, ওই দুর্বল লোকদের দোয়ার বরকতে তোমরা বিজয়ী হয়েছো। এরপর রসুল স. একজনকে নির্দেশ দিলেন, এই মর্মে ঘোষণা করে দাও যে — যে কোনো যুদ্ধরত কাফেরকে হত্যা করে তার মাল ছিনিয়ে নিবে, সে-ই হবে ওই মালের মালিক। আর কেউ কোনো কাফেরকে বন্দী করলে সেই বন্দীর মালিকও হবে সে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে সাঈদ বিন মনসুর, আহমদ, ইবনে মুনজির, ইবনে হাব্বান এবং হাকেম উল্লেখ করেছেন, তুমুল যুদ্ধ হলো মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে। পরাজিত হলো অবিশ্বাসীরা। পলায়নরত অবিশ্বাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করলো কতিপয় মুসলিম সৈন্য। তারা কাউকে করলো হত্যা, কাউকে বন্দী। কেউ কেউ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের ফেলে যাওয়া গণিমত সংগ্রহের পর বললো, এগুলোতো জমা করেছি আমরা। সুতরাং আমরা ছাড়া অন্য কারো অংশ এগুলোতে নেই। পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যরা ফিরে এসে বললো আমরাই তো গণিমতের অধিক হকদার। আমরাই শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছি দৃষ্টিসীমার বাইরে। তখন রসুল স. এর নিরাপত্তাবিধানে নিয়োজিত সৈন্যরা বলে উঠলো, আমাদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত হকদার কেউ নয়। কারণ, আমরাই ছিলাম রসুল স. এর হেফাজতের দায়িত্বে। আমরা অতন্দ্র ছিলাম বলেই শত্রুরা রসুল স.কে আক্রমণ করার সুযোগ পায়নি। মুজাহিদগণের এমতো বাক্য বিনিময়ের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো 'ইয়াস্‌ আলুনাকা আনিল আন্‌ফাল।'

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

❒ বিশ্বাসী তো তাহারাই যাহাদিগের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন উহা তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

❒ যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

❒ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগেরই জন্য রহিয়াছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে — 'বিশ্বাসীতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়।' এ কথার অর্থ, ওই সকল লোকই পরিপূর্ণ বিশ্বাসী যাদের অন্তর আল্লাহ্‌তায়ালার অতুলনীয় মহিমা, গৌরব ও পরাক্রম স্মরণ করে ভীত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওই সকল লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো পাপ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করলে তাদেরকে যদি বলা হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তখন তারা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই গোনাহের চিন্তা পরিত্যাগ করেন। এখানে আল্লাহ্‌পাকের স্মরণ অর্থ আল্লাহ্‌পাকের আযাবের স্মরণ। আল্লাহ্‌র আযাবের কথা এখানে উহ্য রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। এ কথার অর্থ— যখন ওই সকল ব্যক্তির সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাদের প্রতি বর্ষিত হয় অজস্র বরকত। তাদের চোখ ও হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হতে থাকে আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ। তাই তারা তখন সকল অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কেবল আল্লাহ্‌র উপর। অন্যের প্রতি তাঁরা যেমন নির্ভর করেন না, তেমনি অন্য কাউকে ভয়ও পান না। তাঁদের যাবতীয় কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহ্‌র প্রতি। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো আশাধারী তাঁরা নন।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।' এখানে 'যারা সালাত কায়েম করে' কথাটির অর্থ— তারা সুচারুরূপে নামাজ সম্পাদন করে থাকে। নামাজে তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কঠিন পদার্থ যেমন আগুনে গলিয়ে সোজা করে ফেলা হয়, তেমনি তারা নামাজকে প্রতিষ্ঠা করেন সরল ও শুদ্ধভাবে, পরিপূর্ণরূপে। এভাবে তারা তাদের অস্তিত্বকে করে ফেলেন 'কায়েম' শব্দটির বাস্তব অবয়ব।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।' এ কথার অর্থ — ওই সকল লোক তাদের সম্পদকে মনে করে আল্লাহ্‌তায়ালার দান। ওই সম্পদ দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করেন এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ও করেন। এভাবে তারা অর্জন করেন প্রকৃত ইমানদারের সকল বৈশিষ্ট্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।' এ কথার অর্থ — উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী যারা তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী।

হাসান বসরীকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, আপনার প্রশ্নের অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাব সমূহের প্রতি, রসুলগণের প্রতি, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি এবং হাশর ও হিসাবের প্রতি আমি বিশ্বাস রাখি কিনা, তবে আমি বলবো, আমি অবশ্যই বিশ্বাসী (মুমিন)। কিন্তু আপনি যদি বলেন, 'ইন্নামাল মু'মিনুনাল লাজিনা ইজা জুকিরাল্লহু ওয়াযিলাত কুলুবুহুম' (বিশ্বাসীতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়) আমি এই আয়াতের বৈশিষ্ট্যধারী কিনা, তবে আমি বলবো আমি তা জানি না। হাসান বসরীর এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে — সাধারণ অর্থে অবশ্যই আমি মুমিন, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যধারী মুমিন হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আমি নিজে থেকে কিছু বলবো না (এ রকম বললে অহমিকাকে প্রশ্রয় দানের সুযোগ সৃষ্টি করা হতে পারে)। আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ দয়া ও দানের ফলেই কেবল এ রকম পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায়। এমতো ক্ষেত্রে বান্দার প্রচেষ্টা যেহেতু গৌণ, তাই বান্দা কেনো নিজে থেকে এই ঝুঁকিপূর্ণ দাবিটি করে বসবে। এই মুমিনেরা তো সকল কুমন্ত্রণা ও পাপপ্রবণতা থেকে এমনভাবে পবিত্র, যেভাবে পবিত্র হয় মানুষের শরীর ওজু ও গোসলের মাধ্যমে।

সলফে সালেহীনের একটি বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ হচ্ছে — 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্‌,' এ রকম বলা জায়েয কিনা। 'ইনশাআল্লাহ্‌' শব্দটি দৃঢ় সংকল্পকে প্রকাশ করে না। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আপন ইমানকে এ রকম দৃঢ়তার অনুপযোগী শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা বৈধ নয়। ইনশাআল্লাহ্‌ অর্থ —

আল্লাহ্ যদি চান। তাই 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' বললে 'আমি ইমানদার', এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। 'আপনি কি মুমিন', এ রকম প্রশ্নের যথার্থ ও সুনির্দিষ্ট জবাবও এটা নয়। অবশ্য মৃত্যুকালে ইমান থাকবে কিনা, সে ব্যাপারে হলফ করে কিছু বলা যায় না। তাই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' বললে দোষেরও কিছু নেই।

আমি বলি, হাসান বসরীর 'আমি জানিনা, আমি পরিপূর্ণ ইমানদার কি না'— এ ধরনের জবাব 'আমি মুমিন ইন্শাআল্লাহ্' কথাটির মতোই। তাই তাঁর কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে এ রকম— 'আমার নাম পরিপূর্ণ পুণ্যকর্মধারী ইমানদারদের দপ্তরে আছে কি না তা আমি জানি না।'

আলকামা বলেছেন, একবার সফররত অবস্থায় কয়েকজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হলো আমার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কারা? তারা বললো, 'দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ইমানদার।' আমি নিরুত্তর রইলাম। ভাবলাম, কি বললাম আমি আর তারা জবাব দিলো কী? পরে একদিন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তাদের কথার পরে তুমি কি কিছু বললে? আমি বললাম, আমি আর কিছু বলিনি। তিনি বললেন, তুমি বলতে পারতে, তোমরা কি দৃঢ় প্রত্যয়ী যে তোমরা জান্নাতী? প্রকৃত মুমিনেরা নিজেদেরকে জান্নাতী বলে দৃঢ় আস্থা রাখে।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে বলে, আমি মুমিন; এ কথাও বলে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটেও আমি মুমিন— এরপরও যদি সে তার জান্নাতী হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, তবে বুঝতে হবে, সে পূর্ণ ইমানদার নয়। তার ইমান অর্ধেক। আর যারা 'আমি মুমিন ইন্শাআল্লাহ্' বলা জায়েয মনে করেন, তারা সুফিয়ান সওরীর অভিমতকেই গ্রহণ করেন তাদের পক্ষের দলিল রূপে। এ রকম ভাবে নিজের ইমান প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে— কেবল ভালোভাবে মৃত্যু নয়, খাতেমা বিল খায়ের (ইমানের সঙ্গে মৃত্যু) হলেই কেবল জান্নাত অবধারিত হয়। সুতরাং এ রকম হওয়ার আগে কীভাবে ইমানের ঘোষণা দেয়া যায়। তাদের কথার অর্থ এ রকম নয় যে, বর্তমানে যে বিশ্বাস সহ আমি আমল করে চলেছি, সেই বিশ্বাস দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ। খাতেমা বিল খায়েরের প্রতিই তাঁরা প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখেন বলেই বলেন, 'আমি বিশ্বাসী ইনশাআল্লাহ্।'

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্'— এ রকম বলা মকরূহ। কারণ এ রকম বক্তব্যে রয়েছে সন্দেহ ও দোদুল্যমানতার অবকাশ। 'আমি সত্য ইমানদার' অথবা 'নিশ্চয় আমি মুমিন'— এ রকম বললে এ রকম বোঝায় না যে, 'আমার খাতেমা বিল খায়ের হবেই' বা 'আমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের

ইমানদার' বরং এ কথাই বোঝায় যে— 'বর্তমানে আমি অবশ্যই ইমানদার।' আমি যে ইমানদার, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। উল্লেখ্য যে, সন্দেহ ও ইমান পরস্পরবিরোধী বিষয়। এ দু'টোর একটি থাকলে অপরটি অন্তর্হিত হয়। তাই 'আমি নিশ্চয় মুমিন'— এ রকম বলাই অধিকতর সমীচীন। ইমাম আবু হানিফা তাই এ রকম নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথাটি অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, শব্দবিভ্রাটের মতো লঘু কারণেই এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। তাঁদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে এক্ষেত্রে গুরুতর কোনো বৈসাদৃশ্য নেই।

ইমাম আবু হানিফা একবার কাতাদাকে বললেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ্' — এভাবে আপনি আপনার ইমানকে প্রকাশ করেন কেনো? কাতাদা বললেন, আমি হজরত ইব্রাহিমের শর্ত অনুসরণ করি। হজরত ইব্রাহিম ঘোষণা করেছিলেন, 'যিনি আমাকে আহার করান, তিনি কিয়ামতের দিন আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।' এখানে 'তোয়ামা' শব্দের মাধ্যমে ওই ইমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অদৃঢ়। ইমাম আবু হানিফা বললেন, আপনি হজরত ইব্রাহিমের ওই কথার অনুসরণ করেন না কেনো, যেখানে তাঁকে বলা হয়েছিলো 'তুমি কি ইমান আনোনি।' হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি ইমান এনেছি। কিন্তু আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য এ রকম কামনা করছি (তুমি মৃতকে কীভাবে জীবিত করো, তা দেখতে চাচ্ছি)।' তাঁর ওই প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। হজরত ইব্রাহিমের মতো ইমানের দাবি উপস্থাপন করলে তার সওয়াবও পাওয়া যাবে। এ কথা অবশ্য সত্য যে, অন্তরে বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ বলে 'আমি ইমানদার' তবে তার অবিশ্বাস হয়ে যাবে আরো পাকাপোক্ত এবং এর জন্য শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।' এখানে 'ইনদা রব্বিহিম' অর্থ— তাদের প্রতিপালকের নিকট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অন্তরে কপটতা নেই এ রকম বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকটে রয়েছে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা। এ রকম বলা হয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন — 'তিলকার্‌রসুলু ফাদ্‌দ্বাল্‌না বা'দ্বহুম আ'লা বা'দ্বিন' (এই রসুলগণ, তাদের মধ্যে একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি)। আতা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে সে মর্যাদা হচ্ছে জান্নাতের মর্যাদা। সেখানে প্রত্যেকে তার আপন পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে (মর্যাদা নির্ণীত হবে প্রত্যেকের আমল অনুযায়ী)।

হজরত উবাদা বিন সামেত বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের রয়েছে একশত তোরণ। একটি তোরণ থেকে অন্য তোরণের দূরত্ব হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। ফেরদৌস নামক জান্নাতের তোরণ হবে সবচেয়ে

উঁচু। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে জান্নাতের চারটি নদী। জান্নাতুল ফেরদৌসের উপরে রয়েছে আল্লাহ্র আরশ। তোমরা দোয়ার সময় আল্লাহ্তায়ালার নিকট জান্নাতুল ফেরদৌস যাচনা করো। তিরমিজি।

বাগবী বলেছেন, হজরত রবী বিন আনাস এর বর্ণনায় রয়েছে, সত্তরটি দুয়ার রয়েছে জান্নাতের। একটি দ্রুতগামী অশ্ব সত্তর বছর ধরে দৌড়ে যতদূর অতিক্রম করতে পারে, ততদূর ব্যবধান রয়েছে একটির সঙ্গে অন্যটির।

'ওয়া মাগফিরাতুন্' অর্থ— এবং ক্ষমা। অর্থাৎ প্রকৃত ইমানদারের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে। 'ওয়া রিয্কুন কারীম' অর্থ—এবং সম্মানজনক জীবিকা। জান্নাতের জীবিকাসম্ভারের বিবরণ দান অসম্ভব। সেখানকার নেয়ামতরাজি অফুরন্ত, অক্ষয়। প্রকৃত ইমানদারদের জন্য সেখানে রয়েছে ওই সকল নেয়ামতের সমারোহ — যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। যার বিবরণ কোনো কান কখনো শুনেনি এবং যার অনুভূতি কোনো হৃদয় কখনো ধারণ করেনি।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৫, ৬

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

❑ ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন অথচ বিশ্বাসীদিগের এক দল ইহা পছন্দ করে নাই।

❑ সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হইতেছিল তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

'কামা আখরাজা' কথাটির অর্থ— যেমন আপনাকে বের করেছেন। কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই উহ্য উদ্দেশ্যটি সহ প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতটির অর্থ হবে এ রকম — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন একটি কঠিন সমস্যা। সমস্যাটি যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হয়ে বদর প্রান্তরে আসার মতোই বিতর্কবহুল। অর্থাৎ বদর যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে যেমন বাক বিতণ্ডার উদ্ভব হয়েছিলো, তেমনি বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কেও। পরে দেখা গেলো মদীনা থেকে বদরে এসে ভালোই হয়েছে। লাভ হয়েছে পূর্ণ বিজয়। এখন যুদ্ধলব্ধ

সম্পদের বিষয়েও তোমরা নানা মত পোষণ করছো। কিন্তু তোমাদেরকে জানানো হচ্ছে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও রসুলের। এই ঘোষণাটি মেনে নিলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে, যেমন কল্যাণলাভ হয়েছে যুদ্ধে এসে। অতএব, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নির্বিবাদে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কথা মেনে নাও। এ কথা গুলোই আলোচ্য আয়াত দু'টোতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে — হে আমার রসুল! এটা এরূপ যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার গৃহ থেকে (মদীনা থেকে) বের করে ছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একটি দল এটা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিলো তাদেরকে যেনো মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করা হচ্ছে। আর তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে।

এখানে 'বাইত' (গৃহ) বলতে মদীনাকে বুঝানো হয়েছে। মদীনা রসুল স. এর হিজরতের স্থান এবং তাঁর হিজরত পরবর্তী নিবাস। গৃহের সঙ্গে গৃহকর্তার যে সম্পর্ক, মদীনার সঙ্গে রসুল স. এর সম্পর্ক সেরকমই।

বদর যুদ্ধ

ইবনে উকবা ইবনে আবেদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকট সংবাদ এলো সিরিয়া থেকে কুরায়েশদের একটি বিশাল বাণিজ্য বহর ফিরে চলেছে মক্কায়। আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হাজার উটের ওই বাহিনীতে মক্কার সকল মুশরিকেরই কিছু না কিছু আর্থিক অংশগ্রহণ ছিলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যমানের পণ্য সামগ্রী বহন করে আনছিলো উটগুলো। সত্তর জন লোক ছিলো ওই বাণিজ্য বাহিনীতে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের, মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং সুদ্দীর বর্ণনানুসারে ওই বাণিজ্য কাফেলায় আবু সুফিয়ান সহ ছিলো চল্লিশ জন। আমর বিন আস এবং মাখরামা বিন নওফেল জুহুরীর মতো ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ছিলো ওই কাফেলায়। রসুল স. আহ্বান জানালেন— ওই কাফেলাটিকে আক্রমণ করতে হবে। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদেরকেই দেয়া হবে গণিমত। রসুল স. এর এই আহ্বানে সাড়া দিলো অনেকেই। কেউ হালকা এবং কেউ ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলো। কেউ কেউ আবার প্রকাশ করলো অনীহা। মদীনার বাইরে এসে কেউ কেউ বলাবলি করলো, আমরা বুঝতে পারছি না তিনি স. আমাদেরকে কোনো যুদ্ধে যেতে বলছেন কিনা। রসুল স. কারো তোয়াক্কা করলেন না। বললেন, যার যার বাহন আছে, তারাই কেবল গমন করবে আমার সঙ্গে। কেউ কেউ বললো, আমরা তবে মদীনায় ফিরে গিয়ে আমাদের বাহন গুলো নিয়ে আসি। রসুল স. বললেন, না শুধু তারাই আমার সাথে চলো, যাদের বাহন আছে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. দশদিন আগে আবু

সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদকে। তাঁরা দু'জন সিরিয়া ও মক্কার পথের নিকটে একস্থানে কাসিদ বিন মালেক জুহানীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে আত্মগোপন করে রইলেন। গোপন অবস্থানে থেকে তাঁরা আবু সুফিয়ানের বাহিনীকে পথ অতিক্রম করতে দেখলেন। তারপর এই সংবাদ নিয়ে ফিরে চললেন মদীনায়। কাসিদ তাঁদেরকে এগিয়ে দিলেন জুল মারওয়া পর্যন্ত। কিন্তু তারা মদীনায় পৌঁছানোর আগেই রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। তাঁরাও রসুল স. এর সঙ্গে এগিয়ে চললেন নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। রসুল স. যখন ইয়াম্বু নামক স্থান দখল করলেন তখন কাসিদ কে ইয়াম্বুর জায়গীর থেকে উচ্ছেদ করলেন। কাসিদ আরজ জানালো, হে আল্লাহর রসুল ! আমি তো বুড়ো মানুষ। মৃত্যুর নিকটবর্তী প্রায়। সুতরাং জায়গীরটি আমার ভাতিজার নামে করে দিন। রসুল স. তাই করেছিলেন। পরে আব্দুর রহমান বিন সা'দ বিন জারারা সেটা ক্রয় করে নিয়েছিলো। আমর বিন শায়বা।

আবু সুফিয়ানের বাহিনী তখন মাকামে জুরকায়। সেখানে গিয়ে বনী হাজ্জামের একটি লোক আবু সুফিয়ানকে জানালো, মোহাম্মদ তার বাহিনী নিয়ে আপনার বাণিজ্য বহর লুণ্ঠন করতে এগিয়ে আসছে। আবু সুফিয়ান চিন্তিত হয়ে পড়লো। কোনো পথিককে দেখতে পেলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলো রসুল স. এর গতিবিধি সম্পর্কে। শেষে একটি কাফেলার নিকট থেকে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গেলো যে, রসুল স. এই বাণিজ্য বহর লুণ্ঠনের জন্যই মদীনা থেকে সদলবলে বের হয়েছেন। এবার রীতিমতো ভীত হয়ে পড়লো আবু সুফিয়ান। সে বিশ দিনার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দূত হিসেবে নিযুক্ত করলো দমদম বিন ওমর গিফারিকে। বললো, যাও। মক্কায় পৌঁছে উটের কান ছিদ্র করে দিয়ো, আর উটের গদি উল্টো করে বেঁধে স্বীয় পরিধেয় সামনে পিছনে ছিঁড়ে দিয়ে কুরায়েশদের নিকট এই বলে ফরিয়াদ কোরো যে, তোমাদের সম্পদ যদি তোমরা হেফাজত করতে চাও, তবে এক্ষুণি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ো। মোহাম্মদ সদল বলে এগিয়ে আসছে তোমাদের বাণিজ্য বহর লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে। তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের দূত ছুটে চললো মক্কার দিকে।

আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ওরওয়া, বায়হাকী, ইবনে শিহাব, ইসহাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন,মুসা বিন উকবাও এ রকম বলেছেন, আবু সুফিয়ানের দূত মক্কায় পৌঁছবার তিন দিন আগে আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব দুঃস্বপ্ন দেখলেন। তিনি তাঁর ভাই হজরত আব্বাসকে ডেকে বললেন, ভ্রাতঃ! আমি একটি স্বপ্ন দেখার পর থেকে ভয়ে ভয়ে আছি। স্বপ্নটি ভয়ংকর। মনে হয় কুরায়েশদের উপর শীঘ্রই নেমে আসবে ভয়াবহ মুসিবত।

হজরত আব্বাস বললেন, বলো কি দেখেছো। আতেকা বললেন, বলবো। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে — এ কথা তুমি কাউকে জানাবে না। কারণ অন্যেরা জানলে আমাদের বিপদ হতে পারে। হজরত আব্বাস বললেন, ঠিক আছে। কাউকে বলবো না।

আতেকা বললেন, আমি দেখলাম উষ্ট্রারোহী এক আগন্তুক এসে পর্বত উপত্যকায় দাঁড়ালো। তারপর চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, ওরে বিশ্বাস-ঘাতকের দল! তিন দিনের মধ্যে তোরা তোদের মৃত্যুর স্থানে চলে আয়। লোকেরা তার নিকটে জড়ো হতে শুরু করলো। লোকটি সেখান থেকে গেলো মসজিদে। লোকেরাও চললো তার পিছু পিছু। এবার তার উটটি সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং তিনটি চিৎকার দিয়ে বললো, ওহে বিশ্বাসঘাতকেরা! মৃত্যু স্থানে চলে আয় তিন দিনের মধ্যে। এরপর লোকটি গেলো আবু কুবাইস পাহাড়ে। সেখান থেকে পুনরায় হুঙ্কার ছেড়ে বললো, হে বিশ্বাস হন্তারকেরা! তিন দিনের মধ্যে চলে আয় মৃত্যু স্থানে। এ কথা বলেই লোকটি পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিলো একটি প্রকাণ্ড পাথর। প্রচণ্ড আওয়াজে খুব দ্রুত গড়াতে গড়াতে নিচে পড়েই টুকরো টুকরো হয়ে গেলো পাথরটি। ওই টুকরোগুলো নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো মক্কার প্রতিটি গৃহে।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে আব্বাস বললেন, এটাতো উত্তম স্বপ্ন। ভয় পাবার মতো কোনো কিছু এতে নেই। তবে স্বপ্নটির কথা গোপন রাখাই সমীচীন। অন্যেরা শুনে ফেললে আমাদেরকে ভালো চোখে দেখবে না।

আব্বাস কিন্তু কথাটিকে গোপন রাখতে পারলেন না। বলে দিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওলিদ বিন উত্‌বা বিন রবীয়া বিন আব্দুস্ শামস্‌কে। শোনার আগে অবশ্য ওলিদকেও স্বপ্নটি গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিলো।

কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হলো না। তিনি তার পিতা উত্‌বাকে ঘটনাটি জানালেন। উত্‌বা আর রাখ ঢাক না করে যাকে পেলো তাকেই জানাতে লাগলো স্বপ্ন বৃত্তান্তটি। ঘরে ঘরে শুরু হয়ে গেলো দুঃস্বপ্নটির আলোচনা।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আব্বাস বলেছেন, আমি কাবা গৃহে তাওয়াফ করছিলাম। কাবা চত্বরে তখন আবু জেহেল কয়েকজনের সঙ্গে দুঃস্বপ্নটির আলোচনা করছিলো। আমাকে দেখে সে বললো, হে আবুল ফজল! তাওয়াফ শেষ করে এখানে একটু এসো। আমি তাওয়াফ শেষ করে তার কাছে গেলাম। আবু জেহেল বললো, ওহে আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠী! তোমাদের মধ্যে আবার একজন নবী হয়ে গেলো না কি? আমি বললাম, কার কথা বলছো? সে বললো, আতেকার কথা বলছি। সে নাকি আবার কী এক স্বপ্ন দেখেছে। আমি বললাম, সেকি! আতেকা আবার স্বপ্ন টপ্ন দেখবে কেনো? আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদতো আগেই নবুয়ত দাবী করেছে। এবার তবে মহিলারাও নবী হতে শুরু করলো?

ইবনে উকবার বর্ণনায় এসেছে, তখন আবু জেহেল বলেছিলো, হে বনী হাশেম! তোমরা হয়তো তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে মুখে মিথ্যাবাদী বলতে প্রস্তুত নও, কিন্তু আচরণের মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে চলেছো। তোমাদের ও আমার পূর্ব-পুরুষেরা ছিলো দু'টি পৃথক দল। কিন্তু তারা কেউ কারো প্রতিপক্ষ ছিলো না। কারণ তারা ছিলো অভিন্ন মতাবলম্বী। এক ধর্মমতানুসারী। কিন্তু এখন তোমরা দাবী করে বসেছো নবুয়ত (যেমন তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মোহাম্মদ)। তোমরা আবার দেখি তাকে নবী বলে মানোও না। কুরায়েশেরা যে এবার কোন অশুভচক্রে পড়লো, কে জানে? শোনো আবুল ফজল। পুরুষদের মতো তোমাদের মহিলারাও দেখি কম মিথ্যুক নয়। শুনেছো তো, আতেকা নাকি স্বপ্নে দেখেছে, এক লোক নাকি চিৎকার করে বলেছে, আয়! মৃত্যুস্থানে তিন দিনের মধ্যে চলে আয়। আমি তোদের জন্য তিন দিনের অপেক্ষায় আছি। জানিনা আতেকার কথা সত্যি কিনা। সত্যি হলে তো ভালোই। আর সত্য না হলে বুঝবো, সারা আরবে তোমাদের মতো মিথ্যুক আর কেউ নেই। হজরত আব্বাস বলেছেন, আবু জেহেলের কথার অনেক জবাবই আমি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি বাদানুবাদের দিকে আর গেলাম না। অস্বীকার করে বসলাম আতেকার স্বপ্নদর্শনকেই।

হজরত উকবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাস তখন বলেছিলেন, তুমিই মিথ্যুক। তোমার গোষ্ঠীই মিথ্যুক গোষ্ঠী। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে শান্ত করলো। বললো, হে আবুল ফজল! আপনিতো আগে কখনো এ রকম মূর্খতাকে প্রশ্রয়দানকারী ছিলেন না।

ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, আবু জেহেলের কথা শুনে হজরত আব্বাস মনোকষ্ট পেয়েছিলেন খুব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাঁর পিতা হজরত আব্বাস বললেন, সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আব্দুল মুত্তালিব বংশের এমন কোনো রমণী ছিলো না, যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেনি। তারা বলেছিলো আপনি সুযোগ দিয়েছেন তাই ওই নচ্ছার লোকটা প্রথমে আপনাদের পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করেছে, তারপর আপনাদের রমণীকুলেরও সমালোচনা করেছে। আপনারা শুধু শুনেই গেলেন। তার মুখের উপর জবাব দেয়ার মত হিম্মত কারো হলো না। আমি বললাম,আল্লাহ্‌র কসম! যা হবার তাতো হয়েছেই। এর অতিরিক্ত বলার মতো আমার নিকট কিছু ছিলো না। তবে হ্যাঁ, আবার যদি সে এ রকম বলে তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি কিছু শুনিয়েই দিবো। আমাদের বংশের আর কেউ আবু জেহেলের কথার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলো না। আমার মনে হলো, আবদুল মুত্তালিবের বংশকে অপদস্থ করার সুযোগ দিয়েছি আমিই। কিন্তু সে আমাদের নারী-পুরুষ সকলের প্রতি যে ভাষায় কটুক্তি করেছে, সেরকম কটু কোনো উক্তিই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না প্রত্যুত্তর হিসেবে। তবে আমি তখন

আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলেছিলাম, আজ থেকে আমি তোমার পিছনে লাগলাম। আমি এ অপমানের প্রতিশোধ নিবোই নিবো। এ কথা বলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম পুনরায় কথাগুলো শোনার জন্য। সে ছিলো খুবই চতুর। সে আমার প্রচণ্ড রোষ দেখে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করলো। আমি মনে মনে বললাম, এর উপর আল্লাহ্‌র গজব বর্ষিত হোক। কাপুরুষ! আমাকে গালি দেয়ার সুযোগও দিলো না।

সহসা ভেসে এলো একটি ঘোষণা। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম, সামনের উপত্যকায় কান ছিদ্র করা গদি উল্টো করে বাঁধা উটের পাশে ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত দমদম চিৎকার করে বলে চলেছে, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! হে লুয়াই বিন গালিব। তোমাদের বাণিজ্য বহরের সংবাদ শ্রবণ করো। আবু সুফিয়ান তোমাদের বাণিজ্য বহর নিয়ে মক্কার দিকে আসছে। আর তা লুণ্ঠনের জন্য পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে মোহাম্মদ ও তার বাহিনী। মনে হয় তোমরা তোমাদের সম্পদ আর হস্তগত করতে পারবে না। বাণিজ্য বহরের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না তোমরা। ঘোষণাটি শুনে কুরায়েশরা ভয় পেয়ে গেলো। মনে পড়ে গেল ওই দুঃস্বপ্নটির কথা।

হজরত আব্বাস আরো বলেছেন, ওই দিন থেকে আবু জেহেলের সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেলো আমার। তার সঙ্গে আর সংশ্রবও রাখলাম না। আর আমার বোন আতেকা ঘটনাটি সম্পর্কে রচনা করলো একটি কবিতা। কবিতাটি এ রকম—

'কীভাবে তোমরা ভাবতে পারলে যে, আমার স্বপ্ন সত্য নয়। আমার আপনজন আমাকে কিছু বললো না। অথচ তুমি বললে আমি মিথ্যাবাদিনী। এখন দেখো, তুমি নিজেই প্রমাণিত হলে মিথ্যুকরূপে। তুমি তো আমার সত্য কথাগুলোকেই বলেছিলে মিথ্যা, নয় কি?

প্রথমাবস্থায় ভীত হয়ে পড়লেও একটু পরেই সম্পদহানির চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলো তারা। ভাবলো— আমাদের সকলের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মোহাম্মদ ও তার লোকেরা। অসম্ভব। সাজ সাজ রব শুরু হলো। অতি দ্রুত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বাণিজ্য বহর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রার আয়োজন শুরু করে দিলো তারা। যারা যেতে পারলো না তারাও নিজেদের পরিবর্তে অন্য লোক ঠিক করে দিলো। যারা ছিলো সামর্থ্যহীন তাদেরকে যুদ্ধোপকরণ ও পাথেয় সরবরাহ করলো সামর্থ্যবানেরা। রসুল স. এর বংশের (বনী হাশেমের) লোকজনদেরকে মুশরিকেরা সন্দেহের চোখে দেখতো। তাই তাদেরকেও সঙ্গে যেতে বললো তারা। যাদের দু'একজনকে মনে হলো রসুল স. এর প্রতি কিছু না কিছু অনুরাগী তাদেরকেও তারা ছাড়লো না। বনী হাশেমের মধ্যে হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, নওফেল ইবনে হারিস, তালহা ইবনে আবু তালেব, আকিল বিন আবু তালেব এবং আরো দু'জন প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য।

আবু লাহাব কিছুতেই যেতে রাজি হলো না। অথচ নিজে না গেলে অন্য কাউকে পাঠাতেই হবে — এই নিয়ম ঘোষণা করেছিলো তারা। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু লাহাব নিজের বদলে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলো আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে। আস পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু লাহাবের কাছ থেকে আস চার হাজার দিরহাম সুদী কর্জ নিয়েছিলো। যুদ্ধে গেলে সে কর্জ আর পরিশোধ করতে হবে না — বলাতে আস রাজি হলো যুদ্ধে যেতে। আবু লাহাবের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার প্রধান কারণ ছিলো হজরত আতেকার সেই দুঃস্বপ্ন। সে বললো, আতেকার স্বপ্নই হচ্ছে আমার কাল।

উমাইয়া বিন খলফ, উত্‌বা বিন শায়বা, জমআ বিন আসওয়াদ, উমায়ের বিন ওহাব, হাকিম বিন হাজ্জাম এবং তাদের সঙ্গীরা উপস্থিত হলো তাদের উপাস্য দেবতা হুবল মূর্তিটির কাছে। যাত্রা শুভ না অশুভ — তা নির্ধারণ করলো তারা ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের মাধ্যমে। তীর পরীক্ষার পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, আমরা আর এই অভিযানে যাচ্ছি না। আবু জেহেল অনেক অনুরোধ করে তাদের সিদ্ধান্ত বদলিয়ে দিলো। ফলে তারাও প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। উমাইয়া বিন খলফ ছিলো খুবই মোটা। তার যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো না মোটেও। কিন্তু তাকে উত্যক্ত করা হচ্ছিলো বার বার। এক বৈঠকে বসেছিলো উত্‌বা বিন আবু মুইত। সেখানে গিয়ে বসতেই তার সামনে আংটি রেখে বিদ্রূপের সুরে উত্‌বা বললো, আবু আলী! তুমি তো দেখি মহিলা হয়ে গেলে! উমাইয়া খুবই লজ্জিত হলো। বললো, আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করেছেন। অথচ তুমি আমাকে অপমান করতে চাও! এ কথা বলে উমাইয়াও শুরু করে দিলো রণ প্রস্তুতি।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, সেনাদলের সঙ্গে যাওয়ার জন্য গায়িকারাও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে তৈরী হলো। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তারা চিন্তা করলো বনী বকর বিন আবদে মানাত বিন কেনানার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের শত্রুতা। আমরা সকলে মক্কা ছেড়ে চলে গেলে নিশ্চয় তারা আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেবে। প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুযোগ তারা ছাড়বে না কিছুতেই। এ কথা ভেবে কুরায়েশদের মধ্যে দেখা দিলো দোদুল্যচিত্ততা। তখন ইবলিস নিজে সুরাকা বিন মালিক কেনানীর অবয়ব ধারণ করে হাজির হলো তাদের সামনে। সুরাকা ছিলো বনী কেনানার এক প্রভাবশালী সরদার। তার আকার ধরে ইবলিস বললো, আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তোমাদের অনুপস্থিতিতে বনী কেনানা কাপুরুষের মতো আচরণ করবে না। তোমরা নিশ্চিন্তে যাত্রা করো। নইলে সকল সম্পদ হারিয়ে তোমরা হয়ে পড়বে নিঃস্ব। এ কথা শুনে আশ্বস্ত হলো মক্কাবাসীরা। নয়শত পঞ্চাশ জনের একটি সুসজ্জিত বাহিনী রওয়ানা হলো অভিযানে। কেউ

কেউ বলেছেন, তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো এক হাজার। তাদের মধ্যে ছিলো দুই শত অশ্বারোহী এবং ছয়শত লৌহ বর্ম পরিহিত যোদ্ধা। সকল কুরায়েশ গোত্রের লোক একত্র হলো। বাদ পড়লো কেবল বনী আদী গোত্রের দুই একজন।

ইবনে উকবা এবং ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, ইবলিস স্বয়ং রওয়ানা হলো মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলো, তোমরা নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে এগিয়ে চলো। তোমাদের সাহায্যের জন্য পিছন থেকে এগিয়ে আসছে বনী কেনানার বিশাল বাহিনী। আমি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার পক্ষ থেকে আমি এ কথাই বলতে পারি যে — তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবার সাধ্য কারো নেই।

মুশরিক বাহিনী যাত্রা স্থগিত করলো জাহ্‌রানে। আবু জেহেল সেখানে জবাই করলো দশটি উট। প্রতিটি তাঁবুতে পৌঁছে দিলো উটের রক্ত। তারপর সমাপ্ত করলো উটের গোশতের ভোজ। দমদম বিন ওমর তখন দেখলো মক্কার উপত্যকায় বয়ে চলেছে রক্তের ঢেউ।

বিশ্রাম ও ভোজ শেষে পুনরায় যাত্রা শুরু করলো মুশরিক বাহিনী। এবার তারা যাত্রা স্থগিত করলো আসিফ নামক স্থানে। সেখানে সৈন্যদের খাওয়ার জন্য উমাইয়া বিন খলফ জবাই করেছিলো তার নয়টি উট। তৃতীয় দিবসে কাদিদ নামক স্থানে পৌছলে দশটি উট জবাই করলো সুহাইল বিন ওমর। সুহাইল পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাদিদ থেকে সমুদ্রোপকূল ধরে চললো মুশরিকেরা। চতুর্থ দিবসে তাদের জন্য উকবা বিন আবী মুঈদ জবাই করলো দশটি উট। সকালে তারা উপস্থিত হলো আবওয়ায়। সেখানে হেজাজের দুই পুত্র নুবাইয়া ও মুনাইয়া সৈন্যদের জন্য উট জবাই করলো কুড়িটি। এরপর ঘোষণা করে দেয়া হলো, আগামীকাল থেকে পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে নিজেদেরকে।

বায়হাকী, ইবনে শিহাব এবং ইবনে উকবা হজরত ওরওয়া বিন যোবায়েরের বর্ণনানুযায়ী লিখেছেন, যখন মুশরিক বাহিনী হুজাফা নামক স্থানে বিশ্রামরত, তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো জুহাইম বিন ছালাত বিন মাখরামা। সে ছিলো বনী মতলব বিন মানাত গোত্রের। অনেক পরে হুনায়েনের যুদ্ধের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন তিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমরা কি ওই ঘোড় সওয়ারকে দেখতে পাচ্ছো? সাথীরা বলে উঠলো, কি বলছো তুমি? তন্দ্রাভঙ্গ হলো জুহাইমের। বললো, এই মাত্র আমি দেখলাম, এখানে এসে দাঁড়ালো এক ঘোড় সওয়ার। সে বললো, আবু জেহেল, উত্‌বা বিন রবীয়া, শায়বা, জামআ, আবুল বুখতারী এবং উমাইয়া বিন খলফ মারা গিয়েছে। এরপর দেখলাম তারা নিজেদের উটের বক্ষদেশে তলোয়ারের আঘাত করলো। রক্তাক্ত উটগুলো ছড়িয়ে পড়লো সৈন্যদের সকল

তাঁবুতে। ফলে সকল তাঁবু হয়ে গেলো রক্তাক্ত। এ কথা শুনে জুহাইমের সাথীরা বললো, তুমি শয়তানের চালবাজিতে পড়ে গিয়েছো। কথাটা সেনাপতি আবু জেহেলকেও জানানো হলো। আবু জেহেল বললো, জুহাইম বনী হাশেমের কাল্পনিক স্বপ্নের ফাঁদে পড়েছে।

অপর দিকে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে নামাজ ও ইমামতের দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. বেরিয়ে পড়লেন মদীনা থেকে। মাকামে রুহায় পৌঁছে তিনি স. হজরত আবু লুবাবাকে মদীনায় ফিরে গিয়ে মসজিদের নামাজের দায়িত্ব নিতে বললেন। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মদীনা থেকে যাত্রা করেছিলেন ১২ই রমজান। ইবনে হিশাম বলেছেন, ৮ই রমজান।

মদীনা থেকে এক মাইল পথ অতিক্রম করার পর থামলেন রসুল স.। রসুল স. আবু উত্বাকে বললেন, সকলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাও। সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। রসুল স. অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েক জনকে আলাদা করে নিয়ে বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে যাও। ওই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ, হজরত রাফে ইবনে খাদিজ, হজরত বারা ইবনে আজীব, হজরত উসাইদ ইবনে হুদাইর, হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত এবং হজরত উমায়ের ইবনে আবী ওয়াক্কাস।

বাদ পড়ে যাওয়ায় কাঁদতে শুরু করলেন হজরত উমায়ের। রসুল স. তখন তাঁকে যুদ্ধযাত্রার অনুমতি দিলেন। তাঁর বয়স তখন হয়েছিলো ষোলো। বদর যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন তিনি।

মুসলিম বাহিনী চলতে শুরু করলো। পথে পড়লো একটি কূপ। একটি বসতি ছিলো কূপকে কেন্দ্র করে। রসুল স. বললেন, যাত্রা স্থগিত করো। এখানেই নামাজ পড়বো আমরা। আর পান করবো এখানকার এই কূপের পানি। থামলেন সকলে। নামাজ, পানাহার ও বিশ্রামের পর যাত্রা শুরুর পূর্বে রসুল স. হজরত কায়েস বিন আবী সা'সাকে বললেন, সৈন্যদের সংখ্যা গণনা করো। নির্দেশানুসারে সৈন্যদেরকে কূপের পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গণনা করে দেখা গেলো মোট সৈন্য সংখ্যা তিনশত তেরো। রসুল স.কে এ কথা জানানো হলো। তিনি স. অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্যসংখ্যাও ছিলো তিনশত তেরো।

এরপর তিনি স. দোয়া করলেন মদীনার জন্য। নিবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার খলিল হজরত ইব্রাহিম দোয়া করেছিলেন মক্কাবাসীদের জন্য। আর আমি দোয়া করছি মদীনাবাসীদের জন্য। তুমি তাদের ওজন ও পরিমাপের মধ্যে বরকত দাও। বরকত দাও তাদের ফল ও ফসলে। হে আমার প্রভু

প্রতিপালক! তুমি আমাকে দান করো মদীনার ভালোবাসা। মদীনা থেকে তুমি দূর করে দাও সকল অশান্তি ও বিপদাপদ। দূর করে দাও বক্রতা। তোমার খলিল যেভাবে মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, সেভাবেই আমি হারাম ঘোষণা করছি দুই প্রান্তের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী মদীনার এলাকাকে।

হাবিব বিন আসাফ তখনো মুসলমান হননি। কেবল গণিমত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন গোত্র খাজরাজের কিছু লোক নিয়ে রসুল স. এর সঙ্গে চলেছিলেন তিনি। রসুল স. ঘোষণা করলেন, আমাদের সঙ্গে কেবল যেতে পারবে তারাই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কোনো অমুসলমান আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন হাবিব।

ওই লোকালয় থেকে রবিবার রাতে রওয়ানা হলেন রসুল পাক স.। যাত্রারম্ভে দোয়া করলেন, হে আমাদের আল্লাহ্! তোমার পথে গমনকারী প্রাণগুলোকে দান করো বাহন, তোমার রাস্তায় বের হওয়া অনাবৃত শরীরগুলোকে দান করো পোশাক। ক্ষুধার্তদেরকে দান করো আহার। গৃহহীনদেরকে দান করো গৃহচ্ছায়া। তুমি মেহেরবাণী করে সচ্ছল জীবন দান করো এদেরকে।

কাফেলা এগিয়ে চললো। মাত্র সত্তরটি উট ছিলো তাঁদের। সেগুলোতেই পালাক্রমে আরোহন করে রসুল স. এর নির্দেশে এগিয়ে চললো মুজাহিদ সাহাবীগণের কাফেলা।

ইবনে সা'দ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, বদর যাত্রার সময় আমরা তিনজনে পালাক্রমে সওয়ার হতাম একটি উটে। একজন করে সওয়ার হতেন। অন্যেরা চলতেন হেঁটে। রসুল স. এর সওয়ারী সঙ্গী ছিলেন প্রথমে হজরত আলী এবং হজরত আবু লুবাবা। পরে হজরত আলী ও আমি। আমরা দু'জনে তখন বলেছিলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সওয়ারী হয়ে চলতে থাকুন। আমরা হেঁটে যেতে পারবো। তিনি স. বললেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশী হাঁটতে পারবে না। আর তোমাদের চেয়ে সওয়াবের আশাও কম করিনা আমি।

বেদায়া এবং উয়ুন রচয়িতা লিখেছেন, হজরত আবু লুবাবার উটে পা রাখার ঘটনাটি ঘটেছিলো ওই সময় যখন রূহা থেকে তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়েছিলো মদীনায়। রূহা থেকে রওয়ানা হবার পর রসুল স. এর বাহনের অপর দুই আরোহী ছিলেন হজরত আলী এবং হজরত জায়েদ। সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ঘোড়া ছিলো মাত্র দুটি। একটি ছিলো হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের এবং অপরটি ছিলো হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের। ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, ঘোড়া ছিলো তিনটি। আরেকটি ঘোড়া ছিলো হজরত মারছাদ ইবনে আবী মারছাদের।

তুরবান নামক স্থানে পৌঁছে রসুল স. হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে বললেন, দ্যাখো কোনো হরিণ শিকার করতে পারো কি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তীর বিদ্ধ একটি হরিণ এনে হাজির করলেন রসুল স. এর সামনে। রসুল স. বললেন, এটিকে জবাই করে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে গোশত বণ্টন করে দাও। তাই করা হলো। পুনরায় রওয়ানা হলো কাফেলা। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার পথ বাঁয়ে রেখে দিয়ে যাত্রা শুরু হলো বদরের দিকে। জুহফান উপত্যকা অতিক্রম করে মুজায়েকুস্ সুফরা পিছনে ফেলে সাফরান নামক স্থানে পৌঁছলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. সেখান থেকে হজরত লুবাইস বিন ওমর জিহ্নী এবং হজরত আদী বিন জাগবাকে পাঠালেন মুশরিক বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য। সেখানে তিনি সংবাদ পেলেন — আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনী রক্ষা করার জন্য মক্কা থেকে বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা রওনা হয়েছে। তখন সকলকে নিয়ে পরামর্শ বিনিময় করলেন রসুল স.। সর্ব প্রথম বক্তব্য পেশ করলেন হজরত আবু বকর। এরপর হজরত ওমর। তারপর হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে যে নির্দেশ করেছেন, সেই নির্দেশানুযায়ীই আপনি অগ্রসর হোন। আল্লাহ্র শপথ! হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো আমরা এ কথা কখনো বলবো না যে, আপনি এবং আপনার আল্লাহ্ শত্রুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে রইলাম। আমরা আপনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমরা আপনার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি আপনাকে সত্যের প্রতিভূ হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! আপনি যদি আমাদেরকে আগুনে কিংবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন তবুও নির্দ্বিধায় আমরা আপনার নির্দেশ পালন করবো। এ কথা শুনে প্রফুল্ল হলেন রসুলুল্লাহ্ স.। তাঁর পবিত্র মুখাবয়বে ফুটে উঠলো সেই প্রফুল্লতার উদ্ভাস।

আনসার সাহাবীগণ ভাবলেন, এবার তবে আমাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করা উচিত। এ কথা ভেবে দণ্ডায়মান হলেন হজরত সা'দ বিন মুয়াজ। বললেন, আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে জেনেছি। আর এ বিষয়েও আমরা আপনার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, মদীনায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে আপনাকে রক্ষা করবো। কিন্তু আজ আমরা ঘোষণা করছি, যে কোনো স্থানে যে কোনো অবস্থায় আপনার যে কোনো নির্দেশ আমাদের জন্য শিরোধার্য। আমাদেরকে একত্র করা অথবা পৃথক করা — সকল কিছুই আপনার অধিকারভূত। আমাদের জীবন ও সম্পদ আপনার। জীবন ও সম্পদাপেক্ষা আপনিই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। আল্লাহ্র কসম! আমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করার অধিকারও আপনার রয়েছে।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে যদি আপনি আমাদেরকে ঝাঁপ দিতে বলেন, তবে অবনত মস্তকে নিঃশঙ্কচিত্তে সে নির্দেশও পালন করবো আমরা। এই নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো একজনকেও আপনি পশ্চাদবর্তী পাবেন না। হজরত মুসার সম্প্রদায়ের মতো আমরা নই। দ্বিধা-সংশয়, আড়ষ্টতা, কাপুরুষতা — সকল কিছু পরিত্যাগ করে কেবল আপনার আনুগত্যকেই আমরা করে নিয়েছি জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আপনার সম্মুখের, পশ্চাতের, দক্ষিণের ও বামের সার্বক্ষণিক সতর্ক সঙ্গী। আমরা চাই আমাদের অকতোভয় যুদ্ধযাত্রা আপনার পবিত্র আঁখি যুগলকে শীতল করুক। হজরত সা'দের ভাষণ শুনে রসুল স. অত্যন্ত প্রীত হলেন। বললেন, তবে চলো আল্লাহ্‌র নামকে সম্বল করে আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই। আল্লাহ্‌পাক তোমাদের প্রতি প্রসন্ন। আল্লাহ্‌র কসম! এবারের যুদ্ধে অবশ্যই নিহত হবে অংশীবাদীদের শ্রেষ্ঠ নেতারা।

'ওয়া ইন্না ফারিক্বাম মিনাল মু'মিনিনা লাকারিহুন' — কথাটির অর্থ, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'ওয়াও' (অথচ, এবং) হচ্ছে অবস্থা প্রকাশক ওয়াও। অর্থাৎ শব্দটির মাধ্যমে আগের বাক্যের 'গৃহ থেকে বের করেছিলেন' — কথাটির অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম — হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌পাক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার গৃহ থেকে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি।

আমি বলি, 'ওয়াও' শব্দটি এখানে অবস্থা প্রকাশক নয়। বরং শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ইস্তিনাফ (অবতারণা) হিসেবে । স্থান, পাত্র এবং কাল এক না হলে অবস্থা প্রকাশক 'ওয়াও' (ওয়াও হালিয়া) ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এখানে স্থান, কাল ও পাত্র এক নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলকে পূর্ণ রণপ্রস্তুতি ব্যতিরেকেই মদীনা থেকে বের করে এনেছিলেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বিশ্বাসীদের একটি দল প্রদান করেছিলেন ভিন্ন মত। তাঁরা মনে করেছিলেন মদীনা থেকে বের হয়ে গেলে মদীনা হয়ে পড়বে অরক্ষিত। আর সেই সুযোগে বনী নাজির সম্প্রদায় মুসলমানদের পরিবার পরিজনদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। তাঁরা চেয়েছিলেন কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনী লুণ্ঠন করা হোক। অল্প কয়েকজন মিলে প্রায় বিনা যুদ্ধে বাণিজ্যবাহিনীর বিপুল সম্পদ হস্তগত করা সম্ভব। কিন্তু মদীনা থেকে বের হয়ে কুরায়েশদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করা অত্যন্ত কঠিন। বিপুল জান-মাল ক্ষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এতে। সেই সঙ্গে রয়েছে রসুল স. এর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা। তাই তাঁরা মুসলমান বাহিনীর মদীনা পরিত্যাগকে পছন্দ করতে পারছিলেন না।

ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারী বলেছেন, রসুল স. এর সঙ্গে আমরা দুই তিন দিন পথ চললাম। তারপর এক স্থানে থেমে রসুল স. আমাদেরকে বললেন, কুরায়েশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? সম্মুখযাত্রা না প্রত্যাবর্তন? আমি বললাম, অনর্থক আত্মদান সমীচীন নয়। তাই আমাদের আক্রমণকে বাণিজ্য বহর লুণ্ঠন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখাই উত্তম। যুদ্ধযাত্রার পক্ষে ছিলেন বিশ্বাসীদের আরেকটি দল। কারণ ইতোমধ্যে হজরত জিব্‌রাইলের মাধ্যমে রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে প্রত্যাদেশ এসে পৌঁছেছিলো যে — হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্‌ তোমাদের শত্রুদের দু'টি দলের মধ্যে যে কোনো একটি দলের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত এই অঙ্গীকারকে ভিত্তি করে সাহাবীগণের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো পরস্পরবিরোধী দু'টি অভিমত। একদল চাইছিলেন, মদীনা অরক্ষিত রেখে বিপুল ঝুঁকি নিয়ে সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা বাণিজ্য বাহিনীর প্রচুর সম্পদ অধিকার করাই উত্তম। আরেক দল চাইছিলেন, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে প্রভূত বিজয়। এ নিয়েই শুরু হয়েছিলো বিশ্বাসীদের দুই দলের বিতণ্ডা।

এর পরের আয়াতে (৬) —বলা হয়েছে, 'সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিলো তারা যেনো মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে।' এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! দেখুন, আমার পক্ষ থেকে বিজয়ের অঙ্গীকার প্রদান করা সত্ত্বেও বিশ্বাসীদের একটি দল পূর্ণরূপে নির্ভয় হতে পারছে না। কুরায়েশদের বিশাল সমর প্রস্তুতি এবং নিজেদের অল্প সমরায়োজনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তাদের। তাই তাদের মনে হচ্ছে, সশস্ত্র কুরায়েশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আর মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা। তাই তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে তাদেরকে যেনো চালনা করা হচ্ছে মৃত্যুর দিকে। আর তাদের চোখে যেনো কেবল মৃত্যুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'মনে হচ্ছিলো তারা যেনো মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেনো তা প্রত্যক্ষ করছে' — কথাটি বলা হয়েছে মুশরিকদের সম্পর্কে। অর্থাৎ তখন মুশরিকদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো এ রকম, মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে তারা যেনো এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকেই। আর এই যুদ্ধযাত্রায় মৃত্যুই যেনো সতত প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে তাদের।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

❒ স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের এক দল তোমাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ তোমরা চাহিতেছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদিগের আয়ত্তাধীন হউক আর আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যে তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে নির্মূল করেন;

❒ ইহা এইজন্য যে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন যদিও অপরাধিগণ ইহা পছন্দ করে না।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টির প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায় এই যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং নির্মূল করবেন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কিন্তু, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা চাও সহজ ও ঝুঁকিহীন বিজয়। তোমরা চাও বাণিজ্য বাহিনীটির সমস্ত সম্পদ অধিকার করে পার্থিবভাবে লাভবান হতে।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাণিজ্যবাহিনী অথবা যুদ্ধবাহিনী — যে কোনো একটি দলের উপরে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে বিজয় দান করবেন। বাণিজ্যবাহিনী অধিকার করাই ছিলো বিশ্বাসীদের অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্যেই তাঁরা সকলে রসুল স. এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেলো, কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনীটি ততোক্ষণে চলে গিয়েছে আওতার বাইরে। তখন রসুল স. চাইলেন, বাণিজ্য বাহিনীকে রক্ষা করতে আসা কুরায়েশদের সশস্ত্র বাহিনীটির মোকাবেলা করতে। কিন্তু পূর্ণ ও পর্যাপ্ত মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি না থাকার কারণে মুসলমানেরা এমতো প্রস্তাবের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছিলেন না। তাঁদের এই আড়ষ্টতার বিবরণ দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। আর শেষে ব্যক্ত করা হয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়। বলা হয়েছে, আর আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে — 'এটা এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্পাক চান সত্য তার স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। শুরু হোক জেহাদ। সে পবিত্র জেহাদে আল্লাহ্পাকের ফেরেশতারাও অংশগ্রহণ করবে। বিজয় হয়ে উঠবে অনিবার্য। কেউ কেউ বলেছেন, আগের আয়াতে উল্লেখিত 'তাঁর বাণী দ্বারা' (বিকালিমাতিহি) কথাটির অর্থ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। সেই প্রতিশ্রুতিটির মূল মর্ম এই — আল্লাহ্তায়ালা অচিরেই সত্যের নিশানবাহী বিশ্বাসীদেরকে আরব ভূমিতে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। নিশ্চিহ্ন করে দিবেন অবিশ্বাস ও অবিশ্বাসীদেরকে। এভাবে বিশ্বাসীদেরকে তিনি দান করবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সামগ্রিক কল্যাণ। আর এভাবেই আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে সত্যরূপে এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিভাসিত করে থাকেন — যদিও এ রকম করা সীমালংঘনকারীদের মনঃপুত নয়।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে — তিনি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে নির্মূল করেন। মুসলমানদের আড়ষ্টতা ও অস্থিরতা দূর করার মানসেই এ রকম বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে — তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন। কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রসুল স. ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ।

'ওয়ালাও কারিহাল মুজরিমুন (যদিও অপরাধীগণ এ রকম পছন্দ করে না)। এখানে মুজরিমুন বা অপরাধীগণ অর্থ — মক্কার মুশরিকেরা। অর্থাৎ বিশাল রণপ্রস্তুতি সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা মুশরিক বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর মাধ্যমে পরাভূত করবেনই — যদিও এই পরাভব তাদের মনপুতঃ নয়।

বদর যুদ্ধের পুনরালোচনা

হান্নান নামক টিলা অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী আরো অগ্রসর হলো। শিবির স্থাপন করলো বদর প্রান্তরের সন্নিকটে । রসুল স. মুশরিক বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ জানার জন্য হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে একটি উটে আরোহণ করে একদিকে বেরিয়ে পড়লেন। পথ চলতে চলতে এক স্থানে সাক্ষাত পেলেন এক বৃদ্ধের। আত্মপরিচয় গোপন রেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, মোহাম্মদের বাহিনী এবং কুরায়েশ বাহিনী কোথায়? বৃদ্ধ বললো, আমি সংবাদ পেয়েছি, মোহাম্মদের বাহিনী অমুক দিন রওনা হয়েছে। যদি সংবাদটি সত্য হয়, তবে তাঁর বাহিনী এখন অমুক স্থানে অবস্থান করছে। আর কুরায়েশরা অবস্থান করছে অমুক স্থানে। রসুল স. দেখলেন, বৃদ্ধের অনুমান যথার্থ। বৃদ্ধটি বললো, তোমরা কোত্থেকে আসছো? রসুল স. বললেন, 'ইন্না মিনাল মায়ি' (আমরা পানি

থেকে)। কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। একটি অর্থ — আমাদের উৎপত্তি হয়েছে তরল শুক্রানু থেকে। আরেকটি অর্থ — আমাদের আগমন ঘটেছে পানি বহুল বা নদী-নালা পরিবেষ্টিত দেশ থেকে। আত্ম পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যেই রসুল স. এ রকম জবাব দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধটি বুঝে নিয়েছিলো, সম্ভবতঃ তারা প্রসিদ্ধ বনী মাইস্ সামায়ী গোত্রের লোক।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, শত্রুদলের গতিবিধির সংবাদ নিয়ে রসুল স. ও হজরত আবু বকর সেনা শিবিরে ফিরে এলেন। ততক্ষণে মরু চরাচরে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। বদর প্রান্তরের সন্নিকটে ছিলো একটি কূপ। দুশমনদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য সেই কূপের দিকে এবার তিনি স. প্রেরণ করলেন হজরত আলী, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে। এই ত্রয়ী সাহাবী সেখানে গিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক সেখানে মদ্যপানে রত। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বনী হাজ্জাজের গোলাম আসলাম ও অপর জন বনী আস বিন সাঈদের গোলাম আবু ইয়াসির। তাঁরা এই দু'জনকে ধরে নিয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। রসুল স. তখন নামাজে মশগুল ছিলেন। সাহাবীগণ ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পরিচয় ব্যক্ত করো। তারা বললো, আমরা কুরায়েশদের পানি সরবরাহকারী । আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিলো পানির অনুসন্ধান করতে। সাহাবীগণের মনে হলো লোক দু'টো মিথ্যে কথা বলছে। তাঁরা মনে করলেন, লোক দু'টো নিশ্চয়ই আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাণিজ্য বাহিনীর লোক। আর বাণিজ্য বাহিনীটি নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও অবস্থান করছে। এ কথা ভেবে তাঁরা লোক দু'টোকে প্রহার করলেন। অধিক প্রহারের ভয়ে তারা বললো, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। ইত্যবসরে রসুল স.এর নামাজ শেষ হলো। তিনি স. এসে বললেন, লোক দু'টো প্রথমে সত্য কথাই বলেছে। তোমাদের প্রহারের ভয়ে এখন বলছে মিথ্যে কথা। তিনি স. স্বয়ং প্রশ্ন করলেন, বলো কুরায়েশদের সেনাবাহিনী এখন কোথায়? লোক দু'টো বললো, সামনের ওই বালিয়াড়িটির পিছনে। রসুল স. বললেন, কতজন এসেছে তারা? লোক দু'টো বললো, অনেক। কিন্তু ঠিক কতজন তা আমরা বলতে পারবো না। রসুল স. বললেন, তাদের আহারের জন্য প্রতিদিন কয়টি উট জবেহ করা হয়। তারা বললো, একদিন জবেহ করা হয়েছিলো দশটি। আরেকদিন নয়টি। এ কথা শুনে রসুল স. অনুমান করতে পারলেন যে, মুশরিকদের সেনা সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজারের মধ্যেই হবে। তিনি স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়েশ নেতাদের মধ্যে কে কে যুদ্ধে এসেছে? তারা বললো, উত্‌বা, শায়বা, আবুল বুখতারী বিন হিশাম, হাকিম বিন হাজ্জাম, নওফেল বিন খুয়াইলিদ, হারিস বিন আমর, তাইমিয়া বিন আদি, নজর বিন হারেস, রবীয়াতুল আসওয়াদ, আবু

জেহেল বিন হিশাম এবং উমাইয়া বিন খলফ্। আরো এসেছে হাজ্জাজের দুই পুত্র নুবাইয়াহ্ ও লুসবাহ্, সহল বিন আমর ও আমর বিন আবদুদ। রসুল স. বললেন, তবে তো মক্কা তার হৃদয়কে এবার মক্কার বাইরে নিক্ষেপ করেছে।

ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, দশদিন পথ চলার পর আমরা উপস্থিত হলাম জুহফায় । সেখান থেকে শত্রুদলের গতি বিধির সংবাদ সংগ্রহের জন্য বের হয়ে গেলেন হজরত লবিস বিন আমর এবং হজরত আদি বিন আবিল জগাবা। তাঁরা এক স্থানে গিয়ে দেখলেন, একটি কূপ থেকে দু'জন লোক পানি উঠিয়ে তাদের মশক পূর্ণ করছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর মাজ্দি বিন ওমর জুহনীও উপস্থিত রয়েছে সেখানে। সেখানে এক ক্রীতদাসী আর এক ক্রীতদাসীর হাত ধরে টানছিলো এবং বলছিলো, বলো আমার ঋণ পরিশোধ করবে কবে? ক্রীতদাসীটি বললো, কুরায়েশদের কাফেলা কাল অথবা পরশুর মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছবে। তখন আমি তাদের কাজ করে দিয়ে কিছু উপার্জন করতে পারবো এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করতেও সক্ষম হবো। এ কথা শুনে মাজদী বলে উঠলো, ওকে ছেড়ে দাও। সে ঠিক কথাই বলেছে। হজরত লবিস এবং হজরত আদি তাদের কথাবার্তা শুনে নীরবে তাঁদের উটে চড়ে ফিরে এলেন আপন শিবিরে। সব কথা খুলে বললেন রসুল স.কে।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ লিখেছেন, বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কায় যাতায়াত করতে হয় মদীনার পাশ দিয়ে। আবু সুফিয়ান তাই ভয়ে ভয়ে পথ অতিক্রম করছিলো। এক স্থানে থেমে সে পানি সংগ্রহ করতে পাঠালো জমসম বিন ওমরকে। সেও ফিরতে দেরী করলো। ওদিকে পানি আনতে গিয়ে কূপের পাড়ে মাজদি বিন ওমরের সাথে দেখা হলো জমসমের। জমসম তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কি? মাজদি বললো, দু'জন উষ্ট্রারোহী এসেছিলো। তারা ওই টিলাটির নিকটে তাদের উট বেঁধে রেখে এই কূপ থেকেই তাদের মশক পূর্ণ করেছে। জমসম ফিরে এসে আবু সুফিয়ানকে এ কথা জানালো। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলো সেই টিলাটির কাছে, যেখানে পানি নিতে আসা আগন্তুকদ্বয় বেঁধে রেখেছিলো তাদের উট। সেখানে পড়েছিলো উটের কিছু জমাট বিষ্ঠা। ওই বিষ্ঠা হাতে নিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করতেই বেরিয়ে এলো খেজুরের আঁটি। ওই আঁটির আকার দেখেই আবু সুফিয়ান বুঝে নিলো, আগন্তুকদ্বয় ছিলো মদীনাবাসী। এ কথাও বুঝতে পারলো যে, মদীনা থেকে মোহাম্মদের বাহিনী কাছাকাছি কোথাও এসে উপস্থিত হয়েছে। আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ তার বাহিনীকে বদর প্রান্তরের বাঁ পাশ দিয়ে পরিচালিত করলো সমুদ্র সৈকতের পথে। নির্দেশ দিলো, এবার পথ পরিক্রমণ করতে হবে অতি দ্রুত এবং বিরতিহীনভাবে। এভাবে বাণিজ্য

কাফেলাটি চলে গেলো মুসলিম বাহিনীর আওতার বাইরে। মক্কার সন্নিকটে পৌঁছে আবু সুফিয়ান কায়েস বিন ইমরানের মাধ্যমে কুরায়েশদের সেনা বাহিনীর নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলো যে, আমাদের বাণিজ্য কাফেলা এখন নিরাপদ। অতএব, তোমরা এখন ফিরে এসো। কুরায়েশদের সেনাদল তখন জুহফায়। আবু সুফিয়ান কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ শুনে আবু জেহেল বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র কসম! বদর মেলায় অংশ গ্রহণ না করে আমরা ফিরবো না। তিনদিন অবস্থান করবো সেখানে। উট জবাই করবো। বসাবো ভোজসভা। শরাব পান করবো। অনুষ্ঠিত হবে নাচ-গানের মহফিল। এ রকম করলে আমাদের পরাক্রম ও শক্তিমত্তার সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে সবখানে। ভীত হবে মুসলমানেরা। উল্লেখ্য যে, তখন মেলার সময়ও হয়ে পড়েছিলো অত্যাসন্ন।

কুরায়েশ নেতারা প্রথম থেকেই যুদ্ধ যাত্রার ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে আসছিলো। হারেস বিন আমের, উমাইয়া বিন খালফ, রবীয়ার দুই পুত্র — উত্‌বা এবং শায়বা, হাকেম বিন হাজ্জাম, আবুল বুখতারী, আলী বিন উমাইয়া বিন খলফ্ ও আবুল আ'স প্রমুখ কুরায়েশ নেতাদের মনোভাবও ছিলো যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাই আবু জেহেল তাদেরকে কাপুরুষ বলে উত্তেজিত করেছিলো। বলেছিলো প্রতিশোধ গ্রহণার্থে সংকল্পবদ্ধ হও। আবু জেহেলের উস্কানি ও চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত উল্লেখিত নেতারাও যুদ্ধে গমন করেছিলো। আবু সুফিয়ানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতে পেরে তারা মনে করতে লাগলো, এবার ফিরে যাওয়াই উত্তম।

আখনাস বিন শরিফ ছিলেন বনী জুহরার মিত্র। আবু সুফিয়ানের বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানতে পেরে আখনাস বনী জুহ্‌রার লোকদেরকে বললো, তোমরা তো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর অর্ন্তভুক্ত মাখরামা বিন নওফেলের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য এসেছিলে। এখন শুনলে তো, বাণিজ্য বাহিনী নিরাপদে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ্ দয়া করে তোমাদের লোকের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এবার মক্কায় ফিরে যাও। বনী জুহরার সংখ্যা ছিলো এক শত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে তিন শত। আখনাসের কথা শুনে বনী জুহরার সকল লোক ফিরে গেলো মক্কায়। রয়ে গেলো কেবল দু'জন — মুসলিম বিন শিহাব এবং তার এক চাচা। তারা দু'জনেই কাফের অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো।

হজরত ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, সংবাদ প্রদান শেষে সংবাদ বাহক ফিরে গেলো মক্কায়। আবু সুফিয়ানকে বললো, আমাদের কাফেলার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জেনেও আমাদের লোকেরা যুদ্ধ করতে চায়। আবু সুফিয়ান বললো, আহা আমার গোত্র! তোমরা এখন ওমর বিন হিশামের (আবু জেহেলের) ফাঁদে বন্দী।

বনী হাশেমও ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু আবু জেহেল তাদের জন্য সৃষ্টি করলো এক কৃত্রিম সমস্যা। বললো, এদেরকে হাত ছাড়া করা ঠিক নয়। এদেরকে রাখতে হবে মরুদ্যানের কোনো উপত্যকায়। প্রয়োজনে কুরায়েশ যুবকেরা তাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখবে।

বদরের পানির কূপটি অধিকার করে বসলো মুশরিক বাহিনী। মুসলমানেরা পড়ে গেলেন বিপাকে। পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। চারিদিকে কেবল ধু ধু বালুকারাশি। পানির অভাবে পানাহার, ওজু, গোসল — সব কিছু বন্ধ হয়ে গেলো তাঁদের। সুযোগ বুঝে শয়তান তাদেরকে এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিলো যে — তোমরা না বিশ্বাসী! তোমরা না আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র! তোমাদের রসুলও তো রয়েছেন তোমাদের সঙ্গে। অথচ দেখো যাদেরকে তোমরা মন্দ বলো, সেই মুশরিকেরাই পেয়েছে পানির অধিকার। তাহলে ভেবে দ্যাখো, আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র কারা? তোমরা, না তারা?

আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসীদেরকে শয়তানের এই কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করলেন। ওই রাতেই শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। আর বৃষ্টির ফলে মুসলমানদের অবস্থান হয়ে উঠলো অধিকতর স্বচ্ছন্দ। নিম্নভূমিতে জমে রইলো প্রচুর পানি। মুসলমানেরা সেই পানি দিয়ে নিজেদের এবং পশুপালের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। কিন্তু এই প্রবল বারিপাত মুশরিকদের অবস্থানকে করে তুললো বিপর্যস্ত। তাদের চারিপাশ হয়ে উঠলো কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। ওই রাতে ঘটলো আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। আল্লাহ্পাক তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এক অপার্থিব তন্দ্রা। ফলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তাঁরা। ওই তন্দ্রা ছিলো আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহমতের এক অলৌকিক বর্ষণ। সারা রাত ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতে সিক্ত ও শীতল হয়ে উঠেছিলো বাইরের মৃত্তিকা। আর সাহাবীগণের হৃদয় ও চেতনা পূর্ণরূপে সিক্ত ও প্রশান্ত হয়ে উঠেছিলো আল্লাহ্পাকের অপার রহমতের অলৌকিক বর্ষণে। নিদ্রারূপী সেই রহমতের সমুদ্রে তাই সারারাত নিমগ্ন ছিলেন তাঁরা।

আবু ইয়া'লী ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় মেকদাদ ছাড়া অন্য কারো কোনো বাহন ছিলো না। আর সেই বর্ষণ সিক্ত রাতে কেবল রসুল স. ছাড়া এমন কেউই ছিলো না, যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। রসুল স. সেই রাতে বৃক্ষের নিচে স্থাপিত তাঁর তাঁবুর মধ্যে সারারাত ধরে নামাজ পড়ে কাটিয়েছিলেন। আর ওই রাত ছিলো জুমআর রাত। তখন আমাদের ও মুশরিক বাহিনীর মধ্যে ছিলো কেবল একটি ছোট্ট পাহাড়ের অন্তরাল।

রসুলে পাক স. শত্রুদলের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরকে। তাঁরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এসে জানালেন, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে শত্রুদের অবস্থা হয়ে পড়েছে নাজুক। তাদের বিচরণ হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। তাই তারা এখন অপ্রস্তুত। এখন আমরা অগ্রসর হলে সহজেই অধিকার করতে পারবো পানির কূপগুলো।

বড় ছোট সকল কূপ ও নির্ঝরিণীই ছিলো পাহাড়ের ওপাশে। তাই পানির প্রস্রবণগুলো দখল করা হয়ে পড়েছিলো অত্যাবশ্যক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণার্থে হজরত হাব্বাব বিন মুনজির বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্! আমাদের বর্তমান অবস্থান কি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশানুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে? না এ আপনার সমরকৌশল? রসুল স. বললেন, না। এ আমারই যুদ্ধ-কৌশল। হজরত হাব্বাব বললেন, তাহলে বলি, এখনই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পানির অবস্থানগুলো দখল করে নেয়া উচিত। আরো উচিত একটি বৃহৎ জলাধার নির্মাণ করা — যে জলাধারটি সংযুক্ত থাকবে পানির উৎসগুলোর সঙ্গে। এ রকম করতে পারলে আমরা আর পানির অসুবিধায় পড়বো না। তখন অসুবিধায় পড়বে শত্রুরা। রসুল স. বললেন, এটা কি তোমার সুচিন্তিত অভিমত? হজরত হাব্বাব বললেন, হ্যাঁ।

ইবনে সা'দ লিখেছেন, তখন হজরত জিব্রাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাব্বাবের পরামর্শটি যথার্থ। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। বিপর্যস্ত ও অপ্রস্তুত কুরায়েশেরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই তিনি স. অধিকার করে বসলেন পানির উৎসগুলো। নির্মাণ করলেন একটি বৃহৎ জলাধার। নালা খনন করিয়ে সেগুলোকে যুক্ত করে দিলেন জলাধারটির সঙ্গে। সঙ্গীদের পানির প্রয়োজন নিশ্চিত করলেন তিনি এভাবে।

হজরত সা'দ বিন মুয়াজ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আপনার জন্য একটি কুটির নির্মাণ করেছি। আপনি দয়া করে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করুন। সেখানে আমরা গড়ে তুলেছি নিরাপত্তা বেষ্টনী। প্রস্তুত রেখেছি উট। আমরা সেখানে আপনাকে নিরাপদে রেখে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুদলের উপর। যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তো ভালোই। আর যদি অন্য কিছু ঘটে যায়, তবে আপনি ওই উটে চড়ে নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারবেন ওই সকল লোকের নিকট, যাদেরকে আমরা পশ্চাতে রেখে এসেছি। তাঁদের ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আপনাকে পেলে তারা অবশ্যই পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আপনার নিরাপত্তা জীবন দিয়ে হলেও নিশ্চিত করবে। রসুল স. হজরত সা'দকে সাধুবাদ জানালেন এবং সকলের জন্য দোয়া করলেন। এরপর রসুল স. উঠে পড়লেন উঁচু টিলায় নির্মিত তাঁর নিজস্ব কুটিরে। উঠে দেখলেন, এখান থেকে যুদ্ধপ্রান্তরের সকল অবস্থা নিরীক্ষণ করা যায়। তিনি স. তাঁর সঙ্গে রাখলেন কেবল হজরত আবু বকরকে। প্রবেশ দ্বারে পাহারারত রইলেন হজরত সা'দ বিন মুয়াজ। হস্তে ধারণ করলেন উন্মুক্ত অসি। রসুল স. সেখান থেকে যুদ্ধের ময়দানে গমন করলেন, বললেন, ওই দেখো ওই স্থানটি

অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান। আর অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে ওই স্থানটিতে। রসুল স. কর্তৃক প্রদর্শিত ওই স্থানগুলোতেই নিহত হয়ে পড়েছিলো কুরায়েশদের বিভিন্ন নেতা— যাদের নামও তিনি স. উল্লেখ করেছিলেন। আহমদ, মুসলিম প্রমুখ।

হজরত রাফে' বিন খাদিজ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধের সময় রসুল স. বলেছেন, যার অলৌকিক হাতে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! মুসলমান ঘরের কোনো সন্তান সারা জীবন ধরে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য করলেও তোমাদের এই এক রাতের (যুদ্ধ পূর্ববর্তী রাতের) মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ফেরেশতারাও মর্যাদার দিক দিয়ে ওই ফেরেশতাদের অপেক্ষা উত্তম, যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। এই বর্ণনাসূত্রভূত কেবল একজন বর্ণনাকারী সেকাহ্ (নির্ভরযোগ্য বা বলিষ্ঠ)। নাম তার জাফর বিন মুয়ালাস। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন কেবল জাফর নামে।

রসুল স. যুদ্ধপ্রান্তরে উপস্থিত হলেন ভোর বেলায়। অপর দিকে শত্রুরাও প্রস্তুত। মুসলমান বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তদুপরি তারা চায় ওমর হাজরামীর রক্তের বদলা নিতে। কিছুকাল পূর্বে সে নিহত হয়েছিলো মুসলমানদের হাতে। সুরা বাকারার 'ইয়াস্ আলুনাকা আনিস্ শাহ্রিল হারামি কিতালিন ফিহি'— আয়াতের তাফসীরে তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ্ স. টিলার উপর থেকেই লক্ষ্য করছিলেন শত্রুদের গতিবিধি। সর্বপ্রথম ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হলো জাময়া বিন আসওয়াছ। তার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলো তার পুত্রও। পিতা-পুত্র ঘোড়ায় চড়ে একটি চক্কর দিলো। উপযুক্ত অবস্থান খুঁজছিলো তারা। রসুল স. তাদেরকে দেখে বললেন, এরা কুরায়েশ। অহংকারী ও উদ্ধত। হে আমার আল্লাহ্! এরা আপনার রসুলকে অস্বীকার করেছে। আপনার রসুলের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে চায়। আপনি আমার সঙ্গে যে বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন, আজ প্রভাতে সেই বিজয় আমাদেরকে দান করুন। শত্রুদলকে ধ্বংস করে দিন। তিনি স. দেখলেন অদূরে একটি লাল উটের উপরে উপবিষ্ট রয়েছে উত্বা বিন রবীয়া। বললেন, যদি কুরায়েশেরা ওই লাল উটের আরোহীর পরামর্শ মেনে নিতো তবে লাভ করতো কল্যাণ। ওই আরোহীর নাম উত্বা। সে কুরায়েশদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলো। আবু জেহেল বলেছিলো, উত্বা কাপুরুষ। তাই যুদ্ধে যেতে ভয় পায়।

মুসলমানদের অবস্থান সুদৃঢ় হওয়ার পর রসুল স.এর নির্দেশে নির্মিত জলাধারে পানি পান করার জন্য অগ্রসর হলো কুরায়েশদের কয়েকজন। হাকিম বিন হাজ্জামও ছিলো তাদের মধ্যে। রসুল স. বললেন, ওদেরকে আসতে দাও।

যে আমাদের জলাধার থেকে পানি পান করবে আজ এই রণপ্রান্তরে তার মৃত্যু অনিবার্য। ব্যতিক্রম কেবল হাকিম বিন হাজ্জাম। বলা বাহুল্য, অনেকের সাথে রসুল স. এর জলাধারে পানি পান করা সত্ত্বেও হাকিম বিন হাজ্জাম সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন। পরে তিনি ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শপথ উচ্চারণ করতেন এভাবে— কসম ওই আল্লাহ্‌র, যিনি বদর যুদ্ধে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

কুরায়েশেরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার পর উমায়ের বিন ওয়াহাবকে মুসলমানদের সঠিক সেনাসংখ্যার খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠালেন। পরবর্তী সময়ে এই উমায়ের মুসলমান হয়েছিলেন। উমায়ের তার ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনীর চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে এসে বললো, মুসলমানদের সেনা সংখ্যা তিনশ'র মতো হবে। পেছনে তাদের কোনো সাহায্যকারী দলও নেই। তবে কিছু লোককে আমি দেখেছি সুদর্শন উটের উপরে আরোহণ করে রয়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে অস্ত্রসজ্জিত দেহরক্ষী। পানি পান করার সময়েও তারা কথা বলে খুব সাবধানে। তাদের চেহারা বজ্রকঠিন। চোখের দৃষ্টি সাপের মতো— ভয়ঙ্কর। তাদেরকে দেখে আমার মনে হলো তোমাদেরকে হত্যা করার আগে তারা কেউ-ই মৃত্যুবরণ করবে না। এখন তোমরা ভেবে দেখো কি করবে? কুরায়েশেরা এবার পাঠালো আবু সালমা জিসমিকে। সে তার ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর আশেপাশে চক্কর দিয়ে ফিরে এসে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের মধ্যে চর্ম-বর্ম পরিহিত কোনো সৈন্য দেখিনি। তাদের কোনো যুদ্ধাশ্ব নেই। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও নেই। কিন্তু তাদের চেহারায় রয়েছে অসীম সাহসিকতার ছাপ। তারা মুসলমান। মৃত্যুভয় বলে কোনো কিছু তাদের নেই। তাদের হাতের তলোয়ারই তাদের সবকিছু। আর আমি তাদের মধ্যে দেখেছি নীলচক্ষুবিশিষ্ট কিছু লোক। আর তাদের পদতলে বিছানো রয়েছে যেনো পাথরের পাটি। এবার তোমরা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

হাকিম বিন হাজ্জাম কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি উত্‌বা বিন রবীয়ার নিকটে গিয়ে বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! আপনি আমাদের নেতা। আপনি আজ এই ক্ষণে এমন কিছু কি করতে পারেন না, যার কারণে আপনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। উত্‌বা বললো, কী বলতে চাও তুমি? হাকিম বললেন, আপনি ওমর হাজরামীর রক্তপণ নিজে থেকে পরিশোধ করে দিয়ে কুরায়েশদেরকে নিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। আপনার এ রকম উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এক্ষুণি সমাপ্ত হয়ে যাবে স্বজন-হননের এই রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্‌বা বললো, তবে তুমি আবু জেহেলের কাছে যেয়ে বলো, আমি এ প্রস্তাবে সম্মত। ওমর হাজরামী ছিলো আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আমি তার রক্তপণ দিতে পিছপা হবো না। এরপর

উত্‌বা কুরায়েশ সেনাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! কী করতে চলেছো তোমরা। আল্লাহ্‌র শপথ! আজ যদি তোমরা বিজয়ীও হও, তবে সে বিজয় হবে সাময়িক। ভবিষ্যতে তোমরা পরাভূত হবেই। তখন তোমাদের স্বজনকে করা হবে হত্যা। তখন স্বজন হারানোর শোক সহ্য করবে কীভাবে? আর যদি তোমরা মোহাম্মদকে অন্য কোনো আরব গোত্রের মোকাবিলায় ছেড়ে দাও, তবু পরাভূত হবে তোমরা। তখন বিদ্রোহী গোত্রের হাত থেকে তোমাদের স্বজন মোহাম্মদকে রক্ষা করাও হয়ে পড়বে কঠিন। তখনও তোমরা হবে অপমানিত, লাঞ্ছিত। তাই হে কুরায়েশ জনতা! তোমাদের সকল লজ্জা আজ অর্পণ করো আমার স্কন্ধে। চারিদিকে ঘোষণা করে দাও, উত্‌বা স্বয়ং রণপ্রান্তরে হাজির। সে কখনো কাপুরুষ হতে পারে না।

হাকিম এবার উপস্থিত হলো আবু জেহেলের কাছে। দেখলো, আবু জেহেল উত্তমরূপে যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হচ্ছে। বললো, হে আবুল হাকাম! উত্‌বা আমাকে আপনার নিকট এ কথাগুলো জানাতে বলেছেন। সবকথা শুনে আবু জেহেল বললো, উত্‌বা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদেরকে কোমল দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আমি সেরকম নই। আল্লাহ্‌র কসম! আজ মোহাম্মদের সঙ্গে চূড়ান্ত মীমাংসা না করে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করবো না। উত্‌বার পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে তার পুত্রের নিরাপত্তা চায়। এরপর আবু জেহেল নিহত ওমর হাজরামীর আত্মীয়দের ডেকে বললো, তোমরা উত্‌বার প্রতি লক্ষ্য রেখো। সে আমাদের লোকদেরকে হতোদ্যম করে দিতে চায়। তোমরা সকলকে তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দাও। আর আজই বদলা নাও তোমাদের ভাইয়ের রক্তের। হে হাজরামী গোত্র! তোমরা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, কুরায়েশ ও হাজরামী গোত্রদ্বয় পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আবু জেহেলের কথা শুনে নিহত ওমর হাজরামীর ভাই আমের হাজরামী মাথা নিচু করে চিৎকার করে ফরিয়াদ জানাতে থাকলো, হায় ওমর! তোমার রক্তের বদলা কি আমরা নিতে পারবো না। তার চিৎকার শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। যুদ্ধের ব্যাপারে কারো মধ্যে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব রইলো না! পুত্র বাৎসল্যের কারণে উত্‌বা ছিলো যুদ্ধের প্রতি অনীহ। কিন্তু সে-ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফেলে প্রস্তুত হলো যুদ্ধের জন্য। সে ঘোষণা করলো, এক্ষুণি প্রমাণিত হবে কে দুর্বল এবং কে সবল। দাও আমার শিরস্ত্রাণ। পরপর কয়েকটি শিরস্ত্রাণ দেয়া হলো তাকে। কিন্তু কোনোটি তার মাথায় লাগলো না। কারণ তার মাথা ছিলো প্রকাণ্ড। কাজেই সে চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলো তার মাথা। আবু জেহেলও তার তরবারী কোষমুক্ত করলো এবং আঘাত করলো তার ঘোড়ার পশ্চাৎদেশে। এ দৃশ্য দেখে ইমা বিন রিহ্‌দা বলে উঠলো, এটাতো দেখছি বড়ই বেয়াড়া।

মোহাম্মদ বিন ওমর আসলামী বেলাদরী এবং 'ইমতেনা' রচয়িতার বর্ণনায় এসেছে, শিবির স্থাপনের পর রসুল স. হজরত ওমর বিন খাত্তাবকে কুরায়েশদের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পছন্দ করি না। কারণ আপনারা আমার স্বগোত্রীয় ও স্বজন। আপনাদের স্থলে অন্য কেউ হলে আমি এ রকম বলতাম না। এ কথা শুনে হাকিম বিন হাজ্জাম বললেন, মোহাম্মদের প্রস্তাবে রয়েছে সহমর্মিতা ও সহনশীলতা। সুতরাং তোমরা সংযত হও। আল্লাহ্‌র কসম! এ রকম ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপনের পরেও যদি তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে তা হবে চরম বাড়াবাড়ি। আর বাড়াবাড়ি যারা করে তারা কখনো জয়লাভ করতে পারে না। আবু জেহেল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো, অসম্ভব, আমরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে পারি না। কারণ আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে শক্তিমান করেছেন। আর তাদেরকে করেছেন দুর্বল।

ইবনে জারীহের বর্ণনা সূত্রে ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আবু জেহেল বলেছিলো, ওদেরকে বন্দী করে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে নিয়ো। হত্যা কোরো না। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা নূন এর এ আয়াত— ইন্না বালাওনাহুম কামা বালাওনা, আস্‌হাবুল জান্নাতি।

সেই ভোর বেলাতেই রসুল স. তাঁর সেনাদলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। একটি ছোট তীর হাতে নিয়ে তিনি স. সকলকে সোজা করে দিলেন। বললেন, এভাবেই সকলে সোজা হয়ে দাঁড়াও। একটুও অগ্রপশ্চাৎ হয়ো না। এরপর বললেন, যারা লৌহ বর্ম পরিহিত তারা সম্মুখে অগ্রসর হও। এরপর তিনি স. যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন হজরত মুসআব বিন উমায়েরের হাতে। তিনি অগ্রসর হয়ে নির্দেশিত স্থানে পতাকা স্থাপন করলেন। বদর প্রান্তরের দক্ষিণভাগে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো মুশরিক বাহিনী। আর মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ছিলো উত্তরে। রসুল স. পুনরায় সেনাবিন্যাস করতে গিয়ে দেখলেন হজরত সাওয়াদ কিছুটা অগ্রগামী হয়েছে। তিনি স. তাঁর হস্তধৃত তীরের খোঁচায় তাকে সোজা করে দিলেন। হজরত সাওয়াদ বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে বানিয়েছেন ন্যায় ও সত্যের প্রতিভূ। অথচ আপনি আমাকে আঘাত করলেন। আমি এর বদলা চাই। রসুল স. তৎক্ষণাৎ তাঁর উদরের বস্ত্র উন্মোচন করলেন এবং বললেন, বদলা নাও। উন্মোচিত উদরে চুম্বন করতে শুরু করলেন হজরত সাওয়াদ এবং তাঁর পবিত্র শরীর জড়িয়ে ধরে ধন্য হলেন। রসুল স. বললেন, এমন করলে কেনো? হজরত সাওয়াদ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার মনে হয় আজ আমি শাহাদাত লাভ করবো। মন চাইছিলো, তার পূর্বে আমি আপনাকে একবার আলিঙ্গন করি। রসুল স. এবার নির্দেশ জারী করলেন, শুনে নাও সবাই। শত্রুরা অগ্রসর হতে শুরু করলে তোমরাও তীর নিক্ষেপ শুরু করবে। আর তলোয়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু করবে তখন, যখন তারা এসে পড়বে তোমাদের একেবারে কাছাকাছি। আবী উসাইয়েদ থেকে বর্ণনাটি এনেছেন আবু দাউদ।

রসুল স. উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, মনে রেখো আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ অর্জনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে নির্দেশ আমি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে পেয়েছি, সেই নির্দেশই আমি দিয়েছি তোমাদেরকে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন দৃঢ়তার ও ধৈর্যের। যদি তোমরা সহিষ্ণু ও সুদৃঢ় হও, তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবেন।

ওদিকে মুশরিক বাহিনীও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মানুষের রূপ ধরে শয়তান স্বয়ং উপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে। সর্বপ্রথম এগিয়ে এলো নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধের দাবিদার আমের হাজরামী। তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন হজরত মুহাইজা বিন আয়াশ। তিনি ছিলেন হজরত ওমরের মুক্ত করা ক্রীতদাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুর শরবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন তিনি। আনসার সাহাবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ হলেন হজরত হারেসা বিন সুরাকা। তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন হাইয়ান বিন ইরকা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে।

এবার এগিয়ে এলো উত্বা, তার ভ্রাতা শায়বা এবং পুত্র ওলিদ। ওই তিনজনকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন তিনজন আনসার সাহাবী— হজরত আউফ, হজরত মুয়াজ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা। উত্বা বললো, তোমরা অনভিজাত। সরে যাও। সামনে আসতে বলো কুরায়েশদেরকে। রসুল স. নির্দেশ করলেন, তোমরা সরে এসো। সম্মুখে অগ্রসর হও উবায়দা, হামযা ও আলী। উত্বা বললো, হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ। উত্বার সামনে দাঁড়ালেন হজরত হামযা, ওলিদের সম্মুখে হজরত আলী এবং শায়বার সম্মুখে হজরত উবায়দা। হজরত হামযার তরবারীর অব্যর্থ আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো উত্বা। হজরত আলীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো ওলিদ। শায়বার সঙ্গে হজরত উবায়দার প্রচণ্ড সংঘর্ষ চললো কিছুক্ষণ ধরে। হজরত উবায়দা আহত হলেন। তখন হজরত হামযা ও হজরত আলী ঝাঁপিয়ে পড়লেন শায়বার উপর। তাঁদের যৌথ আক্রমণে শায়বা মৃত্যুমুখে পতিত হলো অল্পক্ষণের মধ্যে। তারপর তাঁরা দু'জনে আহত হজরত উবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন রসুল স. এর সামনে। উবায়দা রসুল স. এর পবিত্র পদযুগলে স্থাপন করলেন তাঁর গণ্ডদেশ। বললেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আমি কি শহীদ নই? রসুল স. বললেন, নিশ্চয়ই। হজরত উবায়দা শাহাদাত বরণ করেছিলেন যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময়। অপর দিকে কুরায়েশ সর্দার উত্বার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উঠিয়ে নিয়ে গেলো মুশরিকেরা। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত হামযা ও হজরত আলীর বীরত্ব ব্যঞ্জকতার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা হজের এই আয়াত— 'হাজানি খাসমানিখতাসামু ফি রব্বিহিম।'

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁর প্রকোষ্ঠে। সেখানে তিনি স. প্রার্থনা জানালেন— হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছো, তা পূর্ণ করো। ভাবের আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে রসুল স. বার বার এ রকম প্রার্থনা জানাতে থাকলেন। আরো বললেন, স্বল্পসংখ্যক এই মুসলিম সেনানীর উপর নির্ভর করছে ইসলামের ভাগ্য। সুতরাং হে আমার পরম প্রভুপ্রতিপালক! তাদেরকে বিজয় দান করো। এরা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী বলে আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না

রসুল স. এর পুনঃ পুনঃ নিবেদন শুনে হজরত আবু বকর বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! দয়া করে শান্ত হোন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার প্রার্থনা পূরণ করবেন । হজরত আবু আইউব আনসারী থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং তিবরানী লিখেছেন, পেরেশান হয়ে প্রার্থনা করতে দেখে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার একটি সবিনয় জিজ্ঞাসা রয়েছে। জিজ্ঞাসাটি এই — আল্লাহ্‌পাক তো তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেনই। তবে কেনো আপনি এতো কাকুতি মিনতি করে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানিয়ে চলেছেন? রসুল স. বললেন, হে ইবনে রওয়াহা! আমি তো আমার প্রতিপালককে তাঁর প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্মরণ করে চলেছি। তিনি তো তার প্রতিশ্রুতিপালন করবেনই।

ইবনে সা'দ এবং ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, লড়াই শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমি আবির্ভূত হয়েছিলাম লড়াইয়ের ময়দানে। শত্রুনিধনের পর আমি ছুটে এসেছিলাম রসুল স. এর নিকটে। আমার প্রিয় রসুল কি অবস্থায় আছেন তা দেখাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। আমি দেখলাম, তিনি স. সেজদায় পড়ে বার বার কেবল উচ্চারণ করছিলেন, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু। অন্য কোনো কিছু তাঁকে উচ্চারণ করতে শুনিনি। আমি পুনরায় ছুটে গেলাম লড়াইয়ের ময়দানে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর পুনরায় ছুটে এসে দেখলাম, রসুল স. সেজদায় পড়ে প্রার্থনারত অবস্থায় বলে চলেছেন কেবল, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু — ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু। এর কিছুক্ষণ পর আমরা লাভ করলাম পরিপূর্ণ বিজয়। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে অতিরিক্ত এ কথাগুলো — অতঃপর রসুল স. তাঁর পবিত্র বদন ফেরালেন। আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল পূর্ণিমার পূর্ণ শশী সদৃশ উজ্জ্বল। তিনি স. বলে উঠলেন, দিনান্তে আমি নিহত শত্রুদের স্থান পরিদর্শন করবো।

উবায়দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্‌র মাধ্যমে সাঈদ বিন মনসুর বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের সময় রসুল স. তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন হজরত আবু বকর। নামাজ শেষে তিনি স. প্রার্থনা করলেন — হে

আমার আল্লাহ্! আমাকে সহায়হীন অবস্থায় পরিত্যাগ কোরো না। হে আমার আপনতম উপাস্য! আমি তোমাকে ওই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে স্মরণ করছি, যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছো।

ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি প্রমুখ হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন, বদর প্রান্তরে রসুল স. দেখলেন, মুশরিকদের সেনাসংখ্যা প্রায় এক হাজার। আর মুসলিম বাহিনীর সেনা সদস্য তিন শত উনিশ। তিনি স. কাবামুখী হয়ে তাঁর পবিত্র দুই হস্ত প্রার্থনার ভঙ্গিতে উত্তোলন করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র দরবারের উদ্দেশ্যে। বললেন, হে আমার আপনতম আল্লাহ্! যে বিজয়ের অঙ্গীকার তুমি আমার সঙ্গে করেছো, সেই বিজয় আজ আমাকে দান করো। হে আমার প্রিয়তম প্রভু। বিশ্বাসীদের এই দল যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার নামের মহিমা ঘোষণাকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। রসুল স. প্রার্থনা করে চলেছিলেন গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে। পবিত্র স্কন্ধদেশ থেকে স্খলিত হয়ে পড়লো চাদর। কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ মাত্র নেই। হজরত আবু বকর স্খলিত চাদর স্থাপিত করলেন যথাস্থানে। তারপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আমার প্রিয়তম রসুল! আল্লাহ্পাক অবশ্যই তাঁর কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন। আপনি শান্ত হন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৯

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○

❒ স্মরণ কর, 'তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলে; তিনি উহা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা যাহারা একের পর এক আসিবে।'

বদর যুদ্ধে ফেরেশ্তা বাহিনীর সাহায্যের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। ওই যোদ্ধা ফেরেশ্তাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম এবং হজরত ইবরাহিম তায়েমী থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বদর প্রান্তরে রসুলুল্লাহ্ স. এর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত অস্থায়ী প্রকোষ্ঠে তখন উপস্থিত ছিলেন মাত্র দু'জন। রসুল স. স্বয়ং এবং হজরত আবু বকর। রসুল স. ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা ভঙ্গ হলো তাঁর । তারপর বললেন, আবু বকর! শুভসংবাদ শ্রবণ করো। হরিদ্রাভ আমামা পরিহিত এবং অশ্বোপরি উপবিষ্ট হজরত জিবরাইল

এতক্ষণ ধরে অবস্থান করছিলেন আসমান ও জমিনের মাঝখানে। এখন তিনি নেমে এসেছেন নিচে। তিনি কিছুক্ষণ অন্তর্হিত থাকার পর পুনরায় আবির্ভূত হয়ে বললেন, আপনার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে। এসে পড়েছে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য।

ইবনে ইসহাক এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন হজরত জিবরাইল! বোখারী ও বায়হাকীর বর্ণনায় আরো রয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর দিবসে রসুল স.বলেছিলেন, তোমাদের নিকট এসে পড়েছে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হজরত জিবরাইল ও তাঁর সঙ্গীরা। তারা সকলে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়। আপনাপন অশ্বের লাগাম হাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

এখানে উল্লেখিত 'মুরদিফীনা ' শব্দটির অর্থ— একের পর এক সারিবদ্ধ ভাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যোদ্ধা ফেরেশতারা এসেছিলো সারিবদ্ধ ভাবে এক জনের পর একজন। বর্ণনা করেছেন ইবনে যোবায়ের এবং ইবনে মুনজির। কাতাদা বলেছেন, 'মুরদিফীনা' অর্থ এক জনের পর একজন । বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর এবং আবদ বিন হুমাইদ। কাতাদা আরো বলেছেন, আল্লাহতায়ালা প্রথমে পাঠিয়েছিলেন এক হাজার সৈনিক ফেরেশতা । পরে পাঠিয়ে ছিলেন আরো তিন হাজার। এরপর আরো এক হাজার। এভাবে ফেরেশতা সেনাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো পাঁচ হাজারে। হজরত রেফাআ' বিন রাফে' থেকে তিবরানীর বর্ণনায় এবং ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুল এবং মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে হজরত জিবরাইলের নেতৃত্বে প্রথমে প্রেরণ করেছিলেন এক হাজার ফেরেশতার একটি দল। তার পাঁচশত সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হজরত জিবরাইল এবং অবশিষ্ট পাঁচশতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হজরত মিকাইল।

শায়বার বর্ণনাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুল স. সংবাদ পেলেন মুশরিকদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চায় করোজ মাহাবেরীর দল। সংবাদটি ছিলো বেদনাদায়ক। তাই আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন— 'আলা ইয়াক ফিকুম আঁই ইউমিদ্দুকুম রব্বুকুম বি ছালাছাতি আলাফিম্ মিনাল মালায়িকাতি মুনজিলিনা, বালাইন্ তাছবিরু ওয়া তাত্তাকু ওয়া ইয়াতিকুম মিন্ ফাওরিহিম হাজা ইয়ুমদিদ্কুম রব্বুকুম বি খামছাতি আলাফিম মিনাল মালায়িকাতি মুসাওবিমিন্' (তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, তোমরা ধৈর্যধারন এবং আল্লাহ্কে ভয় করলে তোমাদের নিকট এ রকম চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন)।

উল্লেখ্য যে, করোজ মাহাবেরীর বাহিনী কুরায়েশদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে চায়— এই সংবাদটি শত্রু শিবিরে যথা সময়ে পৌঁছেনি। তাই আল্লাহ্তায়ালা পাঁচ হাজার ফেরেশতা না পাঠিয়ে পাঠিয়েছিলেন কেবল এক হাজার ফেরেশতা।

আবু ইয়া'লী এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি তখন ছিলাম বদর প্রান্তরের প্রধান কূপটির নিকটে। হঠাৎ আমার শরীরে লাগলো একটি বাতাসের ঝাপটা। এ রকম অপার্থিব বাতাসের ঝাপটা আমি আগে আর কখনো অনুভব করিনি। কিছুক্ষণ পর আরেকটি দামাল বাতাসের ঝাপটা অনুভব করলাম আমি। এরপর অনুভব করলাম আরেকটি বাতাসের ঝাপটা। হজরত জিবরাইল ও তাঁর সঙ্গী এক হাজার ফেরেশতা আবির্ভূত হওয়ার কারণে অনুভব করেছিলাম প্রথম বাতাসের ঝাপটাটি। দ্বিতীয় ঝাপটাটি অনুভূত হয়েছিলো হজরত মিকাইল ও তাঁর সঙ্গী এক হাজার ফেরেশতার আবির্ভাবের কারণে। আর তৃতীয় বাতাসের ঝাপটাটি লেগেছিলো তখন, যখন এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে রণপ্রান্তরে নেমে এসেছিলেন হজরত ইসরাফিল। হজরত জিবরাইলের বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিলো সম্মুখ ভাগে। আর হজরত মিকাইল ও হজরত ইসরাফিলের বাহিনী অবস্থান নিয়েছিলো যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে। তখন রসুল স. এর ডান দিকে ছিলেন হজরত আবু বকর এবং বাম দিকে ছিলাম আমি।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ, বায্যার এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে রসুল স. হজরত আবুবকর ও আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু বকর! তোমার সঙ্গে রয়েছে জিবরাইল। আর হে আলী! তোমার সঙ্গে রয়েছে মিকাইল। ইসরাফিলও তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। তারা কিন্তু তোমাদের মতো কাতার বদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে না।

আবু ইয়া'লীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধের সময় রসুল স. এর সঙ্গে নামাজ পাঠ করেছি। নামাজরত অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মৃদু হাসির চিহ্ন। নামাজ শেষে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি দেখলাম নামাজরত অবস্থায় আপনার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। তিনি স. বললেন, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন হজরত জিবরাইল । দেখলাম, প্রান্তরের পুবাল বাতাসে তাঁর পাখায় লেগে রয়েছে কিছু ধুলোবালি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমিও হাসলাম।

হজরত আতিয়া বিন কায়েসের বর্ণনাসূত্রে ইবনে সা'দ এবং আবু শায়েখ লিখেছেন, যুদ্ধ শেষে লাল একটি ঘোড়ায় চড়ে হজরত জিবরাইল উপস্থিত হলেন রসুল স. এর নিকটে। তাঁর অবয়বে তখন শোভা পাচ্ছিলো যুদ্ধের পোশাক। হাতে

ছিলো একটি বর্শা। তিনি বললেন, মহা সম্মানিত ভ্রাতা মোহাম্মদ! আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ করেছেন আপনি আপনার পূর্ণ পরিতুষ্টি ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি আপনার পবিত্র সংসর্গে অবস্থান করবো। এখন বলুন আপনি কি পরিতুষ্ট? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। আমি এখন অত্যন্ত আনন্দিত। এ কথা শুনে হজরত জিবরাইল প্রত্যাবর্তন করলেন।

দ্রষ্টব্যঃ বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলো। ইবরাহিম হারসির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু সুফিয়ান বিন হারেস বলেছেন, আমি যুদ্ধের সময় কিছু সবুজ পোশাক পরিহিত লোককে দেখলাম। তারা উপবিষ্ট ছিলো শাদা ও কালো বর্ণ মিশ্রিত ঘোড়ার উপর। ঘোড়াগুলোর পা ছিলো শূন্যে। বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুহাইল বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আমি দেখেছি শাদা কালো রঙের চিহ্নিত কিছু ঘোড়ার উপরে বসে অচেনা লোকেরা যুদ্ধ করে চলেছে। ঘোড়াগুলোর পা মাটিতে ছিলো না। লোকগুলো মুশরিকদের কাউকে করেছিলো হত্যা এবং কাউকে করেছিলো বন্দী।

মোহাম্মদ ওমর আসলামী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধের সময় রসুল স.এর ডান দিকে এবং বাম দিকে দু'জন অপরিচিত লোককে দেখলাম। তাঁরা নির্মম হাতে বধ করে চলেছিলেন অংশীবাদীদেরকে। এরপর আবির্ভূত হলেন তৃতীয় এক অপরিচিত ব্যক্তি। তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স.এর পশ্চাতে। চতুর্থ আরেকজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে অবস্থান গ্রহণ করলেন সম্মুখ ভাগে।

মোহাম্মদ বিন ওমর আসলামীর বর্ণনায় আরো এসেছে, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী হজরত ইবরাহিম গিফারী বলেছেন, আমি এবং আমার পিতৃব্যপুত্র বদর যুদ্ধের সময়ে ছিলাম প্রতিপক্ষ। একটি কূপের পাশে ছিলাম আমরা। সেখান থেকে লক্ষ্য করলাম, কুরায়েশদের সৈন্যের তুলনায় রসুল স.এর সৈন্য সংখ্যা অনেক কম। আমি আপন মনে বললাম এখনই সমর প্রান্তরে সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হবে পরস্পর বিরোধী দু'টো দল। আমি ইচ্ছা পূরণ করবো মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের উপর। এরপর আমি উপস্থিত হলাম রসুল স.এর সেনা বাহিনীর বাম প্রান্তে। এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, রসুল স. এর সেনা সংখ্যা কুরায়েশদের সেনা সংখ্যার এক চর্তুথাংশের মতো হবে। হঠাৎ দেখলাম আমাদের মাথার উপরে এক খণ্ড মেঘ। সেদিকে তাকাতেই শুনতে পেলাম সেনা সঞ্চালন ও অস্ত্রের আওয়াজ। অশ্বারোহী এক লোক সজোরে বলে উঠলো—হাইজুম। সামনে চলো। সামনে চলো। ওই অশ্বারোহী গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন রসুল স. এর দক্ষিণ পাশে। এরপর মেঘ থেকে আবির্ভূত হলো আরেকদল সশস্ত্র সৈন্য।

আগন্তুক সৈন্যসহ তখন রসুল স. এর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হয়ে গেলো কুরায়েশদের দ্বিগুণ। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। আমার পিতৃব্যপুত্র নিহত হলো। আমি বেঁচে গেলাম। পরে ইসলাম গ্রহণের পর আমি রসুল স. কে এই ঘটনাটি বলেছিলাম।

জ্ঞাতব্যঃ অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ওই অপরিচিত অশ্বারোহী তখন উচ্চ কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, 'আকদিম হাইজুম।' সম্মানিত গ্রন্থকর্তা র. তাঁর টীকা ভাষ্যে লিখেছেন উক্‌দুম, ইক্‌দাম, আক্‌দিম — তিনটি উচ্চারণই শুদ্ধ। ইমাম নববী 'ইক্‌দাম' উচ্চারণটিকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখগমনের নির্দেশ হিসেবে শব্দটি উচ্চারিত হয়। আর 'হাইজুম' বলে বক্ষদেশকে। এ রকমও হতে পারে যে, ওই সেনাদলের অশ্বগুলোর নাম ছিলো হাইজুম। এমতাবস্থায় উল্লেখিত নির্দেশটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম — হে অশ্বারোহীরা! সম্মুখে অগ্রসর হও।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর এবং সায়েব বিন আবী জায়িস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন গিফারী গোত্রের এক লোক। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! কোনো মানুষ আমাকে বন্দী করেনি। বদর যুদ্ধে কুরায়েশরা পরাজিত হলো। আমিও পালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমাকে বন্দী করে ফেললো শ্বেত শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক লোক। লোকটি ছিলো অশ্বারোহী এবং দীর্ঘ আকৃতির। তার অশ্বের পা গুলো ছিলো শূন্যে। হঠাৎ আবদুর রহমান বিন আউফ আমাকে দেখে ধরে নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। রসুল স. বললেন, কে তোমাকে বন্দী করেছে? আমি বললাম, জানি না। তিনি স. বললেন, তোমাকে বন্দী করেছে এক ফেরেশতা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ এবং ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আবুল ইয়াসির ছিলেন ক্ষীণকায়। তদৃসত্ত্বেও তিনি বন্দী করে এনেছিলেন রসুল স. এর পিতৃব্য দীর্ঘকায় হজরত আব্বাসকে। রসুল স. তাঁকে বললেন, তুমি কীভাবে তাঁকে বন্দী করতে পারলে? হজরত আবুল ইয়াসির বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অচেনা এক লোক আমাকে সাহায্য করেছিলো। বন্দী করার পূর্বে ও পরে আমি আর তাকে দেখতে পাইনি। রসুল স. বললেন, ওই লোকটিতো ছিলো ফেরেশতা।

ইবনে ইসহাক এবং ইসহাক বিন রাহ্‌ওয়াইহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন হজরত আবু উসায়েদ সাআদী। তিনি তখন বলেছিলেন, এখনো বদর প্রান্তরে গেলে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারবো ওই পথটি, যে পথ বেয়ে নেমে এসেছিলো যোদ্ধা ফেরেশতারা। এখনও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধের সৈনিক ফেরেশতারা ছিলো শাদা পাগড়ী পরিহিত। পৃষ্ঠোপরি ঝুলন্ত ছিলো তাদের পাগড়ীর পুচ্ছ। আর খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক ফেরেশতারা ছিলো লাল রঙের পাগড়ী পরিহিত। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের অতিরিক্ত উক্তি হিসেবে এসেছে — কিন্তু হজরত জিব্‌রাইলের পাগড়ীর রঙ ছিলো হলুদ।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওরওয়া বলেছেন, বদর যুদ্ধে হজরত যোবায়েরের রূপ ধরে লাল পাগড়ী পরে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন হজরত জিব্‌রাইল। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন যোবায়ের থেকে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়াও এ রকম বর্ণনা করেছেন।

শিথিল সূত্রে তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুসাউবিমীন' শব্দটির অর্থ— চিহ্ন বিশিষ্ট। বদর যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের বিশেষ চিহ্ন ছিলো কালো পাগড়ী। উহুদ যুদ্ধে তাদের পাগড়ীর রঙ ছিলো লাল । ইবনে সা'দ লিখেছেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাদের চিহ্ন ছিলো সবুজ, হলুদ ও লাল রঙের জ্যোতির্ময় আমামা। তাদের ঘোড়াগুলো ছিলো শুভ্র ও কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা সুচিত্রিত। ঘোড়াগুলোর পায়ের রঙ ছিলো শাদা। রসুল স. বলেছেন, যুদ্ধকালে ফেরেশতারা নির্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ করে থাকে। তোমরাও ওই চিহ্নগুলোর অনুসারী হয়ো।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১০

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

❑ আল্লাহ্ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদিগের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহের নিকট হইতেই আসে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমে বলা হয়েছে—ওয়ামা জায়ালাহুল্লাহু ইল্লা বুশ্‌রা। কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ এ রকম করেন কেবল শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য। কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! অবিশ্বাসীদের প্রবল পরাক্রম এবং বিপুল যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে আপনি যাতে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না হন, তাই আল্লাহ্‌তায়ালা এ রকম করেছেন— সশস্ত্র ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে আপনাকে প্রদান করেছেন বিজয়ের শুভ সংবাদ।

আমি বলি, আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এ রকম— হে আমার রসুল! আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তৎসত্ত্বেও শত্রুদের বিপুল সমরায়োজন দৃষ্টে যাতে দুর্ভাবনাকবলিত হয়ে না পড়েন, তাই আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে সুসংবাদবাহী হজরত জিবরাইলকে এবং যোদ্ধা ফেরেশতাদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়ালী তাত্বমাইন্না ক্বুলুবুকুম। কথাটির অর্থ— এবং এই উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। এই কথাটির মূল লক্ষ্যও রসুল স.। এখানে সেই চিত্ত প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে, যে চিত্ত প্রশান্তি কামনা করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে বলেছিলেন, আমি মৃতকে জীবিত করি। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক ! কী ভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো, তা আমাকে দেখাও। আল্লাহ্তায়ালা বলেছিলেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। তবু আমি তা দেখতে চাই কেবল আমার চিত্তপ্রশান্তির জন্য। সুরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। হজরত ইব্রাহিমের চিত্তপ্রশান্তির নিবেদনটি ছিলো নুযুলে আতেম (চরম অবতরণ) সম্ভূত। আলোচ্য বাক্যটিতেও তেমনি দেয়া হয়েছে রসুল স. এর চরম অবতরণসম্ভূত অবস্থার পরিচয়। নুযুল (আত্মিক অবতরণ) সংঘটিত হয় উরুজের (আত্মিক ঊর্ধারোহণের) পর। নবী রসুলগণ উরুজের সময় আল্লাহ্তায়ালার একান্ত সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে লাভ করেন অসংখ্য নেয়ামত। আর সেই নেয়ামত সমূহ তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে বিতরণ করেন নুযুলের পর। নুযুল সংঘটিত না হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি হতো সুদূর ব্যবধান। ফলে তাঁদের মাধ্যমে উপকারপ্রাপ্তি হয়ে উঠতো দুরূহ। যে সকল নবী রসুলের এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের নুযুলে আতেম (চরম আত্মিক অবতরণ) সংঘটিত হয়, তাঁদের অনুসারীরাই হন পরিপূর্ণরূপে উপকৃত। সকল নবী রসুল অপেক্ষা রসুলুল্লাহ্ স. এর নুযুল ছিলো অধিকতর পূর্ণ ও পরিণত। তাই তিনি স. বিজয়ের অঙ্গীকার লাভ করা সত্ত্বেও বিজয়ের বাস্তবায়ন দর্শনের জন্য বদর প্রান্তরে আপন প্রকোষ্ঠে বসে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুর্ভাবনা ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত করার জন্য শুভ সংবাদবাহী ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহার নুযুল পরিপূর্ণ ছিলো না। তাই তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্পাক তো তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেনই। সুতরাং সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেনো? পক্ষান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলপ্রেমিক ও রসুলানুসারী হজরত আবু বকরের নুযুল ছিলো পরিপূর্ণ। তাই তিনি নীরবে শ্রবণ করে চলেছিলেন রসুল স. এর কথা। শেষে কেবল

বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার প্রার্থনা পৌঁছে গিয়েছে সর্বোচ্চ শিখরে (সুতরাং এবার ক্ষান্ত হোন)। কিন্তু রসুল স. এ কথা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালা বে নেয়াজ। সৃষ্টির বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা — কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী তিনি নন। সুতরাং চির অমুখাপেক্ষী পবিত্র সেই সত্তার দরবারে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানানোর মধ্যেই রয়েছে দাসত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ।

জ্ঞাতব্যঃ দু'টি অবস্থা রয়েছে নবী রসুলগণের। একটির নাম সুয়ুদী। অপরটির নাম নুযুলী। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য এবং মুখলুকের নৈকট্য লাভ হয় নবুয়তের মাধ্যমে। দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল রসুলগণের জন্য সুনির্ধারিত। তাঁরা সুয়ুদীর পরিপূর্ণতা লাভ করার পর লাভ করেন পরিপূর্ণ নুযুল। নুযুলের এই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম। রসুলুল্লাহ্ স. এই মর্যাদায় ছিলেন আরো অধিক অগ্রগামী। এই অবস্থায় সত্তার ভিতর বাহির, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ — সকল অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিপূর্ণ ইমান। তাই এই অবস্থায় উপনীত ব্যক্তিত্ববৃন্দ কেবল আত্মিক দর্শন ও অনুভবের মাধ্যমে প্রশান্ত হন না। তাঁরা চিত্ত প্রশান্তি লাভ করতে চান চাক্ষুস দর্শনের মাধ্যমেও। তাই হজরত ইব্রাহিম স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য। আর রসুলুল্লাহ্ স.ও দেখতে চেয়েছিলেন বিজয়ের প্রকাশ্য বাস্তবায়ন। আধ্যাত্মিক সাধকবৃন্দ এসকল বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই আসে আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাদের সাহায্য সমর সরঞ্জামের অন্তর্ভূত নয়। যুদ্ধের রীতি নীতির মধ্যেও বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে চান, তাকেই এই অনুগ্রহদানে ধন্য করেন।

দ্রষ্টব্যঃ প্রার্থনা শেষে রসুল স. স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন হজরত আবু বকর। একাধিক অবস্থান গ্রহণ করে রসুল স. এবং হজরত আবু বকর যেমন নিজেরা যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন অন্যদেরকে। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ এবং ফারইয়ানির বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় আমি রসুল স. কেই বানিয়েছিলাম আমার আড়াল ও আশ্রয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিলো সেদিন। আর সেদিন রসুল স.ই ছিলেন মুশরিক বাহিনীর সর্বাপেক্ষা নিকটে। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী উল্লেখ করেছেন, আমি বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন আমি ছিলাম রসুল স. এর প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায়। বর্ণনাটি নাসাঈর মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে — যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আমি আত্মরক্ষা করেছিলাম রসুল স. এর আড়ালে।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

❒ স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদিগ হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদিগের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদিগের পা স্থির রাখিবার জন্য।

প্রথমে বলা হয়েছে — ইজ্ ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নুয়াসা আমানাতাম্ মিন্‌হু (স্মরণ করো, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন)। এখানে 'ইজ্ ইউগাশ্‌শীকুম' কথাটিকে আল্লামা ইবনে কাসীর এবং ক্বারী আবু আমর পড়তেন— ইজ্ ইয়াগ্‌শাকুম। সুরা আলে ইমরানেও এ রকম উচ্চারণভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সেখানে একস্থানে বলা হয়েছে — আমানাতান্ নুয়াছাঁই ইয়াগ্‌শা। ক্বারী নাফে শব্দটিকে উচ্চারণ করেছেন — ইয়ুগ্‌শিকুম। এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ রয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে — কাআন্‌নামা উগশিয়াত উজুহুহুম। অন্য সকল ক্বারী উচ্চারণ করেছেন, ইউগাশ্‌শীকুম — যেমন উল্লেখ করা হয়েছে এখানে।

বদর যুদ্ধের তন্দ্রাচ্ছন্নতা যে সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সে কথা বুঝাতেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'আমানাতান্' শব্দটি। শব্দটি শাব্দিক দিক থেকে কর্মকারক। আর অর্থগত দিক থেকে কারণ বা ক্রিয়া। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্নতাই এখানে স্বস্তির কারণ। ইউগাশ্‌শীকুমুন্ নুয়াসা বলতে অভ্যন্তরীণ আবেগ বা তন্দ্রালুতাকে বুঝায়। তন্দ্রা ঘনিভূত হলে নেমে আসে শ্রান্তিহারক নিদ্রা। সশস্ত্র অভিযানে বহির্গত মুসলিম বাহিনীর জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রাম ছিলো অপরিহার্য। ঘন তন্দ্রার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই বিশ্রাম ও স্বস্তিই তাঁদেরকে দিয়েছিলেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন।

হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন, সমর প্রান্তরে তন্দ্রা অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে। আর নামাজের সময় তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কাতাদার মাধ্যমে আব্‌দ বিন হুমাইদ্ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীবৃন্দের উপর এ রকম অবিস্মরণীয় তন্দ্রা অবতীর্ণ হয়েছিলো দু'বার। একবার বদর যুদ্ধের ময়দানে। আরেকবার উহুদের সমর প্রান্তরে।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন, ওই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করবার জন্যে।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীবৃন্দ! পানির অভাবে তোমরা হয়ে পড়েছিলে তৃষ্ণার্ত ও অপবিত্র। পানির উৎসগুলো ছিলো শত্রুদের অধিকারে। তাই আল্লাহ্‌পাক দয়া করে তোমাদেরকে তৃপ্ত ও পবিত্র করবার জন্য আকাশ থেকে নামিয়েছিলেন রহমতের বৃষ্টি। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রিয় রসুল রয়েছেন তোমাদের সঙ্গে। তাই তোমাদের প্রতি করা হয়েছে এ রকম দয়ার্দ্র আচরণ।

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের নিকট থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য।' বৃষ্টি বর্ষণের আরেকটি উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে এই বাক্যটিতে। সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করা। শয়তান তখন এই মর্মে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করেছিলো যে, তোমরা বলো, তোমরা বিশ্বাসী। তাই তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। অথচ দ্যাখো, পানির সকল উৎস রয়েছে অবিশ্বাসীদের দখলে। তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্রই হয়ে থাকো, তবে তোমরা এ রকম দূরবস্থায় পড়েছো কেনো? ওজু, গোসল কিছুই করতে পারছো না তোমরা। পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে কি আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত করা যায়? আর ইবাদত না করলে কি আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হওয়া যায়? শয়তানের এহেন কুমন্ত্রণা সেই মুহূর্তেই উবে গেলো, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা ঘটালেন প্রবল বারিপাত। আলোচ্য বাক্যে তাই বলা হয়েছে — শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য।

শেষে বলা হয়েছে বারি বর্ষণের আরো দু'টো উদ্দেশ্যের কথা। সে দু'টো উদ্দেশ্য হচ্ছে — ১. হৃদয়কে দৃঢ় করবার জন্য। ২. পা স্থির রাখবার জন্য। এ কথার অর্থ — শ্রান্তি জর্জরিত, অপবিত্র এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রভাবিত হৃদয়ে কখনো সুদৃঢ় সংকল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা এসকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবার জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিলেন। তা ছাড়া তোমাদের সামনে ছিলো বন্ধুর বালিয়াড়ি। তোমাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো অসমতল। পদবিক্ষেপ ছিলো না স্বস্তিদায়ক। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতাটিকেও সরিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ্‌তায়ালা। তোমাদের চলাচল করে দিয়েছেন স্বস্তিকর। 'তোমাদের পা স্থির রাখবার জন্য' কথাটির অর্থ 'যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখবার জন্য' — এ রকমও হতে পারে।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

❐ স্মরণ কর, তোমাদিগের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদিগের সহিত আছি সুতরাং বিশ্বাসিগণকে অবিচলিত রাখ; ' যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তাহাদিগের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর;

প্রথমে বলা হয়েছে — 'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখো।' এখানে বলা হয়েছে ওই ফেরেশতাদের কথা, বদর যুদ্ধের সময় যাদেরকে পাঠানো হয়েছিলো মুসলমানদের সাহায্যার্থে। 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' — কথাটির অর্থ এখানে, আমার সাহায্য তোমাদের সাথে রয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে কারো স্থানগত বা অবস্থানগত নৈকট্য সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা স্থানবিশিষ্ট কিংবা শরীরবিশিষ্ট নন। তিনি আনুরূপ্যবিহীন। এখানে ফেরেশতাদের প্রতি আর একটি প্রত্যাদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে — সুতরাং মুমিনগণকে অবিচল রাখো। এ কথার অর্থ, হে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা! তোমরা বিশ্বাসী যোদ্ধৃবৃন্দকে সুসংবাদ প্রদান করো। তাদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করো। প্রশান্তিতে ভরে দাও তাদের হৃদয়। মুকাতিল বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেরকমই করেছিলো। তারা সারিবদ্ধভাবে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলো। বার বার উচ্চারণ করে চলেছিলো — শুভ সংবাদ বিশ্বাসীদের জন্য। বিজয় অনিবার্য। এভাবে তারা তাদের কথা ও উপস্থিতির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের অন্তরের চঞ্চলতা ও আশংকা দূর করে দিয়েছিলো। তাই সাহাবীগণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো প্রশান্তি, স্বস্তি এবং নিশ্চিতি। অপরদিকে অবিশ্বাসীদের অন্তরে তারা করেছিলো ভীতির সঞ্চার। তাদের দৃষ্টিতে প্রদর্শন করেছিলো মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। ফলে অবিশ্বাসীরা দেখতে পাচ্ছিলো মুসলমানদের সেনা সংখ্যা দ্বিগুণ অথবা চতুর্গুণ।

আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আমার পিতা! আমাকে বলুন, বদর যুদ্ধের সময় আপনার মতো দীর্ঘকায় ও বলশালী ব্যক্তিকে আবুল ইয়াসিরের মতো ক্ষীণকায় ব্যক্তি বন্দী করতে পেরেছিলো কি ভাবে! আপনি তো ইচ্ছা করলেই আবুল ইয়াসিরের গলা টিপে ধরতে পারতেন। আমার পিতা বলেছিলেন, প্রিয় পুত্র! এ রকম বোলো না। আমাকে তখন এমন কিছু দেখানো হয়েছিলো, যার ফলে আমি হয়ে পড়েছিলাম ভীত সন্ত্রস্ত।

আমি বলি, আল্লাহ্তায়ালা তখন কুরায়েশদের অন্তরে মুসলমানদের ভয় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। এই ভীতি সৃষ্টি করার কথাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে এভাবে —'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো।'

এরপর বলা হয়েছে — সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত করো।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীদের সাহায্যে প্রেরিত ফেরেশতারা ! তোমরা আঘাত করো অবিশ্বাসীদের স্কন্ধদেশে, কণ্ঠদেশে এবং মস্তকে। হজরত ইকরামা বলেছেন, 'ফাউকাল আনাক' অর্থ গ্রীবাদেশের উপরে। অর্থাৎ মস্তকে। কেননা গ্রীবাদেশের উপরেই রয়েছে মস্তক। জুহাক বলেছেন, গ্রীবাদেশেই। ফাউকা অর্থ উপর। অর্থাৎ কণ্ঠদেশেই আঘাত করো। 'কুল্লা বানান' অর্থ —সকল সন্ধিস্থলে আঘাত হানো। হজরত ইবনে আব্বাস, জুরাইজ ও জুহাক বলেছেন, 'বানানাতুন' এর বহুবচন 'বানান।' এর অর্থ— হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অস্থিসন্ধিতে আঘাত করো। কামুস প্রণেতা বলেন, শব্দটির অর্থ —আঙ্গুলসমূহ। অথবা আঙ্গুলের অগ্রভাগ। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তখন সাহায্যকারী ফেরেশতারা কেবল বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করা, অবিচলিত রাখা এবং অবিশ্বাসীদের ভীতি সৃষ্টি করার দায়িত্বই পালন করেনি, যুদ্ধেও সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলো। সরাসরি আঘাত হেনে হত্যা করেছিলো অনেক অবিশ্বাসীকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরশীল হয়ে সকলকে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেছি। তুমি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, ইচ্ছাময়। আর যদি তুমি বিশ্বাসীদেরকে পরাজিত করতে ইচ্ছা করো, তবে এ পৃথিবীতে তোমার দাসত্ব করার আর কেউ থাকবে না। রসুল স. পুনঃ পুনঃ এ রকম বলে চলেছিলেন। এক সময় হজরত আবু বকর তাঁর পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র প্রিয় রসুল! যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আপনার প্রার্থনা

ও রোদন সমাপ্ত করুন। রসুল স. তাঁর প্রার্থনা সমাপ্ত করলেন। পরিধান করলেন যুদ্ধের পোশাক। তারপর সশরীরে উপস্থিত হলেন রণপ্রান্তরে। রসুল স. এর সেই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই সুরার আলোচ্য আয়াতগুলো।

মুসলিম ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সেদিন এক মুসলিম এক মুশরিকের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুশরিক দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো। মুসলিম যোদ্ধা শুনতে পেলেন, এক অশ্বারোহী যোদ্ধা বলছে, হাইজুম, হাইজুম। একটু পরেই তিনি দেখলেন মুশরিক লোকটি ভূতলশায়ী হয়ে পড়লো। তার নাক কাটা ও চেহারা বিধ্বস্ত। মুসলিম সেনা অন্যদেরকেও ডেকে দেখালেন ঘটনাটি। এক আনসার সাহাবী রসুল স. সকাশে ঘটনাটি জানালেন। রসুল স. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। একাজ করেছে তৃতীয় আসমানের এক ফেরেশতা। হাকেম, আবু নাঈম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল ইবনে হানিফ বর্ণনা করেছেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের কিছু লোক তলোয়ার নিক্ষেপের আগেই দেখতে পাচ্ছিলো মুশরিকেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়ছে। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রবী বিন আনাস বলেছেন, গলদেশে ও অস্থিসন্ধিতে পোড়া দাগ দেখেই বোঝা যেতো তাকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, হুয়াইতাব বিন আবদুল উজ্জা বলেছেন, বদর যুদ্ধে ফেরেশতার আঘাতে নিহত হয়েছিলো অনেক মুশরিক। ফেরেশতারা বন্দীও করেছিলো তাদের অনেককে। আমি স্বচক্ষে এ রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। মোহাম্মদ ওমর আসলামী এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বুরদা বিন দীনার বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকটে হাজির করলাম দেহ বিচ্ছিন্ন তিনটি মস্তক। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! এই তিন জনের মধ্যে আমি দু'জনকে হত্যা করে তাদের মস্তক ছেদন করেছি। আরেক জনকে হত্যা করেছে শাদা রঙের এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি। আমি তাকে চিনতে পারিনি। তিনি স. বললেন, সে ছিলো এক ফেরেশতা।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, ওইদিন কোনো কোনো লোকের মস্তক ছেদন করা হয়েছিলো কিন্তু কেউ বুঝতে পারছিলো না, কারা এ রকম করেছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো কারো কারো হাত। অথচ কেউ অনুমান করতে পারছিলো না, কেনো এ রকম হচ্ছে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু ওয়াকেদ লাইসি বর্ণনা করেছেন, আমি এক মুশরিককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি আঘাত হানার পূর্বেই দেখলাম, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার ছিন্ন মস্তক। আমি বুঝতে পারলাম না, কে এ রকম করলো। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত

খারেজা বিন ইব্‌রাহিম বলেছেন, রসুল স. একবার হজরত জিব্‌রাইলকে বললেন, হে ভ্রাতা জিব্‌রাইল! বদর প্রান্তরে আপনি 'আকদাম হাইজুম' বলেছিলেন কাদেরকে লক্ষ্য করে? হজরত জিবরাইল বললেন, বিশ্বাসীদের সাহায্যার্থে আগমনকারী ওই সকল ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে, যাদেরকে আমিও আর কখনো দেখিনি।

ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কর্তৃক মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত আবু রাফে' বলেছেন, আমি ছিলাম আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম। মনে মনে তিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভিতরে ভিতরে উম্মুল ফজল ও আমিও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কেউই গোত্রীয় নেতাদের দাপটে আমাদের ইমানকে প্রকাশ করতে পারিনি। হজরত আব্বাস ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর প্রদত্ত ঋণের অনেক অর্থ আটকে ছিলো মুশরিকদের কাছে। গোত্রীয় লোকদের অসন্তোষ এবং ঋণের অর্থ আদায় অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে তিনি তাঁর ইমানকে প্রকাশ করেননি। আর তাই মুশরিকদের বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাঁকেও যেতে হয়েছিলো বদর যুদ্ধে। আল্লাহ্‌র দুশমন আবু লাহাব বদর যুদ্ধে যায়নি। সে ছিলো মক্কায়। যুদ্ধে বন্দী হয়ে হজরত আব্বাসকে যেতে হয়েছিলো মদীনায়। কিছুকাল পর রক্তপণ প্রদানের মাধ্যমে তিনি ফিরে এলেন মক্কায়। আমি ছিলাম অসহায় এক ক্রীতদাস। তীর প্রস্তুত করতাম আমি। সেদিনও জমজম কূপের পাশে বসে আমি তীর প্রস্তুত করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম তীর চালনা শিখতে। নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন উম্মুল ফজল। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হয়ে আবু লাহাবও বসে পড়লো। কেউ কেউ সেখানে বসে ছিলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তাদের একজন বলে উঠলো, ওই আসছেন আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিব। আবু লাহাব বললো, তাকে আমার কাছে আসতে বলো। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানা যাবে তার কাছ থেকে। লোকেরা আবু সুফিয়ানকে বললো, হে পানিওয়ালা! বলো কি খবর? আবু সুফিয়ান বললো, তেমন কিছু নয়। আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আমরা লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়েছি। তারা আমাদের অনেককে হত্যা করেছে। অনেককে করেছে বন্দী। কিন্তুএটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। আমরা বিস্মিত হয়েছি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখে। সেখানে আমরা দেখেছি শাদা-কালো রঙের অশ্বের উপরে আরোহী কিছু শ্বেত-শুভ্র লোক। আল্লাহ্‌র শপথ! তারা মানুষ নয়। তাদের মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই। এ কথা শুনে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, আল্লাহ্‌র কসম! সেগুলো নিশ্চয় ফেরেশতা। আবু লাহাব রেগে গিয়ে আমাকে চপেটাঘাত করলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। উম্মুল ফজল তখন একটি লাঠি নিয়ে এসে আবু লাহাবের মস্তকে সজোরে আঘাত করে বললো, এর

মনিব কাছে নেই বলে তুমি একে দুর্বল ভেবেছো। মাথা ফেটে গিয়েছিলো আবু লাহাবের। সে আর বাক্য ব্যয় না করে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। এই ঘটনার পর সাত দিন যেতে না যেতেই সে আক্রান্ত হলো আদ্‌ছা নামক এক ব্যাধিতে। ওই ব্যাধিতেই তার মৃত্যু হয়।

ইবনে জারীর বলেছেন, আদ্‌ছা হচ্ছে এক প্রকার ফোঁড়া। আরব দেশে এ রকম ঘৃণ্য ফোঁড়াকে বলা হয় মাখুস। ওই ব্যাধিকে মনে করা হতো একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। তাই আবু লাহাবের মৃত্যুর পরেও তার সন্তান-সন্ততিরা তার কাছে ঘেঁসেনি। দাফন কাফনের কোনো আগ্রহই তাদের ছিলো না। তিন দিন পর দুর্ণামের ভয়ে তারা লাঠির সাহায্যে আবু লাহাবের অপবিত্র মরদেহ উঠিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করলো একটি গর্তে। তারপর দূর থেকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করতে লাগলো পাথর। এভাবে পাথর চাপা দিয়ে দাফন করা হয়েছিলো তাকে।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ইউনুস বিন বুকাইরের বর্ণনায় এসেছে, আবু লাহাবের লাশ দাফনের জন্য কোনো কবর খোঁড়া হয়নি। তার মরদেহ জনবসতির বাইরে এক স্থানে রেখে অনেক পাথর নিক্ষেপ করে তাকে দেয়া হয়েছিলো পাথরের কবর।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১৩, ১৪

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ

❒ ইহা এই হেতু যে তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তিদানে কঠোর।

❒ সুতরাং ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য অগ্নি শাস্তি রহিয়াছে।

প্রথমে বলা হয়েছে— হেতু এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে। এ কথার অর্থ— বদর যুদ্ধে মক্কার অংশীবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়েছে। তাদের কাউকে করা হয়েছে হত্যা এবং কাউকে বন্দী। এ রকম করার কারণ হচ্ছে, তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং কেউ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্‌তো শাস্তিদানে কঠোর।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে শাস্তিদান করবেনই।

'জালিকা অর্থ 'এই'। এ আঘাত বা এ আঘাতের নির্দেশ। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. কে। 'বিআন্নাহুম শাক্কু' অর্থ যেহেতু তারা বিদ্রোহ করেছিলো।

মর্মার্থ হচ্ছে— এ আঘাত হানার হেতু, তারা বিদ্রোহ করেছিলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে। 'শাক্ক' শব্দের ধাতুমূল শিক্ক— অর্থ পার্শ্ব বা পাঁজর। বিদ্রোহী দু'টি দলের একটি অবস্থান করে অপরটির পাশে; তাই বলা হয়েছে এ রকম । 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার প্রতিফল কি? — কথাটি রয়েছে অনুক্ত। এর প্রতিফল হচ্ছে, আল্লাহ্পাক তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দিবেন। 'ফাইন্নাল্লহা শাদীদুল ইক্বাব' অর্থ আল্লাহ্ অবশ্যই কঠিন শাস্তিদাতা। বাক্যটিতে বিধৃত হয়েছে শাস্তি প্রদানের কারণ। অথবা বলা যায়— বাক্যটিতে ওই শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, জাগতিক শাস্তির পরে যে শাস্তি তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে পৃথিবী পরবর্তী জীবনে।

পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'সুতরাং এর আস্বাদন গ্রহণ করো এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য অগ্নি-শাস্তি রয়েছে।' এ কথার অর্থ, আখেরাতে অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে — 'এবার আস্বাদন গ্রহণ করো লাঞ্ছনা ও শাস্তির। জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত রাখা হয়েছে তোমাদের জন্যই। এই জলন্ত হুতাশনে তোমরা দগ্ধ হতে থাকবে চিরকাল।'

'জালিকুম' (তোমাদের এটা) এর পূর্বে জালিকা ব্যবহৃত হয়েছে উত্তম পুরুষে। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। অতঃপর 'জালিকুম' দ্বারা সম্বোধন ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে কাফেরদের প্রতি। শাক্ক শব্দটি ছিলো উত্তম পুরুষে। আর এখানে বলা হয়েছে 'জালিকুম' মধ্যম পুরুষে। এ কথার অর্থ — তোমাদের এহেন উক্তির প্রতি অধিক আসক্তি অথবা উক্তি দ্বারা সতর্কতার উদ্দেশ্যে উত্তম পুরুষ থেকে সরাসরি মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা হয়েছে।

'ওয়া আন্নালিল কাফিরীনা আজাবান্নার অর্থ — কাফেরদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি। বাক্যটির সংযোগ রয়েছে 'জালিকুম' এর সাথে। অথবা 'ওয়া আন্না' বাক্যের 'ওয়াও' (এবং) অব্যয়টি সাযুজ্য অর্থে ব্যবহৃত। সেক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, শীঘ্র করে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তার সাথে ওই শাস্তিরও আস্বাদ গ্রহণ করো যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে পরকালের জন্য। 'লিল কাফিরীনা' (কাফেরদের জন্য)। এখানে 'লিল কাফিরীনা' কাফেরদের জন্য না বলে 'লাহুম'— 'তাদের জন্য' বলা যেতো। তবে এ রকম বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক যোগে জাগতিক ও পারলৌকিক শাস্তি একমাত্র কুফরী করার কারণেই ঘটে তা প্রকাশ করা। আর কোনো দুষ্কর্মের কারণে যদি কোনো মুমিন ব্যক্তি পার্থিব বিপদ-আপদগ্রস্ত হয়; তবে সেটা হবে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত। আল্লাহ্ না করুন, পরলোকে তাদের শাস্তি হবে না।

ইমাম বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার বললেন, আমি কি তোমাদের সম্মুখে কোরআন মজীদের ওই মহা মর্যাদামণ্ডিত আয়াতটির কথা উল্লেখ করবো, যা রসুল স. আমাকে জানিয়েছেন? আয়াতটি এই— 'মা আসবাকুম মিম্ মুসিবাতিন ফাবিমা কাসাবাত্ আইদিকুম ওয়া ইয়া'ফুআন কাছীর' অর্থ— তোমাদের উপর আপতিত বিপদ তোমাদেরই অর্জন, যার অধিকাংশই মার্জনা করা হয়। এই আয়াত পাঠের পর রসুল স. আমাকে বলেছিলেন, হে

আলী! আমি কি তোমাকে এই আয়াতের মর্মার্থটি জানাবো না? এর মর্মার্থ হচ্ছে— তোমাদের কর্মফলের কারণেই পৃথিবীতে তোমাদের উপর নেমে আসে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ। ওই সকল বিপদ-আপদের মাধ্যমে তোমাদেরকে পাপ মুক্ত করা হয় । আখেরাতে তোমাদেরকে কোনো শাস্তি দেয়া হবে না বলেই এভাবে তোমাদেরকে সংশোধন করে নেয়া হয় পৃথিবীতেই— যদিও সকল ক্ষেত্রে পুণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকলকে শাস্তিদানের ব্যাপারে তিনি পরিপূর্ণরূপে সক্ষম ও স্বাধীন।

হজরত ইকরামা থেকে তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বদর যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! যাত্রা স্থগিত করে এবার কুরায়েশদের বাণিজ্য বাহিনীটির উপর হামলা করা হোক। আমাদের সঙ্গে ছিলো কুরায়েশ যুদ্ধ বন্দীরা। আমার পিতা আব্বাসও ছিলেন তাদের মধ্যে। তিনি বলে উঠলেন, এ রকম করা ঠিক নয়। রসুল স.বললেন, কেনো? হজরত আব্বাস বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে দু'টো দলের যে কোনো একটির উপর বিজয় দানের অঙ্গীকার করেছেন। সে অঙ্গীকার তো বাস্তবায়িত হয়েছেই। কুরায়েশ সেনাদলের উপর অর্জিত হয়েছে নিরঙ্কুশ বিজয়। রসুল স.বললেন, হে আমার পিতৃব্য! আপনি ঠিকই বলেছেন।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১৫, ১৬

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ

بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

❒ সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহের বিরাগ-ভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট!

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু ইজা লাক্বীতুমুল্ লাজীনা কাফারু যাহ্ফান ফালা তুও য়াল্লু হুমুল আদ্‌বারা (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না)। এখানে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে মুখোমুখী যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পলায়ন ও পশ্চাদপসরণকে করা হয়েছে নিষিদ্ধ। নির্দেশনাটির মমার্থ হচ্ছে— সম্মুখ যুদ্ধে বিশ্বাসীদেরকে হতে হবে ক্ষিপ্র, আক্রমণপ্রবণ ও অকুতোভয়। এমতোক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন সম্পূর্ণতঃই নিষিদ্ধ। বাগবী এ রকম বলেছেন।

আমি বলি, এখানে উল্লেখিত 'যাহ্ফান' শব্দটির অর্থ প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটবর্তী হওয়া। বা শত্রুর একেবারে সামনে চলে যাওয়া। কথাটি এসেছে 'যাহাফাস্ সবিয়্যু' থেকে। শিশুরা নিতম্বে ভর করে চলতে শেখে, তখন ওই অবস্থাকে বলা হয় যাহাফাস্ সবিয়্যু। 'যাহাফাল্ বায়িরু' থেকেও শব্দটির উৎসারণ ঘটে থাকতে পারে। যাত্রা বিরতির পূর্বক্ষণে উটের ধীর পদবিক্ষেপকে বলা হয় 'যাহাফাল্ বায়িরু।' এখানে 'যাহাফান্' শব্দটির মাধ্যমে এ নির্দেশনাটিই দেয়া হয়েছে যে, শত্রুদলের প্রবল আক্রমণ বীর বিক্রমে প্রতিহত করতে হবে। শব্দটি একটি মূল শব্দ। তাই এর বহুবচনের শব্দরূপ এখানে ব্যবহৃত হয়নি। এ রকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— 'ক্বওমুন্ আদলুন' (ন্যায়-পরায়ণ সম্প্রদায়)। লাইস বলেছেন, 'যাহাফুন্' অর্থ ওই দল যা সম্মিলিতভাবে সামনে ধেয়ে আসে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, শত্রুদের যে অগ্রগামী দল সম্মুখে এগিয়ে আসে তাকে বলা হয় 'যাহ্ফান।' বায়যাবী এই অর্থটিকে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি তাঁর তাফসীরে লিখেছেন এ রকম — তোমরা যখন বহুসংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। অর্থাৎ তোমরা স্বল্পসংখ্যক হলেও অধিক সংখ্যক সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করবেই করবে।

বদর যুদ্ধে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর বিশ্বাসীরা ছিলো সংখ্যালঘু। কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধের অবস্থা ছিলো বিপরীত। সেখানে সংখ্যালঘু সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সংঘবদ্ধ প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিলো। সুতরাং এক্ষেত্রে বায়যাবীর তাফসীর অপেক্ষা বাগবীর তাফসীরটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। অর্থাৎ এখানকার নির্দেশনাটির অর্থ এ রকম নয় যে, শত্রুরা সংখ্যাগুরু হলেই কেবল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে হবে এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা চলবে না। বরং নির্দেশনাটির যথার্থ উদ্দেশ্য এই যে— শত্রুরা সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু, শক্তিমান, দুর্বল —যাই হোক না কেনো, প্রচণ্ড তেজে তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে এবং প্রতিহত করতে হবে। পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা যাবে না। অর্থাৎ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি, দলের বিরুদ্ধে দল— এভাবেই করতে হবে শত্রুর মোকাবিলা।

মাসআলাঃ অধিকাংশ আলেমের অভিমত হচ্ছে, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কবীরা গোনাহ্। চার ইমামের অভিমতও এ রকম। তবে সকলে এই শর্তটি আরোপ করেছেন যে, শত্রুদের তুলনায় বিশ্বাসীদের সেনাসংখ্যা কমপক্ষে হতে

হবে অর্ধেক। অর্ধেকের কম হলে প্রয়োজনে পশ্চাদপসরণ করা যাবে। কেননা, আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেছেন — 'আলআনাখাফ্‌ফা ফাল্লহু আনকুম ওয়া আলিমা আননা ফিকুম দ্বয়্‌ফান ফাইঁয়্যাকুম মিন্‌কুম মিয়াতুন সাবিরাতুঁই ইয়াগ্‌লিবু মিআতাইনি (এখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সহজ করে দিলেন এবং জেনে নিলেন তোমাদের কিঞ্চিত দুর্বলতাকে। তোমাদের একশত ধৈর্যাবলম্বনকারী বিজয়ী হবে তাদের দুই শতের উপর)।

আতা বিন রেবাহ্ বলেছেন, উল্লেখিত আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে— লা তুওয়াল্লুহুমুল আদবারা (তোমরা তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কোরো না)।

হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতেও এ রকম কথা এসেছে। তিনি বলেছেন, রসুল স. আমাকে একটি মুজাহিদ দলের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। ওই দলটি শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই মদীনায় ফিরে এসে আমরা চুপচাপ রইলাম। আমরা সকলে মর্মপীড়া অনুভব করতে লাগলাম এই ভেবে যে, আমরা রসুল স.এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছি। তাই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে আমরা রসুল স. এর নিকটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। পুনঃ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। বর্ণনাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— রণকৌশলের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ বা পলায়ন সিদ্ধ। প্রতারণামূলক পলায়নও অসিদ্ধ নয়। তবে পুনঃ আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করতে হবে। আমার অবস্থান স্থল তোমাদের মূল কেন্দ্র। তাই মুজাহিদেরা অনর্থক জীবন দানের পরিবর্তে আমার নিকটে ফিরে আসে। তিরমিজি, আবু দাউদ। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম।

মোহাম্মদ বিন সিরিনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উবায়দার শাহাদাতের সংবাদ জানতে পেরে হজরত ওমর বলেছিলেন, যদি তিনি আমাদের দিকে ফিরে আসতেন, তবে পেয়ে যেতেন আশ্রয়ের কেন্দ্র। আমি এখন সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা। তাই আমিই এখন সকলের আশ্রয়স্থল।

উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর নির্দেশনা ওই অবস্থার প্রতি প্রযোজ্য হবে, যখন মুসলমানদের সেনাসংখ্যা কাফেরদের সেনাসংখ্যার তুলনায় হবে অর্ধেকের কম। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন জন শত্রুর মোকাবিলা করার চেয়ে পলায়নকে শ্রেয়ঃ মনে করবে তাকে পলাতক বলা যাবে না। কিন্তু ওই ব্যক্তি অবশ্যই পলাতক, যে দু'জন শত্রুর মোকাবিলা না করে পালিয়ে আসে। কেউ কেউ এই হাদিসের আলোকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকে সিদ্ধ বলেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন না করার নির্দেশটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বদর প্রান্তরে রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাই তাঁর উপস্থিতিতে পলায়ন বা পশ্চাদপসরণকে করা হয়েছিলো নিষিদ্ধ। তখন মুসলমানদের জন্য দ্বিতীয় কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। সুতরাং তাঁরা পালাবেন কোথায়? পরবর্তী সময়ের অবস্থা কিন্তু এ রকম ছিলো না। তখন অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মুসলমানেরা লাভ করতেন একে অন্যের আশ্রয়। তাই পরবর্তী সময়ের কোনো যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ পালিয়ে যায়, তবে তাকে কবীরা গোনাহ্কারী বলা যাবে না। হাসান, কাতাদা এবং জুহাকও এ রকম অভিমত পোষণ করেন।

ইয়াজিদ বিন আবী হাবিব বলেছেন, বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাক স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, তারা হবে জাহান্নামী। পরে উহুদ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ ভয়ে পলায়নকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে— 'ইন্নামাস তাজাল্লা হুমুশ্ শাইতানু বিবা'দি মা কাছাবু ওয়া লাকৃদ আফাল্লহু আন্হুম' (নিশ্চয় শয়তান কিছু সংখ্যকের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো, যা ছিলো তাদেরই অর্জন। আর আল্লাহ্ তাদের মার্জনা করেছেন)। আর হুনাইন যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত— 'ছুম্মা ওয়াল্লাইতুম্ মুদবিরিনা ছুম্মা ইয়াতুবুল্লহু মিম্ বা'দি জালিকা আ'লা মাই ইয়াশাউ' (অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে। অনন্তর আল্লাহ্ পরবর্তীতে যাকে ইচ্ছা তার তওবা কবুল করেন)।

আমি বলি, ইয়াজিদ বিন আবী হাবিবের উপরোক্ত বক্তব্যটি ঐকমত্য বিরোধী। তিনি উহুদ এবং হুনায়েন যুদ্ধ সম্পর্কে যে আয়াত দু'টোর উল্লেখ করেছেন, সে দু'টোর প্রথমটিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, শয়তানের প্রলোভনের কারণে তখন তীরন্দাজ বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিলো। আল্লাহ্তায়ালা তাঁদের সে ভুল ক্ষমাও করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, তোমরা যারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে, তারা তওবা করলে আল্লাহ্তায়ালা তা কবুল করবেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ যাকে ক্ষমা করেন, তার কোনো গোনাহ্ আর অবশিষ্ট থাকে না। রসুল স. যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নের কারণ হিসেবে সাতটি ক্ষতিকর ও মনোমুগ্ধকর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম এবং হজরত সাফওয়ান বিন আস্সাল থেকে সুনান প্রণেতাবৃন্দ। সুরা নিসার 'ইনতাজতানিবু কাবাইরা মা তুনহাওনা আনহু নুকাফ্ফির আনকুম সায়্যিআতিকুম'— আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে—'সেই দিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান গ্রহণ ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সেতো আল্লাহ্র বিরাগ ভাজন হবে এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম, আর তা কতো নিকৃষ্ট।' আলোচ্য আয়াতটি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের নির্দেশনাটি একটি

সাধারণ নির্দেশনা। আয়াতের মমার্থ হচ্ছে— যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বনের নিমিত্তে পলায়ন, আত্মগোপন অথবা পশ্চাদপসরণ করা যাবে। অথবা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে আপন শিবিরে। এ রকম অবস্থায় পুনঃ আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে হবে। পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করে কিংবা পুনঃ কৌশল নির্ধারণ করে পরাস্ত করতে হবে দুশমনদেরকে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কেউ কেউ বলাবলি করছিলেন আমি ওমুক কাফেরকে হত্যা করেছি, কেউ কেউ বলছিলেন আমি বধ করেছি অমুককে। এ সকল কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ১৭, ১৮

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

❒ তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, আল্লাহ্ই তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ইহা বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করিবার জন্য, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ এই ভাবে আল্লাহ্ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! বিজয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবন করো। জয়লাভের কৃতিত্বকে নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোরো না। বিজয়ের কৃতিত্ব কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি তোমাদের হৃদয় থেকে চাঞ্চল্য ও ভীতি অপসারিত করে দিয়েছেন। শত্রুসেনাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন তোমাদের প্রতাপ ও প্রভাব। আর তোমাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন যোদ্ধা ফেরেশ্‌তাদেরকে। তিনি এ রকম করেছেন বলেই তোমরা ছিনিয়ে নিতে পেরেছো বিজয়ের মুকুট। তোমরা তো মাধ্যম মাত্র। আমিই তোমাদের নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও বিজয়দাতা। সুতরাং প্রকাশ্যতঃ তোমরা শত্রু বধকারী হলেও মূলতঃ তোমাদের শত্রুদেরকে বধ করেছি আমিই। আর হে আমার প্রিয় রসুল! আপনিও শুনুন (যদিও আপনি বিজয়ের কৃতিত্বের দাবিদার নন) শত্রুদলের উদ্দেশ্যে যে মৃত্তিকা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, সেগুলোকে শত্রুদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি আমি। সে কারণে তো তারা হয়ে পড়েছিলো অপ্রস্তুত, দিক-বিদিক জ্ঞান

শূন্য এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুতরাং প্রকাশ্যতঃ আপনি মৃত্তিকা নিক্ষেপকারী হলেও প্রকৃত নিক্ষেপকারী আমি। তাই বিজয়ের নিরঙ্কুশ কৃতিত্ব ও গৌরব কেবলই আমার। এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত উত্তম পুরস্কার। এভাবেই আমি বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌-তায়ালা সকল কিছু শোনেন এবং সকল বিষয় জানেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও বায়হাকী এবং হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন ছা'লাবা বিন সফির থেকে উমুবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্‌! আজ এই বদর প্রান্তরে তুমি যদি বিশ্বাসীদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে ভূ-পৃষ্ঠে তোমার ইবাদতকারী বলে আর কেউ থাকবে না। প্রার্থনা শেষ হলো। অবতীর্ণ হলেন হজরত জিবরাইল। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুঁড়ে মারুন। রসুল স. তাই করলেন। ওই মাটি নিক্ষিপ্ত হলো সকল শত্রুর চোখে, নাকে ও মুখে। ফলে তারা হয়ে পড়লো দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। কিছুক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকার চেষ্টা করলেও পলায়ন ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। রসুল স. সাহাবীগণকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন, আক্রমণ করো। আক্রমণ করো। শুরু হলো প্রচণ্ড আক্রমণ। একে একে নিহত হতে শুরু করলো কুরায়েশ নেতারা। কেউ কেউ হয়ে গেলো বন্দী। তখন অবতীর্ণ হলো এ আয়াত।

বিশুদ্ধ সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী এবং আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আলীকে বললেন, আমাকে এক মুঠো কংকর দাও। সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলী কংকর এনে দিলেন। রসুল স. সেগুলোকে মুষ্টিবদ্ধ করে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তাদের মধ্যে এমন কেউই অবশিষ্ট রইলো না, যাদের চোখে কংকর নিক্ষিপ্ত হয়নি।

আবু শায়েখ, আবু নাঈম এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, বদর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমি শুনতে পেলাম আকাশ থেকে কংকর পতনের আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো সেগুলো যেনো কোনো থালার উপর পতিত হচ্ছে। যখন দুশমনেরা কাতার বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তখন রসুল পাক স. তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এক মুঠো কাঁকর। মুহূর্তের মধ্যে শত্রুরা বিশৃংখল হয়ে পড়লো। পলায়নপ্রবণতা শুরু হয়ে গেলো তাদের মধ্যে।

হজরত ইবনে জায়েদের বর্ণনা সূত্রে ইবনে আবী হাতেম লিখেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স. সেদিন তিনটি কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। একটি শত্রুসেনাদের মধ্যভাগে, একটি দক্ষিণভাগে এবং একটি বামভাগে। প্রতিটি নিক্ষেপের সময় তিনি স. উচ্চারণ করেছিলেন 'শাহাতিল উজুহ্‌'। এইভাবে প্রস্তর নিক্ষেপের ফলে শোচনীয়রূপে পরাজয় বরণ করেছিলো দুশমনেরা।

হজরত মোহাম্মদ বিন আমর আসলামী বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. এক মুঠো কাঁকর নিয়ে মুশরিকদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, 'শাহাতিল উজুহু আল্লাহুম্মারইব কুলুবাহুম ওয়া জালযিল আক্বদামাহুম'। পরিবর্তিত হয়ে গেলো তাঁর মুখ-মণ্ডলের রঙ। তিনি স. দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! ওদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করো। তাদেরকে পদস্খলিত করে দাও। এরপর দেখা গেলো শত্রুরা দিশেহারা হয়ে পালাতে চেষ্টা করছে। তখন ওই ভীত সন্ত্রস্ত মুশরিক-দেরকে হত্যা করতে শুরু করলেন মুসলিম সেনারা। বন্দী করলেন অনেককে। তাদের সকলের চোখে মুখে লেগে ছিলো মাটি ও কাঁকর। যারা পালিয়ে যাচ্ছিলো তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেললো ফেরেশতারা।

হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম থেকে উত্তম সূত্রপরম্পরায় ইবনে হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমি শুনতে পেলাম কংকর পতনের শব্দ। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো থালায় পতিত হচ্ছে অজস্র পাথর কণা। রসুল স. সেই পাথর হাতে নিয়ে 'শাহাতিল উজুহু' বলে নিক্ষেপ করলেন শত্রু সৈন্যদের দিকে। ওই প্রস্তর নিক্ষেপের ফলেই সেদিন বিজয় লাভ করেছিলাম আমরা।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের সূত্রে হজরত মুসাইয়্যেব বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন উবাই বিন খালফ রসুল স. এর দিকে অগ্রসর হলো । তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে গেলেন হজরত মাসয়াব বিন উমায়ের। উবাইয়ের যুদ্ধের পোশাকের এক স্থানে ছিলো ছেঁড়া। ওই ছেঁড়া অংশ দিয়ে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো তার গলার নিচের হাড়। রসুল স. একটি ছোট বর্শা নিক্ষেপ করলেন উবাইয়ের প্রতি। বর্ষাটি গিয়ে লাগলো তার ওই গলার হাড়ে। সামান্য জখম হলো সেখানে। কোনো রক্তপাতও হলো না। কিন্তু ওই টুকুর যন্ত্রণায় সে ষাঁড়ের মতো চিৎকার শুরু করে দিলো। সাথীরা বললো, সামান্য একটু চামড়া ছিলে গিয়েছে তোমার। অথচ যন্ত্রণায় তুমি ডুকরে ডুকরে উঠছো কেনো? সে বললো, মোহাম্মদের রোষ তো আমি সহ্য করতে পারছি না। সে আমাকে হত্যা করতে চায়। জখম সামান্য হলেও এতে রয়েছে মোহাম্মদের ক্রোধতপ্ত দৃষ্টি। সেই ক্রোধের আগুনে দগ্ধিভূত হচ্ছি আমি। জখম তো নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ্র কসম! জুলমাজায মেলায় সমবেত সকলকে যদি এই জখমটুকু ভাগ করে দেয়া হয় তবে সকলেই নির্ঘাত মৃত্যুবরণ করবে (জুলমাজাযে সুবৃহৎ মেলা বসতো ওকাজের মেলার পর)। যুদ্ধ শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে মৃত্যু ঘটেছিলো উবাইয়ের। তখন অবতীর্ণ হয়েছে— এই বর্শা তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন। এই হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বর্ণনাটি বিরল।

আবদুর রহমান ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধে রসুল স. একজনের কাছ থেকে তীর ও ধনুক চেয়ে নিলেন। তীর নিক্ষেপ করলেন দূর্গের দিকে। ওই তীরের আঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হলো ইবনে আবিল হাকিক্ বুস্তার। সে ছিলো শায়িত। 'তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে.............'এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তখন। হাদিসটি মুরসাল এবং বলিষ্ঠ, কিন্তু দুর্লভ।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, জেহাদ হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্পাকের এক বিশেষ উপহার। এই জেহাদের মাধ্যমেই বিশ্বাসীরা লাভ করে থাকেন বিজয়, গণিমত এবং সম্মান। এতে করে তাদের বিশ্বাসও হয়ে ওঠে অধিকতর বলিষ্ঠ ও প্রোজ্জ্বল। এছাড়া জেহাদে রয়েছে শাহাদাত লাভের অনন্যসাধারণ সুযোগ। আরো রয়েছে সওয়াব, জান্নাত এবং আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য।

আমি বলি, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্পাক তো ফেরেশতাদের সাহায্য ছাড়াই বিশ্বাসীদেরকে বিজয়ী করতে পারতেন। তাছাড়া কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতাই তো যথেষ্ট ছিলো। কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, অতীতের এক অবাধ্য উম্মতকে একজন ফেরেশতার হুংকারের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। তাহলে এখানে হাজার হাজার ফেরেশতার প্রয়োজন পড়লো কেনো? এ সকল প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই আয়াতের শেষে উল্লেখিত এই কথাটির মধ্যে— 'এবং এটা বিশ্বাসীগণকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য। কথাটির মর্মার্থ এ রকম— বদর যুদ্ধে আমি বিশ্বাসীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কার লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। দিয়েছি বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সম্মান। যুদ্ধ ছাড়াও আমি অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম। একজন ফেরেশতার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতাম তাদেরকে। সে রকম করলে বিশ্বাসীরা পুরস্কার লাভ করতো কীভাবে। আর সকল অবিশ্বাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেললে তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে কীভাবে পেতো ইসলাম গ্রহণের সুযোগ। বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধিও তো বিশ্বাসীদের জন্য একটি অনন্য উপহার। তাই তাদের অনেককে বাঁচিয়ে রাখা হলো বন্দীরূপে অথবা অন্য কোনোভাবে। বিশ্বাসীরাও পেলো বিজয়ীর সম্মান। আবার বিশ্বাসীদের মধ্যেও কাউকে কাউকে দেয়া হলো শাহাদাতের মর্যাদা। শহীদেরা পেলো শাহাদাতের সওয়াব এবং আল্লাহ্তায়ালার একান্ত সন্নিধান। গাজীরাও পেলো আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ, জেহাদের সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতারাও লাভ করলো এক বিরল সৌভাগ্য।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত

হজরত রেফাআ বিন রাফে' জরকী থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত জিবরাইল রসুল স.কে বললেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? রসুল স. বললেন, তারা অন্য সকল মুসলমানের চেয়ে উত্তম। অথবা তিনি স. উচ্চারণ করলেন এ রকমই কোনো একটি উক্তি। হজরত

জিবরাইল বললেন, যথার্থ বলেছেন আপনি। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতারাও অন্য ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। হজরত রাফে' বিন খাদিজ থেকে আহমদ, ইবনে মাজাও এ রকম হাদিস উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সূত্রে আহমদ হজরত জাবের থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা বদরে ও হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাঁরা কখনোই দোজখে প্রবেশ করবে না। বলিষ্ঠ সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা আহলে বদর সম্পর্কে জানিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো— আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, জননী হাফসা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে ঘোষণা করতে শুনেছি, যারা বদর ও হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলো, ইনশাআল্লাহ্ তাঁরা কখনো জাহান্নামে যাবে না। ঘোষণাটি শুনে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা কি এরশাদ করেননি— 'ওয়া ইম্ মিন্কুম ইল্লা ওয়ারিদুহা' (তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে দোজখে পতিত হবে না)। তিনি স.বললেন, তুমি কি আল্লাহ্তায়ালার এই ঘোষণাটি শ্রবণ করোনি— 'ছুম্মা নূনাজজিয়াল্লাজিনা ত্তাকাউ ওয়ানাযারুজ্ জলিমীনা ফিহা জিছিয়্যা'(অতঃপর যারা সংযমী তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম। আর অত্যাচারীদেরকে সেখানে পরিত্যাগ করেছিলাম অধোমুখী অবস্থায়)।

হজরত জাবেরের মাধ্যমে মুসলিম ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার হজরত আবদুল্লাহ্ বিন হাতেব তাঁর পিতা হজরত হাতেবের বিরুদ্ধে রসুল স. এর দরবারে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা হাতেব অশিষ্ট। তাঁর দোজখ গমন নিশ্চিত। তিনি স. বললেন, ভুল বলেছো তুমি। হাতেব কখনো দোজখে যাবে না। কারণ, সে বদরে এবং হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলো। হজরত আলীর মাধ্যমে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাতেব বিন আবী বালতা একবার মুসলমানদের গোপন সিদ্ধান্তের সংবাদ উল্লেখ করে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন মক্কায় অবস্থিত তাঁর নিকটাত্মীয়দের উদ্দেশ্যে। রসুল স. তা জানতে পেরে হজরত আলীকে পাঠিয়ে পথিমধ্যেই আটক করিয়েছিলেন পত্রবাহককে। হজরত আলী পত্রটি ছিনিয়ে এনেছিলেন। তখন হজরত ওমর বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অনুমতি প্রদান করুন, আমি হাতেবের মস্তক ছেদন করি। রসুল স. বলেছিলেন, সে কি বদরে অংশ গ্রহণ করেনি? আল্লাহ্পাকতো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে জানিয়েই দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। আরো জানিয়েছেন, তোমাদের জন্য জান্নাত অনিবার্য। এ বিষয়ের হাদিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ফাতাহ্ এবং সুরা মুমতাহিনার তাফসীরে।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধে শহীদ হলেন হজরত হারেসা বিন জায়েদ। তাঁর মা রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো জানেন হারেসা আমার কতো প্রিয়। সে

যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। আর যদি তা না হয় তবে আমি কী করবো তা বলে দিন। রসুল স. বললেন, জান্নাত তো একটি নয়— অনেক। আর তোমার পুত্রের জন্য নির্ধারিত হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। অন্য দু'টো বর্ণনায় এসেছে, তোমার ছেলে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ স্তরে। হজরত হারেসা কিন্তু যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হননি। তিনি তখন দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই সময় শত্রুর একটি তীর তাঁকে বিদ্ধ করে। ফলে তিনি শহীদ হয়ে যান। এভাবে শহীদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি লাভ করবেন শ্রেষ্ঠ জান্নাত— যার নাম জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতের সকল স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়েছে ওই জান্নাত থেকেই। এতে করে অনুমান করা যায় বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত কতো বেশী। আর যারা শত্রুর সঙ্গে জীবন-পণ লড়াই করে গাজী অথবা শহীদ হয়েছেন তাদের ফযীলত আরো কতো বেশী।

'তোমরা যা খুশী করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— বদর যোদ্ধাদের জন্য সকল কিছু বৈধ। কিন্তু এ রকম ধারণা শরিয়তের রীতি-নীতির পরিপন্থী। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, উল্লেখিত শুভ সংবাদটির অর্থ হবে এ রকম— বদর যুদ্ধের পূর্বে তোমরা যতো পাপই করে থাকো না কেনো, সে সকল পাপ আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ধারণাটিও ঠিক নয়। কারণ বদর যোদ্ধা হজরত হাতেব বিন বালতার গোপন চিঠি প্রেরণের ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের ছয় বছর পর। হজরত ওমর তখন তাঁকে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রসুল স. বলেছিলেন, সে তো বদর যোদ্ধা। আল্লাহ্পাক বদর যোদ্ধাদের সম্পর্কে বলেছেন— তোমরা যা খুশী করতে পারো, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ঘটনাটির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য শুভ সংবাদটির মর্মার্থ হবে— পূর্বাপর সকল অপরাধ মার্জনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব সময়ের সকল অপরাধ তো মার্জনা করা হয়েছেই, উপরন্তু মার্জনা করে দেয়া হবে তাদের ভবিষ্যতের সকল অপরাধ (যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়)। ।

দ্রষ্টব্যঃ বর্ণিত শুভ সংবাদটির প্রকৃত অর্থ এই— আখেরাতে বদর যোদ্ধাদেরকে পূর্বাপর কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু শরিয়ত বিগর্হিত কোনো কাজের জন্য পৃথিবীতে তাঁরা অব্যাহতি পাবেন— এ রকম কথা সুসংবাদটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, পৃথিবীর জীবন শরিয়তের বিধানের আওতায়। আর এই বিধান সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সর্বশ্রোতা বলেই তিনি তোমাদের সকল প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন শ্রবণ করেন। আর সর্বজ্ঞ বলেই জানেন সকলের অন্তরের নিয়ত।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এভাবে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন'। আলোচ্য বাক্যটি একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই

অনুক্ত উদ্দেশ্যটিসহ পূর্ণ বক্তব্যটি দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ষড়যন্ত্র অকার্যকর করতে। তাই তিনি এভাবে যুদ্ধের আয়োজন করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের দূরভিসন্ধি ও অপচেষ্টা অকার্যকর করে দিয়েছেন।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ছা'লাবা থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক ও আহম্মদ এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধ শুরুর পূর্বে যখন দুই পক্ষের সেনাবাহিনী কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, তখন আবু জেহেল বললো, হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে দল আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করেছে এবং আমাদের মধ্যে যে দল নিকৃষ্ট, সেই দলকে তুমি ধ্বংস করে দাও। তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ১৯

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ○

❒ তোমরা সত্যের জয় চাহিয়াছিলে, তাহা তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদিগের দল সংখ্যায় অধিক হইলেও তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ বিশ্বাসীদিগের সহিত রহিয়াছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে।' উল্লেখ্য যে, এই বিজয় কামনাই ছিলো আল্লাহ্তায়ালার নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এর প্রেক্ষিতের পরক্ষণই তাই আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন 'তা তো তোমাদের নিকট এসেছে' (তোমাদের মনোস্কামনা পূর্ণ করা হয়েছে)।

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বর্ণনা করেছেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে দেখলাম আমার দু'পাশের দুই সহযোদ্ধাই কিশোর। কিছুটা আশাহত হলাম আমি। ভাবলাম, পূর্ণ যুবক অথবা বয়স্ক যোদ্ধা আমার পাশে থাকলে কতইনা উত্তম হতো। হঠাৎ ডান পাশের কিশোরটি এগিয়ে এসে বললো, হে পিতৃব্য! আপনি কি আবু জেহেলকে চেনেন? আমি বললাম হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তার কথা জিজ্ঞেস করছো কেনো? সে বললো, সে নাকি আল্লাহ্র রসুলকে মন্দ বলে।

আল্লাহ্‌র কসম! তার সঙ্গেই বুঝাপড়া করতে চাই আমি। হয় সে মরবে। না হয় আমি। বাম পাশের কিশোরটি এগিয়ে এসে একই কথা বললো আমাকে। আমি বিস্মিত হলাম। এমন সময় বীর দর্পে সম্মুখে এগিয়ে এলো আবু জেহেল। এই কবিতাটি আওড়াচ্ছিলো সে— মা তানকিমুল হারবুল আওয়ানু মিন্নি বাজিলু আম্মাইনি হাদিদু মিন্নী (বর্ষনাসিক্ত রণভূমি আমার নিকট থেকে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? ফেঁসে গেছে আমার নবজীবনের দু'টি বছর)। আমি কিশোরদ্বয়কে বললাম, ওই দেখো, ওই লোকটিই আবু জেহেল। আমার কথা শোনা মাত্র তারা দু'জনেই তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবু জেহেলের উপর এবং তাকে হত্যাও করে ফেললো অল্পক্ষণের মধ্যে। তারপর ছুটে এসে রসুল স.কে একথা জানালো। কিশোরদ্বয়ের নাম মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ এবং মুয়াওবিজ বিন আফরা। রসুল স. আবু জেহেলের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের পোশাক ওই কিশোরদ্বয়কেই দান করে দিলেন।

হজরত আনাস থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন সংবাদ নিয়ে এসো আবু জেহেল এখন কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে? হাকেমের বর্ণনা অনুসারে আজ্ঞা পালনার্থে অগ্রসর হলেন হজরত ইবনে মাসউদ। ঘটনা স্থলে গিয়ে তিনি দেখলেন, আফরার দুই পুত্র আবু জেহেলকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। কিন্তু গুরুতর আহত আবু জেহেল তখনো মরেনি। হজরত ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, কী ব্যাপার আবু জেহেল! (খুব তো অহংকার করেছিলে)। আবু জেহেল বললো, যারা স্বসম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের দ্বারা হত্যা করায় (কুরায়েশকে হত্যা করায় অকুরায়েশ দ্বারা), তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে?

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু উবায়দা বিন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, বদরের যুদ্ধে তলোয়ারের আঘাতে হাঁটু ভেঙে গিয়েছিলো আবু জেহেলের। ফলে ভূতলশায়ী হয়ে পড়েছিলো সে। তখন তার তলোয়ার দিয়েই আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রসুল স. ওই তলোয়ারটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, বর্ণনাটি একটি বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত। ওই বর্ণনায় এসেছে রসুল স. আবু জেহেলের যুদ্ধ সরঞ্জামগুলো দান করেছিলেন আফরার দুই পুত্রকে।

উপরে বর্ণিত হাদিস দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার্থে এ রকম বলা যেতে পারে যে, রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে দান করেছিলেন কেবল তলোয়ারটি। আর আফরার পুত্রদ্বয়কে দান করেছিলেন অপর সরঞ্জামগুলো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ বলেছেন, যুদ্ধের শেষ দিকে রসুল স. আবু জেহেলের লাশ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদন জানালেন, আয় আল্লাহ্! তোমার প্রতি

অশেষ কৃতজ্ঞতা, সে তোমার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেনি। একথা শুনে আমি খুঁজতে খুঁজতে আবু জেহেলের নিকট পৌঁছলাম। সে তখন মরণোন্মুখ। আমার তলোয়ারের আঘাতে সাঙ্গ হলো তার জীবন লীলা। তার ছিন্ন ভিন্ন শরীর থেকে কেটে আলাদা হয়ে পড়লো পায়ের নিম্নাংশ। তখন আবু জেহেলের পুত্র ছুটে এসে তলোয়ার চালালো আমার উপর। কেটে গেলো আমার বাহুমূল। কেবল চামড়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঝুলতে থাকলো আমার হাতটি। ওই ঝুলন্ত হাত নিয়েই আমি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলাম। একটি হাত দিয়েই করতে থাকলাম শত্রুর মোকাবিলা। ঝুলন্ত হাতটির কারণে অসুবিধা হচ্ছিলো খুব। তাই পায়ের নিচে চেপে ধরে একটানে শরীর থেকে আলাদা করে ফেললাম হাতটিকে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আরো এসেছে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের খেলাফতের সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন হজরত মুয়াজ। কাযী আয়ায তাঁর 'আল উয়ুন' গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় বলা হয়েছে, যুদ্ধ শেষে হজরত মুয়াজ তাঁর কর্তিত হাতটি নিয়ে রসুল স. সকাশে উপস্থিত হলেন। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখের লালা দিয়ে হাতটি জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এই বর্ণনাটি কাযী আয়ায তাঁর 'আশ্‌শিফা' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, আবু জেহেল উপুড় হয়ে পড়েছিলো। তার এ রকম শোচনীয় অবস্থা হয়েছিলো হজরত মুয়াজ বিন আফরার অস্ত্রাঘাতে। এরপর হজরত মুয়াজ শহীদ হন। একটু পরে হজরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, প্রায় নিঃসাড় আবু জেহেল উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তখনও মরেনি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমি তখন তার গর্দানের উপর পা রেখে বললাম, রে আল্লাহ্র দুশমন! আল্লাহ্ তোকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে বলে উঠলো, কীভাবে লাঞ্ছিত করলেন? তুই যাকে হত্যা করেছিস, তার চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করেছে কে? (সে তো নিহত হতে চলেছে স্বগোত্রের অস্ত্রাঘাতে)। এবার বল্, যুদ্ধে জয়লাভ হলো কার? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ উল্লেখ করেছেন, আবু জেহেল আমাকে বললো, ওহে ছাগলের রাখাল, বড়ই দুঃসাহস তোর। তুই তো আরোহণ করেছিস পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে (আমার বক্ষদেশ তো সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গের মতো)। আমি তখন তার মস্তক ছেদন করে রসুল স. এর খেদমতে হাজির করলাম। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এই দেখুন আল্লাহ্র দুশমন আবু জেহেলের মস্তক। তিনি স. বলে উঠলেন, সেই সত্তাই পবিত্রাতিপবিত্র! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার কসম! তিনিই একমাত্র এবং একক মাবুদ।

অপর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সেজদায় পতিত হলেন। আর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তখন আল্লাহ্পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন।

কাতাদা থেকে ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে ফেরাউন সৃষ্টি করা হয়। আর এই উম্মতের ফেরাউন হচ্ছে আবু জেহেল। এর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। আফরার পুত্রদ্বয় একে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে ফেরেশতারাও। আর এর মস্তক ছেদন করেছে ইবনে মাসউদ।

হজরত ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, মুশরিকেরা বলেছিলো, মোহাম্মদের ধর্মকে আমরা সত্য বলে মনে করি না। হে আল্লাহ্! এই যুদ্ধে সত্যকে বিজয়ী করে দাও। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে—'তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে।'

সুদ্দী এবং কালাবীর বর্ণনায় এসেছে— বদর যুদ্ধে রওনা হওয়ার পূর্বে মুশরিকেরা কাবাগৃহের গেলাফ ধরে বলেছিলো, যদি যুদ্ধ হয়, তবে যে ধর্ম ও যে দল উত্তম, সেই ধর্ম ও সেই দলকে তুমি বিজয়ী কোরো। তাদের এমতো প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত উবাই বিন কা'ব বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে। ইসলাম যে সত্য ধর্ম— সে বিষয়ে তাঁদের বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ ছিলো না। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন সত্যের পরিপূর্ণ বিজয়। তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই আয়াতে বলা হয়েছে— তোমরা সত্যের জয় চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের নিকট এসেছে।

স্বসূত্রে আল্লামা বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত কায়েস বিন হাব্বাব বলেছেন, হিজরত পূর্ব সময়ে রসুল স. একদিন কাবা গৃহের ছায়ায় শায়িত ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো অত্যাচারিত। অথচ আপনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন না। আমাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে কোনো দরখাস্তও পেশ করছেন না। একথা শুনেই উঠে বসলেন রসুল স.। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল তখন রক্তাভ। গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বে প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছে। কাউকে করা হয়েছে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত। লৌহদণ্ডের আঘাতে ভেঙে ফেলা হয়েছে কারো কারো পৃষ্ঠদেশের অস্থি। তবুও তারা ছিলেন সত্যধর্মে অবিচল। উত্তমরূপে অবগত হও, জীবন কণ্ঠাগত হলেও সত্যাধর্মকেই করতে হবে একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহ্পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেনই। অতএব তোমরা ত্বরাপ্রবণতা পরিত্যাগ করো। বিজয়ের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিজয়াভিলাষী হয়ো না। এমন সময় আসবে, যখন সানা-আর দূর্গের প্রাকার থেকে হাদ্বরা মাউত পর্যন্ত হবে তোমাদের নিঃশঙ্কচিত্ত পদচারণা। আল্লাহ্র ভয় ছাড়া কোনো ভয়ই তখন থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে— যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় করো তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, এবং

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সঙ্গে রয়েছেন। একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! যদি তোমরা আল্লাহ্র ও রসুলের নির্দেশের যথামূল্যায়ন থেকে বিরত হও, তবে তা হবে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর যদি তোমরা তার নির্দেশনার যথাগুরুত্ব দিতে অস্বীকৃত হও, তবে আমি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করবো শাস্তি। তখন তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো কাজে আসবে না। অতএব বিশ্বাসে স্থিত হও। লোকবল এবং যুদ্ধোপকরণের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করো আল্লাহ্র উপর। একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করো তাঁর রসুলের নির্দেশনার। এটাই বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য। এ রকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশ্বাসীদের সঙ্গেই রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সর্বাত্মক সাহায্য।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ○ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না;

❒ এবং তোমরা তাহাদিগের ন্যায় হইও না যাহারা বলে 'শ্রবণ করিলাম'; বস্তুতঃ তাহারা শ্রবণ করে না।

❒ আল্লাহের নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধির ও মুক যাহারা কিছুই বুঝে না।

❒ আল্লাহ্ যদি তাহাদিগের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতেন তবে তিনি তাহাদিগকেও শুনাইতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেও তাহারা উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইত।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। একথাও মনে রেখো যে, রসুলের আনুগত্যই আল্লাহ্র আনুগত্য। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর নিকট থেকে জেহাদের নির্দেশপ্রাপ্ত হও (শ্রবণ করো), তখন সে নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

দ্বিতীয়টির (২১) মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! দ্যাখো মুনাফিকদের অবস্থা। তারা রসুলের নির্দেশ শুনে বলে, আমরা শুনলাম (মান্য করলাম), কিন্তু তারা শোনেনা (মান্য করে না)। ওই সকল মুনাফিকদের মতো তোমরা হয়ো না।

তৃতীয়টির (২২) মর্মার্থ হচ্ছে— শোনো হে বিশ্বাসীরা! ওই সকল মুনাফিক আল্লাহ্‌পাকের নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সত্য কথা শুনতে তারা আগ্রহী নয়। তাই কান থাকা সত্ত্বেও তারা শ্রুতিশক্তিহীন, বধির। সত্য কথা বলতেও তারা অনাগ্রহী। তাই তারা বাকশক্তিহীন— মুখ থাকা সত্ত্বেও। আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকেও দিয়েছিলেন, সত্য শ্রবণের এবং সত্য উচ্চারণের যোগ্যতা। কিন্তু সে যোগ্যতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী আবদুদ্‌দার গোত্রের লোকদেরকে লক্ষ্য করে। তারা বলতো, আমরা মোহাম্মদের আনীত ধর্মের কথা শুনবোই না। এ সম্পর্কে কোনো কথাও বলবো না। মাত্র দু'জন বাদে ওই গোত্রের সকল লোক উহুদ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। কেবল বেঁচে গিয়েছিলেন মুস্‌আব বিন উমাইর এবং সুবিত বিন হারমেলা। তারা দু'জনই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষোক্ত আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন, কিন্তু তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা ভরে মুখ ফিরিয়ে নিতো।' একথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, অবিশ্বাসীরা (কাফেরেরা) এবং কপট বিশ্বাসীরা (মুনাফিকরা) সৃষ্টিগতভাবে হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতা রহিত। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তারা সত্যচ্যুত। তাই তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ সত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত। আল্লাহ্‌পাকও তাই চান না যে তারা সত্যের আহ্বান শুনুক এবং সত্যকে উপলব্ধি করুক। কারণ প্রত্যাখ্যান ও উপেক্ষা হচ্ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি।

রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, কিছু লোক পুণ্যকর্ম করতে করতে পৌঁছে যায় জান্নাতের অতি নিকটে। জান্নাতের সঙ্গে তাদের ব্যবধান থাকে মাত্র এক হাত। শেষে তকদীর প্রবল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তারা শুরু করে দোজখবাসীদের মতো আমল— অবশেষে প্রবেশ করে দোজখে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কুরায়েশরা একবার রসুল স. কে বললো, আমাদের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ কুসাই ছিলেন অত্যন্ত সৌভাগ্য-শালী। হে মোহাম্মদ! তুমি তাঁকে জীবিত করে দেখাও। তিনি যদি তোমাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন, তবে আমরাও তোমাকে নবী বলে মান্য করবো। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই বর্ণনার ভিত্তিতে আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে এ রকম— আল্লাহ্‌তায়ালা ভালো করেই জানেন যে, অংশীবাদী কুরায়েশরা সত্যকে স্বীকার করবে না। কারণ তারা সৃষ্টিগতভাবেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই কুসাইকে জীবিত করে তার অভিমত শুনিয়ে দিলেও তারা সত্যের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করবে। আগের মতোই থেকে যাবে সত্যবিমুখ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

❐ হে বিশ্বাসিগণ! রসুল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে তখন আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'হে বিশ্বাসীগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিবে।' সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'প্রাণবন্ত করে এমন কিছুর দিকে'—কথাটির অর্থ, ইমানের দিকে। কারণ, ইমানই ইমানদারদেরকে প্রাণবন্ত করে। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' অর্থ, কোরআনের দিকে। কেননা কোরআনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত প্রাণবন্ততা— ইহকাল ও পরকালের কল্যাণময় জীবন। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য— সত্যের দিকে। ইবনে ইসহাক বলেছেন— জেহাদের দিকে। কেননা জেহাদের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত জীবন, প্রভূত সম্মান। কুতাইবী বলেছেন, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' কথাটির অর্থ হবে শাহাদাতের দিকে। কারণ শহীদগণই অক্ষয় প্রাণবন্ততার অধিকারী। তাই অন্য এক আয়াতে ঘোষিত হয়েছে— 'বাল আহ্‌ইয়াউন্ ইন্‌দা রব্বিহিম ইউরজাকুনা ফারিহীন' (বরং তারা জীবিত তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদেরকে জীবনোপকরণ দেয়া হয় প্রসন্নতার সঙ্গে)।

আমি বলি, এখানে 'এমন কিছুর দিকে' কথাটির অর্থ হবে— রসুল স. এর সকল নির্দেশের দিকে। কেননা রসুল স. এর সকল নির্দেশই বিশ্বাসীগণকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দিলে অন্তর জীবন্ত হয়। আর সাড়া না দিলে অন্তর হয় মৃত। সুতরাং মৃত্যুর নিথরতাতুল্য উদাসীনতাকে অতিক্রম করে জাগ্রতজীবনের অধিকারী হতে গেলে রসুল স. এর ডাকে সাড়া দিতেই হবে। অন্যথায় নিজেকে বিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করা যাবে না।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত উবাই বিন কা'ব একবার নামাজ পাঠ করছিলেন। রসুল স. তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে ডাকলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে হাজির হলেন

রসুল স. এর নিকটে। রসুল স. বললেন, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলে না কেনো? হজরত উবাই বিন কা'ব বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি যে নামাজ পড়ছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি আল্লাহ্পাকের এই ঘোষণাটি শোনোনি— 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানুস্ তাজীবু লিল্লাহি ওয়ার্ রসুলি ইজা দায়াকুম লিমা ইউহ্ইকুম' (হে বিশ্বাসীগণ! রসুল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দিবে)। হজরত উবাই বিন কা'ব বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরপর থেকে আমি নিশ্চয় এই নির্দেশের অন্যথা করবো না।

মাসআলাঃ কোনো কোনো আলেম বলেছেন, নামাজরত অবস্থায় রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দিলে নামাজ ভঙ্গ হবে না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রসুল স. জরুরী কোনো কাজে তলব করলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিকটে উপস্থিত হতে হবে। প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর শক্তিশালী। এখানে একথাটিও প্রণিধানযোগ্য যে, যে কোনো জরুরী প্রয়োজনে নামাজ ছেড়ে দেয়া জায়েয। যেমন, নামাজরত অবস্থায় যদি কেউ দেখে কোনো অন্ধ কূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এক্ষুণি তাকে না আটকালে কূপের মধ্যে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে ওই অন্ধকে রক্ষা করতে হবে। অন্যান্য দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও এ রকম করা সিদ্ধ। রসুল স. এর আহ্বানে সাড়া দেয়ার ব্যাপারটি কিন্তু এ রকম নয়। তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া বিশ্বাসীদের জন্য অত্যাবশ্যক।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান করেন।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! জেনে রাখো, আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় অবস্থান মানুষ ও তার হৃদয়ের মধ্যে। সুতরাং দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে বরণ করো। মৃত্যুর পর তোমরা এ সুযোগ আর পাবে না। এই পৃথিবীই পুণ্যকর্মের স্থান। তাই এখানেই তোমরা হও বিশুদ্ধচিত্ত। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, হে বিশ্বাসীরা! সকল মানুষের হৃদয়ে রয়েছে দীর্ঘ জীবনের বাসনা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সকলের হায়াত। সুতরাং তোমরা দীর্ঘ হায়াতের ভরসায় তোমাদের পুণ্যকর্মকে বিলম্বিত কোরো না। এ রকম মনে কোরো না যে, আজ নয়, পুণ্যকর্ম করবো আগামীকাল।

এক আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'নাহ্নু আক্রাবু ইলাইহি মিন হাবলিল্ ওয়ারিদ্' (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। আলোচ্য আয়াতেও বলা হয়েছে— আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করেন। মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালার এই নৈকট্যের ধরন অজ্ঞাত। এ রকম

নৈকট্যের ঘোষণার মধ্যে এই নির্দেশনাটি নিহিত রয়েছে যে— হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল রহস্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় করো ও ভালোবাসো। একনিষ্ঠ আনুগত্য করো তাঁর ও তাঁর রসুলের। না করলে তোমাদের সকল কামনা বাসনা হয়ে যেতে পারে নিষ্ফল— যদি আল্লাহ্তায়ালা সে রকম চান। কারণ তিনি তোমাদের অন্তর ও বাহিরের সকল কিছুর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছাময়। অভিপ্রায় বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, স্বাধীন, পবিত্র। তিনি যাকে সৌভাগ্যশালী করতে চান, সে-ই হয় সৌভাগ্যশালী। আর যাকে করতে চান হতভাগ্য, সে অবশ্যই হয় দুর্ভাগা। তাই বিশ্বাসীদের কর্তব্য হচ্ছে অনিশ্চিত এই জীবনের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। প্রতিটি মুহূর্ত অন্তরে আল্লাহ্র জিকির জাগ্রত রাখা। পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকা। আর এ সকলের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট তৌফিক প্রার্থনা করা।

হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এই দোয়াটি অত্যধিক উচ্চারণ করতেন—'ইয়া মুক্বাল্লিবাল্ কুলুব্ ছাব্বিত ক্বালবি আ'লা দ্বীনিকা'(হে হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো)। সাহাবায়ে কেরাম একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো আপনার আনীত ধর্মে বিশ্বাস করেছি। ভবিষ্যতে কি আমাদের এই বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা রয়েছে? তিনি স. বললেন, হৃদয় তো আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তিনি যেভাবে চান, সেভাবেই হৃদয়ের আবর্তন-বিবর্তন ঘটান। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত ইবনে ওমরের মারফু বর্ণনায় এসেছে, আদম সন্তানদের অন্তর পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার পরিপূর্ণ অধিকারে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা অন্তরের পরিবর্তন ঘটান। রসুল স. প্রার্থনা করতেন, হে আমাদের আল্লাহ্! হে আমাদের অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার নির্দেশমুখী করে দাও (তোমার নির্দেশ প্রতিপালনার্থে আমাদের অন্তরগুলোকে একত্রিত করে দাও)। মুসলিম।

হজরত ওমর বিন খাত্তাব একদিন দেখলেন, এক যুবক প্রার্থনা করছে— হে আমার আল্লাহ্! তুমি মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করো। অতএব, তুমি পাপ ও আমার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যাও, যেনো কোনো পাপকর্ম করবার সুযোগ ও ক্ষমতা আমি না পাই। একথা শুনে হজরত ওমর তাঁকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তোমার প্রার্থনা পূরণ করুন।

শেষে বলা হয়েছে—'এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! আরো শুনে নাও, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, পাপী-পুণ্যবান— সকলকে পুনরুত্থান দিবসে একত্রিত করা হবে। তখন পুণ্যবানদেরকে দেয়া হবে পুণ্যের যথা পুরস্কার। আর পাপীদেরকে দেয়া হবে উপযুক্ত শাস্তি।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৫

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

❐ তোমরা এমন ফিত্‌নাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জালিম কেবল তাহাদিগকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

অত্যাচারীকে বাধাদান না করলে অত্যাচার ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। অত্যাচারের ওই ব্যাপক বিস্তৃতিকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ফেত্‌না। নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, ওই ফেত্‌নাকে ভয় করো। আত্মরক্ষা করো ওই ভয়াবহ বিশৃংখলা থেকে। কারণ ওই ফেত্‌না কেবল অত্যাচারীদের উপর আপতিত হবে না। আপতিত হবে পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ এই যে, কোনো অন্যায়কে স্থায়ী হতে দেয়া যাবে না। অন্যথায় আল্লাহ্‌তায়ালা শাস্তি অবতীর্ণ করবেন সাধারণভাবে। ওই শাস্তি পতিত হবে পাপাচারী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক ঘোষণা করেছেন, হে মানুষ! তোমরা এই আয়াতের নির্দেশনা প্রতিপালনে যত্নবান হও— তোমরা এমন ফেত্‌নাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে বাধা না দিলে এ রকম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে সকলের প্রতি অবতীর্ণ করবেন শাস্তি। অন্য খলিফাত্রয়ও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি শুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেছেন— উত্তম ও বিশুদ্ধ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, হে মানুষ! তোমরা কল্যাণের নির্দেশনা দাও এবং অকল্যাণ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হও। এমন সময় আসবে, তোমরা আত্মরক্ষার জন্য দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। পাপ মার্জনার জন্য তোমরা প্রার্থনা জানাবে, অথচ তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। সুতরাং মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে

থাকো এবং বাধাদান করো অসৎকর্ম থেকে। তাহলে তোমাদের জীবন এবং সম্পদ নিরাপদ থাকবে। ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমেরা যখন 'সৎকর্মের নির্দেশ দান এবং অসৎ কর্মে বাধাদান'—এই নির্দেশটিকে উপেক্ষা করেছিলো, তখন তাদের পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত হয়েছিলো অভিসম্পাত। তাদের আপামর জনতা তখন সাধারণভাবে ভোগ করেছিলো আল্লাহ্তায়ালার শাস্তি। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আল্লামা ইস্পাহানী।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং জননী আয়েশা থেকে আদী বিন আদী কুনদীর পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ্তায়ালা সর্ব সাধারণের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে কোনো অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে বাধা দান না করলে সর্বসাধারণের উপর নেমে আসে আযাব। বাগবী।

হজরত নোমান ইবনে বশীরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশের সীমারেখা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের দৃষ্টান্তটি এ রকম— একটি দ্বিতল জাহাজের যাত্রীরা লটারীর মাধ্যমে তাদের দোতলা ও একতলার অবস্থান নির্ধারণ করলো। পানির ব্যবস্থা ছিলো দোতলায়। নিচের তলার লোকদেরকে উপরতলা থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে হতো। কাজটি ছিলো শ্রমসাধ্য। উপরতলার লোকেরাও এতে করে বিরক্তি প্রকাশ করতে শুরু করলো। নিচের তলার লোকেরা ভাবলো, জাহাজের তলা ফুটো করলেই তো পানি পাওয়া যায়। অযথা উপরে ওঠা নামা করতে হয় না। এই ভেবে তারা জাহাজের তলা ফুটো করতে শুরু করলো। উপরের লোকেরা বললো, তোমরা অমন করছো কেনো? নিচের লোকেরা বললো, উপরে ওঠা নামা করতে আমাদের কষ্ট হয়। তোমরাও বিরক্ত বোধ করো। এমতাবস্থায় উপরের লোকেরা যদি নিচের লোকদেরকে বাধা না দেয়, তবে সকলেরই সলিল সমাধি ঘটবে। বোখারী।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ রকম মনে করা ঠিক হবে না যে, অন্যায়কারীদের পাপ যারা অন্যায় করে না তাদের উপরে বর্তাবে। বরং হাদিসগুলোর মর্মার্থ হবে এ রকম— পাপের শাস্তি আপতিত হবে কেবল পাপীদের উপর। আর যারা সামনে পাপ সংঘটিত হতে দেখেও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা কথার মাধ্যমে পাপীদেরকে পাপকর্ম থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা না করবে, তারা 'সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ'—এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তারা শাস্তিযোগ্য হবে না। এ সম্পর্কে শনিবারে মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞা লংঘনকারীদের ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে একটি দল শনিবারে মৎস্য শিকার করেছিলো। দ্বিতীয় দলটি সদুপদেশ দানের মাধ্যমে তাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলো। আর তৃতীয় দলটি নিষেধাজ্ঞা লংঘন যেমন করেনি, তেমনি

লংঘনকারীদেরকে বাধা প্রদানও করেনি। এই তিন দলের মধ্যে শাস্তিদান করা হয়েছিলো কেবল নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী দলটিকে। অপর দল দু'টোকে শাস্তি দেয়া হয়নি। অতএব, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে এ রকম বলা যায় না যে, পাপের শাস্তি পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপরে আপতিত হবে। তাই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ফেত্না সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— তোমরা এমন ফেত্নাকে ভয় করো, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না।

ফেত্না অর্থ— যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশৃংখলা, লুণ্ঠন ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। এ রকম ফেত্না দ্বারা আপামর জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন যে, অচিরেই শুরু হবে ফেত্না ফাসাদ। ওই ফেত্নাকে প্রতিহত করতে হবে। প্রতিহত না করলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিসাধিত হবে জীবন ও সম্পদের। তীব্র হয়ে উঠবে কলহ, বিবাদ-বিসংবাদ ও মতভেদ।

হাসান বসরীর বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আলী, হজরত আম্মার, হজরত তালহা এবং হজরত যোবায়েরের মতবিরোধকে লক্ষ্য করে। হজরত আলীর খেলাফতের সময় তাঁদের মতবিরোধ পারস্পরিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো।

মাতরাফের বর্ণনায় এসেছে, আমি হজরত যোবায়েরকে একবার বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনি ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর পক্ষে দাঁড়াননি কেনো? খলিফার শাহাদাতের পর আপনিই তো আবার তাঁর রক্তের প্রতিশোধের (কিসাসের) দাবি তুলেছিলেন। হজরত যোবায়ের বললেন, আমি 'তোমরা এমন ফেত্নাকে ভয় করো.....' এই আয়াতটি এতদিন ধরে তেলাওয়াত করে এসেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি এই আয়াতে উল্লেখিত 'ফেত্না' আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে। এখন বুঝতে পারছি আমিই ছিলাম এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল। রসুল স.ও এই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। ফেত্না পরিগ্রহ করেছিলো তার চরম রূপ। তাই জংগে জামালে আলী ও আমি হয়েছিলাম পরস্পরের প্রতিপক্ষ। সুদ্দী, জুহাক এবং কাতাদার মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে।

আমি বলি, জেহাদের প্রতি অনাগ্রহকে আলোচ্য আয়াতে ফেত্না বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন মুসলমানদের ইমামের পক্ষ থেকে জেহাদের আহ্বান জানানো হয়, তখন সে আহ্বানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলে তা হবে ফেত্না। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পছন্দ করেনি (আয়াত ৫)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না

(আয়াত ১৫)। আর এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— হে বিশ্বাসীগণ! রসুল স. যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে (আয়াত ২৪)।

উদ্ধৃত আয়াতগুলোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— ফেত্না দমনার্থে জেহাদ করতে হবে। অন্যথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর নেমে আসবে চরম মুসিবত। আর জেহাদের ময়দানে শৈথিল্যকেও প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। যেমন উহুদ যুদ্ধে তীরন্দাজ বাহিনীর শিথিলতা ও অসতর্কতার কারণে মুসলিম বাহিনীর অনেককে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিলো। রসুল স. এর পবিত্র অবয়ব হয়েছিলো রক্তে রঞ্জিত। সে কারণেই আলোচ্য আয়াতের প্রথমেই ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, ফেত্নার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার কথা। বলা হয়েছে ফেত্নার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আম খাস সকলেই।

ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করাও এই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— (পিপীলিকাদের নেতা বললো) 'হে পিপীলিকারা! তোমরা আপনাপন গর্তে প্রবিষ্ট হও। অন্যথায় সুলায়মানের সেনাবাহিনীর পদতলে পিষ্ট হবে।' ফেত্নাকে ভয় করে এভাবে আত্মরক্ষা করাও আলোচ্য আয়াতের নির্দেশ হওয়া সম্ভব।

আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, আমার মতে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে এ রকম— ফেত্না ফাসাদ ছড়িয়ে পড়লে তোমাদের মধ্যে যারা জালেম, কেবল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবাই। আমি বলি, এখানে বিপদ, মুসিবত থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটি শর্ত অনুক্ত রয়েছে। সেই শর্তটি হচ্ছে— ফেত্নার মোকাবিলা করা অথবা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা ফেত্নার ভয়াবহতা অনুধাবন করো। ফেত্নাকে প্রতিহত করো অথবা ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করো। এই শর্তটি প্রতিপালন করলে ফেত্না থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। এটা সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। মনে রেখো, ফেত্নাজাত বিপদ-মুসিবত সাধারণ, বিশেষ— সকল শ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করে। পিপীলিকাদের নেতার কথায়ও এ রকম শর্তের উল্লেখ রয়েছে। সে শর্তটি হচ্ছে গর্তে প্রবেশ করার শর্ত। অর্থাৎ এই শর্তটি' পালন করলে ফেত্না থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—'আসলিম তাদ্খুলিল জান্নাতি' (ইসলাম গ্রহণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে)। এখানেও জান্নাত গমনের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামকে। ইতোপূর্বেও আমরা এ রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। একথাটিও উল্লেখ করেছি যে পাপের শাস্তি পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর আপতিত হয় না। এ রকম ধারণা কোরআন ও হাদিসের বিরোধী। ঐকমত্যেরও পরিপন্থী। 'লা

তাজিরু ওয়াজিরাতাই উইজ্‌রা উখ্‌রা'—এই আয়াতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পাপীদের পাপের বোঝা কখনও পাপহীনেরা বহন করে না। অতএব একথা মেনে নিতে হবে যে, এখানে ফেত্‌না অর্থ জেহাদের প্রতি বৈমুখ্য, যুদ্ধ প্রান্তর থেকে পলায়ন ইত্যাদি। সুতরাং জেহাদ অত্যাবশ্যক।

সবশেষে বলা হয়েছে—'এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্‌তায়ালা যে শাস্তিদানে কঠোর সে কথা ভুলে যেয়ো না। জেহাদের নির্দেশ বাস্তবায়ন করো। আল্লাহ্‌তায়ালার কঠিন আযাবের ভয়ে বিরত থাকো ফেত্‌না থেকে।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৬

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

❑ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; তোমরা আশংকা করিতে যে লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ওয়াজ্‌কুরু (স্মরণ করো) বলে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুহাজির সাহাবীগণকে— যারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। বলা হয়েছে—'তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল বলে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে লোকেরা তোমাদেরকে অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে।' একথার অর্থ— হে মুহাজিরবৃন্দ! কিছুদিন পূর্বের কথা স্মরণ করো। তোমরা ছিলে নগণ্য সংখ্যক। তোমরা আশংকা করতে, যে কোনো মুহূর্তে মক্কার অংশীবাদী কুরায়েশরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। এখানে আন্‌নাস (লোকেরা) অর্থ— মক্কার প্রতাপশালী কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু শায়েখ লিখেছেন একবার রসুল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই আয়াতে আন্‌নাস (লোকেরা) বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি স. বললেন, পারস্যবাসীদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ দান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' একথার অর্থ— হে মুহাজিরবৃন্দ! এরপর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে আশংকামুক্ত করেন। দান করেন মদীনার নিরাপদ আশ্রয়। স্বীয় সাহায্য দ্বারা বিশ্বাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং দান করেন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ— যা অতীতের কোনো উম্মতের জন্য হালাল ছিলো না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'স্মরণ করো' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সমগ্র আরববাসীকে। প্রথমে আরবে ইসলাম ছিলো হত দরিদ্র অবস্থায়। ওদিকে রোম ও পারস্যের অধিবাসীরা ছিলো পরস্পর পরস্পরের শত্রু। তৎকালীন সময়ে রোম ছিলো পারস্য রাজ্যের অধীন। আবার রোম ও পারস্য দু'টো রাজ্যই ছিলো আরবের শত্রু। রসুলুল্লাহ্ স. এর মহাআবির্ভাবের পর তাঁর আনীত ধর্মমতের মাধ্যমে আরব হয়ে উঠতে শুরু করলো উত্তরোত্তর শক্তিশালী। ক্রমে ক্রমে রসুল স. কে কেন্দ্র করে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ালো আরব ভূখণ্ড। এভাবে আল্লাহ্পাক স্বীয় সাহায্যে আরব ভূখণ্ডকে করলেন শক্তিমান।

সাঈদ বিন মনসুরের বর্ণনাসূত্রে বাগবী লিখেছেন, আবদুল্লাহ্ বিন আবী কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বনী কুরায়জাকে অবরোধ করে রাখলেন একুশ দিন। অবরুদ্ধ ইহুদীরা আবেদন জানালো, হে মুসলমানদের রসুল! আপনি যে সকল শর্তের মাধ্যমে বনী নাজিরের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন, ওই সকল শর্তের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করুন। তাদেরকে আপনি সিরিয়ার আজরুয়াত এবং আরীহা অঞ্চলে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেছেন। আমাদেরকেও তেমনি অনুমতি প্রদান করুন। রসুল স. তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। বললেন, তোমরা সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ হিসেবে মানো। আমরাও তাকে মানলাম। দূর্গ থেকে বের হয়ে এসো। সা'দ বিন মুয়াজ যে সিদ্ধান্ত দান করবে, সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হও। বনী কুরায়জা এর কোনো উত্তর না দিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করলো হজরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজিরকে। কিন্তু তাঁর পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদকে আটকে রেখে দিলো দূর্গের মধ্যে। হজরত সা'দ বিন মুয়াজ এবং হজরত লুবাবা— দু'জনেই ছিলেন ইহুদী সম্প্রদায়ভূত। কিন্তু তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হয়েছিলেন রসুল স. এর বিশিষ্ট সাহাবী। রসুল স. এর সঙ্গে বাক্যালাপের পর হজরত আবু লুবাবা আলোচনার ফলাফল জানানোর জন্য বনী কুরায়জার নিকটে গেলেন। বললেন, তোমরা যদি সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ মানো, তবে দূর্গ থেকে বের হয়ে এসো। রসুল স. তাকে সালিশ মেনেছেন। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর কণ্ঠদেশের দিকে ইশারা করে দেখালেন। অর্থাৎ ইশারায় বললেন, সা'দের নির্দেশেই তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদ করা হবে।

সাবিলুর রাশাদ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. হজরত আবু লুবাবাকে অবরুদ্ধ বনী কুরায়জার নিকট পাঠালেন। তাঁকে দেখে অবরুদ্ধ নারী ও শিশুরা কান্না জুড়ে দিলো। স্বজনদের কান্না দেখে হজরত আবু লুবাবার হৃদয় হয়ে উঠলো দয়ার্দ্র। কা'ব বিন আসাদ বললো, হে আবু লুবাবা! আমরা তো আপনাকে সালিশ নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে সা'দ বিন মুয়াজকে সালিশ নিযুক্ত করার কথা। আপনি কী বলেন? আমরা কি মোহাম্মদের প্রস্তাবানুসারে দূর্গ থেকে বের হয়ে আসবো? হজরত আবু লুবাবা বললেন, হ্যাঁ। একই সঙ্গে হাত দ্বারা নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ বুঝালেন, তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। হজরত আবু লুবাবা বলেছেন, এভাবে ইশারা করার পরক্ষণে আমার মনে হলো, একি করলাম আমি! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে প্রতারণা করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঠ করলাম— ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। চোখ ফেটে কান্না এলো আমার। শ্মশ্রু হয়ে গেলো অশ্রুসিক্ত। ওদিকে রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষমাণ। আমি দূর্গ থেকে বের হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে দূর্গের পিছন দিক দিয়ে অন্য রাস্তায় সোজা হাজির হলাম মসজিদে নববীতে। মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম আমার শরীরকে। প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই থাকবো। মনে মনে বললাম, হে আমার আল্লাহ্! দয়া করে আমার তওবা কবুল করো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু লুবাবা তখন বললেন, তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত আমি পানাহার করবো না। আর যদি তওবা কবুল না হয়, তবে এভাবেই স্বেচ্ছা-বন্দী অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো আমি। অল্পক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ পৌঁছে গেলো রসুল স. এর নিকটে। তিনি স. বললেন, যদি সে আমার কাছে আসতো, তবে আমি তার জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করতাম। সে যখন এ রকম করেনি, তখন আমিও তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবো না। তার ক্ষমাপ্রাপ্তির সংবাদ যদি আল্লাহ্তায়ালা আমাকে জানান, তবেই কেবল আমি তাকে মুক্ত করবো। সাতদিন কেটে গেলো। অনাহারক্লিষ্ট ও অনুতাপ জর্জরিত হজরত আবু লুবাবা বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর তওবা কবুল করলেন।

সাবিলুর রাশাদ্ গ্রন্থে আরো উল্লেখিত হয়েছে, ইবনে হাকাম বলেছেন, হজরত আবু লুবাবা মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন ছয় দিন। নামাজের সময় হলে তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর বাঁধন খুলে দিতেন। তিনি নামাজ পাঠ করতেন। পুনরায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলতেন নিজেকে।

হজরত ইবনে উকবার বর্ণনায় এসেছে, সম্ভবতঃ আবু লুবাবা স্বেচ্ছা-বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন বিশ দিন। বেদায়া গ্রন্থে এই অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তিনি স্বেচ্ছা-বন্দী ছিলেন পঁচিশ দিন।

ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনাসূত্রে মালেকের বিবরণে এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী বাকর বলেছেন, ছাগল বাঁধা দড়ি দিয়ে নিজেকে দশদিনেরও বেশী মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন আবু লুবাবা। শেষের দিকে তাঁর শ্রবণশক্তি এবং বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নামাজের সময় তাঁর কন্যা এসে বাঁধন খুলে দিতেন। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন, ওজু, নামাজ ইত্যাদি সেরে আবার খুঁটির সঙ্গে দাঁড়াতেন। তাঁর কন্যা আবার তাঁকে ছাগলবাঁধা দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতেন। কোনো কোনো সময় একাজ করতেন তাঁর স্ত্রী। এরপর অবতীর্ণ হলো— 'ওয়া আখারুনা' তারাফু বিজুনুবিহিম খলাতু আমালান সালিহাঁও আখারু সাইয়্যিআন আসাল্লহু আঁইইয়াতুবা আ'লাইহিম ইন্নাল্লহা গফুরুর রহীম'(আর অন্যেরা তাদের পাপের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। তারা মিশ্রিত করেছিলো পুণ্য ও পাপকে। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, করুণাময়)।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনাসূত্রে ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসিদ উল্লেখ করেছেন, রসুল স. জননী উম্মে সালমার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছিলেন। ওই সময় অবতীর্ণ হলো হজরত আবু লুবাবার তওবা কবুলের শুভসংবাদ সংক্রান্ত আয়াত। পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তখন। ভোরের আলোর মতো রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পবিত্র ওষ্ঠাধারে ফুটে উঠলো মৃদু হাসির রেখা। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আজ যে আপনি বড়ই হৃষ্টচিত্ত। কী ঘটেছে বলুন। তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে। জননী বললেন, আমি কি এই শুভসংবাদটি বহির্বাটির লোকদেরকে জানাতে পারবো না? তিনি স. বললেন, কেনো পারবে না? পর্দার হুকুম তখনও অবতীর্ণ হয়নি। তাই উম্মত জননী বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সন্তানকে বললেন, হে আবু লুবাবা! শুভ সমাচার শ্রবণ করো। আল্লাহ্পাক তোমার তওবা কবুল করেছেন। উপস্থিত লোকেরা একথা শুনে দৌড়ে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করতে গেলেন। তিনি বলে উঠলেন, না, তোমরা কেউ এদিকে এসো না। আল্লাহ্তায়ালার শপথ! স্বয়ং রসুল স. আমাকে বন্ধনমুক্ত করবেন। একটু পরে ফজরের নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে রসুল স. বাইরে এলেন এবং মুক্ত করে দিলেন হজরত আবু লুবাবাকে।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের বর্ণনাসূত্রে সুহাইল উল্লেখ করেছেন, হজরত সাইয়্যেদা ফাতেমা হজরত আবু লুবাবার রশি খুলে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবু লুবাবা বলে উঠেছিলেন, আমি এই মর্মে কসম খেয়েছি যে, রসুল স. ছাড়া আমি অন্য কারো দ্বারা বন্ধনমুক্ত হবো না। একথা শুনে রসুল স. বলেছিলেন, ফাতেমা তো আমারই অংশ (সে বন্ধনমুক্ত করলে তা হবে আমারই বন্ধনমুক্ত করার মতো)। এই বর্ণনাসূত্রভূত আলী বিন জায়েদ বিন জাযয়ান দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত। তাছাড়া ইমাম জয়নুল আবেদীনের এই বর্ণনাটিও মুরসাল। আর

তিনি তাঁর পিতামহী হজরত ফাতেমাতুজ্জোহরাকে দেখেননি। একথাও উল্লেখ করেননি যে, একথা তিনি কার কাছে শুনেছেন—পিতা ইমাম হোসাইন থেকে না পিতৃব্য ইমাম হাসান থেকে, না অন্য কোনো সাহাবী থেকে।

বন্ধনমুক্ত হবার পর হজরত আবু লুবাবা বললেন, সম্পদ ও স্বজনের আকর্ষণে আমি অন্যায় করেছিলাম। সুতরাং আমার সকল সম্পদ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমার তওবা পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। আমি আমার সকল সম্পদ দান করে দিবো। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজের বসতবাটিও দান করে দেবো। কারণ, ওই বাড়ীতে বসবাসের সময়েই আমার এই অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। রসুল স. বললেন, এক তৃতীয়াংশ দান করো। এটাই তোমার জন্য উত্তম। এরপর হজরত আবু লুবাবাকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না এবং তোমাদিগের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও নহে;

বিশ্বাসভঙ্গ বা আমানতের খেয়ানত সম্পর্কে দু'টি নিষেধাজ্ঞা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। একটি হচ্ছে— জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। অপরটি হচ্ছে— তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও না। 'লা তাখুনু' অর্থ— বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না। শব্দটি এসেছে 'খওনুন' থেকে। খওনুন শব্দটি একটি মূল শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ, কম করা। এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ওয়াফা'— যার আভিধানিক অর্থ পূর্ণ করা। তাই গচ্ছিত বিশ্বাস অথবা দ্রব্যের যথাসংরক্ষণ বা আমানতের বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, খেয়ানত শব্দটি। বলা হয়েছে— লা তাখুনু (খেয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করো না)। আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে— জ্ঞাতসারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানত এবং আল্লাহ্‌র বান্দাগণের আমানত— দু'টোই রক্ষা করতে হবে। কোনো আমানতেরই খেয়ানত করা যাবে না।

'ওয়া আনতুম তা'লামুন' অর্থ জেনে শুনে। হজরত আবু লুবাবা জেনে শুনে তাঁর গলদেশের দিকে ইঙ্গিত করে ইহুদীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। সে ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে, হে বিশ্বাসীগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আমানতের খেয়ানত কোরো না। এভাবে বিশেষ একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়েও আয়াতের নির্দেশনাটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয়েছে সকল বিশ্বাসীদের উপর।

সুদ্দী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার যে কোনো ফরজ হুকুম লংঘন করলেও তাকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আমানত খেয়ানত করা হয়েছে বলে ধরা যাবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের ফরজ নির্দেশ পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আমানতের খেয়ানত করা হয়। তাই প্রকাশ্য, গোপন— সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফরজ নির্দেশসমূহ প্রতিপালন করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে। কাতাদা বলেছেন, ফরজ হুকুমসমূহ এবং শরিয়তের সীমারেখা বজায় রাখা আমানতের অন্তর্গত। আর মানুষের গচ্ছিত কথা ও দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা করাও আমানত। আমানতের যথাসংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এর অন্যথা করা যাবে না।

একটি সন্দেহঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— আল মুসতাশারু মুউতামিনুন (যার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে আমানতদার হতেই হবে)। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে সে ভুল পরামর্শ দিবে না। জননী উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাহলে একথা বলা যাবে না কেনো যে, ইশারায় কতল হওয়ার ইঙ্গিত করে হজরত আবু লুবাবা বরং ঠিক কাজই করেছিলেন। পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশ্বাসভাজনতার মাধ্যমে। সুতরাং বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত হতে হলো কেনো? এ রকম না করলেই তো পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি আমানতের খেয়ানত করতেন।

সন্দেহভঞ্জনঃ এমতোক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের দায় থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরামর্শ দান থেকে বিরত থাকাই উত্তম। এমতাবস্থায় নিশ্চুপ থাকলে পরামর্শ দাতার ভূমিকায় আর অবতীর্ণ হতে হয় না। বিশ্বাসভঙ্গের দায়ও বর্তে না। হজরত আবু লুবাবা এ রকম বললেও দায়মুক্ত থাকতে পারতেন যে— আমি মুসলমান। তোমরা অমুসলমান। আমরা এখন পরস্পরের শত্রু। সুতরাং আমরা কেউ কারো পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি না। আর শত্রুর পরামর্শ গ্রহণযোগ্যও নয়। ওয়াল্লহু আ'লাম।

আল্লামা সুদ্দী সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, প্রথমদিকে সাহাবায়ে কেরাম রসুল স. এর নিকট থেকে যা শুনতেন তা পাত্র অপাত্র নির্বিশেষে সকলকে বলে বেড়াতেন। এভাবে কথাগুলো মক্কার মুশরিকদের কান পর্যন্ত পৌঁছতো। এতে করে অনেক গোপনীয় সংবাদও তারা পেয়ে যেতো। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌ থেকে ইবনে জারীর প্রমুখ উল্লেখ করেছেন, আবু সুফিয়ান তার সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা অভিযানে বের হলো। হজরত জিবরাইল তার গতিবিধির সংবাদ রসুল স. কে জানালেন। বললেন, এগিয়ে আসছে আবু সুফিয়ানের লস্কর। মদীনা আক্রমণ করাই তার উদ্দেশ্য। অমুক পথ দিয়ে সে এভাবে এভাবে এগিয়ে আসছে। রসুল স. তখন সাহাবায়ে কেরামের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, আবু সুফিয়ানের বাহিনী এখন অমুক স্থানে।

তোমরা তার মোকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হও। আর তোমাদের অভিযানের সংবাদ গোপন রাখো। মুনাফিকেরা এ সংবাদ জানতে পারলে অবশ্যই আবু সুফিয়ানের নিকট পৌঁছে দেবে। অতএব সাবধান! —এ ঘটনাটিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই হাদিসটি অবশ্য বিরলসূত্র বিশিষ্ট।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৮

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

❑ এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌রেই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

এখানে 'ফিত্‌না' শব্দটির অর্থ— পরীক্ষা। শব্দটির আভিধানিক অর্থ— সোনা আগুনে পুড়িয়ে কানের অলংকার বিশেষ নির্মাণ করা। যে পরীক্ষা দ্বারা সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়, সে পরীক্ষাকেও ফেত্‌না বলা যায়। যেমন এক আয়াতে এসেছে— নাব্‌লুকুম বিশ্‌শাররি ওয়াল খইরি ফিত্‌নাতুন (আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দের দ্বারা পরীক্ষা করবো)। অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে— আলান্‌নারি ইয়ুফ্‌তানুনা (তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আগুনের উপরে)। কখনো কখনো সত্যপ্রত্যাখ্যানের পাপ, বিশৃংখলা এবং আযাবের কারণসমূহকেও ফেত্‌না নামে অভিহিত করা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে— ওয়াত্তাকু ফিত্‌নাতান (ফেত্‌নাকে ভয় করো)। আ'লা ফিল ফিতনাতি ছাকাতু (সাবধান! তারা ফেত্‌নাগ্রস্ত হয়েছে)। আল ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি (হত্যা অপেক্ষা ফেত্‌না জঘন্যতম)। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও পাপ ও শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার উপকরণ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এটি একটি পরীক্ষা। তাই আলোচ্য আয়াতে এগুলোকে 'ফিত্‌না' বা পরীক্ষা বলা হয়েছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু লুবাবাকে উপলক্ষ করে। তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্পদ আটকা ছিলো অবরুদ্ধ বনী কুরায়জার দূর্গে। তাই স্বজন ও সম্পদের মহব্বতে তিনি ইশারার মাধ্যমে গোপন কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর নিকটে একটি শিশুকে হাজির করা হলো। তিনি স. শিশুটিকে চুম্বন দান করলেন এবং বললেন, হে আমার আয়েশা। শোনো, শিশু সন্তানের কারণেই অনেকে কৃপণ অথবা কাপুরুষ হয়ে যায়। আবার সন্তান-সন্ততিই কারো কারো জন্য হয় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত। বাগবী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আবু ইয়ালী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সন্তান-সন্ততি হচ্ছে অন্তরের প্রশান্তি। অথবা ভীরুতা, কৃপণতা ও দুঃখের কারণ।

হজরত খাওলা বিনতে হাকিম থেকে হাকিম বর্ণনা করেছেন, আত্মজরা বেহেশতি শাস্তি সমূহের মধ্যে একটি শাস্তি— ওই সকল লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পূর্ণ অনুগত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌রই নিকটে মহাপুরস্কার রয়েছে।' এ কথার অর্থ— ওই মহাপুরস্কার লাভের জন্য সচেষ্ট হও, যা রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে। এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সন্তান-বাৎসল্য এবং সম্পদ-প্রীতিকে রাখতে হবে শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে। সন্তান ও সম্পদের মহব্বতকে কখনো আল্লাহ্‌তায়ালার প্রসন্নতার উপরে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ২৯

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

❒ হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করবার শক্তি দেবেন।' একথার অর্থ— হে বিশ্বাসীর দল! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো), তবে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি (ফেরাসাত) দান করবেন। সেই অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তোমরা ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারবে।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় পাও। তারা আল্লাহ্‌র নূরের মাধ্যমে দৃষ্টিপাত করে। বোখারী, তিরমিজি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিবরানী, হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আদী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরও এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে রসুল স. বলেছেন, মুফতীর ফতোয়া দান সত্ত্বেও তুমি তোমার হৃদয়ের ফতোয়া অন্বেষণ করো। হজরত ওয়াবিসা থেকে উত্তমসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। উল্লেখ্য যে, নফসের ফানা সংঘটিত হওয়ার পরেই কেবল হৃদয়ের (কলবের) ফতোয়া প্রদানের অধিকার জন্মে। ওই ফতোয়া গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিতও হয়। সুফী সাধকগণ বিশেষ আধ্যাত্মিক স্তরসমূহ অতিক্রমের পর লাভ করেন কলব ও নফসের ফানা। লাভ করেন তাকওয়া। ফলে অন্তর্দৃষ্টিও অর্জিত হয় তাঁদের। ওই অন্তর্দৃষ্টিকে তাঁরা বলে থাকেন বাতেনী কাশফ্ (আত্মিক দর্শন)।

ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফুরক্বানুন' শব্দটি। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসকে পার্থক্য করার এই জ্ঞান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আল্লাহ্তায়ালা এই জ্ঞানদানের মাধ্যমে বিশ্বাসীগণকে করেন সম্মানিত। আর এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে লাঞ্ছিত করেন অবিশ্বাসীদেরকে। এই জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ্র ভয়)। আর তাকওয়া লাভ করেন কেবল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির অধিকারীরা। তাঁদেরকে বলা হয় মুত্তাকী (সাবধানী)। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে সকল প্রকার স্খলন ও সন্দেহের দোদুল্যমানতা থেকে চির নিরাপদ করে দিয়েছেন।

মুকাতিল বিন হাইয়্যান বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুত্তাকীদেরকে সংশয়াচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন। হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুত্তাকীদেরকে ভ্রষ্টতার কারাগার থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তিদান করেন। জুহাক বলেছেন, মুত্তাকীদেরকে দেয়া হয় চির অটল বিশ্বাস। ইবনে ইসহাক বলেছেন, মুত্তাকীদের নিকট সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য রেখাটি সুস্পষ্ট।

'ফুরক্বানুন' শব্দটি একটি মূল শব্দ। এ ধরনের মূল শব্দ আরো রয়েছে। যেমন, রুজহানুন, নুক্বসানুন ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমাদের পাপ মোচন করবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! তোমরা যদি মুত্তাকী হও (আল্লাহ্কে ভয় করো), তবে আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য করবার শক্তি তো দান করবেনই, তদুপরি তিনি মাফ করে দেবেন তোমাদের অতীতের সকল গোনাহ্। গোনাহ্ ও তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দেবেন এক অভেদ্য অন্তরায়। ফলে তোমরা লাভ করতে পারবে চিরস্থায়ী ক্ষমা।

হজরত আনাস থেকে বায্যার লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে তিনটি বিষয়— বান্দার পাপ ও পুণ্য এবং আল্লাহ্র নেয়ামত (যে নেয়ামতসমূহ আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীতে দান করেছিলেন)। তখন বান্দাকে বলা হবে পৃথিবীতে তোমাকে এই নেয়ামতগুলো দেয়া হয়েছিলো তোমার পুণ্যকর্মসমূহের বিনিময়ে। নেয়ামত নিজেই তখন বলবে, হে পরম দয়ালু দাতা আল্লাহ্! তোমার অতুলনীয় সম্মানের শপথ, আমি তো আমার বদলে তার নেক আমলসমূহকে পুরোপুরি পাইনি। তদুপরি তার পাপগুলো তো রয়েছেই। আল্লাহ্তায়ালা যদি তখন ইচ্ছা করেন তবে অনুগ্রহ করে বলবেন, আমি আমার এই বান্দার নেক আমলের পুণ্যসমূহ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবো এবং ক্ষমা করে দেবো তার পাপসমূহকে। আর তাকে পুরস্কৃত করবো আমার আপন করুণা থেকে।

হজরত ওয়াসিলা ইবনে আসকাআ থেকে তিবরানী উল্লেখ করেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাক তাঁর এমন এক পুণ্যবান বান্দাকে উঠাবেন, যার আমলনামা থাকবে পুণ্যে পরিপূর্ণ এবং পাপহীন। আল্লাহ্পাক তাকে বলবেন, পাপ বলতে তো তোমার কিছুই নেই। এখন বলো, কীভাবে তুমি পুরস্কৃত হতে চাও— পুণ্যের বিনিময়ে, না আমার করুণায়? বান্দা বলবে, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তুমি তো জানো আমি কখনো তোমার অবাধ্যতা করিনি। অতএব তুমি আমাকে আমার পুণ্যের বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করো। আল্লাহ্পাক বলবেন, তাই হোক। এবার তবে তোমার পুণ্যের বিপরীতে পৃথিবীতে আমি যে সকল নেয়ামত দান করেছিলাম, সেগুলোর হিসেব করতে থাকো। এভাবে হিসেব করতে গিয়ে দেখা যাবে তার পুণ্যকর্মের চেয়ে অনেক বেশী নেয়ামত তাকে দেয়া হয়েছে পৃথিবীতেই। আল্লাহ্পাক তখন বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি তোমার পুণ্যকর্মকে আমার নেয়ামতের উপযুক্ত বিবেচনা করো? বান্দা আবেদন করবে, হে আমার আল্লাহ্! আমার পুণ্যকর্মের বিনিময়ে নয়, তুমি আমাকে নেয়ামত দান করো তোমার অফুরন্ত করুণাভাণ্ডার থেকে। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্যই রসুল স. অন্যত্র এরশাদ করেছেন, তোমাদের পুণ্যকর্ম তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার নেক আমলও কি আপনাকে বাঁচাতে পারবে না? তিনি স. বললেন, না— যদি আল্লাহ্তায়ালার করুণা দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত না হই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

উম্মত জননী আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যকর্ম করতে থাকো। কিন্তু নির্ভরশীল হও আল্লাহ্তায়ালার দয়ার উপর। আল্লাহ্তায়ালার দয়া না হলে কেবল পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বেহেশতে পৌঁছানো যায় না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার পুণ্যকর্মও কি আপনাকে জান্নাতে পৌঁছাবে না? তিনি স. বললেন, না— যদি না আমি আল্লাহ্তায়ালার দয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হই (এই অবস্থাই আমার সার্বক্ষণিক অবস্থা)।

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, ওয়াল্লহু জুলফাদ্বলিল্ আজিম (আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়া বা ফজলের অধিকারী)। আল্লাহ্পাকের এই বিশেষ দয়া যারা পায় তারাই লাভ করেন মুক্তি। আল্লাহ্পাক তাঁর দাসদেরকে পুণ্যকর্মের বিনিময় প্রদানের অংগীকার করেছেন। এই বিনিময় প্রদান করা হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। পুণ্যকর্মসমূহকে তিনিই দয়া করে বানিয়েছেন মুক্তির কারণ বা অবলম্বন। তাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দয়াতেই কেবল মুক্তিলাভ সম্ভব। দুনিয়াতে যে অজস্র নেয়ামত দেয়া হয়, মানুষের সকল নেক আমলের মাধ্যমেও সে সকল নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না। এরপর আখেরাতে যদি কোনো নেয়ামত

দেয়া হয় তবে তাতো দয়া করেই দেয়া হবে। আর তা বান্দার পারিশ্রমিক হবে না, হবে পুরস্কার। বিষয়টি এ রকম— কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি তার দাসকে বললো, অমুক কাজটি করো, তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এটা হচ্ছে গোলামের প্রতি মনিবের দয়া। গোলাম তো তার মনিবের কাজকর্মের বিনিময়ে নির্ধারিত পারিশ্রমিক পেয়েই থাকে। পারিশ্রমিক ও পুরস্কার কখনো এক কথা নয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্পাক তোমাদের ক্ষুদ্র পাপসমূহকে মুছে দিবেন এবং ক্ষমা করে দিবেন বৃহৎ পাপসমূহকে।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩০

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ○

❒ স্মরণ কর, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।

রসুল স. এর হিজরত পূর্ব সময়ে তাঁকে হত্যা, বন্দী অথবা নির্বাসনদানের যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো সেই ষড়যন্ত্রের কথা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় রসুলের বিরুদ্ধে সংঘটিত ওই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেছিলেন। আয়াতের শেষাংশে সেকথাটিই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—'এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।' উল্লেখ্য যে, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা একটি দোষ। আর আল্লাহ্তায়ালা সকল দোষ থেকে মুক্ত, পবিত্র। কিন্তু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে হয় বলে এখানে 'আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন' এ রকম বলা হয়েছে।

ষড়যন্ত্রটি সংঘটিত হয়েছিলো এভাবে— ইবনে ইসহাক, আবদুর রাজ্জাক, ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, আবু নাঈম, ইবনে মুনজির ও তিবরানী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এবং আবদুর রাজ্জাক ও আবদ্ বিন হুমাইদ হজরত কাতাদা থেকে উল্লেখ করেছেন, গোপনে গোপনে ইসলাম প্রসার লাভ করছে জানতে পেরে আবু জেহেল ও অন্যান্য অংশীবাদী কুরায়েশ নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা খবর পেলো ইতোমধ্যেই মদীনার কিছু লোক এসে মোহাম্মদ স. এর ধর্মে দীক্ষা নিয়ে গিয়েছে মক্কার কোনো কোনো মুসলমান হিজরত করে ঘাঁটি গেড়েছে

সেখানে। ইতোপূর্বে আবিসিনিয়ায় গিয়েও উপস্থিত হয়েছে মুসলমানদের একটি দল। এভাবে তারা মক্কার বাইরের লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চলেছে। এখন যদি মোহাম্মদও গোপনে অন্যত্র গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মক্কা আক্রমণ করে বসে তবে কী উপায় হবে? উপায় উদ্ভাবনের জন্য তারা পরামর্শ সভা আহ্বান করলো। একটি বড় বাড়ি ছিলো তাদের পরামর্শস্থল। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে একত্রিত হলো তারা। ওই দিনটিকে বলা হয় ইয়াওমুজ্‌জহমত বা অভিসম্পাত দিবস। এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির রূপ ধারণ করে পশমী চাদরে আবৃত হয়ে ইবলিস নিজেও উপস্থিত হলো সেই পরামর্শ সভায়। সে দরজায় দাঁড়াতেই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা বলাবলি করতে লাগলো এই প্রবীণ ব্যক্তিটি কে? ইবলিস বললো, আমার বসবাস নজদ প্রদেশে। শুনতে পেলাম আপনারা এক দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদনার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছেন। শুনে ভাবলাম আমিও হয়তো আপনাদেরকে এ ব্যাপারে কোনো অব্যর্থ পরামর্শ দিতে সক্ষম হবো। পরামর্শ সভার সদস্যরা বললো, বেশ, বেশ। আপনি আসন গ্রহণ করুন। দেখা গেলো পরামর্শ সভায় উপস্থিত হয়েছে কুরায়েশদের অধিকাংশ প্রভাবশালী নেতারা। উপস্থিত হয়েছে উত্‌বা বিন রবিয়া, শায়বা বিন রবিয়া, তাঈমা বিন আদী, নজর বিন হারেস, আবু বোখতারী বিন হিশাম, আবু জেহেল বিন হিশাম, মাসবিয়া ও মুনাব্বাহ্ ভ্রাতৃদ্বয়, উমাইয়া বিন খালফ্, আবু সুফিয়ান বিন হরব, যোবায়ের বিন মুতয়েম এবং হাকেম বিন হাজ্জাম। শেষোক্ত ব্যক্তিত্রয় পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরায়েশ ও আরো দু'টি গোত্রের কতিপয় নেতাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। কিন্তু তাদের নাম জানা যায় না।

শুরু হলো পরামর্শ বিনিময়। একজন বললো, মোহাম্মদের অনুসারী দিন দিন বেড়েই চলেছে। এভাবে তার দল শক্তিশালী হলে সে নিশ্চয় আমাদের উপর চড়াও হবে। সুতরাং এখনই আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এর বিহিত করতে হবে। আবুল বোখতারী বললো, মোহাম্মদকে শৃংখলাবদ্ধ করে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঘরে আটকে রাখা হোক। নজদের বৃদ্ধরূপী ইবলিস বললো, প্রস্তাবটি আমার মনঃপুত নয়। কারণ তাকে এভাবে আটকে রাখলে তার সঙ্গী সাথীরা এ সংবাদ পাবেই। তখন তারা জান বাজী রেখে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও তখন তারা পিছপা হবে না। সকলে বললো, শায়েখ (বৃদ্ধ) তো ঠিক কথাই বলেছেন। এবার আবুল আসওয়াদ বললো, তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হোক। যেখানে খুশী সেখানে চলে যাক সে। তার কাজ সে করে বেড়াক। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। নজদের শায়েখ বললো, এ রকম করাও ঠিক হবে না। এ রকম করলে সে অন্যত্র গিয়ে নির্বিঘ্নে তার অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে থাকবে। এভাবে সে তার দলবল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। তখন সমর্পণ অথবা সন্ধি ছাড়া তোমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। অতএব অন্য কোনো কৌশল নির্ধারণ করো।

আবু জেহেল বললো, আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই। মনে হয় প্রস্তাবটি আপনাদের সকলের মনঃপুত হবে। সকলে বললো, ঠিক আছে এবার আপনার প্রস্তাবের কথাটাই শুনি। আবু জেহেল বললো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে তেজোদীপ্ত যুবক নির্বাচন করা হোক। এভাবে সকল যুবক একত্রিত হয়ে একযোগে আক্রমণ করে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করবে মোহাম্মদকে। এভাবে সকল গোত্র হত্যাকাণ্ডে শরিক হতে পারবে। আর মোহাম্মদের নিকটজনেরা সকল গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবারও সাহস পাবে না। খুব বেশী হলে হয় তো রক্তপণ দাবী করে বসতে পারে। সম্মিলিতভাবে সেই রক্তপণের দাবী পরিশোধ করাও আমাদের জন্য হবে সহজ। নজদী শায়েখ বললো, হ্যাঁ, এটা একটা প্রস্তাবের মতো প্রস্তাব বটে। এরপর সে আবৃত্তি করলো একটি কবিতা যার মর্মার্থ এ রকম—

অনেক প্রস্তাবই তো শোনা হলো। কিন্তু শেষোক্ত প্রস্তাবটিই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাব। একযোগে হানতে হবে তলোয়ারের আঘাত। আর এই পরিকল্পনাটির মধ্যেই রয়েছে সম্মান, গৌরব ও প্রশংসা।

আবু জেহেলের প্রস্তাবটিকে নজদী শায়েখের মতো অন্যান্যরাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো। ওই আসরেই প্রস্তাবটি কার্যকর করার দিনক্ষণ নির্ধারণ করে ফেললো তারা।

হজরত জিবরাইল এ সংবাদ পৌছে দিলেন আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় রসুলের নিকট। আরো বললেন, আবু জেহেলের দল ঠিক করেছে আজ রাতে তারা আপনাকে হত্যা করতে আসবে। আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ রাতেই আপনাকে গৃহত্যাগ করতে হবে।

রাত হলো। রসুল স. হজরত আলীকে ডেকে বললেন, আজ রাতেই আমাকে চলে যেতে হবে। তুমি আমার এই সবুজ চাদরটি মুড়ি দিয়ে আমার এই শয্যায় শুয়ে থেকো। গভীর রাতে আবু জেহেলের দল এসে রসুল স. এর গৃহের চতুর্দিকে ঘিরে ফেললো। তাদের পরিকল্পনা ছিলো ভোর বেলায় রসুল স. যখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসবেন, তখন সকলে মিলে একযোগে তাঁর উপরে চালাবে তলোয়ারের আঘাত। রসুল স. তাদের উপস্থিতি টের পেলেন। হজরত আলীকে বললেন, এবার তুমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো। বাইরে আবু জেহেলের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো। সে তার সাথীদেরকে বললো, মোহাম্মদ বলে, তোমরা তার অনুসরণ করলে নাকি আরব ও আজমের বাদশাহ্ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে নাকি আবার জীবিত করা হবে এবং দেয়া হবে আরদানের বাগানের মতো বাগান। আর তার অনুসরণ না করলে তোমরা তার হাতেই নিহত হবে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে নিক্ষেপ করা হবে দোজখের আগুনে।

রসুল স. এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। ওই মাটি আবু জেহেলের লোকদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে যেতে যেতে বললেন, হ্যাঁ আমি এ রকম বলেছি। যারা আমার লোকদের মাধ্যমে নিহত হবে, তুমিও তাদের একজন। রসুল স. কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাটি গিয়ে পড়লো তাদের সকলের মস্তকে। আল্লাহ্পাক তাদের চোখের সামনে সৃষ্টি করে দিলেন অন্তরায়। রসুল স. 'ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম.......লা ইউব্ সিরুন' পর্যন্ত পাঠ করে তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। তারা কেউই তাঁকে দেখতে পেলো না। হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে অপেক্ষমান আততায়ীদেরকে বললো কাকে খুন করার জন্য অপেক্ষা করছো তোমরা? তারা বললো, মোহাম্মদকে। লোকটি বললো, আল্লাহ্ তোমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম! সে তো তোমাদের সকলের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে তোমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গিয়েছে। ভেবে দেখো, এখন কী করবে তোমরা। লোকটির কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাথায় হাত দিয়ে দেখলো সত্যি সত্যিই কে যেনো তাদের মাথায় মাটি ছুঁড়ে মেরেছে। তবু লোকটির কথায় তারা পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলো না। একজন ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে এসে বললো, না লোকটি ঠিক বলেনি। আমি দেখলাম, মোহাম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে তার নিজের বিছানাতেই শুয়ে রয়েছে। ভোর হলো। হজরত আলী গাত্রোত্থান করলেন। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁকে দেখে আততায়ীরা বলে উঠলো, লোকটি তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছিলো। সুরা তওবার তাফসীরে যথাস্থানে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইনশাআল্লাহুতায়ালা।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী রসুল স. কে জীবনের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাই তিনি জীবন দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন রসুল স.কে। রসুল স. এর নির্দেশে তাঁরই শয্যায় তাঁরই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ভোরে গাত্রোত্থানের সময় আবু জেহেলের লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলো। বললো, তুমি নিচ। তোমার কারণেই আমরা প্রতারিত হলাম।

হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম জয়নুল আবেদীন একবার বললেন, 'মিনান্নাসি মাইইয়াশ্তারি নাফসাহুব তিগাআ মারদ্বতিল্লাহি' (মানুষের মধ্যে যারা নিজের সত্তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষায় বিক্রয় করে।) এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল ছিলেন হজরত আলী। তিনিই আল্লাহ্পাকের সন্তোষ অন্বেষণের জন্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর ইমাম জয়নুল আবেদীন পাঠ করলেন হজরত আলীর একটি কবিতা। কবিতাটির মর্মার্থ এ রকম—

'যে সকল লোক মক্কার পাথুরে রাস্তায় বিচরণ করে, চুম্বন করে কালো পাথর এবং প্রদক্ষিণ করে কাবাগৃহ— তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের জন্য আমি আমার জীবন সমর্পণ করেছি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্তায়ালার রসুল। আমি

চেয়েছিলাম অংশীবাদীদের রক্তলোলুপ তরবারীর আঘাত যেনো তাঁর পবিত্র দেহ পর্যন্ত না পৌঁছে। অবশেষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে রক্ষা করেছেন। সে রাতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে দান করেছিলেন পর্বতগুহার নিরাপদ আশ্রয়। আর এদিকে আমি সারারাত অংশীবাদীদের হন্তারক অপেক্ষার সামনে শহীদ অথবা বন্দী হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, উপরোক্ত ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। আবুল হাকীক বলেছিলো, মোহাম্মদকে বন্দী করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করবার জন্য।' আবু জেহেল বলেছিলো, হত্যা করার কথা। আর আবুল আসওয়াদ বলেছিলো, নির্বাসনে পাঠানোর কথা। তাই এখানে বলা হয়েছে 'হত্যা করবার অথবা নির্বাসিত করবার জন্য।'

'মকর' অর্থ ষড়যন্ত্র। এখানে বলা হয়েছে— 'ইয়াম কুরুনা ওয়া ইয়াম কুরুল্লহ্' (তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন)। 'মকর' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— কোনো পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করা। ষড়যন্ত্র হতে পারে দু'রকমের। কোনো মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পনা করা হলে তা হবে উত্তম ষড়যন্ত্র। আর নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র বলা যাবে সেই পরিকল্পনাকে যা অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা নিজের পক্ষ থেকে কখনোই কোনো ষড়যন্ত্র করেন না। তবে তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসৎ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেন। এখানেও তেমনটি ঘটেছে। ষড়যন্ত্র করেছে আসলে আবু জেহেলের দল। আর আল্লাহ্তায়ালা তা প্রতিহত করেছেন। আর এই অবস্থাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও ষড়যন্ত্র করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ। এ রকম বলা হয়েছে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। আর আল্লাহ্তায়ালার ষড়যন্ত্রকে যদি সরাসরি ষড়যন্ত্রও বলা হয়, তবে তা হবে উত্তম ষড়যন্ত্র। কারণ অনুত্তম সকল কিছু থেকে আল্লাহ্তায়ালা মুক্ত, পবিত্র। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলো সত্যের নূর। আর আল্লাহ্তায়ালা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সেই নূরকে করে তুলেছিলেন অধিকতর প্রোজ্জ্বল। এভাবেই আল্লাহ্তায়ালা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিশ্চিহ্ন করে দেন অসত্যকে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু খইরুল মাকিরীন (এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ)। আল্লাহ্তায়ালার সকল কর্মই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং তিনি যা কিছু করেন তা উত্তমই হবে। অনুত্তম কখনোই হবে না। কোনো কোনো

তাফসীরকার বলেছেন, মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকে অকার্যকর করে দেয়াকেই এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্র ষড়যন্ত্র। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে এখানে ষড়যন্ত্র আখ্যা দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ্পাকের ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি এ রকম— অবাধ্যদেরকে অবকাশ প্রদান করা এবং পৃথিবীর সুখ সম্ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা। একারণেই হজরত আলী বলেছেন, বিত্ত-বৈভবের অধিকারীরা যদি তাদের বিত্ত-বৈভবকে আল্লাহ্পাকের মকর (ষড়যন্ত্র)রূপে বুঝতে না পারে, তবে বুঝতে হবে সে প্রবঞ্চিত।

উবাইদ বিন উমায়েরের বর্ণনা সূত্রে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, মতলব বিন ওয়াদাআ বলেছেন, রসুল স. এর পিতৃব্য আবু তালেব একবার বললেন, প্রিয় বৎস! তুমি কি জানো, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে কী শলাপরামর্শ করছে? রসুল স. বললেন, তারা আমাকে হত্যা, বন্দী অথবা নির্বাসন দানের পরামর্শ করছে। আবু তালেব বললেন, এ কথা তোমাকে কে বলেছে? তিনি স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক। আবু তালেব বললেন, তোমার প্রতিপালক অতি উত্তম। তিনি তোমার অনুগত। রসুল স. বললেন, না আমিই তাঁর একান্ত অনুগত। আর তিনি আমার কল্যাণকামী। এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি। এই বর্ণনাটি অবশ্য দুর্বল, বরং পরিত্যক্ত। কারণ রসুল স. এর বিরুদ্ধে হত্যা, বন্দী এবং নির্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তাঁর হিজরতের প্রাক্কালে। আর আবু তালেব পরলোকগমন করেছিলেন হিজরতের তিন বছর পূর্বে। এ কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে কাসীর।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো উকবা বিন আবী মুয়ীত, তোয়াইল বিন আদী এবং নজর বিন হারেস। পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়। নজর বিন হারেসকে বন্দী করেছিলেন হজরত মেকদাদ। অন্য দু'জনের সঙ্গে তাকেও হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হলে হজরত মেকদাদ নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! নজর তো আমার বন্দী। রসুল স. বলেছিলেন, সে আল্লাহ্তায়ালার কিতাব সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। তাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। নজরের ওই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

❒ যখন তাহাদিগের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তাহারা তখন বলে, 'আমরা তো শ্রবণ করিলাম, ইচ্ছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি, ইহা তো শুধু সেকালের লোকদিগের উপকথা।'

কোরআনের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলো নজর বিন হারেস। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে'; এক বচনের স্থলে এ রকম বহুবচন বোধক বাক্য ব্যবহারের কারণ এই যে— নজর একা এ রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও তাকে সমর্থন করেছিলো অন্যান্য অবিশ্বাসীরা। তাই তাদের সকলকেই এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন হজরত সালেহের উটনীকে হত্যা করেছিলো একজন। অথচ ওই ঘটনার বিবরণদানকালে অবাধ্য ছামুদ জাতির সকলকে হত্যাকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ হত্যাকারী একজন হলেও সমর্থক হিসেবে অন্যান্যরাও ছিলো ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি।' চরমতম মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে অভিশপ্ত নজরের এই উদ্ধৃতিটিতে। কারণ তার এই অপকথনটি উচ্চারণের অনেক আগেই কোরআনের অনুরূপ কোনো বাণী রচনার জন্য সকল অবিশ্বাসী কবি ও পণ্ডিতদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সাধ্য কোনো কালে কারো হয়নি। নজর অভিশপ্ত ও চরম মূর্খ ছিলো বলেই এ রকম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পেরেছিলো।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।' নজরের এ কথাটিও নিতান্ত মূর্খজনোচিত। কোনো জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তি কখনোই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র বাণীবৈভবকে অতীতকালের জনমনরঞ্জনমূলক কিংবদন্তী বা উপকথা হিসেবে অভিহিত করতে পারে না। বাগবী লিখেছেন, নজর বিন হারেস ছিলো ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে সে পারস্য এবং ইরাক অঞ্চলে গমনাগমন করতো। সেখানে বসতো অনারবদের বিভিন্ন কল্পকাহিনীর আসর। সেগুলো সে মন দিয়ে শুনতো। সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সে তাদের উপাসনালয়ে

রুকু ও সেজদা করতে দেখেছিলো। তাই সে রসুল স. এর নামাজ ও কোরআন পাঠকে তুলনা করেছিলো বিধর্মীদের কল্পকাহিনী এবং উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে। বলেছিলো— আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছে করলে আমরাও অনুরূপ বলতে পারি, এটা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩২, ৩৩

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

❒ স্মরণ কর, তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আল্লাহ্! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে আমাদিগের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'

❒ আল্লাহ্ এরূপ নহেন যে, তুমি তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং তিনি এইরূপ নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে অভিশপ্ত নজর বিন হারেসকে লক্ষ্য করে। তার সমর্থক গোষ্ঠীও ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের প্রতি বিদ্রূপকারীদের মধ্যে গণ্য। তাই সকলকে অপরাধী ধরে নিয়ে নজরের বিদ্রূপাত্মক উক্তিকে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-'তারা বলেছিলো, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, যখন অতীত যুগের উম্মতগণের কাহিনী প্রত্যাদেশরূপে অবতীর্ণ হতে শুরু করলো তখন নজর বিন হারেস বললো, আমিও ইচ্ছে করলে এ রকম কাহিনী রচনা করতে পারবো। এ সকল উপাখ্যান তো আগের যুগের লোকেরা অনেক আগেই রচনা করেছে। এ কথা শুনে হজরত ওসমান বিন মাজউন বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, মোহাম্মদ স. তো সত্য কথা বলছেন। নজর বললো, আমিই সত্য কথা বলছি। হজরত ওসমান বললেন, মোহাম্মদ স.তো উচ্চারণ করেন তৌহিদের বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই)। আর তুমি হচ্ছো অংশীবাদী। নজর বললো, আমিও বলি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। দেবী

প্রতিমাগুলোকে তো আমি আল্লাহ্ বলি না— বলি, আল্লাহ্‌র কন্যা। এরপর সে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্! এই কোরআন যদি সত্য হয় এবং তা তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। কিংবা আমাদেরকে অন্য কোনো কঠিন শাস্তি প্রদান করো। তার এই কথা ছিলো কোরআনের প্রতি সরাসরি উপহাস। সে সত্যি সত্যি চেয়েছিলো আবরাহার হস্তি বাহিনীর প্রতি যেরূপ প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিলো অথবা হজরত লুতের সম্প্রদায় কিংবা অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর যেমন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি আপতিত হয়েছিলো, সে ধরনের কোনো শাস্তি তারও উপর আপতিত হোক। তখন অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটি— 'ছাআলা ছায়েলুম বিআজাবিঁউ ওয়াক্ব' (যাচ্ঞাকারী যাঞ্চা করেছিলো অবতরণ যোগ্য শাস্তির)।

আতা বলেছেন, নজর বিন হারেস সম্পর্কে কমপক্ষে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সে সব সময় চাইতো তার উপর আযাব অবতীর্ণ হোক। শেষে তার কাংখিত আযাব অবতীর্ণ হয় বদর যুদ্ধের সময়। প্রথমে বন্দী করা হয় তাকে। তারপর করা হয় হত্যা।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তো আমারই রহমতের প্রতিভূ। সুতরাং আপনার উপস্থিতিতে আমার গজব প্রকাশিত হবে কিরূপে? গজব অপেক্ষা আমার রহমতই যে প্রবল। আর অপরাধীরা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তো আমি আমার গজবকে প্রকাশ করতে পারবো না। কারণ আমি যে গফুর (ক্ষমা পরবশ)।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩৪

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ এবং তাহাদিগের কি-বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না যখন তাহারা লোকদিগকে মসজিদুল-হারাম হইতে নিবৃত্ত করে? যদিও তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক নহে, সাবধানিগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বিভিন্ন রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এই আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতের (৩৩) বিষয় বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত। আগের আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলতে শুরু করলো, এবার তাহলে আমরা নিশ্চিত যে

আমাদের উপর আযাব আসবে না। কারণ আমাদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ। আর আমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করছি। তাদের এ কথার মধ্যেও রয়েছে প্রচ্ছন্ন উপহাস। তাই তাদের উক্তিকে নাকচ করে দিয়ে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—'এবং তাদের কি-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জুলুমের কারণে মুসলমানেরা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এভাবে তারা বিশ্বাসীদেরকে নিবৃত্ত করেছে কাবাগৃহের তাওয়াফ থেকে এবং মসজিদুল হারামে নামাজ পাঠের সুযোগ থেকে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করবেন না কেনো?

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আগের আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই আয়াতের বক্তব্যবিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। হজরত আনাস থেকে বোখারী লিখেছেন, 'হে আল্লাহ্! এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্যি হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করো। কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।'—এই জঘন্য প্রার্থনাটি করেছিলো আবু জেহেল। তার ওই প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছিলেন—আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মহাবিশ্বের রহমত। তাই আপনার উপস্থিতিতে আমি আমার গজবকে প্রকাশ করবো না। এ কথাটির মধ্যে এই বক্তব্যটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, রসুল স. এর হিজরতের পর আল্লাহ্পাক মক্কার মুশরিকদের উপর অবতীর্ণ করবেন আযাব। কারণ তখন রসুল স. তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন না। এ রকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীর। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আয়াতের এই অংশটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মক্কায়। অপর অংশটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মদীনায় হিজরতের পর। আর সেটি হচ্ছে—'এবং তিনি এরূপ নন যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।' এ কথার অর্থ—প্রধান প্রধান সাহাবীগণকে নিয়ে রসুল স. মদীনায় চলে যাওয়ার পরও কতিপয় অক্ষম মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন মক্কায়। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিকটে তাদের অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁরাও মক্কা পরিত্যাগ করলেন। তখন কাফেরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অন্তরায় আর রইলো না। আর তখনই অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। বদর যুদ্ধের দিন সেই শাস্তি নিয়েছিলো বাস্তব রূপ। এভাবে মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে। ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা যে আল্লাহ্র গজব

অবতীর্ণ হওয়ার অন্তরায়, অন্য আয়াতেও সে কথার বিবরণ এসেছে। যেমন একস্থানে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাওলা রিজালুম মু'মিনুনা ওয়া নিসায়ুম্ মু'মিনাতুন লাম তা'লামুহুম............লাও তাজাইয়্যাহা লাআয্যাবনাল্লাজীনা কাফারু মিনহুম আযাবান আলীমা।'

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্পাক তাঁর নবী ও নবীর অনুসারীগণকে অন্যত্র সরিয়ে না নিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। তাই রসুল স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ মক্কায় অবস্থান করার সময় অবাধ্য মক্কাবাসীর উপর আযাব অবতীর্ণ হয়নি। তাঁরা সকলে যখন মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়ে হাজির হলেন, তখন মক্কার কাফেরদের উপর আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হওয়ার কোনো অন্তরায় আর রইলো না। সে কথাই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— 'এবং তাদের কি-বা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যখন তারা লোকদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করে?' রসুল স. এর মহা তিরোধানের পর হজরত আবু মুসা আশআরী একবার বললেন, ওহে মুসলিম জনতা! দু'টি কারণে তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র আযাব থেকে নিরাপদ ছিলে। তার মধ্যে একটি কারণ এখন আর নেই, মহাপ্রস্থান ঘটেছে রসুল স. এর। এখন কারণ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র একটি। সেটি হচ্ছে— ইসতেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা। এই কারণটি অবশিষ্ট থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক আমার উম্মতকে আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য দু'টি অবলম্বন দান করেছেন। তার মধ্যে একটি অন্তর্হিত হবে আমার পৃথিবী থেকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে। অপর অবলম্বনটি (ইসতেগফার) জারী থাকবে মহা প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত। তিরমিজি নিজেই এই বর্ণনাটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, উদ্ধৃত বক্তব্যটি সম্ভবত হজরত আবু মুসার নিজস্ব বক্তব্য। বক্তব্যটিকে রসুল স. এর বক্তব্য হিসেবে প্রমাণ করা কঠিন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আগের আয়াতের 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে (ওয়াহুম ইয়াস্তাগফিরুন)' কথাটির মাধ্যমে মক্কায় মুশরিকদের ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। 'হুম' (তারা) সর্বনামটি এখানে মুশরিকদের স্থলাভিষিক্ত তাই আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরাও কাবাগৃহ তাওয়াফ করতো এবং বলতো গুফরানাকা, গুফরানাকা (আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী)। তাদের এই ক্ষমা প্রার্থনাকেই আযাব অবতীর্ণ হওয়ার অন্তরায়রূপে আগের আয়াতে (৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— এবং তিনি এরূপ নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

ইয়াজিদ বিন রুম্মান সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, মুশরিকেরা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদ একাই আল্লাহ্‌র কথা বলে যাচ্ছে। তারপর তারা প্রার্থনা করতো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। এ রকম বলেও তারা শান্তি পেতো না। তাই দিনান্তে পেরেশান হয়ে দোয়া করতো, গুফরানাকাল্‌লাহুম্মা (হে আল্লাহ্ আমরা ক্ষমাপ্রার্থী)। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো বলেই তখন তাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা হয়নি। এক আয়াতে বলা হয়েছে—আপনার প্রতিপালক কোনো জনপদবাসীকে অংশীবাদীতার কারণে ধ্বংস করেন না— যতক্ষণ তারা থাকে শুদ্ধাচারী। এতে করে বুঝা যায়, অংশীবাদীরা শুদ্ধাচারী থাকা পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকে। কাতাদা এবং সুদ্দী বলেছেন, 'মুশরিকেরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌তায়ালা আযাব অবতীর্ণ করেন না'— এ কথার অর্থ মুশরিকেরা যদি মুমিন হয় তবে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বেঁচে যেতে পারে। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা খুলে রেখেছেন সংশোধনের পথ। এভাবেই মুশরিকদেরকে দেয়া হয়েছে তওবা ও আযাব থেকে অব্যাহতি লাভের উৎসাহ ও সুযোগ।

কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. যে আল্লাহ্‌তায়ালার কত প্রিয়, সে কথা জানাতে এবং তাঁর অনুসরণীয় পদ্ধতিতে ক্ষমা প্রার্থনা করলে যে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে কথা বুঝাতেই বলা হয়েছে— আল্লাহ্ এরূপ নন যে, ... অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন (৩৩)। রসুল স. এর সংসর্গ গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই ছিলো এমতো বক্তব্যের উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে—তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। এভাবে বক্তব্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম—এবং আল্লাহ্ এরূপ নন যে, ইসলাম গ্রহণ করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ওয়ালেবী বর্ণনা করেছেন, সৃষ্টির সূচনালগ্নে এ বিষয়টি স্থিরকৃত হয়েছে যে, কারো কারো ইসলাম গ্রহণ হবে বিলম্বিত। তাই তাৎক্ষণিক অস্বীকৃতির কারণে সঙ্গে সঙ্গে আযাব অবতীর্ণ হয় না। দেয়া হয় দীর্ঘ দিনের অবকাশ। এই অবকাশদানের ফলে যাদের অদৃষ্টে হেদায়েত রয়েছে, তারা নির্ধারিত সময়ে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। তাই দেখা যায়, প্রথম দিকে ইসলামের ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও অনেকে পরবর্তীতে মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন—হজরত আবু সুফিয়ান, হজরত সাফওয়ান, হজরত ইবনে উমাইয়া, হজরত ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, হজরত সুহাইল ইবনে ওমর, হজরত হাকিম ইবনে হাজ্জাম প্রমুখ (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম)। আবদুল ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, 'তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে' কথাটির অর্থ

হবে—ওই সকল মুশরিকের পরবর্তী বংশধরেরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে (ইসলাম গ্রহণ করবে)। তাই তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের পূর্বে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে আযাব দিবেন কিরূপে?

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে সর্বগ্রাসী আযাবের কথা। পূর্বের কোনো কোনো অবাধ্য সম্প্রদায়কে আল্লাহ্তায়ালা সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ রসুলের উম্মতকে আল্লাহ্তায়ালা সেভাবে সমূলে উচ্ছেদ করবেন না। কারণ তারা অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। কেউ গ্রহণ করবে দ্রুত। কেউ বিলম্বে। কেউ আবার নিজেরা গ্রহণ না করলেও গ্রহণ করবে তাদের পরবর্তী বংশধরেরা। আল্লাহ্পাকই এই সুযোগ তাদের দিয়েছেন। সে কারণে এ কথা বলেছেন যে— তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, আল্লাহ্পাক এ রকম নন।

এরপর বলা হয়েছে—'যদিও তারা তার তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই তার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ কথা অবগত নয়।' এ কথার অর্থ— মুসলমানদেরকে হিজরত করতে বাধ্য করে মুশরিকেরা পেয়েছে কাবা শরীফের একচ্ছত্র তত্ত্বাবধানের অধিকার। তাদের এই অধিকার অবৈধ। মুত্তাকীরাই (সাবধানীরাই) কাবা শরীফের যোগ্য তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং মুশরিকেরা কাবা শরীফের মোতোওয়াল্লির পদ ধরে রাখতে পারবে না। অচিরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের এই পদমর্যাদা ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন থেকে মুত্তাকীরাই হতে থাকবে কাবা গৃহের চিরস্থায়ী মোতোওয়াল্লী। কিন্তু এই গুঢ় তত্ত্বটি অধিকাংশ লোক জানে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত রেফাআ বিন রাফে' বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার হজরত ওমরকে নির্দেশ দিলেন, সকল মুহাজিরকে সমবেত করো। হজরত ওমর সকল মুহাজিরকে সংবাদটি জানালেন। আনসার সাহাবীগণও উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে। মুহাজির সাহাবীগণ সম্পর্কে কোনো বিশেষ আয়াত অবতীর্ণ হয় কিনা, সে কথা জানাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। সকলে সমবেত হলে রসুল স. তাঁর প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলেন। মুহাজিরগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শুধু কি তোমরা উপস্থিত হয়েছো? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীরাও (আনসারেরাও) সমবেত হয়েছেন। তিনি স. বললেন, আমাদের প্রতিবেশী ও নিকটজনেরা তো আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা নিশ্চয় কোরআনের এই বাণী শুনেছো—ইন্ আও'লিয়াউনু ইল্লাল মুত্তাকুনা ওয়ালাকিন্নান আকছারাহুম লা ইয়া'লামুন (যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, সাবধানীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এ তত্ত্বটি অবগত নয়)। সুতরাং তোমরা মুত্তাকী হও। উত্তমরূপে অবগত হও যে, মুত্তাকী না হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দান করবেন না। ফলে তোমরা তখন হয়ে পড়বে অপরাধী।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

☐ কাবা গৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাহাদিগের সালাত, সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

'ওয়া মাকানা সালাতুহুম ইনদাল বাইতি ইল্লা মুকাআঁও ওয়া তাস্‌দিয়্যাহ্' অর্থ— কাবাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেয়াই তাদের সালাত। সালাত অর্থ প্রার্থনা, উপাসনা বা ইবাদত। 'মুকা' অর্থ শিস। এ রকম বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত হাসান। আসলে মুকা বলা হয় ওই সকল ধুসর কীটকে, যাদের আওয়াজ শিস দেয়ার মতো। হেজাজ অঞ্চলে ওই সকল কীট দেখা যায়। তাস্‌দিয়াতান অর্থ দুই হাতে তালি বাজানো। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফ করার সময় শিস দিতো ও দুই হাতে তালি বাজাতো। হজরত ইবনে ওমর থেকে ওয়াহেদীও এ রকম বলেছেন।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, আবদুদ্ দার জনপদের কিছু লোক একবার রসুল স. এর তাওয়াফের সময় তাঁর মুখোমুখি হলো এবং তাচ্ছিল্যভরে মুখে আঙ্গুল রেখে শিস দিলো। ওই ঘটনাই উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে 'মুকা' শব্দটির অর্থ হবে মুখে আঙ্গুল দেয়া এবং 'তাস্‌দিয়্যাতান' শব্দটির অর্থ হবে শিস। পর্বত গহ্বরে উচ্চারিত আওয়াজের প্রতিধ্বনিকে বলা হয় 'সদা'। তাস্‌দিয়্যাও বলা হয় ওই প্রতিধ্বনিকে। উন্মুক্ত প্রান্তর পাহাড় অথবা সুউচ্চ অট্টালিকার মধ্যে আওয়াজ করলে চারদিক থেকে যে প্রতিধ্বনি শোনা যায় ওই প্রতিধ্বনিকেই অভিধানে 'সদা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ বলেছেন, রসুল স. এর কাবাগৃহ তাওয়াফের সময় বিধর্মী কুরায়েশরা বিদ্রূপবশতঃ তাঁর সামনে শিস ও করতালি দিতো। এই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

একবার জাফর বিন আবী রবীয়া হজরত আবু সালমা বিন আবদুর রহমানকে মুকা এবং তাস্‌দিয়্যা শব্দ দু'টোর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। হজরত আবু সালমা তাঁর দুই হাত বিশেষভাবে মিলিয়ে তাতে নিম্নমুখী হয়ে ফুঁ দিলেন। এর ফলে তা থেকে নির্গত হলো শিস দেয়ার মতো আওয়াজ। বলেছেন ইবনে জারীর।

মুকাতিলের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার মসজিদুল হারামে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলেন। তখন তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক শিস দিতে শুরু করলো। আর বাম পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে শুরু করলো করতালি। রসুল স. এর ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। ওই অভিশপ্ত লোকগুলো ছিলো আবদুদ্ দার গোত্রের।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারাম, নামাজ এবং অন্যান্য ধর্ম কর্ম থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই অংশীবাদীরা তাস্দিয়া করতো (করতালি দিতো)। এ রকম অপকর্ম তারা হরহামেশাই করতো। তাই উপহাসার্থে আলোচ্য আয়াতে এই অপকর্মগুলোকে তাদের নামাজ বলা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে—'সুতরাং সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ করো।' এখানে 'শাস্তি ভোগ করো' বলে বুঝানো হয়েছে তাদের বদর যুদ্ধে নিহত হওয়াকে। অথবা আখেরাতের অনন্ত আযাবকে। এই আযাবের আবেদন তারা নিজেরাই জানিয়েছিলো। বলে ছিলো— আউইউতিনা বি আ'জাবিন আলিম (কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও (আয়াত ৩২)। এছাড়া তারা কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক সেজেছে। এই অনধিকার চর্চার বিষয়টিও শাস্তিযোগ্য। তাই এখানে বলা হয়েছে— তোমরা শাস্তি ভোগ করো।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ○ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

❒ আল্লাহের পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদিগের ধন-সম্পদ্ ব্যয় করে, তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে অতঃপর উহা তাহাদিগের মনস্তাপের কারণ হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে।

❒ ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হইতে পৃথক করিবেন এবং কুজনদিগের এককে অপরের উপর রাখিবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

কালাবী বলেছেন, বদরের যুদ্ধে গমনের সময় কুরায়েশদের বারোজন নেতা যোদ্ধাদেরকে উট জবাই করে খাইয়েছিলো। তারা ছিলো—আবু জেহেল বিন হিশাম, রবীয়া বিন আবদুস্ শামসের দুই পুত্র, উতবা ও শায়বা, হাজ্জাজের দুই পুত্র, মামবিয়্যাহ ও মুনাব্বাহ্, আবুল বোখ্তারী ইবনে হিশাম, নজর বিন হারেস, হাকিম বিন হাজ্জাম, উবাই বিন খালফ, জময়া বিন আসওয়াদ, হারেস বিন আমের বিন নওফেল এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। তারা তাদের লোকদেরকে গড়ে প্রতিদিন দশটি করে উট জবেহ্ করে খাইয়েছিলো। সেই ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করেই উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্র পথ থেকে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে।'

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, আমার নিকট জুহুরী, মোহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান, আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা এবং হোসাইন বিন আবদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, বদর যুদ্ধে কুরায়েশদের শ্রেষ্ঠ নেতারা নিহত হলো। কেউ কেউ হলো বন্দী। অন্যেরা প্রতিশোধ গ্রহণের কসম খেয়ে পালিয়ে গেলো মক্কার দিকে। পিতৃহারা ইকরামা বিন আবু জেহেল, সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও অন্য একজন হাজির হলো ওই লোকদের নিকট যারা লাভবান হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীর মাধ্যমে। বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! মোহাম্মদ তোমাদের শৌর্যবীর্যকে উড়িয়ে দিয়েছে। হত্যা করেছে তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দকে। এর প্রতিশোধ নিতে হবে। তোমরা যারা ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ লাভ করেছো তাদের কর্তব্য হবে পুনরায় সমর শক্তি গড়ে তোলার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা। লোকেরা তাদের কথা মান্য করলো এবং যুদ্ধের জন্য অর্থ দান করতে লাগলো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইন্নাল্লাজিনা কাফারু থেকে ইয়াহ্শুরুন্ পর্যন্ত (আয়াত ৩৬) অবতীর্ণ হয়েছে এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাকাম বিন উত্বা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে। তিনি মুশরিকদের জন্য চল্লিশ আউকিয়া স্বর্ণ ব্যয় করেছিলেন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং আমবরী বলেছেন, আবু সুফিয়ানই এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ। তিনি দুই হাজার সৈন্যকে বদর পরবর্তী উহুদ যুদ্ধের জন্য তৈরী করেছিলেন। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সাধারণ

নির্দেশনা। যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা সকলেই এই আয়াতের লক্ষ্য। আর উপরে বর্ণিত লোকেরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর তা তাদের মনোস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যারা মানুষকে নিবৃত্ত করতে চায়, তারা কখনোই সফল হবে না। পরাভূত তারা হবেই। আর তখন ওই বৃথা অর্থ ব্যয় হবে তাদের মনঃপীড়নের কারণ। আর তাদের শেষ গন্তব্য হিসেবে নরকের লেলিহান শিখা তো অপেক্ষা করছেই। ওই জ্বলন্ত হুতাশনেই তাদেরকে একত্রিত করা হবে।

পরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে—'এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন থেকে পৃথক করবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।' এখানে খাবিছা (কুজন) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের। আর তৈয়্যেব (সুজন) অর্থ বিশ্বাসী বা মুমিন। আগের আয়াতে 'তারা পরাভূত হবে' অথবা 'তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে'— কথা দু'টোর সঙ্গে রয়েছে এই আয়াতের সংযোগ। এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কীভাবে পরাভূত করা হবে এবং কীভাবে জাহান্নামে একত্রিভূত করা হবে — সে কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদেরকে একজনের উপর একজন — এভাবে স্তূপীকৃত করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। এ রকমও হতে পারে যে, খবছ শব্দটির অর্থ অপবিত্র সম্পদ— যা অংশীবাদীরা ব্যয় করেছিলো রসুল স. এর বিরুদ্ধে আর ত্বইয়্যেব অর্থ— ওই পবিত্র সম্পদ যা বিশ্বাসীরা ব্যয় করেছিলেন রসুল স. এর সাহায্যার্থে।

'ইয়ারকুমাহু' অর্থ স্তূপীকৃত করে। রাকামুন অর্থ একত্রিত করা। মারকুম অর্থ মেঘের ঘনঘটা — পুঞ্জীভূত মেঘ। অর্থাৎ পুঞ্জীভূত মেঘের মতো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে স্তূপীকৃত বা পুঞ্জীভূত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

শেষে বলা হয়েছে—এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। এ কথার অর্থ, আল্লাহ্‌তায়ালার পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়। আর অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ

❐ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল ' যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা অতীতে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিবেন, কিন্তু তাহারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত তো রহিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বলে দিন, এখনও সময় আছে সত্য ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত হও। বিরত হও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা থেকে। যদি এ রকম করো তবে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের ইতোপূর্বের সকল পাপ মার্জনা করবেন। যদি বিরত না হও তবে নিশ্চিত জেনো, পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতদের মতো তোমাদের উপরেও নেমে আসবে কঠোর শাস্তি।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর শত্রুপক্ষের অনেক লোক গ্রহণ করেন ইসলামের চিরন্তন আশ্রয়। যেমন—হজরত আবু সুফিয়ান বিন হরব, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া, হজরত ইকরামা বিন আবু জেহেল, হজরত আমর ইবনে আস প্রমুখ। বদর যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিলেন তাদের মধ্যেও কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেন। যেমন হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, হজরত আকিল বিন আবু তালেব, হজরত নওফেল বিন হারেস, হজরত আবুল আস বিন রবী, হজরত উজায়ের বিন উমায়ের আবদারী, হজরত ছায়েব বিন আবু জায়েশ, হজরত খালেদ বিন হিশাম মখজুমী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবিস্ সাইব, হজরত মতলব বিন খাত্তাব, হজরত আবু বেদআ, হজরত ছাহমী, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আবী উবাই বিন খালফ্, হজরত ওয়াহাব বিন উমায়ের জমাহী, হজরত সুহায়েল বিন উমর আমেরী, উম্মত জননী হজরত সাওদার ভ্রাতা হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাম্‌য়া, হজরত কায়েস বিন সানায়েব এবং হজরত উমাইয়া বিন খালফের মুক্ত করা ক্রীতদাস হজরত মিস্‌তাস।

হজরত সায়েব বিন উবায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আঙ্গুরের ফিদিয়া প্রদানের পর। হজরত আদী বিন খাইয়ার মুসলমান হয়েছিলেন মক্কা বিজয়ের দিন। হজরত ওলিদ বিন মুগিরাকে বন্দী করেছিলেন হজরত হিশাম এবং হজরত খালেদ। তিনি মুক্তিপণ হিসেবে আঙ্গুরের ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত হয়েছিলেন প্রথমে।

তারপর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সকলে তখন এই ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলেও তো তিনি মুক্ত হতে পারতেন। অযথা মুক্তিপণ দিলেন কেনো? তিনি বলেছিলেন, বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ আমার মনোপুত নয়। লোকে হয়তো ভাববে শাস্তি অথবা মুক্তিপণ এড়ানোর জন্যই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম সত্যের আকর্ষণে, সর্বান্তঃকরণে। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। তাই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর মনিবের নিকট। এদিকে রসুল স. তাঁর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে মুক্ত হয়ে রসুল স. এর মহাঅন্তর্ধানের বৎসরে তিনি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতে সক্ষম হন।

হজরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হলে আমি রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার পবিত্র হস্ত প্রসারিত করুন। আমি ইসলামে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি স. হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি স. বললেন, হে আমর! কী হলো তোমার? আমি বললাম, আমার একটি শর্ত রয়েছে। তিনি স. বললেন, বলো। আমি বললাম, আমার অতীতের সকল গোনাহ্ যেনো মাফ করে দেয়া হয়। রসুল স. বললেন, হে আমর! তুমি কি এ কথা জানো না যে—ইসলাম অতীতের সকল পাপ মুছে দেয়। হিজরতও মোচন করে অতীতের পাপরাশি। আর হজও ঢেকে দেয় হজপূর্ব সময়ের সকল গোনাহ্‌কে। মুসলিম।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩৯, ৪০

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

❒ এবং তোমরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহের দ্বীন সামগ্রীকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❒ যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ্‌ই তোমাদিগের অভিভাবক এবং কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেত্না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' ফেত্না অর্থ বিশৃংখলা। আর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিশৃংখলা হচ্ছে শিরিক

(অংশীবাদিতা)। আলোচ্য বাক্যে ফেত্না অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কথার অর্থ—মুশরিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত শিরিক পরিত্যাগ না করবে, অথবা মুসলমানদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে জিযিয়া দিতে সম্মত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। আলোচ্য নির্দেশনাটিতে এ রকম বলা হয়নি যে, সকল অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীকে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। এ রকম মনে করা হলে আলোচ্য আয়াতটি চলে যাবে জিযিয়া সম্পর্কিত অন্য একটি আয়াতের বিরুদ্ধে, যেখানে বলা হয়েছে— মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে যদি অবিশ্বাসীরা জিযিয়া দিতে সম্মত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরো না। সুতরাং—এই আয়াতের নির্দেশনাটি দাঁড়াচ্ছে এ রকম—অবিশ্বাসীরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ অনুগত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হবে শক্তি, বিজয় এবং একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা। 'দ্বীন' শব্দের এ রকম অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে কামুস গ্রন্থে।

হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর সকল গৃহে। অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা হয়ে যাবে ইসলামের সম্পূর্ণ অধীন। সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হবে কেবল আল্লাহ্‌র। আহমদ।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।' এ কথার অর্থ— 'অবিশ্বাসীরা যদি অবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে এই সর্বোত্তম কর্মের যথা পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ্তায়ালা সকল কিছুর সম্যক দ্রষ্টা।' তাঁর অতুলনীয় দৃষ্টিপাতের মধ্যে সংঘটিত হয়ে চলেছে সকলের কর্মকাণ্ড। ভালো ও মন্দ—কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি অবিশ্বাসীদেরকে যেমন শাস্তি দান করবেন, তেমনি পুরস্কৃত করবেন অবিশ্বাস পরিত্যাগকারীদেরকে।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমাকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ওই সময় পর্যন্ত সংগ্রাম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—যতক্ষণ না তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' প্রতিষ্ঠা করে নামাজ এবং প্রদান করে জাকাত। যে এ রকম করবে আমার পক্ষ থেকে তার জীবন ও সম্পদ হয়ে যাবে সুরক্ষিত। আল্লাহ্ই তাদের অভ্যন্তরীণ হিসাব গ্রহণ করবেন (তিনি বিচার করবেন, তারা তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্যে, না অন্তরের তাগিদে ইসলাম গ্রহণ করেছে)। বোখারী ও মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ছয়জন সাহাবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুয়ুতী বলেছেন, হাদিসটি সুবিদিত (মুতাওয়াতির)।

আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে—এবং যদি তারা বিরত হয়, হয়ে যায় মুসলমান অথবা জিম্মি (জিযিয়া কর প্রদাতা), তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের আমলের সম্যক দ্রষ্টা। এমতাবস্থায় তোমরা আর যুদ্ধ কোরো না। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং ইসলাম অথবা কুফরের কারণে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন।

ক্বারী ইয়াকুব এখানে উল্লেখিত ইয়ামালুন (তারা করে) শব্দটিকে পড়তেন তা'মালুন (তোমরা করো)। তাঁর উচ্চারণটিকে গ্রহণ করলে 'আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা' কথাটি সম্পৃক্ত হবে মুসলমানদের আমলের সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে এ রকম, হে মুসলিম বৃন্দ! তোমরা তোমাদের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করো সেরূপ আচরণ করো জিম্মিদের সঙ্গে। যেহেতু তারা জিযিয়া দিয়ে তোমাদের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেছে, সেহেতু তোমরা আর তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার কোরো না। অবশেষে তোমাদের ও তাদের আমলের যথা বিনিময় প্রদান করা হবে। তোমাদেরকে দেয়া হবে পুরস্কার এবং তাদেরকে দেয়া হবে শাস্তি।

কতিপয় সাহাবীর বর্ণনাসূত্রে সাফওয়ান বিন সালিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভালো করে শুনে নাও, যে লোক জিম্মিদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি পূরণ করবে না, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু গ্রহণ করবে অথবা তাদের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। আবু দাউদ। এই হাদিসের আলোকে 'যদি তারা বিরত হয়' কথাটির উদ্দেশ্য হবে দু'টি। একটি হচ্ছে—যদি তারা অবিশ্বাস থেকে বিরত হয়। অপরটি হচ্ছে—যদি তারা জিযিয়া প্রদান করে যুদ্ধ থেকে বিরত হয়।

আল্লামা বায়যাবী বলেছেন, 'ইয়ামালুন' এর স্থলে 'তা'মালুন' উচ্চারণ করলে অর্থ হবে এ রকম— হে মুসলমানেরা! তোমরা জেহাদ করছো, ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছো, মানুষকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ইমানের দিকে আসতে বলছো—তোমাদের এ সকল আমলকে আল্লাহ্‌তায়ালা দেখছেন। এ সকল আমলের জন্য তিনি তোমাদেরকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেন। বায়যাবীর এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, বিষয়টিকে ছেড়ে দিতে হবে তকদীরের উপর। অর্থাৎ মুসলমানেরা কেবল ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত থাকবে। যার তকদীরে ইমান রয়েছে সে ইমান গ্রহণ করবে, আর যার তকদীরে ইমান নেই সে ইমানহীন অবস্থাতেই থেকে যাবে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর সম্যক দ্রষ্টা। তাই তাঁর অধিকারেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের বিষয়টি।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে—'যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক এবং কতো উত্তম অভিভাবক এবং কতো উত্তম সাহায্যকারী।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হয় তবে তাতে করে তোমাদের চিন্তিত হবার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ্তায়ালাই তোমাদের অভিভাবক, বন্ধু। বন্ধু কখনো বন্ধুকে ধ্বংস হতে দেয় না। আর অভিভাবক সব সময় তার অভিভাবকাধীনদেরকে সর্বোত্তম সহায়তা দান করে থাকে। আল্লাহ্তায়ালাও বিশ্বাসীদের সর্বোত্তম সাহায্যকারী। সুতরাং তোমরা কেবল আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হও। কাফেরদের প্রতাপ ও যুদ্ধ প্রস্তুতিকে আমলেই এনো না। সংগ্রাম করো। ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাও (যতক্ষণ না তারা শুভ বুদ্ধিকে মান্য করে ইসলামের পথে আসে অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে স্বীকার করে তোমাদের বশ্যতাকে)।

দশম পারা

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪১

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

❐ আরও জানিয়া রাখ যে যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহের, রসূলের, রসূলের স্বজনদিগের, পিতৃহীনদিগের, দরিদ্রদিগের এবং পথচারীদিগের, যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহে এবং তাহাতে মীমাংসার দিন যাহা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম যখন দুই দল পরস্পরে সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণিমত) সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) সম্পর্কে। প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়ালামু আন্নামা গণিম্‌তুম মিন্ শাইইন' (আরো জেনে রাখো যে যুদ্ধে যা লাভ করো)। এ কথার অর্থ— যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যে সকল সম্পদ তোমাদের অধিকারে আসে। বিদ্রোহী অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত অবিশ্বাসীর পরিত্যক্ত সম্পদ—সব কিছুই গণিমতের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুসলিম দেশের প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে একজন অথবা দুইজন মুসলমান যদি কাফেরদের রাজ্যে গিয়ে যুদ্ধ করে তাদের নিকট থেকে কিছু সম্পদ ছিনিয়ে আনে তবে বায়তুল মালে খুমুস প্রদান করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি চারজন

মুসলমান দারুল হরবের (কাফের সাম্রাজ্যের) যুদ্ধবাজদের নিকট থেকে সম্পদ ছিনিয়ে আনে তবে খুমুস প্রদান করা তাদের উপরে হবে ওয়াজিব। মুহিত গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, এমতোক্ষেত্রে মুসলিম যোদ্ধার সংখ্যাগত দিকটি বিবেচ্য। এ রকম অভিযানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে কমপক্ষে দশজনের একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, একাই একজন দারুল হরব থেকে সম্পদ ছিনিয়ে আনলেও তার পক্ষে খুমুস প্রদান করা হবে ওয়াজিব। কেননা ওই সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে গণ্য। তাই ওই সম্পদের উপর পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে গণিমতের বিধান।

ইমামে আজম এবং অন্য এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত এই যে, চুরি করা সম্পদ গণিমতের মাল হতে পারে না। কারণ তা বলপূর্বক অর্জন করা হয়নি। সরিয়ে নেয়া হয়েছে গোপনে। বিধর্মীদের দেশ থেকে গোপনে কোনো সম্পদ আনলে তার দৃষ্টান্ত হবে গভীর অরণ্য থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করা অথবা অরণ্যবাসী কোনো প্রাণীকে শিকার করার মতো। এভাবে অর্জিত সম্পদকে গণিমত বলা যায় না। তাই তার উপর খুমুসের বিধানও প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মুসলিম শাসকের অনুমতি সাপেক্ষে একজন বা দু'জন যদি বিধর্মীদের রাজ্য থেকে কৌশলে কোনো সম্পদ অধিকার করে আনে, তবে সেই সম্পদের উপর সর্বসম্মতিক্রমে খুমুস ওয়াজিব হবে। কেননা মুসলিম শাসকের অনুমতি প্রদানের অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করা। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গেলে অবশ্যই অভিযাত্রীদের সংখ্যা চার অথবা চারের অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, শাসকের অনুমতি ছাড়া কোনো মুসলমান বিধর্মী রাজ্যে প্রবেশ করলে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করাও শাসকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এ রকম না করলে ইসলাম ও মুসলমানদের নামে অপবাদ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে বিধর্মীদের রাজ্যে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে আর কেউ চোর বলতে পারবে না।

'যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো'—কথাটির মধ্যে সম্পদের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যত কমই হোক না কেনো তার খুমুস প্রদান করা ওয়াজিব—সুঁই অথবা সূতা হলেও। হজরত উবাদা বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূতা ও সুঁই জমা করে দিও। আর গণিমতের সম্পদকে মুক্ত রাখো অপহরণ থেকে। কিয়ামতের দিন গণিমতের সম্পদ অপহরণকারীরা লজ্জিত হবে। দারেমী। ইমাম শাফেয়ী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওমর বিন শোয়াইবের বর্ণনা সূত্রে। একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবু

দাউদ। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এ কথাটি—এ কথা শুনে এক লোক, যার হাতের মধ্যে ছিলো এক গোছা চুল, সে বললো, আমি এই চুলটুকু নিয়েছিলাম আমার খচ্চরের জিন ঠিক করার জন্য। রসুল স. এ কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে, ওই পশমটুকু আমার এবং বনী আবদুল মুত্তালিবের অংশ থেকে তোমাকে দেয়া হলো।

এরপর বলা হয়েছে— ফা আন্না লিল্লাহি খুমুসাহ্ (তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র)। এ কথার অর্থ—যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশের মালিকানা আল্লাহ্‌র। এ কথা এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট চার অংশ সম্পর্কে এ রকম দৃঢ় ঘোষণা নেই। তাই হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, অন্য চার অংশের অধিকারীদের উপরে খুমুস প্রদান করা ওয়াজিব নয়। কারণ খুমুস তাদের অধিকারভূত কোনো বিষয় নয়। খুমুস তাদের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল এ কথা বলা যেতে পারতো যে খুমুস তাদের উপর ওয়াজিব। কিন্তু আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে খুমুসকে শুরু থেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জাকাতের প্রসঙ্গ টেনে বিষয়টিকে আরো ভালোভাবে বুঝে নেয়া সম্ভব। বিত্তশালীদের উপর জাকাত ওয়াজিব। কারণ এক্ষেত্রে সম্পদের পুরো মালিকানা দেয়া হয়েছে জাকাতদাতাদেরকে। আল্লাহ্-তায়ালাই জাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জাকাতের উপর তাঁর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেননি— যেমন করেছেন খুমুসের বেলায়। আর জাকাত দরিদ্র জনসাধারণের হক। তাই তা রসুল স. ও তাঁর নিকটজনের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর খুমুসের মালিকানা সম্পূর্ণতঃই আল্লাহ্‌র। তাই রসুল স. ও তাঁর নিকটজনদের জন্য খুমুসকে করা হয়েছে হালাল। আল্লাহ্‌পাকের নিকট থেকে সরাসরি প্রাপ্ত এই খুমুস তাঁর রসুল কীভাবে ব্যয় করবেন, পরের বাক্যে সে কথা বলে দেয়া হয়েছে এভাবে—

'ওয়ালির্ রসুলি ওয়ালি জিলকুরবা' (রসুলের, রসুলের স্বজনদের)। 'রসুলের স্বজন' কথাটির ব্যাখ্যায় আলেমগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কুরায়েশ গোত্রের সকলেই রসুলের স্বজন। মুজাহিদ এবং ইমাম জয়নাল আবেদীনের মতে রসুলের স্বজন কেবল বনী হাশেমের লোকেরা। ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে, আব্‌দে মান্নাফের দুই পুত্র হাশেম ও মুত্তালিবের আওলাদেরা রসুলের স্বজন। আব্‌দে মান্নাফের অপর দুই পুত্র আবদুস্ শামস্ এবং নওফেলের বংশধরেরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্বস্তসূত্রে হজরত জাবের বিন মুত্য়েম থেকে ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন রসুল স. খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন কেবল বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে। আবদুস্ শামস্ ও বনী নওফেলকে তিনি খুমুসের অংশ দেননি। বোখারীও তার সহিহ্ পুস্তকে এ রকম লিখেছেন। ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত যোবায়ের বিন মুত্য়েম বলেছেন, রসুল স. স্বজন হিসেবে খুমুসের সম্পদ বণ্টন করেছিলেন বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের মধ্যে। আমি এবং হজরত ওসমান বিন আফফান আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরাও তো বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অন্তর্ভুক্ত বনী মুত্তালিব। এ কথা বলা সত্ত্বেও তিনি স. আমাদেরকে খুমুসের অংশ দিলেন না। বরং এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিব তো এ রকম (পরস্পরলগ্ন)। আবু দাউদ, নাসায়ী। প্রকৃত ঘটনা ছিলো এ রকমই। রসুল স. এর মক্কী জীবনে (হিজরতপূর্ব সময়ে) একবার কুরায়েশ নেতারা সকলে মিলে রসুল স.কে একঘরে করে দিয়েছিলো। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিলো একটি চুক্তি। সেই চুক্তি মোতাবেক কুরায়েশ নেতারা তাদের গোত্রের লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলো, তোমরা বনী হাশেমের সঙ্গে ওঠা-বসা কোরো না। কোনো প্রকার লেন-দেন এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন কোরো না। তাদের ওই চুক্তিতে বনী মুত্তালিবের উল্লেখ ছিলো না। তৎসত্ত্বেও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর সঙ্গ ত্যাগ করেনি। তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর সঙ্গে শি'বে আবু তালেব পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো এবং অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলো। এ রকম অন্তরীণ অবস্থায় তাদেরকে অতিবাহিত করতে হয়েছিলো পুরো একটি বছর। সুনান গ্রন্থের মাগাজী অধ্যায়ে এ রকম বলা হয়েছে। বায়হাকীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। খাত্তাবী লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন সূত্রেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। উল্লেখ্য যে, কেবল বংশগত সূত্রে বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব রসুল স. এর স্বজন ছিলেন না, সুখে-দুঃখে সব সময় তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও। পরেও। বংশগত সূত্রে বনী আবদুস্ শামস্ এবং বনী নওফেলও রসুল স. এর স্বজন। তবুও রসুল স. তাদেরকে খুমুসের অংশ প্রদান করেননি।

হেদায়া প্রণেতা লিখেছেন, রসুল স. তাঁর স্বজন নির্বাচনের বেলায় বংশগত নৈকট্যকে বিবেচনা করেন নি। বিবেচনা করেছেন, সাহায্য সহযোগিতাকে। বনী মুত্তালিব ছিলো বনী হাশেমের সার্বক্ষণিক শুভাকাঙ্খী ও সাহায্যকারী। তাই তাদেরকে তিনি স. আকাবের বা স্বজন হিসেবে গণ্য করেছেন। বনী আবদুস্ শামস্ এবং বনী নওফেলকে এ রকম করেননি। তাই বনী হাশেমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খুমুস বণ্টনের বেলায় রসুল স. তাদেরকে আকাবেরের (স্বজনের)

অন্তর্ভুক্ত করেননি। কারণ তারা ইসলামের সাহায্যকারী ছিলেন না। হেদায়া রচয়িতার এই অভিমতটি ভুল। ইসলামের সাহায্য করাই যদি রসুল স. এর স্বজন হওয়ার যোগ্যতা হয়, তবে হজরত আব্বাসের চেয়ে হজরত ওসমানই স্বজন হিসেবে অধিকতর উপযুক্ত হতেন। ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি শুরুতেই। আর হজরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অনেক পরে—বদর যুদ্ধের পর। এ ছাড়াও অন্যান্য মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণ রসুল স. এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের জীবন ও সম্পদ। তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও সাহায্যকারী। তৎসত্ত্বেও খুমুস বন্টনের বেলায় রসুল স. তাঁদেরকে 'স্বজন' হিসেবে গণ্য করেননি। কিন্তু হজরত আব্বাসকে তিনি স. খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াল ইয়াতামা' (এবং পিতৃহীনদের)। ইয়াতামা শব্দটি ইয়াতিম শব্দের বহু বচন। যে সকল শিশুর পিতৃবিয়োগ ঘটেছে তাদেরকে বলা হয় ইয়াতিম। কামুস গ্রন্থে রয়েছে ইয়াতিম অর্থ পিতৃবিয়োগ। প্রাপ্ত বয়স্কদের পিতৃ বিয়োগ ঘটলে তাদেরকে ইয়াতিম বলা যায় না। কেবল পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ইয়াতিম বলা হয়। হজরত আলী থেকে আবু দাউদ এ রকম বর্ণনা করেছেন। উকাইলি, আবদুল হক, ইবনে কাত্তান এবং ইবনে মুনজেরী হাদিসটিকে বলেছেন মুয়াল্লাল(অস্বচ্ছ)। ইমাম নববী বর্ণনাটিকে বলেছেন উত্তম। ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবু দাউদ এবং তায়লাসী। হজরত তালহা বিন হুজায়ফা থেকেও এ রকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে তিবরানীর 'কবির' গ্রন্থে। হজরত জাবের থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী। কিন্তু এই বর্ণনাসূত্রভূত এক বর্ণনাকারী হাজেম বিন ওসমানকে হাদিস বিশারদগণ বলেছেন মাতরুক (পরিত্যক্ত)। হজরত আনাস থেকেও এ রকম হাদিস এসেছে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াল মাসাকীনা' (দরিদ্রদের)। মাসাকিন শব্দটি মিসকিন শব্দের বহুবচন। সুরা তওবার তাফসীরে যথাস্থানে মিসকিনদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'ওয়াব্‌নিস্‌সাবীল' (এবং পথচারীদের)। কথাটির শাব্দিক অর্থ, পথের পুত্র বা সন্তান। প্রকৃত অর্থ পথচারী বা মুসাফির। মুসাফিরদেরকে পথে পথে ভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণের সময় মনে হয় পথই তাদের পিতা-মাতা-সব। তাই তাদেরকে বলা হয় ইবনুস্‌ সাবীল বা পথের পুত্র।

লক্ষণীয় যে, নিঃস্ব হওয়ার কারণেই পিতৃহীন, দরিদ্র ও পথচারীদেরকে খুমুসের অর্থ গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা করা হয়েছে। তাই ইমামগণের ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, তারা যদি নিঃস্ব না হয় (সম্পদাধিকারী হয়), তবে তাদেরকে

খুমুস দেয়া যাবে না। কিন্তু রসুল স. এর স্বজনদেরকে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে খুমুস দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. এর স্বজনদের মধ্যে যারা নিঃস্ব নয়, তাদেরকে খুমুস দেয়া যাবে না। কিন্তু কথাটি ভুল। কেননা আয়াতে স্পষ্ট করে এ রকম কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের উল্লেখে নিঃস্ব হওয়ার কথা পরিষ্কার অনুমান করা যায়। হজরত আব্বাস ছিলেন বিত্তশালী। তৎসত্ত্বেও রসুল স. তাঁকে খুমুসের সম্পদ প্রদান করেছিলেন।

হাদিস বর্ণনাকারী এবং ইমামগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. গণিমতের মালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। চার ভাগ দিয়ে দিতেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারীদেরকে। অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশকে তিনি স. পুনরায় ভাগ করতেন পাঁচটি ভাগে। এক ভাগ রাখতেন নিজের জন্য এবং পরিবার পরিজনের জন্য। ওই অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন তিনি। জেহাদের জন্য ক্রয় করতেন তরবারী ও অশ্ব। অন্য অংশগুলো খরচ করতেন মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। দান করতেন ধনী-নির্ধন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিবকে। কখনো এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরকে।

এখন কথা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণী ছাড়া অন্য কাউকে খুমুসের সম্পদ দেয়া যাবে কি না এবং এক শ্রেণীর অংশ অন্য শ্রেণীকে দেয়া যাবে কি না অথবা এক শ্রেণীর অংশ ওই শ্রেণীর সকলকে না দিয়ে একজনকে দিলে তা যথার্থ হবে কিনা। যেমন একাধিক এতিম থাকা সত্ত্বেও একজন এতিমকে দিলে তা ঠিক হবে কিনা। ইমাম আজম বলেছেন এ রকম করা যাবে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন এতিম, মিসকিন এবং মুসাফির— কেউই উজুবী হকদার (আবশ্যিক পাওনাদার) নয়। তাই ওই তিন শ্রেণীর যে কোনো একটি শ্রেণীকে তাদের অংশের সকল সম্পদ দান করলে তা সিদ্ধ হবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের কতিপয় আলেম এবং ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ওই তিন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অর্থ ওই তিন শ্রেণীকেই দিতে হবে। এক শ্রেণীর অংশ অন্য শ্রেণীর অংশের সঙ্গে মেলানো যাবে না। আর সনাক্ত করা সম্ভব হলে প্রতিটি শ্রেণীর সকল সদস্যকে ওই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

গণিমতের অপর চার অংশও তেমনি সকল যোদ্ধাদের মধ্যে নিয়মানুসারে বণ্টন করে দিতে হবে। কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা ঐকমত্য। ইমাম শাফেয়ী সকল আত্মীয়স্বজনকে খুমুসের সম্পদ লাভের উপযোগী বলে মনে করেন। বলেন, নিকটাত্মীয়েরা মিরাস বা উত্তরাধিকারের অংশ পায়। দূরের আত্মীয়েরা পায় না। কিন্তু নিকটের ও দূরের সকল আত্মীয়ই খুমুসের অংশ পেতে পারে। মিরাসের ক্ষেত্রে যেমন মেয়েরা একগুণ এবং পুরুষেরা দ্বিগুণ অংশ পায় খুমুসের বেলায়ও তেমনি পাবে। যদি স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র এবং মুসাফিরের

সংখ্যা অনেক হয়, তবে প্রতিটি শ্রেণী থেকে দান করতে হবে তিনজনকে। আয়াতে রসুল স. এর স্বজনদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'লিজিল কুরবা।' এই বাক্যাংশটির প্রথমে ব্যবহৃত লাম অক্ষরটি সেই বিশেষত্বের প্রমাণ। সুতরাং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নিয়ে প্রথমেই দিতে হবে স্বজনদেরকে—সম্পদ বেশী-কম যাই হোক না কেনো। উল্লেখ্য যে, 'লিজিল কুরবা' কথাটি বহুবচন বোধক নয়। অর্থাৎ স্বজন বুঝাতে এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু ইয়াতিম ও মিসকিনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের শব্দরূপ (ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনি)।

ইমাম আজম এবং আমাদের অভিমত হচ্ছে, এখানে প্রতিটি শ্রেণীর উল্লেখের শুরুতে লাম অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে শ্রেণীগুলোকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার জন্য। এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মালিকানা বা স্বত্ব নির্ধারণের জন্য নয়। এভাবে এ কথাটিই বলে দেয়া উদ্দেশ্য যে—এই চারটি শ্রেণী (স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথচারী) গণিমতের খুমুস লাভের অধিকারী। এই শ্রেণীগুলোর বাইরে অন্য কাউকে খুমুসের অংশীদার করা যাবে না। সুতরাং এখানে ব্যবহৃত 'লাম' অক্ষরটি ইস্তেগ্রাকী (নিমজ্জক) নয়। অর্থাৎ বর্ণিত শ্রেণীগুলোকে এখানে একীভূত করা হয়নি, চিহ্নিত করা হয়েছে কেবল আলাদাভাবে। তবে একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কেউ আবার অন্য তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তও হয়ে যেতে পারে। যেমন, স্বজন হতে পারে পিতৃহীন, দরিদ্র অথবা মুসাফির অথবা পথচারী। পিতৃহীনও তেমনি হতে পারে একাধারে স্বজন, দরিদ্র এবং পথচারী। এভাবে দরিদ্র ও পথচারী ও দুই তিন বা চারটি শ্রেণীর গুণসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। এমতোক্ষেত্রে একজনকে একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। নতুবা সে দুই তিন বা চার অংশ পাবে। তখন ব্যাপারটি হয়ে যাবে মিরাসের অংশ পাওয়ার মতো। ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীরা কখনো কখনো একবার তার অংশ লাভ করার পর পুনরায় অন্যভাবে অংশ পায়। যেমন কোনো মহিলার স্বামী যদি তার চাচাতো ভাই হয় তবে সে চাচার অংশ যেমন লাভ করবে, তেমনি লাভ করবে স্বামীর অংশ।

হজরত আলী থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নিজ হাতে আটা পিষতে পিষতে হজরত ফাতেমার হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো। তিনি একবার সংবাদ পেলেন গণিমত হিসেবে রসুল স. এর নিকটে কতিপয় গোলাম ও বাঁদী এসেছে। এ কথা শুনে তিনি রসুল স. এর গৃহে গমন করলেন। রসুল স. তখন সেখানে ছিলেন না। তাই তিনি হজরত আয়েশাকে জানালেন, প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্য একটি গোলাম বা বাঁদীর বিশেষ প্রয়োজন। এ কথা বলে তিনি স্বগৃহে চলে এলেন। ওদিকে রসুল স. তাঁর ঘরে এসে হজরত আয়েশার নিকটে শুনলেন সব কিছু। তৎক্ষণাৎ তিনি স. চলে এলেন আমাদের গৃহে। আমি ও

হজরত ফাতেমা তখন শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। রসুল স. এর আগমনের কথা বুঝতে পেরে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। তিনি স. বললেন, ওভাবেই শুয়ে থাকো এ কথা বলে তিনি স. এসে উপবেশন করলেন আমাদের দু'জনের মাঝখানে। তাঁর পবিত্র হাঁটু আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছিলো। আমি অনুভব করছিলাম তাঁর পবিত্র পা শীতল। তিনি স. বললেন, তোমাদেরকে আমি এমন একটি আমলের কথা বলে দেবো, যা পরিচারক লাভ করা অপেক্ষা উত্তম। আমলটি হচ্ছে— তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার। মুসলিমের বর্ণনাটি এ রকম—হজরত ফাতেমাকে উদ্দেশ্য করে রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলবো, যা খাদেম লাভ করা অপেক্ষা উত্তম? তোমরা নামাজের সময় এবং শয্যা গ্রহণের সময় এই আমলটি কোরো—সুবহানাল্লাহ্ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী একবার হজরত ফাতেমাকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার জনককে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। গণিমত হিসেবে তাঁর নিকট এসেছে কয়েকজন ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাস। খাদেম হিসেবে তুমি তাদের একজনকে চেয়ে নিয়ে এসো। হজরত ফাতেমা তখন রসুল স. এর নিকটে গিয়ে একটি খাদেমের আবদার করলেন। রসুল স. বললেন, আমার সর্বহারা সহচরেরা (আহলে সুফফারা) অনাহারে থাকবে, আর আমি তোমাদেরকে খাদেম দান করবো—এটা কি করে সম্ভব (গোলাম এবং বাঁদী বিক্রয় করে সর্বহারাদের আহারের সংস্থান করাই বেশী জরুরী, যেহেতু আহার্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ আমার কাছে নেই)। হে আমার প্রিয় আত্মজা! হজরত জিবরাইল আমাকে একটি আমলের কথা বলে দিয়েছেন। ওই আমলটি গোলাম বা বাঁদী অর্জন অপেক্ষা উত্তম। আমলটির কথা আমি কি তোমাদেরকে জানাবো না? অবশ্যই জানাবো। তোমরা শয্যা গ্রহণের প্রাক্কালে দশ বার সুবহানাল্লাহ্, দশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়ে নিয়ো।

ফজল বিন হোসাইন বিন ওমর বিন হাকিম সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, ফজলের মা বলেছেন, আমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে হজরত ফাতেমার খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. এর দরবারে। রসুল স. তখন কোনো এক জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সঙ্গে গণিমত হিসেবে এনেছেন কতিপয় দাস-দাসী। হজরত ফাতেমা প্রার্থী হলেন একটি গোলামের জন্য। তিনি স. বললেন, এ ব্যাপারে বদর যুদ্ধের শহীদগণের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততিদের অধিকার তোমার চেয়ে বেশী।

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রসুল স.চারটি শ্রেণীর মধ্যে সকল শ্রেণীকে খুমুসের অংশ দান করেন নি। যেমন তিনি স. একবার খুমুসের অংশ দান করেছিলেন আসহাবে সুফ্ফা এবং বদর যুদ্ধের পিতৃহীন-দেরকে। অথচ হজরত ফাতেমা ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকট স্বজন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হচ্ছে, এতিম ও মিসকিনকে দিতে হবে আলাদাভাবে। স্বজনদের অংশ থেকে নয়। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে আশ্‌আস বিন সাওয়ারের মাধ্যমে আবু যোবায়ের সূত্রে হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তা আমাদের অভিমতের পরিপোষক। হজরত জাবের বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. খুমুসের অংশ থেকে যোদ্ধাদের জন্য বাহন ক্রয় করতেন। এবং কখনো কখনো সাংসারিক প্রয়োজনও মেটাতেন। পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণ গণিমতের সম্পদ আসতে শুরু করলো। তখন তিনি স. খুমুসের অংশ থেকে এতিম মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য খরচ করতে শুরু করলেন। আমি বলি, খুমুসের উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকার মালিকানা নেই। আর আল্লাহ্ই তা রসুল স. কে খরচ করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। তাই রসুল স. তাঁর ইচ্ছানুসারে খরচ করতে পারতেন। যতোটুকু ইচ্ছা করতেন নিজের জন্য রাখতেন, যতটুকু ইচ্ছা খরচ করতেন স্বজনদের জন্য। অথবা এতিম, মিসকীন কিংবা মুসাফিরের জন্য।

এখানে তিনটি শব্দের শুরুতে 'লাম' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে তিন রকম অর্থে। 'লিল্লাহি'তে মালিকানা অর্থে, 'লির্ রসুলি'তে খরচ করার অধিকার অর্থে এবং 'লি জিলক্কুরবা'তে গ্রহণের অধিকার অর্থে। আর এই খরচ করার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অবশিষ্ট তিনটি শ্রেণী—এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। অর্থাৎ এই তিনটি শ্রেণীও স্বজনদের মতো তিনটি খরচের ক্ষেত্র। এভাবে এই চারটি ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো খরচ করার অধিকার দেয়া হয়েছে রসুল স.কে। আর স্বজনদের মধ্যে তাঁর পরিবার পরিজনেরাও পড়েন। আবার পরিবার পরিজনের বাইরের সদস্যরাও পড়েন। তারা আবার এতিম, মিসকিন কিংবা মুসাফিরও হতে পারেন। যাই হোক, এ সকল খরচ নির্বাহের জন্য তিনি খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ ছাড়া গণিমতের সম্পদ থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করতেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার মালিকানা ছাড়া অন্য কারো মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতেন না। ওমর ইবনে আমবারের বর্ণনাসূত্রে আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন, একবার রসুল স. উটের শরীর থেকে একটি চুল উঠিয়ে নিয়ে বললেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে খুমুস ব্যতীত এই পশমের পরিমাণ সম্পদও আমার জন্য হালাল নয়। আর এই খুমুসও অবশেষে তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেয়া হয়।

আমর ইবনে শোয়াইবের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে— রসুল স. বলেছেন, গণিমতের সম্পদ থেকে খুমুস ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো কিছু আমার

জন্য বৈধ নয়। উটের এই পশমটির পরিমাণও নয়। খুমুস অর্থ মালে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ। পাঁচ অংশের পঞ্চমতম অংশ— এ রকম নয়। এতে করে বুঝা যায়, রসুল স. তাঁর ইচ্ছেমতো খুমুসের সম্পদ নির্ধারণ করতে পারতেন।

মাসআলাঃ রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরেও খুমুসের বিধান অবশিষ্ট রয়েছে কিনা— সে সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, রসুল স. তাঁর পৃথিবীর জীবনে নিজের জন্য রক্ষিত খুমুসের অংশ থেকে মুসলমানদের উন্নতির জন্য এবং ইসলামের প্রসারের জন্য ব্যয় করতেন। জেহাদের জন্য ক্রয় করতেন যুদ্ধ পোশাক এবং ঘোড়া। ইব্রাহিমের বর্ণনাসূত্রে আমুস উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর তাঁদের খেলাফতের সময় খুমুসের অংশ থেকে ক্রয় করতেন যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধাশ্ব।

কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র রসুল হওয়ার কারণে রসুল স, খুমুসের সম্পদ ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন। শাসক হিসেবে নয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর আর কেউ খুমুসের অধিকার পাবে না। কারণ ওই অধিকার ছিলো রসুল হওয়ার কারণে। তিনিই সর্বশেষ রসুল। তাই তাঁর মহা অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে খুমুসের বিধানটিও অন্তর্হিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রসুলের কথা। তাঁর স্থলাভিষিক্তদের কথা এখানে নেই। রসুল স. তাঁর ইচ্ছেমতো খুমুস গ্রহণ করতে পারতেন। যেমন তিনি বদরের যুদ্ধে মামবাহ্ বিন হাজ্জাজের জুলফিকার নামক তরবারীটি পছন্দ করে নিয়েছিলেন। আবার খায়বার যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে ইহুদী হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা হজরত সাফিয়াকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছিলেন। জননী আয়েশা থেকে যথাসূত্রে (সহিহ্ সনদে) আবু দাউদ ও হাকেম এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর পর কোনো মুসলমান শাসক কিংবা খলিফা এ রকম পছন্দ করার অধিকার রাখেন না। আর খুমুস গ্রহণ করার অধিকারও রসুল স. ছাড়া অন্য কারো নেই।

মাসআলাঃ রসুল স. এর মহাপ্রয়ানের পর তাঁর স্বজনেরাও আর খুমুসের অংশ পাবেন না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর স্বজনদের অংশও অবলুপ্ত হয়েছে। হানাফী মতাবলম্বীগণ বিভিন্ন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে এ কথাটি প্রমাণ করেছেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে রসুল স. এর স্বজনেরা খুমুসের অংশ পেতেন না। পেতেন রসুল স. এর সাহায্যকারী হিসেবে। মূর্খতা ও ইসলাম উভয় যুগে বনী হাশেম ছিলেন রসুল স. এর একনিষ্ঠ সাহায্যকারী। একারণেই খুমুসের অধিকার লাভ করেছিলেন তাঁরা। ইতোপূর্বে হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েমের হাদিসে এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি স. বনী মুত্তালিবকে খুমুসের অংশ

দিয়েছিলেন কিন্তু বনী আবদুস শামস এবং বনী নওফেলকে দেননি। অথচ বনী মুত্তালিবের মতো তারাও ছিলো বনী হাশেমের গোত্রভূত। রসুল স. তখন হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখিয়ে বলেছিলেন, বনী মুত্তালিব ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে এভাবে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবল বংশীয় নৈকট্যই খুমুসের অংশ লাভের যোগ্যতা নয়। সুখে-দুঃখে, অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থায় রসুল স. কে সহায়তা প্রদান করাই খুমুসের অংশ লাভের প্রকৃত যোগ্যতা। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর তাঁকে সাহায্য করার সুযোগ আর নেই। তাই তারা আর খুমুসের অংশীদার নন। হেদায়া রচয়িতার এই দলিলটি দুর্বল। ইতোপূর্বেও সে কথা বলা হয়েছে। তাহাবী লিখেছেন, বংশগত নৈকট্যই খুমুস লাভের প্রধান যোগ্যতা। কিন্তু এই বংশগত নৈকট্য বিশেষ বিশেষ স্বজনের জন্য নির্ধারিত। আর এই নির্ধারণ সম্পূর্ণতঃই রসুল স. এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সিদ্ধান্তনুসারেই বনী মুত্তালিব খুমুসের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং বনী আবদুস শামস ও বনী নওফেল। বিবেচিত হয়েছিলো অনুপযুক্ত বলে। রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর এ রকম নির্ধারণের অবকাশ আর নেই। কারণ সিদ্ধান্তদাতা এখন অনুপস্থিত। তাই তাঁর স্বজনের অংশও এখন অবলুপ্ত। এভাবে রসুল স. নিজের জন্য যা গ্রহণ করতেন তা গ্রহণ করার অবকাশও আর নেই। কারণ তিনি পৃথিবীর প্রয়োজন থেকেও এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাহাবী তার অভিমতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন অন্য একটি পদ্ধতিতে। সেটি হচ্ছে—রসুল স. এর স্বজন বলতে বুঝানো হয়েছে সকল স্বজনকে। কাউকে কাউকে স্বজন বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিন্তু তিনিই স. বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবকে খুমুসের অংশ দিয়েছেন। বনী নওফেল এবং বনী উমাইয়াকে কিছুই দেননি। যাদেরকে দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যাও ছিলো স্থিরকৃত। ওই স্থিরকৃত ব্যক্তিদের কেউ কেউ ছিলেন বিত্তশালী আবার কেউ কেউ ছিলেন বিত্তহীন। আবার যাদেরকে অংশ দেননি তাদের সংখ্যাও ছিলো সুনির্ধারিত। বিত্তশালী ও বিত্তহীন ছিলো তাদের মধ্যেও। এতে করে বুঝা যায় ওই সম্পদ ছিলো রসুল স. এর নিজের। তাই তিনি যাকে পছন্দ করতেন তাকে দান করতে পারতেন। যেমন, মালে গণিমত থেকে কিছু কিছু সামগ্রী তিনি ইচ্ছেমত গ্রহণ করতে পারতেন। পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর পছন্দমত গ্রহণ করা এবং পছন্দমত দান করার অবকাশটি আর নেই। ফলে, নিজের জন্য পছন্দমত গ্রহণ এবং পছন্দমত দান এখন আর সম্ভব নয়। তাহাবী লিখেছেন, এমতো অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত দু'টি দলিলই দুর্বল। সকল অবস্থায় বনী মুত্তালিব ছিলো বনী হাশেমের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। তাই রসুল স. গোত্র দু'টোকে একীভূত করেছিলেন। ওই একীভূতির মধ্যে আবদে মান্নাফের বংশধর ও আত্মীয় হওয়ার বিষয়টি অর্ন্তভূত ছিলো না। ওই একীভূতির কারণে সদ্কার সম্পদ বনী হাশেমের প্রতি হারাম করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনী মুত্তালিবের জন্য তা হারাম করে দেয়া হয়েছিলো। এই বিষয়টিও নির্ভরশীল ছিলো আবদে মান্নাফের বংশধর হওয়া না হওয়ার উপর। এরপর এ রকম বললে ভুল হবে যে, রসুল স. এর বংশগত নৈকট্য বনী হাশেমের সঙ্গে যেরূপ ছিলো, ঠিক সেরূপই নৈকট্য ছিলো বনী মুত্তালিবের সঙ্গে। দাদার বংশ নিশ্চয় দাদার ভাইয়ের বংশ অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী।

যদি বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত রসুলের স্বজন অর্থ তাঁর সকল স্বজন নয়— তবু কথা থেকে যায় যে সেই স্বজনদের সংখ্যা কিন্তু নিরূপণ করা হয়নি। সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়তে অথবা কমতেও তো পারে। আর খুমুসের অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন রসুল স. এর উপর নির্ভরশীল হলেও এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তাঁর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর সিদ্ধান্তদানের ওই ধারাবাহিকতা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বরং এ কথা বলাই সমীচীন হবে যে, ওই ধারাবাহিকতা অবশ্যই বহন করবেন তাঁর খলিফাবৃন্দ। তাছাড়া সদকা ও মালে গণিমতের খুমুসের মধ্যে রয়েছে এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের অংশ। কোরআন মজীদেও এগুলোর স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। সুতরাং দানের ধারাবাহিকতা তো চলতেই থাকবে। তাই তিনি যেমন তাঁর পছন্দমত দান করতেন, তেমনি তাঁর পছন্দের অনুসরণে পরবর্তী সময়ে দান করে যেতে থাকবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফাবৃন্দ।

আত্মীয় স্বজনের হক যদি রসুল স. কে প্রদান করা হয়েও থাকে, তবু তার অর্থ এই নয় যে, রসুল স. পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের হক নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে রসুল স. এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরকেও তাঁর পছন্দমত দান করতেন। পছন্দমত দান করার অধিকার তাঁর ছিলো। কিন্তু ওই সম্পদের মালিক তিনি ছিলেন না। ওই সম্পদের হকদার ছিলো এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরেরা। রসুল স.এর মহাপ্রস্থানের পর তাদের হক পরিশোধের দায়িত্ব তো স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিনিধিদের উপর বর্তায়। তাই আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর স্বজনদের অংশ বিলুপ্ত হবে না, বরং তাদের অংশ বন্টনের দায়িত্ব এসে পড়বে খলিফাগণের উপর।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে আলেম-গণের প্রতিটি দল তাঁদের নিজেদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, খোলাফায়ে রাশেদীন খুমুসের পাঁচটি অংশের মধ্যে দু'টি অংশ অবলোপন করেছিলেন এবং কার্যকর রেখেছিলেন তিনটি অংশ।

অবলোপন করেছিলেন রসুল স. এবং তাঁর স্বজনদের অংশ। আর জারি রেখে-ছিলেন এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরের অংশ। উল্লেখ্য যে, খলিফাগণের আমল অবশ্য অনুসরণীয়। হেদায়া রচয়িতা এ কথাও লিখেছেন যে, চার খলিফার এই সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে সাহাবীগণও কিছু বলেন নি। ফলে সিদ্ধান্তটি হয়ে গিয়েছে ঐকমত্যসম্ভূত। কিন্তু বাগবী লিখেছেন, রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর খলিফাগণ তাঁর স্বজনদেরকে খুমুসের অংশ দিয়েছিলেন। আর এ ব্যাপারে তাঁরা ধনী ও নির্ধনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস ছিলেন বিত্তশালী। তৎসত্ত্বেও তাকে খুমুসের অংশ দেয়া হয়েছিলো।

কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে কালাবীর মাধ্যমে আবু সালেহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীর জীবনে খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হতো— এক ভাগ রসুল স. এর জন্য, এক ভাগ তাঁর স্বজনদের জন্য এবং বাকী তিন ভাগ পিতৃহীন, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। তাঁর মহাতিরোধানের পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এবং হজরত ওসমান ইবনে আফফান, রসুল স. ও তাঁর স্বজনদের অংশ অবলোপন করেন। জারী রাখেন বাকী তিনটি অংশ। হজরত আলীও তা অনুসরণ করেন। মোহাম্মদ বিন ইসাহাকের মাধ্যমে জুহ্রী সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ এর বিপরীত বর্ণনাও এনেছেন। বর্ণনাটি এই— একবার নাজদা হজরত ইবনে আব্বাসকে লিখলেন সম্মানিত হজরত! খুমুসের অন্তর্ভুক্ত রসুল স. এর স্বজনদের অংশ কাকে দেয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন? এর উত্তরে হজরত ইবনে আব্বাস লিখলেন, আমাদেরকে। কিন্তু খলিফা ওমর ইবনে খাত্তাব এ কথা স্বীকার করেননি। আমাদের বংশের বিবাহ-শাদী, ঋণ পরিশোধ, পারিচারক-পরিচারিকা হিসেবে গোলাম বাঁদী কোনো কিছুই আমাদেরকে দিতে স্বীকৃতি হননি। অথচ আমি মনে করি, ওগুলো আমাদের প্রাপ্য ছিলো।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, কায়েস বিন মুসলিম সূত্রে এসেছে, হাসান বিন মোহাম্মদ বিন হানাফিয়্যা বলেছেন, রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর তাঁর এবং তাঁর স্বজনদের অংশ সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর অংশ পাবেন তাঁর খলিফা। আর রসুল স. এর স্বজনদের অংশ তাঁদেরকেই দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, রসুল স. এর অংশ পাবেন তাঁর খলিফাগণ এবং রসুল স. এর স্বজনদের অংশ পাবেন খলিফাগণের স্বজনেরা। শেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে একমত হন যে, রসুল স. এর স্বজনের অংশ খরচ করা হবে সমরাস্ত্র এবং সমরাশ্ব ক্রয়ের জন্য। কায়েস বিন মুসলিম সূত্রে তাহাবীও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। ওই বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাটিও রয়েছে যে— এ রকম ঘটনা ঘটেছিলো হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের খেলাফতের সময়।

মোহাম্মদ বিন খুজাইমা সূত্রে তাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, আমি একবার আবু জাফরকে বললাম, ইরাক অধিকার করার পর হজরত আলী রসুল স. এর স্বজনদের অংশ সম্পর্কে কি বিধান দিয়েছিলেন? আবু জাফর বললেন, আল্লাহ্র শপথ! এ ব্যাপারে হজরত আলী ছিলেন হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের পূর্ণ অনুসারী। ইবনে ইসহাক বলেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসীরা ছিলেন হজরত আলীর পূর্ণ অনুসারী। আর হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের বিরোধিতার অপবাদ যেনো কেউ না দিতে পারে, সে কারণেই হজরত আলী এ রকম করেছিলেন। এ কথাটি সকলে অনুধাবন করতে পারেননি। তাই কেউ কেউ তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে।

আমি বলি, উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের চার খলিফা কেবল এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের অংশ জারী রেখে-ছিলেন। বন্ধ করে দিয়েছিলেন রসুল স. ও তাঁর স্বজনদের অংশ। কিন্তু আমি ইতোপূর্বে লিখেছি যে, খুমুসের কোনো অংশকেই খলিফাগণ অবলোপন করেননি। রসুল স. যেমন যে কোনো এক বা একাধিক শ্রেণীকে দান করা এবং অপর এক বা একাধিক শ্রেণীকে দান না করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন, খলিফাগণও ছিলেন তেমনই। সুতরাং খলিফাগণ রসুল স. এর স্বজনদেরকে খুমুসের অংশ না দিয়ে থাকলেও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা ওই অংশকে অবলোপন করেছিলেন। রসুল স. যেমন হজরত ফাতেমাকে সর্বাপেক্ষা নিকটজন হওয়া সত্ত্বেও খুমুসের অংশ দেন নি, অধিকতর প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে ব্যয় করেছিলেন কেবল আসহাবে সুফফা এবং বদর যুদ্ধের পিতৃহীনদের জন্য— খলিফাগণের আমলও ছিলো তদ্রূপ। ইমাম আবু হানিফার অভিমতও এ রকম।

আবদুর রহমান বিন আবী লায়লার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! খুমুসে আপনার স্বজনদের যে অংশ রয়েছে, সেই অংশ বণ্টনের দায়িত্ব আপনি আমার উপর অর্পণ করুন। সুশৃংখলভাবে বণ্টন করার উদ্দেশ্যেই আমি এই দায়িত্বটি স্কন্ধে নিতে চাই। রসুল স. দয়া করে আমার নিবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন থেকে আমিই বণ্টন করতে শুরু করলাম তাঁর স্বজনদের অংশ। পরে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও তাঁদের শাসনকালে আমাকে ওই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হজরত ওমরের খেলাফতের শেষ বছর বিপুল পরিমাণ গণিমত উপস্থিত হলো। আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! এ বছর রসুল স. এর স্বজনদের কোনো অর্থ সম্পদের প্রয়োজন হবে না। আপনি বরং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মুসলমানদের মধ্যে ওগুলো দান করে দিন। হজরত ওমর আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর দরবার থেকে বেরিয়ে

আসার পর দেখা হলো হজরত আব্বাসের সঙ্গে। তিনি বললেন, হে আলী! তুমি আমাকে এমন অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, যা আমি আর কখনো ফিরে পাবো না। তাই হয়েছিলো। এরপর থেকে আমাকে আর কখনো রসুল স. এর অংশ বন্টনের জন্য ডাকা হয়নি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমর আমাদের বংশের লোকদের বিবাহ -শাদী ও আমাদের ঋণ পরিশোধের জন্য খুমুসের অংশ প্রদান করতেন। পরে তিনি তা বন্ধ করে দেন। সম্ভবতঃ হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষ বছর থেকেই হজরত আলীর পরামর্শক্রমে রসুল স. এর স্বজনদের খুমুসের অংশ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে করে বুঝা যায় যে, রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পরেও প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা তাঁর স্বজনদের অংশ দান করতেন। আর এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধনের কোনো প্রশ্ন ছিলো না। কিন্তু রসুল স. যেমন প্রয়োজনবোধে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন, তেমনি প্রতিনিধিত্বের সূত্রে ওই অধিকার সংরক্ষণ করতেন তাঁর খলিফাগণও। আর তাই হজরত আলীর পরামর্শে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের শেষ বছরে রসুল স. এর স্বজনদের অংশ আর দেননি। পরবর্তী খলিফাদ্বয়ও ওই অংশটি আর পুনরুজ্জীবিত করেননি। আর এতে করে তারা অন্যায় কাজও করেননি। কারণ তাঁরা তা করেছিলেন শরিয়তের সীমা রেখার মধ্যেই।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, আমাকে আতা ইবনে সায়েব বলেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ জাবিল কুরবার (রসুল স. এর স্বজনের) অংশ বনী হাশেমকে দিতেন। কারণ, তাঁর খেলাফতের সময় তিনি জাবিল কুবরার অংশ দান করা জরুরী মনে করেছিলেন। আমি বলি, এ রকম করার কারণ হচ্ছে, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজকে বনী হাশেম নির্ভরযোগ্য মনে করতেন।

আবু দাউদ লিখেছেন, হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম সূত্রে হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জাবিল কুরবার অংশ বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবকে দিতেন। কিন্তু বনী আবদুস শামস্ ও বনী নওফেলকে দিতেন না। হজরত আবু বকর জাবিল কুরবার অংশ দিতেনই না। কিন্তু হজরত ওমর দিতেন। তাঁর পরের খলিফাগণও দিতেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফাগণ কখনও জাবিল কুরবার অংশ দিতেন, কখনও দিতেন না। আর এই দলিল আমাদের অভিমতের পক্ষে।

মতভেদঃ আলোচ্য আয়াতে মালে গণিমতের এক পঞ্চমাংশ যে আল্লাহ্‌র সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং এই অংশ কিভাবে বণ্টন করতে হবে, সে কথা বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাকী চার অংশ কিভাবে কাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এ কথা অনুমান করা যায় যে, বাকী চার অংশ বণ্টন করতে হবে ওই সকল যোদ্ধাদের মধ্যে যারা যুদ্ধের মাধ্যমে গণিমত

অর্জন করেছে। এখানকার বর্ণনাভঙ্গিটি মীরাস সম্পর্কিত ওই আয়াতের বর্ণনার মতো যেখানে বলা হয়েছে—'ওয়া ইল্লাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালাদুঁউ ওয়ারেছাহু আবাওয়াহু ফা লিউম্মিহীছ্ ছুলুছ (পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সন্তানহীন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ওই ব্যক্তির পিতা-মাতা হবে ওয়ারিশ। মাতা তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে)। এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল মাতার অংশের কথা। পিতার অংশ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু পিতার অংশের কথা উল্লেখ না থাকলেও এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পিতা পাবে দুই তৃতীয়াংশ। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ পাবে ওই সকল যোদ্ধারা যারা গণিমত অর্জন করেছে।

আলোচ্য আয়াতের বিবরণদৃষ্টে এই কথাটিও প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতের মাধ্যমে সুরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতটি রহিত হয়েছে। ওই আয়াতে বলা হয়েছে— লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বলো, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌র এবং রসুলের।' ওই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছিলো কেবল রসুল স. কে। তিনি স. ওই সম্পদ আদৌ বণ্টন করবেন কিনা, কিংবা করলেও কিভাবে কার কার মধ্যে তা বণ্টন করবেন, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে যথা নির্দেশনা দানের মাধ্যমে তাই ওই আয়াতটি রহিত (মনসুখ) করা হয়েছে। বোখারীর 'তারিখ' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন— আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. কে খুমুসের অধিকার দেয়া হয়েছে এবং তা কাকে কাকে দিতে হবে সেকথাও বলে দেয়া হয়েছে। ইঙ্গিতে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, অবশিষ্ট চার অংশ বণ্টন করতে হবে মুজাহিদগণের মধ্যে।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে 'কাইনুকা' যুদ্ধের সময়। বদর যুদ্ধের প্রায় একমাস পর ১৫ই শাওয়াল ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। বায়হাকী তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে হজরত সাঈদ ইবনে কা'ব থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বদর যুদ্ধের সময়েই প্রথমে সুরা আন্‌ফালের প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং তখনই অল্প সময়ের ব্যবধানে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে রহিত হয়ে যায় আগের আয়াতটি।

মাসআলাঃ ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, অবশিষ্ট চার অংশ বণ্টন করতে হবে যোদ্ধাদের মধ্যে, যারা যুদ্ধ করে গণিমত অর্জন করেছে। খলিফা বা শাসক একজন যোদ্ধাকেও তার অংশ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কিন্তু কোনো যোদ্ধার সরাসরি আঘাতে নিহত শত্রুর পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি কে পাবে সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, নিহত ব্যক্তির জেরা (যুদ্ধের পোশাক), হাতিয়ার, নগদ অর্থ ইত্যাদির অধিকারী হবে ওই মুজাহিদ যে তাকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা করতে পেরেছে। অর্থাৎ এমন অবস্থায় যুদ্ধ করেছে যে, তাঁর নিজেরও ওই যুদ্ধে নিহত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে যদি কোনো বিধর্মীকে হত্যা করা হয়, তবে ওই নিহত ব্যক্তির যুদ্ধের সরঞ্জামাদি তীর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি পাবে না। আবার হত্যা করা সত্ত্বেও ওই হত্যাকারী ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির সমর-সরঞ্জামের অধিকারী হবে না, যে মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য নয়। অর্থাৎ হঠাৎ বাহির থেকে এসে কেউ যুদ্ধ শুরু করে কোনো বিধর্মীকে হত্যা করলেও সে ওই বিধর্মীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম পাবে না।

ইমাম আহমদ বলেছেন, বিধর্মীর হন্তারক মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও (গণিমত লাভের যোগ্য না হলেও) তাঁর মাধ্যমে নিহত বিধর্মীর যুদ্ধ সরঞ্জাম সে পাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, বহিরাগত যোদ্ধাও তার দ্বারা বধিত বিধর্মীর পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম পাবে, যদি সে সেনাপতির নির্দেশে এরূপ করে। সেনাপতির নির্দেশ না থাকলে পাবে না। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বহিরাগত যোদ্ধার মাধ্যমে নিহতদের যুদ্ধ সরঞ্জাম মুজাহিদগণের অংশের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে। ইমাম মালেক বলেছেন, বহিরাগত ওই যোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে খুমুসের মধ্যে। তখন সে রসুল স. এর স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরের মতো খুমুসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হজরত আবু কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আমরা রসুল স. এর সঙ্গে 'হুনায়েন' যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। আমি দেখলাম এক মুশরিক একজন মুসলমান যোদ্ধার উপর আক্রমণোদ্যত। আমি পশ্চাৎ দিক থেকে ওই মুশরিকের স্কন্ধে আঘাত করলাম। আমার তলোয়ারের আঘাতে কেটে গেলো তার বর্ম। মুশরিক সৈন্যটি তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম, এখনই হয়তো আমি মৃত্যুমুখে পতিত হবো। কিন্তু তার জখমটি ছিলো গুরুতর। তাই সে আর অগ্রসর হতে পারলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলো। এরপর আমি হজরত ওমরের দেখা পেয়ে বললাম, মুসলমানেরা এ রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে কেনো? তিনি বললেন, আল্লাহ্র হুকুমে আবার তারা সংঘবদ্ধ হবে। তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে এলো সকলে। বিজয়ী হলো মুসলিম বাহিনী। রসুল স. ঘোষণা করলেন, কেউ কোনো মুশরিককে সরাসরি হত্যা করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারলে নিহত মুশরিকের যুদ্ধ সরঞ্জাম তাকেই দেয়া হবে। ঘোষণা শুনে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি এরূপ দাবী করি, কেউ কি আমার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবেন? সকলেই নিশ্চুপ রইলো। তাই আমিও বসে পড়লাম। রসুল স. পুনরায় একই ঘোষণা দিলেন। আমিও একই কথা বললাম। কিন্তু কোনো সাক্ষী পেলাম না। তৃতীয় বারও তিনি একই ঘোষণা দিলেন। আমিও সাক্ষী তলব করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দিতে

এগিয়ে এলো না। রসুল স. তখন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, হে আবু কাতাদা! তুমি কী বলতে চাও? আমি বললাম, আমি এক মুশরিককে হত্যা করেছি। তখন একজন বলে উঠলেন, আবু কাতাদা ঠিকই বলেছেন। তাঁর মাধ্যমে নিহত মুশরিকের পরিত্যক্ত সরঞ্জাম আমার কাছে রয়েছে। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এক বীর যোদ্ধা এক অংশীবাদীকে হত্যা করে তার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র হস্তগত করেছে। এখন অন্য কেউ সেগুলো দাবী করবে কেনো? রসুল স. বললেন, হে আবু বকর! আবু কাতাদা সত্য বলেছে। এরপর নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র আমাকে দেয়া হলো। আমি ওই পরিত্যক্ত সম্পদের মাধ্যমে বনী সালমা জনপদে একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করেছিলাম। ওই সম্পদই ছিলো আমার জীবনের প্রথম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বোখারী, মুসলিম।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা (হুনায়েন যুদ্ধে) এক মুশরিককে হত্যা করেন। রসুল স. তাঁকে ওই মুশরিকের জেরা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করেন। তিনি ওগুলো বিক্রয় করেন পাঁচ আওকিয়া মূল্যে।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধের সময় রসুল স. বলেছিলেন, হত্যাকারীই পাবে তার দ্বারা বধকৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সামগ্রী। ওই যুদ্ধে হজরত তালহা বধ করেছিলেন বিশজন মুশরিককে এবং তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অন্যান্য মালপত্র তিনিই পেয়েছিলেন। দারেমী, তাহাবী, আবু দাউদ।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, বনী হাওয়াজেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি তাদের একজনকে হত্যা করলাম। তারপর তার উট নিয়ে হাজির হই রসুল স. এর নিকটে। উটের পিঠে তার মালপত্রগুলো বাঁধা ছিলো। রসুল স. ঘোষণা করলেন, অমুক ব্যক্তিকে কে হত্যা করেছে? আমার সঙ্গীরা বলে উঠলো, ইবনে আকওয়া। তিনি স. তখন উটসহ সকল মালপত্র দিয়ে দিলেন আমাকে। তাহাবী।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় আরো এসেছে, অংশীবাদীদের এক গুপ্তচর রসুল স. এর মজলিশে এসে বসে পড়লো এবং সাহাবীগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলো। হঠাৎ সে গা ঢাকা দিলো। তখন বুঝা গেলো, সে ছিলো গুপ্তচর। রসুল স. আজ্ঞা করলেন, যাও, তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করো। আমিই তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করলাম। এবং তার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এলাম। ওগুলো আমাকেই দান করলেন রসুল স.। তাহাবী।

ওয়াকেদী সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা মারহাব নামক এক মুশরিকের পার্শ্বদেশে আঘাত করলেন। খঞ্জরের আঘাতে কেটে গেলো অনেকটা। কিন্তু সে তখনও মরেনি। হঠাৎ হজরত আলী এসে তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। তাঁর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু মুখে পতিত হলো মারহাব। রসুল স. হজরত ইবনে মুসলিমাকেই দান করলেন মারহাবের জিনিসপত্র। অথচ প্রকৃত ঘটনা ছিলো হজরত আলীই ছিলেন তার প্রকৃত হন্তারক।

হজরত আউফ ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা দিয়েছিলেন, বধিত ব্যক্তির সম্পদ পাবে বধকারী। তাহাবী। হজরত আউফ ইবনে মালেক এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলিদ থেকে ভিন্ন সূত্রে এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইমাম

আহমদ, আবু দাউদ এবং তিবরানীর মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত আউফ ইবনে মালেক এবং হজরত খালেদ ইবনে ওলিদ থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নিহত ব্যক্তির নিকট থেকে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্র গণিমত হিসেবে সকলের মধ্যে বণ্টন করেন নি। দিয়েছেন তার বধকারীকেই। আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান এবং তিবরানীর বর্ণনায় একথাগুলোর সঙ্গে আরো এসেছে—রসুল স. নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সরঞ্জামাদির অধিকারী হিসেবে তার হত্যাকারীকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। গণিমতের মতো সেগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন নি।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নিহত ব্যক্তির মাল সামানের মালিক হবে তার হত্যাকারী। হাদিসটির সূত্র পরম্পরা নিষ্কলুষ। তাহাবী

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এক অংশীবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। রসুল স. হজরত যোবায়েরকে নির্দেশ দিলেন, ওকে হত্যা করো। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। রসুল স. হজরত যোবায়েরকেই দান করলেন ওই নিহত লোকটির পরিত্যক্ত মালপত্র। তাহাবী।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নিঃসন্দেহে রসুল স. এরশাদ করেছেন, বধিত ব্যক্তির মাল সামান তার বধকারীর প্রাপ্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ঘোষণাটি কি রসুল স. দিয়েছিলেন কেবল উৎসাহ প্রদানার্থে, না এটাই শরিয়তের আইন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এটাই শরিয়তের আইন। কারণ বিধানটি দিয়েছেন রসুল স. স্বয়ং।

আমি বলি, হজরত আবু কাতাদা ও হজরত সালমা ইবনে আকওয়ার হাদিসের মাধ্যমে বুঝা যায়, রসুল স. সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তাদের দ্বারা বধিত ব্যক্তির মাল সামান তাঁদেরকে দান করেন নি। দান করেছিলেন সাক্ষ্য প্রাপ্তির পর। উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে একথাও জানা গিয়েছে যে, সম্মুখ যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির মালপত্র তিনি স. পাঁচভাগে বণ্টনযোগ্য গণিমতের সঙ্গেও মেলান নি। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ এই মতে বিশ্বাসী। কিন্তু ইমাম মালেকের মত এর বিপরীত। তিনি মনে করেন, যেভাবেই শত্রু বধ করা হোক না কেনো, সকল শত্রু সম্পত্তি একত্র করতে হবে পাঁচ ভাগে বণ্টনযোগ্য গণিমতের সঙ্গে। একক ভাবে কাউকে দেয়া যাবে না।

দ্রষ্টব্যঃ হজরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন, এক যুদ্ধে হজরত বারা ইবনে মালেক পারস্যবাসী এক শত্রুকে বর্শা বিদ্ধ করেন। সে মারা গেলে তিনি তার জিনিসপত্র খলিফা ওমরের দরবারে নিয়ে আসেন। কেউ কেউ বললেন, জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হতে পারে তিন হাজার আউকিয়া। ফজরের নামাজের পর হজরত ওমরের উপস্থিতিতে হজরত আবু তালহা বললেন, জিনিসপত্রগুলোর মূল্য হবে অনেক— তিরিশ হাজার আউকিয়া। তাই আমার বিবেচনায় এগুলোর পাঁচ

ভাগের এক ভাগ রেখে বাকী অংশ হজরত বারাকে দেয়া সমীচীন। হজরত ওমর তাঁর কথাটিই গ্রহণ করলেন এবং জিনিসপত্রগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক পঞ্চমাংশ (ছয় হাজার আউকিয়া) রাখলেন এবং হজরত বারা ইবনে মালেককে দান করলেন বাকী অংশ (চব্বিশ হাজার আউকিয়া)। তাহাবী।

তাহাবীর অপর বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে মালেক ফারেসের এক সর্দারকে হত্যা করেন এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ অধিকার করে নেন। এই ঘটনাটি লিখে জানানো হলো তৎকালীন খলিফা হজরত ওমরকে। হজরত ওমর সেনাপতিকে লিখে পাঠালেন, ওই সম্পদের এক পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালের জন্য) রেখে বাকী অংশ দেয়া হোক বারা ইবনে মালেককে।

উপরের বর্ণনা দু'টোর মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ নিয়মানুসারে নিহত শত্রুর ব্যক্তিগত সরঞ্জাম হত্যাকারীর প্রাপ্য, কিন্তু সরঞ্জামের মূল্যমান অত্যধিক হলে খলিফা বা শাসক ইচ্ছে করলে ওগুলোর এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখেও দিতে পারেন।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, সেনাপতি বা শাসকের নির্দেশক্রমে শত্রু বধ করলেই কেবল হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মাল-সামান লাভ করতে পারবে। 'আউসাত' ও 'কবির' গ্রন্থে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পরিপোষক। ঘটনাটি এই—পারস্য অভিযানের সময় হজরত হাবীব বিন সালমা সংবাদ পেলেন, ওয়ালী কাবরিছের শাসক আজারবাইজানের পথে রওয়ানা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে ইয়াকুত, মোতি, জমরুদ ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রী। তিনি ওই শাসককে পথিমধ্যে আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করে তার বিপুল সম্পদ হস্তগত করেন। সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা ওই সম্পদের এক পঞ্চমাংশ দাবী করেন। হজরত হাবীব বলেন, আল্লাহ্ পাক যা আমাকে দান করেছেন, তা থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না। রসুল স. ঘোষণা করেছেন, নিহত শত্রুর সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য। সেখানে উপস্থিত হজরত মুয়াজ বলেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, সেনানায়কের সৌজন্য মূলক দানকেই গ্রহণ করা উচিত। বর্ণনাটি বিতর্কিত। কারণ, এই সূত্রভূত এক বর্ণনাকারী আমর ইবনে ওয়াকিদ তেমন বলিষ্ঠ নয়। এ সম্পর্কে স্বসূত্রে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ জুনাদা ইবনে উমাইয়ার একটি বর্ণনা এনেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, হজরত হাবীব নিহত ওই শাসকের সম্পদ এনেছিলেন পাঁচটি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে। ওই সম্পদের মধ্যে ছিলো রেশমী বস্ত্র, ইয়াকুত এবং এক প্রকার মূল্যবান পান্না। তিনি সমুদয় সম্পদ গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা বায়তুল মালের জন্য কিছু রেখে দিতে চাইলেন। হজরত হাবীব বললেন, রসুল স. বলেছেন, যে বিধর্মীকে বধ করবে, সেই পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ। হজরত আবু উবায়দা বললেন,

রসুল স.ওই ঘোষণা দিয়েছিলেন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ঘোষণাটি চিরস্থায়ী নয়। সেখানে উপস্থিত হজরত মুয়াজ বললেন, হাবীব! আল্লাহ্কে ভয় করো। ইমামের (নেতার) নির্দেশ মান্য করো। ইমাম যতটুকু দান করেন, ততটুকুই তোমার জন্য হালাল। হজরত মুয়াজ তাঁর কথার সমর্থনে রসুল স. এর একটি হাদিসও বর্ণনা করলেন। শেষে তাঁর কথার উপরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হজরত আবু উবায়দা খুমুস গ্রহণের পর বাকী চার অংশ দান করলেন হজরত হাবীবকে। হজরত হাবীব তাঁর ভাগের সম্পদকে বিক্রয় করেছিলেন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায়। এই বর্ণনাসূত্রসংযুক্ত একজন বর্ণনাকারী আবার অজ্ঞাত।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে—আবু জেহেলকে হত্যা করেছিলো মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ্ এবং মুয়াজ বিন আফ্রা। রসুল স. বললেন, তোমরা দু'জনেই আবু জেহেলকে হত্যা করেছো। একথা বলে তিনি স. আবু জেহেলের যুদ্ধের পোশাক, অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে দিলেন মুয়াজ বিন আমরকে। মুয়াজ বিন আফ্রাকে কিছুই দিলেন না। নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল সামান তার হত্যাকারীর প্রাপ্য—বিধানটি অত্যাবশ্যক হলে তিনি স. নিশ্চয় এ রকম করতেন না।

মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে—হজরত আউফ বিন মালেক আশজায়ী বর্ণনা করেছেন, মুতা যুদ্ধে আমি গমন করেছিলাম জায়েদ বিন হারেসের সঙ্গে। মাদাবী নামক এক ইয়ামেনী সহযোদ্ধাও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। রোমীয় সেনাবাহিনী ছিলো আমাদের প্রতিপক্ষ। তাদের এক উপ-অধিনায়ক মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করছিলো। তার ঘোড়াটি ছিলো লাল। ঘোড়ার জিন ছিলো সোনালী। আর তার তরবারীটি ছিলো স্বর্ণাভ। তাকে হত্যা করার জন্য মাদাবী আড়াল গ্রহণ করলো একটি প্রস্তর খণ্ডের। শত্রু-অধিনায়কটি কাছাকাছি আসতেই মাদাবী তলোয়ারের এক কোপে কেটে দিলো তার ঘোড়ার গর্দান। তারপর চড়াও হলো তার উপর। অল্পক্ষণের মধ্যে তাকে হত্যা করে দখল করে নিলো তার ঘোড়া এবং ঘোড়ার পিঠের সকল সরঞ্জাম। যুদ্ধশেষে সেনাপতি খালেদ বিন ওলিদ মাদাবীর নিকট থেকে তার অধিকৃত সম্পদের কিছু অংশ গ্রহণ করলেন। আমি সেনাপতিকে বললাম, আপনি কি জানেন না রসুল স. ঘোষণা করেছেন, নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী হবে তার হত্যাকারী। সেনাপতি বললেন, জানি। সম্পদ অধিক ছিলো বলে আমি তার এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছি। আমি বললাম, ওই অংশ তাকে ফিরিয়ে দিন। নয়তো একথা আমি রসুল স.কে জানাবো। সেনাপতি আমার কথা গ্রহণ করলেন না। সকলে মদীনায় ফিরে আসার পর আমি রসুল স.কে ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. বললেন, খালেদ! যা নিয়েছো তা ফিরিয়ে দাও। একথা শুনে আমি খালেদকে বললাম, রসুল স. এর এই নির্দেশের কথা আমি কি আপনাকে আগে বলিনি? আমার একথা শুনে রসুল

স. রাগান্বিত হলেন। বললেন, খালেদ ঠিকই করেছে। নেতার নির্দেশের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তোমাদের সকলের উচিত নেতার নির্দেশ মান্য করে চলা। —এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে তার হত্যাকারীর স্বত্ব অত্যাবশ্যক নয়। নতুবা রসুল স. একবার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে বলে পুনরায় তার বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতেন না।

খাত্তাবী বলেছেন, হজরত আউফকে শিক্ষা প্রদানই ছিলো রসুল স. এর এরকম বিরোধী নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য। আর সেই শিক্ষাটি ছিলো এই— নেতার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ যেনো কেউ না করে। হজরত খালেদের সিদ্ধান্তটি ছিলো ইজ্‌তেহাদী (গবেষণা সঞ্জাত)। রসুল স. তাঁর ওই ইজ্‌তেহাদকেই বহাল রেখেছিলেন। কারণ বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ পরিহরণীয়। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, খাত্তাবীর এই অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা রসুল স. তাঁর নিজের নির্দেশ স্থগিত করেছিলেন অন্য কারণে। কারণটি হচ্ছে— হজরত আউফ ওই সম্পদের অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন মাবাদী। সুতরাং হজরত আউফের কথায় তিনি স. মাবাদীর হক নষ্ট করবেন— এরকম হতেই পারে না। একজনের শাস্তি অন্য জন বহন করবে কেনো? বরং রসুল স. এর এ রকম করার প্রকৃত কারণ ছিলো একথাটি বুঝিয়ে দেয়া যে, নিহত শত্রুর সম্পদের উপর হত্যাকারীর অধিকারের বিধানটি শরিয়তের কোনো অকাট্য বিধান নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই অধিনায়ক, নেতা অথবা শাসকের উপর নির্ভরশীল।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত আজারবাইজানের ঘটনাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিনায়ক ইচ্ছে করলে নিহত ব্যক্তির সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতে পারেন। অথবা তা গণিমতের সাধারণ সম্পদের সাথে মিলিয়ে দিতে পারেন। আবার আবু জেহেলের ঘটনাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হত্যাকারী একাধিক হলে অধিনায়ক ইচ্ছে করলে নিহত ব্যক্তির সম্পদ একজনকে দান করে অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারেন। অথবা কিছু অংশ একজনকে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ মালে গণিমতের মধ্যে একত্র করতে পারেন।

বায়হাকী লিখেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই সুরার প্রথম আয়াতটি। বলা হয়েছিলো— 'কুলিল্ আন্‌ফালু লিল্লাহি ওয়ার্‌রসুলি' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্‌র ও রসুলের)। এই নির্দেশানুসারে বদর যুদ্ধের সকল সম্পদের অধিকারী ছিলেন রসুল স.। তিনি ওই সম্পদ যাকে ইচ্ছে তাকে প্রদান করতে পারতেন। তিনি স. এরকম করেছিলেনও। যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি, তাদেরকেও তিনি স. বদরের গণিমতের অংশ দান করেছিলেন। পরে অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। এরপর রসুল স. 'নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারীর প্রাপ্য'— এই বিধানটি ঘোষণা করেন। তখন থেকে এই বিধানটিই প্রতিষ্ঠিত

হয়। সে কারণেই হজরত আউফ হজরত খালেদকে বলেছিলেন, আপনি কি জানেন না যে, রসুল স. এর ঘোষণা হচ্ছে— নিহত শত্রুর সম্পদ পাবে তারই হত্যাকারী। হজরত খালেদও একথা স্বীকার করেছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, এটি ছিলো একটি সাধারণ বিধান, যা শরিয়তসম্মত। কিন্তু এটাও একটি সাধারণ বিধান যে, অধিনায়কের নির্দেশ মাননীয়। তাই হজরত মাবাদী হজরত খালেদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। প্রতিবাদ করেছিলেন হজরত আউফ। কিন্তু হজরত মাবাদী ছিলেন তাঁর মৌন সমর্থক। সুতরাং তাঁদের দু'জনকেই উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন রসুল স.। আর উপদেশটি ছিলো—অধিনায়কের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। অধিনায়কের নির্দেশ মান্য করা ওয়াজিব— প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তা অন্যায় মনে হলেও। কারণ মান্যতার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ।

মাসআলাঃ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অধিনায়ক কম অথবা বেশী দান করতে পারেন। এটা ঐকমত্য। তিনি যুদ্ধের সময় এরকম ঘোষণাও দিতে পারেন যে— হত্যাকারীই হবে তার মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির সম্পদের অধিকারী। এ রকম করলে তাঁর ওই ঘোষণাটি হবে অনুপ্রেরণামূলক। এ রকম অনুপ্রেরণা দানের নির্দেশ এসেছে অন্য এক আয়াতে এভাবে—হাররিদ্বিল মু'মিনীনা আ'লাল কিতালি (মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করো)। এই নির্দেশানুসারে সেনানায়ক যুদ্ধের প্রাক্কালে বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন। যেমন— এক মুশরিককে হত্যা করলে দেয়া হবে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা, যে ওই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে, তাকে দেয়া হবে এতো এতো পুরস্কার, যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারলে দেয়া হবে খুমুস বাদে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অর্ধেক অথবা এক চতুর্থাংশ, শত্রুপক্ষের রমণী বন্দী করতে পারলে তার অধিকারী হবে বন্দীকারী নিজে ইত্যাদি। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. ছোট ছোট সেনাদলকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন। তাদের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদেরকে তাদের প্রাপ্যের চেয়ে পুরস্কার হিসেবে কিছু অধিক প্রদান করতেন।

উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করার জন্য অধিনায়ক এ রকম ঘোষণা দিতে পারবে না— যুদ্ধকালে যে, যে সম্পদ হস্তগত করবে সে সম্পদ তার। এ রকম করলে তা হবে কোরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপরীত। তখন পদাতিক এবং বাহনারোহী সৈন্যের নির্ধারিত অংশও হয়ে যাবে বাতিল। শত্রু নিধনে যারা অতিরিক্ত মগ্ন থাকবে, তারাও হয়ে যাবে গণিমত থেকে বঞ্চিত। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি যদি উপযুক্ত বিবেচনা করি, তবে সমুদয় গণিমত দিয়ে দিবো ওই ব্যক্তি বা দলকে, যে বা যারা তা অধিকার করেছে। হজরত আবু উমামা সূত্রে মাকহুলের মধ্যস্থতায় হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত উবাদা বিন সামেত

বলেছেন, রসুল স. বদরের দিন এরশাদ করেছেন, যারা শত্রুর সম্পদ অধিকার করবে, ওই সম্পদের অধিকারী হবে তারাই। এ সকল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, এ সকল ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের। খুমুস সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওই বিধানগুলো রহিত হয়ে গিয়েছে।

মাসআলাঃ খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর বাকী চার অংশের মধ্য থেকে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ওই পুরস্কার প্রদান করতে হবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বায়তুল মালে জমা হওয়ার পূর্বে। সকল সম্পদ বায়তুল মালে জমা হওয়ার পর পুরস্কার দিতে চাইলে তা দিতে হবে খুমুস থেকে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমেদ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক বলেছেন, সকল অবস্থায় পুরস্কার দিতে হবে খুমুস থেকে। অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়। পুরস্কার সম্পূর্ণতঃই অধিনায়কের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। আবুল জিয়াদ সূত্রে ইমাম মালেক লিখেছেন, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, যোদ্ধা সাহাবীগণকে পুরস্কার দেয়া হতো খুমুসের অংশ থেকে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে ইবনে আবী শায়বাও এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, রসুল স. আমাকে খুমুসের নির্দিষ্ট অংশ ছাড়াও অতিরিক্ত প্রদান করেছেন। অতিরিক্ত হিসাবে আমি পেয়েছিলাম একটি বয়স্ক উট। বোখারী, মুসলিম। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে স্বভূমিতে পৌছানোর পূর্বে পুরস্কার প্রদান করলে, সে পুরস্কার প্রদান করতে হবে খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ থেকে—যা যোদ্ধাদের অংশ। খুমুসের অংশীদার হচ্ছে এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। যোদ্ধারা এদের অন্তর্ভূত নয়।

বাগবী লিখেছেন, খুমুসের যে অংশ রসুল স. এর জন্য নির্ধারিত, পুরস্কার দিতে হবে সেই অংশ থেকে। এ রকম বলেছেন হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব। ইমাম শাফেয়ীও এই মতের সমর্থক। কারণ রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকই তোমাদেরকে মালে গণিমত দান করেছেন। আমার জন্য নির্ধারিত খুমুস বাদে বাকী অংশ তোমাদেরকে দেয়া হয়। আমার থেকেও দেয়া হয় তোমাদেরকে। একথায় বুঝা যায়, পুরস্কার প্রদান করা হয় খুমুস থেকে।

আমি বলি, খুমুসের খুমুস (পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ) থেকে রসুল স.পুরস্কার প্রদান করতেন। এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, অবশিষ্ট চার অংশ থেকে পুরস্কার প্রদান করা যাবে না। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে তিরমিজি, ইবনে মাজা এবং ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন— আন্নাহু সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফ্‌ফালা ফিল বিদায়াতির্‌ রুবায়া ওয়াফির রাজায়াতিছ্‌ ছুলুছা। খাত্তাবী এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই যদি পুনরায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হয়, তবে পুরস্কার প্রদানের মধ্যে তারতম্য ঘটবে।

এমতোক্ষেত্রে রসুল স. প্রথম যুদ্ধে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতেন খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার ভাগ থেকে। আর দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করতেন তিন ভাগের এক ভাগ। প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুদ্ধ কষ্টসাধ্য। তাই প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় যুদ্ধের পুরস্কারের পরিমাণ হতো বেশী। হাবিব বিন সালমা ফেহরী সূত্রে এ রকম বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ।

আমি বলি, উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে ওই সকল মহাত্মাগণের অভিমত খণ্ডন হয়ে গিয়েছে, যারা বলেন— অতিরিক্ত পুরস্কার দিতে হবে খুমুস থেকে। অথবা খুমুসের খুমুস থেকে। উল্লেখ্য যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার ভাগ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করার কথা কোনো হাদিসে আসেনি। হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে চার ভাগ এবং তিন ভাগের কথা। আর খুমুস কখনো তিন অথবা চার ভাগ হয় না (খুমুস অর্থ এক পঞ্চমাংশ)। তাছাড়া হাদিসে পুরস্কার প্রদানের কথা বলা হয়েছে চার ভাগ এবং তিন ভাগ থেকে। তাহাবী বলেছেন, ওই চার ভাগ ও তিন ভাগ হচ্ছে খুমুসের চার ভাগ ও তিন ভাগ। তার এই অভিমতটি ভুল। খুমুস হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক একটি বিষয়, যা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। স্বয়ং ইমাম তাহাবীই হজরত হাবিব বিন সালমার হাদিসে উল্লেখ করেছেন, আর রুবয়ু বা'দাল খুমুসি ওয়াছ ছলুছা বা'দাল খুমুসি। এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রথমে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আলাদা করার পর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ অথবা তৃতীয় অংশ পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছিলো। ইমাম আহমদও উদ্ধৃত শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন। আর ওই উল্লেখ থেকে ইবনে জাওজী একথা প্রমাণ করেছেন যে, খুমুস বাদে অবশিষ্ট চার অংশ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করা জায়েয।

মাসআলাঃ যুদ্ধ শেষে অধিনায়ক যদি কোনো যোদ্ধার অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তবে তাকে তার নির্ধারিত অংশ অপেক্ষা পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত দান করতে পারেন—যদি যুদ্ধের পূর্বে কোনো পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেয়া না হয়। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করতে হবে খুমুস থেকে। যোদ্ধাদের প্রাপ্য অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়। যোদ্ধাদের নির্ধারিত অংশের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো যাবে না।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের পর্যালোচনাঃ হজরত সালমা বিন আক-ওয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাঁর গোলাম, হজরত রিবাহ্‌কে কয়েকটি উট চরাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। একদিন সকালে হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো আবদুর রহমান ফুজারী। সে উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। আমি দ্রুত একটি পাহাড়ে উঠে মদীনার দিকে মুখ করে চিৎকার করে বললাম, ইয়া সাব্বাহাহু—ইয়া সাব্বাহাহু (আমাদের উট নিয়ে গেলো, আমাদের উট নিয়ে

গেলো)। এরপর ক্ষিপ্র গতিতে পশ্চাৎধাবন করলাম ফুজারীর। একের পর এক তীর নিক্ষেপ করলাম তার দিকে। আর চিৎকার করে বলতে লাগলাম-আনা ইবনুল আকওয়া ওয়াল ইয়াওমুর রদ্বয়ি (আমি আকওয়ার পুত্র— আজ হচ্ছে দুগ্ধ পানের দিন)।

আমার উপর্যুপরি তীর নিক্ষেপের ফলে সে উটগুলো ছেড়ে দিয়ে একাই পালিয়ে যেতে শুরু করলো। উটগুলো হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও আমি ক্ষান্ত হলাম না। যুদ্ধের নেশা তখন পেয়ে বসেছে আমাকে। ফুজারীর দলের লোকেরা তখন পলায়নের সুবিধার জন্য তেইশটি লৌহদণ্ড ও তেইশটি বর্শা ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো। আমি সেগুলোর উপর চিহ্নস্বরূপ পাথর রেখে দিয়ে, পুনরায় তাদের পশ্চাৎধাবণ করলাম। ইত্যবসরে মদীনা থেকে এসে পড়লো আবু কাতাদার নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী দল। আবু কাতাদা দ্রুত ছুটে গিয়ে বন্দী করলো আবদুর রহমান ফুজারীকে এবং তাকে হত্যাও করে ফেললো। মদীনায় ফিরে আসার পর রসুল স. ঘোষণা করলেন, অদ্যকার সর্বোত্তম অশ্বারোহী আবু কাতাদা এবং সর্বোত্তম প্রহরী সালমা। এরপর রসুল স. আমাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করলেন। আক্রমণকারী হিসেবে একগুণ এবং প্রহরী হিসেবে আরেক গুণ। এরপর তিনি স. আমাকে তাঁর আদ্ববা নামক উষ্ট্রীর উপরে উঠিয়ে নিলেন। মুসলিম।

হানাফীগণের বক্তব্যঃ এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে হাব্বান বলেছেন, ওই যুদ্ধে হজরত সালমা বিন আকওয়া ছিলেন পদাতিক সৈন্য। রসুল স. তখন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন খুমুসের অংশ থেকে। যোদ্ধাদের অংশ থেকে নয়।

কাসেম বিন সালামও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, ইবনে মাহ্দী বলেছেন, আমি এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি সুফিয়ান সওরী থেকে। তিনি বলেছেন, রসুল স. যখন যাকে যতটুকু ইচ্ছা বেশী দান করতে পারতেন। এটা ছিলো তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। যদি রসুল স. তাঁর নিজের অংশ থেকে দান করে থাকেন, তবে তাকে বলতে হবে বদান্যতা, পুরস্কার নয়।

আমি বলি, এক্ষেত্রে ইবনে হাব্বান এবং কাসেম বিন সালামের মন্তব্যের কোনো প্রয়োজনই নেই। আমি এখন উল্লেখ করতে চাই হজরত সালমা বিন আকওয়া বর্ণিত ওই হাদিসটি যেখানে তিনি বলেছেন, হজরত আবু বকরের সহআরোহীরূপে আমরা বনী ফাজারাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। ওই যুদ্ধে মুসলিম ও অমুসলিম বাহিনীর মধ্যে বন্দী বিনিময় হয়েছিলো। হজরত আবু বকর আমাকে পুরস্কার হিসেবে দান করেছিলেন এক বন্দিনীকে।

হজরত উবাদা বিন সামেত এবং হজরত হাবিব বিন সালমা থেকে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে—আন্নান্ নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাফ্ফালা ফিল বিদায়াতির্ রুবায়া ওয়াফির রাজায়াতিছ্ ছুলুছা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে—যুদ্ধের পূর্বে রসুল স. পুরস্কার হিসেবে এক চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করেছিলেন। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পর পুনঃযুদ্ধের পুরস্কার নির্ধারণ করেছিলেন এক তৃতীয়াংশ। এই প্রেক্ষাপটে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. পরের যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব অংশ থেকে অর্থাৎ খুমুস থেকে। এভাবেই প্রমাণিত হয় যে, এটা ইমাম আবু হানিফার অভিমতের একটি প্রমাণ।

ঐকমত্যসম্মত অভিমত এই যে, কোনো কোনো যোদ্ধাকে তার নির্ধারিত অংশ ছাড়াও পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েয। মতভেদ রয়েছে কেবল কোন অংশ থেকে পুরস্কার দেয়া হবে সে সম্পর্কে। বিভিন্ন সূত্রে তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি হজরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আবী বকরের সঙ্গে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি ছিলেন ওই যুদ্ধের অধিনায়ক। তিনি গণিমত বণ্টনের আগে আমাকে এক বন্দী অথবা বন্দিনী দিতে চাইলেন। আমি বললাম, প্রথমে ভাগ করুন। তারপর খুমুসের অংশ থেকে আমাকে দিন। তিনি আমার কথায় সম্মত হলেন না। আমিও তাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃত হলাম।

তাহাবীর বর্ণনায় আরো এসেছে, সুলায়মান বিন ইয়াসার বলেছেন, আমি মুয়াবিয়া বিন খাদিজের সঙ্গে আফ্রিকার এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। অধিনায়ক হজরত মুয়াবিয়া কোনো কোনো মুজাহিদকে উপহার হিসাবে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করলেন। কতিপয় সাহাবীও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে ওই উপহার নিতে অসম্মত হলেন কেবল জাবালা বিন আমর।

খালেদ বিন আবী ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, আমি নিজে একবার সুলায়মান বিন ওমরের নিকট উপহার প্রার্থী হলাম। তিনি বললেন, আমি কাউকে এভাবে আবেদন করতে দেখিনি। কেবল ইবনে খাদিজকে এ রকম করতে দেখেছিলাম। আফ্রিকার যুদ্ধে খুমুস আলাদা করে নেয়ার পর বাকী চার অংশের অর্ধেক দেয়া হয়েছিলো আমাদেরকে। কতিপয় মুহাজির সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সকলে তা গ্রহণ করেছিলেন। উপহার গ্রহণে বিরত ছিলেন কেবল জাবালা।

মাসআলাঃ খুমুস বাদে বাকী চার অংশ মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এভাবে—পদাতিক একগুণ এবং অশ্বারোহী তিন গুণ। অশ্বারোহীর ওই তিন গুণের একগুণ তার নিজের জন্য এবং বাকী দুইগুণ তার বাহনের জন্য। কাযী আবদুল ওয়াহাব বলেছেন, হজরত ওমর ও হজরত আলীর সিদ্ধান্ত ছিলো এ রকম। কোনো সাহাবীই তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। তাবেয়ীগণের মধ্যে এই অভিমতের অনুসারী ছিলেন ওমর বিন আবদুল আজিজ ও ইবনে সিরিন। ফকিহগণের মধ্যে ছিলেন ইমাম মালেক, ইমাম আওজায়ী, ইমাম লাইস

বিন সা'দ, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আবু সওর, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান। কেবল ইমাম আবু হানিফা এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বলেছেন, অশ্বারোহী পাবে পদাতিকের দ্বিগুণ— তিনগুণ নয়।

এ সম্পর্কে জমহুর প্রমাণ পেশ করেছেন, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম বর্ণিত একটি হাদিস থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. আমার জন্য এক অংশ এবং আমার ঘোড়ার জন্য দুই অংশ প্রদান করেছিলেন। আহমদ।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, খালেদ হোজ্জা বলেছেন, এ ব্যাপারে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই যে, এ সম্পর্কে উদ্ধৃত সকল হাদিসে অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ প্রদানের কথা এসেছে। দারা কুতনীও হজরত যোবায়ের বিন আওয়ামের অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত জাবের, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত সহল বিন হাসানা থেকে। ইবনে ইসহাক সূত্রে আবদুল্লাহ বিন আবী বকর বিন আমর বিন হাজ্জাম বলেছেন, বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় রসুল স. অশ্বারোহীদের জন্য তিন অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। এক অংশ যোদ্ধার জন্য এবং দুই অংশ তাদের বাহনের জন্য।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে—রসুল স. ঘোড়ার জন্য দুই ভাগ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক ভাগ নির্ধারণ করেছিলেন। বোখারী এবং নাসাঈ বাদে অন্যান্য সুনান রচয়িতাগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. পুরস্কার হিসেবে অতিরিক্ত সম্পদ বন্টনের সময় ঘোড়ার জন্য দুই এবং তার আরোহীর জন্য এক অংশ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অপর বর্ণনায় পুরস্কারের কথা নেই। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিন অংশের কথা— দুই অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ সওয়ারীর জন্য। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে আব্বাস থেকে। আবু ওমরা থেকে ইসহাক বিন রহওয়াইহ্, আবু দাউদ এবং মুকাদ্দাস সূত্রে বায্যারও এ রকম বর্ণনা এনেছেন। হজরত আবু কাবশা আনসারীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কা বিজয়ের সময় রসুল স. ঘোষণা করেছিলেন, আমি অশ্বের জন্য দুই অংশ এবং তার আরোহীর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। যারা এ বিধান পরিবর্তন করবে, আল্লাহ্ও তাদেরকে পরিবর্তন করবেন। দারা কুতনী, তিবরানী। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই হাদিসের বর্ণনা সূত্রভূত মোহাম্মদ বিন ইমরান ঈসাকে দুর্বল বলেছেন অধিকাংশ হাদিস বিশারদগণ।

হজরত আবু দরহামের বর্ণনায় এসেছে, আমি ও আমার ভাই রসুল স. এর সঙ্গে এক জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের দু'জনেরই ছিলো দুটি ঘোড়া। আমাদেরকে রসুল স. দিয়েছিলেন ছয়টি অংশ। চারটি আমাদের ঘোড়ার জন্য এবং দুটি আমাদের জন্য। দারা কুতনী। ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হজরত আবুজর গিফারী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন

যুদ্ধে আমি ও আমার ভ্রাতা ছিলাম রসুল স. এর অধীনস্ত যোদ্ধা। দু'টি ঘোড়া ছিলো আমাদের। তিনি স. আমাদেরকে দিয়েছিলেন ছয়টি অংশ— ঘোড়ার জন্য চার এবং আমাদের জন্য দুই। এভাবে প্রাপ্ত অংশ বিক্রয় করে আমরা পেয়েছিলাম দু'টি তাজা উট।

ইমাম আবু হানিফার অভিমতের সমর্থন রয়েছে, হজরত মজমা বিন জারিয়া আনসারীর হাদিসে, যেখানে তিনি বলেছেন, খায়বর যুদ্ধের মালে গণিমত ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো হুদায়বিয়া অভিযানকারীদের মধ্যে। রসুল স. তখন মালে গণিমতকে ভাগ করেছিলেন আঠারো শত ভাগে। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিলো পনের শত। তন্মধ্যে তিনশত ছিলো অশ্বারোহী। অশ্বারোহী দুই অংশ এবং পদাতিক এক অংশ — এভাবে তিনি স. ওই আঠারো শত অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। (পদাতিকেরা পেয়েছিলো সর্বমোট বারোশত অংশ এবং অশ্বারোহীরা পেয়েছিলো ছয়শত)। আবু দাউদ। আবু দাউদ বলেছেন, এই হাদিসের সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে বর্ণনাকারীর কল্পনা। আসলে ওই যুদ্ধে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিলো দুই শত। রসুল স. তখন ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ প্রদান করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ীও এ রকম বলেছেন। আমরাও সুরা ফাতাহের তাফসীরে খায়বর যুদ্ধের মালে গণিমত বণ্টনের বিবরণে এ রকমই লিখে দিয়েছি।

হজরত মেকদাদ বিন ওমরের হাদিসে এসেছে, আমি বদর যুদ্ধে ছিলাম অশ্বারোহী যোদ্ধা। রসুল স. আমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দ্বিগুণ দান করেছিলেন। একগুণ আমার জন্য এবং আরেক গুণ আমার অশ্বের জন্য। তিবরানী। এই হাদিসের সূত্রভূত ওয়াকিদি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। ওয়াকিদি সূত্রে জাফর বিন খারেজার বর্ণনায় এসেছে, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম বলেছেন, বনী কুরায়জার যুদ্ধে আমি ছিলাম অশ্বারোহী সৈন্য। রসুল স. আমাকে এক অংশ এবং আমার অশ্বের জন্য এক অংশ প্রদান করেছিলেন। ইবনে মারদুবিয়া তাঁর তাফসীরে ওরওয়া সূত্রে উল্লেখ করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, বনী মুসতালিকের কতিপয় বন্দিনী রসুল স. এর অধিকারে আসে। রসুল স. তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর বাকী অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে ভাগ করে দেন এভাবে — অশ্বারোহী দ্বিগুণ এবং পদাতিক একগুণ। এই হাদিসের সনদ এ রকম, মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ ছুরী — মুনজির বিন মোহাম্মদ— মোহাম্মদের পিতা মুনজির— ইয়াহ্ইয়া বিন মোহাম্মদ বিন্ হানী— মোহাম্মদ বিন ইসহাক — মোহাম্মদ বিন্ জাফর বিন যোবায়ের— হজরত ওরওয়া।

ইবনে আবী শায়বা আবু উসামা এবং ইবনে নুমায়ের ওবায়দুল্লাহ্— নাফে' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. ঘোড় সওয়ারের জন্য দুইভাগ এবং পদাতিকের জন্য একভাগ নির্ধারণ করেছেন। দারা কুতনীও হাদিস বর্ণনা করেছেন এই সূত্রে। আবু বকর নিশাপুরী বলেছেন, আমার মনে হয় ইবনে আবী শায়বা তাঁর বর্ণনাটির মধ্যে ভুল করেছেন। কেননা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আব্দুর রহমান বিন বশীর প্রমুখ ইবনে নুমাইয়েরের বর্ণনাসূত্রে

যে হাদিসটি বিবৃত হয়েছে, সে হাদিসটি ইবনে আবী শায়বার মতো নয়। বর্ণনাটিতে ঘোড় সওয়ারের তিন অংশ এবং পদাতিকের এক অংশের কথা বলা হয়েছে। দারা কুতনীর বর্ণনাটি আবার ইবনে আবী শায়বার বর্ণনার মতো। তবে তাঁর বর্ণনা সূত্রটি এ রকম, নাঈম— ইবনে মুবারক— ওবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর— নাফে'— হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর। ইবনে জাওজী বলেছেন, এই বর্ণনাটির মধ্যে সম্ভবতঃ ভুল করেছেন নাঈম। ইবনে মুবারক ছিলেন বর্ণনাকারী হিসেবে পূর্ণ বিশ্বস্ত। ইবনে হুম্মামের মতও এ রকম।

দারা কুতনী, ইউনুস বিন আবদুল আ'লা, ইবনে ওয়াহাব, ওবায়দুল্লাহ্ বিন ওমর, নাফে— এই সূত্রে এসেছে হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, রসুল স. ঘোড়ার জন্যও অংশ প্রদান করেছেন। পদাতিকের জন্য এক অংশ, ঘোড়া ও তার মালিকের জন্য দুই অংশ। ইবনে আবী মারিয়ম এবং খালেদ বিন আব্দুর রহমানের বর্ণনায় হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর উমরী থেকেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। কা'নাবীও হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর উমরীর এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর মধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, হাদিসে উল্লেখিত শব্দটি আসলে কি ছিলো? অশ্বারোহী, না অশ্ব? দারা কুতনী— হেজাজ বিন মিনহাল— হাম্মাদ বিন সালমা— উবাইদুল্লাহ্ বিন ওমর— নাফে', এই সূত্রে এসেছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বলেছেন, রসুল স. অশ্বারোহীকে দুই অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ ভাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নজর বিন মোহাম্মদ বিন হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন এর বিপরীত।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উবাইদুল্লাহ্র বর্ণনার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কারথীও রয়েছেন। সুতরাং বায়হাকীর বর্ণনা হয়েছে অধিকতর বলিষ্ঠ। উবাইদুল্লাহ্ বিন ওমরকে বর্ণনাকারী হিসেবে অদৃঢ় বলেছেন ইবনে জাওজী। স্বসূত্রে আবদুর রহমান বিন আমিনের মাধ্যমে দারা কুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, রসুল স. অশ্বারোহীর জন্য দ্বিগুণ এবং পদাতিকের জন্য এক গুণ প্রদান করেছিলেন। হাসান বিন আম্মারা— হাকেম বিন উয়াইনা— মুকসিন সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. বদর যুদ্ধের গণিমত ভাগ করেছিলেন এভাবে— অশ্বারোহী দুই এবং পদাতিক এক। কিতাবুল খেরাজে ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, ফকীহ্ শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানিফা (আল্লাহ্তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন, গণিমত বণ্টনের নিয়ম হবে এ রকম— পদাতিক এক গুণ, ঘোড়া একগুণ এবং ঘোড়ার আরোহী একগুণ। আমি চতুষ্পদ জন্তুকে মুসলিমের উপরে মর্যাদা দিতে পারি না। (এ রকম বলতে পারিনা যে, ঘোড়ার অংশ দুই গুণ)। বর্ণনা বিভ্রাটের কারণে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, ঘোড়ার অংশ দুইগুণ। আবার কোথাও এসেছে, অশ্বারোহী পাবে তিনগুণ (ঘোড়ার জন্য দুই গুণ এবং তার নিজের জন্য একগুণ)।

উপরের বর্ণনাগুলোর মাধ্যমে দেখা যায়, ইমাম আবু হানিফার নির্ধারণ হচ্ছে — এক অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ ব্যক্তির জন্য। মুনজির বিন আবী হামসা হামাদানীর সূত্রে জাকারিয়া বিন হারেস বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমরের জনৈক গোলাম ছিলেন এক যুদ্ধের সেনাপতি। সিরিয়ার দিকে পরিচালিত ওই যুদ্ধের গণিমত তিনি ভাগ করেছিলেন এভাবে— ঘোড়ার জন্য এক অংশ এবং ব্যক্তির জন্য এক অংশ। হজরত ওমর এই বণ্টন পদ্ধতি সমর্থন করেছিলেন। অতএব বুঝতে হবে— যে সকল হাদিসে ঘোড়ার জন্য দ্বিগুণ অংশের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন। দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা শুনে মুজাহিদেরা যাতে ঘোড়া প্রতিপালন করতে উৎসাহিত হয়, সে কারণেই হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোড়ার জন্য দুই অংশের কথা বলা হয়েছিলো। লক্ষ্যণীয় যে, ঘোড়ার জন্য দ্বিগুণ অংশ দেয়া হলেও ঘোড়া তাতে করে লাভবান হয়নি। লাভবান হয়েছিলো তার মালিক (ঘোড়ারতো পুরস্কার প্রাপ্তি বোধই নেই)।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে নেতিবাচকতাকে ইতিবাচকতার উপরে প্রাধান্য দিতে হয়। তাই আমরা ঘোড়ার জন্য এক অংশকেই ধরবো। আর দুই অংশের বর্ণনা যেখানে রয়েছে, সেখানে মনে করবো অতিরিক্ত এক অংশ ছিলো আসলে পুরস্কার। তাছাড়া ওই সকল বর্ণনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘোড়ার দুই অংশের ব্যাপারটি স্থায়ী কোনো বিধান ছিলো না। স্থায়ী বিধান ছিলো— ঘোড়ার এক অংশ, যোদ্ধার এক অংশ। এভাবে পদাতিকের এক অংশ এবং অশ্বারোহীর দুই অংশ। আর হজরত আবু কাবশার বর্ণনাটিও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

মাসআলাঃ যদি কেউ দুটি ঘোড়া নিয়ে জেহাদে শরীক হয়, তবে সে একটি ঘোড়ার অংশই পাবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেয়ী। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় লিখেছেন, আমি একাধিক ঘোড়া সম্পর্কে কোনো বর্ণনা শুনিনি। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আহমদ বলেছেন, এমতো ক্ষেত্রে দুটি ঘোড়ার অংশই দিতে হবে। তবে এটা ঐকমত্য যে, দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই। ইমাম আবু ইউসুফের পক্ষে রয়েছে এই হাদিসটি — দারাকুতনীর বর্ননায় এসেছে, হজরত বশীর বিন ওমর বিন মুহসীন বলেছেন, রসুল স. আমার দুই ঘোড়ার জন্য চার অংশ দিয়েছিলেন। মাকহুল সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধে হজরত যোবায়ের দুইটি ঘোড়া সহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। রসুল স. তাঁকে দিয়েছিলেন পাঁচটি অংশ।

আব্দুল মালেক বিন ইয়াহ্ইয়া সূত্রে ওয়াকেদী লিখেছেন, ঈসা বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, খায়বর যুদ্ধের সময় হজরত যোবায়েরের ছিলো দুইটি ঘোড়া। রসুল স. তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন পাঁচটি। হারেস বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কা'ব সূত্রে ওয়াকেদীর বর্ণনায় আরো এসেছে, খায়বর যুদ্ধে রসুল স. তিনটি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোড়া তিনটির নাম ছিলো— লাজাজ, জোরাব এবং সাকাব। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম কয়েকটি ঘোড়া এবং হজরত হেরাস বিন সামেত নিয়ে গিয়েছিলেন দুটি ঘোড়া। দুটি করে ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন হজরত বারা বিন আউস এবং হজরত আবু ওমরা আনসারীও। রসুল স. তাঁদেরকে দুই ঘোড়ারই অংশ দিয়েছিলেন। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য রসুল স. কোনো অংশ নির্ধারণ করেন নি।

স্বসূত্রে ইবনে জাওজী সাঈদ বিন মানসুরের মাধ্যমে ইবনে আয়্যাশ আওজায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোড়ার অংশ প্রদান করতেন। কিন্তু দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ দিতেন না — যদিও কোনো কোনো যুদ্ধে কারো কারো দশটি পর্যন্ত ঘোড়া থাকতো।

সাঈদ বিন মানসুর — ফুরুজ বিন ফাদ্বালাহ— মোহাম্মদ বিন ওয়ালিদ — জুহরী সূত্রে এসেছে, খলিফা হজরত ওমর সেনাপতি হজরত আবু উবায়দা বিন জাররাহকে লিখেছিলেন, এক ঘোড়ার জন্য দুই অংশ, দুই ঘোড়ার জন্য চার অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ — এভাবে দুই ঘোড়ার মালিককে দিতে হবে পাঁচ অংশ। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমাকে ইবনে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ জানিয়েছেন, হাসান বলেছেন, দুইয়ের অধিক ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও যোদ্ধা পাবে কেবল দুটো ঘোড়ার অংশ। দুইয়ের অধিক ঘোড়ার জন্য কোনো অংশ নেই। মাকহুলের বক্তব্য ইয়াজীদ বিন ইয়াজীদ বিন জাবেরের মাধ্যমে মোহাম্মাদ বিন ইসাহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এভাবে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদে দুইয়ের অধিক ঘোড়ার কোনো অংশ নেই।

হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, ওই সকল বর্ণনায় বলা হয়েছে পুরস্কার প্রদানের কথা। মালে গণিমতের নির্ধারিত অংশের কথা সেগুলোতে বলা হয়নি। যেমন, পদাতিক হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. হজরত সালমা বিন আকওয়াকে দিয়েছিলেন অতিরিক্ত অংশ।

আমি বলি, যুদ্ধের পরে সেনাধিনায়ক বা শাসক যোদ্ধার বিশেষ অবদানের মূল্যায়ন করে পুরস্কারের ঘোষণা দিবেন। এটাই পুরস্কার প্রদানের নিয়ম। যুদ্ধের পূর্বে এ রকম ঘোষণা দেয়া যাবে না। কারণ রসুল স. এ রকম করেননি।

মাসআলাঃ যুদ্ধশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে যদি সাহায্যকারী বাহিনী এসে সম্মিলিত হয়, তবে তারাও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পাবে — যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা সত্ত্বেও। তবে শর্ত হচ্ছে সাহায্যকারী বাহিনী মূল বাহিনীর সাথে সম্মিলিত হতে হবে ইসলামী সাম্রাজ্যের বাইরে — বিধর্মীদের অঞ্চলে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। জমহুর বলেছেন অন্য কথা। তাঁদের অভিমতের

দলিল দিয়েছেন তাঁরা এভাবে— যথার্থ সূত্রে ইবনে আবী শায়েবা এবং তাহাবী তারেক বিন শিহাব আখমাসী থেকে বর্ণনা করেছেন— বসরাবাসীরা নাহওয়ানদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। হজরত আম্মার বিন ইয়াসিরের নেতৃত্বে কুফাবাসীরা পরে রওনা হয়েছিলো সাহায্যকারী বাহিনীরূপে। কিন্তু তারা পৌঁছানোর পূর্বেই জয়লাভ করেছিলো বসরাবাসীরা। সাহায্যকারী বাহিনী তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পায়নি। বরং মূল বাহিনীর এক সদস্য মন্তব্য করেছিলো, যুদ্ধ না করেও তারা আমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশীদার হতে চায় কেনো ? সেনাপতি হজরত আম্মার ঘটনাটি লিখে জানালেন খলিফা হজরত ওমরকে। জবাবে হজরত ওমর লিখলেন, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে তারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী। উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর অধীনে সম্পন্ন এক জেহাদে হজরত আম্মারের একটি কান কেটে গিয়েছিলো। তিনি বলতেন, ওই কানটিই আমার ছিলো উত্তম কান যা ধর্ম যুদ্ধে কাজে লেগেছিলো।

মারফু ও মাওকুফ (সর্বোন্নোত ও উন্নত) সূত্রে তিবরানী উল্লেখ করেছেন— যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের দাবীদার। বর্ণনাটি উন্নত সূত্রে বিশুদ্ধ এবং সর্বোন্নত সূত্রে অবিশুদ্ধ। ইবনে আদীর পদ্ধতিতে বোখতারী বিন মোখতার সূত্রে আব্দুর রহমান বিন মাসউদের মাধ্যমে এসেছে, হজরত আলীও এ রকম ঘোষণা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ঘোষণাটি রসুল স. এর নয়, হজরত আলীর। তাই তা মারফু নয়, মাওকুফ।

জায়েদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কাসীতের পদ্ধতিতে ইমাম শাফেয়ী উল্লেখ করেছেন — হজরত আবু বকর হজরত ইকরামা বিন আবু জেহেলের নেতৃত্বে পাঁচশত সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন হজরত জায়েদ বিন লবিদের অগ্রগামী বাহিনীর সাহায্যার্থে। এই বর্ণনাটির শেষ দিকে উল্লেখিত হয়েছে, ওই সময় হজরত আবু বকর একটি লিখিত নির্দেশনায় উল্লেখ করেছিলেন— যারা যুদ্ধে সশরীরে অংশ গ্রহণ করবে, তারাই হবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী। বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরা অসংলগ্ন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. হজরত আবান বিন সাঈদ বিন আস্ এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন নজদের দিকে। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন খায়বর বিজয়ের পর। রসুল স. হজরত আবানের বাহিনীকে খায়বরের গণিমতের অংশ দেননি। আবু দাউদ, আবু নাঈম, বোখারী। এ সম্পর্কে হানাফীগণ বলেছেন, বিজয়ের ফলে খায়বর হয়ে গিয়েছিলো ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানাভূত এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও হয়ে গিয়েছিলো সুসংরক্ষিত। হজরত আবানের বাহিনী সেখানে পৌঁছেছিলো পরে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাদের ঘটেনি। আর তারা বিধর্মীদের রাজ্যেও মিলিত হয়নি মূল বাহিনীর সাথে। তাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদও দেয়া হয়নি তাদেরকে।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু মুসা আশআরী বলেছেন, আমি রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম খায়বর বিজয়ের পর। রসুল স. আমাকেও দিয়েছিলেন গণিমতের অংশ। অংশ পেয়েছিলো আমার সঙ্গী সাথীরাও। এ সম্পর্কে ইবনে হাব্বান বলেছেন রসুল স. তখন হজরত আবু মুসা ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে অংশ দিয়েছিলেন খুমুস থেকে — পুরস্কাররূপে। মুজাহিদগণের অবশিষ্ট চার অংশ থেকে নয়।

মাসআলাঃ ব্যবসায়ী ও ঘোড়ার পরিচর্যাকারীরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকলেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হবে না— যতক্ষণ না তারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তারাও গণিমতের অংশ পাবে। কারণ হাদিস শরীফে এসেছে— আহাল্লাল গাণিমাতা লিমান শাহিদাল ওয়াকোয়াতা। (যুদ্ধের সঙ্গে যারা জড়িত তারাই গণিমত লাভের যোগ্য) অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় সকলেই হবে গণিমতের অংশীদার। ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতটি দু'টি কারণে অশুদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে — বর্ণিত হাদিসটি সর্বোন্নত নয়, উন্নত (রসুল স. এর কথা নয় সাহাবীর কথা)। দ্বিতীয়টি হচ্ছে— হাদিসটির উদ্দেশ্য বুঝতে তিনি অসমর্থ হয়েছেন। হাদিসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— যারা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবে, তারাই পাবে গণিমতের অংশ। এই উদ্দেশ্য বা নিয়ত চিহ্নিত করা যেতে পারে দু'ভাবে— ১. যুদ্ধের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ২. যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ। কাজেই যার রণ প্রস্তুতি নেই এবং যে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি— তাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকারী বলা যায় না। এ রকম হলে তো সেনাবাহিনীর সঙ্গের মহিলা ও শিশুরাও গণিমতের অংশীদার হবে। কিন্তু তাদের অংশীদার হওয়ার কথা কেউই বলেননি।

মুসলিম এবং আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাসকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর সঙ্গে যে সকল রমণী জেহাদে গমন করতেন, তাদেরকেও কি গণিমতের অংশ দেয়া হতো? হজরত ইবনে আব্বাস বললেন, রসুল স. প্রয়োজনবশতঃ তাদেরকে সঙ্গে নিতেন, কিন্তু গণিমতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এ কথাটি— তাদেরকে কিছু উদ্বৃত্ত প্রদান করা হতো (নির্ধারিত অংশ নয়, অতিরিক্ত কিছু দেয়া হতো উপহাররূপে)। এই বর্ণনাটি আবার আবু দাউদ ও নাসাঈর আরেকটি বর্ণনার পরিপন্থী। বর্ণনাটি এই— হাশরাজ বিন জিয়াদ, তাঁর পিতামহীর কথা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— রসুল স. পুরুষদের মতোই রমণীদেরকে গণিমতের অংশ দিয়েছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটি শিথিল সূত্র বিশিষ্ট। আর বর্ণনাকারী হাশরাজও অপরিচিত।

মাসআলাঃ কিশোরদেরকে যদি মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দেয়া হয় এবং শাসক বা অধিনায়ক যদি তাদের অংশ অনুমোদন করেন, তাহলে তারাও হবে মালে গণিমতের অংশীদার। ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। জমহুর বলেছেন, তাদেরকে অংশীদার করা যাবে না। তবে অবশ্যই তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে কিছু দিতে হবে। আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, মাকহুল বলেছেন, রসুল স. মেয়েদের, কিশোরদের এবং ঘোড়ার অংশ প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাটি মূলবিবর্জিত (মুরসাল)।

মাসআলাঃ শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমি, বাগান ইত্যাদি স্থাবর সম্পদ যুদ্ধলব্ধ অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের মতো ভাগ করতে হবে। প্রথমে বের করে নিতে হবে খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), তারপর বাকী চতুর্থাংশ ভাগ করে দিতে হবে মুজাহিদগণের মধ্যে। এ রকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। খায়বরের ভূমি মুজাহিদগণের মধ্যে এভাবেই ভাগ করে দিয়েছিলেন রসুল স.। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদও এই অভিমতের সমর্থক। কারণ, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে — 'মা গণিমতুম' (যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করো)। এখানে স্থাবর— অস্থাবরের পার্থক্য করা হয়নি। তবে মুজাহিদেরা যদি প্রসন্ন চিত্তে তাদের অধিকার পরিত্যাগ করে, তবে শাসক ওই স্থাবর সম্পত্তিকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিতে পারবেন। খলিফা হজরত ওমর তাঁর সময়ে অধিকৃত ইরাকের ভূমি এভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক বলেছেন, স্থাবর সম্পত্তি মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার অধিকার শাসকের নেই। স্থাবর সম্পত্তি অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের সম্পত্তি হিসেবে আপনা আপনি ওয়াকফ হয়ে যাবে। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। বিপরীত বক্তব্য এসেছে অপর একটি বর্ণনানুসারে। ওই বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমত ইমাম মালেকের অভিমতের প্রতিকূল। সেখানে বলা হয়েছে, শাসক ইচ্ছে করলে অধিকৃত স্থাবর সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেয়ার পর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন। অথবা ইচ্ছে করলে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওয়াকফও করে নিয়ে বাকী অংশ মুজাহিদদের বিধানানুসারে বণ্টন করে দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শাসক ইচ্ছে করলে খুমুস আলাদা করে দিতে পারেন। অথবা খেরাজ (খাজনা) প্রদানের শর্তে সাধারণ মুসলমানকেও দিয়ে দিতে পারেন। ওই সম্পত্তি ওয়াকফ্ করার অধিকার শাসকের নেই।

ইমাম আহমদ তাঁর অভিমতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন এভাবে — হজরত সহল বিন হাছানা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. খায়বরের স্থাবর সম্পত্তিকে সমান দুই অংশে ভাগ করেছিলেন। এক অংশ রেখেছিলেন নিজের জন্য। অপর অংশ ভাগ করেছিলেন আঠারো শত ভাগে। পদাতিক এক, অশ্বারোহী দুই এই নিয়মে বারোশত পদাতিক যোদ্ধাদেরকে দেয়া হয়েছিলো এক ভাগ করে বারোশত ভাগ। আর তিন শত অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দেয়া হয়েছিলো দুই ভাগ করে ছয়শত ভাগ। ইবনে জাওজী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তাহাবী লিখেছেন, রসুল স. অর্ধেক ফসল প্রদানের শর্তে খায়বরের জমিন খায়বরবাসীদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর হজরত ইবনে রওয়াহাকে নিযুক্ত করেছিলেন তত্ত্বাবধায়করূপে। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে রসুল স. খায়বরবাসীদেরকে ফসলের অর্ধভাগ প্রদানের শর্তে বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন খায়বরের জমি জমা। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, যখন আল্লাহ্পাক খায়বরের জমি জমা ও বাগান এনে দিলেন মুসলমানদের অধিকারে, তখন সেগুলো সেখানকার জমির মালিকদেরকেই বন্দোবস্ত দেয়া হলো এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহাকে নিযুক্ত করা হলো রাজস্বআদায়কারীরূপে। এরপর তাহাবী লিখেছেন, এতে করে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. খায়বরের অধিকৃত ভূখণ্ড সম্পূর্ণ ভাগ-বন্টন করে দেননি। সম্পূর্ণ ভূখণ্ড দুই ভাগ করে একভাগ বন্টন করে দিয়েছিলেন। অপরভাগ রেখে দিয়েছিলেন বন্টনবিহীন অবস্থায়।

আমি বলি, সুরা ফাতাহের তাফসীরে ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করা হয়েছিলো তিন ভাগে — শেক, নাতাত এবং কুছাইবা। কুছাইবা হচ্ছে খুমুস। আর সৈন্যদের আঠারো শত অংশ। পাঁচশত অংশ নাতাত এবং তেরোশত অংশ শেক। অর্ধেক অংশ খাজনা প্রদানের চুক্তিতে সেখানকার ইহুদীদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। রাজস্ব আদায়কারী হজরত ইবনে রওয়াহা ফসল তোলার মৌসুমে সেখানে যেতেন এবং ফসলের পরিমাণের উপর খাজনা নির্ধারণ করে তা আদায় করে নিয়ে আসতেন। পরবর্তীতে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতকালে ওই ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করেন। কারণ, চুক্তিতে এ কথাটি উল্লেখিত ছিলো যে, আমরা যখনই ইচ্ছা করবো তখনই আমাদের ভূমি সরাসরি আমাদের অধিকারে নিয়ে আসবো।

ইরাক বিজিত হয়েছিলো হজরত ওমরের খেলাফতকালে। ইরাকের প্রেক্ষা-পটটি ছিলো ভিন্ন। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে লিখেছেন, আমার নিকট মদীনার অনেক আলেম বলেছিলেন, যখন সেনাপতি হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বাহিনী ইরাক অধিকার করলো, তখন হজরত ওমর অধিকৃত ভূখণ্ড সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিতে শুরু করলেন সাহাবীগণ। কেউ কেউ বললেন, যারা ইরাক অধিকার করেছে তাদের মধ্যেই বন্টন করে দেয়া হোক সেখানকার জমিজমা। হজরত ওমর বললেন, যদি এ রকম করা যায়, তবে কি অবস্থা হবে। বিধর্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারাতো আর কোনোদিন জমিজমার মালিকানা পাবে না। তাই আমি এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করি। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, বিষয়টিতো যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। হজরত ওমর বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দাদের সমস্যাটিও প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্র শপথ! আমার পরে এতো বিশাল ভূখণ্ড আর আমাদের অধিকারে আসবে

না। সুতরাং ইরাক ও সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড বণ্টন করে দিলে সেনাবাহিনীর খরচ এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য কোথেকে আসবে? ইরাক বিজয়ী ও সিরিয়া বিজয়ীরা তখন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনিন! আমাদের তরবারীর মাধ্যমে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে যা দান করেছেন, আপনি কি তা ওই সকল লোককে ওয়াকফ্ করে দিতে চান, যারা এবং যাদের পুত্র-কন্যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি? হজরত ওমর বললেন, আমি আমার মতামত প্রকাশ করলাম। যোদ্ধৃবৃন্দ বললেন, তবে আপনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করুন। হজরত ওমর প্রথমে আলাপ-আলোচনা করলেন বিজ্ঞ মুহাজির সাহাবীগণের সঙ্গে। হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ বললেন, অধিকৃত সম্পত্তির অধিকারী মুজাহিদবৃন্দ। সুতরাং তাদের মধ্যেই ওই সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া হোক। কিন্তু হজরত আলী, হজরত ওসমান এবং হজরত তালহা মত প্রকাশ করলেন হজরত ওমরের অনুকূলে। এরপর হজরত ওমর পরামর্শে বসলেন আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে। পরামর্শ সভায় অংশ গ্রহণ করলেন আউস গোত্রের দশজন এবং খাজরাজ গোত্রের দশজন। তাদেরকে একত্র করে হজরত ওমর প্রথমে বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, আমি আপনাদেরকে ডেকেছি শুধু এ কথা বলতে যে, আমানতের গুরুভার রয়েছে আমার স্কন্ধে। আপনারাও এই গুরুভারের অংশীদার। আমি আপনাদের মতোই একজন সাধারণ ব্যক্তি। উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কেউ কেউ আমার মতামতের বিরোধিতা করেছেন। কেউ কেউ হয়েছেন একমত। আপনাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। এটাও আমি চাই না যে, আপনারা আমার অযৌক্তিক কোনো সিদ্ধান্তের অনুসারী হোন। আপনাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ্র কিতাব — যা সত্যের নির্দেশক। আল্লাহ্র শপথ! আমি চাই আমার কথায় ও আচরণে প্রকাশিত হোক প্রকৃত সত্য। আনসারী সাহাবীগণ বললেন, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! বিস্তারিত বর্ণনা করুন। আমরা শুনছি।

হজরত ওমর বললেন, কেউ কেউ বলছেন, আমি যোদ্ধাদের হক বিসর্জন দিচ্ছি। এ রকম করা থেকে আমি আল্লাহ্তায়ালার আশ্রয় যাচনা করি। জনগণের অধিকার নিশ্চিত না করতে পারলে তা হবে আমার জন্য বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি মনে করি পারস্য বিজয়ের পর এতোবড় বিজয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না। আল্লাহ্তায়ালা ইরাক সহ পারস্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমাদের অধিকারভূত করে দিয়েছেন। সেখানকার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি খুমুস গ্রহণের পর যোদ্ধাদেরকে দিতেও আমি সম্মত। কিন্তু সেখানকার ভূখণ্ড, জমি-জমা, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি খাজনা দেয়ার শর্তে আমি সেখানকার অধিবাসীদেরকেই দিয়ে দিতে চাই। জিযিয়াও ধার্য করতে চাই তাদের উপর। এভাবে আমরা পাবো খাজনা ও জিযিয়া। এভাবেই নিয়মিত উপার্জন আসতে থাকবে আমাদের। এটাই হবে সকলের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। আমাদের আগামী বংশধরেরাও এতে

করে উপকৃত হবে। এছাড়াও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিজিত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলতে হবে সুশৃঙ্খল প্রশাসন কেন্দ্র। শাম, জাজিরা, কুফা, বসরা, মিশর ইত্যাদি স্থানে গড়ে তুলতে হবে স্থায়ী সেনানিবাস। সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন পড়বে বিপুল অর্থের। অতএব সমগ্র অধিকৃত ভূখণ্ড যদি আমি পারস্য বিজয়ী সৈন্যদের মালিকানায় দিয়ে দেই, তবে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহ হবে কিভাবে? উপস্থিত আনসারী সাহাবীগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি যথার্থ বলেছেন। আপনার সিদ্ধান্তের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। হজরত ওমর বললেন, এবার আমার প্রয়োজন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির — যিনি ভূমির প্রকৃতি অনুপাতে অমুসলিম জনসাধারণের উপর এমন পরিমিত খাজনা নির্ধারণ করতে পারেন যা তাদের জন্য হবে সুবহ। সকলে বলে উঠলেন, ওসমান বিন হানিফের কথা। আরো বললেন, তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। হজরত ওমর তৎক্ষণাৎ হজরত ওসমান বিন হানিফকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রদান করলেন বিজিত ভূখণ্ডের সীমানা ও কর নির্ধারণের দায়িত্ব। এর ফল হলো অত্যন্ত শুভ। হজরত ওমরের পরলোকগমনের বছর খানেক আগেই ওই এলাকাগুলো থেকে আয় হলো এক কোটি দিরহামের মতো।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, জুহুরী সূত্রে আমার নিকট মোহাম্মদ বিন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, হজরত ওমর ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার ভূমি বণ্টন সম্পর্কে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সাধারণভাবে প্রায় সকলেই বললেন, যুদ্ধলব্ধ অস্থাবর সম্পদ বণ্টনের নিয়মে জমি-জমাও ভাগ করে দেয়া হোক মুজাহিদগণের মধ্যে। হজরত বেলাল বিন রিবাহ এই অভিমতের প্রতি ছিলেন অনমনীয়। আর হজরত ওমর ছিলেন ভাগ করার বিপক্ষে। তিনি দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! বেলালের মতামতের উপর তুমি আমার মতামতকে জয়যুক্ত করো। এই নিয়ে বিতর্ক চললো দুই তিন দিন ধরে। অবশেষে হজরত ওমর বললেন, আমার অভিমতের পক্ষে রয়েছে কোরআনের একটি দলিল। সুরা হাশরে ঘোষণা করা হয়েছে— 'মা আফায়াল্লহু আ'লা রসুলিহি মিনহুম .... ওয়াল্লাজিনা জায়ু মিম বা'দিহিম। এই আয়াতের নির্দেশনা একটি সাধারণ নির্দেশনা। অনাগত বিশ্বাসী জনতাও এই নির্দেশনাটির অর্ন্তভূত। এই নির্দেশনাটির আলোকে আমি বলি, বিজিত দেশের সমগ্র ভূখণ্ড সকল মুসলমানের সম্পদ। এবার তবে আপনারা বলুন, ওই ভূখণ্ড আমি ভাগ করবো কিভাবে? যদি ভাগ করি তবে সাধারণ জনতার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে। শেষ পর্যন্ত হজরত ওমরের সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হলো। খাজনা প্রদানের শর্তে সেখানকার জমি-জমা ফিরিয়ে দেয়া হলো আগের মালিকদেরকে।

ইমাম আবু ইউসুফ আরো লিখেছেন, আমার নিকট হাবীব বিন আবী সাবেত সূত্রে লাইস বিন লাইস বিন সা'দ বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণের অনেকে তখন বলেছিলেন, রসুল স. যেভাবে খায়বরের জমি-জমা ভাগ করে দিয়েছিলেন

সেভাবেই আপনি ভাগ করে দিন ইরাক ভূখণ্ডকে। এই অভিমতের দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম এবং বেলাল বিন আবী রিবাহ্। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, মুসলমানদের আগামী প্রজন্মকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। এরপর তিনি দোয়া করেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে বেলালের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। মুসলমানেরা ধারণা করতেন হজরত ওমরের অপপ্রার্থনার ফলেই মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো সিরিয়ায়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, হজরত ওমর তখন ইরাকের ভূখণ্ড খাজনা আদায়ের শর্তে সেখানকার অধিবাসীদেরকেই দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি বলি, এ কথাটি ব্যাপক বিদিত যে, ইরাকের জমি-জমা খাজনার বিনিময়ে সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে হস্তান্তর করার বিষয়টি ছিলো ঐকমত্যসম্মত (পক্ষে বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও অবশেষে সকলে হজরত ওমরের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন)।

একটি সন্দেহঃ ঐকমত্যের মাধ্যমে কোরআনের আয়াত রহিত হতে পারে না। আলোচ্য আয়াতেই দেয়া হয়েছে — যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের বিবরণ। তাহলে বন্টন না করার বিষয়ে ঐকমত্য সংঘটিত হতে পারে কি ভাবে? আর হজরত ওমর সুরা হাশরের যে আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছিলেন, তাও এখানে দলিল হিসেবে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ সেখানে যে সম্পদের কথা বলা হয়েছে, তা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নয়। আর ইরাকের বিজিত ভূখণ্ড যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অন্তর্ভূত। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুজাহিদদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। তবে ইরাকের বিজিত ভূখণ্ড সম্পর্কে এ রকম করা হলো না কেনো?

সন্দেহের নিরসনঃ উম্মতে মোহাম্মদী কখনো ভুল বিষয়ে একমত হয় না। সুতরাং এখানকার ঐকমত্যটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার বিরোধী নয়। তাই বুঝতে হবে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বণ্টনের নিয়ম প্রযোজ্য হবে, অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কোনো কোনো সামগ্রী নিজের জন্য গ্রহণ করার অধিকার রসুল স. এর ছিলো। 'নিহত ব্যক্তির মাল সামান পাবে তার হত্যাকারী'— এই ঘোষণাও তিনি স. দিয়েছিলেন। অতএব বুঝতে হবে বিজিত দেশের ভূখণ্ড ভাগ না করাও তেমনি একটি বিশেষ ব্যবস্থা। আর বিশেষ ব্যবস্থার উপরে সংঘটিত হয়েছিলো ঐকমত্য।

মোহাম্মদ বিন আবীল মুজালিদ একবার আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসুল স. কী তাঁর সময়ে ভূমিজাত শস্য ও পরিপক্ক ফলের খুমুস বের করেছিলেন? তিনি বললেন, খায়বরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকারে আসার পর আমি পেয়েছিলাম কেবল কিছু খাদ্যশস্য এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। অন্যান্যরাও এ রকম পেয়েছিলেন। খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) তখন আলাদা করে

নেয়া হয়। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন রসুল স. এর জামানায় একদল মুজাহিদ গণিমত হিসেবে পেয়েছিলেন কেবল কিছু আহার্য দ্রব্য ও ছোট খাটো কিছু সামগ্রী। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তখন খুমুসকেও আলাদা করা হয়নি। হজরত উবাইদুর রহমানের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস কাসেমের বর্ণনায় এসেছে, কতিপয় সাহাবী বলেছেন জেহাদের সময় আমরা উটের গোশত খেতাম। যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খেতাম আমরা। উট বা গোশত আমাদেরকে ভাগ করে দেয়া হতো না। হাদিস তিনটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ।

দ্রষ্টব্যঃ শাওয়াফীয় বলেছেন, গণিমতের দাবিদারদের সম্মতিক্রমে ইরাক ও সিরিয়ায় সমগ্র ভূভাগ ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন হজরত ওমর। আর মুজাহিদেরা ওই সম্মতি দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, প্রসন্নচিত্তে।

আমি বলি, এ রকম হয়ে থাকলে সবার আগে অবশ্যই খুমুস বের করে নেয়া হতো। কারণ খুমুস খলিফা অথবা মুজাহিদ— কারোই হক নয়। কেউ খুমুসকে পরিত্যাগ করার অধিকারও রাখে না। এরপর হজরত ওমর জরিপ করে আংগুর ও গমের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে খাজনা নির্দিষ্ট করেছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ওই জমি ওয়াকফ্ করা হলে বিভিন্নভাবে কর নির্ধারণের প্রয়োজন পড়তো না। ফসল উৎপাদনের আগেই ফসলের উপর কর নির্ধারণ করলে তা হবে অস্তিত্বহীন ক্রয়-বিক্রয়ের মতো— যা বৈধ নয়। সুতরাং তিনি ইরাক ও সিরিয়ার জমি ওয়াকফ করেছিলেন — কথাটি ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ইরাক ও সিরিয়ার ভূখণ্ড তিনি মুসলমানদের অধীনে প্রদানই করেননি। খাজনা নির্ধারণ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব মালিকদেরকে। জিযিয়াও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাদের উপর। এভাবে বিজিত দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী শাসন। এভাবে বিধর্মীরাই হয়েছিলো ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর কর নির্ধারণ করা না হলেও কর প্রদানকারীদের অধীনস্থ ও অধীনস্থা বলে এভাবে তারাও হয়ে গিয়েছিলো প্রশাসনের পরোক্ষ সহায়ক।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহে এবং তাতে মীমাংসার দিন যা আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম, যখন দুইদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' এ কথার অর্থ— বদর যুদ্ধের দিন মুখোমুখি হয়েছিলো মুসলিম বাহিনী ও কাফের বাহিনী। মুসলিম বাহিনীর সেনাধিনায়ক ছিলেন আল্লাহ্র রসুল স্বয়ং। আল্লাহ্পাক তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন ফেরেশতা বাহিনী। অবতীর্ণ করেছিলেন আরো অনেক মোজেজা। আল্লাহ্র ওই অলৌকিক সাহায্য এবং তাঁর রসুলকে প্রদত্ত মোজেজা সমূহকে তোমরা বিশ্বাস করো। এ কথাও বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। নিম্নে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো—

১. আল্লাহ্পাক অংগীকার করেছিলেন — কুরায়েশদের দু'টি বাহিনীর মধ্যে একটির উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। মুসলমানেরা চেয়েছিলো সহজ বিজয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকে আক্রমণ করা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছিলো। মুসলিম বাহিনীকে দাঁড়াতে হয়েছিলো কুরায়েশদের সশস্ত্র ও সুসজ্জিত বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

২. হঠাৎ নেমে এসেছিলো বৃষ্টি। ওই বৃষ্টি ছিলো মুসলমানদের জন্য রহমত এবং কাফেরদের জন্য অভিশাপ।

৩. সাহায্যকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিলো সশস্ত্র ফেরেশতাদেরকে। কেউ কেউ তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তাদেরকে দেখেওছিলেন কেউ কেউ। ওই ফেরেশতাদের আঘাতে অনেক কাফের ধরাশায়ী হয়েছিলো। কোনো কোনো কাফেরের মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো তাদের শরীর থেকে। আবু জেহেলের শরীরেও ছিলো ফেরেশতাদের চাবুকের চিহ্ন।

৪. রসুল স. এক মুষ্টি প্রস্তর কণা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলেন কাফেরদের দিকে। তাদের প্রত্যেকের চোখে পড়েছিলো ওই পাথরের কণাগুলো। ফলে তারা হয়ে পড়েছিলো দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য।

৫. কাফেরেরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখানো হয়েছিলো নগণ্য সংখ্যকরূপে। এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে দূর করে দেয়া হয়েছিলো যুদ্ধভীতি। বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো সাহস।

৬. রসুল স. পূর্বাহ্নে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মুশরিকদের মৃত্যুর স্থান। তাঁর নির্দেশিত স্থানেই মরে পড়েছিলো ওই সকল অংশীবাদীরা।

৭. রসুল স. তাঁর মক্কা বাসের সময় উক্বা বিন আবী মুয়িত্কে বলেছিলেন, মক্কার পর্বতমালার বাইরে পেলেই আমি তোমাকে হত্যা করবো। বদর যুদ্ধে এ রকমই ঘটেছিলো।

৮. রসুল স. তাঁর যুদ্ধবন্দী পিতৃব্য হজরত আব্বাসকে বলেছিলেন, আপনি অমুক বস্তু আপনার পত্নী উম্মুল ফজলের জ্ঞাতসারে ওমুক স্থানে রেখে এসেছেন। এ কথা শুনে হজরত আব্বাস রসুল স. এর রেসালত সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৯. আল্লাহ্পাক মুসলমানদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করো, তবে যে সম্পদ তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম সম্পদ দেয়া হবে তোমাদেরকে। তাই হয়েছিলো। হজরত আব্বাস বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে, বিশ আউকিয়ার (সোনা অথবা চাঁদির) বিনিময়ে পেয়েছিলেন বিশটি গোলাম।

১০. আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলকে জানিয়েছিলেন, মক্কায় বসে আমবার বিন ওয়াহাব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। তাদের পরিকল্পনা সফল হবে না। কারণ আপনার রক্ষক স্বয়ং আমি। এই সংবাদ উমায়েরকে জানানো হলে তিনি তা স্বীকার করেন এবং বিশুদ্ধ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। হয়ে যান ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক। তখন খেজুরের একটি শুকনো শাখা হয়ে গিয়েছিলো তরবারী। হজরত জায়েদ বিন আসলাম এবং হজরত ইয়াজিদ বিন রুম্মান থেকে ইবনে সাঈদ এ রকম লিখেছেন। হজরত ওমর থেকে বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, বদর প্রান্তরে যুদ্ধ করতে করতে হজরত উক্কাশা বিন মহসীনের তরবারী ভেঙে যায়। ভাঙা তরবারী নিয়ে তিনি উপস্থিত হন রসুল স. এর খেদমতে। রসুল স. তাঁর হাতে তুলে দেন খেজুরের একটি শুকনো ডাল। বলেন, উক্কাশা! এটাই তোমার তরবারী। যাও, যুদ্ধ করো। হজরত উক্কাশা ডালটি হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন সেটি হয়ে গিয়েছে একটি সুতীক্ষ্ণ শাদা তরবারী। বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওই তরবারী দিয়েই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন হজরত উক্কাশা। তরবারীটির নাম দেয়া হয়েছিলো উয়ূন। হজরত উক্কাশা ওই তরবারী দিয়ে এর পরেও অনেক যুদ্ধ করেছেন। শেষে নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার তালহা বিন খুওয়াইলিদ আসাদীর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

১১. দাউদ বিন হোসাইন সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, আশহাল গোত্রের কিছু লোক বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের সময় সালমা বিন আসলাম বিন হারেসের তলোয়ার ভেঙে গেলো। তখন রসুল স. এর হাতে ছিলো একটি খর্জুর শাখার ছড়ি। ছড়িটি তিনি স. হজরত সালমাকে দিয়ে বললেন, যাও, এটা দিয়েই যুদ্ধ করো। হজরত সালমা ছড়িটি হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর। দেখলেন ছড়িটি হয়ে গিয়েছে একটি অত্যুত্তম তলোয়ার। তলোয়ারটি সবসময় সঙ্গে রাখতেন তিনি। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন খায়বর যুদ্ধে।

১২. বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হজরত হাবীব বিন আদীর একটি হাত বাহুমূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রসুল স. হাতটি তাঁর পবিত্র মুখের লালা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

১৩. বায়হাকীর বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত কাতাদা বিন নোমানের একটি চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। তাঁর সাথীরা বলেছিলেন, ঝুলন্ত চোখটি কেটে ফেলে দাও। রসুল স. বলেছিলেন, না। এমন কোরো না। এরপর তিনি স. তাঁর পবিত্র হাতে চোখটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। মুছে গেলো জখমের চিহ্ন। বুঝার উপায় রইলোনা, কোন চোখটি জখম হয়েছিলো তাঁর।

১৪. বায়হাকী কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, হজরত রেফাআ বিন রাফে' বলেছেন বদর যুদ্ধে তীর বিদ্ধ হয়েছিলো আমার চোখে। রক্তাক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন ওই চোখের উপরে পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন রসুল স.। দোয়াও করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাভ করলাম নিরাময়।

১৫. ইসহাক থেকে ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ বিন নওফেল বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা নওফেল বন্দী হলেন বদর যুদ্ধে। রসুল স. তাকে বললেন, মুক্তিপণ হিসাবে ওই বর্শাটি দিয়ে দাও, যা তুমি তোমার বাড়ীতে রেখে এসেছো, নওফেল বললেন, আমার ওই বর্শার কথা আল্লাহ্ এবং আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। নিশ্চয় আল্লাহ্পাকই আপনাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রসুল। আমি এবার মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলাম। উল্লেখ্য, ওই বর্শাটি ছিলো এক হাজার দিরহাম মূল্যমানের।

আলোচ্য বাক্যে 'মীমাংসার দিন' বলে বুঝানো হয়েছে বদর যুদ্ধের দিবসকে। ওই দিন যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করা হয়েছিলো। জয়যুক্ত করা হয়েছিলো সত্যধর্ম ইসলামকে এবং ধ্বংস করা হয়েছিলো অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতাকে।

'যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলো'—কথাটির অর্থ যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের দু'টি দল। একটি দল ছিলো আল্লাহ্র। অপরটি ছিলো শয়তানের।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।' এ কথার অর্থ —আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাবলে পরাস্ত করেছেন তাঁর শত্রু-দেরকে। এভাবেই সর্ব সমক্ষে এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে — তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

সুরা আন্ফালঃ আয়াত ৪২

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তাহারা ছিলো দূর-প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদিগের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাহিতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিত; কিন্তু বস্তুতঃ যাহা ঘটিবারই ছিল আল্লাহ্ তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করিলেন

যাহাতে যে-কেহ ধ্বংস হইবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকিবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এখানে বদর প্রান্তরে মুসলিম বাহিনী এবং মুশরিক বাহিনীর অবস্থানের বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে উপত্যকার নিকটবর্তী সীমানায় ছিলো মুসলিম যোদ্ধাদের অবস্থান দূরবর্তী সীমানায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলো মুশরিক যোদ্ধারা। নিম্নভূমিতে ছিলো তাদের উষ্ট্রারোহী বাহিনী। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকেই এখানে উষ্ট্রারোহী বাহিনী বলা হয়েছে। ওই বাহিনী তখন প্রায় তিন মাইল দূরের সমুদ্রোপকূলের পথে দ্রুত ফিরে যাচ্ছিলো মক্কায়। সমুদ্রোপকূলকেই এখানে বলা হয়েছে নিম্নভূমি। এ কথাগুলোই প্রথমে বলা হয়েছে এভাবে— স্মরণ করো, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট-প্রান্তে এবং তারা ছিলো দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী দল ছিলো তোমাদের অপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করতে চাইতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটতো।' এ কথার অর্থ— হে মুসলিম বাহিনী! তোমাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তোমরা একমত হয়ে এ রকম পরিকল্পনা করতেও পারতে না। মুশরিকেরা ছিলো তোমাদের চেয়ে তিনগুণ। তাদের সমরায়োজনও ছিলো বিশাল। ওই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে ঘটতো চরম মতভেদ। কারণ তোমরা ছিলে তাদের চেয়ে সেনা সংখ্যা, সমর সম্ভার— সব দিক দিয়ে দুর্বল। স্বাভাবিকভাবে তোমাদের মনে হতো এই অসম যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু বস্তুত! যা ঘটবার ছিলো আল্লাহ্তায়ালা তা সম্পন্ন করবার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করলেন।' এ কথার অর্থ—আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্য ছিলো সত্য ও মিথ্যা মুখোমুখি হোক। সত্য হোক বিজয়ী এবং মিথ্যা হোক পরাজিত। সৃষ্টি তার স্রষ্টার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা কার্যকর করতে বাধ্য। তাই হয়েছিলো। পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই পরিপূর্ণ লোকবল ও অস্ত্রবল ছাড়াই মুসলিম বাহিনী উপস্থিত হয়েছিলো বদরে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীকে আক্রমণ করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এভাবে বদরে এসে উপস্থিত হতেই তারা দেখলেন, পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে অদূরে অবস্থান গ্রহণ করেছে মুশরিকদের বিশাল সেনাবাহিনী। অপরদিকে মুশরিক বাহিনীরও উদ্দেশ্য ছিলো না যুদ্ধ হোক। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাণিজ্য বাহিনীটিকে রক্ষা করা। এভাবে অগ্রসর হতে হতে তারাও এসে দাঁড়ালো মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখী। অবশেষে তাই ঘটলো, যা ঘটাতে চেয়েছিলেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং।

আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় রসুলকে সাহায্য করতে। তাই তাঁর পক্ষে প্রেরণ করেছিলেন সশস্ত্র ফেরেশতা বাহিনীকে। আল্লাহ্তায়ালা চেয়েছিলেন সমুন্নত হোক ইসলামের পতাকা। আরো চেয়েছিলেন ইসলামের শত্রুরা হোক লাঞ্ছিত ও অপমানিত। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিলো। পূর্ণ হয়েছিলো আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে।' এ কথার অর্থ— সত্য ও অসত্যের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য একটি যুদ্ধ ছিলো অনিবার্য। যুদ্ধে পরিপূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমেই সর্বসমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সত্যের প্রকৃতরূপ। তাই আল্লাহ্পাক এইভাবে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থী উভয় দলকে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো— যারা মরবে তারা যেনো সত্যের পূর্ণরূপ দেখেই মরে। আর যারা বাঁচবে তারাও যেনো সত্যের স্বরূপ দেখে লাভ করে বিশুদ্ধ জীবন।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, এখানে 'যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয়'— কথাটির মর্মার্থ হবে, যে কেউ কাফের হতে চায়, সে যেনো সত্য ও অসত্য স্পষ্ট হওয়ার পরই হয়ে যায় চিরস্থায়ী কাফের। আর যে জীবিত থাকবে সে যেনো সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে'— কথাটির মর্মার্থ হবে, যে ইমানদার হবে, সে যেনো সত্য ও অসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পরেই হয়ে যায় চিরস্থায়ী ইমানদার। এখানে ধ্বংস হওয়ার অর্থ হবে অবিশ্বাস বা কুফরীকে গ্রহণ করা। আর জীবিত হওয়ার অর্থ হবে গ্রহণ করা ইমান বা বিশ্বাসকে। ইমানই প্রকৃত জীবন। আর কুফরই প্রকৃত ধ্বংস বা মৃত্যু। আল্লাহ্পাক ভালো করেই জানেন, কে ইমান আনবে আর কে ইমান আনবে না। সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, প্রারম্ভ ও পরিণতি— সবকিছুই তাঁর জ্ঞানবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায় হচ্ছে, সকলের সামনে উম্মোচিত হোক সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ। তাই তিনি পরস্পর বিরোধী ওই দল দু'টিকে তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই বদর প্রান্তরে সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

শেষে বলা হয়েছে —' আল্লাহতো সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসের ঘোষণা যেমন শোনেন, তেমনি শোনেন বিশ্বাসের ঘোষণা। কারণ তিনি সর্ব শ্রোতা। আর আল্লাহ্তায়ালা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে জানেন সকলের ভিতরের ও বাইরের সকল কিছু। অবিশ্বাসীরা যে চির নরকবাসী এবং বিশ্বাসীরা যে চির বেহেশতবাসী— সে কথাও আল্লাহ্তায়ালা উত্তমরূপে অবগত। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ
فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

❐ স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে তাহারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাইতেন যে তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাইতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

❐ স্মরণ কর, বস্তুতঃ যাহা ঘটিবারই ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদিগের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদিগের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

'ইজ ইউরিকাহুমুল্লহু ফী মানামিকা কুলীলা' (স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প)। বদর প্রান্তরে রসুল স. গভীর আবেগে দোয়া করতে করতে এক সময় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন যে, শত্রুদের লোকবল, অস্ত্রবল নিতান্তই স্বল্প। সেই স্বপ্নের কথাই স্মরণ করার নির্দেশনা এসেছে এখানে। এটা ছিলো আল্লাহ্তায়ালার হেকমত। ঘটনাটি ছিলো এ রকম —

শত্রুদের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের পর রসুল স. সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি যুদ্ধের নির্দেশ না দিবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। শত্রুরা তোমাদের নিকটবর্তী হতে চাইলে শর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে প্রতিহত কোরো। তলোয়ার চালিয়োনা। একেবারে সামনে এসে পড়লে তলোয়ার চালিয়ো। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন, তাঁর জন্য নির্মিত অস্থায়ী প্রকোষ্ঠে। প্রার্থনারত অবস্থায় হয়ে পড়লেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকরের কথায় তন্দ্রা কেটে গেলো। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহের রসুল! দুশমনেরা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। শুরু হয়েছে শোরগোল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রসুল স. কে দেখানো হয়েছিলো, কাফেরদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ কথা তিনি সাহাবীগণকে জানালেন। ফলে সকলে হয়ে পড়লেন প্রফুল্লচিত্ত ও নির্ভীক। প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন সকলে।

হজরত হাব্বান বিন ওয়াসে থেকে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, তন্দ্রা ভঙ্গ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আবু বকর! সুসংবাদ শ্রবণ করো। আল্লাহ্পাকের সাহায্য তোমাদের নিকট এসে পড়েছে। জিবরাইল তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে স্বয়ং উপস্থিত। তার উপরে পড়েছে যুদ্ধ প্রান্তরের ধুলো বালির প্রভাব।

হাসান বলেছেন—শত্রুদের সংখ্যা রসুল স. কে কম করে দেখানো হয়েছিলো জাগ্রত অবস্থায়। স্বপ্নে নয়। এখানে উল্লেখিত মানামিকা স্বপ্নে কথাটির অর্থ হবে — স্বপ্নের মতো করে। অর্থাৎ তখন জাগ্রত অবস্থাতেই রসুল স. এর পবিত্র দু'চোখে নেমে এসেছিলো স্বপ্নের ঘোর। আর আল্লাহ্পাক ওই অবস্থায় তাঁকে দেখিয়েছিলেন শত্রুদের সেনা সংখ্যা নগণ্য সংখ্যক। আর তাদের সমরায়োজনও অপ্রতুল।

এরপর বলা হয়েছে — 'ওয়ালাও আরাকাহুমকাসীরাল লাফাশিলতুম ওয়ালা-তানা মায়'তুম ফীল আমরি।' এ কথার অর্থ— যদি তোমাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। এখানে স্বপ্নে দুশমনদের সংখ্যা কম করে দেখানোর কারণটি বলা হয়েছে। বাস্তবে দুশমনেরা ছিলো বিপুল সংখ্যক জনবল ও অস্ত্রবলে সুসজ্জিত। এই অবস্থা দেখলে মনোবল হারিয়ে ফেলতো মুসলিম বাহিনী। অতি উৎসাহীরা বলতো মৃত্যু ভয়ে আমরা পশ্চাদপসরণ করতে পারি না। চলো সকলে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হই। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্নরা বলতো, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও অগ্রসর হওয়া আত্মহননের নামান্তর। সুতরাং অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন। এভাবে দেখা দিতো তুমুল বিরোধ।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া লাকিন্নাল্লহা সাল্লামা ইন্নাহু আ'লীমুম্ বিজাতিস্ সুদুর।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে এই প্রচণ্ড অনৈক্য ও মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছেন। আর তিনি সকলের অন্তরের গতিবিধি সম্পর্কে সম্যক অবগত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শেষ কথাটির অর্থ হবে এ রকম— আল্লাহ্পাক তোমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনিই জানেন, কার অন্তরে আল্লাহ্তায়ালার জন্য রয়েছে কতটুকু ভালোবাসা।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'স্মরণ কর, বস্তুতঃ যা ঘটবারই ছিলো তা সম্পন্ন করবার জন্য। তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।' এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালাই চেয়েছিলেন যুদ্ধ সংঘটিত হোক। তাই তিনি উভয় দলের দৃষ্টিতে উভয় দলকে শক্তিহীনরূপে দেখিয়েছিলেন। ফলে উভয় দলই নিশ্চিত বিজয় জেনে শুরু করেছিলো প্রচণ্ড যুদ্ধ।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন— আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, দুশমনদের সংখ্যা খুবই কম। পাশের সহযোদ্ধাকে বললাম, ওরা তো দেখছি দুইশ'র বেশী হবে না। তুমি কি বলো? সে বললো, আমার তো মনে হয় নব্বই জন। পরে এক

যুদ্ধ বন্দীকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা যুদ্ধ করতে এসেছিলে কতজন? সে বললো, এক হাজার। অপর দিকে কাফেরেরাও দেখছিলো মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মুসলমানের সংখ্যা বেশী দেখলে তারা পালিয়েও যেতে পারতো। তাই আল্লাহ্পাক তাদের চোখে মুসলমানদেরকে দেখিয়েছিলেন দুর্বলরূপে। আবু জেহেল তাই বলেছিলো, মোহাম্মদের লোকেরা তো দেখছি একটি উটের গোশত ভক্ষণ করার মতোও নয়।

ইবনে মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে— ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল তখন এ কথাও বলেছিলো যে, ওদেরকে হত্যা কোরো না। বন্দী কোরো। রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিও সকলকে। এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াতটি— 'ইন্না বালাওনাহুম কামা বালাওনা আসহাবাল জান্নাতি' (আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যেমন পরীক্ষা করেছিলাম জান্নাতবাসীদেরকে)।

উল্লেখ্য যে, কাফেরেরা মুসলমানদেরকে নগণ্য সংখ্যক দেখতে পেয়েছিলো যুদ্ধ শুরুর পূর্বে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো, তখন তারা দেখতে পাচ্ছিলো, মুসলমানদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

❐ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হইবে তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

❐ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজদিগের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমাদিগের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করিবে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত রহিয়াছেন।

❐ তোমরা তাহাদিগের ন্যায় হইবে না যাহারা গর্বভরে ও লোকদেখানোর জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হয় এবং লোককে আল্লাহের পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন কোনো কাফের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে তখন অবিচল থাকবে। পলায়ন করবে না। আল্লাহতায়ালার কথা বিস্মৃত হবে না। মনে মনে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এই মর্মে দৃঢ় আশা পোষণ করবে যে, আল্লাহ্‌পাক নিশ্চয়ই বিজয় দান করবেন।

এখানে বলা হয়েছে, 'যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে।' এখানে নির্দিষ্ট করে কাফেরদের দলের সম্মুখীন হবে এ রকম বলার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, মুসলমানেরা সব সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর বলা বাহুল্য যে, এখানে 'সম্মুখীন হবে' কথাটির অর্থ, যুদ্ধ করবে। 'অবিচলিত থাকবে' কথাটির অর্থ— দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে, পলায়ন করবে না। সহীহ্ হাদিস সমূহে বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কবীরা গোনাহ্। 'আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে' অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বিজয়ের প্রার্থনা জানাবে। 'যাতে তোমরা সফলকাম হও' অর্থ— যাতে তোমরা বিজয়ী হও। এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত তাঁর বিশ্বাসী বান্দার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই সঙ্গীন অবস্থায় সাহায্য ও বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণ ও প্রার্থনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— গাফেল হয়ো না। নির্ভর করো আল্লাহ্‌তায়ালার দয়ার উপর এবং বিশুদ্ধ অন্তরে স্মরণমগ্ন থাকো কেবল আল্লাহ্‌র।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হবে। 'ফাতাফশালু ওয়া তাজহাবা রীহুকুম' অর্থ— করলে তোমরা সাহস হারাবে। সুদ্দী বলেছেন, এখানে রীহ্ শব্দটির অর্থ—সাহসিকতা, বীরত্ব। মুকাতিল বলেছেন, শব্দটির অর্থ ক্ষিপ্রতা, গতিশীলতা। নজর বিন শামিল বলেছেন শক্তিমত্তা। কাতাদা এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, বদর বিজয়ের উপলক্ষ ছিলো ওই বাতাস যার কারণে মুশরিকদের অগ্রযাত্রা পরিবর্তিত হয়েছিলো। ওই বাতাসের জন্যই অর্জিত হয়েছিলো বিজয়। অতএব, 'রীহ' শব্দটির অর্থ হবে বাতাস। আবু জায়েদের উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেম এ রকম উল্লেখ করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, আমরা বিজয়ী হয়েছি পূবাল বাতাসের মাধ্যমে। আর আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিলো পশ্চিমা বাতাসের মাধ্যমে।

হজরত নোমান বিন মাকরানের বর্ণনায় এসেছে, আমি রসুল স. এর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তিনি স. সকালের দিকে যুদ্ধ শুরু করতে চাইতেন না। আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যের অপেক্ষায় থাকতেন। যুদ্ধ শুরু করতেন দ্বিপ্রহরের পর। ইবনে আবী শায়বা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন'। অমূল্য সম্পদ ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ্পাকের সাহায্য ও প্রতিদান ধৈর্যধারণকারীদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাই তারা হয় পৃথিবীতে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে বলীয়ান এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানে বিভূষিত।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের আজাদ করা ক্রীতদাস আবু নসর সালেম বলেছেন, আমি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমরের সচিব ছিলাম। তাঁর নিকট আগত চিঠিপত্র পড়া, পড়ে শোনানো, জবাব প্রদান ইত্যাদিও ছিলো আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একদিন আমি পাঠ করলাম হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই আওফার একটি চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিলো— রসুল স. এক জেহাদে সামনাসামনি হলেন বিধর্মী বাহিনীর। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত তিনি আক্রমণ শুরু করলেন না। দ্বিপ্রহরের পর তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, উপস্থিত জনমণ্ডলী! দুশমনদেরকে আক্রমণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো। নিরাপত্তার জন্য সাহায্য কামনা করো কেবল আল্লাহ্র। ক্রমাগত অগ্রসর হও সামনের দিকে। মনে রেখো, তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। এরপর প্রার্থনা করলেন এভাবে— হে আমাদের আল্লাহ্! হে আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ-কারী, মেঘপুঞ্জের পরিচালক, কাফের সম্প্রদায়কে পরাজয়দাতা— আমাদেরকে কাফেরদের উপরে জয়যুক্ত করো।

এর পরের আয়াতে (৪৭) দেয়া হয়েছে বিশুদ্ধচিত্ততার (এখলাসের) নির্দেশনা। এখলাসের অভাবে সকল পুণ্যকর্ম হয়ে পড়ে মূল্যহীন ও নিষ্প্রাণ। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের সুরত (আকৃতি) ও সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। দৃষ্টিপাত করেন তোমাদের অন্তর ও পুণ্যকর্মের প্রতি। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, বিশুদ্ধ নিয়তের উপরেই নির্ভর করে জেহাদ, হিজরত— সকল পুণ্যকর্ম। বোখারী, মুসলিম। আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য স্বীয় গৃহ থেকে বের হয় এবং লোককে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।' এখানে

'বাতারান' শব্দটির অর্থ গর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা। জুজায্ বলেছেন, 'বাতারান' অর্থ নেয়ামত প্রাপ্তির পরে অবাধ্য বা অকৃতজ্ঞ হওয়া। কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হবে প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বিস্মৃত হওয়া। 'রিয়া' অর্থ কৃতিত্ব ও সাফল্যকে মানুষের সামনে জাহির করা। প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জনই এ রকম প্রদর্শন সর্বস্ব প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য।

আবু জেহেলের গর্বন্মোত্ততা এবং কৃতিত্ব প্রদর্শনের কথাই বর্ণিত হয়েছে এখানে। আর বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো কস্মিনকালেও আবু জেহেলের মতো দম্ভ ও জনমনোরঞ্জনের আকাঙ্খার প্রতারণায় না পড়ে। ঘটনাটি ছিলো এ রকম— আবু সুফিয়ান সংবাদ পেলো, মুসলমানেরা তার বাণিজ্য বাহিনী আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। সে তৎক্ষণাৎ বিপুল বাণিজ্য সম্ভার রক্ষার জন্য মক্কায় সংবাদ পাঠালো। ওই বাণিজ্যে অংশী ছিলো মক্কার প্রায় সকলেই। তাই এ সংবাদে সৃষ্টি হলো চরম উত্তেজনা। সাজ সাজ রব পড়ে গেলো যুদ্ধের জন্য। আবু জেহেল সকলকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে লাগলো। বাণিজ্য বাহিনীটি উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই এসে পড়লো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা। আবু সুফিয়ান বললো, কাফেলা এখন নিরাপদ। সুতরাং তোমরা যুদ্ধযাত্রা স্থগিত করো। আবু জেহেল বললো, না। আমরা ক্ষান্ত হবো না। বদর প্রান্তরে আমরা পৌঁছবোই। তিন দিন অবস্থান করবো সেখানে। উট জবাই করে বসাবো ভোজসভা। চলবে গান, বাজনা, মদ্যপান ও ভোজ। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। ফলে তাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের প্রতাপ ও পরাক্রম। এ সকল কথার প্রতি ইঙ্গিত করে বিশ্বাসীগণকে আলোচ্য আয়াতে গর্ব, লোক দেখানো কাজ এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— এ সকলের বিপরীত অবস্থাই প্রশংসনীয়। তাই বিশ্বাসীগণকে হতে হবে অহংকার মুক্ত, প্রদর্শন প্রবণতা মুক্ত এবং আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে আহ্বানকারী। সকল আমলের নেপথ্যে থাকতে হবে বিশুদ্ধ নিয়ত বা উদ্দেশ্য। আকাঙ্খী হতে হবে কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির ও সওয়াবের।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু বিমা ইয়া'মালুনা মুহিত্ব'। এ কথার অর্থ— বান্দার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌তায়ালার বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত। 'ইহাত্বা' অর্থ— পরিবেষ্টন বা বেষ্টন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার এই পরিবেষ্টন আল্লাহ্‌-তায়ালারই মতো বেমেছাল (আনুরূপ্যবিহীন)।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

❒ স্মরণ করো, শয়তান তাহাদিগের কার্যাবলী তাহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল 'আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদিগের উপর বিজয়ী হইবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদিগের নিকটই থাকিব।' অতঃপর দুইদল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন সে সরিয়া পড়িল ও বলিল 'তোমাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাওনা আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।'

বদর প্রান্তরে আসার পূর্বে মক্কায় অনুষ্ঠিত কুরায়েশ নেতাদের পরামর্শ সভায় এক নজদী বৃদ্ধের রূপ ধরে ইবলিস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন অপপরামর্শ দিয়েছিলো। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যুদ্ধের প্রতি। সেই ঘটনাই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— স্মরণ করো, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিলো এবং বলেছিলো আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকবো। এ কথার অর্থ— শয়তান মুশরিকদেরকে বুঝিয়েছিলো, দেখো। তোমরাই সঠিক পথে রয়েছো। কারণ তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী। মোহাম্মদই নতুন করে ধর্মদ্রোহীতা শুরু করেছে। বলা বাহুল্য এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিলো মুশরিক নেতাদের মনে। তাই আবু জেহেল দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা জানিয়েছিলো, হে আল্লাহ! যুদ্ধরত দু'টি দলের মধ্যে যারা সঠিক পথে রয়েছে, তাদেরকে জয়যুক্ত করো। আর ধ্বংস করে দাও ভ্রষ্টদেরকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে শয়তান রূপ ধারণ করেছিলো সুরাকা বিন মালেক বিন জাশামের। বলেছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে এমন কেউ নেই। আর আমিও সাহায্যকারী হিসেবে তোমাদের সাথে থাকবো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করলো। পরবর্তী বাক্যে সে কথাই বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— অতঃপর দুইদল যখন পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হলো, তখন সে

সরে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না, আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

হজরত রেফায়া বিন রাফে' থেকে তিবরানী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির এবং ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্-তায়ালা রসুল স. এর সাহায্যার্থে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন। এক প্রান্তে পাঁচশত ফেরেশতার নেতৃত্বে ছিলেন হজরত জিব্রাইল এবং অপর প্রান্তে পাঁচশত ফেরেশতা নিয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন হজরত মিকাইল। অপরপক্ষে ইবলিসও তার দলবল ও নিশান নিয়ে উপস্থিত ছিলো। বনী মাদলাসের পশ্চাতে সে দাঁড়িয়েছিলো সুরাকা বিন মালেকের আকৃতি ধরে। তার সঙ্গে ছিলো অন্যান্য শয়তানেরা। শয়তান তখন মুশরিক সেনাদেরকে বললো, —'লা গালিবা লাকুমুল ইয়াওমা মিনান্নাসি ওয়া ইন্নী জারুল্লাকুম' (আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। সাহায্যার্থে আমি তোমাদের নিকটেই থাকব)। হঠাৎ ইবলিসের নজর পড়লো হজরত জিব্রাইলের দিকে। জনৈক মুশরিকের হাত ধরে কথা বলছিলো ইবলিস। হজরত জিব্রাইলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছেড়ে দিয়ে পালাতে শুরু করলো। এক মুশরিক বললো, কি ব্যাপার সুরাকা! পালাচ্ছো কেনো? তুমি তো বললে আজ আমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। ইবলিস বললো— তোমাদের সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক রইলো না। তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি। আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

ফেরেশতা বাহিনীকে দেখেই পলায়ন করেছিলো ইবলিস। হারেস বিন হিশাম শয়তানের উপরোক্ত কথাগুলো শুনেছিলো। সে মনে করেছিলো সুরাকাই কথাগুলো বলছে। সুরাকা অবশ্য বদরযুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হজরত জিব্রাইলকে দেখে পালাবার সময় হারেসের বুকে আঘাত করেছিলো শয়তান। ফলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো হারেস। পালাবার সময় একটি বারও পিছন ফিরে তাকাবার সাহস পায়নি শয়তান। সোজা গিয়ে সে ঝাঁপ দিলো সমুদ্রে। আর আল্লাহ্তায়ালার নিকটে দুই হাত উঠিয়ে চিৎকার করে দোয়া করতে লাগলো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো, যে প্রতিশ্রুতি তুমি আমাকে দিয়েছো। তুমি বলেছো তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচতে দিবে।

শয়তান মনে করেছিলো, আজ হয়তো হজরত জিব্রাইল তাকে মেরেই ফেলবেন। তাই সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করেছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। আবু জেহেল তখন বলেছিলো, সুরাকাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা ভুল করেছি। সে তো ছিলো আসলে মোহাম্মদের পক্ষের লোক। তোমরা হতোদ্দম হয়ো না।

শপথ লাত্ ও উজ্জার! মোহাম্মদ ও তার সাথীদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না। সুতরাং তাদের কাউকে তোমরা হত্যা কোরো না। বন্দী কোরো। পরে আমরা তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবো।

এক বর্ণনায় এসেছে, বদর যুদ্ধের পরে লোকেরা সুরাকাকে মক্কায় দেখে বললো, সুরাকা! তুমিই তো আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছো। পলায়নের মনোবৃত্তি জাগ্রত করে দিয়েছো আমাদের যোদ্ধাদের অন্তরে। সুরাকা বললো, আমি বুঝতে পারছি না তোমরা কি বলছো। আমি তো সেখানে যাইইনি। তাই জানিও না সেখানে কে কি করেছে। কিন্তু লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করলো না। পরে সুরাকা ইসলাম গ্রহণ করলেন। অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। তখন সকলে বুঝতে পারলো যে, বদর যুদ্ধে ইবলিসই সুরাকার আকৃতি ধারণ করেছিলো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি'— ইবলিসের এ কথাটি সত্য। কিন্তু 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি'— তার এ কথাটি সত্য নয়। কারণ আল্লাহ্র ভয় তার ছিলো না। আসলে সম্পূর্ণ বিষয়টি ছিলো শয়তানের প্রতারণা। এভাবেই শয়তান প্রতারণা করে মানুষকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। তারপর বিপদ দেখলে তাদেরকে পরিত্যাগ করে আত্মরক্ষা করে।

আতা বলেছেন 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি— শয়তানের এই কথাটির অর্থ হবে— আমার ভয় হচ্ছে, আবু জেহেলের বাহিনী ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনে হয় ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আমি তাদের সঙ্গে থাকবো না। আমার তো রয়েছে জীবন হারানোর ভয়।

কালাবী বলেছেন, হজরত জিব্রাইলকে দেখে শয়তানের ভয় হয়েছিলো, এই বুঝি হজরত জিব্রাইল তাকে ধরে সকলের সামনে তার প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস করে দিবেন। এভাবে সকলের সামনে চিহ্নিত হলে সবাই তো সাবধান হয়ে যাবে। প্রতারণা করা তখন আর সহজ হবে না। তাই তার বক্তব্যটি হবে এ রকম— এভাবে চিহ্নিত হওয়াকে আমি ভয় করি। শয়তানের 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি' কথাটিরও অর্থ হবে এ রকম।

কেউ কেউ বলেছেন, শয়তানের 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি' কথাটির অর্থ হবে— আমি জানি আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুলকে সাহায্য করবেন। এ কথাও জানি যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে শাস্তিদানে কঠোর। তাই হে আল্লাহ্র দুশমনেরা! তোমাদের ব্যাপারেই আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। হজরত জিব্রাইলকে যখন আল্লাহ্তায়ালা পাঠিয়েছেন তখন এ কথা নিশ্চিত যে, আজ নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। সে ভয়ই আমি করি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি' একটি পূর্ণ বাক্য। এরপর ঘটবে যতিপাত। শেষের বাক্যটি (আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর) সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য।

হজরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্‌ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, আরাফার দিবসে (হজের দিন) আল্লাহ্‌তায়ালার সীমাহীন রহমত বর্ষণ হতে দেখে এবং অসংখ্য মানুষকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে দেখে শয়তান নিজেকে খুবই অপমানিত ও লাঞ্ছিতবোধ করে। এ রকম লাঞ্ছনা এবং অপমানবোধ করেছিলো সে বদর যুদ্ধের দিন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি' শয়তানের এ কথাটির অর্থ কি? রসুল স. বললেন, হজরত জিব্‌রাইল এবং সাহায্যকারী ফেরেশতা দলকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে দেখে তাদের বিপরীতে শয়তান তার নিজের কৌশল ও সেনাসমাবেশের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়। আর পরাজয় নিশ্চিত জেনে ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে দগ্ধীভূত হতে থাকে। তাই নিরাশ হয়ে বলে, 'তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তা দেখি।' মালেক, বাগবী।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبٰرَهُمْ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ○ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ○

❒ স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে 'ইহাদিগের দ্বীন ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে।' কেহ আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিলে আল্লাহ্‌ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

❒ তুমি দেখিতে পাইলে দেখিতে ফেরেশতাগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে 'তোমরা দহন যন্ত্রনা ভোগ কর।'

❒ ইহা তোমাদিগের কর্মফল; আল্লাহ্‌ তাঁহার দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে।' মদীনার মুনাফিকেরা দেখলো, মাত্র তিনশত দলের অধিক লোক নিয়ে রসুল স. যুদ্ধযাত্রা করলেন। তারা এ সংবাদও পেলো যে, ওদিকে আবু জেহেল প্রায় এক হাজার লোক নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওনা হয়েছে। তারা তখন স্থির নিশ্চিত হলো যে, মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য। বিপুল সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে তারা কিছুতেই টিকতে পারবে না। তাই তারা বলতে শুরু করলো, মুসলমানদের ধর্মই তাদেরকে প্রতারিত করেছে। যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারাও এ রকম বলতে শুরু করলো। এখানে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে দোদুল্য-চিত্ত মুসলমানদেরকে— যাদের বিশ্বাস ছিলো সন্দেহবিজড়িত। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মুশরিকদেরকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি বলে মুনাফিকদেরই আর একটি দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওই দলটিও মুনাফিক। মুনাফিকদের মতো তাদেরও অন্তর ছিলো ব্যাধিগ্রস্ত। তাই 'ওয়া'(ও) শব্দটির মাধ্যমে দল দু'টোকে এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। যেমন— 'ইলাল মালিকিল ইরামি ওয়াব্নুল হিমামি ওয়া লাইসাল কুতাইবাতু ফিল মুজদাহামি।'

এখানে একই বাদশাহ্কে বুঝানো হয়েছে— যার ছিলো বিভিন্ন দল। ওই দল সমূহকে এখানে ওওয়া (ও) শব্দের মাধ্যমে সংযোজন করা হয়েছে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল মুসলমানকে যারা দুর্বলতার কারণে হিজরত করতে পারেনি। মুশরিক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তারা রয়ে গিয়েছিলো মক্কায়। বদর যাত্রার সময় কুরায়েশরা তাদেরকে জোর করে ধরে এনেছিলো। বদরে এসে তারা মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা দেখে হতাশ হয়ে পড়লো। ইসলামের প্রতি যেটুকু বিশ্বাস তাদের ছিলো সেটুকুও তারা হারিয়ে ফেললো তখন এবং বলতে শুরু করলো, 'এদের (মুসলমানদের) ধর্ম এদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে'। এ কথা বলার কারণে তারা হয়ে গিয়েছিলো ধর্মত্যাগী (মোরতাদ)। বদর যুদ্ধে তারা সকলেই নিহত হয়েছিলো। ;তাদের মধ্যে ছিলো— কায়েস বিন ওলিদ বিন মুগিরা মাখজুমী, আবু কায়েস বিন ফাকীহ্ বিন মুগিরা মাখজুমী, হারেস বিন জামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আলী বিন উমাইয়া বিন খলফ জামুহী, আস বিন মুনাব্বিহ্ বিন হাজ্জাজ প্রমুখ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, এ

কথা (এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে) বলেছিলো উত্‌বা বিন রবিয়া এবং তার সঙ্গী সাথীরা। তারা সকলেই ছিলো মুশরিক। তাদের এই অপকথনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক যা এরশাদ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ রয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে এভাবে—

'কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করলে আল্লাহ্‌ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত এবং প্রজ্ঞাময়। সুতরাং তাঁর প্রতি যারা নির্ভর করবে, তারাই লাভ করবে বিজয়। বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো। মুসলমানদের বদর বিজয় আল্লাহ্‌পাকের ওই পরাক্রান্তি ও প্রজ্ঞাময়তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— তুমি দেখতে পেলে দেখতে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে। এখানে 'তারা' শব্দটির অর্থ 'দেখছো'। শব্দরূপটি বর্তমান কালের কিন্তু এর অর্থ হবে অতীতকাল বোধক। কারণ এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'লাও' শব্দটি। এভাবে 'ওয়ালাও তারা' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— তুমি দেখতে পেলে দেখতে।

এরপরে বলা হয়েছে— ইজ তাওয়াফ্‌ফা। এ কথার অর্থ— প্রাণ হরণ করছিলো। এরপর বলা হয়েছে আল্লাজিনা কাফারু (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের)। এরপর বলা হয়েছে— আল মালাইকাতু ইয়াদ্বরিবুনা উজুহাহুম ওয়া আদবারাহুম (ফেরেশতাগণ মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে)। এভাবে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— ফেরেশতাগণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণ হরণ করছে। এখানে প্রাণ হরণ করছে কর্মটির কর্তা হবে ফেরেশতাগণ। এ রকমও হতে পারে যে, কর্তা এখানে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং আর 'ফেরেশতাগণ' হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং ইয়াদ্ব রিবুন (আঘাত করে) হচ্ছে বিধেয়।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ বদর যুদ্ধে মুশরিক সেনাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেছিলো আগুনের চাবুক এবং লৌহদণ্ড দ্বারা। সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎভাগ উভয় দিক থেকে আঘাত করা হয়েছিলো তাদেরকে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'পৃষ্ঠদেশ' কথাটির অর্থ হবে— পশ্চাদ্দেশ (নিতম্ব)। 'পশ্চাদ্দেশ' শব্দটি লজ্জাজনক বিধায় আল্লাহ্‌পাক এখানে উল্লেখ করেছেন 'পৃষ্ঠদেশ।'

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া জুকু আ'জাবাল হারীক্ব (এবং বলছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ করো)। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই কথাটুকু বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত নয়— আখেরাতে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে

—১২

যখন আযাব দেয়া হবে, সেই সময়কার। অর্থাৎ বদর প্রান্তরে যখন মুশরিকেরা মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে শুরু করলো তখন ফেরেশতারা চাবুকের আঘাত হানতে শুরু করলেন তাদের মুখমণ্ডলে। এর ফলে তারা পালাতে শুরু করলো। তখন ফেরেশতারা আঘাত শুরু করলো তাদের পশ্চাদ্দেশে। এইভাবে তাদেরকে বধ করতে করতে ফেরেশতারা তাদেরকে বলতে শুরু করলো— (আখেরাতেও তোমাদেরকে দহন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।)। তখন শাস্তিদানকালে ফেরেশতারা বলবে— তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ করো।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, তখন ফেরেশতারা কাফেরদেরকে আঘাত করবে লৌহদণ্ড দ্বারা। ওই লৌহদণ্ডের আঘাতে তাদের জখমের স্থানে জ্বলে উঠবে আগুন। ওই অগ্নি-শাস্তিকেই এখানে বলা হয়েছে জুক্বূ আ'জাবাল হারীক্ব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরেশতারা এ রকম বলতে থাকবে কাফেরদের মৃত্যুর পর থেকে।

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'জালিকা বিমা ক্বদ্দামাত আইদী-কুম ওয়া আন্নল্লহা লাইসা বি জাল্লামিল্লিল আ'বীদ্' (এটা তোমাদের কর্মফল; আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন)। এখানে 'বিমা' শব্দটির 'মা' কারণ প্রকাশক। 'মা ক্বদ্দামাত' (কর্মফল) অর্থ অবিশ্বাস ও পাপ। 'আইদিকুম' অর্থ হস্ত দ্বারা অর্জিত। মানুষের অর্জন সাধারণতঃ হস্ত দ্বারাই হয়। তাই এখানে কর্মফলকে ক্বদ্দামাত আইদিকুম (হস্ত দ্বারা অর্জিত কর্ম) বলা হয়েছে।

মানুষ অবিশ্বাস ও পাপকে গ্রহণ করে স্বেচ্ছায়। এভাবে তারা নিজেরাই হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী। সে কারণেই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দান করেন। যারা শাস্তির উপযুক্ত নয়, আল্লাহ্পাক তাদেরকে শাস্তি দান করেন না। শাস্তিদান করেন কেবল শাস্তিযোগ্যদেরকেই। আর এ রকম শাস্তিদানকে জুলম বা অত্যাচার বলা যায় না। তাই এখানে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ তাঁর দাসদের প্রতি অত্যাচারী নন।

'জাল্লামিন্' শব্দটি এখানে মুবালেগার (কর্তৃকারকের) শব্দরূপ হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে। শক্তি ও ক্রিয়ার ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য এ রকম করা হয়নি। করা হয়েছে শক্তি ও ক্রিয়াকে অধিকতর গুরুত্বদানের জন্য। কেননা 'দাসদের' বলে এখানে সকল দাসদেরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে— আল্লাহ্তায়ালা তাঁর কোনো দাসের উপরে অত্যাচার করেন না।

এ পর্যন্ত বিবৃত হলো বদর যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা। পরবর্তী আয়াতে সত্য ও মিথ্যার পরিণতির দৃষ্টান্তরূপে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এভাবে—

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ
مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ○ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ○

❐ ফেরাউনের স্বজন ও উহাদিগের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ্ ইহাদিগের পাপের জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দেন। আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর;

❐ ইহা এই জন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নহেন যে তিনি উহাদিগকে যে সম্পদ দান করেন তিনি উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❐ ফেরাউনের স্বজন ও তাহাদিগের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদিগের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল সীমালংঘনকারী।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে 'কাদা'বি আলি ফিরয়াউনা ওয়াল্লাজীনা মিন ক্বলিহিম কাফারু বি আয়াতিল্লাহি ফা আখাজাহুমুল্লহু বিজু-নুবিহিম' (ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন)। এখানে কাদা'বি আলি ফিরয়াউনা (ফেরাউনের স্বজনের) অভ্যাসের ন্যায় কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতি আল্লাহ্‌দ্রোহী ফেরাউনের স্বজনদের মতো। ওয়াল্লাজিনা মিন ক্বলিহিম (তাদের পূর্ববর্তীগণের) কথাটির অর্থ— ফেরাউনের পূর্ববর্তী অবাধ্য সম্প্রদায়ের। এ কথার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ফেরাউনের জামানার পূর্ববর্তী হজরত নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে এবং আদ্, ছামুদ ইত্যাদি কাফের সম্প্রদায়কে। ফেরাউনের অনুসারীদের মতো ওই সকল সম্প্রদায়ও

আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। তার সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে তাদের ওই পাপের জন্য বিভিন্নভাবে শাস্তিও দিয়েছিলেন।

শেষে বলা হয়েছে— ইন্নাল্লহা ক্বওবিয়্যুন শাদীদুল ইক্বাব। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। এমন কেউই নেই যে তাঁর শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারে।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, যদি কোনো সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্‌ এমন নন যে তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেন, তা পরিবর্তন করবেন।' এ কথার অর্থ— কাফেরদের উপর আযাব অবতীর্ণ করা হয় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। অবাধ্যতা ও পাপের মাধ্যমে আহ্বান জানায় আযাবকে। অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য হয় বলেই আল্লাহ্‌পাক তাদের উপর অবতীর্ণ করেন শাস্তি। যেমন, মক্কাবাসীদেরকে আল্লাহ্‌পাক দান করেছিলেন সম্মানজনক জীবনোপকরণ ও নিরাপত্তা। তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন আবরাহার হস্তি বাহিনীর আক্রমণ থেকে। কিন্তু তারা পরবর্তীতে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের সত্য ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। এভাবে দীর্ঘ দিন গত হওয়ার পরও আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেননি। শেষে তাদেরকে শাস্তি দান করেছিলেন বদর যুদ্ধে। কারণ তারা পৌঁছে গিয়েছিলো অবিশ্বাস ও পাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে। রসুল স. ও তাঁর অনুসারীদের সাথে শত্রুতা, মসজিদুল হারাম থেকে বিশ্বাসীদেরকে বিতাড়ন, কোরবানীর পশুর হেরেম শরীফে প্রবেশে বাধাদান, বিশ্বাসীদেরকে হত্যার অপতৎপরতা, কোরআনের আয়াতের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ— এ সকলকিছুই ছিলো তাদের চরম সীমালংঘন। আর এই সীমালংঘনের কারণেই তাদের উপর আপতিত হয়েছে শাস্তি। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, রসুল স. এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের পিতামহের নাম ছিলো আবদুল মান্নাফ। আবদুল মান্নাফ ছিলো কুসাইয়ের পুত্র এবং কেলাবের প্রপৌত্র। কেলাবের উর্ধ্বতন বংশধারা ছিলো এ রকম, মুররাহ্‌— কায়াব— লুওয়াই। কেলাবের পূর্ববর্তী পুরুষেরা ছিলেন হজরত ইসমাইলের সত্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁরা তাদের পরবর্তী বংশধরকে হজরত ইসমাইলের ধর্মাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন। পরে কুসাই বিন কেলাবের জামানায় তাদের মধ্যে শুরু হয় মূর্তি পূজার প্রচলন। কা'য়াব বিন লুওয়াই একবার আরববাসীদেরকে একত্র করেছিলেন। তখন তাঁর পুত্র কুসাই জনতাকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বশেষ রসুল জন্মগ্রহণ করবেন আমার বংশে। তোমরা তার অনুসরণ কোরো। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কোরো। এরপর তিনি পাঠ করেছিলেন কয়েকটি কবিতা। ওই কবিতাগুলোর

একটির মর্মার্থ এ রকম— হায়! আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতে পারতাম যখন কুরায়েশরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে এবং শেষ রসুলকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে।

কুসাই ছিলেন দানশীল, পরোপকারী। হজের সময় তিনি হাজীদেরকে পানাহার করাতেন। পানি সংরক্ষণের জন্য তিনি নির্মাণ করেছিলেন চর্ম-নির্মিত অনেক বৃহদাকৃতির পাত্র। মক্কা, মিনা ও আরাফায় তিনি ওই পাত্রগুলোকে পানি দ্বারা পূর্ণ করে রাখতেন এবং হাজীদেরকে ওই পাত্রগুলোর পানি পান করতে দিতেন। তাই তাকে বলা হতো পানি সরবরাহকারী। মূর্খতার যুগেও এই প্রথাটির প্রচলন ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পরেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

কুসাই কর্তৃক প্রচলিত আরেকটি রীতি ছিলো এই যে, হজের সময় মুজদালিফায় রাতে আগুণ জালিয়ে রাখা হতো। ওই আগুন দেখে হাজীগণ আরাফা থেকে সোজা মুজদালিফায় চলে আসতে পারতেন। রসুল স. এর সময়েও এ রকম করা হতো। পরবর্তী তিন খলিফার জামানাতেও এই নিয়মটি প্রতিপালিত হতো। কুসাইয়ের জামানার পরে মক্কাবাসীরা হজরত ইসমাইলের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করে। আমর ইবনে লুহাই খাজায়ী প্রথম প্রচলন ঘটায় মূর্তি পূজোর। সমাজে শুরু হয় আরো অনেক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা।

সুদ্দী বলেছেন, 'আল্লাহ্ তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন'— এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে। মক্কাবাসীরা ওই সম্পদের যথাসমাদর করেনি। তাই আল্লাহ্তায়ালা ওই সম্পদকে (নেয়ামতকে) দিয়ে দিয়েছিলেন মদীনাবাসীকে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মক্কাবাসী মুশরিকেরা ছিলো ফেরাউনের স্বজনদের মতো। তারা ছিলো দুরাচার ও নিকৃষ্ট। মূর্তি পূজাই ছিলো তাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মমত। তাই তারা রসুল স. এর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে-ছিলো। মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলো তাঁকে। আল্লাহ্র পথে হয়েছিলো অনড় প্রতিবন্ধক। এমন কি রসুল স. এর হত্যার পরিকল্পনাও তারা করেছিলো। এতো কিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেননি। তাঁর প্রিয় রসুলকে দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। তবু তারা সত্য ধর্মের বিরোধিতা পরিত্যাগ করেনি। হয়ে উঠেছিলো যুদ্ধংদেহী। তাদের ওই চরম সীমালংঘনের কারণে তাই বদর যুদ্ধের সময় তাদের উপর নেমে এসেছিলো আল্লাহ্র আযাব।

উল্লেখ্য যে, কোনো সম্প্রদায় তাদের অবস্থা পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্তায়ালা অবিশ্বাসীদের উপর আযাব অবতীর্ণ করেন না। তওবার জন্য প্রদান করেন দীর্ঘ অবকাশ। কিন্তু তওবার সেই সুযোগ গ্রহণ না করে ক্রমাগত সীমালংঘন করতে থাকলে অকস্মাৎ একদিন কাফেরদের উপর নেমে আসে আল্লাহ্র আযাব। আল্লাহ্তায়ালা তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নেন তার নেয়ামত। তাদেরকে নিপতিত করেন শাস্তির মধ্যে।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া আন্নাল্লহা সামীউন আ'লীম' (এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক সীমালংঘনকারীদের সকল কথা শ্রবণ করেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তাদের সকল অপচেষ্টা ও অবাধ্যতা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। তারা যে নেয়ামতের অনুপযুক্ত এবং আযাবের উপযুক্ত সে কথাও তিনি ভালো করে জানেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ।

এর পরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে, 'ফেরাউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় এরা এদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিলো সীমালংঘনকারী।' এখানে ফাআহ্লাকনা হুম (তাদেরকে ধ্বংস করেছি) কথাটির অর্থ— ওই সকল অবাধ্য-দের কাউকে কাউকে আমি দিয়েছি সলিল সমাধি, ভূমিকম্পের মাধ্যমে কাউকে কাউকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি মাটির সঙ্গে, কাউকে দিয়েছি আকৃতি পরিবর্তনের আযাব, কারো কারো মূলোৎপাটন করেছি ভয়াবহ তুফানের মাধ্যমে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তারা সকলেই ছিলো সীমালংঘনকারী।' এ কথার অর্থ— ওই সকল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ও তাদের কর্মফলের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছিলো আল্লাহ্র আযাব। আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি। পাপাচরণের যথাপ্রতিফল দিয়েছিলেন মাত্র।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ

عٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝

❒ আল্লাহের নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বাস করে না।

❒ উহাদিগের মধ্যে তুমি যাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদিগের চুক্তি ভংগ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না;

❒ যুদ্ধে উহাদিগকে তোমরা যদি তোমাদিগের আয়ত্তে পাও তবে উহাদিগকে উহাদিগের পশ্চাতে যাহারা আছে তাহাদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে উহারা শিক্ষা লাভ করে।

'ইন্না শার্রাদ দাওয়াব্বি ই'ন্দাল্লহ্' অর্থ— আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই। আল্লাজীনা কাফারূ অর্থ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়। ফাহুম লা ইয়ু'মিনূন অর্থ— এবং বিশ্বাস করে না। এখানে ফা (এবং) সংযোজক অব্যয়টির মাধ্যমে

এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালার অসীম জ্ঞানের মধ্যে ওই সকল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী ও অবিশ্বাসীরা চিরভ্রষ্ট। তাই কস্মিনকালেও তারা ইমান আনবে না। এভাবে উদ্ধৃত আয়াতত্রয়ের প্রথমটি প্রযোজ্য হবে ওই সকল অবিশ্বাসীর প্রতি যারা মৃত্যুবরণ করবে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের সঙ্গে, তারাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট জীব। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদের ছয়টি গোত্র সম্পর্কে। ইবনুত্ তাবুতও ছিলো ওই সকল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে—'তাদের মধ্যে তুমি যাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে।' হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি (৫৫) অবতীর্ণ হয়েছে ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত চুক্তি ভঙ্গকারীরাও পূর্ববর্তী আয়াতে কথিত 'নিকৃষ্ট জীব' এর অন্তর্ভুক্ত রয়ে যাবে। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা হবে আলোচ্য আয়াতেও প্রবহমান।

চুক্তিতে আবদ্ধ দু'টি পক্ষই থাকে পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এভাবে মদীনার ইহুদীরা মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে ছিলো অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, 'চুক্তিভঙ্গ করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে বনী কুরায়জার ইহুদীদেরকে। তাদের সঙ্গে মুসলমানেরা এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, মদীনাবাসীরা কেউ কারো বিরুদ্ধাচরণ করবে না। গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ কারো শত্রুকে সাহায্য করতে পারবে না। বনী কুরায়জা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছিলো। গোপনে গোপনে তারা সাহায্য করতে শুরু করেছিলো মুসলমানদের শত্রুপক্ষকে। কা'ব বিন আশরাফ মক্কায় গিয়ে সেখানকার মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। এর ফলে সংঘটিত হয় খন্দকের যুদ্ধ। কিন্তু খন্দক যুদ্ধেও সুবিধা করতে পারেনি মুশরিকেরা। অসাফল্যের গ্লানি নিয়ে তাদেরকে ফিরে যেতে হয়েছিলো মক্কায়। এভাবে চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে ইহুদীরা বলেছিলো, আমরা ভুল করেছি। সুতরাং আমরা পুনরায় চুক্তি করতে চাই। কিন্তু পরের চুক্তিটিও ভঙ্গ করেছিলো তারা। তাই এখানে বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি ইহুদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ, তারা প্রত্যেকবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াহুম লা ইয়াত্তাকুন (এবং তারা সাবধান হয় না) এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! ইহুদীরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের চেয়েও অধিক চেনে আপনাকে। তারা ভালো করেই জানে যে, আপনি আমার রসুল। অথচ তারা সাবধান হয় না। জেনে শুনে বুঝে অস্বীকার করে আপনাকে। বার বার ভঙ্গ করে অঙ্গীকার।

আবদ্ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল, হজরত বশীর বিন বারায়া এবং হজরত দাউদ বিন সালমা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় করো, মুসলমান হয়ে যাও। আমরা যখন মুশরিক ছিলাম তখন মোহাম্মদ স. এর নাম নিয়ে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলে। এ কথাও বলেছিলে যে, মোহাম্মদ স. এর আবির্ভাবের সময় সমাগত। তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণও তোমরা আমাদেরকে দিয়েছিলে।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী ও অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট নিকৃষ্ট জীব। আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হচ্ছে ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা চুক্তি ভঙ্গ করে। উল্লেখ্য যে, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরে অনড়, তারাও চুক্তিভঙ্গকারী। কারণ তারাও রূহের জগতে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছে।

এর পরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'যুদ্ধে তাদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে যারা আছে তাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে তারা শিক্ষালাভ করে।' এখানে উল্লেখিত 'ফাশাররিদ্ বিহিম' অর্থ বিধ্বস্ত করবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির মাধ্যমে এখানে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদীদেরকে দিতে হবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। শাস্তিদানের পূর্বে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে মক্কায় ও ইয়েমেনে বসবাসকারী তাদের মিত্রদের থেকে। এমনভাবে তাদেরকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে হবে, যাতে করে তাদের সমগোত্রীয়রা ভীত হয়। হারিয়ে ফেলে মোকাবিলার সাহস। এই নির্দেশটি মান্য করেই রসুল স. ষড়যন্ত্রপ্রবণ ও চুক্তি ভঙ্গকারী বনী কুরায়জার সকল পুরুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের সম্পদ, রমণীকুল ও শিশুদেরকে ভাগ করে দিয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসলাম আনসারী বলেছেন, আমাকে দূর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ বনী কুরায়জাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন রসুল স.। আমি সে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তাদের পুরুষদেরকে যেখানে পেয়েছি সেখানেই তাদেরকে হত্যা করেছি।

শেষ কথাটি হচ্ছে— লায়াল্লাহুম ইয়াজ্ জাককারূন (যাতে তারা শিক্ষালাভ করে)। এ কথার অর্থ— এ রকম ভয়াবহ শাস্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ কারণে যেনো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এতে করে সাবধান হয়ে যায়। চুক্তিভঙ্গের সাহস যেনো কখনো আর না পায়।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝

❒ যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করিবে; আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদিগকে পছন্দ করেন না।

আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটি এ রকম— হে আমার রসুল! আপনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়কে যদি আপনি বিশ্বাসভঙ্গ করবে বলে আশংকা করেন, তবে আপনি যথাযথভাবে ওই চুক্তি বাতিল করে দিন। চুক্তি বাতিল করা হলো— এ রকম সংবাদ আপনি পূর্বাহ্নে তাদেরকে পৌঁছে দিন। এতে করে বিশ্বাসভঙ্গের দায় আপনার উপরে বর্তাবে না। এ কথাও আপনি জেনে রাখুন হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

জুহ্‌রী সূত্রে আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই হজরত জিব্‌রাইল রসুল স.কে বললেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা! আপনি তো যুদ্ধের সাজ পোশাক খুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা এখনো সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের পশ্চাদ্ধাবনে রত। আপনিও প্রস্তুত হোন। যুদ্ধ করতে হবে বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে। আল্লাহ্‌পাক আপনাকে বনী কুরায়জা নিধনের অনুমতি প্রদান করেছেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণটি সৃষ্টি হয়েছিলো খন্দকের যুদ্ধের পর। হাফেজ মোহাম্মদ ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, বনী কায়নুকা ও মুসলমানেরা ছিলো পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। পরবর্তীতে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। প্রজ্জ্বলিত করেছিলো হিংসার আগুন। একদিন তাদের বাজারে ঘটলো একটি ঘটনা। আপাদমস্তক আবৃতা এক আরবী রমণী অলংকার ক্রয়ের জন্য তাদের বাজারের এক স্বর্ণকারের দোকানে গেলো। কেউ কেউ উন্মোচিত করতে বললো তার মুখমণ্ডলের আবরণ। কিন্তু সে এতে অস্বীকৃত হলো। তখন স্বর্ণকার কেটে নিলো তার আঁচলের কিছু অংশ। উত্তেজিত হলো সে। শুরু করে দিলো চিৎকার। অনেক লোক জড়ো হলো সেখানে। উত্তেজিত রমণীটিকে লক্ষ্য করে তারা শুরু করে দিলো হাসিঠাট্টা। জনৈক সাহাবীও উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বুঝলেন স্বর্ণকারটিই উত্যক্তকারী। তাই

প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। স্বর্ণকারটি ছিলো ইহুদী। তাই উপস্থিত ইহুদীরা এক জোট হয়ে হত্যা করে ফেললো ওই সাহাবীকে। এভাবে ভঙ্গ হয়ে গেলো মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত অনাক্রমণ চুক্তিটি। মুসলমানেরা হলেন বিচারপ্রার্থী। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

রসুল স. তখন বললেন, বনী কায়নুকা চুক্তিভঙ্গের কারণে বিপদ কবলিত। এ কথা বলেই তিনি বনী কায়নুকার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবকে। মদীনা রক্ষার দায়িত্ব দান করলেন হজরত আবু লুবাবা বিন আবদুল মুনজিরকে। বনী কায়নুকার লোকেরা দূর্গে আশ্রয় নিলো। দূর্গ অবরোধ করে রইলো মুসলিম বাহিনী। পনের দিন কেটে গেলো এভাবে। আল্লাহ্পাক অবরুদ্ধ ইহুদীদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন। তাই তারা রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালো যে— আমাদের সকল সম্পদ পরিত্যাগ করতে আমরা রাজি। এখন শুধু রমণী ও শিশুদেরকে নিয়ে আমরা দেশান্তরে গমন করতে চাই। রসুল স. তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনদিন পর তারা তাদের সকল সম্পদ ফেলে রেখে পরিবার পরিজনসহ মদীনা থেকে বের হয়ে গেলো। রসুল স. তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাখলেন নিজের জন্য। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ ভাগ করে দিলেন তাঁর অনুচরবর্গকে। বদর যুদ্ধের পর গণিমত লাভ ও বণ্টনের এই ঘটনাটিই ছিলো প্রথম ঘটনা।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' বাগবী লিখেছেন, হজরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রোম সাম্রাজ্যের ছিলো অনাক্রমণ চুক্তি। হজরত মুয়াবিয়া ঠিক করলেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন। বীর বিক্রমে ঢুকে পড়বেন তাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে। এমন সময় তিনি দেখেন, এক অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে আসছে এবং বলছে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বিশ্বাসভঙ্গ কোরো না। নিকটবর্তী হতেই চেনা গেলো অশ্বারোহী ব্যক্তিটি হচ্ছেন হজরত আমর ইবনে আমবাসা। হজরত মুয়াবিয়া তাঁকে কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কী বলতে চান আপনি? তিনি বললেন, আমি রসুল স. কে ঘোষণা করতে শুনেছি, চুক্তিভঙ্গ কোরো না— যতক্ষণ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হয়। অথবা প্রতিপক্ষের দ্বারা চুক্তিভঙ্গের কোনো কারণ সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষ যদি চুক্তিভঙ্গ করে, তবেই কেবল চুক্তি বিরোধী কোনো কিছু করা যেতে পারে। হজরত মুয়াবিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে ফিরে এলেন স্বসাম্রাজ্যের সীমানায়।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ○ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

❐ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিগণ যেন কখনও মনে না করে যে তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে; তাহারা সত্যানুসারিগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

❐ তোমরা তাহাদিগের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিবে এতদ্দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহের শত্রুকে, তোমাদিগের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদিগকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন; আল্লাহের পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

বদর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি। বলেছেন বাগবী। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আপাততঃ পালাতে সমর্থ হলেও তারা যেনো এ কথা মনে না করে যে, চিরদিনের জন্য তারা পরিত্রাণ লাভ করেছে। এ কথাও যেনো মনে না করে যে পুনঃ শক্তি সঞ্চয় করে তারা আর কখনো বিশ্বাসীদেরকে পরাস্ত করতে পারবে।

পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে। এগুলোর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ জানেন'। এখানে 'যথাসাধ্য শক্তি' অর্থ— সমর শক্তি। আর 'অশ্ব' অর্থ— যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া। সমর শক্তি সঞ্চয়ের মধ্যে রয়েছে তরবারী চালনা শিক্ষা, তীর চালনা শিক্ষা ইত্যাদি। যুদ্ধের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করাও সমর শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

হজরত উকবা বিন আমের বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাষণ দিতে শুনেছি— সাবধান! সাবধান! জেনে রাখো তীর চালনা শিক্ষা সমর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ যোদ্ধারাও তীরন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় সম্মুখে অগ্রসর হয়। মুসলিম।

হজরত আবু নাজিহ্ সালামী বর্ণনা করেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহ্পাকের রাস্তায় একটি তীর সরবরাহ করবে, সে জান্নাতের মধ্যে লাভ করবে একটি মর্যাদা। যে তীর নিক্ষেপ করবে সে ক্ষতিপূরণ করবে তার পাপের এবং লাভ করবে দোজখ থেকে মুক্তি। নাসাঈ। হজরত উকবা বিন আমেরের বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স. বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমরা লাভ করবে রোম সাম্রাজ্যের অধিকার। তখন আল্লাহ্ই হবেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অতএব তোমরা তীর চালনা বিদ্যা থেকে বিরত হয়ো না। মুসলিম, আবু দাউদ। তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উদ্ধৃত অতিরিক্ত কথাটি হচ্ছে— আল্লাহ্র রাস্তায় যার চুল শাদা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার ওই শাদা চুল হবে নূর। এ সম্পর্কে বর্ণিত তিনটি হাদিসই বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর শো'বুল ইমান গ্রন্থে। তবে সেগুলোতে 'আল্লাহ্র রাস্তায়' এর বদলে লিপিবদ্ধ রয়েছে— 'ইসলামের রাস্তায়'।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উকবা বিন আমের বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা তীরন্দাজী বিদ্যা ছেড়ে দেয়, তারা আমার দলভুক্ত নয়। এ রকমও শুনেছি যে, তারা নাফরমানী করে।

হজরত আবু উসাইয়েদ বলেছেন, বদরের দিন যখন আমরা মুশরিকদের মুখোমুখি হলাম, তখন রসুল স. নির্দেশ করলেন, মুশরিকেরা অগ্রসর হলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা তোমাদের জন্য হবে অত্যাবশ্যক। বোখারী। হজরত উকবা বিন আমের উল্লেখ করেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। ওই তিন ব্যক্তি হচ্ছে— তীর নির্মাতা, তীর সরবরাহকারী এবং তীর নিক্ষেপকারী। সুতরাং তোমরা হতে চেষ্টা করো তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী যোদ্ধা। তিরমিজি, ইবনে মাজা। আবু দাউদ ও দারেমীর মাধ্যমেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এ কথাগুলো— যারা তীর চালনা বিদ্যা শিক্ষা করার পর তা পরিত্যাগ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র একটি নেয়ামতকে। অথবা তিনি স. এ রকম বলেছেন— সে হয় আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, একটি তীরের কারণে জান্নাত লাভ করবে তিনজন— তীরের নির্মাতা, সরবরাহকারী ও নিক্ষেপকারী।

যুদ্ধের জন্য অশ্ব প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এখানে অশ্ব প্রস্তুত রাখার অর্থ— অশ্ব প্রতিপালন করা। এ সম্পর্কে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে 'রিবাতি' শব্দটি। বায়যাবী লিখেছেন, জেহাদের জন্য নির্ধারিত ঘোড়াকে বলা হয় রিবাত। শব্দটি একটি মূল শব্দ। কিন্তু এখানে এটি

ব্যবহৃত হয়েছে কর্মকারকরূপে। রিবাত শব্দটিকে রাবাতা, রাবৃতান এবং রিবাতারূপেও উল্লেখ করা যায়। রাবাতান এবং রিবাতান— দু'ভাবেই শব্দটি লেখা যেতে পারে। শব্দটি কর্মকারকরূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। রিবাতা শব্দটি রাবিতা শব্দের বহুবচন— যেমন, ফাসিল শব্দের বহুবচন ফিসাল। এখানে মির্‌রিবাত (অশ্ব) এর সম্পর্ক রয়েছে মিনক্কুওয়াত্‌ (যথাসাধ্য শক্তি) এর সঙ্গে। অর্থাৎ বিশেষত্ব প্রকাশার্থে এখানে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থাকে একত্র করা হয়েছে— যেমন, অন্য এক আয়াতে হজরত জিব্‌রাইল ও হজরত মিকাইলকে একত্র করা হয়েছে 'আল মালায়েকা' শব্দের মাধ্যমে। এভাবে সমর শক্তির অন্তর্ভূক্ত হলেও আলাদাভাবে উল্লেখ করে যুদ্ধাশ্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ঘোড়ার পেশানির চুলের মধ্যে রয়েছে বরকত। বোখারী ও মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে।

হজরত জারীর বিন আবদুল্লাহ্‌ বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসুল স. একবার ঘোড়ার পেশানির চুল হাতের মুঠোয় নিয়ে বললেন, এর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে কল্যাণ, সওয়াব এবং মালে গণিমত। মুসলিম। হজরত ওরওয়া বারকী থেকে বোখারীর পদ্ধতিতে বাগবীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ঘোড়া কখনো হবে পাপের বোঝা, কখনো হবে পরিত্রাণের উপকরণ এবং কখনো হবে দোজখের আড়াল। যারা ঘোড়া প্রতিপালন করবে অহমিকা ও আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য তাদের ঘোড়া হবে পাপের বোঝা। নাজাতের অসিলা হবে তাদের ঘোড়া যারা তাদের ঘোড়াকে ব্যবহার করবে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে। আর ওই সকল লোকের ঘোড়া হবে তাদের ও দোজখের আড়াল, যারা জেহাদের জন্য ধর্মযোদ্ধাদেরকে তাদের প্রতিপালিত ঘোড়া প্রদান করবে। জেহাদের ঘোড়া চারণভূমিতে যা ভক্ষণ করবে তার জন্যও পুণ্যলাভ করবে তাদের প্রতিপালন-কারী। জেহাদের ঘোড়ার মলমূত্র পরিস্কারের কারণেও তার মালিক পাবে নেকী। রশি ছিঁড়ে ফেলে জেহাদের ঘোড়া কৌতুকভরে দৌড়াদৌড়ি করলে তাদের খুরের চিহ্ন ও মলমূত্রের কারণেও তাদের মালিকেরা লাভ করবে পুণ্য। ওই সকল ঘোড়াকে যদি কোনো জলাশয়ে পানি পান করানো হয়, তবে পানকৃত পানির বিনিময়েও পুণ্য লাভ করবে তার মালিকেরা। মুসলিম।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ওই সকল ঘোড়া হবে তার মালিকের নাজাতের উপকরণ, যেগুলোর মালিক পার্থিব লাভালাভের আকাঙ্খা করে না, যারা স্মরণে রাখে যে, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আল্লাহ্‌র হক। হজরত আবু ওয়াহাব হাশেমীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, অশ্ব প্রতিপালন করো। অশ্বের ললাট-দেশ, পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধদেশে হাত বুলিয়ে দাও। আবু দাউদ, নাসাঈ।

এখানে 'আল্লাহ্‌র শত্রু' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। 'তোমাদের শত্রু' বলে বুঝানো হয়েছে অন্যান্য বিধর্মীদেরকে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল বলেছেন, বনী কুরায়জাকে এখানে বলা হয়েছে 'তোমাদের শত্রু'। সুদ্দী বলেছেন, তোমাদের শত্রু বলে এখানে বুঝানো হয়েছে পারস্যবাসী অগ্নি উপাসকদেরকে। ইবনে জায়েদ হাসান বলেছেন, মুনাফিকদেরকে।

'এতদ্ব্যতীত অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্‌ জানেন'— এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে, মুনাফিকদেরকে। মুনাফিকেরা প্রকাশ্যতঃ মুসলমান। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা অন্তর্যামী। তাই তিনি জানেন যে, প্রকাশ্যতঃ মুসলমান হলেও অন্তরে অন্তরে তারা কাফের। কেউ কেউ বলেছেন, 'যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্‌ জানেন' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে কাফের জ্বিনদেরকে। আবুল মাহাদির সূত্র পরম্পরায় মারফুরূপে আবু শায়েখ এ রকম বর্ণনা করেছেন। ইয়াজিদ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন গরিব সূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এ রকমই বলেছেন।

এর পর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীগণ! জেহাদের জন্য তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পরিপূর্ণ সওয়াব দেয়া হবে তোমাদেরকে। তোমাদের যে সওয়াব প্রাপ্য, তা থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

হজরত জায়েদ বিন খালেদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মুজাহিদকে জেহাদের সামগ্রী প্রদান করলো সে যেনো নিজেই জেহাদ করলো। যে মুজাহিদের পরিবার পরিজনের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করলো, সেও যেনো জেহাদ করলো। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু মাসউদ আনসারীর বর্ণনায় এসেছে এক লোক একটি উষ্ট্রীর নাসারন্ধ্রে দড়ি পরিয়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, এই উট আমি দান করলাম জেহাদের জন্য। রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিন এর পরিবর্তে তোমাকে সাতশত উট দান করার সওয়াব দেয়া হবে। মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন তোমরা জীবন, সম্পদ ও পরিবার পরিজনসহ অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আবু দাউদ, নাসাঈ, দারেমী।

হজরত মুজাইম বিন ফাতাক্‌ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে তাদেরকে দেয়া হবে সাতশত গুণ প্রতিদান। তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুজাহিদগণের যেমন প্রতিদান রয়েছে, তেমনি প্রতিদান রয়েছে সমরাস্ত্র নির্মাণকারীদের জন্য। আবু দাউদ। হজরত আলী, হজরত আবু দারদা, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু উমামা, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ এবং হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জেহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করে ঘরে বসে থাকে, সে প্রতি দিরহামের বদলে পায় সাত শত দিরহাম প্রদানের সওয়াব। আর যে অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে নিজেও জেহাদ করে সে পায় এক দিরহামের পরিবর্তে সাত হাজার দিরহামের সওয়াব। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন — 'ওয়াল্লাহু ইউদ্বয়িফু লিমা ইয়াশায়ু' (আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ দান করেন)।

হজরত আবদুর রহমান বিন হাব্বাব বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রস্তুত করছিলেন এবং লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করছিলেন। হজরত ওসমান দণ্ডায়মান হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হাওদাসহ আমি দান করবো এক শত উট। রসুল স. পুনরায় উৎসাহ প্রদান করলেন। হজরত ওসমান পুনরায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমি অঙ্গীকার করলাম হাওদাসহ দুইশত উট প্রদানের। রসুল স. আবারও দানের প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন হজরত ওসমান। বললেন, আমি আল্লাহ্পাকের রাস্তায় দান করবো হাওদাসহ তিনশত উট। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখলাম রসুল স. মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং বললেন, ওসমান যা খুশী করুক না কেনো, তার কোনো হিসাব নিকাশ নেই। তার কোনো হিসাব নিকাশ নেই। তিরমিজি।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় জামার আস্তিনে করে এক হাজার দিনার নিয়ে হাজির হলেন হজরত ওসমান। রসুল স. সেগুলো গ্রহণ করে রেখে দিলেন তাঁর কোলের মধ্যে। আমি দেখলাম, তিনি মুদ্রাগুলো ওলট-পালট করছেন এবং বলছেন, এরপর ওসমান যে আমলই করুক না কেনো, তাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করবে না (হিসাব নিকাশ হবে না)। তিনি স. এ কথা উচ্চারণ করলেন দু'বার। আহমদ।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬১, ৬২

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

❒ তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে ও আল্লাহের প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, — তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসিগণ দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন।

সলম বা সোলেহ্ অর্থ সন্ধি। এর বিপরীত হচ্ছে হরব বা যুদ্ধ। আরবী ভাষায় এমতোক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই এখানে সলম শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দরূপে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে, যদি অবিশ্বাসীরা বিনম্র হয় এবং শান্তিচুক্তি করতে চায়, তবে তোমরাও শান্তির দিকে অগ্রসর হও। সন্ধিবদ্ধ হও তাদের সঙ্গে। হাসান ও কাতাদার অভিমত হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতটি (৬১) রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে যেখানে বলা হয়েছে— 'উক্বতুলুল মুশরিকীনা হাইসু ওজাত্ তুমূহুম (মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো)। বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি আহলে কিতাবদের (ইহুদীদের) জন্য নির্দিষ্ট। কেননা, তাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

আমি বলি, আয়াতটি রহিত যেমন হয়নি, তেমনি আহলে কিতাবদের সঙ্গেও এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এখানকার নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। প্রয়োজনবোধে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন যে বৈধ, সে কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনবশতঃ শান্তিচুক্তি করতে পারেন। আর 'উক্বতুলুল মুশরিকীনা'— আয়াতের নির্দেশনাটি প্রযোজ্য হবে বিশেষ পরিস্থিতির উপর। জিযিয়া প্রদানে সম্মত শান্তিকামী কাফের (জিম্মি) ওই হুকুমের বাইরে। তাই এখানে সাধারণভাবে বলে দেয়া হয়েছে— তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সন্ধিবদ্ধতার আড়ালে যদি অবিশ্বাসীরা ষড়যন্ত্রপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে সেই ষড়যন্ত্রের পরওয়া আপনি করবেন না। নির্ভর করবেন কেবল আল্লাহ্র উপর। আল্লাহ্তায়ালাই তাদের প্রতারণা থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই তাঁর শ্রুতি ও জ্ঞানকে অতিক্রম করার সাধ্য কারো নেই। অতএব আপনার হেফাজতের জন্য আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সন্ধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে যদি কাফেরেরা যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবে তাদের ওই প্রতারণা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর বিশেষ সাহায্যের দ্বারা এবং আপনার একনিষ্ঠ অনুচর বিশ্বাসীগণের দ্বারা।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

❐ এবং তিনি উহাদিগের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি তাহাদিগের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❐ হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ছিলো সীমাহীন হিংসা ও শত্রুতা। রসুল স. এর মদীনায় আগমনের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্প্রীতি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি পৃথিবীর সকল সম্পদ ব্যয় করলেও আউস ও খাজরাজদের অন্তহীন হিংসা ও শত্রুতার অনল নির্বাপিত করতে পারতেন না।

এরপর বলা হয়েছে— 'কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— সকল কিছুই আল্লাহ্তায়ালার পরাক্রম ও প্রজ্ঞাময়তার অধীন। মানুষের হৃদয় সমূহও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন কেবল তিনি। এক্ষেত্রেও তাই করেছেন। অন্যের পক্ষে অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর অপার করুণায় ও ক্ষমতায় মমতা ও সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের বিশ্বাসীগণের মধ্যে।

পরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসীগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন— এখানে হাস্বুকা (যথেষ্ট) শব্দটি সম্পর্কিত হবে 'মানিত্তাবায়াকা মিনাল মু'মিনীন' (অনুসারী বিশ্বাসীগণ) এর সঙ্গে। এভাবেই অর্থ দাঁড়াবে— হে

আমার নবী! আপনার জন্য আল্লাহ্ এবং আপনার অনুসারী বিশ্বাসীগণই যথেষ্ট। আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যথেষ্ট' শব্দটি সম্পর্কিত হবে কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে। তখন অর্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রিয় নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (বঙ্গানুবাদে এ রকমই উদ্ধৃত হয়েছে)।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে যথাসূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা তখন ছিলো উনচল্লিশ জন। তেত্রিশজন পুরুষ এবং ছয়জন রমণী। এরপর হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো চল্লিশে। আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে— হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেন এই আয়াত।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে তিবরানী ও অন্যান্যরা লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নারী-পুরুষ মিলে উনচল্লিশজন ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমান হন হজরত ওমর। মুসলমানদের সংখ্যা তখন হয় চল্লিশজন। ওই সময় আল্লাহ্পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হজরত ইকরামা থেকে শিথিল সূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ওমরের মুসলমান হওয়ার কথা শুনে মুশরিকেরা বলেছিলো আজ আমাদের সম্প্রদায়ের শক্তি হয়ে গেলো অর্ধেক। আল্লাহ্পাক তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে এ কথাটিও বলা যেতে পারে যে, মক্কায় নয়— মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। কারণ আলোচ্য সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে বদর যুদ্ধের পর মদীনায়।

সুরা আন্ফাল ঃ আয়াত ৬৫

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۝

❐ হে নবী! বিশ্বাসীদিগকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদিগের মধ্যে একশতজন থাকিলে এক সহস্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই।

'ইয়া আয়্যুহান্নাবীয়্যু হার্রিদ্বিল মু'মিনীন' অর্থ— হে নবী! বিশ্বাসীদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। 'হার্রিদ্বি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— পীড়ার কারণে শ্বেতাভ ওষ্ঠ বিশিষ্ট মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে নিরাময় দান পূর্বক বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম করে তোলা। অর্থাৎ এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাতে অনুৎসাহের কোনো কারণ আর অবশিষ্ট না থাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ' জনের উপর বিজয়ী হবে। তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে এক সহস্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উপর বিজয়ী হবে।' এ কথার মাধ্যমে মুসলমানদের দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দেয়া হয়েছে বিজয়ের সুসংবাদ।

শেষে বলে দেয়া হয়েছে— 'কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না। তাই তারা মৃত্যুভয়ে ভীত। আর বিশ্বাসী নয় বলে পুণ্যলাভের বাসনাও তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং তারা বোধশক্তি বিবর্জিত। অতএব তারা অবশ্যই হবে পরাজিত এবং তোমরা হবে বিজয়ী।

আলোচ্য আয়াতটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। একই সঙ্গে এখানে ধ্বনিত হয়েছে আল্লাহ্‌র আদেশ। এই আদেশ কার্যকর ছিলো বদর যুদ্ধের সময়। ওই যুদ্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিশ্বাসীগণের উপর ফরজ করে দিয়েছিলেন। স্বসূত্রে ইসহাক বিন রহ্‌ওয়াইহ্ উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানের উপর দশজন কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অত্যাবশ্যক করে দিলেন, তখন নির্দেশটি হয়ে পড়লো তাদের উপর অত্যন্ত গুরু। পরে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের ওই গুরুভার লাঘব করে দিয়েছেন। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৬

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

❒ আল্লাহ্ এখন তোমাদিগের ভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদিগের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদিগের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদিগের

মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহের অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগের সহিত রহিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশটি ছিলো তোমাদের উপর অত্যন্ত ভারী। তাই আমি তোমাদের ওই ভারকে হাল্কা করে দিলাম। কারণ আমি জানি তোমাদের কারো কারো মধ্যে রয়েছে দুর্বলতা। এ কারণে আমি এই মর্মে সহজ নির্দেশ দান করলাম যে— তোমরা ধৈর্যশীলতার সঙ্গে তোমাদের দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করলেও বিজয়ী হবে। আল্লাহ্তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। সুতরাং এ কথাটিও জেনে রেখো যে, সমর শক্তি এবং সৈন্যসংখ্যার বিষয়টি এখানে প্রধান বিষয় নয়, প্রধান বিষয় হচ্ছে ধৈর্যশীলতা। ধৈর্যশীলেরাই আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বিজয়ী— শত্রুদের শক্তি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ অথবা যতগুণই হোক না কেনো।

সুফিয়ানের বর্ণনায় এসেছে— শুবরামা বলেছেন, এখানকার নির্দেশনাটি 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' (সৎকাজের নির্দেশদান এবং অসৎকাজকে প্রতিহতকরণ) সম্পর্কিত। কেউ কেউ বলেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা যখন অল্প ছিলো, তখন তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো অধিক সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ। যখন তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলো, তখন নির্দেশটি করা হলো লঘু । এ কারণেই প্রথম দিকে দশগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশটি পরিবর্তন করে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে সাধারণ নির্দেশনাটি এই যে, স্বল্প অধিক যে রকমই হোক না কেনো, সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে ধৈর্যশীলতার সঙ্গে। তবেই লাভ হবে কাঙ্খিত বিজয়। তাই শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।'

হজরত আনাস থেকে আহমদ, হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শায়বা, আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মুনজির, তিবরানী, হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া ও আবু শায়েখ এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রসুল স. এর পিতৃব্য হজরত আব্বাসও ছিলেন। এক আনসার সাহাবী তাঁকে বন্দী করেছিলেন। আনসার সাহাবীগণ চাইলেন, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। এ কথা রসুল স. এর কানে পৌঁছুলে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সারারাত ঘুম হলো না তাঁর। সকালে বললেন, আমার প্রিয় পিতৃব্যের পরিণতির কথা ভেবে সারারাত আমি অস্থির অবস্থায় কাটিয়েছি। ওদিকে আনসার সাহাবীগণ মনে করলেন,

এতক্ষণে নিশ্চয় হজরত আব্বাসের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি কি আনসারদের নিকট গমন করবো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হজরত ওমর আনসার সাহাবীগণের নিকটে গিয়ে বললেন, তোমরা আব্বাসকে ছেড়ে দাও। তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে ছাড়বো না। হজরত ওমর বললেন, রসুল স. এ রকমই পছন্দ করেন। তাঁরা বললেন, রসুল স. এর পছন্দই আমাদের পছন্দ। এরপর হজরত ওমর হজরত আব্বাসকে একান্তে বললেন, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আমার পিতার ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। কারণ এটা রসুল স. এর পছন্দ।

হজরত আনাস বিন মালেক থেকে বোখারী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— কতিপয় আনসারী সাহাবী রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি দয়া করে সম্মতি প্রদান করলে আমরা আপনার সম্মানিত চাচার মুক্তিপণ রহিত করে দিতে চাই। তিনি স. বললেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! একটি দিরহামও ছাড়া হবে না। এরপর বললেন, এই বন্দীদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। এরা তোমাদের ভ্রাতাতুল্য। তবে বলো, তোমাদের এই ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই বন্দীরা তো আপনারই স্বজন। তাই আমার অভিমত হচ্ছে হত্যা না করে এদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হোক। মুক্তিপণের ওই অর্থের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমর শক্তিকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে পারবো। এ রকমও হতে পারে যে, অবশেষে আপনার মাধ্যমে এদেরকে আল্লাহ্‌পাক হেদায়েত দান করবেন। তখন এরাই আপনার হস্তকে শক্তিশালী করবে। রসুল স. বললেন, ইবনে খাত্তাব! তুমি কী বলো? হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে আপনাকে। আবার যুদ্ধও করেছে। তাই আমি বলি আমাদের বন্দী স্বজনদেরকে আমাদেরই অধীনে অর্পণ করুন। আমরা নিজ নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে হত্যা করি— যাতে করে আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে আমরা এ কথা প্রমাণ করতে পারি যে, আমাদের হৃদয়ে অংশীবাদীদের প্রতি ভালোবাসা একেবারেই নেই।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি নির্দেশ প্রদান করলে আমরা সামনের উপত্যকায় অনেক লাকড়ি একত্র করে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারি এবং বন্দীদেরকে নিক্ষেপ করতে পারি ওই আগুনে। বন্দী হজরত আব্বাস এ কথা শুনে বললেন, তোমরা তো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছো। এরপর রসুল স. প্রবেশ করলেন তাঁর গৃহে। বাইরে সমাগত সাহাবী-

গণের কেউ কেউ বললেন, রসুল স. আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কেউ কেউ বললেন, তিনি গ্রহণ করবেন হজরত ওমরের মতামত। কেউ কেউ ধারণা করলেন, রসুল স. শেষ পর্যন্ত হয়তো হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহার অভিমতকেই গ্রহণ করবেন। কিছুক্ষণ পর রসুল স. বাইরে এলেন এবং বললেন, কোনো কোনো লোকের হৃদয়কে আল্লাহতায়ালা দুধের চেয়ে অধিক নরম করে দিয়েছেন। কারো কারো অন্তরকে করে দিয়েছেন পাথরের চেয়েও কঠিন। আবু বকরের দৃষ্টান্ত মিকাইল ফেরেশতার মতো— যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর নবী-গণের মধ্যে হজরত ইব্রাহিমের মতো যিনি বলেছিলেন— যারা আমার অনুসরণ করে তারা তো আমারই দলভুক্ত। আর যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে— অতঃপর নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাপরবশ। ওমরের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জিব্রাইল ফেরেশতার মতো— যিনি আল্লাহ্র দুশমনদের প্রতি অবতীর্ণ করেন কঠিন মুসিবত ও আযাব। নবীগণের মধ্যে নুহ্ এবং মুসার সঙ্গেও রয়েছে ওমরের সাদৃশ্য। নুহ্ বলেছিলেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! পৃথিবীতে কোনো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীকে অবশিষ্ট রেখো না। রসুল মুসা বলেছিলেন— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তাদের সম্পদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরসমূহকে এমতো কঠিন করে দাও যেনো তারা ইমান গ্রহণ করতে না পারে— যে পর্যন্ত না প্রত্যক্ষ করে ভয়াবহ আযাব। এরপর তিনি স. বললেন, আমি আবু বকর ও ওমরের সম্মিলিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করবো না। কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে একমত নও। সুতরাং সিদ্ধান্ত দান করা হচ্ছে যে— বন্দীদের মধ্যে যে রক্তপণ প্রদান করবে, তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আর যে রক্তপণ প্রদান করবে না তাকে দেয়া হবে মৃত্যুদণ্ড।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সহল বিন বায়জাকে ক্ষমা করে দিন। আমি সাক্ষী— তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রসুল স. নির্বাক হয়ে গেলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, মৌন রসুল স.কে দেখে আমি ভীত হলাম। ভাবলাম আমি একজন কাফের বন্দীর জন্য সুপারিশ করেছি। আসমান থেকে পাথর বর্ষণ হওয়ার চিন্তা ওই সময়ের চেয়ে বেশী আমি আর কখনোই করিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর মৌনতা ভঙ্গ হলো রসুল স. এর। তিনি বললেন, সহল বিন বায়জাকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

পরদিন সকালে হজরত ওমর রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি স. ও হজরত আবু বকর কাঁদছেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে বলুন, কী কারণে রোদন করছেন আপনারা? আমিও আপনাদের সঙ্গে রোদন করতে চাই। রসুল স. বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার

অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে আমাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছিলো প্রায়। নিকটের একটি বৃক্ষের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, আযাব এসে পড়েছিলো ওই বৃক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা দয়া করে তা দূর করে দিয়েছেন। ওই আযাব আপতিত হলে ইবনে খাত্তাব ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারতো না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৭

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

❒ দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে; তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ্ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'মা কানা লিনাবিয়্যিন আঁয়্যাকুনা লাহু আস্‌রা হাত্তা ইউছ্‌খিনা ফিল আরদ্ব' অর্থ— দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আবুল ফজল আয়ায তাঁর আশ্‌শিফা গ্রন্থে লিখেছেন 'দেশে সম্পূর্ণরূপে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সংগত নয়' কথাটির মাধ্যমে রসুল স. এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। বরং এ কথাটির মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে রসুল স. এর অনন্য সাধারণ মর্যাদা। যেমন অন্যান্য নবীগণের জন্য গণিমতের মাল গ্রহণ করা হালাল ছিলো না। কিন্তু রসুল স. এর জন্য তা হালাল করা হয়েছে। তাই তিনি স. বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ-সম্পদ অন্য নবীদের জন্য হালাল ছিলো না। কিন্তু আমার জন্য হালাল।

কাযী আয়ায আরো লিখেছেন, 'তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ' এ কথাটিও রসুল স. কিংবা তাঁর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে ওই সকল লোককে লক্ষ্য করে, যারা পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালসাপরায়ণ। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, বদর যুদ্ধের দিন যখন অংশীবাদী সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছিলো, তখন বিজয় নিশ্চিত জেনে কেউ কেউ তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলো। হজরত ওমর তখন আশংকা করেছিলেন, এ রকম করলে অংশীবাদীরা হয় তো পুনরাক্রমণের উদ্যোগ নিতে পারে।

'ইউছ্‌খিনা' অর্থ নিপাত করা, নিশ্চিহ্ন করা, পরাভূত করা, হত্যা করা অথবা পরাস্ত করা। এখানে মূল কর্ম বা হত্যা করার কথাটি রয়েছে অনুক্ত। এভাবে আয়াতে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে— শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত না করা

পর্যন্ত বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। হত্যা করতে হবে তাদেরকে। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। যেমন— 'আছখানা ফলানা' অর্থ অমুক ব্যক্তিকে নিপাত করা হয়েছে, 'আছখানা ফিল আদুবি' অর্থ শত্রুকে যথেষ্ট পরিমাণে আঘাত করা হয়েছে ইত্যাদি।

এরপর বলা হয়েছে 'তুরিদুনা আরদ্বাদ্ দুন্ইয়া' (তোমরা কামনা করো পার্থিব সম্পদ)। এ কথার অর্থ— হে মুসলমানেরা! তোমরা চাও ধ্বংসশীল পার্থিব বৈভব।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াল্লহু ইউরিদুল আখিরা' ওয়াল্লহু আযিযুন্ হাকীম' (এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি চান তাঁর অপার পরাক্রমের অধীনে এবং অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অনুসরণে তোমরা পরকালাভিমুখী হও। অংশীবাদীদেরকে হত্যা করে সাহায্যকারী হও সত্যধর্মের। অর্জন করো পুণ্য এবং আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের সময়। তখন মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিলো অল্প। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলো তখন অবতীর্ণ হলো— 'ফাইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইন্না ফিদাআন্' (এরপর হয় অনুগ্রহ করবে নয়তোবা রক্তপণ নেবে)। এই আয়াতের মাধ্যমে রসুল স. কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেয়া হলো। যুদ্ধবন্দীকে হত্যা, অথবা তাদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া— যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তখন থেকে রসুল স. কে এবং মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে।

মাসআলাঃ আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, মুসলমানদের শাসক বা অধিনায়ককে এই আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করার অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই রসুল স. বনী কুরায়জার পুরুষদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বন্দী করার পর হত্যা করিয়েছিলেন নজর বিন হারেস, তাইমিয়া বিন আদী এবং উকবা বিন আবী মুঈতকে। সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, উকবা বিন আবী মুঈত তখন বলেছিলো, মোহাম্মদ শিশুদেরকে দেখবে কে? রসুল স. বলেছিলেন, আগুন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, উকবাকে হত্যা করেছিলেন হজরত ইবনে আবীল আফলা। ইবনে হিশাম বলেছেন, হজরত আবী ইবনে আবী তালেব।

মাসআলাঃ বন্দীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করা সিদ্ধ। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। এর মাধ্যমে অংশীবাদীতা নিপাত করা হয় এবং সম্মানিত করা হয় ইসলামকে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, শাসক বা অধিনায়ক ছাড়া বন্দীকে হত্যা করার অধিকার অন্য কারো নেই। প্রয়োজনবোধে কেবল শাসকই যুদ্ধবন্দীকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন। তবে কেউ যদি অতর্কিতে কোনো যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করে ফেলে তবে এর জন্য তাকে রক্তপণ দিতে হবে না।

মাসআলাঃ মুক্তিপণ গ্রহণ করে অথবা না করে বন্দীকে মুক্ত করে তাদের (কাফেরদের) রাজ্যে যেতে দেয়া, বন্দী-বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া, জিম্মি (কর প্রদানে সম্মত) হিসাবে মুসলিম রাজ্যে বসবাসের অধিকার দেয়া— এ সকল কিছুই 'ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন' — এই নির্দেশনাটির অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে অবশ্য আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্, হাসান বসরী ও আতা বলেছেন, ফিদিয়া নিয়ে অথবা না নিয়ে ছেড়ে দেয়া এবং বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তিদান জায়েয। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম আওজায়ী, কাতাদা এবং জুহাক বলেছেন, মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্তি দেয়া নাজায়েয। ইমাম আবু হানিফা এবং সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের) মত হচ্ছে— মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও নাজায়েয। সিয়ারে কবীরে বলা হয়েছে, সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিলে এ রকম করাতে কোনো দোষ নেই। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফার মতে, মূলতঃ এ রকম করা সিদ্ধ নয়। কুদুরী রচয়িতা এবং হেদায়া রচয়িতা এ রকম উল্লেখ করেছেন। বলিষ্ঠ বর্ণনা এই যে, বন্দীবিনিময় বৈধ। সাহেবাইনের মতও এ রকম।

বন্দীকে জিম্মি করে (কর প্রদানে সম্মত অবস্থায়) মুক্ত করে দেয়াও জায়েয। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক এ রকম বলেছেন। হজরত ওমর ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের পর সেখানকার বিধর্মীকে জিম্মি অবস্থায় মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, বন্দীকে জিম্মি করা যায় না। কারণ তারা অধিকৃত (অধিকৃতরা তো বাধ্য হয়ে এ রকম প্রস্তাবে সম্মত হবে)। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুক্তিপণ নিয়ে অথবা না নিয়ে অথবা বন্দীবিনিময়ের মাধ্যমে কাফের বন্দীকে তার স্বভূমিতে যেতে দিলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় তারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। আর কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। ওই সকল বন্দীর বন্দীত্ব আল্লাহ্-তায়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। তাছাড়া 'ফা ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন'— আয়াতটি রহিত হয়েছে। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে— 'ফাইম্মা তাছকাফান্নাহুম বিল হরবি ফাশাররিদ বিহিম মান খালাহুম' এবং 'উকতুলুল মুশরিকীনা হাইছু ওয়াজাদতাহুম'। অবশ্য জমহুরের মতে মুক্তিপণ ও সৌজন্য-মূলক মুক্তি সম্পর্কিত আয়াতটি রহিত হয়নি। কেননা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটলো, তখন অবতীর্ণ হয় —'ইম্মা মান্না বা'দু ওয়া ইম্মা ফিদাআন'। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, 'উকতুলুল মুশরিকীন' আয়াতের মাধ্যমে বন্দী মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়নি। বরং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বন্দী বিধর্মীদেরকে হত্যা না করে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী বানানো যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফার মতে তাদেরকে জিম্মী হিসাবে ছেড়ে দেয়াই উত্তম। (কারণ হত্যা ও বন্দী এক কথা নয়।— হত্যা করতে চাইলে তো বন্দী করার প্রাক্কালেই হত্যা করা যেতো)।

হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে মুসলিম, আবু দাউদ এবং তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. দু'জন মুসলমান বন্দীর বিনিময়ে একজন বিধর্মী বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মুসলিম, আহমদ এবং সুনান রচয়িতা চতুষ্টয়ের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে আমাদেরকে এক জেহাদে প্রেরণ করলেন। নির্দেশ ছিলো যুদ্ধ করতে হবে বনী কাজায়ার বিরুদ্ধে। আমরা যুদ্ধ শুরু করলাম। হত্যা করলাম তাদের অনেককে। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম মহিলা ও শিশুসহ কিছু লোক আশ্রয় লাভের জন্য একটি উঁচু টিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমি দেখলাম আমি তাদেরকে সামনাসামনি গিয়ে বাধা দিতে পারবো না। তার আগেই তারা পৌঁছে যাবে নিরাপদ স্থানে। তাই আমি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলাম। ফলে তারা আর অগ্রসর হতে পারলো না। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে অধিনায়ক হজরত আবু বকরের নিকটে এলাম। ওই দলে ছিলো এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী। হজরত আবু বকর ওই যুবতীকে দিলেন আমার অধিকারে। যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম আমরা। কিন্তু পথিমধ্যে আমি ওই যুবতীর বস্ত্র উন্মোচন করিনি। এরপর মদীনার বাজারে স্বয়ং রসুল স. আমাকে বললেন, হে সালমা! ওই যুবতীকে আমার হাতে দিয়ে দাও। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল। যুবতীটি আমার খুবই পছন্দ। এখন পর্যন্ত আমি তার বসনোন্মচন করিনি। তিনি স. আর কিছু বললেন না। কয়েকদিন পর আবার বাজারে দেখা হলো রসুল স. এর সঙ্গে। তিনি স. বললেন, হে সালমা! আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করবেন— মেয়েটিকে আমার হাতে দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সে আপনারই জন্য। এখনো আমি তার গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করিনি। রসুল স. ওই যুবতীর বিনিময়ে মুক্ত করলেন মক্কার মুসলমান বন্দীদেরকে।

ইবনে ইসহাক ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, যখন মক্কাবাসীরা তাঁদের বন্দী স্বজনদের জন্য মুক্তিপণ পাঠাতে শুরু করলেন, তখন রসুল স. এর কন্যা হজরত জয়নাবও তাঁর বন্দী স্বামীর মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন একটি মুক্তার মালা। মালাটি রসুল স. তাঁর প্রথম বিবাহের সময় উম্মত জননী হজরত খাদিজাকে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি বিজড়িত ওই মালাটি দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন রসুল স.। সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে জয়নাবের বন্দীকে মুক্তি দিতে পারো এবং মালাটিও ফিরিয়ে দিতে পারো। রসুলঅন্তপ্রাণ সাহাবীগণ তাই করলেন। হাকেমের বিশুদ্ধ বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো (হজরত জয়নাবের স্বামী) আবুল আসকে মুক্তিদান কালে রসুল স. এই মর্মে তাঁর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তিনি মক্কায় গিয়ে অবশ্যই হজরত জয়নাবকে পাঠিয়ে দিবেন মদীনায়। আবুল আস তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. মুক্তিপণ ছাড়া যে সকল বদরের যুদ্ধ-বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলো মুত্তালিব বিন হানতাব এবং আবদুল উজ্জা জামুহী। তারা ছিলো বিত্তহীন। রসুল স.কে তারা তাদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলো। তিনি স. তাদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিলেন যে, তোমরা আমার শত্রুকে কখনো সাহায্য করতে পারবে না। তারা ছিলো কবি। কবিতায় তারা রসুল স. এর কিছু গুণগানও করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন উহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনীর সহযোদ্ধা হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলো। যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। আবারও সে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। রসুল স. বলেন, মক্কার মাটিতে তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না। সেখানে গিয়ে এ রকম বলার সুযোগও পাবে না যে, আমি মোহাম্মদকে দুই দুইবার প্রতারণা করতে পেরেছি। এরপর রসুল স. তার মস্তক ছেদনের নির্দেশ দেন।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে রসুল স. বিত্তহীন বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর বিত্তশালী বন্দীদের মুক্তিপণ ধার্য করেছিলেন এক হাজার থেকে চার হাজার দিনার পর্যন্ত। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিদানের প্রাক্কালে রসুল স. বলেছিলেন মুত্ইম বিন আবী জিন্দা নিহত না হয়ে যদি বন্দী হতো, তবে তার সুপারিশে আমি ফিদিয়া ব্যতিরেকেই বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতাম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ইয়ামামার বনী হানিফার এক ব্যক্তিকে বন্দী করে আনবার জন্য একটি সেনাদলকে পাঠালেন। সেনাদল যথাসময়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে এলো। বেঁধে রাখলো মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে। তার নাম ছিলো সামামা বিন আছাল। রসুল স. তার কাছে এসে বললেন, তোমার নিকটে এখন কি রয়েছে? সামামা বললেন, যদি আপনারা আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন। যদি ছেড়ে দেন, তবে আমি জানাবো কৃতজ্ঞতা ও সম্মান। এখন বলুন, মুক্তিপণ হিসেবে কী পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হবে আমার জন্য? রসুল স. কিছু বললেন না। প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। পরদিন তিনি স. পুনরায় এসে বললেন, সামামা! কী ভাবছো? সামামা আগের দিনের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলেন। রসুল স. নীরবে সরে গেলেন সেখান থেকে। তৃতীয় দিনে পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে রসুল স. বললেন, এবার বলো সামামা কী চিন্তা করছো তুমি? সামামা বললেন, আমি তো আমার কথা বলেই দিয়েছি। তিনি স. নির্দেশ দিলেন সামামাকে ছেড়ে দাও। সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। মসজিদের অদূরেই ছিলো কিছু খেজুরের গাছ। সেদিকে চলে গেলেন সামামা। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে গোসল করে মসজিদে এসে ঘোষণা দিলেন— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। এ

রকমও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌র শপথ! হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনার রূপে আমি মুগ্ধ। পৃথিবীর অন্য কেউ আমাকে এ রকম মুগ্ধ করতে পারেনি। এখন আপনিই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আপনার আনীত ধর্মের চেয়ে অন্য কারো ধর্ম আমাকে এতো বেশী মোহিত করেনি। এখন সকল শহর অপেক্ষা আপনার এই শহর আমার নিকট অধিকতর আকর্ষণীয়। আর সকল মানুষ অপেক্ষা আপনিই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। ওমরার উদ্দেশ্যে আমি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলাম। আপনার সৈন্যরা আমাকে এখানে ধরে এনেছে। দয়া করে আজ্ঞা করুন, এখন আমি কী করবো? রসুল স. তাকে সুসংবাদ দান করলেন এবং ওমরার অনুমতি দিলেন। সামামা মক্কায় পৌঁছলে এক লোক বললো, শুনলাম তুমি নাকি ধর্মত্যাগ করেছো? সামামা বললেন, না আমি ধর্ম (প্রকৃত ধর্ম) গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম আমি এখন আল্লাহ্‌র রসুলের অনুগামী। তাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে ইয়ামামার একটি গমের দানাও আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করবো না।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাহাবীগণের সঙ্গে সলাপরামর্শ করলেন। বললেন, আল্লাহ্‌-পাক তোমাদেরকে তাদের উপর ক্ষমতাশালী করেছেন। হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওদের মস্তক কর্তনের অনুমতি প্রদান করুন। রসুল স. এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। হজরত আবু বকর বললেন, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। এটাই উত্তম। রসুল স. এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬৮

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

❒ আল্লাহের পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদিগের উপর মহা শাস্তি আপতিত হইত।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হচ্ছে— প্রত্যাদেশের (ওহীর) মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান লংঘন করলে তা হয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে। বিধান প্রদানের পরে যদি এ রকম করা হতো তবে আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে আপতিত হতো মহাশাস্তি। আলোচ্য আয়াতে এ কথাটিই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, হাসান এবং মুজাহিদ।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের পূর্বে অন্য কোনো উম্মতের জন্য গণিমত হালাল করা হয়নি। ইতোপূর্বে নিয়ম ছিলো— গণিমতের মাল জমা করে রাখতে হবে এক স্থানে। আর ওই স্তুপীকৃত গণিমতকে ভস্মীভূত করে দিবে আসমান থেকে নেমে আসা আগুন।

বদর যুদ্ধের সময় পলায়ণপর শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সাহাবীগণ। ওই অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— লাওহে মাহ্ফুজে পূর্বাহ্নে এ কথা লিখিত হয়েছিলো যে, মালে গণিমত শেষ উম্মতের জন্য বৈধ। যদি এ রকম লেখা না থাকতো তবে এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব। এ রকম তাফসীর করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

কেউ কেউ তাফসীর করেছেন এ রকম— বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করাই ছিলো অধিকতর উত্তম। এতে করে অবিশ্বাসীর অন্তরে সৃষ্টি হতো প্রচণ্ড ভীতি। প্রতিষ্ঠিত হতো ইসলামের নিরঙ্কুশ প্রতাপ। মুসলমানেরা এ কথা বুঝতে পারেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার মধ্যে রয়েছে দু'টি উপকার। একটি হচ্ছে— এরা হয়তো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এক সময় তওবা করবে। আশ্রয় গ্রহণ করবে ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। এ রকমই ঘটেছিলো বাস্তবে। বন্দীদের অনেকেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে— মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে অস্ত্র, অশ্ব ইত্যাদি ক্রয় করে মুসলমানেরা হতে পারবে সমরশক্তিতে অধিকতর বলীয়ান। এই চিন্তাটি ছিলো ভুল। কিন্তু এটা বিশ্বাসগত ভুল নয়— চিন্তাপ্রসূত (ইজতেহাদী) ভুল। লাওহে মাহ্ফুজে পূর্বাহ্নে লিখিত রয়েছে যে, ইজতেহাদী ভুল কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। যদি এ রকম লেখা না থাকতো, তবে এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব। কোনো কোনো আলেম আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— অনেক আগেই লাওহে মাহ্ফুজে আল্লাহ্তায়ালা লিখে রেখেছিলেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্বাসীদের উপর তিনি আযাব অবতীর্ণ করবেন না। এ রকম লেখা না থাকলে অবশ্যই এসে পড়তো আযাব। 'ফি মা আখাজতুম' অর্থ তোমরা যা গ্রহণ করেছো। অর্থাৎ তোমরা অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছো। এই গ্রহণের ফলেই তোমাদের উপর এসে পড়তো আল্লাহ্র আযাব (যদি পূর্বাহ্নে এ রকম নিষেধাজ্ঞা আসতো)।

জ্ঞাতব্যঃ একদল আলেম আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তোমরা ক্ষমার্হ। যদি তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাসী না হতে (যাদের জন্য গণিমত হালাল ছিলো

না, এ রকম উম্মতের মধ্যে কোনো এক উম্মত যদি হতে) তবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হতো আল্লাহ্‌র আযাব। তোমাদের জন্য গণিমত হালাল। তাই গণিমত গ্রহণ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করেছো তোমরা।

এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, গণিমত ও ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে সাহাবীগণ গোনাহ্‌গার বলে সাব্যস্ত হননি। নাফরমানীও করেননি আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে।

কাযী আবু বকর বিন আ'লা বলেছেন, শেষ উম্মতের জন্য গণিমত ও ফিদিয়া হালাল বলেই রসুল স. এর চিন্তাপ্রবাহ সেদিকেই প্রবাহিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে পৃথিবীতে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাই রসুল স. লাওহে মাহ্‌ফুজের ওই অনড় বিধানের অনুবর্তী হয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বেও এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিলো। হজরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলো ইবনে হাজরামী। রসুল স. ফিদিয়া প্রদানের শর্তে তাঁকে দায়মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন এ সম্পর্কে কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষের কারণ ঘটলে তখনই এ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালার কোনো অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেনি। বরং এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে রসুল স. এর অনন্যসাধারণ মর্যাদা। তাই আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র পূর্ববিধান না থাকলে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে এ রকম— আল্লাহ্‌পাকের লাওহে মাহ্‌ফুজে লিপিবদ্ধ ওই পূর্ব বিধান তোমাদের জন্য নির্ধারিত আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিশেষ নেয়ামত। অতএব হে বিশ্বাসীরা! উত্তমরূপে অবগত হও, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নেয়ামতের অধিকারী। এ রকম নেয়ামতের অধিকারী না হলে তোমরা আল্লাহ্‌পাকের মহাশাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারতে না।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, তখন উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেবল হজরত ওমর ও হজরত সা'দ ইবনে মুয়াজ ছিলেন বন্দীদেরকে হত্যা করার পক্ষে। অন্যরা ছিলেন হত্যার বিপক্ষে এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে। তাই রসুল স. বলেছিলেন আসমান থেকে আযাব নেমে এলে ওমর ও সা'দ ছাড়া আর কেউ রক্ষা পেতো না।

হজরত আলী থেকে ইবনে আবী শায়বা, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে সা'দ, ইবনে জারীর, ইবনে হাব্বান এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত হাদিসে এসেছে, হজরত জিব্‌রাইল রসুল স. কে বললেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় ফিদিয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। তবে আল্লাহ্ আপনাকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, হত্যা

অথবা ফিদিয়া— যে কোনো একটিকে আপনি গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু ফিদিয়া গ্রহণ করলে প্রতি বন্দীর পরিবর্তে আপনার দলের একজন মৃত্যুবরণ করবে। রসুল স. এ কথা সাহাবীগণকে জানালেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বন্দীরা আমাদেরই স্বজন। তাদেরকে ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে ফিদিয়ার অর্থে আমরা সমর-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করতে পারবো। আর তাদের একজনের বদলে আমাদের একজন যদি শহীদও হয়, তবুও তা আমাদের নিকট অপছন্দনীয় নয়। তাই হয়েছিলো। বদরের সত্তরজন যুদ্ধবন্দীর বদলে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন সত্তরজন সাহাবী।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আবুল ফজল আয়ায তাঁর আশ্‌শিফা গ্রন্থে লিখেছেন, হত্যা ও মুক্তিপণ গ্রহণ— দু'টোই ছিলো বৈধ। তবে হত্যা ছিলো উত্তম এবং মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে বন্দী মুক্তির ব্যাপারটি ছিলো অনুত্তম। রূপকার্থে তাই মুক্তিপণ গ্রহণ করাকে অন্যায় বলা হয়েছে। নির্দেশনাটি ছিলো এ রকম— উত্তম আমল গ্রহণ করাই সমীচীন। তিবরানীও এ রকম বলেছেন। হজরত ওমর এবং হজরত সা'দ গ্রহণ করেছিলেন উত্তম আমলটি। তাই রসুল স. বলেছিলেন, আযাব এলে ওমর ও সা'দ ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারতো না। কিন্তু তকদীরের নির্ধারণ ছিলো আযাব আসবে না। তাই আযাব আসেনি।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, পূর্বাহ্নে ফিদিয়াকে নিষেধ করা হয়নি। নিষেধ করা হলেও এ কথা বলা যেতো না যে রসুল স. আল্লাহ্‌র নিষেধের বাইরে কোনো কাজ করেন। এ রকম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাই, বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে'। এভাবে বলে বরং রসুল স. কে সম্মানিতই করা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি রসুল স. এর একনিষ্ঠ আনুগত্যকে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সাহাবীগণ ফিদিয়ার অর্থ গ্রহণের প্রতি তাঁদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তখন অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত।

সুরা আন্‌ফালঃ আয়াত ৬৯

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

❑ যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! গণিমত ও ফিদিয়া হিসাবে যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু অর্জিত হয়, তা তোমরা ভক্ষণ করতে এবং ব্যবহার করতে পারবে। এটা তোমাদের জন্য মোবাহ্ (বৈধ)। তবে তোমাদের অন্তরে সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে আল্লাহ্‌র ভয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে— আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

রসুল স. বলেছেন, আমাকে অন্য নবীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে ছয়টি বিষয়ে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে— যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার জন্য হালাল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি। এ সম্পর্কে হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানীর বর্ণনাটি এ রকম— রসুল স. বলেছেন, অন্য নবীগণকে দেয়া হয়নি, এ রকম পাঁচটি বিশেষত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। আর আমার জন্য মালে গণিমতকে করা হয়েছে হালাল— যা ইতোপূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে চারটি বিশেষত্বের কথা। হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানীর বর্ণনাতেও এ রকম বলা হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার পূর্বে কারোর জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিলো না। দুর্বলতা ও বিত্তহীনতার কারণে আমাদের জন্য গণিমতকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।

হজরত জাবের থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার জন্য মালে গণিমত হালাল। ইতোপূর্বে কারো জন্য মালে গণিমত হালাল ছিলো না। আল্লাহ্তায়ালা সমধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। যে দশজনের উপর মুশরিক সেনাদের আহার করানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তিনি ছিলেন তাদের একজন। সৈন্যদেরকে আহার করানোর জন্য তিনি বিশ আউকিয়া স্বর্ণ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তার পালা আসার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। তাই ওই স্বর্ণ খরচ করার সময় তিনি পাননি। মদীনায় আসার পর তিনি বললেন, মোহাম্মদ! এই বিশ আউকিয়া স্বর্ণ আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করো। রসুল স. বললেন, হে আমার পিতৃব্য! ওগুলো তো আপনি ইসলাম বিরোধী কাজে ব্যয় করার জন্য এনেছিলেন। তাই ওগুলো আমি গ্রহণ করতে পারি না। দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আকিল বিন আবু তালেব এবং নওফেল বিন হারেসের মুক্তিপণ পরিশোধের দায়িত্বও বর্তেছিলো হজরত আব্বাসের উপর। তাই তিনি বললেন, মোহাম্মদ! তুমি তো আমাকে নিঃস্ব করে দিলে। যতদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন আমাকে কুরায়েশদের কাছে হাত পাত্তে হবে। রসুল স. বললেন, ওই স্বর্ণগুলোর তাহলে কি হবে, যেগুলো আপনি মক্কা ছেড়ে আসার সময় উম্মুল ফজলের নিকট রেখে এসেছেন এবং তাঁকে বলে এসেছেন, জানি না আমার কী পরিণতি হবে। সে রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে প্রিয় পুত্র চতুষ্টয় আবদুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্, ফজল এবং কাসেমকে এগুলো দিও। হজরত আব্বাস বললেন, তোমাকে এ সংবাদ কে জানিয়েছে? তিনি স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক। এ কথা শুনেই হজরত আব্বাস বলে উঠলেন, আশহাদুআল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা আবদুহু ও রসুলুহু।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী, আবু নাঈম, ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ্, তিবরানী, আবু শায়েখ এবং হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে ইসহাক ও আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন বদর যুদ্ধে বন্দী করা হয় সত্তর জনকে। হজরত আব্বাস এবং হজরত আকিলও ছিলেন ওই সত্তর জনের মধ্যে। তাদের মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিলো চল্লিশ আউকিয়া স্বর্ণ। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ইসমাইল বিন আবদুর রহমান বলেছেন, হজরত আব্বাস, আকিল এবং নওফেল ও তার ভ্রাতার জন্য ফিদিয়া নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হজরত আব্বাসের মুক্তিপণই ছিলো সর্বাধিক। পরিমাণ ছিলো, চারশত দিনার। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফিদিয়া ধার্য করা হয়েছিলো হজরত আব্বাসের। তার পরিমাণ ছিলো একশত আউকিয়া স্বর্ণ। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. স্বয়ং হজরত আব্বাসের ফিদিয়া নির্ধারণ করলেন চারশত দিনার। হজরত আব্বাস বললেন, আমার কাছে তো কিছুই নেই। রসুল স. বললেন, ওই সম্পদগুলোর কী হবে, যা আপনি উম্মুল ফজলের নিকট গচ্ছিত রেখে আসার সময় বলেছিলেন, যদি খারাপ কোনো কিছু ঘটে, তবে এগুলো রইলো ফজল, আবদুল্লাহ্, ওবায়দুল্লাহ্ ও কাসেমের জন্য। হজরত আব্বাস বললেন, আল্লাহ্র কসম, এ ঘটনা তো আমি ও উম্মে ফজল ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই আমি এ কথা বিশ্বাস করলাম যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসুল।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আব্বাসের ফিদিয়া নির্ধারিত হয়েছিলো চারশত আওকিয়া। কেউ কেউ বলেছেন, চল্লিশ আউকিয়া। আকিলের জন্য মুক্তিপণ ধার্য করা হয়েছিলো আশি আউকিয়া। তখন হজরত আব্বাস বলেছিলেন, তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য কুরায়েশদের মুখাপেক্ষী করে দিলে। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত—

সুরা আনফাল ঃ আয়াত ৭০

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❑ হে নবী! তোমাদিগের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, 'আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন; তবে তোমাদিগের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

—১৪

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী তাঁর সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আব্বাস সহ বদর যুদ্ধের কয়েকজন বন্দী বললেন, আমরা তো ভিতরে ভিতরে মুসলমানই ছিলাম। মুশরিকদের জবরদস্তির কারণে আমরা বদরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদেরকে ফিদিয়া দিতে হবে কেনো? তাদের ওই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

এখানে উল্লেখিত 'ফি কুলুবিহিম খইরন' (যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু দেখেন) কথাটির অর্থ— যদি আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের অন্তরে ইমান ও এখলাস দর্শন করেন। ইউ'তিকুম খইরন (তদপেক্ষা উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করবেন) অর্থ— তোমাদের নিকট থেকে যে ফিদিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। মিম্মা উখিজা মিনকুম ওয়া ইয়াগ ফিরলাকুম (তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে)। আল্লাহ্‌ ওই ফিদিয়া অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী তোমাদেরকে দান করবেন পৃথিবীতে এবং আখেরাতেও দান করবেন অনেক সওয়াব। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে আমার প্রিয় নবী! আপনার অধীন যুদ্ধবন্দীদেরকে বলুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যদি তোমাদের অন্তরে ইমান ও এখলাসের উপস্থিতি দেখেন, তবে তোমাদের নিকট থেকে যে মুক্তিপণ নেয়া হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তো তোমাদেরকে পৃথিবীতেও যেমন বহুগুণ বেশী সম্পদ দান করবেন, তেমনি আখেরাতেও দান করবেন অনেক সওয়াব। আর তোমরা হবে ক্ষমার্হ। কারণ, আল্লাহ্‌তায়ালা ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ালু।

তিবরানী তাঁর আল আওসাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমার পিতা হজরত আব্বাস জানিয়েছেন, আমি যখন রসুল স. কে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানালাম এবং মুক্তিপণরূপে স্বর্ণ প্রদান করলাম, তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আল্লাহ্‌পাক ওই স্বর্ণের পরিবর্তে আমাকে বিশজন গোলাম দান করলেন। তারা প্রত্যেকে আমার উপার্জনের মাধ্যম। এর সঙ্গে আমি আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমাপ্রাপ্তির আশাও করি।

বাগবীর বর্ণনায় রয়েছে এ রকম— (হজরত আব্বাস জানিয়েছেন), আল্লাহ্‌-পাক এই মুক্তপণের পরিবর্তে আমাকে দান করেছেন কুড়িজন ক্রীতদাস। তারা সকলে আমার ব্যবসার মাধ্যম এবং অধিকাংশই উপার্জনশীল। প্রত্যেকের ন্যূনতম উপার্জন বিশ হাজার দিরহাম। এ ছাড়া আল্লাহ্‌পাক আমাকে দিয়েছেন জমজম কূপের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব। ওই দায়িত্বের পরিবর্তে মক্কার সকল সম্পদের অধিকারী হওয়াও আমার মনঃপুত নয়। তদুপরি, আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমালাভের দৃঢ় আশাও পোষণ করি।

সাবিলুর রাশাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে হজরত আব্বাস বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার নিকট থেকে যে মুক্তিপণ আপনি গ্রহণ করেছেন, তার সঙ্গে আমার পাপরাশিও অন্তর্হিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌পাক ওই সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম সম্পদ দান করেছেন আমাকে। আমি হয়েছি চল্লিশজন গোলামের মালিক। তারা প্রত্যেকে উপার্জন করে আমার বিত্তবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। আবার আমাকে দেয়া হয়েছে মার্জনার শুভ সংবাদ।

বোখারী এবং ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর খেদমতে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি স. নির্দেশ দিলেন, ওগুলোকে মসজিদের এক কোণে রেখে দাও। একটু পরে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত আব্বাস। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে ওই সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করুন। আমি তো আমার ও আকিলের ফিদিয়া পরিশোধ করেছি। রসুল স. বললেন, নিয়ে যান। হজরত আব্বাস দুই হাতে ওই সম্পদগুলো তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে বেঁধে নিলেন। কিন্তু তা উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলেন। বললেন, কাউকে হুকুম করুন, যেনো সে আমার বোঝাটি উঠিয়ে দেয়। রসুল স. বললেন, না। হজরত আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি উঠিয়ে দিন। তিনি স. বললেন, না। হজরত আব্বাস নিরুপায় হয়ে কিছু অংশ রেখে দিলেন, এভাবে ভার কিছুটা হাল্‌কা করে বোঝাটি স্কন্ধে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। এ কথাও বলতে বলতে গেলেন যে, আল্লাহ্‌পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। রসুল স. এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হজরত আব্বাসের গমন পথের দিকে। আর অবশিষ্ট দিরহামগুলো দান করার আগে তিনি স. সে স্থান পরিত্যাগ করলেন না।

সুরা আন্‌ফালঃ আয়াত ৭১

وَاِنۡ یُّرِیۡدُوۡا خِیَانَتَکَ فَقَدۡ خَانُوا اللّٰہَ مِنۡ قَبۡلُ فَاَمۡکَنَ مِنۡہُمۡ ؕ وَاللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ○

❑ তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহিলে করিতে পারে, তাহারা তো পূর্বে আল্লাহের সহিতও বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তাহাদিগের উপর শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা মুক্তিপণ প্রদান করে অথবা বিনা মুক্তিপণে মুক্তিলাভের পর আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, তারা অবশ্যই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে দায়ী হবে। তারা তো আল্লাহ্‌র সঙ্গেও এ রকম করে। সুতরাং আপনি চিন্তিত হবেন না। আল্লাহ্‌ তাদের উপর আপনাকে প্রবল করে দিবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞ। তাই তিনি ওই সকল বিশ্বাস হন্তারকদের মনোবৃত্তি, অভিপ্রায় ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। সকল কিছুই তাঁর ওই অতুলনীয় প্রজ্ঞাময়তার অধীন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আবু গুররা জামুহী নামক এক বদরের যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার নিকট থেকে এই মর্মে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তুমি আর কখনো আমাদের শত্রুদের সহযোগী হতে পারবে না। কিন্তু সে এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। উহুদ যুদ্ধে হাজির হয়েছিলো মুশরিকদের সহযোদ্ধা হয়ে। পুনরায় তাকে বন্দী করা হয়। পরে রসুল স. এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৭২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

❒ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে কিন্তু দ্বীনের জন্য গৃহ ত্যাগ করে নাই, গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহাদিগের অবিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নাই; আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদিগের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদিগের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদিগের বিরুদ্ধে নহে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

'যাহারা বিশ্বাস করেছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেছে' অর্থ— যারা ইমান এনেছে এবং আল্লাহ্ ও রসুলের মহব্বতে মক্কার বসবাস ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছে। 'জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে' অর্থ— জেহাদ করেছে, জেহাদের অস্ত্র, অশ্ব ক্রয়ের জন্য এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করেছে। 'যারা আশ্রয় দান করেছে' অর্থ— যে সকল আনসার তাঁদের বসতবাটিতে মুহাজিরগণকে আশ্রয় দান করেছে। 'সাহায্য করেছে' অর্থ— যে সকল মদীনাবাসী আনসার, মুশরিক শত্রুর বিরুদ্ধে মুহাজিরগণকে সহযোগিতা

দান করেছেন। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, মুহাজিরগণকে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়েছে— তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারেরা একে অপরের সুহৃদ। কিন্তু তাদের কাফের আত্মীয় স্বজনেরা বংশগত নৈকট্য সত্ত্বেও তাদের বন্ধু নয়। অবিশ্বাসীরা কখনো বিশ্বাসীদের প্রকৃত বন্ধু ও সুহৃদ হতে পারে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মীরাস (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে। মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ওই উত্তরাধিকার ইসলামের কারণে ছিলো না। ছিলো হিজরতের কারণে। তাই মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরত রহিত হয়ে যায়, তখন ওই উত্তরাধিকারও রহিত হয়ে যায়। রহিতকারী আয়াতটি হচ্ছে— ওয়া উলুল আরহাম বা'দ্বহুম আওলা বি বা'দ্বিন ফি কিতাবিল্লাহি (আল্লাহ্‌র বিধানে তারা রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পর অপেক্ষা উত্তম) ।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতকে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত বলা হলেও আয়াতটি রহিত (মনসুখ) হয়েছে, এ রকম বলার কোনো কারণ নেই। কারণ, পরস্পর বিরোধী বিধানের ক্ষেত্রেই কেবল রহিত হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু এখানে সেরকম কোনো পরস্পরবিরোধিতা নেই। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্য হচ্ছে— মুহাজির ও আনসার একে অপরের উত্তরাধিকার পেতেন। কিন্তু মুসলমানেরা তখন তাদের কাফের আত্মীয়স্বজনের উত্তরাধিকার পেতেন না। কারণ তাদের মধ্যে ছিলো ধর্মীয় বিভেদ। এছাড়া যে সকল মুসলমান হিজরত করেননি তাদের সঙ্গেও হিজরতকারীদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক তখন ছিলো না। কারণ, তাঁরা ছিলেন কাফের অধ্যুষিত এলাকায় (মক্কায়)। আর মুহাজিরেরা ছিলেন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে (মদীনায়)। মক্কা বিজয়ের পর এই ব্যবধানটি উঠে গেলো। মক্কাবাসীরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। মক্কা হয়ে গেলো মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত। দূর হয়ে গেলো ধর্মের ও রাজ্যের ব্যবধান। ফলে আত্মীয়তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো পূর্ণরূপে। উল্লেখ্য যে, মুহাজির ও আনসারগণের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিষয়টি শরিয়তের বিধানগত কোনো উত্তরাধিকার ছিলো না। ওই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়েছিলো সুগভীর প্রেম-প্রীতির ভিত্তিতে— যা রহিত হওয়া না হওয়ার পর্যায়ভূত নয়। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর সৌহার্দ সূত্রের উত্তরাধিকার অবশ্যই শরিয়ত সমর্থিত। ইমামে আজম বলেছেন, সৌহার্দ সূত্রভূত উত্তরাধিকার অবশ্য মাননীয়।

এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে উত্তরাধিকারের বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। বলা হয়েছে আনসার ও সাহাবীগণের গভীর বন্ধুত্বের কথা। সুতরাং তাঁদের সৌহার্দ সূত্রের উত্তরাধিকার যে রহিত হবার মতো কিছু নয়— তা বলাই বাহুল্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর যারা বিশ্বাস করেছে কিন্তু দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেনি, গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকদের দায়িত্ব তোমার নেই।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা ইমানদার হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম রক্ষার জন্য হিজরত করেনি, তাদের ব্যাপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। তারা বিশ্বাসী হলেও আপনাদের প্রকৃত সুহৃদ নয়। (অতএব তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন থেকে বিরত থাকুন)। এ কথার মাধ্যমে এই নির্দেশনাটি দেয়া হয়েছে যে— তওবা না করা পর্যন্ত পাপী (ফাসেক) বিশ্বাসীদের সঙ্গে পুণ্যবান বিশ্বাসীদের বন্ধুত্ব সমীচীন নয়। আর নির্দেশনাটিকে উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বলা হলে অর্থ দাঁড়াবে— কাফের সাম্রাজ্যের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাদের সঙ্গে মুসলিম রাজ্যের অধিবাসীদের উত্তরাধিকার অচল।

এরপর বলা হয়েছে — 'আর দ্বীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। এ কথার অর্থ— যারা মুহাজির নয় তারা যদি ধর্মরক্ষার জন্য সাহায্য কামনা করে তবে তাঁদেরকে সাহায্য করা মুহাজির ও আনসারগণের উপরে ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)।

এরপর বলা হয়েছে — 'যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়।' এ কথার অর্থ ওই সকল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলমানদেরকে সাহায্য করা যাবে না, যাদের সঙ্গে রয়েছে চুক্তি। কেননা চুক্তি ভঙ্গ করা নাজায়েয। এ কারণেই হুদায়বিয়ার চুক্তির পরক্ষণে হজরত আবু জান্দাল মক্কার অন্তরীণ অবস্থা থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেও রসুল স. তাঁকে আশ্রয় দান করেননি। আশ্রয় দিলে ভঙ্গ হয়ে যেতো চুক্তির একটি বিশেষ ধারা। সুরা ফাতাহ'র তাফসীরে এই ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু বিমা তা'মালুনা বাসীর (তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা)। এ কথার অর্থ— সবকিছু রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উদাহরণ রহিত দৃষ্টিসীমানার মধ্যে। কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত নয়। সুতরাং বিশুদ্ধ চিত্ত হও। হও বিশুদ্ধাচারী।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

❒ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা উহা না কর তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা বিপর্যয় দেখা দিবে।

❒ যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে ও আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী; তাহাদিগের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদেরই বন্ধু। বিশ্বাসীদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হতে পারে না। তাই তাদেরকে সাহায্য করা বিশ্বাসীদের জন্য বৈধ নয়। বিশ্বাসীরা সাহায্য করবে কেবল বিশ্বাসীদেরকে। এ রকম না করলে দেখা দিবে বিপর্যয়।

হজরত উসামা ইবনে জায়েদ থেকে বোখারী, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাগণ তাঁদের আপনাপন পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন মুসলমানেরা কাফেরদের উত্তরাধিকারী নয়। কাফেরেরাও নয় মুসলমানদের উত্তরাধিকারী। সুরা নিসার উত্তরাধিকার বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

মাসআলাঃ মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কাফের সাম্রাজ্যে কিছু সংখ্যক কাফের অপর কোনো কাফের জনপদের উপর আক্রমন করে বসে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে, ওই জনপদে বাস করে কিছু সংখ্যক আশ্রিত মুসলমান, তবে হামলাকারীদের প্রতিহত করা মুলমানদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যদি মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতির আশংকা দেখা যায় তবে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। কারণ শত্রুর মোকাবিলা করার অর্থ— জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করা। আর আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীকে সমুন্নত করা, ধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ও আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবনের ঝুঁকি নেয়া বৈধ নয়। তাই কাফেরদের জান মাল রক্ষার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া মুসলমানদের জন্য অবৈধ।

মাসআলাঃ যদি বিধর্মীদের সাম্রাজ্যের কোনো বসতির মুসলমান ও কাফের অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে; এমতাবস্থায় ওই বসতির কাফেররা যদি অন্য কোনো দেশ থেকে মুসলমানদেরকে বন্দী করে এনে মুসলিম বসতির পাশ দিয়ে

যেতে থাকে তবে ওই বসতির মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য হবে তাদের কাছ থেকে বন্দীদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে মুক্ত করে দেয়া। বন্দীরা যদি খারেজী হয়— তবুও। আর ওই হামলাকারীরা যদি অন্য দেশের মুসলমানদের কেবল সম্পদ লুণ্ঠন করে আনে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীন নয়। কারণ যেহেতু ইমাম আবু হানিফার মতে মুসলমানদের নিকট থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের মালিক হয়ে যায় কাফেরেরা। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে হবে কেবল বন্দী মুসলমানদেরকে অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য। তাদের সম্পদ উদ্ধারের জন্য নয়। ইমাম আবু হানিফা এ রকম বলেছেন।

পরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাস করেছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করেছে ও আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।' এই আয়াতে প্রকৃত ইমানদার বলে সম্মানিত করা হয়েছে হিজরতকারী, আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং হিজরতকারীদের আশ্রয়দাতাদেরকে। তাদের-কে দেয়া হয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণের সুসংবাদ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইসলাম পূর্বের পাপরাশিকে ঢেকে দেয়। আর হিজরত মুছে দেয় হিজরতপূর্ব সময়ের গোনাহ সমূহকে। হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত আমর ইবনে আস থেকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির পূর্বে যারা হিজরত করেছিলেন তাদেরকে বলা হয় প্রথম হিজরতকারী। আর ওই সন্ধি পরবর্তী হিজরতকারীদেরকে বলা হয় দ্বিতীয় হিজরতকারী। কেউ আবার দু'বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমবার হিজরত করেছিলেন আবিসিনিয়ায়। পরে মদীনায়। হজরত ওসমান ও হজরত জাফর ছিলেন দুইবার হিজরতকারীদের অন্তর্ভূত। আলোচ্য আয়াতে আলোচিত হয়েছে প্রথম হিজরতকারীদের প্রসঙ্গে। পরের হিজরতকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে নিম্নের আয়াতে এভাবে—

সুরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৭৫

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۟

❐ যাহারা পরে বিশ্বাস করিয়াছে, দ্বীনের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছে ও তোমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া সংগ্রাম করিয়াছে তাহারাও তোমাদিগের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহের বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— প্রথম হিজরতকারীরাও পরে হিজরত-কারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তারাও ধর্মরক্ষার জন্য স্বভূমি পরিত্যাগকারী এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদকারী। আর ওই হিজরতকারীদের মধ্যে যারা আত্মীয়স্বজন, তাদের অধিকার অধিকতর শক্তিশালী। অতএব, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে তোমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর করো। আল্লাহ্তায়ালা সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত। ধর্মীয় সূত্রে, বংশীয় সূত্রে এবং সৌহার্দ সূত্রে উত্তরাধিকারের প্রবর্তনা তাঁর অপার জ্ঞানেরই নিদর্শন।

এখানে 'আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার' কথাটির অর্থ — আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী মুসলমান অপেক্ষা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী স্বজনেরা উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিক হকদার। সুরা নিসার তাফসীরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকারের প্রথম হকদার হচ্ছে জাবিল ফুরুজ। তার পরের হকদার হচ্ছে আছাবা। সুতরাং যারা একেবারে অপরিচিত ও যারা দূরবর্তী আত্মীয়তারও অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা উত্তরাধিকার পাবে না। রসুল স. এরশাদ করেছেন, যারা জাবিল ফুরুজ কিংবা আছাবা নয়, তাদের উত্তরাধিকারী হয় তাদের মাতুলেরা।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, যাদের জাবিল ফুরজ অথবা আছাবা কেউ নেই, তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করে দিতে হবে বায়তুল মালে (কোরআন মজীদে যাদের উত্তরাধিকারের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাদেরকে বলে জাবিল ফুরুজ। আর জাবিল ফুরুজের অংশ দেয়ার পর যারা মীরাসের অংশ পায়, তাদেরকে বলা হয় আছাবা)। উত্তরাধিকার বণ্টনের নিয়ম হচ্ছে— প্রথমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে জাবিল ফুরুজের মধ্যে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বণ্টন করে দিতে হবে আছাবাগণের মধ্যে। জাবিল ফুরুজদেরকে দেয়ার পর কোনো কিছু অবশিষ্ট না থাকলে আছাবারা কিছুই পাবে না। আর জাবিল ফুরুজ না থাকলে সকল সম্পদ পাবে আছাবারা। মুসলমানের কাফের আত্মীয়রাও উত্তরাধিকার পাবে না। এমতোক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ জমা করতে হবে বায়তুল মালে। বরং অপরিচিত ও অনাত্মীয় মুসলমানদেরকেও এ রকম উত্তরাধিকারহীন সম্পদ দেয়া যেতে পারে। সুতরাং এ রকম বলা যায় যে, ইমাম শাফেয়ীর মাসআলাটি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

সুরা তওবা

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্! আমরা তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। তুমিই একমাত্র উপাস্য। তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমরা আমাদের সকল বিচ্যুতি ও দুঃখ কষ্ট থেকে তোমার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি এবং যাচঞা করি ক্ষমা। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি সকল কিছুর উপরে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কেবল তোমার। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্যাধিকারী করো। আর যাকে ইচ্ছা করো রাজ্যহারা। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করো। যাকে ইচ্ছা করো

অসম্মানিত। তোমারই অধিকারে রয়েছে সকল কল্যাণ। সকল কিছু সম্পাদন করো তুমিই। তুমি আমাদের এবং আকাশ-পৃথিবী সহ সকল সৃষ্টির মালিক। আমরা তোমারই নিরাপত্তা ও করুণাপ্রার্থী। আমরা দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি তোমার বার্তাবাহক ও প্রেমাস্পদ এবং যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক ও প্রভু। অন্যান্য নবী রসুল এবং তোমার সকল পুণ্যবান দাসদের প্রতিও আমরা প্রেরণ করি দরূদ ও সালাম।

উপক্রমণিকাঃ মদীনায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ১২৯ অথবা ১৩০ আয়াত। আবু আতিয়াহ্ হামাদানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব এই মর্মে লিখিত নির্দেশ জারী করেছিলেন যে, হে মানুষ! তোমরা সুরা বারাআত (তওবা) নিজে শিক্ষা করো এবং পরিবার পরিজনকে শিক্ষা দাও। আরো পাঠ করো সুরা নূর। কারণ সুরা বারাআতে রয়েছে পুরুষের জন্য জেহাদের অনুপ্রেরণা। আর সুরা নূরে রয়েছে রমণীদের জন্য পর্দার নির্দেশ।

হজরত ওসমান বলেছেন, রসুল স. এর সময়ে এই সুরাকে আমরা সুরা আন্‌ফালের সঙ্গে পরস্পরযুক্ত মনে করতাম। আমিও তখন সুরা দু'টো পরস্পর যুক্তরূপে লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

এই সুরার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন—

১. বারাআত। কাফেরদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিবৃত হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নাম সুরা বারাআত।
২. সুরা তওবা। মুমিনদের তওবা কবুলের শুভসংবাদ দেয়া হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে সুরা তওবা।
৩. মুকাশকাশা। অপবিত্রতা বা নেফাকের প্রতি প্রচণ্ড রোষ ঘোষিত হয়েছে এই সুরায়। তাই এর নাম সুরা মুকাশকাশা। হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম থেকে আবু শায়েখ এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, এই সুরায় প্রকাশ করা হয়েছে নেফাকের প্রতি প্রবল অসন্তোষ।
৪. মোবায়ছিরা। ইবনে মুনজিরের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাসূত্রে এ নামটির কথা এসেছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ রহস্য সমূহের যবনিকা উন্মোচন করা হয়েছে এ সুরায়। তাই এর নাম মোবায়ছিরা।
৫. আল বহুছ। হজরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ থেকে আবু রুশদ্ হেরানী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম তিবরানী এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এ নামটি।
৬. আল্ মুছিরাহ্। এ নামটি কাতাদা সূত্রে উল্লেখ করেছেন ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ এবং ইবনে আবী হাতেম। এই সুরার এরূপ

নামকরণের কারণ এই যে, এখানে এসেছে অপবিত্রতা উচ্ছেদের নির্দেশনা। মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ নেফাককে (অপবিত্রতাকে) প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এ সুরায়।

৭. মুনকিলাহ্। এর অর্থ — শাস্তিদাতা, ধ্বংস আনয়নকারী।

৮. আযাব। এ নামকরণের কথা জানিয়েছেন হজরত হুজায়ফা। বলেছেন, তোমরা যাকে সুরা তওবা বলো, সেই সুরাটির নাম সুরা আযাব। আল্লাহ্র কসম! এ সুরায় কাউকেই চিহ্নিতকরণ ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হয়নি। ইবনে আবী শায়বা, তিবরানী, আবু শায়েখ, হাকেম এবং ইবনে মারদুবিয়া। হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর থেকেও এ রকম নামকরণের কথা এসেছে। খাজা আবু আওয়ানাতাহ্, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া।

৯. আল ফাজেহাহ্। এ সুরার মাধ্যমে মুনাফিকদেরকে অপদস্ত করা হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে আল ফাজেহাহ্। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি নিজে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এ সুরার আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং প্রকাশ করতে থাকে মুনাফিকদের অবস্থা। আমরা তখন মনে করতাম, মনে হয় কোনো কিছুই আর অনুল্লেখ্য থাকবে না। আমি বললাম, সুরা আন্ফাল। তিনি বললেন, সুরা বদর। আমি বললাম, সুরা হাশর। তিনি বললেন, এ সুরাকে সুরা নফির বলো (কারণ, এর মধ্যে রয়েছে কবর থেকে পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে একত্র হওয়ার বিবরণ)।

প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ উল্লেখ করা হলো না কেনোঃ

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার হজরত ওসমানকে বললাম, সুরা আন্ফাল শেষ করে সুরা তওবা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে আপনি বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীম লিখেননি কেনো? হজরত ওসমান বললেন, রসুল স. এর প্রতি একই সঙ্গে কয়েকটি সুরা কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হতো। তিনি তখন তাঁর কোরআন লিপিবদ্ধকারীকে বলতেন. সদ্য অবতীর্ণ এ আয়াতগুলো অমুক সুরায় সন্নিবেশিত করো। মদীনায় আগমনের পর প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুরা আন্ফাল। আর সুরা বারাআত অবতীর্ণ হয়েছিলো শেষদিকে। পরে উভয় সুরা একত্রে মেলানো হয়েছিলো। কিন্তু তিনি স. এ কথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, সুরা বারআত, সুরা আন্ফালের অংশ। তাই এ দু'টো সুরাকে আমি একত্র করেছি এবং সুরা বারাআত এর পূর্বে বিস্মিল্লাহির রহ্মানির রহীমও উল্লেখ করিনি। বাগবী

সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন— আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং তিরমিজি। হাকেম বলেছেন হাদিসটি বিশুদ্ধ। আর তিরমিজি বলেছেন উত্তম।

সুরা বারাআতের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ উল্লেখ না করার একটি কারণ এই যে, এখানে নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি পরিত্যক্ত হয়েছে। আর বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম হচ্ছে নিরাপত্তার নিদর্শন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি একবার হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, সুরা বারাআতের প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ নেই কেনো? তিনি বললেন বিস্‌মিল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আর সুরা বারাআত হচ্ছে— খাপ খোলা তলোয়ারের মতো। আবু শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে—এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মতপৃথকতা ছিলো। কেউ কেউ মনে করতেন উভয় সুরা অবতীর্ণ হয়েছে সম্মিলিতরূপে। আবার কেউ কেউ মনে করতেন পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েছে সুরা দু'টো। দু'টোর মধ্যে তাই পার্থক্যটিও সুস্পষ্ট। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, অন্য সুরার মতো এই সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌র উল্লেখ নেই।

বাগবী লিখেছেন তাফসীরকারগণ বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধে গমন করলে মুনাফিকেরা বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়। সৃষ্টি করে বিভিন্ন গুজব। তাদের প্রচারণার আঘাতে মুসলমানেরা হয়ে পড়ে পেরেশান। রসুল স. এর সঙ্গে কৃত সন্ধি-চুক্তিও তারা ভঙ্গ করে ফেলে।

আমি বলি, মুনাফিকেরা বিশ্বাস করতো মুসলমানেরা কিছুতেই রোমের প্রশাসক কায়সারের মোকাবেলা করতে পারবে না। ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। এ রকম অপবিশ্বাসের কারণেই তারা শুরু করে দেয় বাড়াবাড়ি। আল্লাহ্‌পাকও তাই তাঁর প্রিয় রসুলকে তাদের সঙ্গে কৃত সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। ঘোষণা করেন—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১, ২

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

❑ ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত অংশীবাদীদিগের সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

❒ অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাস কাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

'বারাআত' অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ। শব্দটি 'নাশাআত' এবং 'দানাআত' এর মতো একটি মূল শব্দ। প্রথমোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এখানে উহ্য রয়েছে। ওই উহ্য উদ্দেশ্যসহ 'বারাআত' এর অর্থ করা হয়েছে— এটা সম্পর্কচ্ছেদ। এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে সে সকল অংশীবাদীদিগের সঙ্গে— যাদের সাথে তোমরা ছিলে চুক্তিবদ্ধ। জুজায বলেছেন, বক্তব্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে— ওই সকল মুনাফিক যেহেতু নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করেছে, তাই এখন থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলও ওই চুক্তির দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত।

'আহাদতুম' অর্থ — তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো। এখানে 'সম্পর্কচ্ছেদ' কথাটি সম্পৃক্ত হয়েছে আল্লাহ্ ও রসুলের সঙ্গে। আর 'চুক্তিবদ্ধ' হওয়ার সম্পর্ক করা হয়েছে রসুল স. এবং সাহাবীগণের সঙ্গে। এর মধ্যে এই নির্দেশনাটি রয়েছে যে, বিধর্মীরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে, তবে রসুল স. এর পক্ষ থেকে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে ওয়াজিব।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে — 'অতঃপর তোমরা দেশে চারমাস কাল পরিভ্রমণ করো ও জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে বিধর্মীর দল! তোমরা পূর্ণ নির্ভয়ে চারমাস দেশের মধ্যে যেখানে ইচ্ছে সেখানে পরিভ্রমণ করো। এই চারমাস তোমরা মুসলমানদের আক্রমণ থেকে মুক্ত। কিন্তু তোমরা এ কথা মনে কোরো না যে, তোমরা আল্লাহ্তায়ালার কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত। অন্যদের মতো তোমরাও কখনো আল্লাহ্তায়ালাকে হীনবল করতে সক্ষম নও।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।' এ কথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেনই। তাই পৃথিবীতে অবশ্যই তোমাদের উপর নেমে আসবে হত্যা ও বন্দীত্বের অভিশাপ। আর আখেরাতে তোমাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই।

জুহরী বলেছেন, এখানে 'চারমাস' কথাটির অর্থ— শাওয়াল, জিলক্বদ, জিলহজ এবং মহররম। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো শাওয়াল মাসে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে এখানে চারমাস বলে বুঝানো হয়েছে জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে রবিউস সানি মাসের ১০ তারিখের সময়কে। পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ

مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ

اَحَدًا فَاَتِمُّوْۤا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

❐ মহান হজের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে আল্লাহের সহিত অংশীবাদীদিগের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাঁহার রসূলের সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে; আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না; এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও,

❐ তবে অংশীবাদীদিগের মধ্যে যাহাদিগের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদিগের চুক্তিরক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই; এবং তোমাদিগের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে; আল্লাহ্ সাবধানীদিগকে পছন্দ করেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'ওয়াআজানুম মিনাল্লহি ওয়া রসূলিহি।' এর অর্থ— এটা আল্লাহ্ ও রসুলের পক্ষ থেকে এক ঘোষণা। বক্তব্যভঙ্গিটি প্রথম আয়াতের প্রারম্ভিক বক্তব্যের মতো (বারাআতুম মিনাল্লহ— এটা সম্পর্কচ্ছেদ)। এখানে আজান শব্দের অর্থ এলান বা ঘোষণা। শব্দটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশক। যেমন আমান অর্থ ঈমান, আতা অর্থ ই'তা। নামাজের আহ্বানকেও এই অর্থে বলা হয় আজান। যেমন বলা হয়— আজানতুহু ফাফাঅজিনা' (আমি তাকে সংবাদ দিলাম বলেই সে জানতে পারলো)। আজান শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে উজুন থেকে। উজুন অর্থ কর্ণ (অর্থাৎ আমি তার কর্ণ বিবরে ঢেলে দিলাম)।

'ইলান্নাসি ইয়াওমাল হাজ্জিল আক্বারি' অর্থ মহান হজের দিবসে মানুষের প্রতি। হজরত ইকরামা সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মহান হজের দিবস' অর্থ আরাফার দিবস। হজরত ওমর, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের

মাধ্যমেও বাগবী এ রকম বর্ণনা করেছেন। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আতা, তাউস এবং মুজাহিদও এ মতের সমর্থক। আমি বলি, হজরত মুসাওওয়ার বিন মুখরিমা থেকে ইবনে আবী হাতেমের মাধ্যমে আবদুর রহমান বিন মু'তামির সূত্রে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি,নাসাঈ এবং ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. বলেছেন, আরাফার দিনই হজে আকবারের (মহান হজের) দিন।

বাগবী লিখেছেন, হজে আকবারের দিন হচ্ছে কোরবানীর দিন। ইয়াহইয়া বিন খারাজের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আলী কোরবানীর দিন একটি শাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে জেবানা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন । তখন এক লোক তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে হজে আকবার কোন দিন, তা জানতে চাইলেন। হজরত আলী বললেন, আজকের দিন। তিরমিজি লিখেছেন, হজরত আলী তখন বলেছিলেন, আমিও রসুল স. এর নিকটে হজে আকবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে-ছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবার (মহান হজের দিবস) হচ্ছে কোরবানীর দিবস। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীরের মাধ্যমেও এ রকম বর্ণনা এসেছে। অনুরূপ বর্ণনা এসেছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা এবং হজরত মুগীরা বিন শো'বা থেকেও। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, শা'বী এবং সুদ্দীও এ অভিমতের সমর্থক। হজরত ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, আরাফার দিবসের শেষে পরদিন (কোরবানীর দিন) জুমারাতের নিকটে (শয়তানকে পাথর মারার স্থানে) দাঁড়িয়ে রসুল স. ঘোষণা করেছিলেন, আজ হচ্ছে মহান হজের দিবস।

ইবনে জারীহ্ সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন— হজের সকল দিবসই মহান। অর্থাৎ যে কয়দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়, সে কয়দিনই হচ্ছে মহান হজের দিন। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, হজ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে যে কয়দিন লাগে সে কয়দিনই মহান হজের দিন (ইয়াওমিল হাজ্জিল আকবার)। যেমন ইয়াও মিস সিফফিন (সিফফিনের দিবস), ইয়াও মিল জামাল (জামালের দিবস) ইত্যাদি। এ সকল যুদ্ধ নিশ্চয় একদিনে সম্পন্ন হয়নি। কিছুদিন সময় তো লেগেছিলোই। তবু বলা হয়ে থাকে সিফফিনের (যুদ্ধের) দিন, জামালের (যুদ্ধের) দিন ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্যঃ ১. হাসান বসরীকে ইয়াওমিল হাজ্জিল আকবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন— রসুল স. প্রতিনিধিরূপে হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে হজযাত্রীর একটি দলকে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে তখন মুসলিম, মুশরিক সকলেই হজ সম্পাদন করেছিলো। তাই ওই হজকে বলা হয় মহান হজ। ওই দিন আবার পড়েছিলো ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঈদের দিন।

২. শা'বীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু জর এবং হজরত যোবায়েরের মধ্যে কোনো একজন স্বয়ং রসুল স. কে জুমআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছিলেন। তখন কেউ কেউ বলাবলি করছিলেন এ আয়াত আবার নাজিল হলো কবে? হজরত ওমর তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের জুমআ হয়নি।

ওমরাহ্‌কে বলা হয় গৌণ হজ (হজে আসগর) তাই হজকে বলা হয়েছে মহান বা মুখ্য হজ (হজে আকবার)। এই অভিমতের সমর্থক জুহরী, শা'বী এবং আতা। তাঁরা বলেছেন, পূর্বের আয়াতে যে চার মাসের কথা বলা হয়েছে, সেই চার মাসের ভিত্তি হচ্ছে হজে আকবার। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে আকবারের দিন প্রদত্ত একটি ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। এই ঘোষণার সঙ্গে কথিত চার মাসের কোনো সংযোগ নেই। হজের প্রারম্ভ ও সমাপ্তির কোনো উল্লেখ এখানে নেই। উল্লেখ নেই কোনো মাস অথবা সময়ের।

প্রথম আয়াতের উল্লেখিত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাটি দেয়া হয়েছিলো কেবল ওই সকল মুশরিককে লক্ষ্য করে, যারা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলো। আর আলোচ্য আয়াতের ঘোষণাটি দেয়া হয়েছে সাধারণভাবে। তাই এখানে বলা হয়েছে— ইলান্ নাস (মানুষের প্রতি) যারা চুক্তিবদ্ধ এবং যারা চুক্তিবদ্ধ নয়— তারা সকলে এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া যে সকল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক চুক্তি ভঙ্গ করেনি, তাদের সম্পর্কে অন্যত্র নির্দেশ এসেছে— ফাআতিমমু ইলাইহিম আহাদহুম (কৃত চুক্তি পরিপূর্ণ কর)। এ বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে যে, চার মাস পরিভ্রমণ করার নির্দেশের সঙ্গেও হজে আকবারের কোনো সম্পর্ক নেই। যদি থাকতো তবে, ভ্রমণের সূচনা বা তারিখের কথাও উল্লেখ করা হতো এখানে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই।

আমি বলি, বারাআতুম মিনাল্লাহি ওয়া রসুলিহি (এটা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে) এবং আন্নাল্লহা বারিউম মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রসুলুহু (আল্লাহর সঙ্গে অংশীবাদীদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাঁর রসুলের সঙ্গেও নয়) — এ আয়াত দু'টো কেবল তাবুক যুদ্ধের চুক্তিভঙ্গকারী বিধর্মীদেরকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে, এ রকম বলা যায় না। বরং চুক্তিভূত এবং চুক্তিবহির্ভূত সকল বিধর্মীই ঘোষণা দু'টোর লক্ষ্যস্থল। তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই চার মাস নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ ওই চারমাস আল্লাহ্‌তায়ালা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছেন । তাই, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— 'ফা ইজানসালাখাল আশহুরুল হুরুম (যখন সম্মানিত মাসগুলো অতীত হয়ে যায়) অন্য এক স্থানে এসেছে— মিনহা আরবাআতুন হুরুমুন (তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত)।

জ্ঞাতব্যঃ এই আয়াতে উল্লেখিত 'ওয়া রসুলুহু' কথাটিকে 'ওয়া রসুলিহি' পাঠ করা হতো। ইবনে আবী মালেকার বর্ণনায় এসেছে, এক আরববাসী হজরত ওমরের খেলাফতের সময় মদীনায় এসে বললো, আমাকে আপনারা কেউ আল্লাহ্‌র কালাম শিখিয়ে দিন। মোহাম্মদ বিন খাত্তাব তাকে শিখিয়ে দিলেন সুরা বারাআত এবং আলোচ্য আয়াতের 'রসুলুহু'কে পড়লেন 'রসুলিহি'। এ রকম পড়ার ফলে

অর্থ দাঁড়ালো এ রকম— আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রসুলের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত। এ রকম পাঠ শুনে লোকটি বললো, তাহলে আমিও আল্লাহ্তায়ালার রসুলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এ কথা বলেই সে প্রস্থানোদ্যত হলো। হজরত ওমর তাকে ফিরিয়ে এনে বললেন, তুমি এমন করলে কেনো ? লোকটি বললো, আমি কোরআন শিখতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানকার এক লোক আমাকে একটি আয়াত পড়ালেন এভাবে— 'আন্নাল্লহা বারিউম মিনাল মুশরিকিনা ওয়া রসুলিহি।' তাই আমি বলেছি, আমিও আল্লাহ্তায়ালার রসুলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। হজরত তৎক্ষণাৎ মোহাম্মদ বিন খাত্তাবকে ডেকে এনে নির্দেশ দিলেন, এই লোকটি এখন থেকে তোমাদেরকে কোরআন পড়াবে। আর আবুল আসওয়াদকে ডেকে এনে বললেন, কোরআন লিপিবদ্ধ করার সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করো।

একটি সন্দেহঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, এখানে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষণা করা হলেও অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কাতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান' (মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো)। সুতরাং বুঝতে হবে এ হুকুমটির মাধ্যমে চারমাস যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম হওয়ার নির্দেশনাটি রহিত হয়েছে। এ রকম বলেছেন কাতাদা, আতা খোরাসানী, জুহুরী এবং সুফিয়ান সওরী। তারা তাদের অভিমতের দলিল পেশ করেছেন এভাবে— রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের সময় হাওয়াজেনদের বিরুদ্ধে এবং তায়েফে সাক্বিফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অবরোধ করেছিলেন শাওয়াল মাসে এবং জিলক্বদের কিছু অংশে। অথচ জিলক্বদ ছিলো নিষিদ্ধ ঘোষিত চার মাসের অর্ন্তভূত।

সন্দেহ ভঞ্জনঃ আমি বলি 'ক্বতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান' কথাটি একটি পূর্ণ আয়াতের অংশ বিশেষ। এ রকম আংশিক বাক্য দ্বারা কোনো পূর্ণ আয়াত রহিত হতে পারে না। পূর্ণ আয়াতটি এ রকম— ইন্না ইদ্দাতাস্ শুহুরী ইনদাল্লহি ইছনা আশারা শাহারান ফি কিতাবিল্লাহি ইয়াওমা খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব মিনহা আরবাআতুন হুরুমুন জালিকাদ্দীনুল ক্বায়্যিমু ফালা তাজলিমু ফিহিন্না আংফুসাকুম ওয়া ক্বতিলুল মুশরিকীনা কাফ্ফাতান কামা ইউক্বাতিলুনা কুম কাফ্ফাতান (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের মধ্যে জুলুম কোরো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে)। এই আয়াতটির সকল বাক্য একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর কোনো বিশেষ বাক্য পূর্ণ কোনো আয়াতের রহিতকারী

(নাসেখ) হতে পারে না। এ রকম মনে করাও ঠিক নয় যে, 'কাফ্‌ফাতান' অর্থ মুশরিকদেরকে আওতায় পেলে যখন তখন হত্যা করতে হবে বা যখন তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। বরং 'কাফ্‌ফাতান' কথাটি বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিতবহ।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, একটি একক বর্ণনায় (খবরে আহাদে) রসুল স. কর্তৃক শাওয়াল, জিলক্বদ মাসে তায়েফ অবরোধের কথা এসেছে। কিন্তু এ রকম একক বর্ণনার মাধ্যমে কোরআনের কোনো সুস্পষ্ট হুকুম রহিত হতে পারে না । তাছাড়া সুরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছিলো তায়েফের যুদ্ধের পর। আর রসুল স. তাঁর মহাপ্রস্থানের আশিদিন পূর্বে বিদায় হজের সময় কোরবানীর দিন ঘোষণা করেছিলেন— কালচক্র এখন অতিক্রম করছে পরিপূর্ণতার পথ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় যেমন ছিলো। এক বৎসরে রয়েছে বারোটি মাস। তার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ওই চার মাসের মধ্যে তিনটি মাস পরস্পরলগ্ন— জিলক্বদ, জিলহজ ও মহররম। চতুর্থ মাসটি হচ্ছে— জমাদিউস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস— রজব। হজরত আবী বকরা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম ।

এ রকমও বলা যেতে পারে যে, তায়েফের বনী সাক্বিফের অবরোধটি ছিলো রসুল স.এর একটি বিশেষ মর্যাদার প্রকাশ। যেমন হেরেম শরীফে হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. এর সম্মানে কিছুকালের জন্য এই নিষেধাজ্ঞাটি উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। তাই তিনি মক্কাবিজয়ের পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইসলামের চরমতম কয়েকজন শত্রুকে হেরেম শরীফের সীমানাতেই হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহতায়ালা আসমান ও জমিনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এই শহরকে মহামর্যাদামণ্ডিত করেছেন। এই মর্যাদা অটুট থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এখানে আমার পূর্বে আর কাউকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। অল্পকিছু সময়ের জন্য কেবল আমাকেই আজ এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে। বোখারী ও মুসলিমের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে।

হজরত আবু শোরাইহ্ আদবী থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে— রসুল স. এর এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে কেউ যেনো এ রকম মনে না করেন যে, হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড ঘটানো বৈধ। যে এ রকম মনে করে তাকে বলে দাও— এই অনুমতি ছিলো কেবল রসুল স. এর জন্য, তোমাদের জন্য নয়। আর তাকেও ওই অনুমতি দেয়া হয়েছিলো অল্পকিছু সময়ের জন্য, চিরকালের জন্য নয়। ওই সময়টুকু ব্যতিরেকে পূর্বাপর সকল সময়ে হেরেম শরীফের মর্যাদা চির অটুট।

নেপথ্যের কাহিনীঃ নবম হিজরীর শাওয়াল মাসে সুরা বারাআত অবতীর্ণ হলো। তখন রসুল স. এই সুরা হজযাত্রীদের সমাবেশে পাঠ করার জন্য প্রেরণ করলেন হজরত আলীকে। হজরত জাবের থেকে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নির্বাচন করেছিলেন হজযাত্রীদের নেতা (আমিরে হজ)। হজরত জাবের বলেছেন, আমিও ছিলাম ওই হজযাত্রীদের মধ্যে। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা উরুজ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। অতি প্রত্যুষে মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো— আস্‌সালাতু খয়রুম মিনান্‌ নাউম (নিদ্রা অপেক্ষা নামাজ উত্তম)। আমরা সকলে ঘুম থেকে উঠে নামাজের জন্য প্রস্তুত হলাম। নামাজের জামাত শুরু হতে যাবে, এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম একটি উট আগমনের আওয়াজ। হজরত আবু বকর আর তকবির উচ্চারণ করলেন না। বললেন রসুল স. এর উষ্ট্রীর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় তিনিও হজযাত্রার উদ্দেশে আগমন করেছেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা রসুল স. এর সঙ্গেই নামাজ পাঠ করতে পারবো। উষ্ট্রীটি নিকটবর্তী হতেই সকলে দেখলেন, উষ্ট্রারোহী হয়ে আগমন করছেন হজরত আলী। হজরত আবু বকর বললেন, হে আলী! আপনি কি হজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আগমন করছেন, না দূত হিসেবে । হজরত আলী বললেন, হজযাত্রীদের সমাবেশে সদ্য অবতীর্ণ সুরা বারাআত পাঠ করার দায়িত্ব দিয়ে রসুল স. আমাকে প্রেরণ করেছেন। আমরা নামাজ পাঠ করলাম, এর পর রওয়ানা হলাম মক্কাভিমুখে। মক্কায় পৌঁছে ৭ই জিলহজ হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর ভাষণ দান করলেন। জানিয়ে দিলেন হজের সকল নিয়মকানুন। তাঁর ভাষণ শেষে উঠে দাঁড়ালেন হজরত আলী এবং পাঠ করে শোনালেন সুরা বারাআত।

আরাফা ও মুজদালিফায় হজের অনুষ্ঠানসমূহ শেষ করে আমরা সমবেত হলাম মিনায়। কোরবানীর দিবসে হাজীদের উদ্দেশ্যে পুনরায় ভাষণ দান করলেন হজরত আবু বকর। ওই ভাষণে তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন কোরবানী ও অন্যান্য নির্দেশনা। তাঁর ভাষণ শেষে পুনরায় সুরা বারাআত পাঠ করে শোনালেন হজরত আলী। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হজরত আবু বকর আবার আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন । ওই বক্তৃতায় তিনি শুনিয়ে দিলেন শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের নিয়মাবলী। তাঁর বক্তৃতার পর হজরত আলী পাঠ করলেন সুরা বারাআত।

বাগবী লিখেছেন রসুল স. ওই বৎসর হজরত আবু বকরকে বানিয়েছিলেন আমীরে হজ। পরে তাঁর নিজের উটনীর উপরে আরোহণ করিয়ে হজরত আলীকে পাঠিয়েছিলেন হজ যাত্রীদের সমাবেশে সুরা বারাআত পাঠ করে শোনানোর জন্য। এমতো নির্দেশনাও তাঁকে দিয়েছিলেন যে, মক্কা, মিনা ও আরাফায় মুসলিম

অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে এ কথা জানিয়ে দিবেন, 'এখন থেকে অংশীবাদীদের সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কোনো সম্পর্ক নেই।' যারা মুসলমান নয় তারা এখন থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় কাবাগৃহে তাওয়াফ করতে পারবে না। এখন থেকে আর হজও করতে পারবে না। এই পয়গাম নিয়ে হজ কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলে হজরত আবু বকর ফিরে এলেন রসুল স. এর নিকটে। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সম্পর্কে কি নতুন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে? রসুল স. বললেন, না। তবে আলীকে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে বললাম সুরা বারাআত পাঠ করার জন্য এবং বিধর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা প্রদান করার জন্য। আপন খান্দানের লোকের দ্বারা এ রকম ঘোষণা না দিলে ঘোষণাটি সর্বমহলের আস্থা অর্জন করতে পারবে না। তাই আমি তাঁকে তোমার সঙ্গী করে পাঠালাম। হে আবু বকর! তুমি কি এ কথা ভেবে প্রসন্ন নও যে, তুমি ছিলে আমার সওর পর্বত গুহার একমাত্র সঙ্গী, আবার একান্ত সঙ্গী হবে হাউজে কাউছারের পাশে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার সকল সিদ্ধান্তের প্রতি প্রসন্ন। এরপর হজরত আবু বকরের নেতৃত্বে তাঁর প্রধান সঙ্গী হজরত আলী সহ সকল হজযাত্রী যাত্রা করলেন মক্কার পথে। তখন ছিলো হিজরী সালের সপ্তম বর্ষ। মক্কায় পৌঁছে ৭ই জিলহজ হজরত আবু বকর হজের গুরুত্ব ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে খুত্বা প্রদান করলেন। তখনকার রীতি অনুসারে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও হজ প্রথা পালন করতো। হজরত আবু বকর সকল হাজীকে নিয়ে হজ সম্পাদন করলেন। কোরবানীর দিন মিনায় সমবেত সকল হাজীর সামনে সুরা বারাআত পাঠ করার পর হজরত আলী ঘোষণা করে দিলেন যে, এখন থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিধর্মীদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর এখন থেকে কোনো বিধর্মী তাওয়াফ ও হজ করতে পারবে না।

হজরত জায়েদ বিন তয়েস বর্ণনা করেছেন, আমি তখন হজরত আলীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে কোন কথা প্রচারের জন্যে পাঠানো হয়েছিলো? তিনি বলেছিলেন, চারটি বিষয় প্রচারের জন্য। সে চারটি বিষয় হচ্ছে — ১. এখন থেকে কেউ বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে পারবে না। ২. যারা রসুল স. এর সঙ্গে চুক্তি করেছিলো তাদের চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না। আর যাদের সঙ্গে চুক্তি নেই তাদেরকে সময় দেয়া হবে চারমাস মাত্র। ৩. ইমানদার ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ৪. এই হজের পর মুশরিকেরা আর কখনো হজ করতে পারবে না।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে— হজরত আবু বকর আমাকে হজরত আলীর প্রচারসঙ্গী হিসেবে মিনার ময়দানে এ কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন যে, এখন থেকে কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না, বিবস্ত্র অবস্থায় কেউ

তাওয়াফও করতে পারবে না। হুমাইদ বিন আবদুর রহমানও হজরত আবু হোরায়রা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর রসুল স. হজরত আলীকে তাঁর নিজের উটের পিঠে চড়িয়ে হুকুম দিলেন যে, তুমি সুরা বারাআতের নির্দেশ সকলকে পাঠ করে শোনাবে। সেই নির্দেশানুসারে হজরত আলী কোরবানীর দিন মিনা প্রান্তরে উপস্থিত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, এই হজের পর থেকে কোনো মুশরিক আর কখনো হজ করতে পারবে না, নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফও করতে পারবে না।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ওরওয়া কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবম হিজরীতে রসুল স. হজরত আবু বকরকে প্রদান করলেন আমিরে হজের দায়িত্ব। তাঁর হাতে দিলেন হজের নিয়মকানুন সম্বলিত লিখিত নির্দেশনামা। আর হজরত আলীর হাতে দিলেন সুরা বারাআতের লিখিত আয়াতসমূহ। তাঁকে বললেন, তুমি মক্কা, মিনা, আরাফা এবং হজের অন্যান্য সমাবেশস্থলে এ কথা প্রচার করবে— এ বৎসরের পর মুশরিকদের হজ ও বস্ত্রবিবর্জিত তাওয়াফ নিষিদ্ধ। এ বৎসরের পর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি নিরাপত্তার দায়িত্ব আর নেই। আর যারা চুক্তিবদ্ধ তাদের চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে মাত্র চার মাস। নির্দেশানুসারে হজরত আলী হজের সকল সমাবেশ স্থলে বারাআতুম মিনাল্লহি ওয়া রসুলিহি' এবং 'ইয়া বনী আদামা খুজু জিনাতাকুম ইন্দাকুল্লা মাসজিদিন' — আয়াত সমূহের নির্দেশগুলো শুনিয়ে দেন।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. প্রথমে সুরা বারাআত দিলেন হজরত আবু বকরের হাতে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, না। এই ঘোষণা আমার পরিবার পরিজনভূত কোনো সদস্যের মাধ্যমে হওয়াই সমীচীন। এ কথা বলে তিনি স. সুরা বারাআতের প্রচারের দায়িত্ব প্রদান করলেন হজরত আলীকে। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে — রসুল স. প্রথমে হজরত আবু বকরকে সুরা বারাআত প্রদান করে মক্কাভিমুখে প্রেরণ করলেন। পরে সুরা বারাআতের প্রচারকরূপে প্রেরণ করলেন হজরত আলীকে। হজরত আবু বকরকে বলে পাঠালেন, এ ধরনের ঘোষণা আরবীয় রীতি অনুসারে আপন বংশের লোকের মাধ্যমেই প্রচারিত হওয়া উচিত। নতুবা মানুষ এর উপর আস্থা রাখতে পারবে না। তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত ও উত্তম আখ্যায়িত এবং হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. প্রথমে হজরত আবু বকরকে সুরা বারাআতের বাণীসমূহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে প্রচারক হিসাবে পাঠিয়েছিলেন হজরত আলীকে। হজরত আবু বকর ছিলেন ওই হজ কাফেলার অধিনায়ক এবং হজরত আলী ছিলেন সুরা বারাআতের বিশেষ নির্দেশপ্রাপ্ত প্রচারক। কোরবানীর দিবস সমূহের মধ্যে হজরত

আলী পাঠ করিয়ে শুনিয়েছিলেন — 'আন্নাল্লহা বারিউম্ মিনাল মুশরিকীনা ওয়া রসুলুহু' এবং 'ফাসীহু ফিল আরদ্বি আরবাআ'তা আশহুরীন।' তারপর বলেছিলেন, এই বৎসরের পর থেকে কোনো অংশীবাদী হজ করতে পারবে না, বিবসন অথবা বিবসনা হয়ে কাবা প্রদক্ষিণও কেউ করতে পারবে না। আর বিশ্বাসী ব্যতীত বেহেশ্তেও কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, আমি দেখলাম হজরত আলীর এই ঘোষণা শেষে হজরত আবু বকর উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনিও একই কথা ঘোষণা করলেন।

পরিণামঃ উপরে বর্ণিত 'নেপথ্যের কাহিনী' শিরোনামভূত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. হজরত আবু বকরকে হজের অধিনায়কত্ব থেকে দায়িত্বচ্যুত করেননি। পরে হজরত আলীকে ওই দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন কেবল সুরা বারাআত পাঠের জন্য এবং মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির বিশেষ ঘোষণা প্রদানের জন্য। আরবীয় রীতি অনুসারে এ ধরনের ঘোষণা ঘোষকের বংশদ্ভুত লোকের মাধ্যমে হওয়াই দস্তুর। বংশদ্ভূত নয় এমন কেউ এ ধরনের ঘোষণা দিলে লোকেরা বলতে পারতো চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা অন্য লোকের মাধ্যমে দেয়া হলো কেনো? এ রকম প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত হতে না পারে, তাই রসুল স. হজরত আলীকে নিযুক্ত করেছিলেন চুক্তিভঙ্গ সম্পর্কিত ঘোষণার বিশেষ প্রচারকরূপে। তাই রসুল স. বলেছিলেন— 'লা ইয়ামবাগি লী আহাদিন আঁই ইয়াবলুগা হাজা ইল্লা রজুলুম মিন আহ্লি' (আমার পরিবারভুক্ত নয় এমন কাউকে দিয়ে এটা প্রচার করা সমীচীন নয়)। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ এবং তিরমিজি। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তম।

'নেপথ্যের কাহিনী' শিরোনামে উল্লেখিত বিবরণ সমূহের কিছু অংশ নেয়া হয়েছে মস্নদে আহমদ থেকে এবং কিছু অংশ নেয়া হয়েছে বায়হাকীর দলায়েল সূত্রে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে। অবশিষ্ট অংশ আমরা গ্রহণ করেছি হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে মারদুবিয়ার তাফসীর থেকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যদি তওবা করো তবে তোমাদের কল্যাণ হবে; আর তোমরা যদি মুখ ফেরাও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করতে পারবে না; এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

পরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'তবে অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় ত্রুটি করেনি; এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে; আল্লাহ্ সাবধানীদেরকে পছন্দ করেন।'

এই আয়াতে ওই সকল অংশীবাদীদের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর চুক্তি বিরোধী কোনো কিছু করেনি। এ ধরনের চুক্তিভূতদের মধ্যে ছিলো বনী কেনানার একটি উপগোত্র বনী হামজা।

হজরত আবু বকরের নেতৃত্বাধীন সম্পাদিত হজের সমাবেশে যখন হজরত আলী সাধারণভাবে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির কথা প্রচার করেন, তখন তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ বাকী ছিলো নয় মাস। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কেই এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরপর অন্যান্য মুশরিকদের সম্পর্কে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫, ৬

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ○

❑ অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে অংশীবাদীদিগকে যেখানে পাইবে বধ করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদিগের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ অংশীবাদীদিগের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহের বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে।' এখানে উল্লেখিত 'ইন সালাখা' শব্দটির অর্থ অতিবাহিত হলে। শব্দটি এসেছে 'সালখুন' থেকে। সালখু শ্শাত অর্থ বকরীর চামড়া টেনে নিচে নামানো। ইন সালাখা শব্দটির প্রকৃত অর্থ— কোনো কিছুকে তার আবরণ বা খোলস থেকে বের করে ফেলা।

'আশ্‌হারুল হুরুম' অর্থ নিষিদ্ধ মাস। মুজাহিদ ও ইবনে ইসহাক বলেছেন, এখানে আশ্‌হারুল হুরুম অর্থ চুক্তির মাস, যার মেয়াদ চার মাস। আর যাদের জন্য চুক্তি নেই, তাদের জন্য এর সময়সীমা হচ্ছে— মহররম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত। অর্থাৎ যে তারিখে (কোরবানীর দিন — ১০ই জিলহজ) হজরত আলী সুরা বারাআতের ঘোষণা শুনিয়েছিলেন, সেই তারিখ থেকে মহররম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত— পঞ্চাশ দিন। যে মাসগুলোতে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম করে দিয়েছেন, সেই মাসগুলোকে বলা হয় আশ্‌হারুল হুরুম (নিষিদ্ধ মাস)। মুজাহিদ বলেছেন, দশই জিলহজ থেকে মহররমের শেষ তারিখ পর্যন্ত ধরলে হয় পঞ্চাশ দিন। দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন পুরো হয় না। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে মাসের কথা। পঞ্চাশ দিনের হিসাব ধরলে তো মাস পুরো হয় না (বিশ দিনে তো কোনো মাস হয় না)। তাঁর এমতো বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, দশই জিলহজ ঘোষণা দেয়া হলেও নিষিদ্ধ মাসের গণনা শুরু হবে পিছনের জিলক্বদ মাস থেকে। আর জিলক্বদ থেকে গণনা করলে মাস পূর্ণ না হওয়ার সমস্যা আর থাকে না। নিষিদ্ধ মাসের হিসাব করতে হবে এভাবেই। প্রতি বছরের নিষিদ্ধ মাস হচ্ছে জিলক্বদ, জিলহজ, মহররম এবং রজব।

'হাইছু' অর্থ যেখানে। অধিকাংশ তাফসীরকার লিখেছেন, এ কথার অর্থ— মুশরিকদেরকে হেরেম শরীফের সীমানার ভিতরে অথবা সীমানার বাইরে যেখানেই পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কিন্তু তাঁদের তাফসীর বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত। কেননা রসুল স. বলেছেন, জমিন ও আসমানের সৃষ্টিলগ্ন থেকে আল্লাহ্‌পাক এই শহর (মক্কা) কে হারাম ঘোষণা করেছেন। হারামের এই বিধান বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে এখানে কারো জন্য যুদ্ধ বৈধ করা হয়নি। কেবল আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিলো অল্প কিছুক্ষণের জন্য। রসুল স. এ কথা বলেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর। বিজয়ের পরক্ষণে তিনি তখন ইসলামের কয়েকজন কুখ্যাত শত্রুকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর এ কথার উপর ভিত্তি করে কেউ যদি বলে অন্যদের জন্যেও হেরেম শরীফের সীমানার মধ্যে মুশরিক বধ বৈধ, তবে তা হবে নিতান্ত ভুল। কারণ রসুল স. স্পষ্ট করে বলেছেন, কেবল আমার জন্য এখানে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। এরপর ওই অনুমতি রহিত হয়ে যায়। সুতরাং অন্যদের জন্য এখানে যুদ্ধ করা বৈধ হতে পারে কীভাবে? বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'ইলা ইয়াওমিল কিয়ামাতি' (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। সুতরাং হেরেম শরীফের হুরমত (নিষিদ্ধতা) রহিত হতে পারে না। তাই এখানে 'হাইছু' শব্দের অর্থ হবে হেরেম শরীফের বাইরে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, বধ করবে।

মাসআলাঃ যদি কোনো গর্বিত মুশরিক নিষিদ্ধ মাসের তোয়াক্কা না করে এবং হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু করে দেয় তবে তার গর্বের প্রত্যুত্তররূপে মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

আশ্হারুল হারামু বিশ্শাহরিল হারামী ফাল হুরুমাতু কিসাসু ফামানি'তাদা আলাইকুম ফা'তাদু আলাইহি বিমিছলি মা'তাদা আলাইকুম (সম্মানিত মাসের বিনিময়ে সম্মানিত মাস)। এই মাসআলাটি সুরা বাকারার তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

'ওয়াখুজুহুম' অর্থ— তাদেরকে বন্দী করবে। ওয়াহ্সুরুহুম অর্থ অবরোধ করবে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এ কথার অর্থ যদি মুশরিকেরা কোনো দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, যেনো তারা যুদ্ধ অথবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করে কিংবা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— এমনভাবে অবরোধ সৃষ্টি করো যেনো মুশরিকেরা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে অথবা মুসলিম রাজ্যের সীমানায় নির্বিঘ্নে চলাচল করতে না পারে।

ওয়াক্বউদু লাহুম কুল্লা মারসাদ্ অর্থ— প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। মারসাদ অর্থ ঘাঁটি— এমন স্থানে অবস্থান করা, যে স্থান থেকে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। এ কথার অর্থ— তোমরা শত্রুর চলাচল সম্পর্কে সকল স্থানে সদা সতর্ক থাকবে, যেনো তারা মক্কায় প্রবেশ করতে এবং দেশে ষড়যন্ত্র বিস্তার করতে না পারে।

শেষে বলা হয়েছে— কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। — এ কথার অর্থ 'আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ালু বলে অনুতপ্ত প্রত্যাবর্তন-কারীদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। অতএব, হে বিশ্বাসীবৃন্দ! তোমরা সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনকারী, সালাত প্রতিষ্ঠাকারী এবং জাকাত দানকারীদের পথ ছেড়ে দাঁড়াও।

হাসান ইবনে ফুজাইল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ওই সকল আয়াত রহিত হয়েছে, যে গুলোতে অবিশ্বাসীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ধৈর্য ও মার্জনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে, কারণ তারা অজ্ঞ। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীদের কেউ আশ্রয় প্রার্থী হলে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন, তাঁকে পৌঁছে দেবেন নিরাপদ স্থানে। এভাবে তাকে আল্লাহ্র বাণী শুনবার, বুঝবার এবং হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ প্রদান করবেন। কারণ তারাতো অজ্ঞ। হাসান বলেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এই হুকুমটি বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ

আপনার লোকেরা কোথায়? তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে বাবুল বৃক্ষের নিচে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকেরা! হে সুরা বাকারার অধিকারীরা! ফিরে এসো। হজরত আব্বাসের কণ্ঠ ছিলো অত্যন্ত উচ্চ। তিনি রসুল স. এর এই ঘোষণাটি উচ্চকণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই ঘোষণাটি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক সৈন্যরা অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন— যেমন মায়ের ডাকে শিশুরা ফিরে আসে মায়ের কাছে।

বায়হাকী ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান বিন আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তখন হজরত আব্বাসকে বলেছিলেন, হে আমার পিতৃব্য! হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নিচে যারা বায়াত গ্রহণ করেছে এবং যে সকল মদীনাবাসী আল্লাহ্‌র রসুল ও মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দান করেছে — তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করুন। হজরত আব্বাস বলেন, আমি নির্দেশানুসারে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো সকল আনসার— যেমন উষ্ট্রশাবক ফিরে আসে তার মাতৃক্রোড়ে। সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করলো, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক (আমরা হাজির, আমরা হাজির)। রসুল স. তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য উত্তোলিত হলো অসংখ্য বর্শা। আনসারদের উত্তোলিত সেই বর্শা সমূহ ছিলো কাফেরদের বর্শাগুলোর চেয়ে আরো ভয়ংকর। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবু ইয়ালী এবং তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. সেদিন এক মুঠো ধুসর পাথরকণা হাতে নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন এবং বলেছিলেন, কাবার প্রভুর কসম! এই যুদ্ধে আমাদের বিজয় অনিবার্য। ওই দিন হজরত আলীর যুদ্ধও ছিলো অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক।

হজরত আবু আবদুর রহমান ইয়াজিদ ফেহরী থেকে ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শোয়াইবা, আহমদ, আবু দাউদ, বাগবী প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে তখন মুসলমানেরা পালাতে শুরু করলো। রসুল স. পলায়নপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। এরপর তিনি অবতরণ করলেন তাঁর বাহন থেকে। মিশে গেলেন উপস্থিত সৈন্যদের মধ্যে। তারপর এক মুঠো মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন শত্রুদের দিকে। বললেন, তোমাদের চেহারা বিধ্বস্ত হোক। ইয়ালী বিন আতার বর্ণনায় এসেছে, হুনায়েনে যারা শত্রুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো, তাদের সন্তানেরা বলেছেন, আমরা আমাদের পিতাদেরকে বলতে শুনেছি, আমাদের চোখ মুখ তখন মাটিতে ভরে গিয়েছিলো। আর আমরা তখন শুনতে পেলাম একটি ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো থালায় পতিত হচ্ছে অসংখ্য লোহার টুকরা। এসকল কারণেই আমরা তখন পরাজিত হয়েছিলাম।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে সুদ্দীর 'কবির' গ্রন্থে রয়েছে, ওগুলো ছিলো যোদ্ধা ফেরেশতাদের আওয়াজ। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্পাক হুনায়েনে রসুল স. এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন পাঁচ হাজার নিদর্শনবিশিষ্ট ফেরেশতা। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া, আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখতে পেলাম, আসমান থেকে নেমে আসছে একটি কালো চাদর। চাদরটি পতিত হলো যুদ্ধের ময়দানে। তারপর ওই চাদর থেকে বের হতে শুরু করলো অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা। সমস্ত উপত্যকা ভরে গেলো পিপীলিকায়। আমার তো মনে হলো ওগুলো ফেরেশতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। একটু পরেই দেখলাম শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলো।

ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, আমার নিকট প্রবীণ আনসার সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা ওই দিন আসমান থেকে কালো চাদর পতিত হতে দেখেছি। ওই চাদর থেকে অসংখ্য পিঁপড়া বের হলো। পিঁপড়ায় পিঁপড়ায় ভরে গেলো পুরো এলাকা। আমাদের কাপড়েও পিঁপড়া উঠেছে মনে করে আমরা আমাদের কাপড়ও ঝাড়া দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই অর্জিত হলো বিজয়।

স্বসূত্রে মুসাদ্দাদের বর্ণনায় এবং বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে বারছানের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, আমাকে হুনায়েন যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর পক্ষের এক যোদ্ধা বলেছে, হুনায়েনে মুসলমানেরা আমাদের সামনে ছাগল দোহনের সময় পরিমাণও তিষ্ঠাতে পারেনি। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা পিছু হঠতে শুরু করলো। আমরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। হঠাৎ সামনে দেখলাম খচ্চরের পিঠের উপরে উপবিষ্ট এক সৌম্যকান্তি পুরুষ আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। দেখলাম, তিনি অন্য কেউ নন, রসুল স. স্বয়ং। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. ও আমাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত ছিলো কিছু শাদা শাদা লোক। তারা আমাদেরকে বলতে লাগলো, তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়েছে। ফিরে যাও। ফিরে যাও। আমরা ভয় পেলাম। ফিরে এলাম পিছনের দিকে।

ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত শায়বা ইবনে ওসমান বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে হুনায়েন যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবু মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলাম একারণে যে, কুরায়েশদের উপর হাওয়াজেনদের বিজয় ছিলো আমার নিকট অকল্পনীয়। যুদ্ধের ময়দানে আমি ছিলাম রসুল স. এর কাছাকাছি। হঠাৎ আমি দেখলাম, সুচিত্রিত অশ্বের উপরে আরোহণ করে উপস্থিত হলো কিছু অপরিচিত

লোক। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু অপরিচিত ঘোড় সওয়ারকে। ঘোড়াগুলো চিত্রিত। রসুল স. বললেন, শায়বা এ রকম দৃশ্যতো দেখতে পারে কেবল বিধর্মীরা। এরপর তিনি স. আমার বুকে হাত রেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্‌! শায়বাকে হেদায়েত করো। তিনি এ রকম করলেন তিন বার। আমার মনে হলো, এখন রসুল স. অপেক্ষা অন্য কেউই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় নয়। এরপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের কেউ কেউ শহীদ হলেন। রসুল স. অগ্রসর হলেন সামনের দিকে। হজরত ওমর ও হজরত আব্বাস ধরে ছিলেন তাঁর অশ্বের লাগাম। রসুল স. এর নির্দেশে হজরত আব্বাস উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, হে মুহাজিরবৃন্দ! হে আনসার! হে সুরা বাকারাওয়ালারা! তোমরা কোথায়? রসুল স. স্বয়ং ঘোষণা করলেন, আমি সত্য নবী। এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন পশ্চাদ-পসরণকারীরা। যুদ্ধ শুরু করলো বীর বিক্রমে। রসুলুল্লাহ্‌ স. বললেন, এবার চুল্লি উত্তপ্ত হয়েছে (যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছে)।

মোহাম্মদ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত মালেক বিন আওম বিন হামমান বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনকারী আমাদের গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বলেছে, ওই দিন রসুল স. কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরকণার আঘাত থেকে আমাদের কোনো লোকই রক্ষা পায়নি। পাথরকণাগুলো পড়েছিলো আমাদের চোখে। আর আমাদের বুকের ভিতরেও অনুভূত হচ্ছিলো অবিরল পাথর পড়ার শব্দ। আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো থালার উপরে অঝোর ধারায় প্রস্তর খণ্ড বর্ষণের মতো। আমরা আরো দেখলাম আসমান ও জমিনের মাঝখানে চিত্রিত ঘোড়ার উপরে বসে রয়েছে শাদা বর্ণের অনেক লোক। মাথায় ছিলো তাদের লাল পাগড়ী। তাদের চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। তাদের হস্তধৃত তলোয়ারও ছিলো বিচিত্র ধরনের। তাদের দিকে সরাসরি আমরা তাকাতেও পারছিলাম না। ইবনে আবী হাতেম ও সুদ্দী বলেছেন, ফেরেশতাদের ওই তলোয়ারগুলোর আঘাতেই সেদিন অনেক কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বায্‌যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. তখন নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, ওদেরকে দ্বিখণ্ডিত করো। নির্দেশ প্রদানের সময় তিনি স. ইশারা করেছিলেন তার কণ্ঠনালীর দিকে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন হারেস বলেছেন, বদরের মতো হুনায়েনেও নিহত হয়েছিলো অনেক লোক। তাদের বেশীর ভাগই ছিলো তায়েফবাসী। আর মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন উম্মে আইমানের কন্যা, হজরত আইমান, হজরত সুরাকা বিন হারেস, হজরত ইয়াতিম বিন ছা'লাবা, হজরত ইয়াজিদ বিন জামআ এবং হজরত আবু আমের আশয়ারী।

হজরত মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আ'সা থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, ওই সংকটময় মুহূর্তে হজরত সা'দ বিন উবাদা চিৎকার করে আহ্বান জানালেন খাজরাজ গোত্রকে। আর আউস গোত্রকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর। তাঁদের আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাজরাজ ও আউস গোত্রের লোকেরা ছুটে এলো যুদ্ধের ময়দানে— যে ভাবে মৌমাছিরা ছুটে আসে রাণী মৌমাছির নির্দেশে।

যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেছেন, এরপর মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন মুশরিকদের উপর। শত্রুনিধন করতে করতে তাঁরা পৌঁছে যান তাদের মহিলা ও শিশুদের নিকটে। রসুল স. নির্দেশ করেন, তোমরা মহিলাদের নিকটে গেলে কেনো? মহিলা ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা তো মুশরিকদের সন্তান। রসুল স. বললেন, প্রতিটি শিশু ইসলামের স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান বানায়।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, সক্বিফ গোত্রের এক বৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিষ্ঠাতে না পেরে পলায়ন করলাম। মনে হচ্ছিলো যেনো রসুল স. আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছেন। শেষে তায়েফের একটি দূর্গে আমরা বলপূর্বক ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, এভাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে পরাস্ত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাদের অনেককে হত্যা করেছিলেন এবং বন্দী করেছিলেন তাদের নারী ও শিশুদেরকে। হাওয়াজেনদের অধিনায়ক মালেক বিন আউফও পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফের দুর্গে।

ইবনে ইসহাক, মোহাম্মদ বিন ওমর প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, মালেক বিন আউফ এবং হাওয়াজেন গোত্রের কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফে। আর কিছু লোক আওতাস এলাকার এক স্থানে বানিয়ে নিয়েছিলো তাদের সেনানিবাস। কেউ কেউ আবার চলে গিয়েছিলো নাখলার দিকে। এভাবে যারা পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলো, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়নি। আর হাওয়াজেনদের প্রবীণতম নেতা দুরাইদ বিন উসামাকে হত্যা করেছিলেন হজরত রবীয়া বিন রাফি সালামী।

বাগবী লিখেছেন, আওতাস এলাকায় যারা পরিবার পরিজন ও পশুপাল নিয়ে সেনানিবাস গড়ে তুলেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে রসুল স. একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। ওই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত আবু আমেরকে। তিনি মুশরিকদের সেনানিবাস আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নিহত হয় দুরাইদ বিনিস্ সামাহ সহ আরো অনেকে। সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে দুশমনেরা। বন্দী হয় তাদের

মহিলা ও শিশুরা। মালেক পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফ দুর্গে। অধিনায়ক হজরত আবু আমের ওই দুর্গ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ মুশরিকেরা উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অবশেষে বরণ করে পরাজয়। অধিনায়ক হজরত আবু আমেরও শহীদ হন ওই যুদ্ধে। হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী হতে দেখে মক্কার বহুসংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে যায়। তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ইসলামই আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম। রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সকল সম্পদ একত্রিত করতে বলেন জিয়িররানা নামক স্থানে। তায়েফ বিজয়ের পর রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হন জিয়িররানায়। ইবনে সা'দ এবং উয়ুন রচয়িতা লিখেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে ছিলো ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও বেশী ভেড়া ও বকরী এবং চার হাজার আউকিয়া চাঁদি।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো ছয় হাজার যুবতী ও বয়স্কা মহিলা। আবু সুফিয়ান হরবকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো ওই সকল গণিমতের প্রহরী। বালাযুরী বলেছেন, প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত বুদাইল বিন ওরাকা খাজায়ীকে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত মাসউদ ইবনে ওমর গিফারীকে।

আরবের সকল দুর্গের চেয়ে তায়েফের দুর্গই ছিলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ওই দুর্গের শিখর দৃষ্টিগোচর হতো বহু দুর থেকে। ওই দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করলো সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো। রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেখানে। অবরুদ্ধ বনী সাক্বিফেরা দুর্গের উপর বসিয়ে রাখলো একশত তীরন্দাজ। আগুনের গোলা নিক্ষেপের আয়োজনও তারা করলো। ফলে মুসলমানেরা দুর্গের কাছে ঘেঁষতে পারলেন না। দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেই শুরু হতো তীর নিক্ষেপ ও আগুনের গোলা বর্ষণ। মনে হতো তারা যেনো একটি সংঘবদ্ধ পঙ্গপালের দল। তাদের তীর বর্ষণে আহত হলেন অনেকে। বারোজন পান করলেন শাহাদাতের পেয়ালা। রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করলেন ওই স্থানে, যেখানে সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়ে মসজিদ বানিয়েছিলো। দুর্গ মধ্যে অবস্থান গ্রহণকারী আমর ইবনে উমাইয়া সাক্বাফীও পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার দলকে নির্দেশ দিলেন মুসলমানেরা মল্ল যুদ্ধে আহ্বান করলে তোমরা সাড়া দিয়োনা। যতোদিন ইচ্ছা পড়ে থাকতে দাও তাদেরকে। হজরত খালেদ বিন ওলিদ সম্মুখ সমরের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা কেউ উঁকি দিয়েও দেখলো না। তিনি পুনরায় আহ্বান জানালেন। তবুও তারা নিরুত্তর রইলো। অনেকক্ষণ পরে আবদ অথবা লাইল বলে উঠলো, আমাদের কেউই তোমাদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করবে না। এক বৎসরের পানাহারের ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে। সুতরাং তোমরা এক

বৎসর অপেক্ষা করো। এক বৎসর পর আমরা দুর্গ থেকে বের হয়ে তলোয়ারের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। মুসলিম বাহিনী তীর ছুঁড়তে লাগলো। প্রত্যুত্তরে তারাও শুরু করলো তীর বর্ষণ। কিন্তু কেউ বাইরে এলো না। তাদের তীরে আহত হলেন অনেক মুসলিম যোদ্ধা। কেউ কেউ শহীদও হলেন।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীনেরা বলেছেন, রসুল স. তখন ঘোষণা করলেন, যে ক্রীতদাস দুর্গ থেকে বের হয়ে আসবে তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো দশের অধিক ক্রীতদাস। রসুল স. তাদেরকে স্বাধীন করে দিলেন।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে — রসুল স. সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, পাথর নিক্ষেপক কামান প্রস্তুত করা হোক। তাই করা হলো। ওই কামানের মাধ্যমে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হলো পাথর। কিন্তু এতে করেও তাদেরকে কাবু করা গেলো না। তখন রসুল স. ঘোষণা করে দিলেন দুর্গ থেকে বের হয়ে না এলে তোমাদের খেজুর ও আঙ্গুর বাগানের সবগুলো গাছ কেটে ফেলা হবে। সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে পাঁচটি করে খেজুরের গাছ এবং পাঁচটি করে ফলন্ত আঙ্গুরের গাছ কেটে দাও। তাঁরা নির্দেশ পালন করতে শুরু করলেন। বনী সাক্বিফেরা চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাদের বাগান নষ্ট করছো কেনো? তোমরা যদি বিজয়ী হও তবেতো এগুলোর মালিক হবে তোমরাই। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্মানে তোমরা ওগুলো ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকো। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে, তাই করা হবে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে — অবরোধ চলা কালে একদিন রসুল স. হজরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম মাখন ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমার সামনে হাদিয়া হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম একটি মোরগ এসে পেয়ালাটি উল্টে ফেলে দিলো। হজরত আবু বকর বললেন, আমার মনে হয় আপনি যা কামনা করছেন তা পাবেন না (দুর্গ জয় করা যাবে না)। রসুল স. বললেন, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু প্রথমে আমি এ কথা বুঝতে পারিনি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— তায়েফ অবরোধের পনেরো দিন অতিবাহিত হলো। রসুল স. নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়েলীকে ডেকে বললেন, আমাদের এ অবরোধ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? হজরত নওফেল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! খেঁকশিয়াল গর্তে ঢুকে পড়েছে। আপনি যদি এখানে অবস্থান

করেন তবে এক সময় সে ধরা পড়বেই। যদি আপনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তবুও সে আপনাকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, দুর্গ অবরোধ করে কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে রসুল স. বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্! আগামীকাল আমরা ফিরে যাবো। সাহাবীগণের কেউ এই সিদ্ধান্তটি পছন্দ করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এখন চলে গেলে আমরা বিজয় লাভ করবো কী ভাবে? তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। আমরা চলে যাবো আর একদিন পর। এক দিন সময় হাতে পেয়ে সাহাবীগণ ভাবলেন, এই একদিনের মধ্যেই একটি ফয়সালা করে ফেলতে হবে। তাই পরদিন সকালেই তাঁরা শুরু করলেন প্রচণ্ড যুদ্ধ। অনেকে জখম হলেন, কিন্তু দুর্গ বিজিত হলো না। রসুল স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্! আগামীকাল প্রাতে আমরা এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবো। সিদ্ধান্তটি সকলেই পছন্দ করলেন। এই অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন রসুল স.। সালেহী উল্লেখ করেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ হয়েছিলেন বারোজন মুসলমান।

হজরত ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করলেন, আগামীকাল তোমরা তোমাদের উটগুলোকে চারণভূমির দিকে ছেড়ে দিয়ো না। কাল সকালে প্রত্যাবর্তন করবো আমরা। সিদ্ধান্ত অনুসারে পরদিন সকালে রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন মক্কায়। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত দান করো। যুদ্ধের কঠিন শ্রম থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও (তারা যেনো আমাদেরকে আক্রমণ না করে, আমরাও যেনো তাদের প্রতি সেনাভিযান না চালাই)।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— সাহাবীগণ তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাক্বিফদের তীরন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত পারদর্শী। আপনি তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করুন। তিনি স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ ! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত করো। তাদেরকে ইমানের পথে নিয়ে এসো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তায়েফ অবরোধের সময়সীমা ছিলো তিরিশ রাত্রি অথবা তিরিশ রাত্রির কাছাকাছি। অপর বর্ণনায় এসেছে— বিশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ দিন। কারো কারো মতে দশ দিনের কিছু বেশী। ইবনে হাজাম বলেছেন, এই অভিমতটিই সঠিক। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মুসলিম বাহিনী তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন চল্লিশ দিন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, বর্ণনাটি গরীব (দুর্লভ)। বাগবী লিখেছেন, অবরোধ জারী ছিলো শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে। জিলক্বদ মাস এসে পড়তেই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কারণ যে চার মাস যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, জিলক্বদ তার অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি, এই বক্তব্যটি ইবনে

হাজামের বক্তব্যের অনুরূপ। কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসের বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ এখানে জিলক্বদ মাস সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো জিলক্বদ মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে।

তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে রসুল স. পৌছেছিলেন জিয়িররানায়। সেখান থেকে বেঁধেছিলেন ওমরাহ্‌র ইহ্‌রাম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৭

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

❒ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ হইতে পারেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইউনুছ বিন বকরের মাধ্যমে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি হুনায়েন যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম। হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল আমাদের অধিকারে এলে তারা খুবই বিপদে পড়ে গেলো। তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে রসুল স. যখন জিয়িররানা নামক স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করলো হাওয়াজেনদের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলটি ছিলো চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট। রসুল স. এর দুগ্ধ সম্পর্কীয় পিতৃব্য বুয়াইরকানও ছিলেন ওই দলে। জুহায়ের বিন সরোদ ছিলেন ওই দলের নেতা। পরে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বুয়াইরকান বললেন, আমরা সকলে একই গোষ্ঠির লোক। আপনি জানেন এখন আমরা বিপদগ্রস্ত। আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে দয়া করবেন। জুহায়ের বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! বন্দী রমণীদের মধ্যে আপনার ফুফু ও খালারাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনতো খুবই সুন্দরী। তারা শিশুকালে আপনাকে কোলে নিয়েছে। পানাহার করিয়েছে। আরো অনেক খেদমত করেছে আপনার। ইরাক ও সিরিয়ার সম্রাটের মাধ্যমে যদি আমরা এ রকম মুসিবতে পড়তাম, তবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, আমাদের প্রতি করুণা করা হবে। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো তাদের চেয়ে অনেক মহান ও করুণাপরায়ণ। এরপর তিনি রসুল স. কে কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালেন।

সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জুহায়ের বিন সরোদ জাসামী বলেছেন, রসুল স. হুনায়েনে আমাদের সবকিছু অধিকার করলেন। তারপর সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে। আমি তাঁর নিকট

উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মতো মহান ব্যক্তিত্বের নিকটে আমরা যথাযোগ্য সম্মান ও অনুগ্রহ প্রত্যাশী। এরপর আমি কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালাম। তিনি কবিতা শুনে বললেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আবদুল মুত্তালিবের যে অংশ রয়েছে, সেই অংশ আমি প্রত্যর্পন করতে পারি। কুরায়েশরা বললেন, আমাদের অংশও আল্লাহ্র রসুলের (আমরাও আমাদের অংশ ফিরিয়ে দিলাম)। আনসারগণও একই কথা বললেন। সালেহী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা অত্যন্ত উন্নত মানের। শয্যাশূন্য খাটের মতো। মোকাদ্দেসিও হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও হাদিসটি উত্তম পদবাচ্য হওয়াকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। বোখারী তাঁর সহীহ্ পুস্তকে হজরত মারওয়ান ও হজরত মুছওয়ার বিন মাখরামা থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও মালমাত্তা ফিরে পেতে চাই। রসুল স. বললেন, তোমরা আমার সঙ্গী সাথীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমার নিকটে সত্য কথাই সর্বোত্তম কথা। আমার সাফ সাফ কথা এটাই— তোমরা যে কোনো একটি ফিরিয়ে নাও— পরিবার পরিজন অথবা সম্পদ। হাওয়াজেনরা বললো, আমরা চাই আমাদের পরিবার পরিজনকে। এ কথা শোনার পর রসুল স. দণ্ডায়মান হলেন। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বক্তব্য প্রদান করলেন এভাবে— আম্মা বা'দ — হুনায়েনের মুজাহিদ বৃন্দ ! হাওয়াজেনরা তওবা করেছে । তারা এখন তোমাদের ভ্রাতা। সুতরাং তাদের নিবেদন যারা গ্রাহ্য করবে তাদেরকেই সর্বপ্রথম দেয়া হবে গণিমত। মুজাহিদগণ বললেন, আমরা আনন্দিত চিত্তে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসুল স. বললেন এভাবে সমস্বরে বলে উঠলে আমি বুঝতে পারবো না যে, তোমাদের মধ্যে কে এই সিদ্ধান্তে প্রসন্ন এবং কে প্রসন্ন নয়। সুতরাং তোমরা আপনাপন স্থানে ফিরে যাও। তোমাদের নেতাদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও। সকলে প্রস্থান করলে রসুল স. গোত্রীয় নেতাদেরকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের সকলের নিকট থেকে এ ব্যাপারে মতামত জেনে আসতে বললেন। নেতৃবৃন্দ তাদের লোকজনের মতামত জেনে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সকলেই বন্দীদেরকে তাদের স্বজনদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত।

আবু দাউদ, বায়হাকী ও আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু তোফায়েল বলেছেন, আমি দেখলাম জিয়িররানায় গোশত বণ্টন করছেন রসুল স. (সম্ভবতঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ভেড়া, বকরী ইত্যাদি বণ্টনের কথা বলা হয়েছে

এখানে)। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন এক বেদুইন রমণী। তিনি রসুল স. এর একেবারে কাছে চলে গেলেন। রসুল স. তাঁর উপবেশনের জন্য তাঁর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনিও বসে পড়লেন ওই চাদরের উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? একজন বললেন, ইনি রসুল স. এর দুগ্ধদাত্রী জননী।

আবু দাউদের 'মারাসিল' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ওমর ইবনে সায়েবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে একদিন এলেন— তাঁর দুগ্ধদান সম্পর্কীয় পিতা। রসুল স. তাঁর চাদরের একাংশ বিছিয়ে বসতে দিলেন তাঁকে। তিনিও বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর এলেন তাঁর দুগ্ধদাত্রী মা। তাঁকে বসার জন্য রসুল স. বিছিয়ে দিলেন চাদরের অপরাংশ। এরপর এলেন তাঁর দুগ্ধ-ভ্রাতা। রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বসালেন সামনে।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিতদের অনুসরণের নির্দেশ দিলেন। বললেন, বনী সা'দ গোত্রের ওই লোকটিকে ছেড়ো না। রসুল স. নির্দেশিত ওই লোকটি ছিলো খুনী। সে একজন মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে জ্বালিয়েছিলো। অনুসন্ধানী অশ্বারোহীরা ওই পলাতক খুনীকে বন্দী করতে সমর্থ হয়। তাঁরা রসুল স. এর দুধ বোন সীমাকেও বন্দী করে আনেন। বন্দী হওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। বন্দিনী সীমাকে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, মোহাম্মদ আমি তো তোমার বোন। রসুল স. বললেন, প্রমাণ কি? সীমা তাঁর শরীরের একটি কাটা দাগ দেখালেন। বললেন, এই ক্ষত চিহ্নটি তোমার কারণেই হয়েছে। একদিন পর্বত উপত্যকায় আমাদের পশুগুলো চরাচ্ছিলাম। তখন তুমি ছিলে আমার কোলে। মায়ের দুধ পান নিয়ে বচসা বেঁধেছিলো আমাদের মধ্যে। তখন তুমি আমার এ স্থানটি কেটে দিয়েছিলে। সব কথা মনে পড়ে গেলো রসুল স. এর। বহুদিন পর বোনকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। আনন্দাশ্রু দেখা দিলো তাঁর পবিত্র দু'চোখে। গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে বসো। জানতে চাইলেন পিতা মাতার খবর। সীমা বললেন, তাঁরা তো চলে গিয়েছেন। রসুল স. নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, প্রিয় বোন, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তবে সসম্মানে থাকতে পারবে। আর যদি আপন গোত্রে ফিরে যেতে চাও, তবে যথাযোগ্য মর্যাদায় তোমাকে পৌঁছে দেয়া হবে। সীমা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, আমি আমার আপন আবাসে ফিরে যেতে চাই। রসুল স. তাঁকে দান করলেন তিনজন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। একটি বা দু'টি উট। বললেন, ঠিক আছে। তুমি জিয়িররানায় গিয়েই থাকো। আমি এখন তায়েফে যাচ্ছি। সীমা ফিরে গেলেন জিয়িররানায়। রসুল স. চললেন তায়েফে। তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিয়ির-

রানায় হাজির হলেন তিনি। বোনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এবং তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে দান করলেন আরো কয়েকটি উট ও বকরী। সীমা আবেদন করলেন, প্রিয় ভাই আমার! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও। রসুল স. তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

ইউনুস বিন ওমর সূত্রে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. হাওয়াজেন বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। একটি উটে চড়ে রওয়ানা হলেন তায়েফের দিকে। অনেক লোক অনুসরণ করলো তাঁর এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! গণিমতের সম্পদ থেকে আমাদেরকেও দান করুন। লোকের ভিড়ে রসুল স. যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হন। বাহন থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। প্রার্থীরা তাঁর চাদর নিয়ে নেয়। তিনি স. বলেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন যাঁর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যদি তাহামা অঞ্চলের সকল বৃক্ষের সমান উটও আমার নিকটে থাকে, তবে আমি তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেবো। কোনোই কার্পণ্য করবো না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, আরবের কতিপয় নেতাকে কেবল তাদের মনোরঞ্জনের জন্য হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেয়া হয়েছিলো। রসুল স. সর্বপ্রথম তাদেরকেই গণিমত দান করেছিলেন। কাউকে দিয়েছিলেন একশতটি এবং কাউকে দিয়েছিলেন পঞ্চাশটি করে উট। পঞ্চাশের কমে কাউকে দেননি। সালেহী এ রকম সাতান্ন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট তখন একশ' উট চেয়েছিলাম। তিনি স. আমাকে একশ' উটই দিয়েছিলেন। আমি পুনরায় তাঁর নিকট একশ' উট চাইলাম। তিনিও পুনরায় এক'শ উট দিলেন এবং বললেন, হাকিম, এগুলো হচ্ছে সুমিষ্ট সম্পদ। উদার অন্তরে গ্রহণ করো। বরকত লাভ করবে। লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করলে বরকত পাবে না। যেমন পেটুক ব্যক্তিরা যতই আহার করুক না কেনো, তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম (গ্রহিতা অপেক্ষা দাতা উত্তম)। সুতরাং সবসময় দান করতে চেষ্টা করবে। হাকিম বললেন, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এখন থেকে কারো নিকটে কিছু চেয়ে নিজেকে ছোট করবো না। তাই করেছিলেন তিনি। হজরত ওমর তাঁর খেলাফত কালে হাকিমকে কিছু দিতে চাইলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে লোক সকল! আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি হাকিমকে তাঁর অংশ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। ইবনে আবী জিয়াদের বর্ণনায় এসেছে, হাকিম প্রথম বারের একশ' উট নিয়েছিলেন। পরের একশ' উট তিনি নেননি।

রসুল স. তখন সুহাইল বিন আমরকে দিয়েছিলেন একশ' উট, আবু সুফিয়ান বিন হরবকে দিয়েছিলেন একশ' উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকেও দিয়েছিলেন একশত করে উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, রসুল স. ছিলেন আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়। কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধের পর তিনি আমাকে এতো বেশী দান করলেন যে, তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় না ভাবা আমার পক্ষে হয়েছিলো অসম্ভব। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন সাফওয়ানকে দিয়েছিলেন একশ' উট। এরপর একশ'। তারপর আবার একশ'। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ান রসুল স. এর সঙ্গে চলতে চলতে এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে জমা করা ছিলো অনেক উট, বকরী ও ভেড়া। ওগুলো ছিলো গণিমতের মাল— যা, আল্লাহ্‌পাক যুদ্ধ ব্যতীত রসুল স.কে দান করেছিলেন। সাফওয়ান পশুগুলোকে খুব পছন্দ করলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেগুলোর দিকে। রসুল স. বললেন আবু ওহাব! এগুলো কি তোমার পছন্দ? সাফওয়ান বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, এগুলো সব তোমার। সাফওয়ান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্‌র রসুল। রসুল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ রকম আনন্দিত চিত্তসম্বলিত দান সম্ভব নয়।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেছেন, মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রসুল স. প্রথম দান করেছিলেন একজন পুরুষকে। এরপর অন্যদেরকেও শত শত উট প্রদান করেছিলেন। আব্বাস বিন মুরদাসকে দান করেছিলেন এক শতের কম উট। আব্বাস তখন এই কবিতাটি পাঠ করেছিলেন— আপনি কি আমাকে ওয়াইনা বিন হাসান ফাজারী এবং আকরা বিন হাবাসের সমান্তরাল করে দিতে চান? হাসান ও হাবাস তো কখনো আমার পিতা মুরদাসের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলো না। এই কবিতা শুনে রসুল স. তার উট এক শত পুরো করে দিলেন।

রসুল স. ওসমান বিন ওয়াহাব, আদি বিন কায়েস, উমায়ের বিন ওয়াহাব, আলা বিন জরিয়া, মাখরামা বিন নওফেলকে তাদের মনোতুষ্টির জন্য পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করলেন। এরপর হজরত যায়েদ বিন সাবেতকে নির্দেশ দিলেন, সৈন্যদের সংখ্যা নিরুপণ করো। আর গণিমতের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হও। নির্দেশানুযায়ী সেনা সংখ্যা ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের পর গণিমত বণ্টন শুরু করা হয়। পদাতিকেরা পায় চারটি করে উট এবং চল্লিশটি করে বকরি। অশ্বারোহীদের দেয়া হয় বারোটি করে উট অথবা একশত বিশটি করে বকরি

(অশ্বারোহীরা পায় পদাতিকদের তিনগুণ) একাধিক অশ্বের অধিকারীদেরকে তাদের অতিরিক্ত অশ্বের জন্য কিছুই দেয়া হয় না। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে উট ছিলো চব্বিশ হাজার আর বকরি ছিলো চল্লিশ হাজারের বেশী। একটি উটকে ধরা হয়েছিলো দশটি বকরির সমান। মনোতুষ্টি সাধনার্থে সর্বমোট দেয়া হয়েছিলো চার হাজার উট। তাদের অংশ ধরা হয়েছিলো পঁচিশ শত (খুমুসুল খুমুস), অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী। বরং সমস্ত সম্পদের সাত ভাগের এক ভাগ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে। এমতো অবস্থায় দু'টি অভিমতের একটিকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা হিসেবে থেকে যাবে বৈসাদৃশ্য। আসলে কিছু লোকের মনোতুষ্টির জন্য তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে সমস্ত সম্পদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছিলো প্রথমে। তারপর সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো অবশিষ্ট অংশ। সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার বা ষোল হাজার। কেউ কেউ ছিলেন অশ্বারোহী। পদাতিকদের ভাগে পড়ে চারটি করে উট। আর অশ্বারোহীরা পায় ষোলটি করে। এভাবে হিসাব করলে গণিমতের সর্বমোট উটের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট হাজার। অথচ উটের সংখ্যা ছিলো চব্বিশ হাজার বা আটাশ হাজার। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে অতিরিক্ত উটগুলো কোত্থেকে এলো? এই জটিলতাটি নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ গণিমতের চাঁদিগুলোকেও উটের মাপ কাঠিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন হারেস তায়েমী বলেছেন জনৈক সাহাবী (মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তাঁর নাম হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস) তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো উয়াইনিয়া বিন হাসান এবং আকরা বিন হাবাসকে এক শত করে উট প্রদান করেছেন। কিন্তু জায়িল বিন সুরাকা জামেরীকে দিলেন অনেক কম। তিনি স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ! উয়াইনিয়াও আকরার চেয়ে অনেক উত্তম। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাকে আমি দান করেছি বেশী। আর সুরাকাকে তো আমি ইসলামে সমর্পিত করেই দিয়েছি (তার ইসলাম ও ইমান চির অনড়)।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে সা'লাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের পর কাউকে কাউকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছিলেন। কাউকে দেননি। যাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি তারা মনে করলেন, আল্লাহর রসুল হয়তো আমাদের উপর নারাজ। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে রসুল স. বললেন, ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করার জন্য দুর্বলচিত্ত ইমানদারদেরকে আমি এভাবে উপহার প্রদান করলাম । আর যাদের ইমান মজবুত তাদেরকে আমি কিছুই দেইনি। ওমর ইবনে সা'লাবও রয়েছে তাদের মধ্যে। হজরত ওমর ইবনে সা'লাব বলেছেন, রসুল স. এর এ কথা লাল উটের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা

আমার নিকট অধিকতর প্রিয় মনে হলো। রসুল স. আরো বললেন, আমার প্রিয়জনদের ছেড়ে ওই সকল লোকদেরকে উপহার প্রদান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ কথা ভেবে আমি দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, আমার এহেন উপহার না পেয়ে তারা যদি ধর্মত্যাগ করে জাহান্নামের পথে চলে যায়, তবে কিভাবে তারা সহ্য করবে আল্লাহ্র আযাব। বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইমাম আহমদ— হজরত আনাস বিন মালেক থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ বিন আসেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের গণিমত ইচ্ছে মতো কুরায়েশ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে দান করেছিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাদের প্রত্যেককে রসুল স. দান করেছিলেন একশ'টি করে উট। কিন্তু আনসারদেরকে তিনি কোনো কিছুই দেননি। এতে করে আনসারেরা মনোক্ষুণ্ন হলেন। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে নিরাপদ রাখুন। আশ্চর্য! তিনি কুরায়েশদেরকে সব দিয়ে দিচ্ছেন, আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারীও শত্রুদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বিপর্যয় দেখা দিলে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়। অথচ গণিমত পায় অন্যেরা। আমরা জানি না কোন বিধান অনুসারে এ রকম করা হচ্ছে। যদি আল্লাহ্র নির্দেশে এ রকম করা হয় তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো। আর যদি রসুল স. এর নির্দেশে এ রকম করা হয়ে থাকে তবে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো তাঁর অসন্তোষ থেকে। একজন আনসার বললেন, আমার তো আগেই ধারণা হয়েছিলো, কাজ শেষ হয়ে গেলে অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। আমরা তখন হয়ে পড়বো অপাংক্তেয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আনসারগণের এ রকম কথোপকথনের সংবাদ রসুল স. পর্যন্ত পৌঁছলো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, তখন হজরত ইবনে উবাদা রসুল স,এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আনসারগণ খুবই মনোক্ষুণ্ন। রসুল স. বললেন, কেনো? হজরত সা'দ বললেন আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছেন কেবল আপনার সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে। তাদেরকে কিছুই দেননি। রসুল স. বললেন, এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ? হজরত সা'দ বললেন আমি তো তাদেরই একজন। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ বেষ্টনীর মধ্যে একত্র করো। হজরত সা'দ বাইরে এসে আনসার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করলেন। একে একে উপস্থিত হলেন সকল আনসার। একজন মুহাজির সাহাবীও এলেন। হজরত সা'দ তাঁকেও বসবার অনুমতি দিলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য মুহাজির সাহাবীও ওই

মজলিশে বসবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হজরত সা'দ অনুমতি দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আনসার সাহাবীগণের সমাবেশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। ছিলে নিঃস্ব। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে করেছেন বিত্তশালী। ছিলে পরস্পরের শত্রু। তারপর পারস্পরিক শত্রুতা মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ই তোমা-দেরকে করেছেন একতাবদ্ধ। বলো, আমি ঠিক বলেছি কিনা? আনসারগণ জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন। এ রকম প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। রসুল স. বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা বাস্তবসম্মত কথা বলছো না কেনো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি। রসুল স. বললেন, তোমরা বলতে পারো— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন, আমরা আপনাকে স্বাগতম জানিয়েছি। আপনি ছিলেন সহায়হীন, আমরা আপনাকে দিয়েছি অন্তরঙ্গ আতিথ্য। আপনি ছিলেন শংকাগ্রস্ত। আমরা আপনাকে করেছিলাম শংকামুক্ত। যখন কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি, তখন আমরা হয়েছি আপনার সাহায্যকারী। যখন আপনাকে সকলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তখন আমরাই বিশ্বাস করেছিলাম আপনাকে। আনসারগণ বললেন, আমাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অপার অনুগ্রহ। রসুল স. বললেন, যদি তাই হয়, তবে আমি এ রকম কথা শুনতে পাচ্ছি কেনো? আনসারগণ রইলেন নিরুত্তর। রসুল স. পুনরায় একই প্রশ্ন করে বসলেন। তখন কতিপয় বিজ্ঞ আনসার সাহাবী নিবেদন করলেন, আমাদের কিছু যুবক এ রকম বলেছে। রসুল স. বললেন, আমি এমন লোকদেরকে পুরস্কার প্রদান করেছি যাদের বিশ্বাস এখনো সুদৃঢ় নয়। যারা এখনো অতিক্রম করছে মূর্খতার ক্রান্তিকাল। অপর বর্ণনায় এসেছে এ রকম— আমি কুরায়েশদেরকে উপহার প্রদান করেছি এ জন্যে যে, তারা এখন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বহারা। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিহীনতার জখমের উপরে আমি বুলিয়ে দিচ্ছি সান্ত্বনার প্রলেপ। হে আনসার জনতা! তোমাদের অন্তরে নশ্বর পৃথিবীর সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে কেনো? আমি তো তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসলামের উপর, যে ইসলাম দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৌভাগ্যশালী করেছেন। হে ইসলামের সাহায্যকারী! তোমরা কি এ কথা ভেবে আনন্দিত নও যে, লোকেরা পশুপাল নিয়ে চলে যাবে, আর তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আল্লাহ্‌র রসুলকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা তাদের ঘরে নিয়ে যাবে দুনিয়া, আর তোমরা তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে আল্লাহ্‌র রসুলকে। যার

অলৌকিক হস্তে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! সকল লোক যে পথে চলে সে পথে নয়— আমি চলবো ওই পথে, যে পথের পথিক আনসার সম্প্রদায়। অন্য লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাহ্যিক। আর আনসারদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আন্তরিক। আনসারেরা আমার কলিজা, গোপন সম্পদ। আমি যদি হিজরতকারী না হতাম, তবে অবশ্যই হতাম আনসারদের অন্তর্ভূত। হে আমার আল্লাহ্! আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। এই হৃদয়হারক বক্তৃতা শুনে আনসারগণ কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের জলে ভিজে গেলো তাঁদের শ্মশ্রুসমূহ। তারা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসুলকে পেয়ে পরিতুষ্ট (পৃথিবীর সম্পদ আমরা চাই না)।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, এরপর রসুল স. বাহরাইনের জায়গীর আনসারদের নামে লিখে দিতে চাইলেন। তখনকার বাহরাইন ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি অঞ্চল। আনসারগণ বাহরাইনের জায়গীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দুনিয়া আমরা চাই না। রসুল স. বললেন, আমার পরলোকগমনের পর অন্যেরা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে (অধিকারী হবে সম্পদের ও কর্তৃত্বের)। তোমরা তখন ধৈর্য ধারণ কোরো— যে পর্যন্ত না হাউজে কাওসারের সন্নিকটে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতাগণ লিখেছেন, যুদ্ধশেষে হাওয়াজেনদের প্রতিনিধি দলের নিকট রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, মালেক বিন আউফ কোথায়? তারা বললো, সাকিফ গোত্রের সঙ্গে। তিনি তায়েফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রসুল স. বললেন, তাকে গিয়ে বলো, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আমি তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়ে দিবো। একশত উটও দান করবো। রসুল স. মালেকের পরিবার পরিজনকে তার মক্কাবাসিনী ফুফী উম্মে আবদিল্লা বিনতে উমাইয়ার গৃহে বন্দী করে রেখেছিলেন। রসুল স. এর প্রস্তাব মালেকের নিকট পৌঁছানো হলো। সে বুঝতে পারলো, তার পরিবার পরিজন বিশেষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে মনস্থির করলো, রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হতেই হবে। কিন্তু সে ভাবলো, এ কাজ করতে হবে অত্যন্ত গোপনে। নতুবা আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাকে বন্দী করে ফেলবে। সে তার নির্ভরযোগ্য অনুচরকে ওহানা নামক স্থানে একটি উট প্রস্তুত রাখতে বললো। তারপর গভীর রাতে সকলের অগোচরে দুর্গ থেকে বের হয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে গেলো সেখানে। তারপর সেখান থেকে উষ্ট্রারোহী হয়ে রওনা দিলো জিয়িররানা অথবা মক্কার দিকে। রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলে ফিরিয়ে দেয়া হলো তার পরিবার পরিজন ও সম্পদ। দেয়া হলো একশত উটও। মালেক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বান্তকরণে। পরবর্তী জীবনে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। রসুল স. তাঁকে হাওয়াজেন, সাক্বিফ ও সালমা গোত্র থেকে আগত নওমুসলিমদের নেতৃত্বে

অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ওই অঞ্চলের অন্যান্য নওমুসলিমদেরকেও করে দিয়েছিলেন তাঁর নেতৃত্বের অধীন। এরপর মালেক মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। লুণ্ঠন করেন জংগলে লুকিয়ে রাখা সাক্বিফদের পশুর পাল। প্রতিবাদী আকাদ অঞ্চলের লোকদের করেন হত্যা। যথারীতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দেন রসুল স. এর দরবারে। এভাবে একবার পাঠান একশত উট ও এক হাজার ছাগল ও ভেড়া। তায়েফবাসীদের পশুগুলোকেও ধরে আনেন তিনি। এক দিনেই সেখান থেকে নিয়ে আসেন এক হাজার মেষ ও ছাগল।

ইবনে ইসহাক সূত্রে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরীর রমজান মাসে সাক্বিফ গোত্রের প্রতিনিধিরা রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাবুক যুদ্ধের পরে।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৮

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

❒ হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মস্‌জিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

'নাজাসুন' অর্থ অপবিত্র। শব্দটির উৎসরণ ঘটেছে সামেয়া ও কারুমা রীতি অনুসারে। তাই শব্দটি একবচন বোধক, বহুবচন বোধক নয়। আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিকে ধাতু বা শব্দমূল যেমন বলা যাবে না, তেমনি শব্দমূল নয়— এ রকমও বলা যাবে না। এখানে বিধেয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উদ্দেশ্য। বিধেয় হওয়ার কারণেই শব্দটি এখানে মূল ধাতুরূপে গণ্য। এখানে বলা হয়েছে, আল মুশরিকুনা নাজাসুন (অংশীবাদীরা তো অপবিত্র)। এ রকম বক্তব্যভঙ্গির কারণে প্রমাণিত হয় যে, অংশীবাদীরা প্রকৃত অর্থেই অপবিত্র। অর্থাৎ তাদেরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে হাত নাপাক হয়ে যাবে। তারা নাপাকী বহনকারী বা অপবিত্রতাবাহী— এ রকমও বলা যেতে পারে।

'নাজাসুন', 'নিজসুন', 'নাজিসুন', 'নাজুসুন'— শব্দগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, 'নাজাস' বলা হয় ওই সকল বস্তুকে, যেগুলোকে একজন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি অপবিত্রতা বলে থাকে। যেমন— মল, মূত্র,

বীর্য, রক্ত ইত্যাদি। এগুলো প্রকৃত অর্থেই নাপাক। শরিয়তও এগুলোকে নাপাক বলেছে। এগুলোর নাপাকি অবশ্যই বাহ্যিক। এগুলোকে মুমিন, মুশরিক সকলেই নাপাক বলে থাকে। কিন্তু এখানে মুশরিকদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে এ সকল কারণে নয়। তাদের নাপাকি অস্তিত্বজ ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নাপাকি থেকে যেমন মুক্ত থাকা আবশ্যক, তেমনি অভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকেও মুক্ত থাকা অপরিহার্য। অতএব, অংশীবাদীদের স্পর্শ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে একত্রবাস বৈধ নয়। বসতবাটিও নির্মাণ করা সমীচীন নয় তাদের বসতবাটির সঙ্গে।

হজরত আবু উবায়দা এবং জুহাক বলেছেন, এখানে নাজাসাত অর্থ নাজাসাতে গলিজা (গুরু অপবিত্রতা), নাজাসাতে খফিফা (লঘু অপবিত্রতা) নয়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এখানে শারীরিক অপবিত্রতার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত (হুকুমী) অপবিত্রতার কথা। কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকেই এখানে অংশীবাদীদেরকে কেবল হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অপবিত্র'।

কাতাদা বলেছেন, কাফেরেরা এ কারণে অপবিত্র যে, তারা ওজু ও রতিকর্ম পরবর্তী গোসল কিংবা বীর্যস্খলন পরবর্তী গোসল করে না। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরা কুকুরের মতো অপবিত্র। কুকুরের দেহ যেমন নাপাক, তেমনি মুশরিকদের শরীরও নাপাক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে করমর্দন করলে ওজু করে নিয়ো। অথবা নির্দেশ করেছেন, হাত ধুয়ে নিয়ো। এই বিবরণটি আলেমগণের ঐকমত্যবিরোধী— তাই অগ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।' হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, এ কথার অর্থ— এ বছরের পর থেকে মুশরিকেরা যেনো হজ ও ওমরা না করে। এই নির্দেশনাটির মাধ্যমে মসজিদুল হারামে তাদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই অন্যান্য মসজিদে তাদের প্রবেশ অসিদ্ধ নয়। 'নিকটে না আসে' কথাটির অর্থ এখানে— তারা যেনো মসজিদুল হারামের সন্নিকটে এসে হজ ও ওমরা না করে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'নিকটে না আসে' বলে এখানে অংশীবাদীদের হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মসজিদের নিকটে চলে আসা। এখানকার

বাকভঙ্গিটি অন্য একটি আয়াতের মতো, যেখানে বলা হয়েছে— 'সুবহানাল্লাজী আস্‌রা বি আ'বদিহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা' (পবিত্র সেই আল্লাহ্‌, যিনি রাতে তাঁর আপনতম বান্দাকে ভ্রমণ করান মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়)। আয়াতটি রসুল স. এর মেরাজ সম্পর্কিত। মেরাজের রাতে রসুল স.কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো হজরত উম্মে হানির ঘর থেকে। মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) থেকে নয়। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে— মসজিদুল হারাম থেকে। সুতরাং আলোচ্য নির্দেশনাটির অর্থ হবে— মুশরিকেরা যেনো হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ না করে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, ১. জিম্মী (কর প্রদাতা), বিদ্রোহী, সন্ধিবদ্ধ— সকল প্রকার মুশরিকদের জন্য হেরেম শরীফের সীমানায় অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। আমিরুল মু'মিনীন (ইমানদারদের নেতা) হেরেম শরীফে অবস্থানের সময় যদি কাফের সাম্রাজ্যের কোনো দূত আগমন করে, তবে তাকে হেরেমে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না। আমিরুল মু'মিনীন তাঁর প্রতিনিধিকে হেরেমের বাইরে পাঠিয়ে দূতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন।

২. হেরেম শরীফের বাইরে হেজাজের অন্যান্য অঞ্চলে কার্যোপলক্ষে কাফেরেরা আগমন করতে পারবে তবে তিন দিনের বেশী অবস্থান করতে পারবে না। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর জীবনে সময় পেলে আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবো। মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ এখানে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু রসুল স. তাঁর এই ইচ্ছাটির বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে খলিফা হজরত আবু বকরও একাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। হজরত ওমরের খেলাফতকালে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবরূপ নিয়েছিলো। হজরত ওমর সকল অমুসলিমকে বের করে দিয়েছিলেন জাজিরাতুল আরব থেকে। অবশ্য বাণিজ্য ব্যাপদেশে অমুসলিম ব্যবসায়ীরা হেজাজে আসা যাওয়া করতে পারতো। কিন্তু তিন দিনের বেশী তাদেরকে থাকতে দেয়া হতো না। জাজিরাতুল আরবের সীমানা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে এডেন বন্দর থেকে ইরাকের শস্যভূমি পর্যন্ত। আর প্রস্থে জেদ্দার সাগরোপকূল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত।

৩. অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের জিম্মিরাও মুসলমানদের অনুমতি ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে কাবা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। বলেছেন, বিধর্মীদের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। মালেকী মতাবলম্বীগণ ও মাজানীর অভিমত হচ্ছে, হেরেম শরীফে বিধর্মীদের প্রবেশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যান্য মসজিদেও তাদের প্রবেশ নাজায়েয। ইমাম বোখারী মসজিদে বিধর্মীদের প্রবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ওই অধ্যায়ে হজরত আবু হোরায়রা

কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. কতিপয় অশ্বারোহী যোদ্ধাকে প্রেরণ করলেন নজদের দিকে। তাঁরা সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলেন বনু হানুফার সুমামা বিন আম্‌সাল নামের এক লোককে। তাকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুরা আন্‌ফালের তাফসীরে এই ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে বিধর্মীদের মসজিদে প্রবেশ বৈধ প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আর মসজিদে বিধর্মীদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর, নবম হিজরীতে।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, আহলে কিতাবকে (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে) বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদুল হারামে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার এই মতকে খণ্ডন করেছেন। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, সুমামাকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখার হাদিসটি উল্লেখিত অভিমতের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। কারণ সুমামা আহলে কিতাব ছিলো না।

বায়যাবী এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামের শাখা-প্রশাখাগত নির্দেশ অমান্যকারীরাও কাফের। তাই তাদেরকে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বায়যাবীর এ অভিমতটি ভুল। কারণ আয়াতে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের প্রতি। মুসলমানদের প্রতি নয়। ইমানদারদেরকে সম্বোধন করে কেবল জানিয়ে দেয়া হয়েছে নির্দেশনাটি। তাই শুরুতে বলা হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজীনা আমানু (হে বিশ্বাসীগণ)।

উল্লেখ্য যে, নির্দেশটি শাখা-প্রশাখাগত হলে হজও হয়ে পড়বে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়। তখন মূল বিষয় হবে কেবল তৌহিদ (এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস) এবং রেসালত (রসুলে বিশ্বাস)। কিন্তু ব্যাপারটি সেরকম নয়। হজ ইসলামের মূল বিষয়ের অন্তর্ভূত। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের হজ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ রকম বললে আবার সৃষ্টি হয় বৈপরীত্য। আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ প্রতিপালনের মধ্যে রয়েছে সওয়াব বা পুণ্য প্রাপ্তির সুযোগ। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভালো কাজের জন্য সওয়াব দেয়া হয় না। কারণ সওয়াব ধারণের মূল পাত্র ইমানই তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর, আবু শায়েখ এবং হজরত ইকরামা থেকে আতিয়া আউফি, জুহাক, কাতাদা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, বিধর্মী ব্যবসায়ীরা হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানেরা পড়ে যান সংকটে। তাঁরা বলাবলি করতে থাকেন, এখন আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাবো কেমন করে? তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের শেষ অংশ এভাবে— 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভর করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। বলে দেয়া হয়েছে— মানুষ বিত্তাধিকারী হতে পারে কেবল আল্লাহ্তায়ালার অনুকূল ইচ্ছায়। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। বিধর্মীদের ও বিশ্বাসীদের ধ্যান ধারণা, কথাবার্তা সবকিছুই তাঁর অসীম জ্ঞানের অধীন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। বিত্তাধিকারী ও বিত্তহীন করা না করার মধ্যে রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন। অতএব, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা শুভ পরিণামের অপেক্ষা করো। সমর্পিত হও কেবল আল্লাহ্র প্রতি— যিনি সকলের অভাব মোচনকারী।

হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে যে অচিরেই বিত্তশালী করবেন— তার সংবাদ দেয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ্তায়ালা প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন। এরপর থেকে আরব অঞ্চলেই শুরু হলো ফল ও ফসলের আবাদ। মুকাতিল বলেছেন, জেদ্দা, সানাআ ও জরশবাসীরা মুসলমান হয়ে গেলো। সেখানকার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতে শুরু করলো প্রয়োজনীয় পণ্য। ফলে মক্কাবাসীদের আর কোনো অসুবিধা রইলো না।

জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন'— কথাটিতে এমতো ইঙ্গিত রয়েছে যে— অচিরেই বিজিত দেশ সমূহ থেকে আসতে থাকবে বিপুল জিযিয়া। তাই হলো। আসতে শুরু করলো বিপুল পরিমাণ জিযিয়া। আর ওই জিযিয়ার অংশ পেয়ে মুসলমানেরা হয়ে গেলেন বিত্তশালী।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৯

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

❐ যাহাদিগের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতে রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই রসুল স. এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তাবুক গমন করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।' এখানে 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস তাদের নেই।

একটি সন্দেহঃ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তো আল্লাহ্কে ও আখেরাতকে মানে। তবুও তাদেরকে এখানে এভাবে অবিশ্বাসী বলা হলো কেনো?

সন্দেহ ভঞ্জনঃ আল্লাহ্র প্রতি যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সেভাবে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে তাদের মনগড়া নিয়মে। এ রকম বিশ্বাস আল্লাহ্পাকের নিকট গ্রহণীয় নয়। যেমন— আল্লাহ্পাক চির অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সন্তান অথবা পিতা নন। অথচ ইহুদীরা হজরত উযায়েরকে এবং খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র বলে। যারা এ রকম বলে, তাদের 'ইমান' বলে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? আখেরাতের প্রতিও তাদের সঠিক বিশ্বাস নেই। তারা মনে করে, জান্নাত তাদের জন্য অবধারিত। ইহুদীরা বলে, তারা দোজখে গমন করলেও সেখানে তারা অবস্থান করবে অল্প কয়েকদিন মাত্র। তারা আরো বলে, জান্নাত দুনিয়ার মতোই। দুনিয়ার মতোই সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। আখেরাত সম্পর্কে এ রকম ধারণা যারা রাখে তাদেরকে কি বিশ্বাসী বলা যায়? উল্লেখ্য যে, মোতাজিলারাও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা ও তাঁর রসুল মোহাম্মদ স. যে সকল বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেন, সেগুলোকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা হারাম বলে মান্য করে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রসুল' বলে মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে তাদের আপনাপন রসুলকে। অর্থাৎ হজরত মুসা ও হজরত ঈসাকে। তাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শেষ রসুল মোহাম্মদ স. আবির্ভূত হলে তাঁর অনুসারী হতে হবে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ লংঘন করেছে। তাঁর অনুসরণ তো করেইনি, বরং করে চলেছে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধাচরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না।' কাতাদা বলেছেন, এখানে 'দ্বীনুল হাক্ব' (সত্য দ্বীন) কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র দ্বীন। কেউ কেউ বলেছেন দ্বীন ইসলাম। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না' বলে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যারা সত্যধর্মের অনুসারী, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি অনুগত নয়।

শেষে বলা হয়েছে 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।'

'জিযিয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিনিময় বা বদলা। শব্দটির শেষ অক্ষর 'তা' প্রতিদান প্রকাশক। 'জিযিয়া' হচ্ছে অপদস্থতার নিদর্শন। ওই সকল লোককে জিযিয়া কর দিতে হবে, যাদেরকে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ জিযিয়া প্রদাতা নির্ধারণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'জাযা দাইনাহু' থেকে, যার অর্থ— সে তার ঋণ পরিশোধ করেছে। এখানে আঁইয়্যাদিঁউ অর্থ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। 'ইয়াদ' অর্থ হাত। এখানে অর্থ আনুগত্যের হাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। অন্যের মাধ্যমে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জিম্মীরা (কর প্রদাতা অবিশ্বাসীরা) নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। অন্য কাউকে মাধ্যম নিযুক্ত করতে পারবে না। এ রকমও হতে পারে যে, 'আন ইয়াদিন' কথাটির অর্থ এখানে— অপদস্থতার সঙ্গে জিযিয়া পরিশোধ করা। আবু উবায়দা বলেছেন, কাফেরদেরকে জিযিয়া দিতে হবে বাধ্যতার বিস্বাদ ও ভয়ের অনুভূতির সঙ্গে। এভাবে বাধ্যতামূলক দেয়কে আরববাসীরা প্রকাশ করে এভাবে— ফুলানুন আয়্'তা আন ইয়াদিন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আন ইয়াদিন' অর্থ নগদ প্রদান করা। বাকী না রাখা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— কৃতজ্ঞচিত্ততার নিদর্শনরূপে জিযিয়া দেয়া। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করতে হবে এ রকম মনোভাব নিয়ে যে 'মুসলমানেরা অতি মহৎ— তাই দয়া করে জিযিয়া গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'সগিরুন' অর্থ নত হয়ে, অপমানিত ও পরাজিত হয়ে। হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— জিযিয়া গ্রহণকারী থাকবে উপবিষ্ট অবস্থায়। আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের স্কন্ধদেশ পদদলিত করে আদায় করতে হবে জিযিয়া। কালাবী বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণকালে তাদের ঘাড়ে মুষ্টাঘাত করে প্রাপ্তি স্বীকারের কথা জানিয়ে দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণের সময় তাদের দাড়ি ধরে তাদেরকে চড় থাপ্পড়ও মারা যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের জামার গলার কাছে ধরে বলপূর্বক তাদেরকে তাদের সঞ্চয়স্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিধর্মীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করার অর্থই তাদেরকে অপদস্থ করা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জিম্মীদেরকে ইসলামের বিধানের আওতায় আনার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে পরাভূত করা।

আলোচ্য আয়াতে কেবল আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিধর্মীর কথা এখানে বলা হয়নি। তাই হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় অন্যান্য বিধর্মীদের রাজ্য জয় করার পর তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি। কিন্তু হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, রসুলুল্লাহ্ স. অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করতে বলেছেন, তখন হজরত ওমর অন্যান্য বিধর্মীদের উপরেও জিযিয়া নির্ধারণ করলেন। বোখারী এই বর্ণনাটি এনেছেন বাজালাহ্ বিন ইবাদ থেকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বাজালাহ্ বর্ণনাকারী হিসেবে অপরিচিত। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের 'জিযিয়া' অধ্যায়ে লিখেছেন, তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধ পদবাচ্য। এ কারণে অগ্নিউপাসকদের উপর জিযিয়া নির্ধারণের ব্যাপারটি ঐকমত্যসম্মত।

মতপার্থক্যঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরব অনারব— সকল ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। অনারব মুশরিকদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে— তারা অগ্নিপূজক হোক অথবা মূর্তিপূজক। মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, আরববাসীদের নিকট থেকে পুরোপুরি জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক— যেই হোক না কেনো। জিযিয়া আদায় করতে হবে কেবল অনারব আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আওজায়ী বলেছেন, আরব অনারব— সকল স্থানের কাফেরদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। তবে মুরতাদ এবং কুরায়েশ মুশরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যক্তির উপর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। জিযিয়া আরোপ করতে হবে বিধর্মীদের দলের উপর। তাই জিযিয়া আদায় করতে হবে আরব ও অনারব ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে। মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ জিযিয়া আদায় করা যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ীর নিকটে অগ্নিপূজারীরাও আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁর আল-উমে লিখেছেন, জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর একবার বললেন, আমি জানি না অগ্নিপূজারীদের ব্যাপারে আমার কি করা উচিত। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আহলে কিতাবেরা যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেনো (তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমার নিকট নসর বিন আসেমের একটি বর্ণনা সাঈদ বিন মারজুবানের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান। ওই বর্ণনায় এসেছে, ফারওয়াহ্ বিন নওফেল বললেন, অগ্নিপূজারীর নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হবে কিসের ভিত্তিতে? তারা তো আহলে কিতাব নয়। এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন

মাসতুরাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ফারওয়ার জামার গলদেশ পেঁচিয়ে ধরে হুংকার ছেড়ে বললেন, রে আল্লাহ্‌র দুশমন! কীভাবে তুই হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত আলীর প্রতি দোষারোপ করতে পারলি! তাঁরা তো অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। এরপর মাসতুরাদ গেলেন খলিফার গৃহে। হজরত আলী তখন বললেন, আহা! আমি তো অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্যেও ধর্মের জ্ঞান ও কিতাব ছিলো। তারা তা শিক্ষা করতো ও অন্যকে শিক্ষা দিতো। একবার তাদের রাজা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়িয়ে ধরলো তার মা অথবা কন্যাকে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো। তাদের আলেম সম্প্রদায় বললো, কিতাবের বিধান অনুসারে রাজাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাজা তখন জনসাধারণকে একত্র করে বললো, প্রথম নবী হজরত আদমের চেয়ে উত্তম ধর্ম আর কার হতে পারে? তিনি তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই অনুসারী। তোমাদেরও উচিত হজরত আদমের ধর্মমতের অনুসারী হওয়া। জনসাধারণ রাজার বিধানকেই মেনে নিলো। রাজার বিরুদ্ধবাদীদেরকে করা হলো হত্যা। এক রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো তাদের আলেম সম্প্রদায়। তাই অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। রসুল স. স্বয়ং, হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। হাদিসটি ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আত্‌তাহকিক' গ্রন্থে। কিন্তু সাঈদ বিন মারজুবানের বিরূপ সমালোচনাও সেখানে করা হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবানের বর্ণনাকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি না। ইয়াহ্‌ইয়া বিন কাত্তান বলেছেন, ওই লোকটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার বর্ণনা লিপিবদ্ধযোগ্যও নয়। কাল্লাস বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবান পরিত্যক্ত। কিন্তু আবু উসামা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু জারআ বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, কিন্তু মুদলাস (প্রবঞ্চক)।

আমি বলি, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে রয়েছে, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়ার মাধ্যমে নজর বিন আসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছেন। আর আমি অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভালো জানি। তারা ছিলো আহলে কিতাব। তারা কিতাব পড়তো এবং শরিয়ত সম্পর্কে শিক্ষাও দিতো। কিন্তু তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে ইলমে ইলাহী উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। ইমাম আবু ইউসুফ নসর বিন খলিফা সূত্রে আরো লিখেছেন, ফারওয়াহ্‌ বিন নওফেল আশজায়ী একবার বললেন, অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়েছিলো— এ কথাটি মেনে নেয়া কঠিন। কারণ

তারা আহলে কিতাব ছিলো না। এ কথা শুনে মাসতুর বিন আহনাফ রাগের চোটে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই রসুল স. এর সিদ্ধান্ত নিয়ে রসিকতা করেছিস। এক্ষুণি তওবা কর। নয়তো আমি তোকে হত্যা করবো। রসুল স. তওবাজারে বসবাসকারী অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকে কর আদায় করেছেন। শেষে দু'জনে বিষয়টি ফয়সালার জন্য উপনীত হলেন হজরত আলীর নিকটে। হজরত আলী বললেন, আমি অগ্নিউপাসকদের সম্পর্কে এমন একটি কথা বলবো, যা তোমাদের দু'জনেরই পছন্দ হবে। অগ্নিউপাসকেরা আসলে আহলে কিতাব। তাদের কাছে একটি আসমানী কিতাব ছিলো। তারা ওই কিতাবটি পাঠ করতো। তাদের এক রাজা ছিলো ঘোর মদ্যপ। সে একদিন মাতাল অবস্থায় তার নিজের বোনকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলো এবং কামরিপু চরিতার্থ করলো তার সাথে। চারজন লোক অনুসরণ করেছিলো তাদের। তারা ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখলো। যখন নেশা কেটে গেলো, তখন তার বোন তাকে বললো, চারজন লোকের সামনে তুমি এ রকম অপকর্ম করলে! এখন তো শরিয়তের আইনে তোমাকে হত্যা করা হবে। রাজা বললো, তাইতো। আমার যে কিছুই খেয়াল ছিলো না। তার বোন বললো, এখন আমার কথা যদি শোনো, তবেই কেবল তুমি শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। রাজা বললো, বলো, অবশ্যই আমি তোমার কথা মান্য করবো। তার বোন বললো, তুমি যা করলে সেটাকেই ধর্মীয় বিধানরূপে প্রচার করো। জনসাধারণকে ডেকে বলে দাও, এটাই আদমের ধর্মাদর্শ। হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আদম থেকে। এই হিসেবে হাওয়া ছিলো আদমের কন্যা। অথচ দু'জনে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। প্রথম নবীর এই ধর্মাদর্শ আমাদের জন্য মান্য করা অত্যাবশ্যক। এই ঘোষণা দেয়ার পর যারা তোমার কথা মানবে তাদেরকে অব্যাহতি দিবে। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলবে। রাজা তার বোনের কথামতো কাজ করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে অনেকেই রাজার এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলো না। কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। বিদ্রোহীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলো রাজা। কিন্তু জনবিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। তার বোন বললো— জনতা এখনো ভীতসন্ত্রস্ত নয়। সুতরাং তুমি এবার ঘোষণা করে দাও, আমার বিধান যে মানবে না তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তাই করলো রাজা। নির্মাণ করলো বিশাল অগ্নিকুণ্ড। ঘোষণা করে দিলো— যারা আমার ধর্মমতকে মানবে না তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে এই অগ্নিকুণ্ডে। এবার ভীত হলো লোকেরা। মেনে নিলো রাজার বিধান। এই ঘটনাটি বর্ণনার পর হজরত আলী বললেন, এবার বুঝলে তো, অগ্নিউপাসকেরা ছিলো আহলে কিতাব। তাই রসুল স. তাদের নিকট থেকে কর আদায় করেছিলেন। অবশ্য পরে তারা মুশরিক হয়ে যায়। তাই তাদের সঙ্গে বিবাহ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ইবনে জাওজী তাঁর আত্ তাহ্কিক গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পারস্যবাসীদের পয়গম্বর যখন পরলোকগমন করলেন, তখন ইবলিস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো অগ্নিউপাসনার দিকে।

উত্তরঃ রসুল স. বলেছেন, অগ্নিপূজারী ও আহলে কিতাব এর সাথে একই ব্যবহার কোরো। এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আহলে কিতাবদের সঙ্গে যা করা যাবে, তা অগ্নি-উপাসকদের সঙ্গেও করা যাবে। ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, অগ্নিউপাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণও নিষিদ্ধ। হাদিসের উদ্দেশ্য শুধু এতোটুকুই যে, আহলে কিতাবের মতো অগ্নি-উপাসকদের উপরেও করারোপ সিদ্ধ। আর হাদিসের মাধ্যমে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, অগ্নিউপাসকদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো আহলে কিতাব। তারা আল্লাহ্পাকের কিতাব পড়তো এবং প্রচার করতো। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র দ্বীন পরিত্যাগ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো কিতাবের বিধান থেকে, তখন এলেম উঠিয়ে নেয়া হলো তাদের হৃদয় থেকে। ইবলিস তখন তাদেরকে বানিয়ে ফেললো অগ্নিউপাসক। তখন থেকে তারা আর আহলে কিতাব নয়। তাই আলেমগণ বলেছেন, তারা আহলে কিতাব নয়। তবে ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় এসেছে, তারাও আহলে কিতাব। আবার অপর বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত জমহুরের অনুকূলে। সে অভিমতটি হচ্ছে— অগ্নিউপাসকেরা আহলে কিতাব নয়।

আমি বলি, যদি অগ্নিপূজারীদের পূর্বপুরুষ আহলে কিতাব হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে আহলে কিতাব না বলার কোনো কারণ নেই। আর এ রকম হলে আমাদের দেশের হিন্দু মূর্তিপূজকদেরকেও আহলে কিতাব বলা যেতে পারে। কারণ তাদের কাছে রয়েছে বেদ নামক একটি কিতাব। ওই কিতাবে রয়েছে চারটি পর্ব। একত্রে সেগুলোকে বলা হয় চতুর্বেদ। ওই বেদসমূহের অনেক বিধান শরিয়তের বিধানের অনুরূপ। সেগুলোতে বর্ণনাবৈসাদৃশ্য অবশ্য রয়েছে। আর সেগুলো নিশ্চয় ঘটেছে শয়তানের প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। শয়তানের কারসাজির ফলে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে তিয়াত্তরটি ফেরকা। হিন্দুরা যে আহলে কিতাব, তার প্রমাণ কোরআন মজীদেও রয়েছে। যেমন, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— ওয়া ইম্‌মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাজিরুন (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো পয়গম্বর অবশ্যই প্রেরণ করেছি)। অগ্নি-উপাসকদেরকে আহলে কিতাব বললে হিন্দুদেরকে আরো বেশী আহলে কিতাব বলতে হয়। অগ্নিউপাসকদের রাজা মাতাল অবস্থায় তার বোনের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলো। বিধান দিয়েছিলো আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধে। হজরত আদমের নামে প্রচার করেছিলো তার বিকৃত মতবাদ। কিন্তু হিন্দুরা তেমন কিছু করেনি। অবশ্য

তারা রসুল স. এর রেসালত অস্বীকার করার কারণে কাফের। আমার নিকট এ রকম সংবাদ পৌঁছেছে যে চতুর্বেদের মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর আবির্ভাবের শুভসংবাদ। ওই শুভসংবাদ পাঠ করেই কোনো কোনো হিন্দু মুসলমান হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মূর্তিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না— ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতের সমর্থনে এই আয়াতটি উপস্থাপন করা হয়েছে— কাতিলুহুম হাত্তা লাতাকুনা ফিত্নাতান (কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেত্না উচ্ছেদ হয়)। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ রকম কষ্ট করার দরকারই বা কি। আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করার কথাতো আলোচ্য আয়াতেই সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অগ্নি পূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া সংগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। বলা হয়েছে, রসুল স. হেজাজের অধিবাসী অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন।

আমি বলি, ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকেরা আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূত নয়। তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে হাদিস শরীফে। আর এ সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। সে কারণটি হচ্ছে— শিরিক। অর্থাৎ তারা হবে মুশরিক (অংশীবাদী)। মূর্তিপূজকেরা অগ্নিপূজকদের মতো মুশরিক । তাই মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকের উপর প্রবর্তিত হবে একই বিধান। এখন কথা হচ্ছে, অগ্নিপূজকদের পূর্বপুরুষগণ ছিলো আহলে কিতাব— এ কথা যদি বলা হয়, তবে এ কথাটিও মেনে নিতে হবে যে, মূর্তিপূজকদের পূর্বপুরুষও আহলে কিতাবই ছিলো। কিন্তু মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে কিছুতেই আহলে কিতাব বলা যায় না। কারণ তারা আহলে কিতাবদের আদর্শানুসারী নয়।

আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদেরকেও ক্রীত-দাস ও ক্রীতদাসী বানানো যাবে। তাই অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়াও আদায় করা যাবে। সুতরাং গোলাম অথবা স্বাধীন উভয় অবস্থায় তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা বৈধ। উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা উপার্জন করবে । সেই উপার্জন দ্বারা তাদের সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবে এবং জিযিয়াও পরিশোধ করবে।

সুলায়মান বিন বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কোথাও কোনো সেনাদলকে প্রেরণ করলে অধিনায়ককে বিশেষভাবে আল্লাহ্কে ভয় করার এবং সঙ্গীগণের প্রতি সহমর্মী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র পথে জেহাদ কোরো, আল্লাহ্দ্রোহীদেরকে হত্যা কোরো, শত্রুরা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেয়ো, চুক্তি ভঙ্গ কোরো না, কারো

নাক কান কেটো না (চেহারা বিকৃত কোরো না), পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে আক্রমণ কোরো না, শত্রুরা সম্মুখীন হলে প্রথমে তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ো— ১. তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাও। যদি তারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তবে তোমরা আর যুদ্ধ কোরো না। তাদেরকে বোলো তারা যেনো মদীনায় চলে আসে। এ রকম করলে তারাও হয়ে যাবে মুহাজির। মুসলমানদের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে তারা হবে সমঅংশীদার। যদি তারা মদীনায় আসতে সম্মত না হয় তবে তাদেরকে বোলো, তোমাদেরকে গণ্য করা হবে মদীনার বাইরের মুসলমান হিসেবে। সাধারণ মুসলমানদের প্রতি যে সকল বিধান প্রযোজ্য সে সকল বিধান প্রযোজ্য হবে তোমাদের উপরেও। তোমরা তখন আর গণিমত, ফায় এবং চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য উপার্জনের অংশ পাবে না। ২.যদি তারা ইসলামের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের নিকট জিযিয়া দাবী কোরো। জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলে তাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ কোরো না। ৩. যদি তারা জিযিয়া দিতে অসম্মত হয় তবে আল্লাহ্‌র সাহায্যকামী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরো। মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, আরববাসী আহলে কিতাবদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা জায়েয। তাঁর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স. হজরত খালিদ বিন ওলিদকে প্রেরণ করলেন দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দারের বিরুদ্ধে। তিনি তাকে বন্দী করে আনেন। রসুল স. উকায়দার জীবন ভিক্ষা দেন এবং জিযিয়া পরিশোধের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করেন। আবু দাউদ।

হজরত ইয়াজিদ বিন রুমমান এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সিদ্দীকে আকবরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দার বিন আব্দুল মালেক কান্দীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন হজরত খালিদ বিন ওলিদকে। রসুল স. জিযিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তাকে। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন উপরে বর্ণিত হাদিসের তথ্য সঠিক মনে করা হলে জিযিয়া কেবল আনসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আরবেরাও জিযিয়ার আওতায় পড়বে। উকাইদা যে আরবী, সে কথা নিশ্চিত (বনী কুন্দা আরবের একটি শাখা)। এভাবে এ কথাটিও প্রমাণিত হবে যে, জিযিয়া কেবল আহলে কিতাব ও আজমীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তখন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অভিমতই বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হবে। পার্থক্য থাকবে কেবল এতোটুকু যে, ইমাম আবু হানিফার মতে আরবের পৌত্তলিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া নাজায়েয। আর তাদেরকে গোলামও বানানো যাবে না। উকাইদা ছিলো খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক— পৌত্তলিক নয়।

আবদুর রাজ্জাক ও জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আরবের পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জিযিয়া গ্রহণ করেননি।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরবের পৌত্তলিকেরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী। কোরআন মজীদও নাজিল হয়েছিলো তাদের স্বভাষায়। তাই তারা ছিলো দুর্বিনীত ও প্রকাশ্য মোজেজা অস্বীকারকারী। সেকারণেই তাদের নিকট থেকে ইসলামের স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। ইসলাম গ্রহণ না করলে তারা হবে হত্যার উপযুক্ত। মুরতাদদের (ধর্ম পরিত্যাগকারীদের) বিধানও এ রকম। তারা স্বেচ্ছায় জেনে শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম সম্পর্কে সবকিছু জেনে শুনে বুঝে ধর্মত্যাগ করে। সুতরাং তাদের অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয়। তাদের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ। জিযিয়া নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিমের মাধ্যমে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবের অংশীবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল দু'টি— ইসলাম অথবা যুদ্ধ। মূর্তিপূজক ও মুরতাদেরা বন্দী হয়ে গেলে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা যাবে। রসুল স. আওতাস ও হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজনদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছিলেন। তারা ছিলো আরবী ও অংশীবাদী। বনী মুস্তালিকের পরিবার পরিজনদেরকেও এ রকম করা হয়েছিলো। আবু বনী হানিফা মুরতাদ হয়ে গেলে হজরত আবু বকর তাদের পরিবার পরিজনকে বানিয়েছিলেন গোলাম ও বাঁদী। আর ওই গোলাম বাঁদীদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন আলী বিন আবু তালেবের আম্মা এবং জায়েদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের আম্মাও ছিলো তাদের মধ্যে।

বন্দী করে পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসার পর মুরতাদদের স্ত্রী-পুত্রকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু অংশীবাদীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অংশীবাদী আরবীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানানো যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসে দেখা যায়— আরববাসী কাফেরদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হতো। তারা আহলে কিতাব, মূর্তিপূজক বা অগ্নিপূজক— যাই হোক না কেনো। অন্য হাদিসে এসেছে জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। সুতরাং উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসের বিধানটি রহিত হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ আরব এলাকায় বসবাসও ছিলো জিযিয়া প্রদানের উপযোগী হওয়ার একটি শর্ত। অতএব, বসবাসের অস্তিত্বই যখন নেই, তখন জিযিয়া ধার্য করার প্রেক্ষাপটটি আর রইলো কোথায়?

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তিনটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন— ১. আরব উপদ্বীপ থেকে অংশীবাদীদেরকে বিতাড়িত কোরো। ২. অন্যান্য দেশের কাফেরদেরকে কোরো বন্দী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তৃতীয় উপদেশটির কথা রসুল স. আর উচ্চারণ করেননি। অথবা আমিই তা বিস্মৃত হয়েছি।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করবোই। এই আরবে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো বসবাসের অধিকার নেই। মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জুহুরী থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। অনুরূপ বর্ণনা হজরত আবু হোরায়রা থেকে সালেহ্ বিন আখদারের মাধ্যমেও জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই— জাজিরাতুল আরবে দুই ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সবশেষে ইসহাক বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন স্বসূত্রে।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর শেষ উপদেশ ছিলো— ইহুদীদেরকে হেজাজ থেকে এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। আহমদ, বায়হাকী।

জিযিয়ার পরিমাণঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— জিযিয়ার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। জিযিয়া আদায়কারী এবং জিযিয়া প্রদাতা পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। রসুল স. দুই হাজার জোড়া কাপড় পরিশোধের শর্তে ইয়ামেনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. দুই হাজার জোড়া বস্ত্রের বিনিময়ে নাজরানবাসীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিলেন। ওই চুক্তি অনুসারে নাজরানবাসীদেরকে সফর মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া এবং রজব মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া কাপড় দিতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. নাজরানবাসীদেরকে একটি লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিলো— তারা বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় দিবে। প্রতি জোড়ার মূল্য হতে হবে এক আউকিয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কিতাবুল আমওয়ালের বিবরণ অনুসারে প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম চল্লিশ দিরহাম হয়— পঞ্চাশ দিরহাম নয় (যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন)।

এক জোড়া কাপড় অর্থ দু'টি কাপড়— তহবন্দ ও চাদর। ব্যক্তি ও ভূমি উভয়ের জন্য জিযিয়া হিসাবে কাপড় প্রদান করতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে এ রকমই লিখেছেন। জমিনের জিযিয়া প্রতিষ্ঠিত

থাকতো জমিনের উপরেই। ওই জমি খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো বিধর্মী কিংবা মুসলমান ক্রয় করলেও জিযিয়ার পরিমাণে কোনো হেরফের হতো না। মহিলা ও শিশুদের জমিনেরও জিযিয়া পরিশোধ করতে হতো। তবে ব্যক্তির জিযিয়া মহিলা ও শিশুর উপরে ধার্য ছিলো না। ধার্য ছিলো কেবল পুরুষের উপর।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বনী তাগলীবের খৃষ্টানদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, সাধারণতঃ একজনের উপরে যে করারোপ করা হয়, তার দ্বিগুণ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুসলমানদের অধিনায়ক শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিধর্মীদের এলাকা দখল করলে জিযিয়া ধার্য করতে পারবে এভাবে— সম্পদ-শালী ব্যক্তির জন্য প্রতি মাসে চার দিরহাম হিসেবে বৎসরে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য মাসে দুই দিরহাম হিসেবে বৎসরে চব্বিশ দিরহাম এবং সুস্থ সবল উপার্জনক্ষম দরিদ্রদের জন্য মাসে এক দিরহাম হিসেবে বৎসরে বারো দিরহাম।

ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে— জিযিয়া নির্ধারণের জন্য ধনী দরিদ্র বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই। সকল জিম্মীদের নিকট থেকে বৎসরে বার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে বিত্তশালী বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে বৎসরে জন প্রতি এক দিনার। আর ইমাম আহমদের অভিমত এসেছে চারটি বর্ণনায় চার রকম। প্রথম বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত এসেছে ইমাম আবু হানিফার অনুকূলে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— পরিমাণ নির্ধারিত হবে নেতার সিদ্ধান্তানুসারে। ইমাম সুফিয়ান সওরীও এরকম বলেছেন। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে— সর্বনিম্ন জিযিয়া বছরে জনপ্রতি এক দিনার। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই। চতুর্থ বর্ণনায় এসেছে— কেবল ইয়ামেনবাসীদের জন্য বৎসরে জনপ্রতি এক দিনার (এটা কোনো সাধারণ নিয়ম নয়)। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. যখন আমাকে ইয়ামেনের শাসক নির্বাচন করলেন তখন নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের নিকট থেকে এক দিনার মূল্যমানের কাপড় আদায় করবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারাকুতনী, ইবনে হাব্বান, হাকেম। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। আবু দাউদ এই হাদিসকে মুনকার (অস্বীকৃত) বলেছেন। আরো বলেছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইমাম আহমদও এই হাদিস কে মুনকার বলেছেন। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য সহযোগে। তাঁর সূত্র পরম্পরাটি এ রকম, আমাশ — আবু ওয়ায়েল মাসরুক — হজরত মুয়াজ। কোনো কোনো সূত্রে পৌঁছেছে মাসরুক পর্যন্ত।

কাজেই বর্ণনাটি মাসরুকেরই হবে — হজরত মুয়াজের নয়। ইবনে হাজাম বর্ণনাটিকে বলেছেন মুনকাতে (কর্তিত)। তিনি একথাও বলেছেন যে, মাসরুক হজরত মুয়াজের সাক্ষাত পাননি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে হাজামও এ রকম মত প্রকাশ করেছেন। আবার হাদিসটিকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন তিরমিজি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে হাদিসটি মুরসাল— এটাই শুদ্ধ মত।

ইমাম আবু হানিফার মতের অনুকূলে রয়েছে হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর বক্তব্য ও আমল। সুনান রচয়িতাগণের গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে — হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান এবং হজরত ওসমান বিন হানিফকে ইরাকে প্রেরণ করেন হজরত ওমর। তাঁরা দু'জনে সেখানে গিয়ে ভূমির জরিপ এবং কর নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেন। কর প্রদাতাদেরকে বিন্যাস করেন তিনটি শ্রেণীতে— উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এরপর তারা ফিরে এসে প্রতিবেদন পেশ করেন হজরত ওমরের নিকট। খলিফা হজরত ওমর তা অনুমোদন করেন। পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানও এই নিয়মটি বহাল রাখেন।

ইবনে আবী শায়বা সূত্রে আলী বিন মাসহার শাইবানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আউন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ সাক্বাফি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত চব্বিশ দিরহাম এবং নিম্নবিত্ত বারো দিরহাম। হাদিসটি মুরসাল। ইবনে জানজুইয়্যার কিতাবুল আমওয়ালে এই হাদিসের সূত্র পরম্পরা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, মনদেল—শাইবানী—ইবনে আউন—মুগিরা বিন শো'বা।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে নজরাহ থেকে লিখেছেন, হজরত ওমর বিজিত দেশ সমূহের জিম্মীদের জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন উপরে বর্ণিত নিয়মে। অপর বর্ণনায় হারেস বিন মুজের সূত্রে এসেছে— হজরত ওমর হজরত ওসমান বিন হানিফকে জিযিয়া নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য যথাক্রমে জনপ্রতি আটচল্লিশ, চব্বিশ এবং বারো দিরহাম। সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছিলো। কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। তাই এই ঐকমত্যটি চিরস্থায়ী।

ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজে সিররি বিন ইসমাইল আমের শা'বী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, শা'বী বলেছেন — হজরত ওমর ইরাকের ভূমি জরিপ করিয়েছিলেন। সমগ্র ভূমিকে বিভক্ত করিয়েছিলেন তিনশত ষাটটি খণ্ডে। প্রতি খণ্ডের জন্য বাৎসরিক কর নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে — ফসলের জমি এক

দিরহাম ও এক কফিজ শস্য আঙ্গুরের বাগান দশ দিরহাম এবং খেজুরের বাগান পাঁচ দিরহাম। আর জন প্রতি বাৎসরিক কর — বারো, চব্বিশ এবং আটচল্লিশ দিরহাম (যথাক্রমে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জন্য)। শা'বী বলেছেন, আমার নিকট সাঈদ বিন আবী ওরবার মাধ্যমে এসেছে, কাতাদা বিন মাজলিজ বলেছেন, হজরত ওমর নামাজের ইমামতি ও সৈন্যদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে। বিচার বিভাগ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে। আর হজরত ওসমান বিন হানিফকে দিয়েছিলেন জমি-জমা দেখা শোনার ভার। তাদের আহারের জন্য একটি বকরী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এভাবে — হজরত আম্মার অর্ধেক, হজরত ইবনে মাসউদ এক চতুর্থাংশ এবং হজরত ওসমান বিন হানিফ অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ও আমাকে মনে করি পিতৃহীনদের সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের মতো। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন — 'যারা বিত্তশালী তারা (এতিমদের সম্পদ থেকে) নিরাপদ থাকবে এবং যারা বিত্তহীন তারা এতিমদের সম্পদ থেকে পূরণ করবে তাদের (ন্যূনতম) প্রয়োজন।' তোমরা বিত্তহীন তাই প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি বকরী গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করবে। আল্লাহ্র কসম! তবু আমার আশংকা হয়, হয়তো অনতিবিলম্বে সেখানে বকরীর স্বল্পতা দেখা দিবে। হজরত ওসমান সেখানকার একখণ্ড আঙ্গুরের বাগানের কর নির্ধারণ করেন দশ দিরহাম। খেজুরের বাগানের জন্য আট খণ্ড জমির রাজস্ব ছয় দিরহাম। গমের জমির জন্য চার দিরহাম। যবের একখণ্ড জমির জন্য দুই দিরহাম। ব্যক্তির প্রতি কর বারো, চব্বিশ ও আটচল্লিশ দিরহাম। মহিলা ও শিশুদের প্রতি তিনি কোনো কর ধার্য করেননি। সাঈদের বর্ণনায় এসেছে, আমার এক সঙ্গী বর্ণনা করেছেন এভাবে— খেজুরের বাগানের জন্য দশ দিরহাম এবং আঙ্গুরের বাগানের জন্য আট দিরহাম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে হারেসা বিন মুতরেফ বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর প্রথমে বিজিত ইরাকের ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু আদমশুমারিতে দেখা গেলো সেখানকার কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে দুই তিন গুণ বেশী। তখন তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত আলী বললেন, ওই সকল লোক তো মুসলমানদের উপার্জনে সাহায্যকারী হতে পারে। সুতরাং তাদের ভূমি গ্রহণ না করে তাদের উপর বাৎসরিক কর আরোপ করা হোক। তাঁর এই পরামর্শটি হজরত ওমর পছন্দ করলেন। কর নির্ধারণের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন ওসমান বিন হানিফকে। তিনি তাদের প্রতি বাৎসরিক কর ধার্য করেন জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, চব্বিশ দিরহাম এবং বারো দিরহাম। হজরত মুয়াজ বর্ণিত এই হাদিস সম্পর্কে হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত করের হার

ছিলো এর চেয়ে কম। কারণ ইয়ামেন অধিকারে এসেছিলো সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে— যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। আর সেখানকার অধিবাসীরাও তেমন সম্পদশালী ছিলো না। এ সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, আবু নাজীহ্ বলেছেন, আমি একবার মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, সিরিয়াবাসীদের উপর কর নির্ধারণ করা হয়েছিলো জন প্রতি চার দিনার। আর ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত হয়েছিলো এক দিনার— কারণ কি? মুজাহিদ বললেন, এর কারণ হচ্ছে, সিরিয়াবাসীরা ছিলো সম্পদশালী এবং ইয়ামেনবাসীরা ছিলো স্বল্পবিত্ত। সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম আহমদের অভিমতের দলিল এই যে, রসুল স. হজরত মুয়াজকে জন প্রতি এক দিনার কর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট থেকে আদায় করতে বলেছিলেন দুই হাজার জোড়া কাপড়। আবার হজরত ওমর জিম্মীদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন করের তিনটি স্তর। এ নিয়মটিকেই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। বনী তাগলাব থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার হার ছিলো— মুসলমানদের নিকটে যে সম্পদ ছিলো, তার চেয়ে দ্বিগুণ। এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জিযিয়া নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই মুসলিম শাসকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে উপার্জনহীন নিঃস্ব লোকের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, উপার্জনহীন দরিদ্র লোকের উপরেও জিযিয়া ধার্য করা ওয়াজিব। সুতরাং যখনই তারা স্বচ্ছল হবে তখনই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া (বকেয়াসহ) আদায় করে নিতে হবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি তারা স্বচ্ছল না হয়, তবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে দারুল হরবের (কাফের সাম্রাজের) সঙ্গে। তখন তাদেরকে আর জিম্মী বলা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর এ সকল কথার দলিল হচ্ছে— রসুল স. হজরত মুয়াজকে ঢালাওভাবে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশের মধ্যে স্বচ্ছল-অস্বচ্ছলের উল্লেখ ছিলো না। আর আমাদের কথার দলিল এই যে, হজরত ওসমান বিন হানিফ উপার্জনহীন ও বিত্তহীনদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি।

ইবনে জানজুইয়্যা কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, হাশেম বিন আদি সূত্রে ওমর বিন নাফেয়ের উদ্ধৃতিসহ। আবু বকর সিলাহ্ বিন জুফার আইনি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক বৃদ্ধ জিম্মীকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, ব্যাপার কি? বৃদ্ধ বললো, আমি কপর্দকহীন। অথচ আমার উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। যৌবনে

—২০

তুমি উপার্জন করেছো। তখন করও পরিশোধ করেছো। এখন তুমি বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিত। অথচ তোমার উপর কর ধার্য করা হয়েছে। এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশনামা পাঠালেন যে— বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিতদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে একথাটি এসেছে যে— উপার্জনশীল দরিদ্রদের নিকট থেকে আদায় করতে হবে বারো দিরহাম। বায়হাকী।

আমর ইবনে নাফেয়ে সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর বলেছেন, হজরত ওমর এক লোকের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, এক অন্ধ বৃদ্ধ সেখানে ভিক্ষা করছে। এরপরের বিবরণ উপরে বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ। শেষে কেবল এই কথাটি অতিরিক্ত এসেছে যে, হজরত ওমর ওই বৃদ্ধ এবং ওই রকম লোকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় রহিত করেছেন (আবু বকর বলেছেন) আমি ওই সময়ে উপস্থিত ছিলাম এবং ওই বৃদ্ধটিকে দেখেও ছিলাম।

ওরওয়া বিন যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক স্থানে দেখলেন, কয়েকজন লোককে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, এদের উপর জিযিয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। কিন্তু এরা জিযিয়া পরিশোধ করেনি। তাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, এরা জিযিয়া পরিশোধ করতে চায় না কেনো? লোকেরা বললো, এরা বলছে, এরা কপর্দকহীন। হজরত ওমর বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাধ্যবহির্ভূত বোঝা এদের উপর চাপিয়ো না। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। পৃথিবীতে মানুষকে যারা শাস্তি দিবে, আখেরাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আবু ইউসুফ বলেছেন, আমার নিকট এক জ্ঞানবৃদ্ধ একটি মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আরকামকে জিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন যাত্রা শুরু করলেন, তখন রসুল স. উচ্চস্বরে বললেন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি জিম্মীদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে, তাদেরকে অপমান করবে অথবা বলপূর্বক তাদেরকে কোনো কাজে লাগাবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। পক্ষ অবলম্বন করবো অত্যাচারিতের। এই হাদিসটি ইমাম আহমদের অভিমতের সমর্থক। কারণ, তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণতঃই মুসলমান শাসকের নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল বলে মেনেছেন। বলেছেন, নেতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, জিযিয়া প্রদান জিম্মীদের সাধ্যাভূত কিনা। সাধ্যবহির্ভূত নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না।

আপনার লোকেরা কোথায়? তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! হে বাবুল বৃক্ষের নিচে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকেরা! হে সুরা বাকারার অধিকারীরা! ফিরে এসো। হজরত আব্বাসের কণ্ঠ ছিলো অত্যন্ত উচ্চ। তিনি রসুল স. এর এই ঘোষণাটি উচ্চকণ্ঠে বার বার উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এই ঘোষণাটি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পলাতক সৈন্যরা অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন— যেমন মায়ের ডাকে শিশুরা ফিরে আসে মায়ের কাছে।

বায়হাকী ও বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান বিন আবী শায়বা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তখন হজরত আব্বাসকে বলেছিলেন, হে আমার পিতৃব্য! হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নিচে যারা বায়াত গ্রহণ করেছে এবং যে সকল মদীনাবাসী আল্লাহ্‌র রসুল ও মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দান করেছে — তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করুন। হজরত আব্বাস বলেন, আমি নির্দেশানুসারে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো সকল আনসার— যেমন উষ্ট্রশাবক ফিরে আসে তার মাতৃক্রোড়ে। সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করলো, লাব্বায়েক, লাব্বায়েক (আমরা হাজির, আমরা হাজির)। রসুল স. তাঁর বাহন থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের জন্য উত্তোলিত হলো অসংখ্য বর্শা। আনসারদের উত্তোলিত সেই বর্শা সমূহ ছিলো কাফেরদের বর্শাগুলোর চেয়ে আরো ভয়ংকর। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আবু ইয়ালী এবং তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. সেদিন এক মুঠো ধুসর পাথরকণা হাতে নিয়ে কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন এবং বলেছিলেন, কাবার প্রভুর কসম! এই যুদ্ধে আমাদের বিজয় অনিবার্য। ওই দিন হজরত আলীর যুদ্ধও ছিলো অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক।

হজরত আবু আবদুর রহমান ইয়াজিদ ফেহরী থেকে ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শোয়াইবা, আহমদ, আবু দাউদ, বাগবী প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হয়ে তখন মুসলমানেরা পালাতে শুরু করলো। রসুল স. পলায়নপর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসুল। এরপর তিনি অবতরণ করলেন তাঁর বাহন থেকে। মিশে গেলেন উপস্থিত সৈন্যদের মধ্যে। তারপর এক মুঠো মাটি নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন শত্রুদের দিকে। বললেন, তোমাদের চেহারা বিধ্বস্ত হোক। ইয়ালী বিন আতার বর্ণনায় এসেছে, হুনায়েনে যারা শত্রুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো, তাদের সন্তানেরা বলেছেন, আমরা আমাদের পিতাদেরকে বলতে শুনেছি, আমাদের চোখ মুখ তখন মাটিতে ভরে গিয়েছিলো। আর আমরা তখন শুনতে পেলাম একটি ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। মনে হচ্ছিলো যেনো কোনো থালায় পতিত হচ্ছে অসংখ্য লোহার টুকরা। এসকল কারণেই আমরা তখন পরাজিত হয়েছিলাম।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে সুদ্দীর 'কবির' গ্রন্থে রয়েছে, ওগুলো ছিলো যোদ্ধা ফেরেশতাদের আওয়াজ। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আল্লাহ্পাক হুনায়েনে রসুল স. এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন পাঁচ হাজার নিদর্শনবিশিষ্ট ফেরেশতা। হজরত যোবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া, আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখতে পেলাম, আসমান থেকে নেমে আসছে একটি কালো চাদর। চাদরটি পতিত হলো যুদ্ধের ময়দানে। তারপর ওই চাদর থেকে বের হতে শুরু করলো অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা। সমস্ত উপত্যকা ভরে গেলো পিপীলিকায়। আমার তো মনে হলো ওগুলো ফেরেশতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। একটু পরেই দেখলাম শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলো।

ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, আমার নিকট প্রবীণ আনসার সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন, আমরা ওই দিন আসমান থেকে কালো চাদর পতিত হতে দেখেছি। ওই চাদর থেকে অসংখ্য পিঁপড়া বের হলো। পিঁপড়ায় পিঁপড়ায় ভরে গেলো পুরো এলাকা। আমাদের কাপড়েও পিঁপড়া উঠেছে মনে করে আমরা আমাদের কাপড়ও ঝাড়া দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই অর্জিত হলো বিজয়।

স্বসূত্রে মুসাদ্দাদের বর্ণনায় এবং বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, উম্মে বারছানের মুক্ত করা ক্রীতদাস আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, আমাকে হুনায়েন যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর পক্ষের এক যোদ্ধা বলেছে, হুনায়েনে মুসলমানেরা আমাদের সামনে ছাগল দোহনের সময় পরিমাণও তিষ্ঠাতে পারেনি। আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে তারা পিছু হঠতে শুরু করলো। আমরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। হঠাৎ সামনে দেখলাম খচ্চরের পিঠের উপরে উপবিষ্ট এক সৌম্যকান্তি পুরুষ আমাদের সাথে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। দেখলাম, তিনি অন্য কেউ নন, রসুল স. স্বয়ং। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. ও আমাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত ছিলো কিছু শাদা শাদা লোক। তারা আমাদেরকে বলতে লাগলো, তোমাদের চেহারা বিকৃত হয়েছে। ফিরে যাও। ফিরে যাও। আমরা ভয় পেলাম। ফিরে এলাম পিছনের দিকে।

ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত শায়বা ইবনে ওসমান বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে হুনায়েন যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবু মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলাম একারণে যে, কুরায়েশদের উপর হাওয়াজেনদের বিজয় ছিলো আমার নিকট অকল্পনীয়। যুদ্ধের ময়দানে আমি ছিলাম রসুল স. এর কাছাকাছি। হঠাৎ আমি দেখলাম, সুচিত্রিত অশ্বের উপরে আরোহণ করে উপস্থিত হলো কিছু অপরিচিত

লোক। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু অপরিচিত ঘোড় সওয়ারকে। ঘোড়াগুলো চিত্রিত। রসুল স. বললেন, শায়বা এ রকম দৃশ্যতো দেখতে পারে কেবল বিধর্মীরা। এরপর তিনি স. আমার বুকে হাত রেখে বললেন, হে আমার আল্লাহ্‌! শায়বাকে হেদায়েত করো। তিনি এ রকম করলেন তিন বার। আমার মনে হলো, এখন রসুল স. অপেক্ষা অন্য কেউই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় নয়। এরপর ঘোর যুদ্ধ শুরু হলো। আমাদের কেউ কেউ শহীদ হলেন। রসুল স. অগ্রসর হলেন সামনের দিকে। হজরত ওমর ও হজরত আব্বাস ধরে ছিলেন তাঁর অশ্বের লাগাম। রসুল স. এর নির্দেশে হজরত আব্বাস উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, হে মুহাজিরবৃন্দ! হে আনসার! হে সুরা বাকারাওয়ালারা! তোমরা কোথায়? রসুল স. স্বয়ং ঘোষণা করলেন, আমি সত্য নবী। এ কথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন পশ্চাদ-পসরণকারীরা। যুদ্ধ শুরু করলো বীর বিক্রমে। রসুলুল্লাহ্‌ স. বললেন, এবার চুল্লি উত্তপ্ত হয়েছে (যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছে)।

মোহাম্মদ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত মালেক বিন আওম বিন হামমান বর্ণনা করেছেন, হুনায়েনে বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বনকারী আমাদের গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বলেছে, ওই দিন রসুল স. কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথরকণার আঘাত থেকে আমাদের কোনো লোকই রক্ষা পায়নি। পাথরকণাগুলো পড়েছিলো আমাদের চোখে। আর আমাদের বুকের ভিতরেও অনুভূত হচ্ছিলো অবিরল পাথর পড়ার শব্দ। আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো থালার উপরে অঝোর ধারায় প্রস্তর খণ্ড বর্ষণের মতো। আমরা আরো দেখলাম আসমান ও জমিনের মাঝখানে চিত্রিত ঘোড়ার উপরে বসে রয়েছে শাদা বর্ণের অনেক লোক। মাথায় ছিলো তাদের লাল পাগড়ী। তাদের চোখের পাতা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। তাদের হস্তধৃত তলোয়ারও ছিলো বিচিত্র ধরনের। তাদের দিকে সরাসরি আমরা তাকাতেও পারছিলাম না। ইবনে আবী হাতেম ও সুদ্দী বলেছেন, ফেরেশতাদের ওই তলোয়ারগুলোর আঘাতেই সেদিন অনেক কাফেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বায্‌যার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. তখন নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, ওদেরকে দ্বিখণ্ডিত করো। নির্দেশ প্রদানের সময় তিনি স. ইশারা করেছিলেন তার কণ্ঠনালীর দিকে।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন হারেস বলেছেন, বদরের মতো হুনায়েনেও নিহত হয়েছিলো অনেক লোক। তাদের বেশীর ভাগই ছিলো তায়েফবাসী। আর মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন উম্মে আইমানের কন্যা, হজরত আইমান, হজরত সুরাকা বিন হারেস, হজরত ইয়াতিম বিন ছা'লাবা, হজরত ইয়াজিদ বিন জামআ এবং হজরত আবু আমের আশয়ারী।

হজরত মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আ'সা থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, ওই সংকটময় মুহূর্তে হজরত সা'দ বিন উবাদা চিৎকার করে আহ্বান জানালেন খাজরাজ গোত্রকে। আর আউস গোত্রকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর। তাঁদের আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাজরাজ ও আউস গোত্রের লোকেরা ছুটে এলো যুদ্ধের ময়দানে— যে ভাবে মৌমাছিরা ছুটে আসে রাণী মৌমাছির নির্দেশে।

যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেছেন, এরপর মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়েন মুশরিকদের উপর। শত্রুনিধন করতে করতে তাঁরা পৌঁছে যান তাদের মহিলা ও শিশুদের নিকটে। রসুল স. নির্দেশ করেন, তোমরা মহিলাদের নিকটে গেলে কেনো? মহিলা ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। হজরত উসায়েদ বিন হুদাইর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা তো মুশরিকদের সন্তান। রসুল স. বললেন, প্রতিটি শিশু ইসলামের স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। পরে তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান বানায়।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় রয়েছে, সক্বিফ গোত্রের এক বৃদ্ধ বর্ণনা করেছেন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিষ্ঠাতে না পেরে পলায়ন করলাম। মনে হচ্ছিলো যেনো রসুল স. আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলেছেন। শেষে তায়েফের একটি দূর্গে আমরা বলপূর্বক ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, এভাবে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর দুশমনদেরকে পরাস্ত করেছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাদের অনেককে হত্যা করেছিলেন এবং বন্দী করেছিলেন তাদের নারী ও শিশুদেরকে। হাওয়াজেনদের অধিনায়ক মালেক বিন আউফও পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফের দুর্গে।

ইবনে ইসহাক, মোহাম্মদ বিন ওমর প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, মালেক বিন আউফ এবং হাওয়াজেন গোত্রের কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফে। আর কিছু লোক আওতাস এলাকার এক স্থানে বানিয়ে নিয়েছিলো তাদের সেনানিবাস। কেউ কেউ আবার চলে গিয়েছিলো নাখলার দিকে। এভাবে যারা পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছিলো, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়নি। আর হাওয়া-জেনদের প্রবীণতম নেতা দুরাইদ বিন উসামাকে হত্যা করেছিলেন হজরত রবীয়া বিন রাফি সালামী।

বাগবী লিখেছেন, আওতাস এলাকায় যারা পরিবার পরিজন ও পশুপাল নিয়ে সেনানিবাস গড়ে তুলেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে রসুল স. একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। ওই বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন হজরত আবু আমেরকে। তিনি মুশরিকদের সেনানিবাস আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নিহত হয় দুরাইদ বিনিস্ সামাহ সহ আরো অনেকে। সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করে দুশমনেরা। বন্দী হয় তাদের

মহিলা ও শিশুরা। মালেক পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো তায়েফ দুর্গে। অধিনায়ক হজরত আবু আমের ওই দুর্গ অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ মুশরিকেরা উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অবশেষে বরণ করে পরাজয়। অধিনায়ক হজরত আবু আমেরও শহীদ হন ওই যুদ্ধে। হুনায়েন যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বিজয়ী হতে দেখে মক্কার বহুসংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে যায়। তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ইসলামই আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্ম। রসুল স. যুদ্ধলব্ধ সকল সম্পদ একত্রিত করতে বলেন জিয়িররানা নামক স্থানে। তায়েফ বিজয়ের পর রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হন জিয়িররানায়। ইবনে সা'দ এবং উয়ুন রচয়িতা লিখেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে ছিলো ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও বেশী ভেড়া ও বকরী এবং চার হাজার আউকিয়া চাঁদি।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, হুনায়েন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো ছয় হাজার যুবতী ও বয়স্কা মহিলা। আবু সুফিয়ান হরবকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো ওই সকল গণিমতের প্রহরী। বালাযুরী বলেছেন, প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছিলো হজরত বুদাইল বিন ওরাকা খাজায়ীকে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত মাসউদ ইবনে ওমর গিফারীকে।

আরবের সকল দুর্গের চেয়ে তায়েফের দুর্গই ছিলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ওই দুর্গের শিখর দৃষ্টিগোচর হতো বহু দুর থেকে। ওই দুর্গেই আশ্রয় গ্রহণ করলো সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো। রসুল স. স্বয়ং উপস্থিত হলেন সেখানে। অবরুদ্ধ বনী সাক্বিফেরা দুর্গের উপর বসিয়ে রাখলো একশত তীরন্দাজ। আগুনের গোলা নিক্ষেপের আয়োজনও তারা করলো। ফলে মুসলমানেরা দুর্গের কাছে ঘেঁষতে পারলেন না। দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেই শুরু হতো তীর নিক্ষেপ ও আগুনের গোলা বর্ষণ। মনে হতো তারা যেনো একটি সংঘবদ্ধ পঙ্গপালের দল। তাদের তীর বর্ষণে আহত হলেন অনেকে। বারোজন পান করলেন শাহাদাতের পেয়ালা। রসুল স. অবস্থান গ্রহণ করলেন ওই স্থানে, যেখানে সাক্বিফ গোত্রের লোকেরা পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়ে মসজিদ বানিয়েছিলো। দুর্গ মধ্যে অবস্থান গ্রহণকারী আমর ইবনে উমাইয়া সাক্বাফীও পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার দলকে নির্দেশ দিলেন মুসলমানেরা মল্ল যুদ্ধে আহ্বান করলে তোমরা সাড়া দিয়োনা। যতোদিন ইচ্ছা পড়ে থাকতে দাও তাদেরকে। হজরত খালেদ বিন ওলিদ সম্মুখ সমরের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা কেউ উঁকি দিয়েও দেখলো না। তিনি পুনরায় আহ্বান জানালেন। তবুও তারা নিরুত্তর রইলো। অনেকক্ষণ পরে আবদ অথবা লাইল বলে উঠলো, আমাদের কেউই তোমাদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করবে না। এক বৎসরের পানাহারের ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে। সুতরাং তোমরা এক

বৎসর অপেক্ষা করো। এক বৎসর পর আমরা দুর্গ থেকে বের হয়ে তলোয়ারের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। মুসলিম বাহিনী তীর ছুঁড়তে লাগলো। প্রত্যুত্তরে তারাও শুরু করলো তীর বর্ষণ। কিন্তু কেউ বাইরে এলো না। তাদের তীরে আহত হলেন অনেক মুসলিম যোদ্ধা। কেউ কেউ শহীদও হলেন।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীনেরা বলেছেন, রসুল স. তখন ঘোষণা করলেন, যে ক্রীতদাস দুর্গ থেকে বের হয়ে আসবে তাকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো দশের অধিক ক্রীতদাস। রসুল স. তাদেরকে স্বাধীন করে দিলেন।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে — রসুল স. সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত সালমান ফারসী বললেন, পাথর নিক্ষেপক কামান প্রস্তুত করা হোক। তাই করা হলো। ওই কামানের মাধ্যমে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হলো পাথর। কিন্তু এতে করেও তাদেরকে কাবু করা গেলো না। তখন রসুল স. ঘোষণা করে দিলেন দুর্গ থেকে বের হয়ে না এলে তোমাদের খেজুর ও আঙ্গুর বাগানের সবগুলো গাছ কেটে ফেলা হবে। সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা প্রত্যেকে পাঁচটি করে খেজুরের গাছ এবং পাঁচটি করে ফলন্ত আঙ্গুরের গাছ কেটে দাও। তাঁরা নির্দেশ পালন করতে শুরু করলেন। বনী সাক্বিফেরা চিৎকার করে বললো, তোমরা আমাদের বাগান নষ্ট করছো কেনো? তোমরা যদি বিজয়ী হও তবেতো এগুলোর মালিক হবে তোমরাই। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এবং আত্মীয়তার সম্মানে তোমরা ওগুলো ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকো। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে, তাই করা হবে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে — অবরোধ চলা কালে একদিন রসুল স. হজরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, স্বপ্নে দেখলাম মাখন ভর্তি একটি বড় পেয়ালা আমার সামনে হাদিয়া হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলাম একটি মোরগ এসে পেয়ালাটি উল্টে ফেলে দিলো। হজরত আবু বকর বললেন, আমার মনে হয় আপনি যা কামনা করছেন তা পাবেন না (দুর্গ জয় করা যাবে না)। রসুল স. বললেন, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু প্রথমে আমি এ কথা বুঝতে পারিনি।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন— তায়েফ অবরোধের পনেরো দিন অতিবাহিত হলো। রসুল স. নওফেল বিন মুয়াবিয়া দায়েলীকে ডেকে বললেন, আমাদের এ অবরোধ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? হজরত নওফেল বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! খেঁকশিয়াল গর্তে ঢুকে পড়েছে। আপনি যদি এখানে অবস্থান

করেন তবে এক সময় সে ধরা পড়বেই। যদি আপনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন, তবুও সে আপনাকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবে না। হজরত ওমর এবং হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, দুর্গ অবরোধ করে কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে রসুল স. বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্! আগামীকাল আমরা ফিরে যাবো। সাহাবীগণের কেউ এই সিদ্ধান্তটি পছন্দ করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি এখন চলে গেলে আমরা বিজয় লাভ করবো কী ভাবে? তিনি স. বললেন, ঠিক আছে। আমরা চলে যাবো আর একদিন পর। এক দিন সময় হাতে পেয়ে সাহাবীগণ ভাবলেন, এই একদিনের মধ্যেই একটি ফয়সালা করে ফেলতে হবে। তাই পরদিন সকালেই তাঁরা শুরু করলেন প্রচণ্ড যুদ্ধ। অনেকে জখম হলেন, কিন্তু দুর্গ বিজিত হলো না। রসুল স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্! আগামীকাল প্রাতে আমরা এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবো। সিদ্ধান্তটি সকলেই পছন্দ করলেন। এই অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন রসুল স.। সালেহী উল্লেখ করেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় শহীদ হয়েছিলেন বারোজন মুসলমান।

হজরত ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করলেন, আগামীকাল তোমরা তোমাদের উটগুলোকে চারণভূমির দিকে ছেড়ে দিয়ো না। কাল সকালে প্রত্যাবর্তন করবো আমরা। সিদ্ধান্ত অনুসারে পরদিন সকালে রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে চললেন মক্কায়। প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত দান করো। যুদ্ধের কঠিন শ্রম থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও (তারা যেনো আমাদেরকে আক্রমণ না করে, আমরাও যেনো তাদের প্রতি সেনাভিযান না চালাই)।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে— সাহাবীগণ তখন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সাক্বিফদের তীরন্দাজ বাহিনী অত্যন্ত পারদর্শী। আপনি তাদের জন্য বদ্‌দোয়া করুন। তিনি স. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ ! সাক্বিফ গোত্রকে হেদায়েত করো। তাদেরকে ইমানের পথে নিয়ে এসো।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তায়েফ অবরোধের সময়সীমা ছিলো তিরিশ রাত্রি অথবা তিরিশ রাত্রির কাছাকাছি। অপর বর্ণনায় এসেছে— বিশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী। কেউ কেউ বলেছেন, বিশ দিন। কারো কারো মতে দশ দিনের কিছু বেশী। ইবনে হাজাম বলেছেন, এই অভিমতটিই সঠিক। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, মুসলিম বাহিনী তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন চল্লিশ দিন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, বর্ণনাটি গরীব (দুর্লভ)। বাগবী লিখেছেন, অবরোধ জারী ছিলো শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে। জিলক্বদ মাস এসে পড়তেই অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কারণ যে চার মাস যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ, জিলক্বদ তার অন্তর্ভুক্ত। আমি বলি, এই বক্তব্যটি ইবনে

হাজামের বক্তব্যের অনুরূপ। কোনো কোনো আলেম বলে থাকেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ মাসের বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি রহিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কারণ এখানে জিলক্বদ মাস সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। সুতরাং বুঝতে হবে, তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো জিলক্বদ মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে।

তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে রসুল স. পৌঁছেছিলেন জিয়িররানায়। সেখান থেকে বেঁধেছিলেন ওমরাহ্র ইহ্রাম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ২৭

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

❐ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ হইতে পারেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইউনুছ বিন বকরের মাধ্যমে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি হুনায়েন যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গে ছিলাম। হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল আমাদের অধিকারে এলে তারা খুবই বিপদে পড়ে গেলো। তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে রসুল স. যখন জিয়িররানা নামক স্থানে উপনীত হলেন, তখন তার সঙ্গে এসে সাক্ষাত করলো হাওয়াজেনদের একটি প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলটি ছিলো চৌদ্দ সদস্য বিশিষ্ট। রসুল স. এর দুগ্ধ সম্পর্কীয় পিতৃব্য বুয়াইরকানও ছিলেন ওই দলে। জুহায়ের বিন সরোদ ছিলেন ওই দলের নেতা। পরে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বুয়াইরকান বললেন, আমরা সকলে একই গোষ্ঠির লোক। আপনি জানেন এখন আমরা বিপদগ্রস্ত। আমাদের প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে দয়া করবেন। জুহায়ের বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বন্দী রমণীদের মধ্যে আপনার ফুফু ও খালারাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনতো খুবই সুন্দরী। তারা শিশুকালে আপনাকে কোলে নিয়েছে। পানাহার করিয়েছে। আরো অনেক খেদমত করেছে আপনার। ইরাক ও সিরিয়ার সম্রাটের মাধ্যমে যদি আমরা এ রকম মুসিবতে পড়তাম, তবে আমরা আশা করতে পারতাম যে, আমাদের প্রতি করুণা করা হবে। হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো তাদের চেয়ে অনেক মহান ও করুণাপরায়ণ। এরপর তিনি রসুল স. কে কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালেন।

সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জুহায়ের বিন সরোদ জাসামী বলেছেন, রসুল স. হুনায়েনে আমাদের সবকিছু অধিকার করলেন। তারপর সকল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন তাঁর সৈন্যদের মধ্যে। আমি তাঁর নিকট

উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার মতো মহান ব্যক্তিত্বের নিকটে আমরা যথাযোগ্য সম্মান ও অনুগ্রহ প্রত্যাশী। এরপর আমি কিছু কবিতা পাঠ করে শোনালাম। তিনি কবিতা শুনে বললেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদে আবদুল মুত্তালিবের যে অংশ রয়েছে, সেই অংশ আমি প্রত্যর্পন করতে পারি। কুরায়েশরা বললেন, আমাদের অংশও আল্লাহ্‌র রসুলের (আমরাও আমাদের অংশ ফিরিয়ে দিলাম)। আনসারগণও একই কথা বললেন। সালেহী বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রপরম্পরা অত্যন্ত উন্নত মানের। শয্যাশূন্য খাটের মতো। মোকাদ্দেসিও হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীও হাদিসটি উত্তম পদবাচ্য হওয়াকে প্রাধান্য প্রদান করেছেন। বোখারী তাঁর সহীহ্‌ পুস্তকে হজরত মারওয়ান ও হজরত মুছওয়ার বিন মাখরামা থেকে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে— হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও মালমাত্তা ফিরে পেতে চাই। রসুল স. বললেন, তোমরা আমার সঙ্গী সাথীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। আমার নিকটে সত্য কথাই সর্বোত্তম কথা। আমার সাফ সাফ কথা এটাই— তোমরা যে কোনো একটি ফিরিয়ে নাও— পরিবার পরিজন অথবা সম্পদ। হাওয়াজেনরা বললো, আমরা চাই আমাদের পরিবার পরিজনকে। এ কথা শোনার পর রসুল স. দণ্ডায়মান হলেন। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বক্তব্য প্রদান করলেন এভাবে— আম্মা বা'দ — হুনায়েনের মুজাহিদ বৃন্দ ! হাওয়াজেনরা তওবা করেছে । তারা এখন তোমাদের ভ্রাতা। সুতরাং তাদের নিবেদন যারা গ্রাহ্য করবে তাদেরকেই সর্বপ্রথম দেয়া হবে গণিমত। মুজাহিদগণ বললেন, আমরা আনন্দিত চিত্তে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসুল স. বললেন এভাবে সমস্বরে বলে উঠলে আমি বুঝতে পারবো না যে, তোমাদের মধ্যে কে এই সিদ্ধান্তে প্রসন্ন এবং কে প্রসন্ন নয়। সুতরাং তোমরা আপনাপন স্থানে ফিরে যাও। তোমাদের নেতাদের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও। সকলে প্রস্থান করলে রসুল স. গোত্রীয় নেতাদেরকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের সকলের নিকট থেকে এ ব্যাপারে মতামত জেনে আসতে বললেন। নেতৃবৃন্দ তাদের লোকজনের মতামত জেনে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সকলেই বন্দীদেরকে তাদের স্বজনদের নিকটে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত।

আবু দাউদ, বায়হাকী ও আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু তোফায়েল বলেছেন, আমি দেখলাম জিয়িররানায় গোশত বণ্টন করছেন রসুল স. (সম্ভবতঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে ভেড়া, বকরী ইত্যাদি বণ্টনের কথা বলা হয়েছে

এখানে)। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন এক বেদুইন রমণী। তিনি রসুল স. এর একেবারে কাছে চলে গেলেন। রসুল স. তাঁর উপবেশনের জন্য তাঁর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনিও বসে পড়লেন ওই চাদরের উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? একজন বললেন, ইনি রসুল স. এর দুগ্ধদাত্রী জননী।

আবু দাউদের 'মারাসিল' গ্রন্থে রয়েছে, হজরত ওমর ইবনে সায়েবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর নিকটে একদিন এলেন— তাঁর দুগ্ধদান সম্পর্কীয় পিতা। রসুল স. তাঁর চাদরের একাংশ বিছিয়ে বসতে দিলেন তাঁকে। তিনিও বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর এলেন তাঁর দুগ্ধদাত্রী মা। তাঁকে বসার জন্য রসুল স. বিছিয়ে দিলেন চাদরের অপরাংশ। এরপর এলেন তাঁর দুগ্ধ-ভ্রাতা। রসুল স. উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বসালেন সামনে।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিতদের অনুসরণের নির্দেশ দিলেন। বললেন, বনী সা'দ গোত্রের ওই লোকটিকে ছেড়ো না। রসুল স. নির্দেশিত ওই লোকটি ছিলো খুনী। সে একজন মুসলমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে জ্বালিয়েছিলো। অনুসন্ধানী অশ্বারোহীরা ওই পলাতক খুনীকে বন্দী করতে সমর্থ হয়। তাঁরা রসুল স. এর দুধ বোন সীমাকেও বন্দী করে আনেন। বন্দী হওয়ার সময় তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি। বন্দিনী সীমাকে রসুল স. সকাশে উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন, মোহাম্মদ আমি তো তোমার বোন। রসুল স. বললেন, প্রমাণ কি? সীমা তাঁর শরীরের একটি কাটা দাগ দেখালেন। বললেন, এই ক্ষত চিহ্নটি তোমার কারণেই হয়েছে। একদিন পর্বত উপত্যকায় আমাদের পশুগুলো চরাচ্ছিলাম। তখন তুমি ছিলে আমার কোলে। মায়ের দুধ পান নিয়ে বচসা বেঁধেছিলো আমাদের মধ্যে। তখন তুমি আমার এ স্থানটি কেটে দিয়েছিলে। সব কথা মনে পড়ে গেলো রসুল স. এর। বহুদিন পর বোনকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। আনন্দাশ্রু দেখা দিলো তাঁর পবিত্র দু'চোখে। গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে বসো। জানতে চাইলেন পিতা মাতার খবর। সীমা বললেন, তাঁরা তো চলে গিয়েছেন। রসুল স. নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, প্রিয় বোন, তুমি যদি এখানে থাকতে চাও তবে সসম্মানে থাকতে পারবে। আর যদি আপন গোত্রে ফিরে যেতে চাও, তবে যথাযোগ্য মর্যাদায় তোমাকে পৌঁছে দেয়া হবে। সীমা ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, আমি আমার আপন আবাসে ফিরে যেতে চাই। রসুল স. তাঁকে দান করলেন তিনজন ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। একটি বা দু'টি উট। বললেন, ঠিক আছে। তুমি জিয়িররানায় গিয়েই থাকো। আমি এখন তায়েফে যাচ্ছি। সীমা ফিরে গেলেন জিয়িররানায়। রসুল স. চললেন তায়েফে। তায়েফ থেকে ফেরার পথে জিয়ির-

রানায় হাজির হলেন তিনি। বোনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এবং তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে দান করলেন আরো কয়েকটি উট ও বকরী। সীমা আবেদন করলেন, প্রিয় ভাই আমার! আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও। রসুল স. তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

ইউনুস বিন ওমর সূত্রে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, রসুল স. হাওয়াজেন বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। একটি উটে চড়ে রওয়ানা হলেন তায়েফের দিকে। অনেক লোক অনুসরণ করলো তাঁর এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্র রসুল! গণিমতের সম্পদ থেকে আমাদেরকেও দান করুন। লোকের ভিড়ে রসুল স. যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হন। বাহন থেকে নেমে একটি গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। প্রার্থীরা তাঁর চাদর নিয়ে নেয়। তিনি স. বলেন, আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন যাঁর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যদি তাহামা অঞ্চলের সকল বৃক্ষের সমান উটও আমার নিকটে থাকে, তবে আমি তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেবো। কোনোই কার্পণ্য করবো না।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, আরবের কতিপয় নেতাকে কেবল তাদের মনোরঞ্জনের জন্য হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেয়া হয়েছিলো। রসুল স. সর্বপ্রথম তাদেরকেই গণিমত দান করেছিলেন। কাউকে দিয়েছিলেন একশতটি এবং কাউকে দিয়েছিলেন পঞ্চাশটি করে উট। পঞ্চাশের কমে কাউকে দেননি। সালেহী এ রকম সাতান্ন জনের নাম উল্লেখ করেছেন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট তখন একশ' উট চেয়েছিলাম। তিনি স. আমাকে একশ' উটই দিয়েছিলেন। আমি পুনরায় তাঁর নিকট একশ' উট চাইলাম। তিনিও পুনরায় এক'শ উট দিলেন এবং বললেন, হাকিম, এগুলো হচ্ছে সুমিষ্ট সম্পদ। উদার অন্তরে গ্রহণ করো। বরকত লাভ করবে। লোভের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করলে বরকত পাবে না। যেমন পেটুক ব্যক্তিরা যতই আহার করুক না কেনো, তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম (গ্রহিতা অপেক্ষা দাতা উত্তম)। সুতরাং সবসময় দান করতে চেষ্টা করবে। হাকিম বললেন, যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহ্র শপথ! আমি এখন থেকে কারো নিকটে কিছু চেয়ে নিজেকে ছোট করবো না। তাই করেছিলেন তিনি। হজরত ওমর তাঁর খেলাফত কালে হাকিমকে কিছু দিতে চাইলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। হজরত ওমর তখন বলেছিলেন, হে লোক সকল! আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি হাকিমকে তাঁর অংশ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। ইবনে আবী জিয়াদের বর্ণনায় এসেছে, হাকিম প্রথম বারের একশ' উট নিয়েছিলেন। পরের একশ' উট তিনি নেননি।

রসুল স. তখন সুহাইল বিন আমরকে দিয়েছিলেন একশ' উট, আবু সুফিয়ান বিন হরবকে দিয়েছিলেন একশ' উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকেও দিয়েছিলেন একশত করে উট ও চল্লিশ আওকিয়া চাঁদি।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, রসুল স. ছিলেন আমার দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়। কিন্তু হুনায়েন যুদ্ধের পর তিনি আমাকে এতো বেশী দান করলেন যে, তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় না ভাবা আমার পক্ষে হয়েছিলো অসম্ভব। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন সাফওয়ানকে দিয়েছিলেন একশ' উট। এরপর একশ'। তারপর আবার একশ'। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ান রসুল স. এর সঙ্গে চলতে চলতে এক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে জমা করা ছিলো অনেক উট, বকরী ও ভেড়া। ওগুলো ছিলো গণিমতের মাল— যা, আল্লাহ্পাক যুদ্ধ ব্যতীত রসুল স.কে দান করেছিলেন। সাফওয়ান পশুগুলোকে খুব পছন্দ করলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেগুলোর দিকে। রসুল স. বললেন আবু ওহাব! এগুলো কি তোমার পছন্দ? সাফওয়ান বললো, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, ঠিক আছে, এগুলো সব তোমার। সাফওয়ান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসুল। রসুল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ রকম আনন্দিত চিত্তসম্বলিত দান সম্ভব নয়।

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত রাফে বিন খাদিজ বলেছেন, মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রসুল স. প্রথম দান করেছিলেন একজন পুরুষকে। এরপর অন্যদেরকেও শত শত উট প্রদান করেছিলেন। আব্বাস বিন মুরদাসকে দান করেছিলেন এক শতের কম উট। আব্বাস তখন এই কবিতাটি পাঠ করেছিলেন— আপনি কি আমাকে ওয়াইনা বিন হাসান ফাজারী এবং আকরা বিন হাবাসের সমান্তরাল করে দিতে চান? হাসান ও হাবাস তো কখনো আমার পিতা মুরদাসের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলো না। এই কবিতা শুনে রসুল স. তার উট এক শত পুরো করে দিলেন।

রসুল স. ওসমান বিন ওয়াহাব, আদি বিন কায়েস, উমায়ের বিন ওয়াহাব, আলা বিন জরিয়া, মাখরামা বিন নওফেলকে তাদের মনোতুষ্টির জন্য পঞ্চাশটি করে উট প্রদান করলেন। এরপর হজরত যায়েদ বিন সাবেতকে নির্দেশ দিলেন, সৈন্যদের সংখ্যা নিরুপণ করো। আর গণিমতের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হও। নির্দেশানুযায়ী সেনা সংখ্যা ও সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণের পর গণিমত বণ্টন শুরু করা হয়। পদাতিকেরা পায় চারটি করে উট এবং চল্লিশটি করে বকরি। অশ্বারোহীদের দেয়া হয় বারোটি করে উট অথবা একশত বিশটি করে বকরি

(অশ্বারোহীরা পায় পদাতিকদের তিনগুণ) একাধিক অশ্বের অধিকারীদেরকে তাদের অতিরিক্ত অশ্বের জন্য কিছুই দেয়া হয় না। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে উট ছিলো চব্বিশ হাজার আর বকরি ছিলো চল্লিশ হাজারের বেশী। একটি উটকে ধরা হয়েছিলো দশটি বকরির সমান। মনোতুষ্টি সাধনার্থে সর্বমোট দেয়া হয়েছিলো চার হাজার উট। তাদের অংশ ধরা হয়েছিলো পঁচিশ শত (খুমুসুল খুমুস), অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী। বরং সমস্ত সম্পদের সাত ভাগের এক ভাগ দেয়া হয়েছিলো তাদেরকে। এমতো অবস্থায় দু'টি অভিমতের একটিকে গ্রহণ করতে হবে। নতুবা হিসেবে থেকে যাবে বৈসাদৃশ্য। আসলে কিছু লোকের মনোতুষ্টির জন্য তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে সমস্ত সম্পদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছিলো প্রথমে। তারপর সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছিলো অবশিষ্ট অংশ। সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো বারো হাজার বা ষোল হাজার। কেউ কেউ ছিলেন অশ্বারোহী। পদাতিকদের ভাগে পড়ে চারটি করে উট। আর অশ্বারোহীরা পায় ষোলটি করে। এভাবে হিসাব করলে গণিমতের সর্বমোট উটের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট হাজার। অথচ উটের সংখ্যা ছিলো চব্বিশ হাজার বা আটাশ হাজার। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে অতিরিক্ত উটগুলো কোত্থেকে এলো? এই জটিলতাটি নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ গণিমতের চাঁদিগুলোকেও উটের মাপ কাঠিতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ বিন হারেস তায়েমী বলেছেন জনৈক সাহাবী (মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তাঁর নাম হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস) তখন বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি তো উয়াইনিয়া বিন হাসান এবং আকরা বিন হাবাসকে এক শত করে উট প্রদান করেছেন। কিন্তু জায়িল বিন সুরাকা জামেরীকে দিলেন অনেক কম। তিনি স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ! উয়াইনিয়াও আকরার চেয়ে অনেক উত্তম। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাকে আমি দান করেছি বেশী। আর সুরাকাকে তো আমি ইসলামে সমর্পিত করেই দিয়েছি (তার ইসলাম ও ইমান চির অনড়)।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আমর ইবনে সা'লাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের পর কাউকে কাউকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছিলেন। কাউকে দেননি। যাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি তারা মনে করলেন, আল্লাহর রসুল হয়তো আমাদের উপর নারাজ। তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে রসুল স. বললেন, ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করার জন্য দুর্বলচিত্ত ইমানদারদেরকে আমি এভাবে উপহার প্রদান করলাম । আর যাদের ইমান মজবুত তাদেরকে আমি কিছুই দেইনি। ওমর ইবনে সা'লাবও রয়েছে তাদের মধ্যে। হজরত ওমর ইবনে সা'লাব বলেছেন, রসুল স. এর এ কথা লাল উটের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা

আমার নিকট অধিকতর প্রিয় মনে হলো। রসুল স. আরো বললেন, আমার প্রিয়জনদের ছেড়ে ওই সকল লোকদেরকে উপহার প্রদান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ কথা ভেবে আমি দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়ি যে, আমার এহেন উপহার না পেয়ে তারা যদি ধর্মত্যাগ করে জাহান্নামের পথে চলে যায়, তবে কিভাবে তারা সহ্য করবে আল্লাহ্র আযাব। বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, ইমাম আহমদ— হজরত আনাস বিন মালেক থেকে আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াজিদ বিন আসেম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধের গণিমত ইচ্ছে মতো কুরায়েশ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে দান করেছিলেন। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাদের প্রত্যেককে রসুল স. দান করেছিলেন একশ'টি করে উট। কিন্তু আনসারদেরকে তিনি কোনো কিছুই দেননি। এতে করে আনসারেরা মনোক্ষুণ্ণ হলেন। কেউ কেউ বলতে শুরু করলেন, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে নিরাপদ রাখুন। আর্শ্চয! তিনি কুরায়েশদেরকে সব দিয়ে দিচ্ছেন, আমাদেরকে কিছুই দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারীও শত্রুদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বিপর্যয় দেখা দিলে আমাদেরকে আহ্বান করা হয়। অথচ গণিমত পায় অন্যেরা। আমরা জানি না কোন বিধান অনুসারে এ রকম করা হচ্ছে। যদি আল্লাহ্র নির্দেশে এ রকম করা হয় তবে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো। আর যদি রসুল স. এর নির্দেশে এ রকম করা হয়ে থাকে তবে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করবো তাঁর অসন্তোষ থেকে। একজন আনসার বললেন, আমার তো আগেই ধারণা হয়েছিলো, কাজ শেষ হয়ে গেলে অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। আমরা তখন হয়ে পড়বো অপাংক্তেয়। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, আনসারগণের এ রকম কথোপকথনের সংবাদ রসুল স. পর্যন্ত পৌছলো। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, তখন হজরত ইবনে উবাদা রসুল স,এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আনসারগণ খুবই মনোক্ষুণ্ণ। রসুল স. বললেন, কেনো? হজরত সা'দ বললেন আপনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছেন কেবল আপনার সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য আরব নেতাদেরকে। তাদেরকে কিছুই দেননি। রসুল স. বললেন, এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ? হজরত সা'দ বললেন আমি তো তাদেরই একজন। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ বেষ্টনীর মধ্যে একত্র করো। হজরত সা'দ বাইরে এসে আনসার সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করলেন। একে একে উপস্থিত হলেন সকল আনসার। একজন মুহাজির সাহাবীও এলেন। হজরত সা'দ তাঁকেও বসবার অনুমতি দিলেন। তার দেখাদেখি অন্যান্য মুহাজির সাহাবীও ওই

মজলিশে বসবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হজরত সা'দ অনুমতি দিলেন না। কিছুক্ষণ পর আনসার সাহাবীগণের সমাবেশে উপস্থিত হলেন রসুল স.। বর্ণনা করলেন আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। তারপর বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। ছিলে নিঃস্ব। তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে করেছেন বিত্তশালী। ছিলে পরস্পরের শত্রু। তারপর পারস্পরিক শত্রুতা মিটিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ই তোমাদেরকে করেছেন একতাবদ্ধ। বলো, আমি ঠিক বলেছি কিনা? আনসারগণ জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি ঠিকই বলেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন। এ রকম প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। রসুল স. বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা বাস্তবসম্মত কথা বলছো না কেনো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি। রসুল স. বললেন, তোমরা বলতে পারো— হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন, আমরা আপনাকে স্বাগতম জানিয়েছি। আপনি ছিলেন সহায়হীন, আমরা আপনাকে দিয়েছি অন্তরঙ্গ আতিথ্য। আপনি ছিলেন শংকাগ্রস্ত। আমরা আপনাকে করেছিলাম শংকামুক্ত। যখন কেউ আপনাকে সাহায্য করেনি, তখন আমরা হয়েছি আপনার সাহায্যকারী। যখন আপনাকে সকলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, তখন আমরাই বিশ্বাস করেছিলাম আপনাকে। আনসারগণ বললেন, আমাদের উপরে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের অপার অনুগ্রহ। রসুল স. বললেন, যদি তাই হয়, তবে আমি এ রকম কথা শুনতে পাচ্ছি কেনো? আনসারগণ রইলেন নিরুত্তর। রসুল স. পুনরায় একই প্রশ্ন করে বসলেন। তখন কতিপয় বিজ্ঞ আনসার সাহাবী নিবেদন করলেন, আমাদের কিছু যুবক এ রকম বলেছে। রসুল স. বললেন, আমি এমন লোকদেরকে পুরস্কার প্রদান করেছি যাদের বিশ্বাস এখনো সুদৃঢ় নয়। যারা এখনো অতিক্রম করছে মূর্খতার ক্রান্তিকাল। অপর বর্ণনায় এসেছে এ রকম— আমি কুরায়েশদেরকে উপহার প্রদান করেছি এ জন্যে যে, তারা এখন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বহারা। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিহীনতার জখমের উপরে আমি বুলিয়ে দিচ্ছি সান্ত্বনার প্রলেপ। হে আনসার জনতা! তোমাদের অন্তরে নশ্বর পৃথিবীর সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে কেনো? আমি তো তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আল্লাহ্র মনোনীত ইসলামের উপর, যে ইসলাম দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৌভাগ্যশালী করেছেন। হে ইসলামের সাহায্যকারী! তোমরা কি এ কথা ভেবে আনন্দিত নও যে, লোকেরা পশুপাল নিয়ে চলে যাবে, আর তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আল্লাহ্র রসুলকে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা তাদের ঘরে নিয়ে যাবে দুনিয়া, আর তোমরা তোমাদের ঘরে নিয়ে যাবে আল্লাহ্র রসুলকে। যার

অলৌকিক হস্তে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! সকল লোক যে পথে চলে সে পথে নয়— আমি চলবো ওই পথে, যে পথের পথিক আনসার সম্প্রদায়। অন্য লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাহ্যিক। আর আনসারদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আন্তরিক। আনসারেরা আমার কলিজা, গোপন সম্পদ। আমি যদি হিজরতকারী না হতাম, তবে অবশ্যই হতাম আনসারদের অন্তর্ভূত। হে আমার আল্লাহ্! আনসারদের প্রতি, তাদের সন্তানদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। এই হৃদয়হারক বক্তৃতা শুনে আনসারগণ কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের জলে ভিজে গেলো তাঁদের শ্মশ্রুসমূহ। তারা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে পেয়ে পরিতুষ্ট (পৃথিবীর সম্পদ আমরা চাই না)।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, এরপর রসুল স. বাহরাইনের জায়গীর আনসারদের নামে লিখে দিতে চাইলেন। তখনকার বাহরাইন ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর একটি অঞ্চল। আনসারগণ বাহরাইনের জায়গীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! দুনিয়া আমরা চাই না। রসুল স. বললেন, আমার পরলোকগমনের পর অন্যেরা তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে (অধিকারী হবে সম্পদের ও কর্তৃত্বের)। তোমরা তখন ধৈর্য ধারণ কোরো— যে পর্যন্ত না হাউজে কাওসারের সন্নিকটে আমার সঙ্গে মিলিত হও।

যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতাগণ লিখেছেন, যুদ্ধশেষে হাওয়াজেনদের প্রতিনিধি দলের নিকট রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, মালেক বিন আউফ কোথায়? তারা বললো, সাকিফ গোত্রের সঙ্গে। তিনি তায়েফ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রসুল স. বললেন, তাকে গিয়ে বলো, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আমি তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়ে দিবো। একশত উটও দান করবো। রসুল স. মালেকের পরিবার পরিজনকে তার মক্কাবাসিনী ফুফী উম্মে আবদিল্লা বিনতে উমাইয়ার গৃহে বন্দী করে রেখেছিলেন। রসুল স. এর প্রস্তাব মালেকের নিকট পৌঁছানো হলো। সে বুঝতে পারলো, তার পরিবার পরিজন বিশেষ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে মনস্থির করলো, রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত হতেই হবে। কিন্তু সে ভাবলো, এ কাজ করতে হবে অত্যন্ত গোপনে। নতুবা আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাকে বন্দী করে ফেলবে। সে তার নির্ভরযোগ্য অনুচরকে ওহানা নামক স্থানে একটি উট প্রস্তুত রাখতে বললো। তারপর গভীর রাতে সকলের অগোচরে দুর্গ থেকে বের হয়ে একটি ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছে গেলো সেখানে। তারপর সেখান থেকে উষ্ট্রারোহী হয়ে রওনা দিলো জিয়িররানা অথবা মক্কার দিকে। রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হলে ফিরিয়ে দেয়া হলো তার পরিবার পরিজন ও সম্পদ। দেয়া হলো একশত উটও। মালেক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সর্বান্তকরণে। পরবর্তী জীবনে সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। রসুল স. তাঁকে হাওয়াজেন, সাক্বিফ ও সালমা গোত্র থেকে আগত নওমুসলিমদের নেতৃত্বে

অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ওই অঞ্চলের অন্যান্য নওমুসলিমদেরকেও করে দিয়েছিলেন তাঁর নেতৃত্বের অধীন। এরপর মালেক মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। লুণ্ঠন করেন জংগলে লুকিয়ে রাখা সাকিফদের পশুর পাল। প্রতিবাদী আকাদ অঞ্চলের লোকদের করেন হত্যা। যথারীতি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ পাঠিয়ে দেন রসুল স. এর দরবারে। এভাবে একবার পাঠান একশত উট ও এক হাজার ছাগল ও ভেড়া। তায়েফবাসীদের পশুগুলোকেও ধরে আনেন তিনি। এক দিনেই সেখান থেকে নিয়ে আসেন এক হাজার মেষ ও ছাগল।

ইবনে ইসহাক সূত্রে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, নবম হিজরীর রমজান মাসে সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিরা রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটেছিলো তাবুক যুদ্ধের পরে।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❒ হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মস্‌জিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

'নাজাসুন' অর্থ অপবিত্র। শব্দটির উৎসরণ ঘটেছে সামেয়া ও কারুমা রীতি অনুসারে। তাই শব্দটি একবচন বোধক, বহুবচন বোধক নয়। আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি একইরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিকে ধাতু বা শব্দমূল যেমন বলা যাবে না, তেমনি শব্দমূল নয়— এ রকমও বলা যাবে না। এখানে বিধেয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উদ্দেশ্য। বিধেয় হওয়ার কারণেই শব্দটি এখানে মূল ধাতুরূপে গণ্য। এখানে বলা হয়েছে, আল মুশরিকুনা নাজাসুন (অংশীবাদীরা তো অপবিত্র)। এ রকম বক্তব্যভঙ্গির কারণে প্রমাণিত হয় যে, অংশীবাদীরা প্রকৃত অর্থেই অপবিত্র। অর্থাৎ তাদেরকে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে হাত নাপাক হয়ে যাবে। তারা নাপাকী বহনকারী বা অপবিত্রতাবাহী— এ রকমও বলা যেতে পারে।

'নাজাসুন', 'নিজসুন', 'নাজিসুন', 'নাজুসুন'— শব্দগুলো সমঅর্থসম্পন্ন। 'কামুস' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, 'নাজাস' বলা হয় ওই সকল বস্তুকে, যেগুলোকে একজন সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি অপবিত্রতা বলে থাকে। যেমন— মল, মূত্র,

বীর্য, রক্ত ইত্যাদি। এগুলো প্রকৃত অর্থেই নাপাক। শরিয়তও এগুলোকে নাপাক বলেছে। এগুলোর নাপাকি অবশ্যই বাহ্যিক। এগুলোকে মুমিন, মুশরিক সকলেই নাপাক বলে থাকে। কিন্তু এখানে মুশরিকদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে এ সকল কারণে নয়। তাদের নাপাকি অস্তিত্বজ ও অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক নাপাকি থেকে যেমন মুক্ত থাকা আবশ্যক, তেমনি অভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকেও মুক্ত থাকা অপরিহার্য। অতএব, অংশীবাদীদের স্পর্শ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে একত্রবাস বৈধ নয়। বসতবাটিও নির্মাণ করা সমীচীন নয় তাদের বসতবাটির সঙ্গে।

হজরত আবু উবায়দা এবং জুহাক বলেছেন, এখানে নাজাসাত অর্থ নাজাসাতে গলিজা (গুরু অপবিত্রতা), নাজাসাতে খফিফা (লঘু অপবিত্রতা) নয়। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এখানে শারীরিক অপবিত্রতার কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে বিধানগত (হুকুমী) অপবিত্রতার কথা। কোনো প্রকার ব্যাখ্যা বা কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকেই এখানে অংশীবাদীদেরকে কেবল হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অপবিত্র'।

কাতাদা বলেছেন, কাফেরেরা এ কারণে অপবিত্র যে, তারা ওজু ও রতিকর্ম পরবর্তী গোসল কিংবা বীর্যস্খলন পরবর্তী গোসল করে না। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুশরিকেরা কুকুরের মতো অপবিত্র। কুকুরের দেহ যেমন নাপাক, তেমনি মুশরিকদের শরীরও নাপাক। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু শায়েখ ও ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, রসুল স. নির্দেশ করেছেন, তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে করমর্দন করলে ওজু করে নিয়ো। অথবা নির্দেশ করেছেন, হাত ধুয়ে নিয়ো। এই বিবরণটি আলেমগণের ঐকমত্যবিরোধী— তাই অগ্রহণীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।' হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেছেন, এ কথার অর্থ— এ বছরের পর থেকে মুশরিকেরা যেনো হজ ও ওমরা না করে। এই নির্দেশনাটির মাধ্যমে মসজিদুল হারামে তাদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাই অন্যান্য মসজিদে তাদের প্রবেশ অসিদ্ধ নয়। 'নিকটে না আসে' কথাটির অর্থ এখানে— তারা যেনো মসজিদুল হারামের সন্নিকটে এসে হজ ও ওমরা না করে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'নিকটে না আসে' বলে এখানে অংশীবাদীদের হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে মসজিদের নিকটে চলে আসা। এখানকার

বাকভঙ্গিটি অন্য একটি আয়াতের মতো, যেখানে বলা হয়েছে— 'সুবহানাল্লাজী আস্‌রা বি আ'বদিহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা' (পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি রাতে তাঁর আপনতম বান্দাকে ভ্রমণ করান মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়)। আয়াতটি রসুল স. এর মেরাজ সম্পর্কিত। মেরাজের রাতে রসুল স.কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো হজরত উম্মে হানির ঘর থেকে। মসজিদুল হারাম (কাবা শরীফ) থেকে নয়। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে— মসজিদুল হারাম থেকে। সুতরাং আলোচ্য নির্দেশনাটির অর্থ হবে— মুশরিকেরা যেনো হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ না করে।

ইমাম বাগবী লিখেছেন, ১. জিম্মী (কর প্রদাতা), বিদ্রোহী, সন্ধিবদ্ধ— সকল প্রকার মুশরিকদের জন্য হেরেম শরীফের সীমানায় অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। আমিরুল মু'মিনীন (ইমানদারদের নেতা) হেরেম শরীফে অবস্থানের সময় যদি কাফের সাম্রাজ্যের কোনো দূত আগমন করে, তবে তাকে হেরেমে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যাবে না। আমিরুল মু'মিনীন তাঁর প্রতিনিধিকে হেরেমের বাইরে পাঠিয়ে দূতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন।

২. হেরেম শরীফের বাইরে হেজাজের অন্যান্য অঞ্চলে কার্যোপলক্ষে কাফেরেরা আগমন করতে পারবে তবে তিন দিনের বেশী অবস্থান করতে পারবে না। হজরত ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবীর জীবনে সময় পেলে আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবো। মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ এখানে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু রসুল স. তাঁর এই ইচ্ছাটির বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে খলিফা হজরত আবু বকরও একাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। হজরত ওমরের খেলাফতকালে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবরূপ নিয়েছিলো। হজরত ওমর সকল অমুসলিমকে বের করে দিয়েছিলেন জাজিরাতুল আরব থেকে। অবশ্য বাণিজ্য ব্যাপদেশে অমুসলিম ব্যবসায়ীরা হেজাজে আসা যাওয়া করতে পারতো। কিন্তু তিন দিনের বেশী তাদেরকে থাকতে দেয়া হতো না। জাজিরাতুল আরবের সীমানা হচ্ছে দৈর্ঘ্যে এডেন বন্দর থেকে ইরাকের শস্যভূমি পর্যন্ত। আর প্রস্থে জেদ্দার সাগরোপকূল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত।

৩. অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের জিম্মিরাও মুসলমানদের অনুমতি ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে কাবা শরীফ ও অন্যান্য মসজিদের মধ্যে বিধানগত পার্থক্য নিরুপণ করেছেন। বলেছেন, বিধর্মীদের জন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। মালেকী মতাবলম্বীগণ ও মাজানীর অভিমত হচ্ছে, হেরেম শরীফে বিধর্মীদের প্রবেশ যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যান্য মসজিদেও তাদের প্রবেশ নাজায়েয। ইমাম বোখারী মসজিদে বিধর্মীদের প্রবেশ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। ওই অধ্যায়ে হজরত আবু হোরায়রা

কর্তৃক এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. কতিপয় অশ্বারোহী যোদ্ধাকে প্রেরণ করলেন নজদের দিকে। তাঁরা সেখান থেকে ধরে নিয়ে এলেন বনু হানুফার সুমামা বিন আম্‌সাল নামের এক লোককে। তাকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুরা আন্‌ফালের তাফসীরে এই ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে বিধর্মীদের মসজিদে প্রবেশ বৈধ প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঘটনাটি ঘটেছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আর মসজিদে বিধর্মীদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর, নবম হিজরীতে।

কোনো কোনো আলেম ধারণা করেন, আহলে কিতাবকে (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে) বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদুল হারামে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার এই মতকে খণ্ডন করেছেন। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন, সুমামাকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখার হাদিসটি উল্লেখিত অভিমতের একটি বিরুদ্ধ প্রমাণ। কারণ সুমামা আহলে কিতাব ছিলো না।

বায়যাবী এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামের শাখা-প্রশাখাগত নির্দেশ অমান্যকারীরাও কাফের। তাই তাদেরকে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বায়যাবীর এ অভিমতটি ভুল। কারণ আয়াতে নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের প্রতি। মুসলমানদের প্রতি নয়। ইমানদারদেরকে সম্বোধন করে কেবল জানিয়ে দেয়া হয়েছে নির্দেশনাটি। তাই শুরুতে বলা হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজীনা আমানু (হে বিশ্বাসীগণ)।

উল্লেখ্য যে, নির্দেশটি শাখা-প্রশাখাগত হলে হজও হয়ে পড়বে শাখা-প্রশাখাগত বিষয়। তখন মূল বিষয় হবে কেবল তৌহিদ (এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস) এবং রেসালত (রসুলে বিশ্বাস)। কিন্তু ব্যাপারটি সেরকম নয়। হজ ইসলামের মূল বিষয়ের অন্তর্ভূত। তাই আলোচ্য আয়াতে তাদের হজ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ রকম বললে আবার সৃষ্টি হয় বৈপরীত্য। আরো উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ প্রতিপালনের মধ্যে রয়েছে সওয়াব বা পুণ্য প্রাপ্তির সুযোগ। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে, অবিশ্বাসীদেরকে তাদের ভালো কাজের জন্য সওয়াব দেয়া হয় না। কারণ সওয়াব ধারণের মূল পাত্র ইমানই তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর, আবু শায়েখ এবং হজরত ইকরামা থেকে আতিয়া আউফি, জুহাক, কাতাদা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, বিধর্মী ব্যবসায়ীরা হেরেম শরীফের সীমানায় প্রবেশ করে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানেরা পড়ে যান সংকটে। তাঁরা বলাবলি করতে থাকেন, এখন আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী পাবো কেমন করে? তখন অবতীর্ণ হলো আয়াতের শেষ অংশ এভাবে— 'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

আল্লাহ্তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভর করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখানে। বলে দেয়া হয়েছে— মানুষ বিত্তাধিকারী হতে পারে কেবল আল্লাহ্তায়ালার অনুকূল ইচ্ছায়। আল্লাহ্তায়ালা সর্বজ্ঞ। বিধর্মীদের ও বিশ্বাসীদের ধ্যান ধারণা, কথাবার্তা সবকিছুই তাঁর অসীম জ্ঞানের অধীন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। বিত্তাধিকারী ও বিত্তহীন করা না করার মধ্যে রয়েছে তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন। অতএব, হে বিশ্বাসীরা! তোমরা শুভ পরিণামের অপেক্ষা করো। সমর্পিত হও কেবল আল্লাহ্র প্রতি— যিনি সকলের অভাব মোচনকারী।

হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্পাক বিশ্বাসীদেরকে যে অচিরেই বিত্তশালী করবেন— তার সংবাদ দেয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ্তায়ালা প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন। এরপর থেকে আরব অঞ্চলেই শুরু হলো ফল ও ফসলের আবাদ। মুকাতিল বলেছেন, জেদ্দা, সানাআ ও জরশবাসীরা মুসলমান হয়ে গেলো। সেখানকার ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতে শুরু করলো প্রয়োজনীয় পণ্য। ফলে মক্কাবাসীদের আর কোনো অসুবিধা রইলো না।

জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন'— কথাটিতে এমতো ইঙ্গিত রয়েছে যে— অচিরেই বিজিত দেশ সমূহ থেকে আসতে থাকবে বিপুল জিযিয়া। তাই হলো। আসতে শুরু করলো বিপুল পরিমাণ জিযিয়া। আর ওই জিযিয়ার অংশ পেয়ে মুসলমানেরা হয়ে গেলেন বিত্তশালী।

সুরা তওবাঃ আয়াত ২৯

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُونَ ○

❒ যাহাদিগের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতে রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই রসুল স. এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রোমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তাবুক গমন করেন।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌কে ও পরকালকে বিশ্বাস করে না।' এখানে 'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস তাদের নেই।

একটি সন্দেহঃ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তো আল্লাহ্‌কে ও আখেরাতকে মানে। তবুও তাদেরকে এখানে এভাবে অবিশ্বাসী বলা হলো কেনো?

সন্দেহ ভঞ্জনঃ আল্লাহ্‌র প্রতি যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সেভাবে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে তাদের মনগড়া নিয়মে। এ রকম বিশ্বাস আল্লাহ্‌পাকের নিকট গ্রহণীয় নয়। যেমন— আল্লাহ্‌পাক চির অমুখাপেক্ষী। তিনি কারো সন্তান অথবা পিতা নন। অথচ ইহুদীরা হজরত উযায়েরকে এবং খৃষ্টানেরা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। যারা এ রকম বলে, তাদের 'ইমান' বলে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? আখেরাতের প্রতিও তাদের সঠিক বিশ্বাস নেই। তারা মনে করে, জান্নাত তাদের জন্য অবধারিত। ইহুদীরা বলে, তারা দোজখে গমন করলেও সেখানে তারা অবস্থান করবে অল্প কয়েকদিন মাত্র। তারা আরো বলে, জান্নাত দুনিয়ার মতোই। দুনিয়ার মতোই সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। আবার নাও থাকতে পারে। আখেরাত সম্পর্কে এ রকম ধারণা যারা রাখে তাদেরকে কি বিশ্বাসী বলা যায়? উল্লেখ্য যে, মোতাজিলারাও আখেরাতের প্রতি সঠিক বিশ্বাস রাখে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা নিষিদ্ধ করে না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা ও তাঁর রসুল মোহাম্মদ স. যে সকল বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেন, সেগুলোকে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা হারাম বলে মান্য করে না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'রসুল' বলে মোহাম্মদ মোস্তফা স. কে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে তাদের আপনাপন রসুলকে। অর্থাৎ হজরত মুসা ও হজরত ঈসাকে। তাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শেষ রসুল মোহাম্মদ স. আবির্ভূত হলে তাঁর অনুসারী হতে হবে। কিন্তু তারা এই নির্দেশ লংঘন করেছে। তাঁর অনুসরণ তো করেইনি, বরং করে চলেছে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও বিরুদ্ধাচরণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সত্য দ্বীনের অনুসরণ করে না।' কাতাদা বলেছেন, এখানে 'দ্বীনুল হাক্ব' (সত্য দ্বীন) কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্‌র দ্বীন। কেউ কেউ বলেছেন দ্বীন ইসলাম। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না' বলে এ কথাই বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যারা সত্যধর্মের অনুসারী, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি অনুগত নয়।

শেষে বলা হয়েছে 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।'

'জিযিয়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিনিময় বা বদলা। শব্দটির শেষ অক্ষর 'তা' প্রতিদান প্রকাশক। 'জিযিয়া' হচ্ছে অপদস্থতার নিদর্শন। ওই সকল লোককে জিযিয়া কর দিতে হবে, যাদেরকে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ জিযিয়া প্রদাতা নির্ধারণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'জাযা দাইনাহু' থেকে, যার অর্থ— সে তার ঋণ পরিশোধ করেছে। এখানে আঁইয়্যাদিঁউ অর্থ আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। 'ইয়াদ' অর্থ হাত। এখানে অর্থ আনুগত্যের হাত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে, নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। অন্যের মাধ্যমে নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জিম্মীরা (কর প্রদাতা অবিশ্বাসীরা) নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। অন্য কাউকে মাধ্যম নিযুক্ত করতে পারবে না। এ রকমও হতে পারে যে, 'আন ইয়াদিন' কথাটির অর্থ এখানে— অপদস্থতার সঙ্গে জিযিয়া পরিশোধ করা। আবু উবায়দা বলেছেন, কাফেরদেরকে জিযিয়া দিতে হবে বাধ্যতার বিস্বাদ ও ভয়ের অনুভূতির সঙ্গে। এভাবে বাধ্যতামূলক দেয়কে আরববাসীরা প্রকাশ করে এভাবে— ফুলানুন আয়্'তা আন ইয়াদিন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আন ইয়াদিন' অর্থ নগদ প্রদান করা। বাকী না রাখা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে— কৃতজ্ঞচিত্ততার নিদর্শনরূপে জিযিয়া দেয়া। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করতে হবে এ রকম মনোভাব নিয়ে যে 'মুসলমানেরা অতি মহৎ— তাই দয়া করে জিযিয়া গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'সগিরুন' অর্থ নত হয়ে, অপমানিত ও পরাজিত হয়ে। হজরত ইকরামা বলেছেন, এখানে কথাটির উদ্দেশ্য হবে— জিযিয়া গ্রহণকারী থাকবে উপবিষ্ট অবস্থায়। আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে থাকবে তার সামনে। এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁদের স্কন্ধদেশ পদদলিত করে আদায় করতে হবে জিযিয়া। কালাবী বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণকালে তাদের ঘাড়ে মুষ্টাঘাত করে প্রাপ্তি স্বীকারের কথা জানিয়ে দেয়া যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণের সময় তাদের দাড়ি ধরে তাদেরকে চড় থাপ্পড়ও মারা যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের জামার গলার কাছে ধরে বলপূর্বক তাদেরকে তাদের সঞ্চয়স্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিধর্মীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করার অর্থই তাদেরকে অপদস্থ করা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, জিম্মীদেরকে ইসলামের বিধানের আওতায় আনার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে পরাভূত করা।

আলোচ্য আয়াতে কেবল আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যান্য বিধর্মীর কথা এখানে বলা হয়নি। তাই হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় অন্যান্য বিধর্মীদের রাজ্য জয় করার পর তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি। কিন্তু হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলেন যে, রসুলুল্লাহ্ স. অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করতে বলেছেন, তখন হজরত ওমর অন্যান্য বিধর্মীদের উপরেও জিযিয়া নির্ধারণ করলেন। বোখারী এই বর্ণনাটি এনেছেন বাজালাহ্ বিন ইবাদ থেকে। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, বাজালাহ্ বর্ণনাকারী হিসেবে অপরিচিত। কিন্তু তাঁর গ্রন্থের 'জিযিয়া' অধ্যায়ে লিখেছেন, তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস বিশুদ্ধ পদবাচ্য। এ কারণে অগ্নিউপাসকদের উপর জিযিয়া নির্ধারণের ব্যাপারটি ঐকমত্যসম্মত।

মতপার্থক্যঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরব অনারব— সকল ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। অনারব মুশরিকদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে— তারা অগ্নিপূজক হোক অথবা মূর্তিপূজক। মুরতাদদের (ধর্মত্যাগীদের) নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, আরববাসীদের নিকট থেকে পুরোপুরি জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক— যেই হোক না কেনো। জিযিয়া আদায় করতে হবে কেবল অনারব আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট থেকে।

ইমাম মালেক এবং ইমাম আওজায়ী বলেছেন, আরব অনারব— সকল স্থানের কাফেরদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে। তবে মুরতাদ এবং কুরায়েশ মুশরিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, ব্যক্তির উপর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। জিযিয়া আরোপ করতে হবে বিধর্মীদের দলের উপর। তাই জিযিয়া আদায় করতে হবে আরব ও অনারব ইহুদী-খৃষ্টানদের নিকট থেকে। মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে সম্পূর্ণ জিযিয়া আদায় করা যাবে না। তবে ইমাম শাফেয়ীর নিকটে অগ্নিপূজারীরাও আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁর আল-উমে লিখেছেন, জাফর বিন মোহাম্মদ বলেছেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর একবার বললেন, আমি জানি না অগ্নিপূজারীদের ব্যাপারে আমার কি করা উচিত। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আহলে কিতাবেরা যে পদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেনো (তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে)।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমার নিকট নসর বিন আসেমের একটি বর্ণনা সাঈদ বিন মারজুবানের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন সুফিয়ান। ওই বর্ণনায় এসেছে, ফারওয়াহ্ বিন নওফেল বললেন, অগ্নিপূজারীর নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হবে কিসের ভিত্তিতে? তারা তো আহলে কিতাব নয়। এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন

মাসতুরাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ফারওয়ার জামার গলদেশ পেঁচিয়ে ধরে হুংকার ছেড়ে বললেন, রে আল্লাহ্‌র দুশমন! কীভাবে তুই হজরত আবু বকর, হজরত ওমর ও হজরত আলীর প্রতি দোষারোপ করতে পারলি! তাঁরা তো অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। এরপর মাসতুরাদ গেলেন খলিফার গৃহে। হজরত আলী তখন বললেন, আহা! আমি তো অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী জানি। তাদের মধ্যেও ধর্মের জ্ঞান ও কিতাব ছিলো। তারা তা শিক্ষা করতো ও অন্যকে শিক্ষা দিতো। একবার তাদের রাজা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়িয়ে ধরলো তার মা অথবা কন্যাকে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলো। তাদের আলেম সম্প্রদায় বললো, কিতাবের বিধান অনুসারে রাজাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাজা তখন জনসাধারণকে একত্র করে বললো, প্রথম নবী হজরত আদমের চেয়ে উত্তম ধর্ম আর কার হতে পারে? তিনি তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই অনুসারী। তোমাদেরও উচিত হজরত আদমের ধর্মমতের অনুসারী হওয়া। জনসাধারণ রাজার বিধানকেই মেনে নিলো। রাজার বিরুদ্ধবাদীদেরকে করা হলো হত্যা। এক রাতের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলো তাদের আলেম সম্প্রদায়। তাই অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। রসুল স. স্বয়ং, হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। হাদিসটি ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আত্‌তাহকিক' গ্রন্থে। কিন্তু সাঈদ বিন মারজুবানের বিরূপ সমালোচনাও সেখানে করা হয়েছে। ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবানের বর্ণনাকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করি না। ইয়াহ্‌ইয়া বিন কাত্তান বলেছেন, ওই লোকটি গ্রহণযোগ্য নয়। তার বর্ণনা লিপিবদ্ধযোগ্যও নয়। কাল্লাস বলেছেন, সাঈদ বিন মারজুবান পরিত্যক্ত। কিন্তু আবু উসামা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু জারআ বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, কিন্তু মুদলাস (প্রবঞ্চক)।

আমি বলি, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে রয়েছে, সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়ার মাধ্যমে নজর বিন আসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী বলেছেন, রসুলুল্লাহ্‌ স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর অগ্নিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছেন। আর আমি অগ্নিপূজারীদের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে ভালো জানি। তারা ছিলো আহলে কিতাব। তারা কিতাব পড়তো এবং শরিয়ত সম্পর্কে শিক্ষাও দিতো। কিন্তু তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে ইলমে ইলাহী উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। ইমাম আবু ইউসুফ নসর বিন খলিফা সূত্রে আরো লিখেছেন, ফারওয়াহ্‌ বিন নওফেল আশজায়ী একবার বললেন, অগ্নি উপাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হয়েছিলো— এ কথাটি মেনে নেয়া কঠিন। কারণ

তারা আহলে কিতাব ছিলো না। এ কথা শুনে মাসতুর বিন আহনাফ রাগের চোটে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই রসুল স. এর সিদ্ধান্ত নিয়ে রসিকতা করেছিস। এক্ষুণি তওবা কর। নয়তো আমি তোকে হত্যা করবো। রসুল স. তওবাজারে বসবাসকারী অগ্নিউপাসকদের নিকট থেকে কর আদায় করেছেন। শেষে দু'জনে বিষয়টি ফয়সালার জন্য উপনীত হলেন হজরত আলীর নিকটে। হজরত আলী বললেন, আমি অগ্নিউপাসকদের সম্পর্কে এমন একটি কথা বলবো, যা তোমাদের দু'জনেরই পছন্দ হবে। অগ্নিউপাসকেরা আসলে আহলে কিতাব। তাদের কাছে একটি আসমানী কিতাব ছিলো। তারা ওই কিতাবটি পাঠ করতো। তাদের এক রাজা ছিলো ঘোর মদ্যপ। সে একদিন মাতাল অবস্থায় তার নিজের বোনকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলো এবং কামরিপু চরিতার্থ করলো তার সাথে। চারজন লোক অনুসরণ করেছিলো তাদের। তারা ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখলো। যখন নেশা কেটে গেলো, তখন তার বোন তাকে বললো, চারজন লোকের সামনে তুমি এ রকম অপকর্ম করলে! এখন তো শরিয়তের আইনে তোমাকে হত্যা করা হবে। রাজা বললো, তাইতো। আমার যে কিছুই খেয়াল ছিলো না। তার বোন বললো, এখন আমার কথা যদি শোনো, তবেই কেবল তুমি শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। রাজা বললো, বলো, অবশ্যই আমি তোমার কথা মান্য করবো। তার বোন বললো, তুমি যা করলে সেটাকেই ধর্মীয় বিধানরূপে প্রচার করো। জনসাধারণকে ডেকে বলে দাও, এটাই আদমের ধর্মাদর্শ। হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিলো আদম থেকে। এই হিসেবে হাওয়া ছিলো আদমের কন্যা। অথচ দু'জনে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। প্রথম নবীর এই ধর্মাদর্শ আমাদের জন্য মান্য করা অত্যাবশ্যক। এই ঘোষণা দেয়ার পর যারা তোমার কথা মানবে তাদেরকে অব্যাহতি দিবে। আর যারা তোমার কথা মানবে না তাদেরকে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করে ফেলবে। রাজা তার বোনের কথামতো কাজ করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে অনেকেই রাজার এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলো না। কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। বিদ্রোহীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলো রাজা। কিন্তু জনবিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। তার বোন বললো— জনতা এখনো ভীতসন্ত্রস্ত নয়। সুতরাং তুমি এবার ঘোষণা করে দাও, আমার বিধান যে মানবে না তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। তাই করলো রাজা। নির্মাণ করলো বিশাল অগ্নিকুণ্ড। ঘোষণা করে দিলো— যারা আমার ধর্মমতকে মানবে না তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হবে এই অগ্নিকুণ্ডে। এবার ভীত হলো লোকেরা। মেনে নিলো রাজার বিধান। এই ঘটনাটি বর্ণনার পর হজরত আলী বললেন, এবার বুঝলে তো, অগ্নিউপাসকেরা ছিলো আহলে কিতাব। তাই রসুল স. তাদের নিকট থেকে কর আদায় করেছিলেন। অবশ্য পরে তারা মুশরিক হয়ে যায়। তাই তাদের সঙ্গে বিবাহ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ইবনে জাওজী তাঁর আত্ তাহ্কিক গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পারস্যবাসীদের পয়গম্বর যখন পরলোকগমন করলেন, তখন ইবলিস তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলো অগ্নিউপাসনার দিকে।

উত্তরঃ রসুল স. বলেছেন, অগ্নিপূজারী ও আহলে কিতাব এর সাথে একই ব্যবহার কোরো। এ কথায় প্রমাণিত হয় না যে অগ্নি উপাসকেরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এবং আহলে কিতাবদের সঙ্গে যা করা যাবে, তা অগ্নি-উপাসকদের সঙ্গেও করা যাবে। ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, অগ্নিউপাসকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং তাদের দ্বারা জবাইকৃত পশুর গোশত ভক্ষণও নিষিদ্ধ। হাদিসের উদ্দেশ্য শুধু এতোটুকুই যে, আহলে কিতাবের মতো অগ্নি-উপাসকদের উপরেও করারোপ সিদ্ধ। আর হাদিসের মাধ্যমে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, অগ্নিউপাসকদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো আহলে কিতাব। তারা আল্লাহ্পাকের কিতাব পড়তো এবং প্রচার করতো। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র দ্বীন পরিত্যাগ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো কিতাবের বিধান থেকে, তখন এলেম উঠিয়ে নেয়া হলো তাদের হৃদয় থেকে। ইবলিস তখন তাদেরকে বানিয়ে ফেললো অগ্নিউপাসক। তখন থেকে তারা আর আহলে কিতাব নয়। তাই আলেমগণ বলেছেন, তারা আহলে কিতাব নয়। তবে ইমাম শাফেয়ীর এক বর্ণনায় এসেছে, তারাও আহলে কিতাব। আবার অপর বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত জমহুরের অনুকূলে। সে অভিমতটি হচ্ছে— অগ্নিউপাসকেরা আহলে কিতাব নয়।

আমি বলি, যদি অগ্নিপূজারীদের পূর্বপুরুষ আহলে কিতাব হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে আহলে কিতাব না বলার কোনো কারণ নেই। আর এ রকম হলে আমাদের দেশের হিন্দু মূর্তিপূজকদেরকেও আহলে কিতাব বলা যেতে পারে। কারণ তাদের কাছে রয়েছে বেদ নামক একটি কিতাব। ওই কিতাবে রয়েছে চারটি পর্ব। একত্রে সেগুলোকে বলা হয় চতুর্বেদ। ওই বেদসমূহের অনেক বিধান শরিয়তের বিধানের অনুরূপ। সেগুলোতে বর্ণনাবৈসাদৃশ্য অবশ্য রয়েছে। আর সেগুলো নিশ্চয় ঘটেছে শয়তানের প্রক্ষেপণের মাধ্যমে। শয়তানের কারসাজির ফলে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে তিয়াত্তরটি ফেরকা। হিন্দুরা যে আহলে কিতাব, তার প্রমাণ কোরআন মজীদেও রয়েছে। যেমন, একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে— ওয়া ইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাজিরুন (আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোনো না কোনো পয়গম্বর অবশ্যই প্রেরণ করেছি)। অগ্নি-উপাসকদেরকে আহলে কিতাব বললে হিন্দুদেরকে আরো বেশী আহলে কিতাব বলতে হয়। অগ্নিউপাসকদের রাজা মাতাল অবস্থায় তার বোনের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিলো। বিধান দিয়েছিলো আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধে। হজরত আদমের নামে প্রচার করেছিলো তার বিকৃত মতবাদ। কিন্তু হিন্দুরা তেমন কিছু করেনি। অবশ্য

তারা রসুল স. এর রেসালত অস্বীকার করার কারণে কাফের। আমার নিকট এ রকম সংবাদ পৌঁছেছে যে চতুর্বেদের মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর আবির্ভাবের শুভসংবাদ। ওই শুভসংবাদ পাঠ করেই কোনো কোনো হিন্দু মুসলমান হয়েছে। ওয়াল্লহু আ'লাম।

মূর্তিপূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না— ইমাম শাফেয়ীর এই অভিমতের সমর্থনে এই আয়াতটি উপস্থাপন করা হয়েছে— কাতিলুহুম হাত্তা লাতাকুনা ফিত্নাতান (কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করো যতক্ষণ না ফেত্না উচ্ছেদ হয়)। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ রকম কষ্ট করার দরকারই বা কি। আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করার কথাতো আলোচ্য আয়াতেই সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর অগ্নি পূজারীদের নিকট থেকে জিযিয়া সংগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে হাদিস শরীফে। বলা হয়েছে, রসুল স. হেজাজের অধিবাসী অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন।

আমি বলি, ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকেরা আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভূত নয়। তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে হাদিস শরীফে। আর এ সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ কারণও নির্দেশ করা হয়েছে। সে কারণটি হচ্ছে— শিরিক। অর্থাৎ তারা হবে মুশরিক (অংশীবাদী)। মূর্তিপূজকেরা অগ্নিপূজকদের মতো মুশরিক। তাই মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকের উপর প্রবর্তিত হবে একই বিধান। এখন কথা হচ্ছে, অগ্নিপূজকদের পূর্বপুরুষগণ ছিলো আহলে কিতাব— এ কথা যদি বলা হয়, তবে এ কথাটিও মেনে নিতে হবে যে, মূর্তিপূজকদের পূর্বপুরুষও আহলে কিতাবই ছিলো। কিন্তু মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজকদেরকে কিছুতেই আহলে কিতাব বলা যায় না। কারণ তারা আহলে কিতাবদের আদর্শানুসারী নয়।

আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদেরকেও ক্রীত-দাস ও ক্রীতদাসী বানানো যাবে। তাই অগ্নিপূজকদের মতো মূর্তিপূজকদের নিকট থেকে জিযিয়াও আদায় করা যাবে। সুতরাং গোলাম অথবা স্বাধীন উভয় অবস্থায় তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা বৈধ। উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা উপার্জন করবে। সেই উপার্জন দ্বারা তাদের সংসারের ব্যয় নির্বাহ করবে এবং জিযিয়াও পরিশোধ করবে।

সুলায়মান বিন বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কোথাও কোনো সেনাদলকে প্রেরণ করলে অধিনায়ককে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌কে ভয় করার এবং সঙ্গীগণের প্রতি সহমর্মী হওয়ার নির্দেশ দিতেন। তারপর বলতেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কোরো, আল্লাহ্‌দ্রোহীদেরকে হত্যা কোরো, শত্রুরা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেয়ো, চুক্তি ভঙ্গ কোরো না, কারো

নাক কান কেটো না (চেহারা বিকৃত কোরো না), পশ্চাৎ দিক থেকে কাউকে আক্রমণ কোরো না, শত্রুরা সম্মুখীন হলে প্রথমে তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ো— ১. তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাও। যদি তারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তবে তোমরা আর যুদ্ধ কোরো না। তাদেরকে বোলো তারা যেনো মদীনায় চলে আসে। এ রকম করলে তারাও হয়ে যাবে মুহাজির। মুসলমানদের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে তারা হবে সমঅংশীদার। যদি তারা মদীনায় আসতে সম্মত না হয় তবে তাদেরকে বোলো, তোমাদেরকে গণ্য করা হবে মদীনার বাইরের মুসলমান হিসেবে। সাধারণ মুসলমানদের প্রতি যে সকল বিধান প্রযোজ্য সে সকল বিধান প্রযোজ্য হবে তোমাদের উপরেও। তোমরা তখন আর গণিমত, ফায় এবং চুক্তির মাধ্যমে অন্যান্য উপার্জনের অংশ পাবে না। ২.যদি তারা ইসলামের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের নিকট জিযিয়া দাবী কোরো। জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলে তাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ কোরো না। ৩. যদি তারা জিযিয়া দিতে অসম্মত হয় তবে আল্লাহ্‌র সাহায্যকামী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরো। মুসলিম।

হজরত আনাসের বর্ণনায় এসেছে, আরববাসী আহলে কিতাবদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা জায়েয। তাঁর বর্ণনায় আরো এসেছে, রসুল স. হজরত খালিদ বিন ওলিদকে প্রেরণ করলেন দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দারের বিরুদ্ধে। তিনি তাকে বন্দী করে আনেন। রসুল স. উকায়দার জীবন ভিক্ষা দেন এবং জিযিয়া পরিশোধের শর্তে তার সঙ্গে চুক্তি করেন। আবু দাউদ।

হজরত ইয়াজিদ বিন রুমমান এবং হজরত আবদুল্লাহ্‌ বিন সিদ্দীকে আকবরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. দুমাতুল জানদলের শাসক উকায়দার বিন আব্দুল মালেক কান্দীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন হজরত খালিদ বিন ওলিদকে। রসুল স. জিযিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দান করেছিলেন তাকে। আবু দাউদ, বায়হাকী।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন উপরে বর্ণিত হাদিসের তথ্য সঠিক মনে করা হলে জিযিয়া কেবল আনসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আরবেরাও জিযিয়ার আওতায় পড়বে। উকাইদা যে আরবী, সে কথা নিশ্চিত (বনী কুন্দা আরবের একটি শাখা)। এভাবে এ কথাটিও প্রমাণিত হবে যে, জিযিয়া কেবল আহলে কিতাব ও আজমীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তখন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অভিমতই বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হবে। পার্থক্য থাকবে কেবল এতোটুকু যে, ইমাম আবু হানিফার মতে আরবের পৌত্তলিকদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া নাজায়েয। আর তাদেরকে গোলামও বানানো যাবে না। উকাইদা ছিলো খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক— পৌত্তলিক নয়।

আবদুর রাজ্জাক ও জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আরবের পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জিযিয়া গ্রহণ করেননি।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, আরবের পৌত্তলিকেরা ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী। কোরআন মজীদও নাজিল হয়েছিলো তাদের স্বভাষায়। তাই তারা ছিলো দুর্বিনীত ও প্রকাশ্য মোজেজা অস্বীকারকারী। সেকারণেই তাদের নিকট থেকে ইসলামের স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। ইসলাম গ্রহণ না করলে তারা হবে হত্যার উপযুক্ত। মুরতাদদের (ধর্ম পরিত্যাগকারীদের) বিধানও এ রকম। তারা স্বেচ্ছায় জেনে শুনে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম সম্পর্কে সবকিছু জেনে শুনে বুঝে ধর্মত্যাগ করে। সুতরাং তাদের অজ্ঞতা ক্ষমার্হ নয়। তাদের সঙ্গে কেবল যুদ্ধ। জিযিয়া নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিমের মাধ্যমে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরবের অংশীবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল দু'টি— ইসলাম অথবা যুদ্ধ। মূর্তিপূজক ও মুরতাদেরা বন্দী হয়ে গেলে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করা যাবে। রসুল স. আওতাস ও হাওয়াজেনদের পরিবার পরিজনদেরকে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছিলেন। তারা ছিলো আরবী ও অংশীবাদী। বনী মুস্তালিকের পরিবার পরিজনদেরকেও এ রকম করা হয়েছিলো। আবু বনী হানিফা মুরতাদ হয়ে গেলে হজরত আবু বকর তাদের পরিবার পরিজনকে বানিয়েছিলেন গোলাম ও বাঁদী। আর ওই গোলাম বাঁদীদেরকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন আলী বিন আবু তালেবের আম্মা এবং জায়েদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের আম্মাও ছিলো তাদের মধ্যে।

বন্দী করে পূর্ণ কর্তৃত্বে নিয়ে আসার পর মুরতাদদের স্ত্রী-পুত্রকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে। কিন্তু অংশীবাদীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অংশীবাদী আরবীদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে বন্দী করে ক্রীতদাস বানানো যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন, উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসে দেখা যায়— আরববাসী কাফেরদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হতো। তারা আহলে কিতাব, মূর্তিপূজক বা অগ্নিপূজক— যাই হোক না কেনো। অন্য হাদিসে এসেছে জাজিরাতুল আরব থেকে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো। সুতরাং উকাইদা সম্পর্কিত হাদিসের বিধানটি রহিত হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ আরব এলাকায় বসবাসও ছিলো জিযিয়া প্রদানের উপযোগী হওয়ার একটি শর্ত। অতএব, বসবাসের অস্তিত্বই যখন নেই, তখন জিযিয়া ধার্য করার প্রেক্ষা-পটটি আর রইলো কোথায়?

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তিনটি উপদেশ প্রদান করেছিলেন— ১. আরব উপদ্বীপ থেকে অংশীবাদীদেরকে বিতাড়িত কোরো। ২. অন্যান্য দেশের কাফেরদেরকে কোরো বন্দী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তৃতীয় উপদেশটির কথা রসুল স. আর উচ্চারণ করেননি। অথবা আমিই তা বিস্মৃত হয়েছি।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আমি ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করবোই। এই আরবে মুসলমান ছাড়া অন্য কারো বসবাসের অধিকার নেই। মুসলিম।

ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তায় জুহুরী থেকে একটি বর্ণনা এনেছেন। অনুরূপ বর্ণনা হজরত আবু হোরায়রা থেকে সালেহ্ বিন আখদারের মাধ্যমেও জুহুরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি এই— জাজিরাতুল আরবে দুই ধর্মের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সবশেষে ইসহাক বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন স্বসূত্রে।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর শেষ উপদেশ ছিলো— ইহুদীদেরকে হেজাজ থেকে এবং নাসারাদেরকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও। আহমদ, বায়হাকী।

জিযিয়ার পরিমাণঃ ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— জিযিয়ার নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। জিযিয়া আদায়কারী এবং জিযিয়া প্রদাতা পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। রসুল স. দুই হাজার জোড়া কাপড় পরিশোধের শর্তে ইয়ামেনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. দুই হাজার জোড়া বস্ত্রের বিনিময়ে নাজরানবাসীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিলেন। ওই চুক্তি অনুসারে নাজরানবাসীদেরকে সফর মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া এবং রজব মাসের মধ্যে এক হাজার জোড়া কাপড় দিতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. নাজরানবাসীদেরকে একটি লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিলো— তারা বছরে দুই হাজার জোড়া কাপড় দিবে। প্রতি জোড়ার মূল্য হতে হবে এক আউকিয়া। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কিতাবুল আমওয়ালের বিবরণ অনুসারে প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম চল্লিশ দিরহাম হয়— পঞ্চাশ দিরহাম নয় (যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন)।

এক জোড়া কাপড় অর্থ দু'টি কাপড়— তহবন্দ ও চাদর। ব্যক্তি ও ভূমি উভয়ের জন্য জিযিয়া হিসাবে কাপড় প্রদান করতে হতো। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে এ রকমই লিখেছেন। জমিনের জিযিয়া প্রতিষ্ঠিত

থাকতো জমিনের উপরেই। ওই জমি খৃষ্টান অথবা অন্য কোনো বিধর্মী কিংবা মুসলমান ক্রয় করলেও জিযিয়ার পরিমাণে কোনো হেরফের হতো না। মহিলা ও শিশুদের জমিনেরও জিযিয়া পরিশোধ করতে হতো। তবে ব্যক্তির জিযিয়া মহিলা ও শিশুর উপরে ধার্য ছিলো না। ধার্য ছিলো কেবল পুরুষের উপর।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বনী তাগলীবের খৃষ্টানদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, সাধারণতঃ একজনের উপরে যে করারোপ করা হয়, তার দ্বিগুণ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুসলমানদের অধিনায়ক শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বিধর্মীদের এলাকা দখল করলে জিযিয়া ধার্য করতে পারবে এভাবে— সম্পদ-শালী ব্যক্তির জন্য প্রতি মাসে চার দিরহাম হিসেবে বৎসরে আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্তদের জন্য মাসে দুই দিরহাম হিসেবে বৎসরে চব্বিশ দিরহাম এবং সুস্থ সবল উপার্জনক্ষম দরিদ্রদের জন্য মাসে এক দিরহাম হিসেবে বৎসরে বারো দিরহাম।

ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে— জিযিয়া নির্ধারণের জন্য ধনী দরিদ্র বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই। সকল জিম্মীদের নিকট থেকে বৎসরে বার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর মতে বিত্তশালী বিত্তহীন নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে বৎসরে জন প্রতি এক দিনার। আর ইমাম আহমদের অভিমত এসেছে চারটি বর্ণনায় চার রকম। প্রথম বর্ণনানুসারে তাঁর অভিমত এসেছে ইমাম আবু হানিফার অনুকূলে। দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে— পরিমাণ নির্ধারিত হবে নেতার সিদ্ধান্তানুসারে। ইমাম সুফিয়ান সওরীও এরকম বলেছেন। তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে— সর্বনিম্ন জিযিয়া বছরে জনপ্রতি এক দিনার। সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত নেই। চতুর্থ বর্ণনায় এসেছে— কেবল ইয়ামেনবাসীদের জন্য বৎসরে জনপ্রতি এক দিনার (এটা কোনো সাধারণ নিয়ম নয়)। হাদিস শরীফে এরকমই বলা হয়েছে। হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. যখন আমাকে ইয়ামেনের শাসক নির্বাচন করলেন তখন নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের নিকট থেকে এক দিনার মূল্যমানের কাপড় আদায় করবে। আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, দারাকুতনী, ইবনে হাব্বান, হাকেম। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। আবু দাউদ এই হাদিসকে মুনকার (অস্বীকৃত) বলেছেন। আরো বলেছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইমাম আহমদও এই হাদিস কে মুনকার বলেছেন। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য সহযোগে। তাঁর সূত্র পরম্পরাটি এ রকম, আমাশ — আবু ওয়ায়েল মাসরুক — হজরত মুয়াজ। কোনো কোনো সূত্রে পৌঁছেছে মাসরুক পর্যন্ত।

কাজেই বর্ণনাটি মাসরুকেরই হবে — হজরত মুয়াজের নয়। ইবনে হাজাম বর্ণনাটিকে বলেছেন মুনকাতে (কর্তিত)। তিনি একথাও বলেছেন যে, মাসরুক হজরত মুয়াজের সাক্ষাত পাননি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ইবনে হাজামও এ রকম মত প্রকাশ করেছেন। আবার হাদিসটিকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন তিরমিজি। তিনি একথাও বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে হাদিসটি মুরসাল— এটাই শুদ্ধ মত।

ইমাম আবু হানিফার মতের অনুকূলে রয়েছে হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলীর বক্তব্য ও আমল। সুনান রচয়িতাগণের গ্রন্থে আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে — হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান এবং হজরত ওসমান বিন হানিফকে ইরাকে প্রেরণ করেন হজরত ওমর। তাঁরা দু'জনে সেখানে গিয়ে ভূমির জরিপ এবং কর নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেন। কর প্রদাতাদেরকে বিন্যাস করেন তিনটি শ্রেণীতে— উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এরপর তারা ফিরে এসে প্রতিবেদন পেশ করেন হজরত ওমরের নিকট। খলিফা হজরত ওমর তা অনুমোদন করেন। পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানও এই নিয়মটি বহাল রাখেন।

ইবনে আবী শায়বা সূত্রে আলী বিন মাসহার শাইবানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আউন মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাক্বাফি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, মধ্যবিত্ত চব্বিশ দিরহাম এবং নিম্নবিত্ত বারো দিরহাম। হাদিসটি মুরসাল। ইবনে জানজুইয়্যার কিতাবুল আমওয়ালে এই হাদিসের সূত্র পরম্পরা উল্লেখিত হয়েছে এভাবে, মনদেল—শাইবানী—ইবনে আউন—মুগিরা বিন শো'বা।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে নজরাহ থেকে লিখেছেন, হজরত ওমর বিজিত দেশ সমূহের জিম্মীদের জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন উপরে বর্ণিত নিয়মে। অপর বর্ণনায় হারেস বিন মুজের সূত্রে এসেছে— হজরত ওমর হজরত ওসমান বিন হানিফকে জিযিয়া নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে— বাৎসরিক হিসেবে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য যথাক্রমে জনপ্রতি আটচল্লিশ, চব্বিশ এবং বারো দিরহাম। সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছিলো। কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। তাই এই ঐকমত্যটি চিরস্থায়ী।

ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খেরাজে সিররি বিন ইসমাইল আমের শা'বী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, শা'বী বলেছেন — হজরত ওমর ইরাকের ভূমি জরিপ করিয়েছিলেন। সমগ্র ভূমিকে বিভক্ত করিয়েছিলেন তিনশত ষাটটি খণ্ডে। প্রতি খণ্ডের জন্য বাৎসরিক কর নির্ধারণ করেছিলেন এভাবে — ফসলের জমি এক

দিরহাম ও এক ককিজ শস্য আঙ্গুরের বাগান দশ দিরহাম এবং খেজুরের বাগান পাঁচ দিরহাম। আর জন প্রতি বাৎসরিক কর — বারো, চব্বিশ এবং আটচল্লিশ দিরহাম (যথাক্রমে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের জন্য)। শা'বী বলেছেন, আমার নিকট সাঈদ বিন আবী ওরবার মাধ্যমে এসেছে, কাতাদা বিন মাজলিজ বলেছেন, হজরত ওমর নামাজের ইমামতি ও সৈন্যদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে। বিচার বিভাগ ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে। আর হজরত ওসমান বিন হানিফকে দিয়েছিলেন জমি-জমা দেখা শোনার ভার। তাদের আহারের জন্য একটি বকরী নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এভাবে — হজরত আম্মার অর্ধেক, হজরত ইবনে মাসউদ এক চতুর্থাংশ এবং হজরত ওসমান বিন হানিফ অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে ও আমাকে মনে করি পিতৃহীনদের সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের মতো। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন — 'যারা বিত্তশালী তারা (এতিমদের সম্পদ থেকে) নিরাপদ থাকবে এবং যারা বিত্তহীন তারা এতিমদের সম্পদ থেকে পূরণ করবে তাদের (ন্যূনতম) প্রয়োজন।' তোমরা বিত্তহীন তাই প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি বকরী গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করবে। আল্লাহ্র কসম! তবু আমার আশংকা হয়, হয়তো অনতিবিলম্বে সেখানে বকরীর স্বল্পতা দেখা দিবে। হজরত ওসমান সেখানকার একখণ্ড আঙ্গুরের বাগানের কর নির্ধারণ করেন দশ দিরহাম। খেজুরের বাগানের জন্য আট খণ্ড জমির রাজস্ব ছয় দিরহাম। গমের জমির জন্য চার দিরহাম। যবের একখণ্ড জমির জন্য দুই দিরহাম। ব্যক্তির প্রতি কর বারো, চব্বিশ ও আটচল্লিশ দিরহাম। মহিলা ও শিশুদের প্রতি তিনি কোনো কর ধার্য করেননি। সাঈদের বর্ণনায় এসেছে, আমার এক সঙ্গী বর্ণনা করেছেন এভাবে— খেজুরের বাগানের জন্য দশ দিরহাম এবং আঙ্গুরের বাগানের জন্য আট দিরহাম।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে হারেসা বিন মুতরেফ বর্ণনা করেছেন, খলিফা হজরত ওমর প্রথমে বিজিত ইরাকের ভূমি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু আদমশুমারিতে দেখা গেলো সেখানকার কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে দুই তিন গুণ বেশী। তখন তিনি সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ বিনিময় করলেন। হজরত আলী বললেন, ওই সকল লোক তো মুসলমানদের উপার্জনে সাহায্যকারী হতে পারে। সুতরাং তাদের ভূমি গ্রহণ না করে তাদের উপর বাৎসরিক কর আরোপ করা হোক। তাঁর এই পরামর্শটি হজরত ওমর পছন্দ করলেন। কর নির্ধারণের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন ওসমান বিন হানিফকে। তিনি তাদের প্রতি বাৎসরিক কর ধার্য করেন জন প্রতি আটচল্লিশ দিরহাম, চব্বিশ দিরহাম এবং বারো দিরহাম। হজরত মুয়াজ বর্ণিত এই হাদিস সম্পর্কে হানাফী মতাবলম্বীগণ বলেন, ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত করের হার

ছিলো এর চেয়ে কম। কারণ ইয়ামেন অধিকারে এসেছিলো সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে— যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। আর সেখানকার অধিবাসীরাও তেমন সম্পদশালী ছিলো না। এ সম্পর্কে বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, আবু নাজীহ্ বলেছেন, আমি একবার মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, সিরিয়াবাসীদের উপর কর নির্ধারণ করা হয়েছিলো জন প্রতি চার দিনার। আর ইয়ামেনবাসীদের উপর নির্ধারিত হয়েছিলো এক দিনার— কারণ কি? মুজাহিদ বললেন, এর কারণ হচ্ছে, সিরিয়াবাসীরা ছিলো সম্পদশালী এবং ইয়ামেনবাসীরা ছিলো স্বল্পবিত্ত। সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম আহমদের অভিমতের দলিল এই যে, রসুল স. হজরত মুয়াজকে জন প্রতি এক দিনার কর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নাজরানের খৃষ্টানদের নিকট থেকে আদায় করতে বলেছিলেন দুই হাজার জোড়া কাপড়। আবার হজরত ওমর জিম্মীদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন করের তিনটি স্তর। এ নিয়মটিকেই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা। বনী তাগলাব থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার হার ছিলো— মুসলমানদের নিকটে যে সম্পদ ছিলো, তার চেয়ে দ্বিগুণ। এ সকল বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জিযিয়া নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণতঃই মুসলিম শাসকের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে উপার্জনহীন নিঃস্ব লোকের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এক বর্ণনানুসারে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও অনুরূপ। কিন্তু অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, উপার্জনহীন দরিদ্র লোকের উপরেও জিযিয়া ধার্য করা ওয়াজিব। সুতরাং যখনই তারা স্বচ্ছল হবে তখনই তাদের নিকট থেকে জিযিয়া (বকেয়াসহ) আদায় করে নিতে হবে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যদি তারা স্বচ্ছল না হয়, তবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে দারুল হরবের (কাফের সাম্রাজের) সঙ্গে। তখন তাদেরকে আর জিম্মী বলা যাবে না। ইমাম শাফেয়ীর এ সকল কথার দলিল হচ্ছে— রসুল স. হজরত মুয়াজকে ঢালাওভাবে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই নির্দেশের মধ্যে স্বচ্ছল-অস্বচ্ছলের উল্লেখ ছিলো না। আর আমাদের কথার দলিল এই যে, হজরত ওসমান বিন হানিফ উপার্জনহীন ও বিত্তহীনদের উপর জিযিয়া আরোপ করেননি।

ইবনে জানজুইয়্যা কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, হাশেম বিন আদি সূত্রে ওমর বিন নাফেয়ের উদ্ধৃতিসহ। আবু বকর সিলাহ্ বিন জুফার আইনি বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর এক বৃদ্ধ জিম্মীকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, ব্যাপার কি? বৃদ্ধ বললো, আমি কপর্দকহীন। অথচ আমার উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়েছে। হজরত ওমর বললেন, আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। যৌবনে

—২০

তুমি উপার্জন করেছো। তখন করও পরিশোধ করেছো। এখন তুমি বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিত। অথচ তোমার উপর কর ধার্য করা হয়েছে। এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদেরকে এই মর্মে লিখিত নির্দেশনামা পাঠালেন যে— বৃদ্ধ ও উপার্জন ক্ষমতারহিতদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে একথাটি এসেছে যে— উপার্জনশীল দরিদ্রদের নিকট থেকে আদায় করতে হবে বারো দিরহাম। বায়হাকী।

আমর ইবনে নাফেয়ে সূত্রে ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আবু বকর বলেছেন, হজরত ওমর এক লোকের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, এক অন্ধ বৃদ্ধ সেখানে ভিক্ষা করছে। এরপরের বিবরণ উপরে বর্ণিত হাদিসের অনুরূপ। শেষে কেবল এই কথাটি অতিরিক্ত এসেছে যে, হজরত ওমর ওই বৃদ্ধ এবং ওই রকম লোকদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় রহিত করেছেন (আবু বকর বলেছেন) আমি ওই সময়ে উপস্থিত ছিলাম এবং ওই বৃদ্ধটিকে দেখেও ছিলাম।

ওরওয়া বিন যোবায়ের বিন আওয়াম থেকে হিশাম বিন ওরওয়ার মাধ্যমে আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক স্থানে দেখলেন, কয়েকজন লোককে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, এদের উপর জিযিয়া অত্যাবশ্যক ছিলো। কিন্তু এরা জিযিয়া পরিশোধ করেনি। তাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, এরা জিযিয়া পরিশোধ করতে চায় না কেনো? লোকেরা বললো, এরা বলছে, এরা কপর্দকহীন। হজরত ওমর বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। সাধ্যবহির্ভূত বোঝা এদের উপর চাপিয়ো না। আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, মানুষকে শাস্তি দিয়ো না। পৃথিবীতে মানুষকে যারা শাস্তি দিবে, আখেরাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আবু ইউসুফ বলেছেন, আমার নিকট এক জ্ঞানবৃদ্ধ একটি মারফু হাদিস বর্ণনা করেছেন। রসুল স. হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আরকামকে জিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন যাত্রা শুরু করলেন, তখন রসুল স. উচ্চস্বরে বললেন, মনে রেখো, যে ব্যক্তি জিম্মীদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাবে, তাদেরকে অপমান করবে অথবা বলপূর্বক তাদেরকে কোনো কাজে লাগাবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। পক্ষ অবলম্বন করবো অত্যাচারিতের। এই হাদিসটি ইমাম আহমদের অভিমতের সমর্থক। কারণ, তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণতঃই মুসলমান শাসকের নির্ধারণের উপর নির্ভরশীল বলে মেনেছেন। বলেছেন, নেতাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, জিযিয়া প্রদান জিম্মীদের সাধ্যাভূত কিনা। সাধ্যবহির্ভূত নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না।

মাসআলাঃ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি কোনো জিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তবুও তাকে বিগত বৎসরের জিযিয়া পরিশোধ করতে হবে। এ রকম বলেছেন ইমাম শাফেয়ী। তাঁর মতে জিযিয়া হচ্ছে মুসলিম রাজ্যে কাফেরের নিরাপদ বসবাসের বিনিময়। সুতরাং তা রহিত হতে পারে না। কারণ, তার প্রাপ্য নিরাপত্তা সে পেয়েছে। মুসলিম রাজ্যের প্রতি সে ঋণী। ইসলাম গ্রহণ করলেও যেমন তার ইসলাম পূর্ব ঋণ মাফ হয়ে যায় না, তেমনি কোনো জিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলেও তার জিম্মী অবস্থায় অতিবাহিত বৎসরের ঋণ (জিযিয়া) রহিত হবে না।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদের মতে জিযিয়া কুফরের (অবিশ্বাসের) শাস্তিস্বরূপ। তওবা করার পর তওবাকারীকে যেমন শাস্তি দেয়া যায় না, তেমনি ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর কাফের অবস্থার জিযিয়া আদায় করা সমীচীন নয়। জিযিয়া প্রদান করলে যেমন জিযিয়া দাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করলেও সমাপ্ত হয়ে যায় যুদ্ধ বিগ্রহ। নিরাপত্তা প্রাপ্তি হচ্ছে জিযিয়ার প্রতিদান। এই নিরাপত্তার সঙ্গে সে আসলে তার স্বভূমিতেই বসবাস করে।

আমাদের অভিমতের সমর্থনে রয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদিস। যেখানে বলা হয়েছে — রসুল স. বলেছেন, মুসলমানদের উপরে জিযিয়া নেই। আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ। আবু দাউদ লিখেছেন, সুফিয়ান সওরীর নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া মাত্র তিনি বলেছিলেন, মুসলমান হওয়ার পর জিম্মীর পূর্বের জিযিয়া আদায়যোগ্য নয়। তিনি তাঁর সমর্থনে হজরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস উপস্থাপন করছিলেন— যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান হয়ে যাবে, তার উপর জিযিয়া থাকবে না। তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের এক বর্ণনাকারী ইবনে কাত্তান বলেছেন, হজরত ইবনে ওমরের হাদিসের সূত্রসংযুক্ত কাবুস বিন আবুজজুবিয়ান বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। তিবরানীর সূত্রপরম্পরায় কাবুসের নাম নেই। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হাদিস শরীফে বিশেষভাবে ইসলাম পূর্ব সময়ের জিযিয়া রহিত করার অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা সঙ্গত নয় যে, মুসলমান হওয়ার পরেও তার সঙ্গে জিযিয়া সম্পৃক্ত করতে হবে। এ রকম আলোচনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমাকে কুফায় এক জ্ঞানবৃদ্ধ বলেছেন, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ তাঁর আঞ্চলিক প্রশাসক আবদুল হাইদ বিন আবদুর রহমানকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে— তোমরা আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছো, হেরা এলাকায় ইহুদী, খৃষ্টান ও

অগ্নিপূজারীরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের নিকট বাকী রয়েছে পূর্ববর্তী সময়ের জিযিয়া। এখন আমরা কি করবো? তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে, তোমরা চাও, তাদের নিকট থেকে বকেয়া জিযিয়া আদায় করা হোক। কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্পাক তাঁর রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন ইসলামের প্রতি আহ্বান করার জন্য। কর আদায়ের জন্যে নয়। সুতরাং নও মুসলিমদের উপরে প্রবর্তিত হবে জাকাতের বিধান — জিযিয়া নয়।

একটি সন্দেহঃ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জমির খাজনা মাফ হয় না। ক্রীতদাসেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও স্বাধীন হয়ে যায় না। তাহলে কোনো বিধর্মী জিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিযিয়া মাফ হয়ে যাবে কেনো? (তিনটি বিষয়ইতো কুফরির শাস্তি, তাহলে তিনটির বিধান এক রকম হবে না কেনো?)।

সন্দেহের অপনোদনঃ জিযিয়ার ভিত্তি হচ্ছে অপমান বা অপদস্থতা। এই অপদস্থতার কারণ হচ্ছে কুফরী। ইসলাম ওই অপদস্থতা থেকে মুক্তি দেয়। ইসলাম গ্রহণ অর্থ লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে সম্মানের স্তরে উত্তরণ। জমির খাজনা ও গোলামীর বিষয়টি সে রকম নয়। খাজনা মুসলমানদের উপরেও বলবত্ থাকে। আর গোলামের উপরে থাকে ব্যক্তির (মনিবের) মালিকানা। ইসলামে রাষ্ট্র কখনো স্বীকৃত মালিকানায় হস্তক্ষেপ করে না। অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনী। খাজনা ধার্য করা হয় এ কারণেই। আর এই শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজন। তাই খাজনাও ধার্য করা হয় মুসলমান অমুসলমান সকলের উপর। জিযিয়ার বিষয়টি এ রকম নয়। জিযিয়ার উপরে ব্যক্তি মালিকানা নেই। এ সকল কারণে ইসলাম গ্রহণ করলে জিযিয়াও অবলুপ্ত হয়। রাষ্ট্র এই অবলোপনের স্বীকৃতি দেয় মাত্র। ইসলাম গ্রহণের পরে কারো উপর জিযিয়া জারী রাখা রাষ্ট্রের অধিকার বহির্ভূত।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বৎসরের শুরুতেই জিযিয়া পরিশোধ করা ওয়াজিব। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অভিমত হচ্ছে — জিযিয়া পরিশোধ অত্যাবশ্যক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর। বৎসরের শুরুতে নয়। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মতটিও এ রকম।

যদি জিম্মী অন্তর্বর্তী সময়ে অথবা বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর মারা যায়, তবে তার উপর জিযিয়ার হুকুম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। বকেয়া জিযিয়া আদায়ের অবকাশ আর থাকবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা সম্ভব হয় না, তেমনি মৃত জিম্মীর উপরেও জিযিয়া আদায়ের কথা ভাবা যায় না। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম

শাফেয়ী বলেছেন, মৃত্যুমুখে পতিত হলেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ যেমন মাফ হয় না, তেমনি মৃত জিম্মীর বকেয়া জিযিয়াও মাফ হবে না। তাই বকেয়া জিযিয়া আদায় করা অত্যাবশ্যক। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময় হিসেবে জিযিয়া ধার্য করা হয়। আর সে তার জীবদ্দশায় এই নিরাপত্তা পেয়েছে। সুতরাং মরে গেলেও সে রাষ্ট্রের নিকট জিযিয়ার ঋণে ঋণী। তাই রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য ঋণ আদায় করতেই হবে।

মাসআলাঃ কোনো জিম্মীর দুই বা ততোধিক বৎসরের জিযিয়া বাকী পড়ে গেলে তার নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে এক বৎসরের। ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, প্রতি বৎসরের জিযিয়া আদায় করতে হবে। কারণ জিযিয়া হচ্ছে ঋণ স্বরূপ। আর পুরাতন হওয়ার কারণে ঋণ কখনো মাফ হয় না। হানাফীগণের যুক্তি হচ্ছে — জিযিয়া আরোপ করা হয় বিধর্মীদেরকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে। তাই নির্দেশ করা হয়েছে জিযিয়া পরিশোধ করবে জিম্মী নিজে, কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে নয়। সম্পদ জমা করার উদ্দেশ্যে জিযিয়া ধার্য করা হয় না। ধার্য করা হয় তাদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্যে। আর এক বৎসরের জিযিয়া আদায় করলেও এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হয়ে যায়। একাধিক বৎসরের জিযিয়া আদায়ের আর প্রয়োজন পড়ে না।

মাসআলাঃ মহিলা, শিশু ও উন্মাদের উপরে জিযিয়া নেই। বিষয়টি ঐকমত্য সমর্থিত। শিশু ও উন্মাদ কোনো শাস্তির আওতাভূতও নয়। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজে লিখেছেন, আমার নিকট উবাইদুল্লাহ্ নাফেয় — আসলাম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত ওমর তাঁর রাজস্বআদায়কারীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় কোরো। মহিলা ও শিশু জিযিয়ার আওতাভূত নয়। আর জিযিয়ার বাৎসরিক হার হচ্ছে জনপ্রতি চার দিনার অথবা চল্লিশ দিরহাম। এর অতিরিক্ত নয়।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, জায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর তাঁর সেনাপতিদের নিকট এই মর্মে লিখিত ফরমান প্রেরণ করেছিলেন যে — জিযিয়া আরোপ করতে হবে কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর। তিনি রমণী ও শিশুদের উপর জিযিয়া ধার্য করেননি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে (হজরত ওমর লিখেছিলেন) মহিলা ও শিশুকে জিযিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোরো না।

মাসআলাঃ ক্রীতদাসের উপরে জিযিয়া নেই। মুকাতিব, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ — সকল প্রকার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এই বিধানের আওতাভূত। (যে ক্রীতদাসকে তার মনিব বলে তুমি এতো অর্থ প্রদান করলে স্বাধীন, তাকে বলে মুকাতিব। 'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত' — যে গোলামকে তার মনিব এরকম বলে, তাকে বলা হয় মুদাব্বার। আর উম্মে ওয়ালাদ বলে ওই ক্রীতদাসীকে যার গর্ভে তার মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মলাভ করার পর সে মুক্ত হয়ে যায়)। ক্রীতদাসের মালিক ক্রীতদাসের জিযিয়া পরিশোধ করবে না।

আবু উবায়দা তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে হজরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ইয়ামেনবাসীদের সম্পর্কে এই মর্মে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন, কোনো ইহুদী ও খৃষ্টানকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো যাবে না। তবে জিযিয়া ধার্য করতে হবে তাদের পুরুষ, রমণী, শিশু, ক্রীত দাস-দাসী — সকলের উপর। জিযিয়ার হার হবে মাথা প্রতি এক দিনার অথবা দশ দিরহাম। ইবনে জানজুইয়্যাও উত্তম সূত্রে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। উভয় বর্ণনাই মুরসাল। বর্ণনা দু'টো সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উম্মতের সুস্বীকৃত ও স্থিরীকৃত ঐকমত্য হচ্ছে — মহিলা, শিশু ও ক্রীত দাস-দাসীর উপরে জিযিয়া নেই। ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ঐকমত্য) শরিয়তের দলিল। সুতরাং এ রকম সুস্বীকৃত দলিলের মোকাবিলায় মুরসাল হাদিসের বর্ণনা গ্রহণীয় নয়। এই আমলটি আবু ওবায়েদের একটি বর্ণনার মাধ্যমেও পরিত্যাজ্য প্রমাণিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ওমর বলেছেন, তোমরা জিম্মীদের গোলাম ক্রয় কোরো না। করলে তাদের কর পরিশোধ করতে হবে।

মাসআলাঃ যদি জিম্মী জিযিয়া আদায়ে গড়িমসি করে, ইসলামের কোনো (জাগতিক) বিধান মানতে অস্বীকৃত হয়, কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কাউকে প্ররোচিত করে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে লোকদেরকে একত্র করে, কোনো মুসলমান মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করে বা মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করে, মুসলমানকে ধর্ম ত্যাগের প্রতি প্রলোভিত করে, মুসলমানদের যাতায়াতের পথে ওত পেতে লুণ্ঠন কার্য চালায়, ডাকাতি-রাহাজানি করে, মুসলমান শত্রুদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করে, শত্রুকে পথ দেখায়, গোপন তথ্য জানায়— তবে ইমাম আহমদের মতে সে আর জিম্মী (কর প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তা অর্জনকারী) থাকবে না। আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, দুই কিতাবী এক মুসলমান মহিলার উপর বলাৎকার করেছিলো। হজরত আবু উবাদা বিন জাররাহ্ এবং হজরত আবু হোরায়রা তাদেরকে হত্যা করেন।

শা'বী সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, সুহাইব বিন গাফলা বলেছেন, হজরত ওমর সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। ওই সময় আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। হঠাৎ এক নাব্‌তী ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে এলো। নালিশ জানালো, তাকে প্রহার করা হয়েছে। হজরত ওমর সেখানে উপস্থিত হজরত সুহাইবকে বললেন, দেখো তো কে এ রকম করলো? সুহাইব বাইরে গেলেন। একটু পরে হাজির হলেন হজরত আউফ বিন মালেককে নিয়ে। হজরত আউফ বললেন, এই লোকটি গাধার পিঠে আরোহন-কারিণী এক মুসলমান মহিলাকে উত্যক্ত করছিলো। মহিলাটি কোনো স্থানে যাচ্ছিলেন। এই লোকটি তাকে গাধার পিঠ থেকে নামতে বললো। মহিলাটি তার কথা শোনেনি বলে লোকটি তার গাধাকে আঘাত করে। এরপর ধাক্কা দিয়ে তাকে গাধার পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং সে নিজে গাধার পিঠে চড়ে।

তাই আমি লোকটিকে প্রহার করেছি। হজরত ওমর নাব্তী লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, এভাবে তো আমরা তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নই। এরপর তিনি লোকটিকে শুলে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জনতা! তোমরা জিম্মীদের সঙ্গে শরিয়তসম্মত আচরণ কোরো (শরিয়ত যেমন নিরাপত্তা দিতে বলেছে, তেমন নিরাপত্তা দিয়ো)। কিন্তু এ ধরনের আচরণ যারা করবে, তাদের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদ বলেছেন, জিম্মী জিযিয়া দিতে অস্বীকৃত হলে অথবা আমাদের নিয়ম কানুন না মানতে চাইলে তাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, তিনটি কারণে জিম্মীদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে। কারণ তিনটি হচ্ছে — ১. জিযিয়া দিতে না চাইলে, ২. ইসলামের বিধানাবলী মানতে না চাইলে এবং ৩. মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করলে। তাদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি থাকলে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেই তা ভঙ্গ করতে হবে।

ইমাম মালেক বলেছেন, মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করলে, বিবাহ করলে এবং রাহাজানি করলে জিম্মীদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। এই তিনটি কারণ ছাড়া অন্য কোনো গুরুতর কারণ দেখা দিলে চুক্তিভঙ্গ করা যাবে। ইমাম মালেকের শিষ্য কাসেম বলেছেন, রাহাজানি করলেও চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জিম্মী যদি কাফের রাজ্যের সঙ্গে যোগ দেয় অথবা মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে মুসলিম রাজ্যের কোনো অংশ দখল করে নেয়, তবে তারা আর জিম্মী থাকবে না, বিদ্রোহী হয়ে যাবে। আর তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গও করা যাবে। এই দুই অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না। কারণ তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং মুসলিম রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করবে — এ দুটো শর্ত মেনে নিয়েই তারা জিযিয়া দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো। এ দুটি শর্তই ছিলো চুক্তির বুনিয়াদ। এরপর তারা যদি জিযিয়া পরিশোধ করতে গড়িমসি করে কিংবা জিযিয়া দিতে অসমর্থ হয় তবে তাদেরকে বিদ্রোহী বলা যাবে না। খুঁজে দেখতে হবে এর কারণ। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি তারা জিযিয়া না দেয় তবে মুসলমানদের শাসক তাদেরকে বন্দী করতে পারবে, শাস্তিও দিতে পারবে।

মাসআলাঃ আল্লাহ্, রসুল ও কোরআন সম্পর্কে কটু কথা বললে অথবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলে জিম্মীয়াতের চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রকম বলেছেন, ইমাম আহমদ। আর ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অধিকাংশ শিষ্য বলেছেন, চুক্তিনামার মধ্যে যদি এ রকম শর্ত থাকে তবেই কেবল চুক্তি ভঙ্গ হবে, অন্যথায় হবে না। হেদায়া রচয়িতা লিখেছেন, এমতাবস্থায় জিম্মীয়াতের চুক্তি ভেঙে যাবে। কেননা, তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের কারণে মুসলমানদের ইমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ কারণে জিম্মীদের নিরাপত্তাও হয়ে পড়বে বিঘ্নিত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, জিযিয়া প্রদাতা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত সন্ধি চিরস্থায়ী।

সুতরাং তারা আল্লাহ্, রসুল এবং কোরআন সম্পর্কে আজেবাজে কথা বললেও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হবে না। এ রকম আজেবাজে কথা যারা বলে তারা কাফের হয়ে যায়। আর তারা তো আগে থেকেই কাফের। তাহলে তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ হবে কেনো?

এই অভিমতের সমর্থনে জননী আয়েশা থেকে ইবনে হুম্মাম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি এই — একবার কিছু সংখ্যক ইহুদী রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, আস্সামো আলাইকা (আপনার ধ্বংস হোক)। রসুল স. বললেন, ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)। জননী আয়েশা নিকটেই ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আলাইকুমাস্সামা ওয়াল্লানাতা (তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক ধ্বংস ও অভিসম্পাত)। রসুল স. বললেন, আয়েশা! বিনম্র হও। আল্লাহ্পাক করুণাপরবশ। তিনি নম্রতাকে ভালোবাসেন। জননী আয়েশা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি তাদের কথা শোনেন নি? রসুল স. বললেন, শুনেছি। উপযুক্ত জবাবও দিয়েছি। বলেছি, ওয়া আলাইকুম (আর তোমাদের উপরও)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, আলাইকুম (তোমাদের উপর)। ওয়া আলাইকুম নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে — রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি তাদের কথা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার কথা গৃহীত হবে। তাদের কথা গৃহীত হবে না। হাদিসটি বর্ণনা করার পর ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, নিঃসন্দেহে ইহুদীরা তখন প্রকাশ করেছিলো চরম ঔদ্ধত্য। তৎসত্ত্বেও রসুল স. তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেন নি। যদি ভঙ্গ করতেন, তবে তাদেরকে দেয়া হতো মৃত্যুদণ্ড।

অন্যত্র ফতোয়া আকারে ইমাম আবু হানিফার বক্তব্য এসেছে এভাবে — রসুল স.কে গালি প্রদানকারী সকলকেই হত্যা করতে হবে। সে মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান। তার তওবা কবুল করা হবে না। এতে করে বুঝা যায় যে, রসুল স. এর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য দ্বারা জিম্মীদের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফও এ রকম বলেছেন। হাফস্ ইবনে আবদুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার হজরত আবদুল্লাহ্কে বললেন, আমি এক সন্যাসীকে রসুল স. সম্পর্কে কটুক্তি করতে শুনেছি। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি এ রকম শুনতে পেলে তাকে হত্যা করতাম। রসুল স. সম্পর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনবো — এ কারণে আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হইনি।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা যথাক্রমে হজরত ঈসাকে এবং হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু রসুল স. এর প্রতি কটু বাক্য বর্ষণ তাদের বিশ্বাসের অংগীভূত কোনো বিষয় নয়। তাই এরূপ অপকর্ম করলে তাদের সঙ্গে সন্ধি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। যদি তারা প্রকাশ্যে এ রকম না করে, তবে সন্ধি প্রত্যাহার করা হবে না। কারণ প্রকাশ্যে নত করে রাখাই ছিলো জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য। প্রকাশ্যে দুর্বিনীত ভাব দেখালে সন্ধির ভিত্তি আর অবশিষ্ট থাকে না। জিযিয়া আদায়ের বিধানও অকার্যকর হয়ে পড়ে। এখন হজরত

আয়েশা বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, যে সকল ইহুদী রসুল স.কে আস্সামু আলাইকা বলেছিলো, তারা জিম্মী ছিলো না। তাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হয়নি এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তাও দেয়া হয়নি। মুসলমানেরা তখন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো না। পরে আল্লাহ্তায়ালা যখন মুসলমানদেরকে শক্তিশালী করলেন, তখন তাদের একটি গোত্রকে দেশান্তর করা হলো এবং অন্য গোত্রের লোকদেরকে করা হলো হত্যা।

ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোনো জিম্মী মুসলমানদের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তবে মুসলমানদের নেতা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে নিরাপত্তাহীনতার দিকে। অথবা দিবে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং হজরত ইকরামা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলো সালাম বিন মাশকুম, নোমান বিন আওফা, আবু ইউনুস, মালেক বিন জয়িফ প্রমুখ। বললো, আপনি আমাদের কেবলাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর আপনি হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্র পুত্র বলে মানেন না। এ রকম করলে আমরা আপনার অনুসরণ করবো কিভাবে। তাদের এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩০

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ۖ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِـُٔونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ ○

❒ ইহুদী বলে 'ওজাইর আল্লাহের পুত্র' এবং খৃষ্টান বলে 'মসীহ্ আল্লাহের পুত্র।' উহা তাহাদিগের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছিল উহারা তাহাদিগের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া সত্য বিমুখ হয়!

প্রথমে বলা হয়েছে — ইহুদী বলে, 'উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র।' তানবীন সহ 'উযায়রুন' শব্দটি পরিণত হয়েছে আরবী শব্দে। শব্দটি তাসগীর (ন্যূনতাবোধক নাম পদ)। কেউ কেউ বলেছেন, শব্দটি আজমী (অনারব)। তানবীনসহ শব্দটি হয়েছে চার অক্ষরের। তানবীন ছেড়ে দিলে শব্দটি হয় তিন অক্ষরের। যেমন নূহ, হুদ, লূত। ক্বারী কুসায়ী এবং ক্বারী ইয়াকুব ছাড়া অন্য ক্বারীগণ শব্দটিকে তানবীন ছাড়াই পড়েছেন। কেননা শব্দটি গায়েরে মুনসারেফ (আংশিক পরিবর্তনশীল)।

ওবায়েদ বিন উমায়ের বলেছেন, ইহুদী ফাখখাস বিন আজুরা বলেছিলো — উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র। অন্য কেউ এ রকম বলেনি। অন্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র ও আমরা ধনী।' — কথাটিও উচ্চারণ করেছিলো ফাখখাস।

আতিয়া আউফি সূত্রে বাগবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ইহুদীদের মধ্যে 'হজরত উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র' এই ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছিলো এভাবে — হজরত উযায়ের যখন নবী হিসেবে প্রেরিত হলেন তখন ইহুদীদের কাছে ছিলো তওরাত ও তাবুত। কিন্তু তারা তওরাতের উপর আমল করতো না। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদের বক্ষাভ্যন্তর থেকে তওরাত উঠিয়ে নেন। সাথে সাথে তাবুতকেও উঠিয়ে নেন। এভাবে তাদের স্মৃতিপট থেকে আসমানী কিতাব সম্পূর্ণ মুছে যায়। পুনরায় তওরাত ও তাবুত ফিরে পাবার আশায় তারা সমবেত হয় হজরত উযায়েরের নিকটে। তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট রোদনভরা প্রার্থনা পেশ করেন। আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবীর প্রার্থনা কবুল করেন এবং ফিরিয়ে দেন তওরাতকে। সম্পূর্ণ তওরাত তাঁর স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে বলেন, হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্পাক পুনরায় তওরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। শোনো, আমি তওরাত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করছি। বিস্মৃত তওরাতের আদ্যপান্ত পাঠ শুনে ইহুদীরা নির্বাক হয়ে যায়। এর দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্পাক তাবুতও ফিরিয়ে দেন। তাবুতের মধ্যে রক্ষিত ছিলো তওরাত। হজরত উযায়ের কর্তৃক পঠিত তওরাত ও তাবুতে রক্ষিত তওরাতের মধ্যে সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে ইহুদীরা বিস্মিত হয়ে যায় এবং বলতে থাকে নবী উযায়ের নিশ্চয় আল্লাহ্র পুত্র। না হলে আল্লাহ্ তাঁকে এভাবে তওরাত দান করতেন না।

কালাবী বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাইলের উপর বিজয়ী হওয়ার পর সম্রাট বখতে নসর তওরাতের আলেমগণকে হত্যা করে। হজরত উযায়ের ওই সময় ছিলেন শিশু। তাই তাঁকে হত্যা করা হয়নি। সত্তর অথবা একশত বৎসর পর বখতে নসরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাইলেরা যখন বাইতুল মাকদিসে ফিরে আসে, তখন তওরাত তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। ওদিকে এক বস্তিতে হজরত উযায়েরকে একশত বৎসর মৃতবৎ রেখে দিয়েছিলেন আল্লাহ্-তায়ালা। এরপর তাঁকে পুনর্জীবিত করে নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন বনী ইসরা-ইলের নিকটে। তিনি তাদেরকে বিস্মৃত তওরাতের শিক্ষা দান করেন। এই বিবরণটি সুরা বাকারার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এক ফেরেশতা হজরত উযায়েরকে এক পেয়ালা পানি পান করান। সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ তওরাত তাঁর স্মৃতিবদ্ধ হয়। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকটে গিয়ে বলেন, আমি উযায়ের। লোকেরা বলে, যদি তুমি উযায়ের হও, তবে আমাদেরকে

তওরাত লিখে দাও। হজরত উযায়ের সম্পূর্ণ তওরাত লিপিবদ্ধ করেন। কিছুদিন পর এক লোক বলে আমার পিতাকে আমার পিতামহ বলেছিলেন তওরাতের একটি অনুলিপি মটকির মধ্যে পুরে পুষ্পপল্লবিত একটি আঙ্গুরের গাছের গোড়ায় পুঁতে রাখো। বখতে নসর সবকিছু ধ্বংস করে দিলেও যেনো ওই তওরাত সুসংরক্ষিত থাকে। তাই করা হয়েছিলো। ওই স্থানটি কোথায় তাও আমার মনে পড়েছে। একথা বলে সে কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পুঁতে রাখা তওরাতের অনুলিপিটি উদ্ধার করে আনে। বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখতে পায় উদ্ধারকৃত তওরাতের অনুলিপি এবং হজরত উযায়েরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধকৃত তওরাত অবিকল এক। এই অলৌকিক ঘটনার কারণে তারা বলতে শুরু করে উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র না হলে বিস্মৃত তওরাত কিছুতেই অবিকল এভাবে আনতে পারতেন না। তখন থেকে ইহুদীরা বলতে থাকে — উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র (এরকম উচ্চারণ থেকে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থী)।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।' বাগবী লিখেছেন, হজরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার পর একাশি বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টানেরা তাঁর প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করতো ও রোজাও রাখতো। এরপর খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ইহুদী যোদ্ধা বুলেস হজরত ঈসার কয়েকজন সহচরকে হত্যা করে। এরপর ইহুদী-দেরকে বলে, যদি ঈসা সত্য নবী হয়ে থাকে তবে তো আমি নির্ঘাত জাহান্নামী। কিন্তু আমি একা জাহান্নামে যাবো না — খৃষ্টানদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। এমন চাল চালবো যেনো জাহান্নাম তাদের জন্য অবধারিত হয়।

বুলেসের ছিলো একটি ঘোড়া। ঘোড়াটির নাম ছিলো আকাব্। ওই ঘোড়ার পিঠে চড়েই সে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। সে ওই ঘোড়ার লাগাম কেটে দিলো। প্রকাশ করতে লাগলো সাড়ম্বর অনুতাপ। নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে করতে উপস্থিত হলো খৃষ্টানদের কাছে। খৃষ্টানেরা বললো, তুমি কে? সে বললো, আমি তোমাদের দুশমন বুলেস। আমাকে লক্ষ্য করে আকাশ থেকে ঘোষিত হয়েছে এই আওয়াজ — তুমি খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তোমার তওবা কবুল করা হবে না। তাই আমি ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। গ্রহণ করেছি খৃষ্টান ধর্ম। খৃষ্টানেরা তখন তাকে তাদের গীর্জায় নিয়ে যায়। গীর্জার একটি কুঠরীতে সে নিজেকে এক বৎসর আবদ্ধ করে রাখে। এরপর কুঠরী থেকে বের হয়ে এসে বলে, এই এক বৎসরে আমি ইঞ্জিল শিখে ফেলেছি। আমার তওবা কবুল হয়েছে বলে সুসংবাদও পেয়েছি। খৃষ্টানেরা তার কথা বিশ্বাস করে এবং হয়ে পড়ে তার একান্ত অনুরাগী। বুলেস তখন একটি কক্ষের মধ্যে নিয়ে যায় নাসতুরাকে। তাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলে, ঈসা, মরিয়ম এবং ইলাহ্ — এই তিনজনই আল্লাহ্। এরপর বুলেস চলে যায় রোমে। সেখানকার খৃষ্টানদেরকে দেয় লাহুত ও

নাসুতের শিক্ষা। বলে, ঈসা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিলেন না। তার শরীরও মানুষের শরীর ছিলো না। তার মানবত্ব ও শরীর ছিলো এলমে নাসুতের মধ্যে। কিন্তু লাহুতের মধ্যে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। এই বিশ্বাসটি প্রচার করার জন্য সে, রোমের চারজন খৃষ্টানকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করে। আরেক ব্যক্তিকে সে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে একথা প্রচারের জন্য যে — আল্লাহ্ অনাদি ও অনন্ত। আর ঈসাও আল্লাহ্‌র অনুরূপ। এই প্রতিনিধিদেরকে সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ডেকে বলে, তুমি আমার বিশেষ সহচর। আমি ঈসাকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন। আমি তাঁর সন্তোষ সাধনার্থে নিজেই নিজেকে কোরবান করবো (এভাবে চলে যাবো ঈসার কাছে)। তুমি মানুষকে তোমার আকিদা বিশ্বাস শিক্ষা দিয়ো। চালিত কোরো তোমার পথে। এরপর সে তার কথিত সন্তোষ সাধনার্থে নিজেই নিজেকে জবাই করে ফেলে। এরপর তার প্রতিনিধিরা জোরে-শোরে প্রচার করতে থাকে তাদের ধর্মমত। বাড়তে থাকে বিকৃত বিশ্বাসীদের দল। বাড়তে থাকে মতপার্থক্য। শুরু হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

এরপর বলা হয়েছে — 'এটা তাদের মুখের কথা।' এই বাক্যটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে বর্ণিত অপবিশ্বাস ভিত্তিহীন ও অর্থহীন। এ রকমও হতে পারে যে, বাক্যটির অর্থ — তাদের ওই অপবিশ্বাস প্রসূত কথা মৌখিক কথার অতিরিক্ত কিছু নয়। তাদের কথা হচ্ছে প্রতারণার নামান্তর — যার কেবল শব্দ আছে, মর্ম নেই।

এরপর বলা হয়েছে — 'যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা তাদের মতো কথা বলে।' এখানে ইউদ্বহিউনা (তাদের মতো কথা বলে) শব্দটি হামযা সহযোগে অথবা হামযা ব্যতিরেকে উচ্চারণ করা যায়। দু'টো উচ্চারণই শুদ্ধ ও অভিধান সম্মত। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে— খৃষ্টানেরা কথা বলে ইহুদীদের মতো। ইহুদীরা যেমন হজরত উযায়েরকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে, তেমনি খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌র পুত্র বলে থাকে হজরত ঈসাকে। তাই এখানে বলা হয়েছে — পূর্বে যারা (ইহুদীরা) সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা (খৃষ্টানেরা) তাদের (ইহুদীদের) মতো কথা বলে।

মুজাহিদ বলেছেন, অংশীবাদীদের কথার সঙ্গেও খৃষ্টানদের কথার মিল রয়েছে। আরবের অংশীবাদীরা লাত, উজ্জা এবং মানাত নামক মূর্তিগুলোকে বলতো আল্লাহ্‌র পুত্র।

হাসান বলেছেন, খৃষ্টানদের কথা ছিলো অতীত কালের কাফেরদের কথার মতো। আরবের মুশরিকদের সম্পর্কেও অন্য আয়াতে এরকম ঘোষণা এসেছে। বলা হয়েছে — 'কাজালিকা ক্বালাল্লাজিনা মিন ক্বলিহিম মিছলা ক্বাওলিহিম তাশাবাহাত ক্বুলুবুহুম' (তাদের কথার মতো কথা বিগত যুগের লোকেরাও বলেছিলো। তাদের সকলের অন্তর একই রকম কুফরীতে আচ্ছন্ন)।

কুতাইবি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির উদ্দেশ্য এই যে — রসুল স. এর সময়ের ইহুদীদের ও খৃষ্টানদের কথাও তাদের পূর্বপুরুষগণের মতো। অর্থাৎ তাদের এই সত্য-প্রত্যাখ্যান অত্যন্ত প্রাচীন। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন।' বাক্যটি একটি বদ্‌দোয়া। বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌তায়ালা উপরে বর্ণিত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন! এরকম তাফসীর করেছেন ইবনে জারীহ্। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ, তাদের উপর আল্লাহ্‌পাক অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটি একটি বিস্ময় প্রকাশক বাক্য। অপপ্রার্থনা নয়।

শেষে বলা হয়েছে — 'তারা কেমন করে সত্য বিমুখ হয়।' একথার অর্থ — যখন পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে, রসুল স. উপস্থিত রয়েছেন তাদের সামনে, প্রকাশিত হয়ে চলেছে অলৌকিক নিদর্শন সমূহ — তখন ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোন্ যুক্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

❒ তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে তাহাদিগের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মরিয়ম-তনয় মসীহ্‌কেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

❒ তাহারা তাহাদিগের মুখের ফুৎকারে আল্লাহের জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

❒ অংশীবাদিগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য তিনিই পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁহার রসুল প্রেরণ করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখিত 'আহবার' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'হিবর।' হিবর অর্থ আলেম বা পণ্ডিত। আর আহবার অর্থ পণ্ডিতগণ বা আলেমগণ। 'রুহবান' শব্দটিও বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 'রাহিব।' 'রাহিব' অর্থ সংসার-বিরাগী। আর রুহবান অর্থ সংসারবিরাগীগণ।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে।' একথার অর্থ— বনী ইসরাইলেরা আল্লাহ্তায়ালার বিধানবিরোধী আলেমগণ ও সংসারবিরাগী দরবেশগণের অনুসারী হয়েছে।

ইমাম তিরমিজি তাঁর 'জামে তিরমিজি' পুস্তকে এবং ইমাম বাগবী তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আদী বিন হাতেম বলেছেন, আমি গলায় সোনার ক্রুশ পরে একদিন রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, আদী! তোমার গলার ঝুলন্ত মূর্তিটিকে ফেলে দাও। আমি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলাম। তিনি স. তখন পাঠ করলেন এই আয়াতটি। আমি বললাম, আমরা তো আলেম ও দরবেশদের পূজা করি না। রসুল স. বললেন, এমন কাণ্ড কি ঘটেনি যে, তোমাদের আলেম ও দরবেশরা আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক ঘোষিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলেছিলো। আর তাদের কথা নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলে তোমরা। আমি বললাম, হ্যাঁ। তাতো ঘটেছিলো। তিনি স. বললেন, সে জন্যই তো বলা হয়েছে— তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছে।

আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক বলেছেন, ধর্মের বিধান পরিবর্তনকারী শাসক, আলেম, মাশায়েখ— সকলেই আলোচ্য নির্দেশনাটির অন্তর্ভুক্ত। ইবাদত বা উপাসনা অর্থ— বিধানের অনুসরণ। আল্লাহতায়ালার বিধানবিরোধী অনুসরণ নিষিদ্ধ। কিন্তু আল্লাহপাকের বিধানের অনুকূল অনুসরণ নিষিদ্ধ নয়। যেমন রসুল স. ও তাঁর খলিফাগণের অনুসরণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহপাকের অনুসরণ। তাই তাঁদের অনুসরণ নিষিদ্ধ নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলো। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কতো পবিত্র।' এ কথার অর্থ, পথভ্রষ্ট বনী ইসরাইলেরা হজরত মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও তাদের প্রতিপালক সাব্যস্ত করেছিলো। তাঁকে বলেছিলো আল্লাহর পুত্র— অথচ তারা ছিলো এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। নিঃসন্দেহে তারা অংশীবাদী। তাদের আচরিত অংশীবাদ থেকে আল্লাহ্তায়ালা কতোই না পবিত্র।

পরের আয়াতে (৩২)বলা হয়েছে— 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।'

এখানে উল্লেখিত (নূর) শব্দটির অর্থ জ্যোতি। জ্যোতি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল নিদর্শনকে যা আল্লাহ্পাকের এককত্বের দিকে পথনির্দেশ করে। শব্দটির মাধ্যমে কোরআন মজীদ অথবা রসুল স. কে কিম্বা তাঁর রেসালতকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। 'মুখের ফুৎকারে' কথাটির অর্থ মৌখিক মিথ্যা প্রচারে বা অপপ্রচারে। কাফেররা বিভিন্ন অপবাদ ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সত্যের জ্যোতি বা আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাদের এমতো প্রচেষ্টা মুখের ফুৎকারে চন্দ্র সূর্যের আলো নেভানোর প্রচেষ্টার মতো অসম্ভব একটি প্রচেষ্টা— যা আল্লাহপাকের অভিপ্রেতও নয়। তাই শেষে বলা হয়েছে — সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা পছন্দ না করলেও আল্লাহ্তায়ালা চান তার নিদর্শন সমূহের, কোরআনের, রসুল স. এর রেসালতের নূরের পূর্ণ উদ্ভাসন, পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এছাড়া অন্য কিছু তিনি চান না।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে — 'অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন।' এখানে আলহুদা(পথনির্দেশ) অর্থ আল কোরআন। আর কোরআনই হালাল হারাম সহ সকল বিধানাবলী ও জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেছে। আর দ্বীনুল হক্ব (সত্যদ্বীন) অর্থ এখানে দ্বীন ইসলাম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ইজহার কথাটির অর্থ পরিচিত করে দেয়া (জয়যুক্ত করা)। আর এখানকার 'হা' সর্বনামটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে রসুল স. এর সঙ্গে। 'আলাদ্ দ্বীনি কুল্লিহি' অর্থ সকল ধর্ম বা শরিয়ত। এভাবে আয়াতের বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়ায় এ রকম— অংশীবাদীরা না চাইলেও আল্লাহ্-তায়ালা পূর্ববর্তী সকল শরিয়ত অপেক্ষা সর্ব শেষ শরিয়তকে অধিকতর পরিচিতি দানের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শেষ রসুলকে।

জনৈক তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ইজহার' কথাটির অর্থ হবে বিজয়ী করে দেয়া। আর এখানকার 'হা' সর্বনামটির সম্পৃক্তি ঘটেছে দ্বীনুল হক্ব (সত্য ধর্ম) এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এ রকম— পূর্বের যাবতীয় ধর্মের উপরে সর্বশেষ ধর্ম ইসলামের সামগ্রিক বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য (আগের ধর্ম গুলোকে রহিত করার জন্যই) আল্লাহ্পাক প্রেরণ করেছেন তাঁর রসুলকে — অংশীবাদীরা এ রকম করা পছন্দ না করলেও।

ইমাম বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা ও জুহাক বলেছেন, ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ের ঘটনাটি ঘটবে হজরত ঈসার পুনঃ আবির্ভাবের পর। হজরত আবু হোরায়রার এক মারফু (সর্বোন্নত) বর্ণনায় এসেছে, হজরত ঈসার পুনরাগমনের পর ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমি বলি, সকল

পরিত্যক্ত ধর্মের পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে ইসলামের একচ্ছত্র বিজয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে কোনো সময়ে। হজরত মেকদাদ বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট থেকে স্বকর্ণে শুনেছি— এমন এক সময় আসবে যখন এমন কোনো মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ, তাঁবু বা শিবির থাকবে না, যাতে ইসলাম অনুপ্রবেশ না করবে। তখন সম্মানিতরা থাকবে সম্মানের সঙ্গে। আর অসম্মানের সঙ্গে থাকবে অসম্মানিতরা। অর্থাৎ যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে তারা হবে সম্মানিত। আর যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা হবে অসম্মানিত। হজরত মেকদাদ বলেন, আমি তখন বললাম, সে সময়েই তাহলে আল্লাহ্‌র দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে জয়যুক্ত হবে।

আমি বলি, আল্লাহ্‌পাকের দ্বীনকে সকল ধর্মমতের উপর জয়যুক্ত করার এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েই চলেছে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে। এই বিজয় চিরস্থায়ী হবে— এমন নয়। জননী আয়েশার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রাত্রি ও দিবস কখনো অবলুপ্ত হবে না, যে পর্যন্ত পৃথিবীতে সংঘটিত হতে থাকবে লাত ও উজজার উপাসনা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি ভেবেছিলাম, অপর সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করবার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহ তাঁর রসুল প্রেরণ করেছেন— এই সিদ্ধান্তটি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (অবিশ্বাসীরা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না)। তিনি স. বললেন, বিজয় প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছে করবেন। এরপর প্রবাহিত হবে এক পবিত্র বাতাস। যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান থাকবে তার রূহও কবজ করে নেয়া হবে। তখন পৃথিবীতে থাকবে কেবল পাপাচারীরা। তারা প্রত্যাবর্তন করবে তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মের দিকে (অংশীবাদিতার দিকে)। হাসান বিন ফজল বলেছেন, এখানে 'জয়যুক্ত' করার অর্থ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ পেশ করা। দলিল প্রমাণ সমূহের মাধ্যমে সত্যধর্মের (ইসলামের) বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ এই ধর্ম এমন দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, একে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ইসলামকে ওই সকল ধর্মাবলম্বীদের উপর জয়যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, রসুল স. যাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তারা ছিলো ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তাঁর রসুলকে এমন বিজয় দান করেছেন যে, ইসলামের বাণী শ্রবণকারীরা বলতে বাধ্য হতো—রসুল স. সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ভ্রষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা ছিলো দু'ধরনের— আহলে কিতাব ও কিতাববিহীন। এদের সকলের উপরই আল্লাহ্‌পাক তাঁকে জয়যুক্ত করেছেন। কিতাবহীনেরাও ইসলামের প্রতাপের নিকটে হয়েছিলো পূর্ণ

নতজানু। কিতাবীরাও হয়েছিলো বন্দী। কাউকে কাউকে করা হয়েছিলো হত্যা। কাউকে আবার দেয়া হয়েছিলো— দেশান্তর। অধিকাংশ মূর্তিপূজক ও অগ্নি-পূজকেরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। যারা হয়নি তাদেরকে বাধ্য হতে হয়েছিলো জিযিয়া দিতে। এসকল কিছুই ছিলো সকল ধর্মের উপর রসুল স. এর ধর্মের জয়-যুক্ততার প্রমাণ।

আগের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে — 'সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও।' আর এখানে (৩৩) বলা হয়েছে 'অংশীবাদীগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও।' এতে করে বুঝা যায়, আগের আয়াতে উল্লেখিতরা ছিলো কেবল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। আর এই আয়াতে উল্লেখিতরা একই সঙ্গে সত্যপ্রত্যা-খ্যানকারী ও অংশীবাদী। উভয় আয়াতের মিলিত মর্ম এই যে— সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী ও অংশীবাদীদের নিকট অপ্রীতিকর মনে হলেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ঘটাবেনই। ইসলামকেও জয়যুক্ত করবেন অন্য সকল ধর্মমতের উপরে। এর কোনো অন্যথা হবে না।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

❑ হে বিশ্বাসিগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদিগের মধ্যে অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহের পথ হইতে নিবৃত্ত করে। যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহের পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

এখানে 'পণ্ডিত' বা আলেম বলে বুঝানো হয়েছে, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোভী আলেমদের কথা। আর 'সংসার বিরাগীগণ' বলে বুঝানো হয়েছে কেবল লালসাপরায়ণ খৃষ্টান দরবেশদের কথা। ইহুদীদের মধ্যে বৈরাগ্যের প্রচলন ছিলোই না। মানুষের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করা— এই দু'টো অপরাধে এখানে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে। বলা হয়েছে— হে বিশ্বাসীগণ! পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকে মানুষের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে।

ধন সম্পদ অর্জন করা হয় মূলতঃ পানাহারের জন্য এবং অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু পানাহারের প্রসঙ্গটি এখানে প্রধান বলা হয়েছে। 'ইয়া'কুলুনা' অর্থ ভোগ করে বা ভক্ষণ করে।

এখানে 'বিলবাত্বিলি (অন্যায়ভাবে) কথাটির অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করে পক্ষপাতিত্বমূলক সিদ্ধান্ত দেয়, আল্লাহ্র পবিত্র বাণী বিকৃত করে, আল্লাহ্র হুকুম বলে চালিয়ে দেয় স্বহস্তলিখিত বক্তব্যকে ইত্যাদি। তওরাত শরীফে রয়েছে রসুল স. এর পরিচিতি ও তাঁর গুণাবলীর মনোমুগ্ধকর বিবরণ। ইহুদীদের অসৎ আলেমেরা সেগুলোকে গোপন করে। এটাও আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্পদ হারানোর ভয়েই তারা এ রকম করতো। তারা ভালো করেই জানতো যে, সাধারণ মানুষ রসুল স. এর পরিচয় পেলে তাদেরকে আর মানবে না। ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থ সমাগমের সূত্র।

এরপর বলা হয়েছে — 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' এখানেও যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল আলেম ও দরবেশদেরকে। কিন্তু কতিপয় সাহাবীর উক্তি উল্লেখ পূর্বক হাসান বলেছেন, কেবল ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম দরবেশরাই এই বক্তব্যের লক্ষ্য নয়। তারা সহ সকল সম্পদ মওজুদকারীদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে — 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে।' হজরত আবু জর বলেছেন, এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান আলেম দরবেশদের সঙ্গে এই বাক্যটি বিশেষভাবে সংযুক্ত নয়।

'এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না।' এখানে 'তা' হচ্ছে একবচন বোধক সর্বনাম। এই সর্বনামটি বিশেষভাবে 'রৌপ্য' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যয়, খরচ ও লেন-দেন সাধারণতঃ হয়ে থাকে রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে। তাই এখানে 'সেগুলোকে (স্বর্ণ ও রৌপ্যকে) আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না' — এরকম না বলে বলা হয়েছে, 'এবং তা (রৌপ্য) আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না।' এটাই এখানে এক বচন বোধক সর্বনাম (তা) ব্যবহারের কারণ।

আরেকটি বিষয় এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে বলা হয়েছে স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করার কথা। কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুঁজি বা জমানো সম্পদ হিসেবে সোনা ও রূপাকে একসঙ্গে মিলানো যায়। আর জাকাতও দিতে হয় পুঞ্জীভূত, জমানো বা মেলানো সম্পদের উপর। তাই ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, একাধিক প্রকৃতির সম্পদ জমিয়ে রাখলে, ওই জমানো সম্পদের মূল্য যদি জাকাতের মাপকাঠিতে (নেসাবে) পড়ে, তবে জাকাত প্রদান হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মোহাম্মদ বলেছেন, একাধিক প্রকৃতির সম্পদের মূল্যমানের ভিত্তিতে জাকাতের নেসাব নির্ধারণ করা যাবে না।

নেসাব নির্ধারণ করতে হবে ওজনের ভিত্তিতে। যেমন, ধরা যাক, এক লোকের কাছে রয়েছে দশ মিসকাল স্বর্ণ এবং একশত দিরহাম। এমতোবস্থায় তার উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ দশ মিসকাল স্বর্ণের উপর জাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যদি তার নিকটে পাঁচ মিসকাল স্বর্ণ (যার মূল্য একশত দিরহাম অথবা এর অধিক) থাকে, তবে জমানো সম্পদের মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে দিরহামের ভিত্তিতে। এই ভাবে সোনা ও দিরহামের মোট মূল্য যদি দুই শত দিরহামে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে জাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহে-বাঈনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের) মতে ওয়াজিব হবে না। কারণ সাত মিসকালের কম সোনার উপরে জাকাত নেই। যদি ওই লোকের নিকট পাঁচ মিসকাল সোনা ও একশত দিরহাম থাকে, আর ওই একশত দিরহামের মূল্য যদি দশ মিসকাল সোনার সমান হয়, তবে ধরতে হবে পনের মিসকাল সোনা। এভাবে সমস্ত সম্পদকে সোনা ধরে নিয়ে জাকাত দিতে হবে। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা। কিন্তু সাহেবাঈন বলেন, এভাবে জাকাত নির্ধারণ করা যাবে না। কারণ সাত মিসকালের কম ওজনের সোনার উপর জাকাত ওয়াজিব নয়। আর একশত দিরহামের উপরেও জাকাত ওয়াজিব নয়। সুতরাং এখানে সম্পদের সংমিশ্রন অসিদ্ধ।

লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে, 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে।' কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাকাত নির্ধারণ করতে হবে পুঞ্জীভূত সম্পদের উপর। একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করে নয়।

পুঞ্জীভূত সম্পদের মধ্যে সোনা ও রূপার কথা কেবল উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। অতএব বুঝতে হবে জাকাতের নেসাব নির্ধারিত হবে সোনা এবং রূপার মাপকাঠিতে। অর্থাৎ অন্য সকল সম্পদের মূল্য যদি সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপার মূল্যের সমান হয়, তবে জাকাত ওয়াজিব হবে। মনে রাখতে হবে যে, সোনা ও রূপা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ জাকাতের মাপকাঠিরূপে গৃহিত হয়নি। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, মানুষ এই সম্পদ দু'টোকেই পুঞ্জীভূত করে রাখতে চায়।

'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না' কথাটির অর্থ হতে পারে এখানে দু'রকম — ১. একেবারেই ব্যয় করে না। আল্লাহ্‌র পথেও নয়। শয়তানের পথেও নয়। ২. আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না। কিন্তু শয়তানের পথে ব্যয় করে অবলীলায়। যেমন এক আয়াতে এসেছে,'ইনফিকুনা আম্‌ওয়ালাহুম লিইয়াসুদ্দু আন সাবিলিল্লাহি (তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্য)।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেম ও মাশায়েখদের সম্পর্কে বলা হয়েছে — তারা লোককে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে তাদের সম্পর্কে ব্যয় না করার প্রথমোক্ত প্রকারটির কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা ভালো-মন্দ কোনো পথেই অর্থ ব্যয় করে না। তাই কৃপণতার সর্বোচ্চ সীমা বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইয়াকনিযুনা' শব্দটি।

'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না' কথাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। ফরজ, ওয়াজিব, নফল, মোস্তাহাব — সকল প্রকার দানের কথাই নিহিত রয়েছে এই নির্দেশনাটিতে। অর্থাৎ ওই সকল ইহুদী পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীরা বর্ণিত ব্যয়গুলোর কোনোটাই করে না।

হজরত ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করে, তার ওই খরচ হবে সদকাতুল্য (সওয়াবের কারণ)। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. বলেছেন, কেউ যদি এক দিনার এক দিনার করে জেহাদে, ক্রীতদাস মুক্তিতে, মিসকিনের জন্য এবং আপন সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে — তবে সে সবচেয়ে বেশী সওয়াব লাভ করবে ওই দিনারের মাধ্যমে, যা সে খরচ করছিলো তার আপন সন্তান-সন্ততির জন্য। মুসলিম।

হজরত ছাওবান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সবচেয়ে বেশী সওয়াব লাভ হবে ওই দিনারের মাধ্যমে, যা সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করা হয়, ওই দিনারের মাধ্যমে যা ব্যয় করা হয় মুজাহিদদের বাহনের জন্য এবং ওই দিনার যা ব্যয় করা হয় মুজাহিদের জন্য।

জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আমি একবার বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল!(আমার পূর্ববর্তী স্বামী) আবু সালমার সন্তানেরা তো আমারও সন্তান। তাদেরকে কি আমি কিছু দিতে পারবো? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তাদেরকে দিলে সওয়াবও পাবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে মাসউদের পত্নী বলেছেন, আমি ও জনৈক মহিলা রসুল স. এর নিকট আবেদন করলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আমরা যদি আমাদের স্বামীদেরকে কিছু দেই, তবে কি সওয়াব পাবো? রসুল স. বললেন, দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। একগুণ দানের জন্য, আরেকগুণ সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য। বোখারী, মুসলিম।

শেষে বলা হয়েছে — 'তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! যারা একেবারেই দান করে না এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করে কেবল শয়তানের পথে ব্যয় করে, তাদেরকে আপনি মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করা — এই দু'টি অপকর্মের জন্য আলোচ্য আয়াতে মর্মন্তুদ শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে করে বোঝা যায় কেউ যদি ফরজ জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রদান করে, তবে তার সঞ্চয় হবে বৈধ। অতিরিক্ত (নফল) দান না করলেও সে আর শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। এটা ঐকমত্য।

তিবরানী তাঁর আওসাতে, ইবনে আদী তাঁর আল কামেলে এবং ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী তাঁদের স্ব স্ব সুনানে হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যারা জাকাত আদায় করে তারা কৃপণ নয় (শাস্তি যোগ্যও নয়)।

মুজাহিদ সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করলেন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য সঞ্চয় করে না — এমন কেউ কি আছে? বিষয়টি তখন রসুল স. এর সকাশে উত্থাপন করলেন হজরত ওমর। রসুল স. বললেন, তোমাদের সঞ্চয়কে পবিত্র করবার জন্যই আল্লাহ্পাক প্রণয়ন করেছেন জাকাতের বিধি (জাকাত পরিশোধ করলে সম্পদ জমা করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর ওই সঞ্চয় অপবিত্রও নয়)। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু দাউদ, আবু ইয়ালী, ইবনে হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি প্রণীত হয়েছে তো এজন্যেই। তোমরা সঞ্চয় করো বলেই তো তোমাদের মৃত্যুর পর ওগুলো পায় তোমাদের উত্তরাধিকারীরা।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমার সঞ্চয়ে পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও আমি ভীত হবো না, যদি আমি তার জাকাত আদায় করি এবং আল্লাহ্র বিধান মতো চলি। ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, আবু শায়েখ এবং ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি চার হাজার দিরহাম অথবা ততোধিক হয় তবে তা হবে পুঞ্জীভূত সম্পদ— জাকাত দেয়া হোক অথবা না হোক। চার হাজার দিরহামের কম হলে তা গণ্য হবে জীবন-ধারণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন রূপে — যার জাকাত নেই।

কারো কারো ধারণা যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত — তাই পুঞ্জীভূত সম্পদ। হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, রসুল স. কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, ওই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক (দয়া করে বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত কারা)। তিনি স. বললেন, বিত্তশালীরা। তবে ওই বিত্তশালীরা নয় — যারা সম্মুখ-পশ্চাদ দক্ষিণ-বাম, সকল দিক থেকে (অতিরিক্ত) দান করতে অভ্যস্ত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু জর গিফারীর একটি মারফু হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি অর্থবিত্ত পুঞ্জীভূত করে রেখে যায়, কিয়ামতের দিন ওই অর্থবিত্ত দ্বারা তার শরীরে দাগ দেয়া হবে। বোখারী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া। আমি বলি, যে সকল বিত্তবানেরা জাকাত দেয় না, তাদেরকেই কিয়ামতের দিন এভাবে দাগ লাগানো হবে। অতএব জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অতিরিক্ত দান করার অভ্যাসও থাকা দরকার। হাদিস শরীফে জাকাত অত্যাবশ্যক যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বর্ণনা করা হয়েছে অতিরিক্ত দানের ফযীলতও।

যে সকল আলেম প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে পুঞ্জীভূত সম্পদ বলেন, তাঁদের সমর্থনেও রয়েছে কয়েকটি হাদিস। যেমন ১. হজরত আবু উমামা বলেছেন, জনৈক সুফ্ফাবাসী (সর্বহারা) সাহাবী ইন্তেকাল করলেন। তাঁর লুঙ্গির ভাঁজে

পাওয়া গেলো একটি দিনার। রসুল স. তা দেখে বললেন, এটা একটা দাগ (কলংক)। ২. আর একজন পরলোক গমন করলে দেখা গেলো, তাঁর লুঙ্গির মধ্যে রয়েছে দুটি দিনার। রসুল স. বললেন, দুটি দাগ। বাগবী। ৩. হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আহ্‌লে সুফ্‌ফাদের একজন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর চাদরের মধ্যে দুটি দিনার পাওয়া গেলো। রসুল স. বললেন, দুটি দিনার —দুটি কলংক। ৪. হজরত মাসউদ ইবনে ওমর বলেছেন, এক জনের জানাযা পড়ার সময় রসুল স. বললেন, এ লোকের ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ কতো? সাহাবীগণ বললেন, তিন দিনার। রসুল স. বললেন, সেতো রেখে গেলো তিনটি কলংক। এরপর সাক্ষাতে আবদুল্লাহ্ আবুল কাসেম আমাকে বললেন, লোকটি ভিক্ষা করতো সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুল হামিদ হামানী থেকে বর্ণনাটি এনেছেন বায়হাকী। আমি বলি, ইতোপূর্বে হজরত আবু উমামা এবং হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসে বর্ণিত লোকেরাও ছিলো ভিক্ষুক। আর জীবন ধারণ নয়, হয়তো সম্পদ সঞ্চয়ই ছিলো তাদের ভিক্ষার উদ্দেশ্য।

উপরের আলোচনা দৃষ্টে একথাই বলতে হয় যে, যারা সুফী হয়েছেন এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করেছেন তাদের জন্য সম্পদের মুখাপেক্ষী হওয়া নাজায়েয। জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত সম্পদ তাদের জন্য শোভনীয় নয়। আর তাঁরা অসংসারী বলে পরিবার পরিজনের হকও তাদের উপরে নেই। তাঁরা দুনিয়া পরিত্যাগ করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই তো তাদেরকে বলা হয় সুফী। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন — আউফু বিল উকুদি আউফু বিল আহদী (আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো)। সুফ্‌ফাবাসীগণও এ ধরনের দুনিয়া ত্যাগী ও আল্লাহ্ নির্ভরশীল ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন হজরত আলী। কিন্তু তিনি সংসারীও ছিলেন। তাঁর জীবনে রয়েছে সংসারী সুফীগণের প্রকৃষ্ট আদর্শ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৫

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

☐ যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদিগের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে 'ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজদিগের জন্য পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে। সুতরাং আস্বাদ গ্রহণ কর তাহার যাহা তোমরা পুঞ্জীভূত করিতে।

যে সকল বিত্তশালীরা জাকাত দেয় না, তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে — পরকালে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে তাদের পুঞ্জীভূত সম্পদ। তারপর তার দ্বারা দাগ দেয়া হবে শরীরের বিভিন্ন অংশে— ললাটে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলা হবে এবার আস্বাদন করো

পুঞ্জীভূত সম্পদের স্বাদ। এখানে 'জিবাহ্' শব্দটির অর্থ শরীরের সম্মুখ ভাগ (মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ, উদর, উরুদেশ ইত্যাদি)। 'জুনুব' শব্দটির অর্থ পার্শ্বদেশ — শরীরের ডান ও বাম পার্শ্ব। 'জুহুরুহুম' অর্থ শরীরের পশ্চাৎভাগ, গ্রীবা, পিঠ, কোমর। কেউ কেউ বলেছেন, ওই সকল বিত্তবানেরা বিত্তহীনদেরকে দেখলে ভ্রূকুঞ্চন করতো এবং রাগত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাতো। তাই দাগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদের কপালে। ফকির মিসকিনদের দেখলে তারা পাশ ফিরিয়ে থাকতো অথবা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে প্রস্থান করতো। তাই দাগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত বুরায়দা বলেছেন, 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে' — যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বলতে শুরু করলেন, জমানো সম্পদ সম্পর্কে এবার দেয়া হয়েছে চূড়ান্ত বিধান। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এখন আমরা আল্লাহ্‌র কাছে কী চাইবো? তিনি স. বললেন, স্মরণমগ্ন রসনা, কৃতজ্ঞতা ভরা হৃদয় এবং পুণ্যবতী স্ত্রী, যারা তোমাদের ধর্মাচরণের সহচরী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাকাতবিহীন জমানো সোনারূপা দোজখের আগুনে গলিয়ে চ্যাপ্টা করা হবে এবং সেগুলো দোজখের আগুনে গরম করে নিয়ে দাগ দেয়া হবে ওগুলোর মালিকের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুনরায় দোজখের আগুনে তপ্ত করে দেয়া হতে থাকবে দাগ। বিরতিহীনভাবে এভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর শাস্তি দেয়ার পর নির্ধারণ করা হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান — হয় দোজখ, না হয় বেহেশত। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! উটের ব্যাপারে কি হুকুম? রসুল স. বললেন, যে উটের মালিক উটের জাকাত দিবে না, পানি পান করানোর দিন দুগ্ধদোহন কালে পরিশোধ করবে না দরিদ্রদের প্রাপ্য, কিয়ামতের দিন তাকে শোয়ানো হবে একটি সমতল ভূমিতে। এরপর তার মালিকানাধীন সকল উট ও উষ্ট্র শাবক একে একে তাকে কামড়াবে ও পদপিষ্ট করবে। এভাবে শাস্তি চলতে থাকবে পঞ্চাশ বছর ধরে। তারপর তাকে ঠেলে দেয়া হবে জাহান্নাম অথবা জান্নাতের দিকে। পুনঃ নিবেদন করা হলো, ইয়া রসুলাল্লাহ্! গরু-মহিষ ও ছাগলের ব্যাপারে কী নির্দেশ? তিনি স. বললেন, সেদিন গরু-মহিষ ও ছাগল একটি সমতল স্থানে তাদের শিঙ ও খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে ওই সকল মালিককে, যারা জাকাত দেয়নি। সকল পশুর শিঙ হবে তখন তীক্ষ্ণ ও ধারালো। তাদের কারো শিঙই তখন বাঁকানো এবং ভাঙ্গা থাকবে না। এভাবে একের পর এক তারা শাস্তি দিতে থাকবে তাদের মালিককে। পঞ্চাশ হাজার বছর এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের উপরে আসবে জাহান্নাম অথবা জান্নাতের ফয়সালা। মুসলিম। এই হাদিসটির মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর।

হজরত আবু হোরায়রা সূত্রে এসেছে, রসুল স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যাদেরকে সম্পদ দান করেছেন, তারা জাকাত না দিলে কিয়ামতের দিন তাদের ওই সম্পদকে করে দেয়া হবে সাপ। চোখের উপরে কালো বিন্দু বিশিষ্ট ওই

সাপকে পেঁচিয়ে দেয়া হবে তাদের গলায়। সাপটি তাদেরকে দংশন করতে করতে বলবে, আমি তোমার সম্পদ। আমি তোমার ভাণ্ডার। এরপর রসুল স. পাঠ করলেন — ওয়াল ইয়াহ্ছাবান্নাল্লাজীনা ইয়াবখালুনা (যারা কৃপণ তারা যেনো ধারণা না করে যে ....)। বোখারী।

হজরত আবু জর গিফারী সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, উট, মহিষ, গরু ছাগলের যে মালিক জাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তাকে করা হবে বিশাল বপুর অধিকারী। তার পশুগুলো তখন তাকে পদপিষ্ট করতে থাকবে। আর আঘাত করবে শিঙ দিয়ে। এভাবে এক দলের পর আরেক দল তাকে শাস্তি দিতে থাকবে — যতক্ষণ না দেয়া হবে স্থায়ী সিদ্ধান্ত (বেহেশত অথবা দোজখের)। বোখারী, মুসলিম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৬

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

❒ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহের বিধানে আল্লাহের নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজদিগের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা অংশীবাদীদিগের সহিত সমবেতভাবে যুদ্ধ করিবে যেমন তাহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ সাবধানীদিগের সঙ্গে আছেন।

এক বৎসরে মাস রয়েছে বারোটি। বৎসর ও মাস গণনায় এই নিয়মটি আল্লাহ্তায়ালার বিধানাধীন। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই এই বিধানটি প্রচলিত। এখানে আল্লাহ্র বিধানের অর্থ আল্লাহ্তায়ালার কিতাব। অর্থাৎ লওহে মাহফুজ। বৎসরের বারো মাসের মধ্যে সম্পাদন করতে হয় বিভিন্ন ইবাদত। যেমন জিলহজ মাসে সম্পাদন করতে হয় হজ। রমজান মাসে রাখতে হয় রোজা। আবার বৎসর অন্তে দিতে হয় জমানো সম্পদের জাকাত। এর মধ্যে আবার চারটি মাস যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি মাস পরস্পর লগ্ন—

জিলকদ, জিলহজ ও মহররম। আলাদা মাসটির নাম রজব। আলোচ্য আয়াতে এ সকল নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে— এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। হজরত ইব্রাহিমের সময় থেকে এই বিধানাবলী বলবৎ রয়েছে। সুতরাং এসকল বিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নাজায়েয। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা এসকল বিধান পরিবর্তন করেছে বলেই তারা পথভ্রষ্ট। যেমন — খৃষ্টানেরা রমজান মাসে রোজা না রেখে অন্য সময় রোজা রাখে। আবার এক মাসের বদলে তারা রোজা রাখার নিয়ম করেছে পঞ্চাশ দিন ইত্যাদি। এ সকল স্বকপোলকল্পিত বিধান অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না।' একথার অর্থ— নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি মাসে তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহ কোরো না। আল্লাহ্তায়ালার বিধানানুসারে মাসগুলো সম্মানিত। তাই রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে ওগুলোকে অসম্মানিত কোরো না।

কাতাদা বলেছেন, নিষিদ্ধ মাস সমূহে (জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজবে) পুণ্যকর্ম করলে সওয়াব হয় অনেক বেশী। তাই এ মাসগুলোতে গোনাহ্র কাজ করলে তার শাস্তিও হবে অত্যন্ত কঠোর। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'জুলুম কোরো না' কথাটির অর্থ হবে হালাল মাস সমূহকে হারাম এবং হারাম মাস সমূহকে হালাল বানিয়ে নিয়ো না।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে — মুশরিকদের মতো মাসের হুরমত (সম্মান) রদবদল কোরো না। তারা মহররম মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো সফর মাসকে। ওই নিয়মকে তারা বলতো নাসী। এরকম পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানিয়ে নেয়া। অর্থাৎ জুলুম করা।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং তোমরা অংশীবাদীদের সঙ্গে সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখো, আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন।' এখানে ব্যবহৃত 'কাফ্ফাতান' শব্দটি হচ্ছে শব্দমূল। এর অর্থ — রোধ করা বা প্রতিহত করা। অর্থাৎ যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করলে মুশরিকদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া যায়, ততটুকুই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এর বেশী করা যাবে না। তাই এখানে কাফ্ফাতান (যথেষ্ট পুরোপুরি) কথাটির অর্থ হবে জামিয়ান (সমবেতভাবে)। একারণেই আলোচ্য আয়াতাংশটির অর্থ দাঁড়িয়েছে এরকম— সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে যেমন তারা (মুশরিকেরা) সমবেতভাবে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।' এটাই সাবধানতা (তাকওয়া)। যারা সাবধানী (মুত্তাকী) তারাই কেবল এরকম যথাযথ ও ভারসাম্য-

মূলক আমল করতে সক্ষম। তারা আল্লাহ্‌তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন সাহচর্য লাভে ধন্য। তাই সব শেষে বলা হয়েছে— এবং (হে আমার রসুল) আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে রয়েছেন।

বাগবী লিখেছেন, নিষিদ্ধ মাসসমূহের বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতপৃথকতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কাতিলুল মুশরিকীনা কাফফাতান (অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে যুদ্ধ করবে) — এই নির্দেশনাটি অবতীর্ণ হলে নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি রহিত হয়ে যায়। কারণ, নির্দেশনাটিতে ঢালাওভাবে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে। নিষিদ্ধ মাস সমূহের কথা এখানে উল্লেখই করা হয়নি। এতে করে বুঝা যায়, যে কোনো মাসে তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে। লক্ষ্যণীয় যে, রসুল স. হুনায়েনে বনী হাওয়াজেনদের সঙ্গে এবং তায়েফে বনী সাক্বিফদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো শাওয়াল মাসে। আর তা প্রলম্বিত হয়েছিলো জিলক্বদ মাসের কিছুদিন পর্যন্ত। অথচ জিলক্বদ মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস। এতে করে বুঝা যায়, নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি আর নেই। এ রকম অভিমত পোষণ করেন কাতাদা, আতা খোরাসানী, জুহ্‌রী এবং সুফিয়ান সওরী।

আমি বলি, অভিমতটি সঠিক নয়। 'সমবেতভাবে অংশীবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে' এবং 'তন্মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ'— দু'টো নির্দেশনাই এখানে একটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ দু'টো অবতীর্ণও হয়েছে এক সাথে। সুতরাং এদের একটি অপরটির রহিতকারী হতে পারে না। আর সমবেতভাবে অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিধানটি সাধারণ বিধান নয় যে, তা নিষিদ্ধ মাস সমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করবে। এ রকম কোনো ইঙ্গিতও আলোচ্য আয়াতে নেই। রসুল স. এর আমল দ্বারাও নিষিদ্ধ মাসের বিধান রহিত করা যায় না। কারণ, রসুল স. হুনায়েন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন শাওয়াল মাসে। শাওয়াল মাস নিষিদ্ধ মাস নয়। আর তিনি স. তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছিলেন জিলক্বদ মাস আসার সাথে সাথে। কারণ, জিলক্বদ মাস নিষিদ্ধ মাস। যদি জিলক্বদ মাসে অবরোধ বহাল রাখার হাদিস বিশুদ্ধ প্রমাণিতও হয়, তবু বর্ণনাটি হবে 'খবরে আহাদ'(একক বর্ণিত)। আর একক বর্ণনার দ্বারা কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিত হতে পারে না। এ কথাও প্রণিধানীয় যে, তায়েফ অবরোধ সংঘটিত হয়েছিলো অষ্টম হিজরীতে। আর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে নবম হিজরীতে। সুতরাং আগে সংঘটিত কোনো ঘটনা পরে অবতীর্ণ আয়াতকে রহিত করবে কীভাবে? তাছাড়া মহাতিরোধানের আশি দিন পূর্বে বিদায় হজের ভাষণেও রসুল স. নিষিদ্ধ মাস সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই নিষিদ্ধ মাসের বিধানটি রহিত হতেই পারে না — যদিও জিলক্বদ মাসে তায়েফ অবরোধের কথা বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত

হয়। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আতা বিন আবী বেরাহ্ কসম খেয়ে উল্লেখ করেছেন, নিষিদ্ধ মাসের বিধান যেমন রহিত হয়নি, তেমনি রহিত হয়নি হেরেম শরীফের সীমানার অভ্যন্তরের যুদ্ধের নিষিদ্ধতা। তবে হ্যাঁ, যদি বিধর্মীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করে তবে তার উপযুক্ত জবাব দেয়ার বিষয়টি স্বতন্ত্র। যুদ্ধ করা, আর যুদ্ধ করতে বাধ্য হওয়া নিশ্চয় এক কথা নয়। পরবর্তী আয়াতেও বিষয়টি অতি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৭

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ۝

❐ নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছাইয়া দেওয়া কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি করা; যাহা দ্বারা, যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা আল্লাহ্ যেগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা বৈধ করিতে পারে। তাহাদিগের মন্দ কাজগুলি তাহাদিগের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

'নাসীউন' শব্দটি এখানে ফায়িলুন শব্দের অনুসৃতিতে কর্তৃপদের অর্থবহ। যেমন সায়ীরুন, হারিকুন ইত্যাদি। অথবা শব্দটি এখানে কর্ম পদের অর্থে এসেছে। যেমন, জারিহুন এবং ক্বাতিলুন। 'নাসীউন' অর্থ মূলতবী রাখা, পেছনে ঠেলে দেয়া অথবা ওই বস্তু যাকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'আনশাহুল্লাহু আজালাহু (আল্লাহ্ তার আয়ুষ্কালে মন্থরতা দিয়েছেন)। নাস্সাআ ফিআজলিহি (তার মৃত্যুকষ্ট পিছিয়ে দিয়েছেন)।

এখানে 'নাসীউন' কথাটির প্রকৃত অর্থ নিষিদ্ধ মাস সমূহকে অগ্র-পশ্চাৎ করে দেয়া। মূর্খতার যুগে আরববাসীরা তাদের প্রয়োজনানুসারে কোনো নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিতো। আর ওই মাসের নিষিদ্ধতা আরোপ করতো পরবর্তী কোনো হালাল মাসে। আবু মালেক সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, মূর্খতার যুগে আরববাসীরা বছরের বারো মাসকে করে নিতো তেরো মাস (প্রতি তিন বছরে অতিরিক্ত কিছুদিন মিলিয়ে তৈরী করতো নতুন মাস)। কখনো মহররমকে বলতো সফর। মাসের হিসাবে এ রকম বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতটি।

বাগবী লিখেছেন, আরবেরা মাসের নিষিদ্ধতা বিশ্বাস করতো হজরত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে তারা লাভ করেছিলো এই শিক্ষা। এই শিক্ষাকে তারা মান্যও করতো। কিন্তু এতে করে তাদের অসুবিধা হতে লাগলো খুব। ইচ্ছেমতো শিকার, লুণ্ঠন, যুদ্ধ ইত্যাদি না করতে পেরে তাদের সাংসারিক জীবনে দেখা দিতো বিপর্যয়। বিশেষ করে পরস্পরলগ্ন তিনটি নিষিদ্ধ মাসে তারা অসুবিধা বোধ করতো খুব। ফলে কখনো কখনো নিষিদ্ধ মাসেই তারা শুরু করে দিতো যুদ্ধ ও লুণ্ঠন। তখন তারা ওই নিষিদ্ধতা আরোপ করতো পরবর্তী কোনো হালাল মাসের উপর। কিন্তু বিধান লংঘনের কারণে তারা অনুতপ্তও হতো না। এভাবে তারা মহররমকে করতো সফর। আর সফরকে করতো মহররম। আবার সফর মাসের নিষিদ্ধতা লংঘন করলে নিষিদ্ধ মাস ঘোষণা করতো রবিউল আওয়ালকে। এভাবে মাসচক্রের নিষিদ্ধতা ও অনিষিদ্ধতায় আক্রান্ত হতো পুরো বছর। বছরের পর বছর। ইসলামের আগমনের পর এমতো বিশৃংখলা অপসারিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় যথানিয়ম। রসুল স. তাঁর বিদায় হজের ভাষণেও এ বিষয়টির উল্লেখ করেন। হজরত আবু বকর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কোরবানীর দিন (দশই জিলহজ) আরাফা প্রান্তরে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, বিপর্যস্ত কালচক্র এবার পেয়েছে তার প্রকৃত রূপ— যে রূপ ছিলো আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়। বারো মাস মিলে হয় এক বছর। এর মধ্যে চার মাস বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ তিনটি মাস পরস্পর সংলগ্ন— জিলক্বদ, জিলহজ, মহররম। আর একটি নিষিদ্ধ মাস রয়েছে জমাদিউস্‌সানি ও শাবানের মধ্যভাগে। সে মাসটির নাম রজব। এরপর রসুল স. বললেন, এটা কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই উত্তমরূপে অবগত। আমাদের কথা শুনে তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম, এ মাসের নাম তবে কি বদল করা হবে? কিছুক্ষণ পর তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, এটা কি জিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, এটা কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই তা ভালো জানেন। এ কথা শুনেও তিনি স. চুপ করে রইলেন। আমরা ভাবলাম, শহরের নাম হয়তো বা বদল করা হতে পারে। একটু পরে মৌনতা ভেঙে তিনি স. উচ্চারণ করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, এই দিন কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল সমধিক জ্ঞাত। এবারও তিনি কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। আমরা ভাবলাম, দিবসের নামও হয়তো বা বদলে যেতে পারে। তিনি বলে উঠলেন, এটা কি কোরবানীর দিবস নয়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি স. বললেন, এই দিন এই মাস এবং এই শহর যেমন সম্মানিত, তেমনি সম্মানার্হ তোমাদের রক্ত, সম্পদ এবং ব্যক্তিত্ব। তোমাদের কারো রক্ত, সম্পদ ও মর্যাদা

কারো জন্য হালাল নয়। অচিরেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি তোমাদের আমল সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। সুতরাং সাবধান! আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা ভ্রষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। কারো গর্দানে কেউ আঘাত কোরো না। এবার বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। হে আল্লাহ্র রসুল। আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি স. বললেন, আয় আল্লাহ্! তুমিও সাক্ষী থাকো। তারপর বললেন, হে উপস্থিত জনতা! তোমরাও আল্লাহ্র নির্দেশ যথাযথরূপে পৌঁছাতে থাকো। এমনও হতে পারে, যারা পৌঁছে দিবে, তাদের চেয়ে অধিক স্মরণে রাখবে তারা, যাদেরকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

আলেমগণ বলেছেন, মূর্খতার যুগে নিষিদ্ধ মাস পিছিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটতো অহরহ। কোনো নির্দিষ্ট মাসে কয়েক বছর হজ করার পর আবার কয়েক বছরের জন্য হজের জন্য নির্দিষ্ট করতো অন্য মাসকে। মুজাহিদ বলেছেন, পর পর দু'বছর তারা একই মাসে হজ করতো। তারপর বদলিয়ে দিতো হজের মাস। জিলহজে দু'বছর, মহররমে দু'বছর, সফরে দু'বছর— এভাবে তারা প্রতি দু'বছর অন্তর হজের মাসকে বদলিয়ে নিতো। রসুল স. ওই বিশৃঙ্খলার অপনোদন ঘটান। যথা স্থানে স্থাপন করেন, হজের মাস ও স্থানকে। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, মূর্খতার যুগের নিয়ম আজ থেকে রহিত হলো। সময়চক্রকে দেয়া হলো তার নিজস্ব আকার, যে আকার নির্ধারণ করা হয়েছিলো আসমান ও জমিন সৃষ্টির সময়।

সর্বপ্রথম নাসীউ'র (পিছিয়ে দেয়ার) প্রচলন কে ঘটিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতভিন্নতা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেছেন, এই অপপ্রথাটি প্রথম প্রবর্তন করেছিলো মালেক বিন কিনানা গোত্র। এ কাজে তারা ছিলো তিনজন— আবু সামামা, জিন্দাল বিন আউফ এবং ইবনে উমাইয়া কিনানী। কালাবী বলেছেন, এই রীতিটির অগ্রণী ছিলো নাইম বিন ছা'লাবা কিনানী। সে ছিলো আমীরে হজ (হজের অধিনায়ক)। একবার সে হজ শেষে উপস্থিত হাজীদের উদ্দেশ্যে বললো, আমি একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। আমার এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমরা কোনো রসিকতা করতে পারবে না, মতভেদ করতে পারবে না এবং বিরোধিতাও করতে পারবে না। তখনকার যুগে মুশরিক হাজীরাও 'লাব্বায়েকা' উচ্চারণ করতো এবং আবেদন করতো বারো মাসের স্থলে আমাদেরকে তেরো মাস নির্ধারণ করে দেয়া হোক। তাদের আবেদন গৃহীত হলো। তখন থেকে হজ শেষে ঘোষণা দেয়া হতে লাগলো, পরবর্তী নতুন নতুন হজের মাসের। নাইম বিন ছা'লাবার পরে আমীরে হজ নির্বাচিত হলো

জুনাদা বিন আউফ। সে রসুল স. এর জামানা পেয়েছিলো। আবদুর রহমান বিন জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন, নাঈম বিন ছা'লাবার পরের আমীরে হজ ছিলো বনী কিনানার অন্য এক ব্যক্তি। তার নাম গালমাস। জনৈক কিনানী কবি বলেছে— ত্রয়োদশ মাস নির্ধারণকারী ছিলো গালমাস।

জুহাক সূত্রে ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— মাস অদল বদল করার অপনিয়মটির প্রথম প্রবর্তক ছিলো আমর ইবনে জুহাই, ইবনে আমর, ইবনে কামআ, এবং ইবনে খান্দাফ্। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম লিখেছেন, আমি আমর বিন নুহাই বিন কামআ বিন খান্দাফকে দেখেছি দোজখের অভ্যন্তরে। সে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—' নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেয়া কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি করা।' এখানে 'জিয়াদাতুন্ ফিল কুফ্রী' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধি। মুশরিকেরা হালাল মাসকে হারাম এবং হারাম মাসকে হালাল করেছিলো। এই কর্মটিকেই এখানে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানের মাত্রা বৃদ্ধিকারী কর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'যা দ্বারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোনো বৎসর বৈধ করে এবং কোনো বৎসর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ্ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।'

মোহাম্মদ বিন ওমর এবং মোহাম্মদ বিন সাঈদ সূত্রে ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, কতিপয় নাবতি গোত্রের লোক সিরিয়া থেকে মদীনায় এসেছিলো চর্বিজাত তেল নিয়ে। তাদের মধ্যে একজন গল্পচ্ছলে বাজারের লোকজনকে বললো, রোমানরা বিশাল সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। প্রশাসক হারকিল তার সৈন্যদেরকে এক বছরের টাকাও দিয়ে দিয়েছে। ওই সেনাদলে রয়েছে বনী লাখম, বনী জুযাম, বনী আমালা এবং বনী গাস্সান গোত্রের অনেক লোক। তারাও নিজ নিজ স্থান থেকে যাত্রা করেছে। তাদের অগ্রগামী বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে বালকা পর্যন্ত। সংবাদটি ছিলো বানানো। তবুও রসুল স. সকলকে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন।

শিথিল সূত্রে ইমরান বিন হোসাইন থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, আরবের খৃষ্টানেরা রোমানের আঞ্চলিক প্রশাসক হারকিলকে লিখে জানালো, মোহাম্মদ নামক এক লোক নিজেকে নবী দাবী করে বসেছে। লোকজনকে তার দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এদিকে চলছে দুর্ভিক্ষ। গৃহপালিত পশু ধ্বংস হওয়ার পথে।

যদি আপনি আপনার ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে চান, তবে এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। হারকিলের এই প্রস্তাব মনোপুত হলো। সে তার এক সেনাধিনায়কের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করলো। এ সংবাদ পৌঁছলো রসুল স. এর নিকটে। তিনিও তখন জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

উত্তম সূত্রে ইবনে আবী হাতেম এবং আবু সাঈদ নিশাপুরী বর্ণনা করেছেন, ইহুদীরা একবার বললো, আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্যি সত্যি নবী হন, তবে সিরিয়ায় গমন করুন। কারণ সিরিয়া ছিলো অনেক নবী-রসুলের বিচরণ ভূমি। রসুল স. তখন মনস্থির করলেন, এবার অভিযান পরিচালনা করতে হবে সিরিয়ায়। এই অভিযান বাস্তবায়নের জন্য তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন তাবুক নামক স্থানে। তখন অবতীর্ণ হয় সুরা বনী ইসরাইল। এক আয়াতে বলা হয়— ওয়া ইনকানু লা ইয়াসৃতা ফিজ্জুনাকা মিনাল আরদ্বী (তারা তো আপনাকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করতে চায়)।

ইবনে মারদুবিয়া হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তি, ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির মুজাহিদের অভিমত এবং ইবনে জারীর হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— যখন বিধর্মীদের জন্য হজ নিষিদ্ধ করা হলো তখন কুরায়েশরা বললো, এখন তো আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য শেষ হয়ে গেলো। দূরদেশের মানুষ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে আসতো। লেন-দেন করতো আমাদের সঙ্গে। এখনতো তারা আর আসবে না। তাহলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলবে কিভাবে। এ রকম কথোপকথনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক আহলে কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। বলে দিলেন, যুদ্ধ করতে হবে ওই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যাবে অথবা অবনত মস্তকে জিযিয়া কর প্রদান করতে সম্মত হবে। এ সম্পর্কিত আয়াতটি এ রকম— ওয়া ইনখিফতুম আইলাতান ফাসাওফা ইউগনি কুমুল্লহু মিন ফাদ্বলিহ্ (যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করতে পারেন)। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু কাতিলুল্লাজীনা ইয়া লাওনাকুম মিনাল কুফ্ফারী ওয়াল ইয়াজিদু ফিকুম গিলজাতান (হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা সংগ্রাম করো তাদের ...)। এরপর রসুল স. রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কারণ রোমানদের আঞ্চলিক রাজ্য সিরিয়াই ছিলো আরব উপদ্বীপের সর্বাপেক্ষা নিকটে। নিকটস্থ প্রতিবেশী হিসেবে সিরিয়াবাসীরাই ছিলো ইসলাম গ্রহণের অধিক হকদার।

বাগবী লিখেছেন, তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসুল স. রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলেন। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধের সময় দেশ ছিলো দুর্ভিক্ষকবলিত। দেখা দিয়েছিলো প্রচণ্ড খরা। আর তখন ছিলো ফসল বপনের মৌসুম। এ সকল কারণে মুসলমানদের

মধ্যে দেখা দিয়েছিলো উদ্যমহীনতা। প্রচণ্ড খরায় গৃহচ্ছায়া ও বৃক্ষচ্ছায়াই ছিলো খরাতপ্ত জীবনের একান্ত কামনা। তার সঙ্গে ছিলো শস্য বপনের মৌসুম বিগত হওয়ার আশংকা। এ সকল কারণে দ্রুত মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা আচ্ছন্ন করেছিলো মুজাহিদবৃন্দকে। রসুল স. এর রীতি ছিলো তিনি যুদ্ধ গমনকালে ইংগিতে সকলকে জানিয়ে দিতেন বিজয়ের শুভসংবাদ। উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ঘোষণা করতেন নতুনতর অভিযানের কথা। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি এ রকম করেননি। তিনি তখন সকল অসুবিধার কথা আগে থেকেই সকলকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পথ দীর্ঘ। নিসর্গ খরাতপ্ত। শত্রু সেনাদের সংখ্যাও বিপুল। এ সকল বলে তিনি সকলকে নাম ধরে ধরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে ইবনে আবী শায়বা, বোখারী এবং ইবনে সা'দও এ রকম বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— রসুল স. মদীনার আশেপাশে বসবাসকারী আরব গোত্র-গুলোকেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। আহ্বান জানালেন মক্কা-বাসীদেরকেও। ফলে বহুসংখ্যক লোক তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। পশ্চাতে থেকে গেলো কেবল মুনাফিক। কতিপয় বিশ্বাসীও আলস্য বশতঃ যুদ্ধ-গমন থেকে বিরত রইলো। তখন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ○

❑ হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগের হইল কি যে যখন তোমাদিগকে আল্লাহের পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ঘরমনা হইয়া গড়িমসি কর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিতকর।

আলস্য-আক্রান্ত মুজাহিদগণকে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই আয়াতে। এই উদ্বুদ্ধকরণের মধ্যে মুনাফিকেরাও পড়ে। কারণ প্রকাশ্যতঃ তারাও ছিলো ইমানের দাবিদার। এখানে মালাকুম (তোমাদের হলো কি) কথাটি ভর্ৎসনা প্রকাশক নয়, অনুপ্রেরণামূলক। ইজাক্বীলা (বের হতে বলা হয়) কথাটির অর্থ এখানে— যখন রসুল স. তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য বের হতে বলেন। ইনফিরু

অর্থ দলে দলে বের হও। ইছ্ছাক্বালতুম অর্থ— গড়িমসি করলে। ইলাল আরদ্বী অর্থ গৃহকাতর হয়ে গেলে। আরদ্বীতুম বিল হায়াতিদ্দুনইয়া মিনাল আখিরাহ্ অর্থ— তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছো। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে বিশ্বাসীগণ! কি হয়েছে তোমাদের! আল্লাহ্র রসুল তোমাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। অথচ তোমরা গৃহ-কাতরতা থেকে মুক্ত হতে পারছো না। প্রশ্রয় দিচ্ছো আলস্যকে। এ রকম করার অর্থ কি? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হতে চাও?

শেষে বলা হয়েছে— 'ফামা মাতাউ'ল হায়াতিদ্দুন্ইয়া ফিল আখিরাতি ইল্লা ক্বলীল।' এ কথার অর্থ— পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো নিতান্ত নগণ্য, অকিঞ্চিতকর।

নাজদা বিন জাকিয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. আরবের একটি গোত্রকে জেহাদের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা আলস্য বশতঃ জেহাদ যাত্রা থেকে বিরত রইলো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত। বলা হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৩৯

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

❒ যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

জেহাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়া একটি গুরুতর অপরাধ। এর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। সে শাস্তি পৃথিবীতেও হতে পারে। আবার হতে পারে আখেরাতেও অথবা উভয় স্থানে। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! এ রকম মনে কোরো না যে, তোমরা জেহাদে অংশগ্রহণ না করলে জেহাদের মতো মহান কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকবে। তোমরা না এলে আল্লাহ্পাক অন্য কোনো জাতিকে এই নেয়ামত দান করবেন। তখন তারা হবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'অপর জাতিকে' বলে বুঝানো হয়েছে ইয়ামেনবাসীকে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, পারস্যবাসীকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।' একথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা মুখাপেক্ষিতারহিত। সুতরাং তোমরা জেহাদের নির্দেশ লংঘন করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হু' (তার) সর্বনামটি রসুল স. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যদি তাই হয় তবে আলোচ্য বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— তোমরা তাঁর রসুলের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্পাকই তাঁর সংরক্ষক ও সাহায্যকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে, সর্ব শক্তিমান। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে সাহায্য করতে যেমন সক্ষম তেমনি সক্ষম তাঁর রসুলকে অন্যের সাহায্যে সফল করতে। যারা যুদ্ধে যেতে আলস্য করেছিলো তাদের জন্য এই আয়াতটি একটি হুমকি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪০

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

❒ যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারিগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের একজন যখন তাহারা গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, 'বিষণ্ন হইওনা আল্লাহ্ আমাদিগের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর তাহার দয়া বর্ষণ করেন যাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয়। এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের কথা হেয় করেন, আল্লাহের কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

'যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না করো তবে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছিলেন' কথাটির অর্থ— হে অসচেতন বিশ্বাসীরা! তোমরা যদি রসুলের সাহায্যকারী না হও, তবে আল্লাহ্পাক তো অবশ্যই তাঁর সাহায্যকারী। 'আল্লাহ্

তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাকে বহিষ্কার করেছিলো' কথাটির অর্থ— স্মরণ করো, ওই সঙ্গীন সময়ের কথা, যখন মক্কায় মুশরিকেরা রসুল স. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো, তখন কেউ তাঁর সাহায্যকারী ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক ঠিকই তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। দিয়েছিলেন হিজরতের নির্দেশ। এরপর বলা হয়েছে— 'এবং সে ছিলো দুইজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলো, সে তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলো, 'বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এ কথার অর্থ, হিজরতের রাতে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যখন রসুল স. সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেবল হজরত আবু বকর। ওই সময় আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁদেরকে হেফাজত করেছিলেন। হজরত আবু বকর রসুল স. এর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রসুল স. তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, বিষণ্ন হচ্ছো কেনো? আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেনই।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি ও বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে একবার বলেছিলেন, তুমি ছিলে আমার পর্বতগহ্বরের সাথী। হাউজে কাওসারেও হবে আমার বিশেষ সহচর। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে খলিল (বন্ধু) বানাতাম, তবে আবু বকরই হতো আমার খলিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের সাথীকে (আমাকে) খলিল বানিয়েছেন। হাসান বিন ফজল বলেছেন, যদি কেউ হজরত আবু বকরকে রসুল স. এর সাহাবী না বলে, তবে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে কোরআনের এই আয়াতের সুস্পষ্ট বিবরণকে অস্বীকারকারী। আর অন্যান্য সাহাবীদের কাউকে সাহাবী না বললে হবে ফাসেক।

আলোচ্য আয়াতে হজরত আবু বকরের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টিও সুপ্রমাণিত। একবার তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সে ছিলো দুইজনের একজন।' তারপর বলা হয়েছে 'সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলো'। এরপর বলা হয়েছে (রসুল স. বলেছিলেন) বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। এভাবে হজরত আবু বকরের রসুল স. এর সঙ্গী হওয়া এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গী হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌পাকের সঙ্গে থাকার বিষয়টি অন্য কারো সঙ্গে থাকার মতো নয়। আল্লাহ্‌পাকের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর মতো তাঁর সঙ্গে থাকার বিষয়টিও আনুরূপ্যবিহীন। শহীদ শায়েখ মির্জা মাযহারে জানে জাঁনা র. বলেছেন, হজরত আবু বকরের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট। এখানে তাঁর রসুল স. এর সাহচর্য এবং রসুল স. এর সহচর হিসেবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহচর্যের কথা স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং যারা হজরত আবু বকরের ফযীলতকে অস্বীকার করবে, তারা এই আয়াতকে অস্বীকার করবে। আর আয়াতকে যে অস্বীকার করে সে কাফের।

সওর পর্বতের গুহায় রসুল স. তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাথী হজরত আবু বকরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, বিষণ্ন হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। রাফেজীরা এ কথা উল্লেখ করে হজরত আবু বকরকে অপবাদ দেয়। বলে, হজরত আবু বকরের বিশ্বাস ছিলো দুর্বল। আর তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই রসুল স. আল্লাহ্তায়ালার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপনের জন্য এবং তাঁর মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এ রকম নয়। হজরত আবু বকর বিষণ্ন হয়েছিলেন রসুল স. এর নিরাপত্তার জন্য। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, আমার মৃত্যু হলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু আল্লাহ্র রসুল শহীদ হয়ে গেলে তাঁর উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো এটাই। আমরা পর্বতগহ্বর সম্পর্কিত হাদিসে যথাস্থানে এ কথা উল্লেখ করবো যে, হজরত আবু বকর তখন রসুল স. এর পবিত্র অস্তিত্ব নিরাপদ রাখবার জন্যই দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন। নিজের জীবনের জন্য তাঁর কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা অথবা বিষণ্নতা ছিলো না।

হিজরতঃ জননী আয়েশা থেকে হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা এনেছেন মুসা বিন উকবা, ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান এবং বোখারী। আর ইবনে ইসহাক ও তিবরানী বর্ণনা উপস্থিত করেছেন জননী আয়েশার বড় বোন হজরত আসমা থেকে। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেন, আমি যখন বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই আমি আমার পিতা মাতাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেছি ইসলামের উপর। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা রসুল স. আমাদের বাড়ীতে আসতেন। মুসলমানদের তখন ঘোর দুর্দিন। ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিলো অত্যাচার ও নিগ্রহ। তখন রসুল স. একদিন বললেন, আবু বকর! স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। স্থানটি দুই পর্বতের মধ্যস্থলে একটি কংকরময় ভূমি। সেখানে রয়েছে খেজুরের বাগান। ইতোপূর্বে কেউ কেউ মদীনায় হিজরত করে গিয়েছিলেন। তারও আগে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে গিয়েছিলো একটি দল। সেখান থেকে তারাও সম্ভবতঃ মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। রসুল স. এর স্বপ্নের কথা শুনে আমার পিতা হজরত আবু বকরও হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। রসুল স. তাঁকে বললেন, কিছুকাল অপেক্ষা করো (এখনো আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি)। মনে হয় হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে তোমাকেও। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক, আশা রাখি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। তিনি স. বললেন, মনে হয় তাই। এরপর থেকে হজরত আবু বকর হিজরতের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি দু'টি উষ্ট্রীকে বাবলার পাতা খাইয়ে বিশেষভাবে প্রতিপালন করতে লাগলেন। চার মাস কেটে গেলো এভাবে। একদিন আমার পিতার সঙ্গে আমাদের ঘরে বসেছিলাম

আমি ও আমার বড় বুবু। তখন দ্বিপ্রহর। বড় বুবু আসমা বললেন, আব্বা! দেখুন, আল্লাহ্‌র রসুল আগমন করছেন। আমরা সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখলাম, আরবীয় রীতিনীতির পরিপন্থী নিয়মে মাথায় কাপড় জড়িয়ে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং রসুল স.। আমার পিতা বললেন, আমার জনক জননী কোরবান হোক রসুলের জন্য। অসময়ে রসুল স. এর আগমনের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। মনে হয় এবার হিজরতের অনুমতি মিলবে। রসুল স. গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সাদর অভ্যর্থনার সঙ্গে আমার পিতা রসুল স. কে আমাদের ঘরে নিয়ে এলেন। রসুল স. বললেন, এদেরকে সরে যেতে বলো। আমার পিতা বললেন, এরাতো আমার একান্ত অনুগতা দুই কন্যা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এরা তো আপনারই পরিবারভুক্ত। রসুল স. বললেন, আমাকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমার পিতা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুগ্রহ করে আমাকেও আপনার সঙ্গী করে নিন। তিনি স. বললেন, অনুমতি দেয়া হলো। আনন্দে কেঁদে ফেললেন আমার পিতা। আমি ওভাবে আর কখনো তাঁকে কাঁদতে দেখিনি। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় রসুল! আমার জনয়িতা জনয়িত্রী আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। হিজরতের জন্য দু'টি উট প্রস্তুত রেখেছি আমি। দয়া করে সে দু'টোর একটি আপনি গ্রহণ করুন। রসুল স. বললেন, আমি উপযুক্ত মূল্যে তোমার উট ক্রয় করবো। আমার পিতা বললেন, আমি তো আপনার পবিত্র ইচ্ছার অনুগামী। তিনি স. বললেন, কতো টাকায় কিনেছিলে। আমার পিতা বললেন, এতো টাকায়। রসুল স. বললেন, আমি দিবো এতো টাকা। পিতা বললেন, অর্থ ও উট- সবই আপনার।

বোখারী তাঁর গ্রন্থের যুদ্ধবিষয়ক অধ্যায়ে লিখেছেন, ওই উষ্ট্রীটির নাম ছিলো জদআ। ওয়াকেদী লিখেছেন, উষ্ট্রীটির মূল্য ছিলো আটশত দিরহাম। উম্মত জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমরা রসুল স. ও আমার পিতার জন্য উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে একটি থলির মধ্যে রেখে দিলাম। ওয়াকেদী লিখেছেন, আহার্য সামগ্রীর মধ্যে ছাগলের ভূনা গোশতও ছিলো। জননী বলেন, বড় বুবু তাঁর কোমরের বন্ধনী কেটে তাই দিয়ে থলির মুখ সুন্দর করে বাঁধলেন। এজন্য তাঁর উপাধি হয়েছিলো যাতিন নাতাকাইন (দুই কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উপাধি হয়েছিলো যাতিন নিতাক (কোমর বন্ধনী-ধারিণী)। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা তখন তাঁর কোমর বন্ধ ছিঁড়ে দু'টুকরো করেছিলেন। এক টুকরা দিয়ে বেঁধে দিলেন খাদ্য সামগ্রীর থলি। অপর টুকরো বেঁধে রেখেছিলেন কোমরে। তাই তাঁকে যাত্তিন নাতাক এবং যাত্তিন নাতাকাইন বলা হতো। ইবনে সা'দ বলেছেন, কোমর বন্ধের একটি টুকরা কোমরে বেঁধে রেখে অপর টুকরোর দ্বারা খাদ্যের থলির মুখ

বেঁধেছিলেন বলেই হজরত আসমাকে বলা হয় 'দুই কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী।' তিনি খাদ্যের থলি বাঁধার ফিতাটি আবার দুই টুকরা করেছিলেন। এক টুকরার মাধ্যমে বেঁধেছিলেন খাদ্য থলির মুখ এবং অপর টুকরার মাধ্যমে বেঁধেছিলেন পানির মশকের মুখ। রসুল স. পথ প্রদর্শক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন বনী দায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত এবং পথ প্রদর্শনের কাজে প্রাজ্ঞ। পরে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হিজরতের জন্য প্রস্তুতকৃত উট দু'টো তাকে অর্পণ করে বলা হয়েছিলো, আমরা যখন বের হয়ে যাবো, তার তিনদিন পর তুমি উট দু'টো নিয়ে উপস্থিত হয়ো সওর পর্বতের পাদদেশে। হিজরতের প্রাক্কালে রসুল স. হজরত আলীকে নির্দেশ দেন, তুমি আমার চাদর গায়ে দিয়ে আমার শয্যায় শুয়ে পড়বে। আর যাদের আমানত আমার কাছে জমা রয়েছে তাদেরকে যথাযথভাবে সেগুলো ফিরিয়ে দিবে। উল্লেখ্য যে, রসুল স. আমানতদার হিসেবে ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত। তাই মুসলমান, মুশরিক সকলে তাঁর নিকট অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী গচ্ছিত রাখতেন।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এরপর রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সওর পর্বতের গুহায়। হজরত ওমর থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তিনি স. রওয়ানা হয়েছিলেন রাতে। ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী বলেছেন, হজরত আবু বকরের বসতবাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হজরত আয়েশা বিনতে কুদামা থেকে আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সামনে পড়েছিলো আবু জেহেল। আল্লাহ্‌পাক তখন তার দৃষ্টিশক্তি রহিত করে দিয়েছিলেন, তাই সে আমাদেরকে দেখতে পায়নি।

হজরত আসমা বর্ণনা করেন, আমার পিতার জমানো সম্পদ ছিলো পঞ্চাশ হাজার দিরহাম। সবগুলোই তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হজরত আবু বকরের নিকটে ছিলো চল্লিশ হাজার দিরহাম। হিজরতের প্রাক্কালে অবশিষ্ট ছিলো কেবল চার হাজার অথবা পাঁচ হাজার দিরহাম। ওই দিরহামগুলো হজরত আবু বকরের পুত্র সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছিয়ে দেন। জননী আয়েশা বলেন, আমার পিতামহ কুহাফা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি আমার পিতার চলে যাওয়ার সংবাদ জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! মনে হয় সে সবকিছু নিয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, না তিনি এমন করতে পারেন না। আমি তখন কিছু পাথর তাকের উপর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। এরপর আমার পিতামহের হাত ধরে এনে তাকের কাছে দাঁড় করালাম। বললাম, এখানে হাত দিয়ে দেখুন, সবকিছুই এখানে রয়েছে। তিনি

হাত বাড়িয়ে বস্ত্রাবৃত পাথরগুলো স্পর্শ করলেন এবং বললেন, তাহলে তো দোষের কিছু নেই। আবু বকর ঠিকই করেছে। জননী আয়েশা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! হজরত আবু বকর আমাদের জন্য কোনো কিছু রেখে যাননি। আমি আমার বৃদ্ধ পিতামহকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে এ রকম করেছিলাম।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, সওর পর্বত অভিমুখে যাত্রার সময় হজরত আবু বকর বার বার তাঁর স্থান পরিবর্তন করতে লাগলেন। কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে। কখনো দক্ষিণে। আবার কখনো বামে। রসুল স. বললেন, এমন করছো কেনো? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! যখন আমার মনে হচ্ছে সামনে হয়তো কোনো গুপ্তঘাতক ওৎ পেতে রয়েছে, তখন আমি চলছি আপনার সামনে, আবার যখন মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে তখন চলে যাচ্ছি পিছনে। এভাবে আপনার হেফাজতের জন্য আমি ছুটাছুটি করছি, কখনো সামনে কখনো পশ্চাতে। কখনো দক্ষিণে আবার কখনো বামে। সওর পর্বতের গুহামুখে উপস্থিত হলেন তাঁরা। হজরত আবু বকর বললেন, যিনি আপনাকে রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! হে প্রিয় রসুল, আপনি আগে ভিতরে ঢুকবেন না। আমি আগে ভিতরে দেখে আসি। যদি কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকে তবে তা দংশন করুক আমাকে। আপনাকে নয়। ভিতরে প্রবেশ করলেন হজরত আবু বকর। ঘোর অন্ধকার গুহাগাত্রে হাত বুলাতে লাগলেন। এভাবে খুঁজে বের করে গুহাগাত্রের গর্তগুলো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ছিঁড়ে বন্ধ করে দিলেন। গর্তের মুখে ভালো করে গুঁজে দিলেন বস্ত্রখণ্ডগুলো। কিন্তু বস্ত্রখণ্ডের অভাবে দু'টো গর্ত আর বন্ধ করতে পারলেন না। ওই গর্ত দু'টোর মুখ চেপে ধরলেন তাঁর দুই পায়ের গোড়ালী দিয়ে। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এবার আপনি ভিতরে আসুন। বিশ্রাম গ্রহণ করুন। রসুল স. প্রবেশ করলেন। হজরত আবু বকরের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করে শুয়ে পড়লেন। ওদিকে হজরত আবু বকরের গোড়ালীতে দংশন করতে শুরু করলো গর্তবদ্ধ সাপ। হজরত আবু বকর রইলেন অবিচল। কিন্তু বিষের যন্ত্রণায় তাঁর দু'চোখ থেকে নির্গত হতে লাগলো অশ্রু। ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর স্বয়ং বলেছেন, গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর আমি দেখতে পেলাম একটি গর্ত। ওই গর্তের উপরে বিছিয়ে দিলাম দু'পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন। গর্তের ভিতরে সর্প অথবা বৃশ্চিক যদি থাকে, তবে তা আমাকেই দংশন করবে। আপনি থাকবেন নিরাপদ। হজরত জুনদুব বিন সুফিয়ান থেকে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু বকর বলেন, সওর পর্বতের গুহামুখে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি গুহা-অন্দরে প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি।

একথা বলে হজরত আবু বকর গুহায় ঢুকলেন। পরিষ্কার করতে শুরু করলেন স্থানটি। তখন কিছু একটা লেগে তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। তিনি উচ্চারণ করলেন— একটি আঙ্গুলই তো মাত্র জখম হয়েছে। আর এ যন্ত্রণা তো অর্জিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে থেকে।

হজরত আনাস থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সকাল হলো। রসুল স. বললেন, হে আবু বকর! তোমার গাত্রাবরণ কোথায়? হজরত আবু বকর বলেন, গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গর্তগুলো বন্ধ করেছি। রসুল স. আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র দু'হাত তুলে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ! আবু বকরকে জান্নাতেও আমার সঙ্গে রেখো। প্রত্যাদেশ হলো— আপনার প্রার্থনা গৃহীত হয়েছে।

রুজাইনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমরের নিকটে একবার সওর পর্বতের গুহার ঘটনা বর্ণনা করা হলো। তিনি তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সারা জীবনের পুণ্যকর্ম একত্রিত করলেও হজরত আবু বকরের ওই এক রাত্রির পুণ্যের সমতুল্য হবে না। ওই রাতে হজরত আবু বকর গুহামুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি আগে ভিতরে যাবেন না। আমি আগে যাই। যদি কিছু হয় তবে আমার উপরেই হোক। এ কথা বলে তিনি গুহায় ঢুকে স্থানটি পরিষ্কার করলেন। একটি গর্ত দেখতে পেয়ে পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ ছিঁড়ে বন্ধ করে দিলেন গর্তটির মুখ। আরো দু'টি গর্ত দেখে সেগুলোর মুখে রাখলেন দুই পা। তারপর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এবার আসুন। রসুল স. গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং হজরত আবু বকরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। গর্তে ছিলো একটি সাপ। সেই সাপটি দংশন করলো হজরত আবু বকরের পায়ে। বিষে জর্জরিত হলেন তিনি। কিন্তু রসুল স. এর বিশ্রামে ব্যাঘাত হবে মনে করে একটুও নড়াচড়া করলেন না। যন্ত্রণায় অশ্রু নির্গত হলো তাঁর চোখ থেকে। এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলে। রসুল স. সচকিত হলেন। বললেন, কি হয়েছে তোমার? হজরত আবু বকর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। মনে হয় সাপ ছোবল মেরেছে। রসুল স. তাঁর পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন দংশিত স্থানে। অপসারিত হলো বিষের যন্ত্রণা। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই বিষে। ওই বিষই কারণ হয়েছিলো তাঁর মৃত্যুর। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর আরবের কতিপয় গোত্র ধর্মত্যাগ করলো। বললো, আমরা জাকাত দিতে পারবো না। হজরত আবু বকর বললেন, রসুল স. এর সময়ে যদি তারা জাকাত হিসেবে একটি উটের রশি দিয়ে থাকে, তবে এখনও তাই দিতে হবে। নয়তো আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। হজরত ওমর বলেন, আমি বললাম, হে খলিফাতুল মুসলিমীন! রসুল স. মানুষকে একত্র

রেখেছিলেন এবং প্রদর্শন করেছিলেন নম্রতা। হজরত আবু বকর বললেন, হে ওমর! মূর্খতার যুগে তুমি ছিলে বীর পুরুষ। তবে ইসলাম গ্রহণ করার পর এ রকম দুর্বলতা প্রদর্শন করছো কেনো? প্রত্যাদেশ রুদ্ধ হয়েছে, ধর্ম পেয়েছে তার পরিপূর্ণ রূপ। আমি বেঁচে থাকতেই কি ধর্মের মধ্যে দেখা দিবে ন্যূনতা।

ইবনে সা'দ, আবু নাঈম, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, আবু মুসাইব বকসী বলেছেন, আমি হজরত আনাস বিন মালেক, হজরত জায়েদ বিন আরকাম এবং হজরত মুগিরা বিন শোবা প্রমুখ সাহাবীর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছি। তাঁদের নিকট থেকে শুনেছি, রসুল স. সওর পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার পর আল্লাহ্পাক গুহামুখে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন বৃক্ষরাজি। মাকড়সা এসে জাল বিস্তার করেছিলো সেখানে। আর বাসা বেঁধেছিলো দু'টি জংলী কবুতর। পরদিন আবু জেহেলের দল বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে রসুল স. কে খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো ওই গুহার নিকটে। রসুল স. এর সঙ্গে যখন তাদের ব্যবধান ছিলো মাত্র চল্লিশ গজ। গুহামুখের দিকে তাকিয়ে তারা দেখলো, সেখানে রয়েছে মাকড়শার জাল ও জংলী কবুতরের বাসা। তাদের একজন বললো, না, এ গুহায় কেউ থাকতে পারে না। রসুল স. শুনতে পেলেন তাদের কথা। বুঝলেন, তিনি ও হজরত আবু বকর রয়েছেন আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে। তিনি কবুতর দু'টোর জন্য দোয়া করলেন। পরে ওই কবুতর দু'টো বাসা বেঁধেছিলো কাবা শরীফের চত্তরে। হেরেম শরীফের সকল কবুতর ওই কবুতর দু'টির বংশধর।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে উত্তম সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে মুশরিকেরা পৌঁছে গিয়েছিলো সওর পর্বতের সানুদেশে। এরপর তারা দেখে, পদচিহ্নগুলো এলোমলো ও অস্পষ্ট। গুহার মুখ পর্যন্ত তারা উপস্থিত হলো। কিন্তু গুহামুখে মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, নাহ্। গুহায় কেউ প্রবেশ করলে মাকড়সার জাল অক্ষুণ্ণ থাকতো না। রসুল স. ওই গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তিনরাত্রি।

ইমাম নাসায়ীর শিক্ষক কাযী হাফেজ আবু বকর বিন সাঈদ তাঁর মাসদুস সিদ্দ্ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, কুরায়েশরা খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলো সওর পর্বতের ওই গুহাটির সামনে। গুহামুখে মাকড়সার জাল দেখতে পেয়ে বললো, কেউ গুহায় ঢুকলে মাকড়সার জাল অটুট থাকতো না। রসুল স. তখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। পাহারা দিচ্ছিলেন হজরত আবু বকর। হজরত আবু বকর শিউরে উঠলেন। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শত্রুরা তো এসেই পড়েছে। নিজের জন্য আমি শংকিত নই। ভাবছি, আপনার উপর না জানি কোন বিপদ আপতিত হয়। রসুল স. বললেন, চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গী।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু বকর সিদ্দীক বলেছেন, আমি তখন ভয়ার্তস্বরে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা নিচে, আর উপরে গুহামুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুরা। পায়ের দিকে তাকালেই তারা আমাদের দেখে ফেলবে। রসুল স. বললেন, আবু বকর! ওই দু'জন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয় সঙ্গী স্বয়ং আল্লাহ্? আবু নাঈম তাঁর হুলিয়া পুস্তকে আতা বিন মায়সারা সূত্রে লিখেছেন, মাকড়সার জালের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা হেফাজত করেছিলেন দু'জনকে। একবার তালুতের আক্রমণ থেকে হজরত দাউদকে। আর একবার কুরায়েশদের হাত থেকে রসুল স. কে।

ঐতিহাসিক বালাজুরী লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলো আলকামা বিন করজ বিন হেলাল খাজায়ীকে। আলকামা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো মক্কা বিজয়ের পর। হিজরতের সময় সে ছিলো মুশরিকদের ভাড়া করা গোয়েন্দা ও পথ প্রদর্শক। রসুল স. এর পদচিহ্ন ধরে সে নিয়ে চললো সকলকে। সওর পর্বতের পাদদেশে এসে বললো, এখানে পদচিহ্নগুলো কেমন এলোমেলো। বুঝতে পারছি না এবার ডান দিকে যেতে হবে, না বাম দিকে। এ কথা বলে পাহাড়ে আরোহণ করলো সে। অন্যরাও চললো সাথে সাথে। গুহামুখে দাঁড়িয়ে উমাইয়া বিন খলফ বললো, এখানে তো মোহাম্মদের জন্মের আগে থেকেই রয়েছে মাকড়সার জাল। এ কথা বলেই সে প্রস্রাব করলো সেখানে।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো কুরায়েশ দলাধিনায়কেরা। অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। ভাড়া করা লোকও নিযুক্ত করলো। বলে দিলো মোহাম্মদের খোঁজ দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে। শুরু হয়ে গেলো সর্বাত্মক তল্লাশী। শেষে তারা পৌঁছলো সওর পর্বতের ওই নির্দিষ্ট গুহাটির সামনে। আত্মগোপনকারী রসুল স. ও হজরত আবু বকর শুনতে পেলেন তাদের আলাপচারিতার আওয়াজ। হজরত আবু বকর কেঁদে ফেললেন। ভয় ও চিন্তায় হয়ে পড়লেন ভারাক্রান্ত। রসুল স. বললেন, আবু বকর বিষণ্নচিত্ত হয়ো না। আল্লাহ্ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। এ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেন, 'অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়।'

ইবনে আবী হাতেম, আবুশ্ শায়েখ, ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন' অর্থ— হজরত আবু বকরের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন। এখানে আলাইহি (তার উপর) সর্বনামটি হজরত আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, রসুল স.এর চিত্তপ্রশান্তি তো আগে থেকেই ছিলো। তাই তিনি বলতে

পেরেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।' তাঁর এই প্রশান্তিপ্রদায়ক কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন, 'অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর দয়া বর্ষণ করেন, যাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়।' সুতরাং 'আলাইহি' সর্বনামটি এখানে হজরত আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

শেষে বলা হয়েছে, 'এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখোনি।' এখানে 'এমন এক সৈন্য বাহিনী' অর্থ ফেরেশতাবাহিনী। নির্দেশিত ফেরেশতাবাহিনী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টিপথে সৃষ্টি করেছিলো অন্তরায়। ফলে লক্ষ্যস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখতে তারা পায়নি। আর ওই ফেরেশতারাও অদৃশ্য। তাই বলা হয়েছে 'যা তোমরা দেখনি।' আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আসমা বলেছেন, হজরত আবু বকর তখন দেখলেন, এক লোক গুহার দিকে এগিয়ে আসছে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! লোকটি তো আমাদেরকে দেখে ফেললো। রসুল স. বললেন, কক্ষনো নয়। তার চোখের সামনে রয়েছে ফেরেশতাদের পাখার আড়াল। একটু পরে লোকটি রসুল স. ও হজরত আবু বকরের দিকে মুখ করে প্রস্রাব করতে বসলো। রসুল স. বললেন, আবু বকর! লোকটি আমাদেরকে দেখে ফেললেও তেমন কিছুই করতে পারতো না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরেশতারা তখন কাফেরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করেছিলো। তাই তারা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলো।

মুজাহিদ ও কালাবী বলেছেন, এখানকার বক্তব্য বিষয়টি এ রকম— আল্লাহ্-পাক ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসুল স. এর শত্রুদেরকে সওর পর্বতের গুহামুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তারা হেয় ও হতাশ হয়েছিলো। এভাবে বদর যুদ্ধের সময়েও আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে করেছিলেন অপদস্থ ও নিরাশ।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আদী ও ইবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার কবি সাহাবী হজরত হাস্সানকে বললেন, আবু বকর সম্পর্কে তুমি নাকি কি লিখেছো? হজরত হাস্সান বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, শোনাও। হজরত হাস্সান আবৃত্তি করলেন— তিনি ছিলেন সুউচ্চ পর্বতগহ্বরে দু'জনের একজন। শত্রুরা চষে বেড়াচ্ছিলো পাহাড়ে। জনতা জানে যে, আবু বকরই রসুল স. এর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাঁর মতো দৃঢ়তা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। — কবিতাটি শুনে হেসে ফেললেন রসুল স.। পূর্ণরূপে উন্মোচিত হলো তাঁর পবিত্র দন্তরাজি। বললেন, সুন্দর! তুমি ঠিকই লিখেছো।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ও আমার পিতা পর্বতগুহায় অতিবাহিত করেন তিন রাত্রি। আমার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ছিলেন পূর্ণ সতর্ক ও বিচক্ষণ। গোপনে তিনি যোগাযোগ রাখতেন তাঁদের সঙ্গে। দিনের বেলা কুরায়েশদের কথাবার্তা শুনে সেগুলো রাতে পৌঁছাতেন ওই গুহায়।

আবু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, সন্ধ্যায় আহার্যদ্রব্য পৌঁছে দিতেন হজরত আসমা। আর হজরত আবু বকরের ছাগলের রাখাল আমের বিন ফুহায়রা নিয়ে যেতেন দুগ্ধবতী ছাগল। রাতের এক প্রহর অতিবাহিত হলে তিনি পৌঁছতেন সেখানে। ছাগল দোহন করে তাজা দুধ পান করতেন রসুল স. ও হজরত আবু বকর। দুধপান শেষে সন্তর্পণে স্বগৃহে ফিরে আসতেন আমের।

তিনদিন পর সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে কুরায়েশরা। হারিয়ে ফেলে অনুসন্ধানের উৎসাহ। হিজরতের জন্য প্রস্তুতকৃত উট দু'টো হাজির করা হয় তাঁদের নিকটে। তাঁরা উটে আরোহণ করে যাত্রা শুরু করেন। ছাগলের রাখাল আমের পথ চলতে থাকেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন তোফায়েলের গোলাম। আবদুল্লাহ্ বিন তোফায়েল আবার ছিলেন হজরত আয়েশার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। এগিয়ে চললো রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের উট। আসফান অতিক্রম করে সমুদ্রোপকূলের পথ ধরলেন তাঁরা। পাহাড় ও সমুদ্রশোভিত ওই পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন আমের ও আবদুল্লাহ্।

ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বিন আজীব বলেছেন, আমি একবার হজরত আবু বকরকে বললাম, সওর পর্বতের গুহা থেকে কিভাবে যাত্রা শুরু করলেন, সে বিষয়ে কিছু বলুন। তিনি বললেন, রাতে রওয়ানা হয়েছিলাম আমরা। পথ ছিলো জনশূন্য। একটানা পথ চলতে চলতে দ্বিপ্রহরে পৌঁছলাম একটি কংকরময় স্থানে। দাঁড়ালাম একটি বড় পাথরের পাশে। বাহন থেকে নেমে জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানে বিছিয়ে দিলাম আমার চামড়া নির্মিত শয্যাটি। বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমি নজর রাখছি। রসুল স. শয্যায় শরীর এলিয়ে দিলেন। আমি বসে রইলাম। হঠাৎ দেখলাম এক বকরীর রাখাল তার বকরীগুলোকে নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, তুমি কার গোলাম। সে তার মালিকের নাম বললো। আমি চিনতে পারলাম তার মক্কাবাসী মালিককে। পুনরায় বললাম, আমাকে কি তোমার বকরীর দুধ দিতে পারো? সে বললো, পারি। এ কথা বলেই সে ধরে আনলো একটি দুগ্ধবতী ছাগল। ছাগলের বাঁট পরিষ্কার করে দোহন করলো। পাত্র ভর্তি দুধ ঢেলে নিলাম আমার পানির মশকে। ফিরে এসে দেখলাম, রসুল স. গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। ভাবলাম, এ অবস্থায় তাঁকে ডাক দেয়া ঠিক নয়। আমি একটি পাত্রে দুধ ঢালতে শুরু করলাম। ভাবলাম, দুধ ঢালার শব্দে তিনি জেগে উঠলে ভালোই হয়। তাই হলো। তিনি জেগে উঠলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কিছু দুধ পান করুন। রসুল স. দুধ পান করলেন। তারপর বললেন, যাত্রার সময় কি হয়নি? আমি বললাম, হয়েছে। ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। আমরা পুনরায় শুরু করলাম আমাদের সফর।

হজরত সালিত বিন আমর আনসারী থেকে তিবরানী, হাকেম, আবু নাঈম এবং আবু বকর শাফেয়ী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক বিশুদ্ধ আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের সঙ্গে পথপ্রদর্শকরূপে চলছিলেন আমের বিন ফুহায়রা। পথিমধ্যে তাঁরা থামলেন উম্মে মা'বাদের বসতবাটিতে। উম্মে মা'বাদের স্বামী ওমর ছিলো আমেরের পূর্ববর্তী মালিক। উম্মে মা'বাদ রসুল স. কে চিনতেন না। ওমর তাকে বললেন, আমাদের আহারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে কি? উম্মে মা'বাদ বললো, কিছুই তো নেই। আমরা যে বড়ই অভাবগ্রস্ত। ঘরের একদিকে ছিলো একটি ছাগল। সেদিকে দেখিয়ে রসুল স. বললেন, ওই যে একটি বকরী। উম্মে মা'বাদ বললেন, বকরিটি খুবই দুর্বল। তাই ওটি অন্য ছাগলদের সঙ্গে চারণভূমিতে যেতে পারেনি। রসুল স. বললেন, অনুমতি পেলে আমি ছাগলটি দোহন করবো। উম্মে মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ওই মাদি বকরীটি এখনো কোনো পুরুষ ছাগলের সঙ্গে মিলিতই হয়নি। এখন আপনার ইচ্ছা। রসুল স. বিসমিল্লাহ্ বলে ছাগলটি দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। রসুল স. ছাগলটির জন্য দোয়া করলেন। সবাইকে দুধ পান করালেন। নিজে পান করলেন। সকলের শেষে বললেন, যে পান করায় সে পান করবে সকলের শেষে। রসুল স. পুনরায় ছাগলটি দোহন করে পাত্র পূর্ণ দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। ইবনে সা'দ এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারিণী হজরত উম্মে মা'বাদ বলেছেন, ওই বকরীটি আমার কাছে আঠারো হিজরী পর্যন্ত ছিলো। হজরত ওমরের খেলাফতের সময় একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তখনও আমি ওই বকরীটি সকাল-সন্ধ্যা দোহন করে তার দুধ পান করতাম। বকরীটির দুধ কখনো বন্ধ হতো না।

ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যায় ফিরে এলো উম্মে মা'বাদের পুত্র। উম্মে মা'বাদ তার পুত্রকে বললেন, এই কুমারী বকরী ও একটি ছুরি নিয়ে মেহমানদের কাছে যাও। বলো, তাঁরা যেনো এই ছুরি দিয়ে বকরীটি জবাই করে এর গোশত ভক্ষণ করেন। ছেলেটি তাই করলো। রসুল স. বললেন, ছুরিটি নিয়ে যাও এবং দুগ্ধ দোহনের একটি বড় পাত্র নিয়ে এসো। সে বললো, বকরীটি তো কুমারী। এর দুধ হবে কিভাবে? রসুল স. বললেন, তুমি পাত্র নিয়ে এসো। পাত্র আনা হলে রসুল স. বকরীটির স্তনে হাত বুলালেন এবং দুগ্ধ দোহন করতে শুরু করলেন। পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে গেলো অল্পক্ষণের মধ্যে। এই বর্ণনায় আরো রয়েছে, উম্মে মা'বাদের গৃহে আমরা অবস্থান করেছিলাম দুই রাত্রি। তারপর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। উম্মে মা'বাদ আমাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। রসুল স. এর দোয়ার বরকতে উম্মে মা'বাদের বকরীর সংখ্যা অল্প দিনের মধ্যে অনেক হয়ে

গেলো। বকরীগুলো নিয়ে তিনি তখন উপস্থিত হলেন মদীনায়। মদীনায় ছিলেন উম্মে মা'বাদের কন্যা। তিনি হজরত আবু বকরকে দেখিয়ে তাঁর মাকে বললেন, আম্মা। এই সেই ব্যক্তি যিনি আপনার গৃহে মেহমান হয়েছিলেন। উম্মে মা'বাদ বললেন, আপনার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি কে? হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্র রসুল। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমাকে তাঁর নিকটে নিয়ে চলুন। হজরত আবু বকর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তাঁকে পানাহার করালেন এবং বস্ত্র উপহার দিলেন। এরপর মুসলমান হয়ে গেলেন উম্মে মা'বাদ।

হিশাম বিন হাবসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এবং হজরত আবু বকর চলে আসার পর বকরীর পাল নিয়ে গৃহে উপস্থিত হলেন উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ। পাত্র ভর্তি দুধ দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। বললেন, দুধ কোত্থেকে এলো! ঘরে দুগ্ধবতী কোনো বকরী তো ছিলো না। উম্মে মা'বাদ খুলে বললেন পুরো ঘটনা। আবু মা'বাদ বললেন, ওই বরকত পূর্ণ ব্যক্তিটির কিছু বিবরণ দাও। উম্মে মা'বাদ বললেন, তিনি জ্যোতির্ময়, সুন্দর এবং প্রফুল্লচিত্ত। তিনি স্থুলাকার নন। ক্ষুদ্রাকৃতির মস্তকবিশিষ্টও নন। কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত চক্ষু। চোখের পাতা নিবিড়। কণ্ঠস্বর গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের মতো। শ্মশ্রু ঘন, সুবিন্যস্ত। ভ্রূযুগল মিলিত ও অর্ধা চন্দ্রাকৃতির। তিনি স্বল্পভাষী নন। অতিভাষীও নন। তাঁর কণ্ঠ বাহুল্য বর্জিত, সুমিষ্ট, চিত্তরঞ্জক। কথা বললে মনে হয় যেনো নক্ষত্রপুঞ্জ স্খলিত হচ্ছে। অতিদীর্ঘ যেমন তিনি নন, তেমনি নন অতি হ্রস্বও। বরং মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, দৃষ্টি নন্দন। আভিজাত্য ও মর্যাদার প্রতিভূ তিনি। তাঁর সহচর তাঁর একান্ত অনুগত, নম্র। একান্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনি নির্দেশ শ্রবণ করেন এবং যথাযথভাবে তা পালন করেন। দেখে মনে হয় তিনি যেনো আনুগত্যের অতুলনীয় প্রতিভূ। আবু মা'বাদ বললেন, আল্লাহ্র শপথ ইনি নিশ্চয় সেই কুরায়েশ, যার আবির্ভাবের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সবস্থানে। দুর্ভাগ্য আমার যে, এখন পর্যন্ত আমি তাঁর দর্শন পাইনি। আগামীতে যদি সুযোগ পাই তবে আমি নিশ্চয় উপস্থিত হবো তাঁর পবিত্র সংসর্গে।

হজরত আসমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. ও আমার পিতা চলে যাওয়ার পর দল বেঁধে আমাদের বাড়ীতে হাজির হলো কুরায়েশরা। আবু জেহেলও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদের কথা শুনে আমি বাইরে এলাম। আবু জেহেল বললো, তোমার পিতা কোথায়? আমি বললাম, জানি না। আবু জেহেল একটি চড় বসিয়ে দিলো আমার গণ্ডদেশে। খসে পড়লো আমার কানের বালি। তিনদিন পর এলো এক বেদুঈন। সে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলো একটি কবিতা। লোকজন দলবেঁধে তার পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলো। কিন্তু কারো দিকে তার কোনো

ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আপন মনে আউড়িয়ে চললো— আরশের অধীশ্বর উত্তম প্রতিদান প্রদান করেছেন ওই জুটিকে। উম্মে মা'বাদের গৃহে দুই প্রহরের জন্য মেহমান হয়েছিলেন তাঁরা। হেদায়েতের নূরে রওশন করে তুলেছিলেন তাঁদের তাঁবু। তাঁদের মাধ্যমেই আমি পেয়েছি সত্যপথের দিশা। হে জনতা, শোনো, যে মোহাম্মদের সঙ্গী সে-ই সফলকাম। হে বনী কুসাই! শোনো, তিনি হচ্ছেন, অক্ষরের অমুখাপেক্ষী নবী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সাধ্য কারো নেই। বনী কা'বকে অভিনন্দন? পথিমধ্যে দণ্ডায়মান ছিলো এক রমণী। তাঁকে জিজ্ঞেস করো, সে বলতে পারবে ওই বকরী ও দুধের পাত্রটির সংবাদ। বকরীটি ছিলো কুমারী। অথচ তার স্তন থেকে নির্গত হয়েছিলো ফেননিভ দুগ্ধ। মোহাম্মদ বকরীটি ওই রমণীর কাছেই রেখে গিয়েছেন, যেনো দুগ্ধ দোহনকারী সেটিকে পানির উপরে নামায় এবং পানি থেকে ফেরৎ এনে দোহন করে (উম্মে মা'বাদের স্বামী ওই বকরীটির দুগ্ধ দোহন করে, চারণভূমিতে নিয়ে যায়, পান করায় ঝর্ণার পানি, তারপর ফিরিয়ে আনে স্বগৃহে)।

উত্তম সূত্রে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. কে খুঁজতে খুঁজতে কুরায়েশরা উপস্থিত হলো উম্মে মা'বাদের গৃহে। জানতে চাইলো রসুল স. এর সংবাদ। উম্মে মা'বাদ বললেন, কার কথা বলছো তোমরা? সঙ্গীসহ এক অতিথি এসেছিলেন আমার গৃহে। দুগ্ধ দোহন করেছিলেন এক গর্ভবতী ছাগলের। কুরায়েশরা বললো, তাঁকেই তো খুঁজতে বের হয়েছি আমরা।

বায়হাকী বলেছেন, রসুল স. দুর্বল ও কুমারী বকরীটি দেখেছিলেন উম্মে মা'বাদের গৃহকোণে। তখন তাঁর পুত্র ও স্বামী ঘরে ছিলেন না। তাঁরা আসেন রসুল স. এর প্রস্থানের পর। দুগ্ধ দোহনের অলৌকিক ঘটনা শুনে তাঁরা জানতে চান, ওই অলৌকিক ব্যক্তির বিবরণ। উম্মে মা'বাদ তখন খুলে বলেন সবকিছু। আমি বলি, এ সকল কথা কানে পৌঁছেছিলো কুরায়েশদের। তাই তারা খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হয়েছিলো সেখানে।

সুরাকার কাহিনীঃ সুরাকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম এবং ইমাম আহমদ। ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকর থেকে। ঘটনাটি এই— সুরাকা স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশদের এক দূত এসে উপস্থিত হলো আমার নিকটে। বললো, মোহাম্মদ অথবা তার সঙ্গীকে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারলে তুমি পুরস্কার হিসেবে পাবে একশত উট। আমি তখন আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললো, সুরাকা! আমি কয়েকজন লোককে সমুদ্র উপকূলের পথে যেতে দেখেছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সমুদ্রতীরের পথ ধরে আমি যেতে দেখেছি তিনজনকে। মনে হয় ওই দলটিই মোহাম্মদের দল। আমি লোকটিকে ইশারায়

চুপ থাকতে বললাম। সে চুপ করে রইলো। আমি আমার বাড়ীতে এসে পরিচারিকাকে বললাম, আমার ঘোড়াটি নিয়ে বাতন উপত্যকায় চলে যাও। সে নির্দেশ পালন করলো। একটু পরে আমি একটি বল্লম নিম্নমুখী করে সন্তর্পণে বের হয়ে গেলাম বাড়ীর পিছনের পথ ধরে। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখলাম ঘোড়া প্রস্তুত। ত্রস্তে উঠে পড়লাম ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুটতে শুরু করলো। মনে মনে বললাম, ওই দু'জনের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামবো না। ছুটতে ছুটতে এক সময় পেয়ে গেলাম আমার শিকার। কিন্তু তাদের অধিক নিকটে যেতে পারলাম না। ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। আমিও ছিটকে পড়লাম পিঠ থেকে। ভাগ্য পরীক্ষা করলাম তীরাধারের তীর দিয়ে। কিন্তু অনুকূল ফল পেলাম না। ভাগ্য নির্ণায়ক তীর বলে দিলো, আমি সফল হতে পারবো না। কিন্তু এই ফলাফল আমি মেনে নিতে পারলাম না। মনস্থির করলাম, এক শত উট আমাকে পেতেই হবে। আমি ঘোড়ায় উঠে পুনরায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। এবার এতো নিকটে পৌঁছলাম যে, স্পষ্ট শুনতে পেলাম রসুল স. এর কোরআন পাঠের আওয়াজ। কোরআন পাঠে মগ্ন ছিলেন তিনি। তাই আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু হজরত আবু বকরের দৃষ্টি ছিলো তীক্ষ্ণ ও সদাসতর্ক। আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার ঘোড়ার দুই পা দেবে গেলো মাটিতে। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। অতিদ্রুত উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু আমার ঘোড়া তার দেবে যাওয়া পা ওঠাতে পারলো না। পা ওঠাবার চেষ্টা করলে সেখান থেকে নির্গত হতে শুরু করলো ধূলিময় মেঘের মতো ধোঁয়া। আমি পুনরায় ভাগ্য নির্ণায়ক তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আগের মতোই ফল হলো নেতিবাচক। আমার প্রতীতি জন্মালো, তাদের ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই। আর মোহাম্মদ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুল। আল্লাহ্‌পাকই তাঁর হেফাজতকারী। তিনি তাঁর রসুলকে বিজয়ী করবেনই। আমি নিরুপায় হয়ে চিৎকার করে তাদেরকে ডেকে বললাম, দৃষ্টিপাত করুন আমার দিকে। আমার দুরাবস্থার দিকে দয়া করে তাকান। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কথা দিচ্ছি আমি আপনাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেবো না। রসুল স. হজরত আবু বকরকে বললেন, জিজ্ঞেস করো, সে কি চায়? আমি বললাম, আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারলে আপনার সম্প্রদায় একশত উট পুরস্কার দিবে বলে ঘোষণা করেছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে কিছু পথ খরচ এবং কিছু সামগ্রী গ্রহণ করুন। কিন্তু আপনি কথা দিন, সমগ্র আরব যখন আপনার পদতলগত হবে, তখন আপনি আমাকে কষ্ট দিবেন না। এর বেশী আমার চাওয়ার কিছু নেই। রসুল স. বললেন, ঠিক আছে। তুমি কিন্তু আমাদের কথা কাউকে জানিয়ো না। আমি জানালাম, আমাকে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিন। রসুল স. হজরত আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন, লিখে দাও। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন নিরাপত্তা পত্র লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন আমের বিন ফুহায়রাকে। আমের এক টুকরা চামড়ায় লিখে দিলেন নিরাপত্তার অঙ্গীকারনামা।

এরপর রসুল স. অগ্রসর হলেন। মদীনা আর বেশী দূরে নয়। রসুল স. বললেন, আবু বকর! নবীর জন্য অসত্য ভাষণ নিষিদ্ধ। নবীর অনুসারীদের জন্যও। অতএব, সাবধানে মানুষের কথার জবাব দিয়ো। এই নির্দেশনা পেয়ে হজরত আবু বকর মানুষের কথার জবাব দিতে লাগলেন সাবধানে। কেউ যদি বলতো, আপনি কে? তিনি বলতেন, অনিশ্চিত যাত্রী। যদি বলতো, সঙ্গে কে? তিনি জবাব দিতেন, পথপ্রদর্শক।

মদীনার কাছাকাছি হতেই রসুল স. কে স্বাগতম জানালেন আবু বুরায়দা আসলামী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের সত্তর জন লোক। রসুল স. বললেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আবু বুরায়দা। রসুল স. বললেন, আবু বকর! আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে (বুরায়দা অর্থ শীতলতা)। রসুল স. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ গোত্রের লোক তোমরা? আবু বুরায়দা বললেন, আসলাম গোত্রের। রসুল স. হজরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা এখন নিরাপদ। বুরায়দাকে বললেন, বনী আসলাম কোন গোত্রের শাখা? আবু বুরায়দা বললেন, বনী সাহাম গোত্রের। রসুল স. বললেন, তোমার তীরাধার থেকে তীর বের হয়ে পড়েছে। রসুল স. সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করলেন। সকালে আবু বুরায়দা বললেন, আপনার সঙ্গে একটি পতাকা থাকা প্রয়োজন। এই বলে তিনি নিজের পাগড়ী খুলে একটি বল্লমের মাথায় বাঁধলেন এবং পতাকা হিসেবে সেটিকে তুলে ধরলেন উচ্চে।

হাকেম লিখেছেন, এটা সুপ্রসিদ্ধ যে, রসুল স. মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন সোমবার। মদীনায়ও পৌঁছেছিলেন সোমবারে। কেবল মোহাম্মদ বিন মুসা খাওয়ারজামী বলেছেন, রসুল স. হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন জুমআর রাতে। হাফেজ ইবনে হাজার উদ্ভূত সমস্যাটির সমাধান দিয়েছেন এভাবে— রসুল স. জুমআর রাতেই (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) তাঁর গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে সওর পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন ওই রাত, পরদিন রাত (শুক্রবার দিবাগত রাত), তার পরদিনের দিবাগত রাত (শনিবার দিবাগত রাত)। এভাবে তিন রাত অবস্থানের পরের রাতে (সোমবার রাত— অর্থাৎ রবিবার দিবাগত রাতে) রওনা দিয়েছিলেন মদীনার উদ্দেশ্যে। আমি বলি, সম্ভবত কুরায়েশরা জুমআর রাতে পরামর্শ করে রসুল স. কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তাই ওই রাতেই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রসুল স. পৌঁছেছিলেন হজরত আবু বকরের বাড়ীতে। তারপর তাঁর বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে দু'জনে পৌঁছেছিলেন সওর পাহাড়ের গহ্বরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা হেয় করেন, আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শিরিক প্রভাবিত কথা ও পরি-

কল্পনাকে হেয় করেন। করেন অসফলকাম। যেমন রসুল স. এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় কাফেরদের শত প্রচেষ্টাও সফল হতে পারেনি। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বিশেষ সাহায্যকারী ফেরেশতার মাধ্যমে তাদের সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছেন। আর এভাবেই আল্লাহ্র কথা যে সর্বোপরি— তা আল্লাহ্তায়ালা প্রমাণও করেছেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'কালিমাতিল্লাজীনা কাফারু' (সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা) অর্থ— কুরায়েশদের ওই সকল আলোচনা যা তারা উপস্থিত করেছিলো দারুণ নাদওয়ায়। আর কালিমাতিল্লাহ্ (আল্লাহ্র কথা) অর্থ আল্লাহ্পাকের ওই অঙ্গীকার, যা তিনি করেছিলেন তাঁর রসুলের হেফাজতের উদ্দেশ্যে।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু আযীযুন্ হাকীম (এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— কাফেরদেরকে অপদস্থ করা এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার মধ্যে রয়েছে অপার পরাক্রম ও প্রজ্ঞার নিদর্শন। কারণ আল্লাহ্-তায়ালা অতুলনীয় পরাক্রমশালী ও অনন্ত প্রজ্ঞাময়।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪১

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

❒ অভিযানে বাহির হইয়া পড় লঘু রণসম্ভারে হউক অথবা গুরু রণসম্ভারে, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহের পথে তোমাদিগের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে!

'খিফাফান' অর্থ লঘু। আর 'ছিক্বালান্' অর্থ গুরু (ভার)। শব্দ দু'টোকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন— ১. হজরত ইকরামা, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেছেন, 'খিফাফাঁউ ওয়া ছিক্বালান্' (লঘু অথবা গুরু অবস্থায়) কথাটির অর্থ— যুবক অবস্থায় অথবা বৃদ্ধ অবস্থায়। ২. কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— পানাহারে পরিতৃপ্ত অবস্থায় অথবা অভুক্ত অবস্থায়। ৩. আবার কেউ বলেছেন, বিত্তহীন অবস্থায় অথবা বিত্তবান অবস্থায়। ৪. হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন— লঘু রণসম্ভারে অথবা গুরু রণসম্ভারে (হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে)। ৫. আউফি বলেছেন, পদব্রজে অথবা অশ্বারোহী অবস্থায়। ৬. ইবনে জায়েদ বলেছেন, ভূমিহীন অবস্থায় অথবা ভূস্বামী অবস্থায়। ৭. হাকিম বিন উত্বা বলেছেন, কর্মহীন অবস্থায় অথবা কর্মমগ্ন অবস্থায়। ৮. শায়েখ হামাদানী বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় অথবা স্বাস্থ্যবান অবস্থায়। ৯. কোনো

কোনো আলেম বলেছেন, পরিবার পরিজনহীন অবস্থায় অথবা সংসারী অবস্থায়। ১০. ইবনে হুম্মাম বলেছেন, পরিচারক পরিচারিকাহীন অবস্থায় অথবা চাকর বাকরের মালিক অবস্থায়। ১১.আবু সালেহ বলেছেন, অল্প সম্পদের অধিকারী অবস্থায় অথবা অধিক সম্পদের অধিকারী অবস্থায়। কেউ কেউ বলেছেন, 'অভিযানে বের হয়ে পড়ো হাল্‌কাভাবে অথবা ভারীভাবে'— কথাটির অর্থ হবে এখানে, জেহাদের ডাক শোনামাত্র গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হও অথবা নিষ্ক্রান্ত হও যুদ্ধের সাজসজ্জা সমাপনের পর।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের একটি চোখ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু তিনি জেহাদের আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে গেলেন। জনৈক ব্যক্তি বললেন, আপনি তো অসুস্থ এবং অসহায়। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তো লঘু-গুরু সকল অবস্থায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতে বলেছেন। আমার দ্বারা যুদ্ধ যদি নাও হয়, তবে আমি তো যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবো। হিফাজত করতে পারবো তাদের মাল সামান।

আতা খোরাসানীর বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে ওই আয়াতের মাধ্যমে, যেখানে বলা হয়েছে— ওয়ামা কানালমু'মিনুনা লি ইয়াংফিরু কাফফাতান (বিশ্বাসীদের কি হলো, তাদেরতো সম্মিলিতভাবে বের হওয়া উচিত)। সুদ্দী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাদের মনে হতে লাগলো, আয়াতের নির্দেশনাটি অত্যন্ত কঠিন। তাই আল্লাহ্‌পাক আর একটি আয়াতের মাধ্যমে ওই আয়াতটিকে রহিত করে দিলেন। রহিতকারী ওই আয়াতটি হচ্ছে— লাইসা আলাদ্ দুয়াফায়ি ওয়ালা আলাল মারদ্বা (দুর্বল ও অসুস্থদের উপর নয়)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস এবং সুদ্দীর মতে আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়েছে। কিন্তু রহিতকারী (নাসেখ) এবং রহিত (মনসুখ) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সময় ও প্রেক্ষাপটের ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে উল্লেখিত দু'টো আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। তাই এখানে নাসেখ মানসুখের অবকাশ নেই। বরং উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে যারা স্বাস্থ্যগত অথবা সম্পদগত কারণে যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এখানকার নির্দেশটি কেবল ওই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে, যে জেহাদ করতে সমর্থ। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, 'লাইসা আলাদ্ দুয়াফায়ি'— আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতের দু' একদিন পর। সুতরাং আয়াতটি তাবুক যুদ্ধের পরম্পরাভুক্ত। সুতরাং একই পরম্পরাভুক্ত আয়াতগুলো একে অপরের রহিতকারী কিংবা একে অপরের দ্বারা রহিত হতে পারে না। অতএব আলোচ্য

নির্দেশনাটির মর্মার্থ হবে এ রকম— তোমরা জেহাদের আহ্বান শোনামাত্র তোমাদের জীবন ও সম্পদসহ যুদ্ধযাত্রা করো, যদি এ রকম করার ক্ষমতা তোমাদের থাকে। মনে রেখো, জেহাদ বিমুখ হওয়া অপেক্ষা মুজাহিদ হওয়া শ্রেয়। জেহাদে অংশগ্রহণ করলে তোমরা দেখতে পাবে আল্লাহ্পাক কর্তৃক বিজয়দানের শুভসংবাদটি কত সত্য। অতএব তোমরা কালবিলম্ব না করে অভিযানে বের হয়ে পড়ো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সকলকে আর্থিক সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানালেন। সকলের আগে সাড়া দিলেন হজরত আবু বকর। তিনি চার হাজার দিরহাম এনে রসুল স. এর কাছে জমা করলেন। রসুল স. বললেন, আবু বকর! পরিবার পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছো। হজরত আবু বকর বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলকে। হজরত ওমর আনলেন তাঁর সম্পদের অর্ধাংশ। রসুল স. বললেন, ঘরের লোকদের জন্য রেখে এসেছো কতটুকু? হজরত ওমর বললেন, যতটুকু নিয়ে এসেছি। হজরত আব্বাস, হজরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ্ এবং হজরত সা'দ বিন উবাদা দান করলেন বাহন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ দান করলেন দুইশত আউকিয়া সোনা। হজরত আসেম বিন আদী' দান করলেন নব্বই ওসাক খেজুর। হজরত ওসমান বিন আফফান প্রস্তুত করলেন এক তৃতীয়াংশ মুজাহিদকে। আরো অনেক মুজাহিদ তাদের প্রয়োজনের কথা জানালেন। হজরত ওসমান তাঁদের প্রয়োজনও পূর্ণ করে দিলেন। মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, তাবুকের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারেরও বেশী। হজরত ওসমান তন্মধ্যে দশ হাজার যোদ্ধাকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

আবু ওমর তাঁর 'আদ্দুরার' এবং 'আল ইশায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ওসমান তখন দান করেছিলেন নয়শত উট, একশত ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত ওসমান সেনা সজ্জার জন্য তখন এতো বেশী ব্যয় করেছিলেন যে, এরপরে আর কেউ জেহাদের জন্য এতবেশী ব্যয় করতে পারেনি। ইবনে হিশামের এক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যোদ্ধাদের জন্য হজরত ওসমান ব্যয় করেছিলেন দশ হাজার দিরহাম মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, ওই অর্থ তিনি দিয়েছিলেন উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহীদের উট ও ঘোড়ার সাজ সজ্জার জন্য। রসুল স. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন— ইয়া ইলাহী! তুমি ওসমানের প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তাঁর প্রতি প্রসন্ন।

হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা থেকে ইমাম আহমদ, তিরমিজি ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওসমান এক হাজার দিনার নিয়ে রসুল স. এর কোলের উপর রাখলেন। রসুল স. সেগুলোকে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, আজকের পর থেকে ওসমান যে আমলই করুক না কেনো, তার কোনো অনিষ্ট হবে না (তার কোনো আমলের গোনাহ্ হবে না অথবা কোনো গোনাহ্ তাঁর দ্বারা হবেই না)।

হজরত ইবনে উকবা বলেছেন, মুনাফিকরা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তারা মনে করেছিলো, রসুল স. তাবুক থেকে আর ফিরে আসতে পারবেন না। কিন্তু তিনি স. যখন সশরীরে ফিরে এলেন, তখন তারা বিভিন্ন কৈফিয়ত পেশ করতে শুরু করলো। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রসুল স. এর নিকটে মুনাফিকেরা বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলো। রসুল স. তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। ওই মুনাফিকদের সংখ্যা ছিলো আশির অধিক। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪২

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

❒ আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদিগের নিকট যাত্রা পথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিবে 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদিগের সংগে বাহির হইতাম।' উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। উহারা যে মিথ্যাচারী ইহা তো আল্লাহ্ জানেন।

বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যে সকল মুনাফিক তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলো, তাদের কপটতাকে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে— 'আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ হলে তারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হলো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাবুক যদি দূরের পথ না হতো এবং সহজে গণিমত পাবার সম্ভাবনা যদি থাকতো তবে মুনাফিকেরা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে গমন করতো। কিন্তু তাদের নিকট তাবুকের পথ মনে হলো সুদীর্ঘ।

এখানে 'সাকারান ক্বাসেদান্' অর্থ— নাতিদীর্ঘ যাত্রাপথ। আর 'বাউদাত' অর্থ— সুদীর্ঘ যাত্রাপথ। দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ শ্রমসাধ্য। তাই দীর্ঘ যাত্রাপথকে

এখানে বলা হয়েছে বাউদাত। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'বাউদাত' শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মুনাফিকদের অনীহাকে। কারণ দীর্ঘ পথযাত্রার বাসনা তাদের ছিলোই না। তাই পথের দৈর্ঘ তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলো একটি অজুহাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, পারলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বের হতাম।' এ কথার অর্থ— হে আল্লাহর রসুল! মুনাফিকদের ওজরকে গ্রাহ্য করবেন না। আপনি তাবুক থেকে মদীনায় ফিরে এলে দেখবেন মুনাফিকেরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, আমরা ছিলাম অসমর্থ। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই আমরা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যেতাম। এখানে 'সামর্থ্য থাকলে' অর্থ আমাদের শারীরিক সুস্থতা এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম থাকলে। কিন্তু মুনাফিকেরা ছিলো মিথ্যাবাদী। শারীরিক সুস্থতা যেমন তাদের ছিলো, তেমনি ছিলো যুদ্ধ সরঞ্জামও। কিন্তু শ্রমসাধ্য সফর ও গণিমতের অনিশ্চয়তাই তাদেরকে যুদ্ধ বিমুখ করেছিলো। কারণ, তারা ছিলো কপটচারী (মুনাফিক)।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। তারা যে মিথ্যাচারী তা তো আল্লাহ্ জানেন।' রসুল স. এর অনানুগত্য, মিথ্যাচার ও মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণেই মুনাফিকেরা আযাবের উপযুক্ত হয়েছে। এভাবেই তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ করেছে প্রশস্ত। আর আল্লাহ্ তাদের মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে তো জানেনই।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৩, ৪৪, ৪৫

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

❐ আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন! কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে?

❒ যাহারা আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস করে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ সাবধানীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহে ও পরলোকে বিশ্বাস করে না এবং যাহাদিগের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রথমেই বলা হয়েছে— আ'ফাল্লহু আ'নকা (আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন)! এরপর বলা হয়েছে— 'কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেনো তাদেরকে অব্যাহতি দিলে?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আল্লাহ্পাক আপনার উপর নিরতিশয় সদয়। তাই অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকদেরকে অব্যাহতি দানের বিষয়টিকে তিনি ধরেননি। কিন্তু উচিত ছিলো মুনাফিকদের অসার অজুহাতকে পরীক্ষা করা। আপনি সরল মনে তাদের অসার অজুহাতকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা উচিত্ ছিলো যে, তাদের মধ্যে সত্যবাদী কে? মিথ্যাবাদীই বা কে? এ রকম না করে আপনি ঢালাওভাবে তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন কেনো? 'আমরা যুদ্ধে যেতে অসমর্থ'— এ ধরনের শঠতাপূর্ণ অজুহাতকে মেনেই বা নিলেন কেনো?

সুফিয়ান বিন উয়াইনিয়া বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি অসীম মেহেরবাণী ও অনন্য মর্যাদা প্রকাশের জন্যই এখানে ভুলের উল্লেখের পূর্বে এভাবে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের বাক্য সদয় স্মরণমূলক, অভিযোগমূলক নয়। আমি বলি, রসুল স. এর আল্লাহভীতি ছিলো অতুলনীয়। তাই তাঁর ভয় বিহ্বলতা প্রশমনার্থে এখানে প্রথমেই বলে নেয়া হয়েছে 'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।' অনুযোগ উত্থাপিত হয়েছে পরে। এ রকম না করা হলে রসুল স. আল্লাহ্র ভয়ে পৃথিবীর জীবন পরিত্যাগ করতেও পারতেন।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আফাল্লহু আনকা' কথাটি এখানে বলা হয়েছে সৌহার্দ-প্রকাশক সম্ভাষণ হিসাবে। অনুযোগের বিষয়টি এখানে গৌণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে— কেউ তাঁর একান্ত সুহৃদকে বললেন, আল্লাহ্পাক তোমার প্রতি সদয় হোন, তুমি তো দেখা সাক্ষাত করতেও আসো না। কেউ কেউ আবার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমাপ্রবাহ নিরন্তর।

জ্ঞাতব্যঃ কাযী আয়ায তাঁর 'আশশিফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এখানে 'আফা' শব্দটির অর্থ 'ক্ষমা' নয়। কথাটির অর্থ এখানে অব্যাহতি দান। প্রথমেই অব্যাহতি বা দায়মুক্তির ঘোষণা দেয়া হলে ক্ষমার প্রশ্ন আর উঠতেই পারে না। যেমন, রসুল স. বলেছেন, আকাল্লহু লাকুম আন সাদাক্বাতিল খইলি ওয়ার রক্বীব (আল্লাহ্পাক

ঘোড়া ও পরিচারক-পরিচারিকার জাকাত প্রদান করা থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন)। অর্থাৎ— এগুলোর জাকাত ওয়াজিব করেননি। কুশাইরিও এ রকম বলেছেন। কাযী আয়ায আরো লিখেছেন, এখানে 'ক্ষমা করুন' কথাটির অর্থ এ রকমই। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুনাফিকদের অব্যাহতি দেয়া যাবে না— এ রকম কোনো নিষেধাজ্ঞা রসুল স. এর উপরে ছিলো না। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা লংঘন এবং নিষেধাজ্ঞা লংঘনজনিত অপরাধও এখানে অনুপস্থিত। তাই এখানে ভর্ৎসনাজনিত কোনো বক্তব্য নেই। যারা মুনাফিকদের অব্যাহতি দানকে অপরাধ সাব্যস্ত করে আয়াতটিকে ক্রোধপ্রকাশক আয়াত বলেছেন এবং এ কারণে এখানে রসুল স. কে মার্জনা করা হয়েছে মনে করেছেন, তারা ভুল করেছেন। নাফতুইয়া বলেছেন, মুনাফিকদের অজুহাত গ্রহণ করা না করার বিষয়টি ছিলো সম্পূর্ণতঃই রসুল স. এর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্‌পাক তাঁকে যেমন শত্রুর শত্রুতা থেকে হেফাজত করেছেন, তেমনি হেফাজত করেছেন গোনাহ্ থেকে।

'লিমা আজিনতা লাহুম (কেনো অব্যাহতি দিলে)কথাটির অর্থ এখানে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিতে বিলম্ব করলেন না কেনো? ত্বরিৎ অব্যাহতি না দিলেই বিষয়টি আপনার নিকট ধরা পড়তো যে, তারা মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রসুল স. মুনাফিকদের শঠতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে মাইমুন বলেছেন, রসুল স. এর দু'টি কাজ কোনো পূর্ব নির্দেশের লংঘন না হলেও আল্লাহ্‌তায়ালা সমীচীন মনে করেননি। একটি হচ্ছে— মুক্তিপণ গ্রহণের মাধ্যমে বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দান (ইতোপূর্বে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে), আর একটি হচ্ছে এই— আয়াতে উল্লেখিত মুনাফিকদেরকে যুদ্ধগমন থেকে নিষ্কৃতি দান। আর এ দু'টো ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তোষও বর্ণিত হয়েছে প্রিয়জনোচিত সংক্ষোভরূপে— অন্তরঙ্গ অনুযোগের ভিত্তিতে।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা সংগ্রামে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ সাবধানীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, আল্লাহ্ ও কিয়ামতে প্রত্যয়ী, তারা মুনাফিকদের মতো জেহাদ বিমুখ নয়। আল্লাহ্‌র পথে জীবন্ ও সম্পদ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত নয়। জেহাদ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অযথা অজুহাত উপস্থিত করা তাদের স্বভাব নয়। তারা আপনার নির্দেশনার জন্য সদা অপেক্ষমাণ। তারা আপনার কথা শোনামাত্র তা প্রতিপালন করতে সদা সচেষ্ট। কারণ তারা মুত্তাকী (সাবধানী)। আর তাদের মানস ও স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক ভালো করেই জানেন (তিনি তাদেরকে যথাসময়ে যথাপ্রতিদান প্রদান করবেন)।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তারাই, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের চিত্ত

সংশয়যুক্ত। তারাতো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।' এখানেও বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা। এতে করে বুঝা যায়, জেহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ লাভ এবং আখেরাতে পুণ্য প্রাপ্তি। এ রকম উদ্দেশ্য মুনাফিকদের নেই। তাদের চিত্ত দ্বিধাসংশয়বিজড়িত। ওই সংশয়ের কারণে তারা তাদের সুবিধামতো কখনো কখনো মুসলমানদের সঙ্গে জেহাদে গমন করে, আবার কখনো বিরত থাকে। যখন তারা মনে করে অনায়াসে বিজয় লাভ হবে এবং গণিমত লাভ করা যাবে, তখন তারা জেহাদে অংশগ্রহণ করে। আর যখন মনে করে প্রতিপক্ষের আক্রমণে মুসলমানেরা টিকতে পারবে না, জেহাদে গমন করতে গেলে অতিক্রম করতে হবে সুদীর্ঘ পথ, তখন বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করে অব্যাহতি প্রার্থনা করে রসুল স. এর নিকটে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৬

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ○

❒ উহারা বাহির হইতে চাহিলে উহারা নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহারা যাত্রা করে ইহা আল্লাহের মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয় 'যাহারা বসিয়া আছে তাহাদিগের সহিত বসিয়া থাক।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিকেরা যুদ্ধ করতে অনীহ। জেহাদ তাদের মনঃপূত নয়। যদি হতো, তবে তারা পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতো। সংগ্রহ করতো অস্ত্রসস্ত্র ও বাহন। তাদের এমতো মনোভাব আল্লাহ্রও মনঃপূত নয়। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে রেখে দিয়েছেন তাদের কপটতা ও অনীহার সঙ্গে। তাই তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে— যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো। অর্থাৎ তোমরা বসে থাকো অসুস্থ হয়ে কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে অথবা সংসারমগ্ন হয়ে। এ রকমও হতে পারে যে, 'যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো'— এ কথাটি মুনাফিকদের। এখানে তাদের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ তারা একে অপরকে বলেছিলো, তোমরা যে যার মতো ঘরে বসে থাকো (যারা জেহাদ ত্যাগ করে ঘরে বসে আছে, তাদের মতো তোমরাও ঘরে বসে থাকো)। রসুল স. মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে এ রকম বলেছিলেন, এ কথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ রসুল স. অজুহাত উত্থাপনকারী মুনাফিকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে বসে থাকো।

তাবুক অভিযানঃ নবম হিজরীর রজব মাস। রসুল স. মদীনার বাইরে সানিয়াতুল বিদায় সেনা সমাবেশ ঘটালেন। সেনা সংখ্যা দাঁড়ালো তিরিশ সহস্রাধিক। এ রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ বিন ইসহাক, মোহাম্মদ বিন আমর এবং ইবনে সা'দ। হাকেম তাঁর 'আল ইকলিল' গ্রন্থে হজরত মুয়াজ থেকেও এ রকম উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি আরো লিখেছেন, আবু জারআ রাজী অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাবুক অভিযাত্রীদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজার। অর্থাৎ অগ্রগামী বাহিনী ও অনুগামী বাহিনী মিলে সর্বমোট সৈন্য ছিলো সত্তর হাজার। উপরে বর্ণিত মতপার্থক্য দূর করার জন্য হাকেম বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন। বলেছেন, দশ হাজার ছিলো কেবল অশ্বারোহী।

আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে সা'দের বর্ণনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন বৃহস্পতিবার। যাত্রা শুরুর দিন হিসেবে বৃহস্পতিবারই ছিলো তাঁর পছন্দ।

হিশামের অভিমতানুসারে রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন, হজরত মোহাম্মদ বিন মুসলিমা আনসারীকে। জারওয়ার্দীর বর্ণনায় এসেছে, তখন রসুল স. এর স্থলবর্তী নির্ধারিত হয়েছিলেন, হজরত সাবায় বিন ইরফাজা। মোহাম্মদ বিন ওমর এবং ইবনে সা'দ লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, তাবুক অভিযানকালে মদীনায় রসুল স. এর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম। আমাদের মতে, মোহাম্মদ বিন মুসলিমা ছিলেন তখন মদীনায় রসুল স. এর স্থলবর্তী। তিনি তাবুক ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে রসুল স. থেকে পৃথক ছিলেন না।

আবু ওমর বলেছেন, রসুল স. তাবুক যাত্রার সময় মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন হজরত আলীকে। ইবনে দাহিয়াও এ রকম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটাই সঠিক। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে যথাসূত্রে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, যখন রসুল স. তাবুক যাত্রা করলেন, তখন মদীনায় তাঁর স্থলবর্তী হিসেবে রেখে গেলেন হজরত আলী ইবনে আবু তালেবকে। মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে আহলে বাইতের দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন। মুনাফিকেরা এই নিয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিলো। বলাবলি করতে লাগলো, রসুল স. আলীর প্রতি অপ্রসন্ন, তাই তাঁকে বোঝা মনে করে পরিত্যাগ করেছেন। হজরত আলী এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং পথিমধ্যে মিলিত হলেন রসুল স. এর সঙ্গে। রসুল স. তখন অবস্থান করছিলেন জরফ নামক স্থানে। হজরত আলী রসুল স.কে সব কথা খুলে বললেন। রসুল স. বললেন, ওরা মিথ্যাবাদী। আমি তোমাকে রেখে এসেছিলাম আমার ও তোমার গৃহের তত্ত্বা-

বধায়করূপে। হে আলী! তুমি কি এ কথা জেনে প্রসন্ন নও যে, মুসার সঙ্গে হারুনের যে সম্পর্ক ছিলো, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরূপ। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী নেই (পার্থক্য কেবল এতটুকুই)। এ কথা শুনে প্রফুল্লচিত্ত হজরত আলী ফিরে এলেন মদীনায়। বোখারী, মুসলিম।

মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার কিছু অনুরক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেনাসমাবেশস্থল পর্যন্ত গিয়েছিলো। সেখান থেকে রসুল স. যখন তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে এবং বলতে থাকে, এই অসহ্য গরমের মধ্যে সুদীর্ঘ পথের অভিযাত্রী হয়েছেন রসুল স.। এতো দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তিনি বনী আসফার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান। কিন্তু সে ক্ষমতা কি তাঁর আছে? বনী আল আসফারের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি একটা তামাশা নাকি? আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চিত যে, মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বন্দী করা হবে। আর আমি তা দেখতেও পাবো। এসকল কথা রসুল স. এর কানে পৌঁছলো। তিনি স. বুঝলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ফেত্না সৃষ্টি করে চলেছে। আল্লাহ্পাক তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ○

❒ উহারা তোমাদিগের সহিত বাহির হইলে তোমাদিগের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদিগের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদিগের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদিগের মধ্যে উহাদিগের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

❒ পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার কর্ম পণ্ড করিবার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহের আদেশ ব্যক্ত হইল।

প্রথমে বলা হয়েছে — 'তারা তোমাদের সঙ্গে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করতো।' বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করার কথা এখানে বুঝানো হয়েছে 'ইল্লা খাবালা' কথাটির মাধ্যমে। 'খাবালা' অর্থ বিভ্রান্তি। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিকেরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হতো না। মুনাফিকেরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতোই। অপপ্রচার করতো, বিভিন্ন কথা বলে মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্টি করতো শত্রুভীতি। গোপনে শত্রুকে সাহায্য করতো, প্রতারণা করতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের মধ্যে ফেত্না সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করতো।' এখানে 'আউদ্বাউ' অর্থ ছুটাছুটি করা। যেমন— 'ওয়াদ্বাআল বাইরু ওয়াদ্বাআন' অর্থ— উটের দ্রুত ধাবমানতা। 'খিলাল' অর্থ এখানে— তোমাদের মধ্যে। এভাবে আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মুনাফিকেরা দ্রুত সৃষ্টি করতো বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা। শুরু করতো উদ্দীপনাবিরোধী কথাবার্তা। মুসলমানদেরকে সাহায্য তো করতোই না, বরং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে তাদেরকে ফেলে দিতো বেকায়দায়। মতপার্থক্য সৃষ্টি করতো মুসলমানদের মধ্যে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কথাটির অর্থ এখানে — মুনাফিকেরা এমন অপকর্ম ঘটাতো যাতে করে সৃষ্টি হতো ফেত্না। মুজাহিদগণের মধ্যে সৃষ্টি করতো অনৈক্য, শত্রুভীতি ইত্যাদি। কাতাদাও এ রকম বলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের মধ্যে তাদের কথা শুনবার লোক আছে।' এ কথার অর্থ — হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যেও রয়েছে কিছু দুর্বলচিত্ত ও অজ্ঞ। তারা মুনাফিকদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করতো। ফলে ফেত্না ছড়িয়ে পড়তো চরম আকারে।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— ওই সকল মুনাফিক নিঃসন্দেহে সীমালংঘনকারী (জালেম)। আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোভাবে জানেন (তিনি তাদেরকে যথাসময়ে যথাশাস্তি প্রদান করবেন)।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'পূর্বেও তারা ফেত্না সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো এবং তারা তোমার কর্ম পণ্ড করবার জন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছিলো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! স্মরণ করুন, ইতোপূর্বে উহুদ যুদ্ধের সময়েও মুনাফিকেরা এ রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার দলবল সহ ফিরে গিয়েছিলো। এভাবে তারা আপনার মহান কর্মকাণ্ড জেহাদকে পণ্ড করে দিতে চেয়েছিলো।

শেষে বলা হয়েছে — 'যতক্ষণ না তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য এসেছিলো এবং ব্যক্ত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র আদেশ।' এখানে 'আল হাক্ব' কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র সাহায্য। আর 'জাহারা আমরুল্লহি' অর্থ— আল্লাহ্‌র আদেশ বা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিজয়। এভাবে বাক্যটির মর্মার্থ দাঁড়াবে — হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এসেছিলো বলেই আপনি সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন। এই সাহায্য ও বিজয় মুনাফিকদের অভিপ্রায়বিরোধী। কিন্তু তাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ হলেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর সত্যধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করেন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৪৯, ৫০

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝ اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ۝

❒ এবং উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে 'আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিত্‌নায় ফেলিও না।' সাবধান! উহারাই ফিত্‌নাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

❒ তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে 'আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদিগের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম' এবং উহারা উৎফুল্লচিত্তে সরিয়া পড়ে।

মুনাফিক জদ বিন কায়েস সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফেত্‌নায় ফেলো না।' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মুনজির, তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া, আবু নাঈম এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্‌ থেকে ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও আপন মাশায়েখ সূত্রে মোহাম্মদ বিন ইসহাক, মোহাম্মদ বিন ওমর ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, জদ বিন কায়েস তার দশ জনেরও কম সঙ্গী নিয়ে মসজিদে অবস্থানরত রসুল স. এর সান্নিধ্যে গমন করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে অব্যাহতি দিন। আমার কিছু ক্ষেত খামার রয়েছে। সেগুলোর দেখাশুনা খুবই জরুরী। তাই যুদ্ধ-গমন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রসুল স. বললেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। গণিমত হিসেবে বনী আল আসফার (রোমানদের) কোনো রমণীও তো পেয়ে যেতে

পারো। জদ বললো, আমাকে দয়া করে দায়িত্বমুক্ত করুন। বিপদে নিক্ষেপ করবেন না। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ভালোভাবেই জানে যে, আমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক রমণীপ্রেমিক নয়। আমার ভয় হয়, রোমান রমণী দেখলে আমি হয়তো নিজেকে সংবরণ করতে পারবো না। রসুল স. তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, অনুমতি দেয়া হলো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে এই কথাগুলো— জদ বিন কায়েসের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ছিলেন খাঁটি ইমানদার। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই। তিনি তাঁর পিতার ছলচাতুরির কথা জানতে পেরে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি রসুলুল্লাহ্র নির্দেশ পালনে বিরত রয়েছেন কেনো? আল্লাহ্র শপথ! বনী সালমার মধ্যে আপনিই অধিক সম্পদের অধিকারী। অথচ আপনি জেহাদে যাচ্ছেন না। কোনো মুজাহিদের জন্য বাহনের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছেন না। জদ বললো, বৎস! দেখছো তো আবহাওয়া কেমন তপ্ত। এই গরমে কি যুদ্ধ করা যায়? আমি বরং বাড়িতেই থাকি। তা ছাড়া রোমানদের সম্পর্কে আমি নিঃশঙ্কও নই। ওই দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কি সহজ কথা! তার পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার কথা তো কপটতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় রসুল স. এর প্রতি আপনার সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হবে। ওই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা প্রকাশ করে দিবেন আপনার কপটতাকে। এ কথা শুনে জদ রেগে গেলো। রণনিশান উঠিয়ে ছুঁড়ে মারলো পুত্রের মুখের উপর। হজরত আবদুল্লাহ্ নীরবে প্রস্থান করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

তিবরানী, ইবনে মারদুবিয়া এবং আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জদ বিন কায়েসকে বললেন, রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? জদ বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! নারীদের প্রতি আমি খুবই দুর্বল। রোমান নারী দেখলে আমি ফেত্নার মধ্যে পড়ে যাবো। সুতরাং আপনি আমাকে এখানেই থাকতে দিন। দয়া করে আমাকে ফেত্নায় নিক্ষেপ করবেন না। তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. জদ বিন কায়েসকে বললেন, হে আবু ওয়াহাব! রোম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমার মতামত কি? যুদ্ধে গেলে তুমিও পেয়ে যেতে পারো বাঁদী অথবা গোলাম। জদ বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে, রমণী দর্শনে আমি বিমোহিত হয়ে পড়ি। ভাবছি, রোমান রমণীকে দেখলে আমিতো নিজেকে সামলাতে পারবো না। অতএব আমাকে যুদ্ধযাত্রা থেকে অব্যাহতি দিন। অযথা আমাকে রমণীদের ফেত্নায় ফেলবেন না। আমি বরং আপনাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করবো। ভিন্নসূত্রে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুদ্ধযাত্রা করো। গণিমত হিসেবে পাবে রোমান নারী। এ ঘোষণা শুনে কোনো কোনো মুনাফিক বলতে শুরু করলো, দেখো তোমাদেরকে তো নারীর লোভ দেখানো হচ্ছে। তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এ কথা জানা গেলো যে, এখানে 'আমাকে ফেত্‌নায় ফেলো না' কথাটির অর্থ হবে এ রকম — আমাকে রমণীর প্রলোভন দেখিয়ো না। রোমান সুন্দরীদের দেখলে আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো না। শেষে ফেত্‌নায় পড়ে গোনাহ্ করে ফেলবো এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— আমার সম্পদ ও বিবি বাচ্চাদের ক্ষতি হবে। আমি যুদ্ধে গেলে তাদের দেখাশুনার কেউ থাকবে না। ফলে তারা কষ্ট পাবে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুনাফিক জদ বিন কায়েসের কথার অর্থ হবে এ রকম— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে স্বগৃহে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করুন। নতুবা আপনার নির্দেশ পালন না করার কারণে আমি গোনাহ্‌গার হবো। ফেত্‌নায় নিপতিত হবো।

এরপর বলা হয়েছে— 'সাবধান! তারাই ফেত্‌নায় পড়ে আছে।' এ কথার অর্থ— যুদ্ধ গমন না করাই তো ফেত্‌না। যুদ্ধ বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এভাবে নিজেকে মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত করা ফেত্‌না নয়তো কি? সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান হোন।

শেষে বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বেষ্টন করেই রয়েছে।' এ কথার অর্থ— এ সকল কপট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জাহান্নাম তো নির্ধারিত রয়েছেই। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, এ ধরনের মুনাফিকেরা জাহান্নামে প্রবেশের কারণসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, তারা জাহান্নাম দ্বারাই পরিবেষ্টিত।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটলে তারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়ে।' এখানে 'ইনতুসিবকা হাসানাতুন তাসুহুম' কথাটির অর্থ— তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয়।' এখানে হাসানাতুন অর্থ— বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। 'ওয়া ইনতুসিবকা মুসীবাতুন' অর্থ — এবং তোমার বিপর্যয় ঘটলে। এখানে 'মুসীবাতুন' অর্থ পরাজয় অথবা কঠিন মুসীবত— উহুদ যুদ্ধে যেমনটি ঘটেছিলো। উহুদ যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলো। যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পর্যুদস্ত দেখে খুশী হয়েছিলো খুব। নিজেদের দূরদর্শীতার প্রশংসা

করে বলেছিলো, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। এ কথা বলে উৎফুল্লচিত্তে সরে পড়েছিলো তারা। আলোচ্য আয়াতে এ কথাগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

❒ বল, 'আমাদিগের জন্য আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদিগের অন্য কিছু হইবে না; তিনি আমাদিগের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহের উপরই বিশ্বাসীদিগের নির্ভর করা উচিত।'

❒ বল, 'তোমরা আমাদিগের দুইটি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করিতেছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদিগের হস্ত দ্বারা, অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❒ বল, 'তোমাদিগের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক তোমাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথমটিতে বলা হয়েছে— কুল লাঁই ইয়ুসীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লহু লানা (বলো, আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছুই হবে না)। এ কথার অর্থ — হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদেরকে বলে দিন, যুদ্ধে বিজয় অথবা শাহাদাত, যা কিছুই আমাদের অদৃষ্টলিপি হিসেবে আল্লাহ্পাক লওহে মাহ্ফুজে লিখে রাখুন না কেনো, তা ছাড়া অন্য কিছুই ঘটবে না। আরবী ভাষায় 'লাম' কল্যাণের জন্য এবং 'আলা' অকল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লানা।' 'আলাইনা' অর্থাৎ 'লানা আও আলাইনা' বলা হয়নি। তাই আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হবে এ রকম—

আমাদের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ, যা কিছুই আল্লাহ্পাক আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখুন না কেনো, তা ছাড়া অন্য কিছুই হবে না। আর কল্যাণ ও অকল্যাণ (বিজয় ও শাহাদাত) — সবকিছুই তো আমাদের জন্য কল্যাণকর।

হজরত সুহাইব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের অবস্থা বিস্ময়কর। তাদের প্রতিটি বিষয় উত্তম। সবকিছু কল্যাণকর হওয়া বিশ্বাসীদেরই বৈশিষ্ট্য। সুখের সময় তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাই সুখ তাদের জন্য কল্যাণকর। আবার দুঃখের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে। তাই দুঃখও তাদের জন্য কল্যাণকর। আহমদ, মুসলিম। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বায়হাকীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— হুয়া মাওলানা (তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত কর্মবিধায়ক। সুতরাং বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি কোনো অকল্যাণ নির্ধারণ করতেই পারেন না।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়া আ'লাল্লহি ফাল ইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনুন (এবং আল্লাহ্র উপরই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত)। এখানে 'আলাল্লহি' (আল্লাহ্র উপর) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্য ক্রিয়াটি এখানে উল্লেখিত ক্রিয়াকে (নির্ভর করা) অধিকতর গুরুত্ববহ করেছে। আর 'ফালইয়াতাওয়াক্কালি' কথাটির 'ফা' এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপর নির্ভর করা ইমানদারদের জন্য অনুচিত। কেননা আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত কর্মবিধায়ক এবং সকল বিষয়ে তিনি ক্ষমতাবান।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে বলুন, হে মুনাফিকেরা! তোমরা চাও দু'টি কল্যাণের (বিজয় ও শাহাদাতের) একটি আমাদের ক্ষেত্রে ঘটুক। অর্থাৎ তোমরা চাও যে আমরা শহীদ হই। কিন্তু তোমরা এ কথা জানো না যে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মতো আল্লাহ্র পথে জীবনপাত করাও আমাদের নিকটে সমান প্রিয়। শাহদাতও আমাদের জন্য কল্যাণ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ইমান রেখে এবং রসুল স. কে সত্য জেনে আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় (পার্থিব কোনো অর্জন যদি উদ্দেশ্য না হয়), তার সঙ্গে আল্লাহ্পাক এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমি হয় তোমাকে সওয়াব ও গণিমতসহ ফিরিয়ে আনবো অথবা (শহীদ করে) প্রবেশ করাবো জান্নাতে। বোখারী, মুসলিম। এ কথার অর্থ— আমি মুজাহিদদেরকে যে কোনো

একটি নেয়ামত দান করবোই। বিজয় অথবা জান্নাত। কথাটির অর্থ এ রকম নয় যে, যুদ্ধ বিজয়ীরা জান্নাতে গমন করবেন না। প্রকৃত অর্থ এই যে, শহীদরা জান্নাত লাভ করবেন সরাসরি। আর যুদ্ধবিজয়ীরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন পরে— পৃথিবীর জীবন পরিসমাপ্তির পর।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতের মাধ্যমে, অতএব তোমরা প্রতিক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে মুনাফিকেরা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে ভয়াবহ আঘাতে নিপতিত করবেন, যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হও। অথবা পৃথিবীতেই আমাদের হস্তধৃত অস্ত্রের মাধ্যমে তোমাদের উপর নেমে আসবে আযাব এবং হয়ে যাবে চির অগ্নিবাসী, যদি আমরা বিজয়ী হই। এই নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ সকল প্রকার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য এই নির্দেশনাটি প্রযোজ্য। যদি নির্দেশনাটি কেবল মুনাফিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তবে অর্থ দাঁড়াবে এ রকম— হে মুনাফিকেরা! তোমাদের অন্তরের অবিশ্বাস ও কপটতা সংগুপ্ত থাকলেও তোমরা মৃত্যুবরণ করবে অবিশ্বাসের সঙ্গে। বিগত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মতো দুনিয়াতেও তোমাদের উপরে নেমে আসবে আল্লাহ্র আযাব। আর যদি তোমরা তোমাদের অন্তরের সংগুপ্ত অবিশ্বাসকে প্রকাশ করে দাও, তবুও তোমাদের মৃত্যু হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে। মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। এভাবে প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ শাস্তি তোমাদের জন্য অবধারিত।

হাসান বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ হবে এ রকম— হে কপটচারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী! শয়তান তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছে তোমরা সেই অঙ্গীকারের প্রতীক্ষা করো। আর আমাদের সঙ্গে ধর্মের পরিপূর্ণ বিজয়ের যে অঙ্গীকার আল্লাহ্তায়ালা করেছেন, আমরা প্রতীক্ষা করি সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে বলা হয়েছে — 'বলো, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক, তোমাদের নিকট থেকে গৃহীত হবে না।' এখানে 'ত্বাওআন্' অর্থ ওই অর্থ সাহায্য, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে আবশ্যিক নয়। আর 'কারহান' অর্থ ওই অর্থ সাহায্য, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে প্রদান করা আবশ্যিক। এ রকম আবশ্যিক অর্থ সাহায্য মুনাফিকদের জন্য বিস্বাদপূর্ণ। তাই এ রকম অর্থ সাহায্যকে এখানে অনিচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য বলা হয়েছে। 'আনফিক' কথাটিকে এখানে আদেশসূচক বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এখানে বক্তব্য বিষয়টি দাঁড়াবে এ রকম—

মুনাফিকদের ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অর্থ সাহায্য, কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য বাক্যটি মুনাফিক জদ বিন কায়েসের একটি কথার প্রত্যুত্তর। সে বলেছিলো, আমি আর্থিক সাহায্য করতে পারি। দু'টি বিষয় নিহিত রয়েছে আলোচ্য বাক্যে— ১. রসুল স. এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তরা জ্ঞাতসারে মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে না। ২. আল্লাহ্ মুনাফিকদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করবেন না। দানের সওয়াবও দিবেন না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' এ কথার অর্থ, হে মুনাফিকেরা! তোমরা মুসলমান সম্প্রদায়ভূত নও। তোমরা তো একটি ভিন্ন সম্প্রদায়। সুতরাং তোমাদের সম্পদ মুসলমানদের নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তী আয়াতে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৫৪

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ○

❑ উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে বলিয়াই উহাদিগের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে।

মুনাফিকদের সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ না করার তিনটি কারণ উল্লেখিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কারণ তিনটি হচ্ছে— ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতি। ২. নামাজে শৈথিল্য। ৩. দানে আন্তরিকতাহীনতা। প্রকাশ্যে দৃষ্ট না হলেও মুনাফিকদের অন্তর অবিশ্বাস ও কপটতায় পরিপূর্ণ। তাই তাদের সকল আমল প্রদর্শনপ্রবণ। বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন। তাই তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি সমর্পিত নয়। এই সমর্পণহীনতার প্রকাশ রয়েছে তাদের নামাজে ও দানে। তারা নামাজে দাঁড়ায় শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতার সঙ্গে এবং অর্থ সাহায্য করে অনিচ্ছাকৃতভাবে — আনন্দহীন অন্তরে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকেরা অর্থ সাহায্য করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। তাই তাদের সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ। কিন্তু পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক' — এতে করে বুঝা যায় মুনাফিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবেও অর্থ সাহায্য করতে চায়, যদিও তাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার সাহায্যই গৃহীতব্য নয়।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ
وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ۝ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ
اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ
فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ۝ وَلَوْ
اَنَّهُمْ رَضُوْا مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝

❒ সুতরাং উহাদিগের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় উহাদিগের আত্মা দেহ ত্যাগ করিবে।

❒ উহারা আল্লাহের নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদিগেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহে, বস্তুতঃ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় করিয়া থাকে।

❒ উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরি-গুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পাইলে উহাতে পলায়ন করিবে ক্ষিপ্র গতিতে।

❒ উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদাকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয় এবং ইহার কিছু উহাদিগকে না দেওয়া হইলে উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।

❒ ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত 'আল্লাহ্ই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁহার রসূলও; আমরা আল্লাহেরই প্রতি আসক্ত।'

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি যেনো এ রকম মনে না করে বসেন যে, আমি কাফের ও মুনাফিকদেরকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি প্রসন্নচিত্তে। কখনোই নয়। আমি তো এভাবে তাদেরকে পার্থিব বৈভবের ফাঁদে স্থায়ীভাবে বন্দী করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যু পর্যন্ত তারা যেনো অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগ না পায়। পার্থিবতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ইমানবিহীন অবস্থায় পৃথিবী পরিত্যাগ করে। হে আমার প্রিয় রসুল! দেখুন, তারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে যেয়ে এবং সন্তান-সন্ততিদের দুশ্চিন্তায় কতো রকম ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি না থাকলেও তারা পুড়তে থাকে আক্ষেপের আগুনে। উভয় অবস্থায়ই তাদের জন্য আযাব।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শব্দ বিন্যাসের মধ্যে (আরবীতে) কিছু অগ্র-পশ্চাত ঘটেছে। সুতরাং অর্থ বিন্যাস হবে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পার্থিব বৈভব ও বংশবৃদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হবেন না। মনে করবেন না যে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা প্রসন্ন। বৈধাবৈধের তোয়াক্কা না করে তারা উপার্জন ও ব্যয় করে। পুঞ্জীভূত করে রাশি রাশি সম্পদ। পার্থিব জীবনে এটাই তাদের শাস্তি। এই শাস্তিতে নিপতিত থাকা অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করবে।

ওয়া তাজহাক্বা আনফুসুহুম ওয়াহুম কাফিরূন অর্থ—তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে। এখানে 'যাহুক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ ক্লেশকর অতিক্রমণ । অর্থাৎ কাফেরদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে সীমাহীন কষ্ট নিয়ে। মৃত্যুর সময় বৈভবমগ্নতার ভয়াবহ পরিণাম স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে । কিন্তু ভুল সংশোধনের কোনো উপায়ই তারা পাবে না।

আলোচ্য আয়াতে মোতাজিলাদের একটি অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তারা বলে, বান্দার জন্য যা শোভনীয় ও কল্যাণকর আল্লাহ্‌পাক তা দিতে বাধ্য। কিন্তু এখানে কাফেরদেরকে প্রদত্ত পার্থিব বৈভব ও সন্তান-সন্ততি যে কল্যাণকর অনুদান নয়, সে কথাই প্রমাণিত হয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, শাস্তিদানের অভিলাষে কাফের অবস্থায় তাদের মৃত্যু নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে দান করেছেন পার্থিব সফলতা।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বস্তুতঃ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে থাকে।'

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে — 'তারা কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গিরি-গুহা অথবা কোনো প্রবেশস্থল পেলে তাতে পলায়ন করবে ক্ষিপ্র গতিতে।' এখানে 'মালজ্বাআন্' অর্থ আশ্রয়স্থল। 'মাগারাতিন' অর্থ গিরি-গুহা সমূহ। শব্দটি বহুবচনবোধক। এর একবচন হচ্ছে — 'মাগারাত'। শব্দটি এসেছে 'গাওর' থেকে। 'গাওর' অর্থ গোপন স্থান। আতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ— সুড়ঙ্গ অথবা সিঁড়ি।

'মুদ্দাখালান্' অর্থ এমন প্রবেশস্থল যেখানে কষ্ট করে প্রবেশ করতে হয়। 'লাওয়াল্লাও ইলাইহি' অর্থ পলায়ন করবে। 'ইয়াজমাহুন' অর্থ ক্ষিপ্র গতিতে, যেমন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ধাবিত হয় পলাতক অশ্ব। এভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে — হে আমার রসুল! জেনে রাখুন যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে অথবা যুদ্ধরত অবস্থায় মুনাফিকেরা ক্ষিপ্রগতিতে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করবে। খুঁজবে নিরাপদ আশ্রয়, পর্বত গহ্বর অথবা এমন স্থান, যেখানে আত্মগোপন করা যায়। এভাবে তারা আপনার নিকট থেকে পৃথক হবেই হবে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে — 'তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদ্‌কা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে।' মুনাফিকেরা রসুল স. এর গণিমত বণ্টনের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতো। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী, মুসলিম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন— হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিত হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রসুল স. কোনো কোনো নওমুসলিম জননেতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মদীনার এক লোক বলে বসলো, এই বণ্টন আল্লাহ্‌পাকের পরিতুষ্টির অনুকূল নয়। এক্ষেত্রে ইনসাফ করা হয়নি। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমি সাথে সাথে বললাম, আমি অবশ্যই রসুল স. কে এ কথা জানাবো। তাই করলাম আমি। আমার কথা শুনেই রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হলো। তাঁর পবিত্র ত্বক হয়ে উঠলো গাঢ় লাল বর্ণের। তিনি স. বললেন, যদি আল্লাহ্‌র রসুল হয়ে আমি ইনসাফ না করি তবে ইনসাফ করবে কে? রসুল মুসার প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত। তাঁকে তো এর চেয়ে বেশী দুঃখ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে এভাবে দোষারোপ করেছিলো মো'তাব বিন কুশায়ের। সে ছিলো মুনাফিক।

হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে ইবনে ইসহাক এবং হজরত জাবের থেকে বোখারী, মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হাওয়াজেন সম্প্রদায়ের নিকট থেকে অর্জিত গণিমত বণ্টন করছিলেন। তখন এক লোক রসুল স. এর মুখোমুখি দাঁড়ালো। তিনি স. বললেন, কি বলতে চাও? সে বললো, ইনসাফ করুন। আমি মনে করি আপনার বণ্টন ন্যায়ানুগ নয়। হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, ওই লোকটি ছিলো তামীম গোত্রের।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, লোকটি বলেছিলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইনসাফের ভিত্তিতে বণ্টন করুন। তার কথা শুনে রসুল স. কুপিত হন এবং বলেন, আমি ইনসাফ না করলে ইনসাফ করবে কে? ন্যায়বিচার না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমিই। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বলেছিলেন, ন্যায়পরায়ণতা যদি আমার নিকটে না থাকে তবে কার নিকটে থাকবে? হজরত ওমর নিবেদন

করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র আশ্রয় যাঞ্চা করি। একে উপেক্ষা করো। এভাবে একে হত্যা করলে মানুষ বলবে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করি। তবে ভালো করে চিনে রাখো এদেরকে। নামাজ রোজার পূর্ণ পাবন্দ হবে এরা। তাদের আমল দেখলে নিজেদের আমল তুচ্ছ মনে হবে তোমাদের কাছে। এরা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু কোরআন এদের কণ্ঠনালী থেকে নিচে নামবে না। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো এরা বেরিয়ে যাবে ধর্ম থেকে। তীব্রগতিসম্পন্ন তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে তার শরীরে ক্ষত চিহ্ন না রেখেই পার হয়ে যায়, তেমনি তীব্র হবে এদের পতন। অথচ তার বাহ্যিক কোনো আলামত প্রকাশ পাবে না। তাদের মধ্যে থাকবে এক অতি কুৎসিত লোক। তার করতল হবে রমণীদের স্তনের মতো অথবা মাংশপিণ্ডের মতো পুরুষ্ট। ওই লোক দাঁড়াবে মুসলমানদের প্রতিপক্ষে। মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি এ হাদিস স্বকর্ণে শুনেছি। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত আলী তাঁর খেলাফতকালে নাহ্রোয়ান নামক স্থানে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম ওই যুদ্ধক্ষেত্রে। ব্যাপকভাবে শত্রু নিধনের পর আমরা ওই লোকটির মৃতদেহ অনুসন্ধান করতে থাকি। খুঁজতে খুঁজতে একস্থানে দেখি তার মরদেহ। দেখতে পাই রসুল স. কর্তৃক বর্ণিত চিহ্নগুলো সবই রয়েছে ওই মরদেহটির মধ্যে।

বাগবী লিখেছেন, ওই লোকটি ছিলো তামীম গোত্রের। তার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। এই অভিমতটিই সুদৃঢ়। তার নাম ছিলো খিরাকাওস বিন জুহাইর। খারেজীদেরকে সংঘবদ্ধ করেছিলো সে-ই। কিন্তু আয়াতের শানে নুজুল (অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিত) উপরে বর্ণিত অভিমতটিকে সমর্থন করে না। কেননা আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে সদ্কা বণ্টনের কথা। গণিমত বণ্টনের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, জিলখুওয়াইসিরা তামিমী এবং মো'তাব বিন কুশায়ের ইনসাফের কথা তুলেছিলো হুনায়েন যুদ্ধে গণিমত বণ্টনের সময়। সুতরাং এটা মানতে হবে যে, এই আয়াতে উল্লেখিত সদ্কা বণ্টনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তদুপরি আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের সময়— যা সংঘটিত হয়েছিলো হুনায়েন যুদ্ধের অনেক পরে। আমি বলি, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো, তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য রসুল স. তখন সকলকে সদ্কা (দান) করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ওই সদ্কা বণ্টনের সময় কতিপয় মুনাফিক তাঁর বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো।

কালাবী বলেছেন, আবুল খাওয়াস নামক এক মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। সে বলেছিলো, ন্যায়ানুগতার সঙ্গে বণ্টন করা হচ্ছে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'অতঃপর তার কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং এর কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।' এ কথার অর্থ— ওই সকল মুনাফিককে কিছু দিলে খুশী হয়, না দিলে হয় বেজার। অথচ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি প্রসন্ন থাকার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। পরের আয়াতে (৫৯) সে কথাই বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে — 'ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরিতুষ্ট হতো এবং বলতো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ্ আমাদেরকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসুলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত।' এর মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের দানে পরিতুষ্ট থাকাই বিশ্বাসীদের কর্তব্য। আল্লাহ্র রসুল কখনো আল্লাহ্র নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছু করেন না। সুতরাং হে বিশ্বাসীরা! জেনে রাখো, রসুল স. এর সিদ্ধান্তই আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্ কখনো ন্যায়পরায়ণতাবিরোধী কিছু করেন না। তাঁর রসুলও নয়। সুতরাং তোমরা বলো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারীদের প্রতি বড়ই করুণাপরবশ। আল্লাহ্র রসুলও তাঁর অনু-সারীদের প্রতি মহান অনুগ্রহকারী। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে নিশ্চয়ই অনুগৃহীত করবেন। আর আমরা কেবল অনুরক্ত আল্লাহ্র প্রতি।

পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে সদ্কা বণ্টনের নিয়মাবলী। সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী বর্ণনার পর সদ্কা গ্রহণের জন্য যারা লালায়িত হয়েছিলো তারা স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে এ কথাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, রসুল স. এর বণ্টনপদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ সঠিক ও ন্যায়ানুগ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

❐ সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদিগের জন্য যাহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদিগের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদিগের, আল্লাহের পথে সংগ্রামকারী ও পর্যটকদিগের জন্য। ইহা আল্লাহের বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

বায়যাবী লিখেছেন, এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে জাকাত বণ্টনের নিয়মাবলী— যা গণিমত বণ্টনের নিয়মাবলী থেকে পৃথক।

আমি বলি, এই আয়াতে বলা হয়েছে, কেবল নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তরাই পাবে সদ্‌কা বা জাকাত। তারা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হতে পারে আবার কিছু সম্পদের অধিকারীও হতে পারে। তবে এতো পরিমাণ সম্পদ তাদের নিকট থাকা যাবে না যাতে করে তাদেরকে বিত্তবান বলা যায়। কাজেই এখানে ফকির (নিঃস্ব) এবং মিসকিন (অভাবগ্রস্ত) সম্পর্কিত নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অধিকাংশ হানাফী মতাবলম্বীদের অভিমত এই যে, ওই সকল লোক ফকির, যাদের নিকট নেসাবে জাকাত (জাকাত ফরজ হয় এই পরিমাণ অর্থ) থাকে না। সম্পদ থাকলেও তা থাকে নেসাব অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাজহাবই অধিকতর গ্রাহ্য। কেননা তিনি ঋণগ্রস্ত মুজাহিদদেরকেও 'ফকির' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত একটি বিবরণে। বিবরণটি এই— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বোখারী, মুসলিম ও সুনান রচয়িতাগণ লিখেছেন, রসুল স. হজরত মুয়াজকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণের সময় বলেছিলেন, মনে রেখো, তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখানে বসবাস করে আহলে কিতাব জনগোষ্ঠী। তুমি প্রথমে তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমার দাওয়াত দিয়ো। যদি তারা এই কলেমাকে গ্রহণ করে তবে তাদেরকে বোলো, আল্লাহ্‌পাক তোমাদের উপর দিবারাত্রি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে বোলো, আল্লাহ্ তোমাদের বিত্তশালীদের উপর ফরজ করেছেন জাকাত। জাকাত গ্রহণ করা হবে তোমাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এবং তা বণ্টন করে দেয়া হবে তোমাদেরই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে। সাবধান! জাকাত হিসেবে পূর্ণ বয়স্ক পশু গ্রহণ কোরো না। অত্যাচারীদের অপপ্রার্থনা থেকে আত্মরক্ষা কোরো। মনে রেখো, মজলুমের বদ্‌দোয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে যায়। এক্ষেত্রে কোনো বিলম্ব বা বাধা নেই।

উপরের হাদিস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহীতাদেরকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। জিম্মী অথবা স্বাধীন কোনো অমুসলমানকেই জাকাত দেয়া যাবে না। অবশ্য জুহুরী এবং ইবনে শুবরামা বলেছেন, জিম্মী কাফেরকে জাকাত দেয়া যায়। কেননা এই আয়াতের ব্যাখ্যাসূত্রে হজরত ওমর বলেছেন, ফুকারা (নিঃস্ব জনগোষ্ঠী) হচ্ছে আহলে কিতাবদের বিকলাঙ্গ ও অকর্মন্যরা। কিন্তু জুহুরী ও ইবনে শুবরামার অভিমত আলেমগণের ঐকমত্য-বিরোধী। তাই তাদের অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না।

একটি সন্দেহঃ ইমাম আবু হানিফা বলে থাকেন হাদিসে আহাদ (একক বর্ণিত হাদিস) কখনো নসের (কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণার) উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে স্পষ্টাক্ষরে 'ফুকারা' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমান কিংবা অমুসলমানের উল্লেখ এখানে নেই। তবুও জাকাত অমুসলমান-দেরকে দেয়া যাবে না এ রকম বলা হলো কেনো?

সন্দেহের অপনোদনঃ ইয়ানহাকুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা কাতালুকুম ফিদ্দ্বীন (আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তাদের সম্পর্কে যারা তোমাদের সঙ্গে জেহাদ করেনি) —এই আয়াতে আলোচ্য আয়াতের পূর্বে ঐকমত্য সূত্রে কাফের-দেরকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে খবরে আহাদের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নির্দিষ্ট করে নেয়া ইমাম আবু হানিফার মতে সিদ্ধ। তাই এখানকার 'আল ফুকারা' অর্থ হবে নিঃস্ব মুসলমান। নিঃস্ব অমুসলমানেরা এর মধ্যে পড়বে না। তবে ফরজ জাকাত ছাড়া অন্য সকল নফল (অতিরিক্ত) দানের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে আলাদা করে দেখা যাবে না। ঐকমত্যাগত অভিমত এই যে, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল অভাবগ্রস্তদেরকে নফল সদ্কা প্রদান করা যাবে। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— লা ইয়ানহাকুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা লাম ইউক্বাতিলুকুম ফিদ্দীন। আবার হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে বলা হয়েছে কেবল জাকাতের কথা। নফল সদ্কার ব্যাপারে তাঁকে কিছু বলা হয়নি। আর 'ইন্নামা ইয়ানহা কুমুল্লহু আ'নিল্লাজীনা কাতালুকুম ফিদ্দ্বীন' এর মধ্যে অমুসলিম রাজ্যের অধিবাসীদের সঙ্গে শিষ্টাচার প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই যুদ্ধবাজ অমুসলিমদেরকেও নফল সদ্কা প্রদান করা যাবে না। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রোজার ফিতরা, কাফফারা, মানত ইত্যাদি ওয়াজিব সদ্কার বিধানকেও ফরজ সদ্কার (জাকাতের) বিধানের অনুরূপ মনে করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, ওয়াজিব সদ্কা জিম্মীদেরকেও দেয়া যাবে। তাঁর নিকট ফরজ সদ্কা ও ওয়াজিব সদ্কার বিধান এক নয়। কারণ ফরজ প্রমাণিত হয় কোরআনের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমে। কিন্তু ওয়াজিবের প্রমাণ স্পষ্ট হলেও অপ্রত্যক্ষ। আবার হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে রয়েছে কেবল ফরজ জাকাতের কথা। কোনো ওয়াজিব সদ্কার কথা সেখানে নেই।

'ফুকারা' শব্দের পরে উল্লেখ করা হয়েছে 'মাসাকীন' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় মিসকীনেরাও ফকিরদের অনুবর্তী বা অন্তর্ভূত। এখানে সাধারণভাবে ফকির কথাটি উল্লেখ করে পরক্ষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মিসকীনদেরকে। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন— হাফিজু আলাস্সালাওয়াতি ওয়াস্সালাতিল উস্তা (নামাজের হেফাজত করো, বিশেষভাবে হেফাজত করো মধ্যবর্তী নামাজের)।

এবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো মিসকীন সম্পর্কে। যারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে দাতাদেরকে বিরক্ত করে না, তারাই মিসকীন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ওই সকল লোক মিসকীন নয়, যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে মিসকীনেরা যাচঞাকারী হিসেবে পরিচিত নয়। অথচ তারা ফকিরদের মতোই অভাবগ্রস্ত। তাই ফকিরদেরকে দান করা যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি অত্যাবশ্যক মিসকীনদেরকে দান করা। আলোচ্য আয়াতে তাই আল্লাহ্পাক ওই সকল সম্ভ্রমশীল অভাবগ্রস্তকে গুরুত্ব সহকারে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক আয়াতে এরশাদ করেছেন— লিল ফুকারা ইল্লাজীনা উহ্সিরু ফিসাবিলিল্লাহি লা ইয়াস্তাত্বীউনা দ্বারবান ফিল আরদ্বী ইয়াহ্সাবুহুমুল জাহিলু আগ্নিইয়াআ মিনাত্-তায়াফুফি তায়রিফুনা হুম বিসিমাহুম লা ইয়াসাআলুনান্ নাসা ইল্হাফা (যে সকল নিঃস্ব আল্লাহ্র পথে নিয়োজিত, যারা সাধারণভাবে উপার্জনক্ষম নয়, মূর্খেরা তাদেরকে মনে করে বিত্তবান, তাদেরকে চেনা যায় তাদের মুখমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করলে, তারা মানুষের নিকটে প্রার্থনাপ্রবণ নয়)।

এখানে 'ইলহাফ্' কথাটির অর্থ— জেদ করা , বিলাপ করা, কাকুতি মিনতি করে দাতাকে উত্যক্ত করা।

একটি সন্দেহঃ ভিক্ষুককেও (ফকিরকেও) তো মিসকীন বলা যায়। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হজরত আবু হোরায়রার এক বর্ণনায় এ রকম বলা হয়েছে। বর্ণনাটি বনী ইসরাইলদের কাহিনীমূলক। ওই দীর্ঘ কাহিনীতে এক কুষ্ঠ রোগী, এক টাক মাথাওয়ালা এবং এক অন্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে— এক মিসকীন তখন বললো, আমি মুসাফির। উপার্জন ও সম্পদ বিবর্জিত। স্বগৃহে পৌছানোর কোনো সম্বলও আমার কাছে নেই। এখন আল্লাহ্র সাহায্য ও আপনার সাহায্য ছাড়া আমি আর দেশে পৌছতে পারবো না। আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে একটি উট দিন। যেনো আমি উটে চড়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।

সন্দেহের অপনোদনঃ ১. ইতোপূর্বে বর্ণিত এক হাদিসে মিসকীনদের সংজ্ঞা বলে দেয়া হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতেও ফকির ও মিসকীনকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উপরে বর্ণিত বনী ইসরাইলের কাহিনীতো ফকির ও মিসকীনের সংজ্ঞা নির্ণায়কও নয়। ২. পরে বর্ণিত হাদিসে মিসকীন বলা হয়েছে ভাবার্থে। হাদিসটির মূল বক্তব্য বিষয়টি ছিলো— দরিদ্র ও নিঃস্বরা সাধারণতঃ কীভাবে যাচঞা করে তা দেখিয়ে দেয়া। প্রকৃত কথা হচ্ছে— মিসকীনেরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব নয়। কোনো কোনো শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম বলেছেন, যারা সর্বহারা, তারাই ফকির। আর মিসকীন তারাই, যারা কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী।

কেননা কাফ্‌ফারাত (প্রায়শ্চিত্ত) সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক এক স্থানে বলেছেন— ইতআমু আশারাতি মাসাকিনা (দশজন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান)। আর এক স্থানে বলেছেন— ইতআমু সিত্তিনা মিসকীনা (ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য দান)। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে এই দুই স্থানে বলা হয়েছে ওই সকল দরিদ্রদের কথা, যারা মিসকীন অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু সম্পদের মালিক। কিন্তু অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— আও মিসকীনাল জামাতরাবাতিন (অথবা ওই মিসকীন যে আশ্রয়হীন)। এখানে মিসকীন বলে বুঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্বদেরকে। এতে করে বুঝা যায় যে, জ্ঞাতসারে মিসকীনদের জন্য কিছু সম্মান বা সম্পদ থাকা জরুরী নয়।

হানাফীগণের মতে 'মিসকীন' অর্থও সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাদের মতের সমর্থনে তাঁরা উপস্থাপন করেন এই আয়াত— আম্মস সাফিনাতু ওয়া কানাত লিমাসাকীনা ইয়ামালুনা ফিল বাহরি (আর ওই তরণীটি ছিলো কতিপয় মিসকীনের যা তারা ব্যবহার করে থাকবে সাগরে)। এখানে কিশতীওয়ালাকে বলা হয়েছে মিসকীন। এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও কিশতীওয়ালা ওই কিশতীটির মালিক নয়। কিশতীটি সে নিয়েছিলো ইজারা বা ভাড়ায়। এ রকম কথা অবশ্য কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের (নসের) প্রতিকূল। কারণ এখানে নৌকাওয়ালাকেই সরাসরি বলা হয়েছে মিসকীন।

যারা বলেন, মিসকীন কিছু না কিছু সম্পদের অধিকারী, আর ফকির সম্পূর্ণ নিঃসম্বল— তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন নিম্নে বর্ণিত হাদিসটিকে। হাদিসটি জননী আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম, হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও হাকেম, হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাটিকে ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধও বলেছেন। হাদিসটি এই— রসুল স. ফকর (ভিক্ষাবৃত্তি) থেকে পরিত্রাণ প্রার্থনা করতেন। দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্‌! আমাকে মিসকীন অবস্থায় রাখো এবং মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো। এই হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে মাজা। এই হাদিস দৃষ্টে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মিসকীন অপেক্ষা ফকির নিকৃষ্ট। নতুবা রসুল স. ফকিরি (উনছবৃত্তি) থেকে পরিত্রাণ চাইতেন না। আর কামনা করতেন না মিসকিনিয়াত (দারিদ্র)কে। লক্ষণীয় যে, রসুল স. সম্পদগত দারিদ্র হতে পরিত্রাণ চাননি, পরিত্রাণ চেয়েছেন হৃদয়গত দারিদ্র থেকে। এক বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, সেই প্রকৃত দরিদ্র, যার হৃদয় দরিদ্র— বহু সম্পদের অধিকারী হলেও। সে-ই প্রকৃত সম্পদশালী, যার হৃদয় সম্পদশালী— অর্থবিত্ত না থাকলেও। রসুল স. আসলে

পরিত্রাণ চেয়েছেন, ভিক্ষাবৃত্তি এবং ফেত্‌না থেকে। সম্পদের স্বল্পতা থেকে নয়। আর তিনি স. হতে চেয়েছেন ওই ধরনের মিসকীন, যে নির্ভর করে কেবল সম্পদের উপরে নয়। সবর (ধৈর্য), তাওয়াক্কল (আল্লাহ্‌নির্ভরতা), রেজা বিল কাজা (তকদীরের প্রতি সন্তোষ) ইত্যাদি বিশেষ গুণে ভূষিত মিসকীন হওয়াই ছিলো রসুল স. এর অভিপ্রায়।

শায়েখ ইবনে হাজার হজরত আনাস এবং হজরত আবু সাঈদ বর্ণিত উল্লেখিত হাদিসের সনদ দুর্বল। ইবনে জাওজী বলেছেন মওজু (বানানো)। কারণ রসুল স. এর দোয়া কবুল না হয়েই যায় না। অথচ পরকাল যাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. মিসকীন ছিলেন না। এক সুবিশাল রাজ্যের তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। আবার কোরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে— ওয়াওয়াজাদাকা আয়েলান ফা আগনা (আল্লাহ্‌ আপনাকে বিত্তহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর করেছেন বিত্তবান)।

এরপর বলা হয়েছে— 'ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য।' এখানে জাকাত আদায়কারী, আদায়কারীর সাহায্যকারী ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক— সকলকেই রূপক অর্থে দরিদ্রের (ফকিরদের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং জাকাত আদায়কারী ধনী হলেও ইচ্ছে করলে জাকাতের অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ তারা ফকির না হলেও ফকিরদের মুখপাত্র (উকিল)। এই হিসেবে ধনী দরিদ্র সকল আদায়-কারীই ফকিরদের অন্তর্ভুক্ত। আর ফকিরদের উপরেও এটা অত্যাবশ্যক যে, তাদের জন্য যারা পরিশ্রম করছে (জাকাত সংগ্রহ করছে) তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া। এ সম্পর্কিত বিধান ও প্রমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

জাকাত সংগ্রাহককে কী পরিমাণ প্রদান করতে হবে ঃ

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, অল্প বেশী সকল ক্ষেত্রে আদায়কৃত জাকাতকে ভাগ করতে হবে সমান আটভাগে। তার মধ্যে একভাগ দিতে হবে জাকাত সংগ্রাহক ও তাদের সহকারীদেরকে। হানাফীদের অভিমত এ রকম নয়। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, সংগ্রাহক জাকাত সংগ্রহের কাজে যতটুকু সময় ব্যয় করবে, ততটুকু সময়ের প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ পারিশ্রমিক তাকে দিতে হবে। যেমন— কোনো সংগ্রাহক জাকাত সংগ্রহের কাজে একদিন ব্যয় করলো, এমতোক্ষেত্রে তাকে একদিনের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দিতে হবে। যে এই কাজে এক বৎসর ব্যয় করবে, তাকে দিতে হবে এক বৎসরের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ অর্থ। জাকাতের সম্পদে ধনীদের কোনো অংশ নেই। অংশ রয়েছে দরিদ্রদের। আর জাকাত আদায়কারীরাও জাকাতের অংশ পাবে না, পাবে পারিশ্রমিক। আর ওই পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

যদি জাকাত সংগ্রাহকদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত জাকাতের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ মাল তাকে দেয়া যাবে না। অর্ধেক দেয়া যেতে পারে। এই অভিমতটি ঐকমত্যসম্মত। লক্ষণীয় যে, এমতোক্ষেত্রে অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশীও দেয়া যাবে না। কারণ অর্ধেকের চেয়ে অতিরিক্ত হলেই তাকে সম্পূর্ণ ধরে নেয়া হয়। তাই অর্ধেকের চেয়ে বেশী পারিশ্রমিকের অনুমোদন দেয়া হলে আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। (দরিদ্ররাই যে জাকাতের হকদার, তার প্রমাণ আর থাকবে না)।

এরপর বলা হয়েছে — 'এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য।' মনোরঞ্জন করার জন্য যাদেরকে দান করা হয় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটিতে। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, 'মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব।' মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব আবার দুই প্রকার— মুসলমান ও কাফের। মুসলমানেরা আবার মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব হয় দুইভাবে। জয়িফুল ইমান (যে সকল নওমুসলিমের ইমান ততো মজবুত নয়)। যেমন— উয়াইনিয়া বিন বদর ফাজারী, আকরা বিন হাবেস এবং আব্বাস বিন মারদাস্। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন গোত্রনেতা। তারা নিজেরা দুর্বল ইমানদার ছিলেন না। দুর্বল ইমানদার ছিলো তাদের গোত্রের লোকেরা। রসুল স. দুর্বল ইমানদার এবং দুর্বল ইমানদারদের নেতা— উভয়কেই জাকাত দান করেছিলেন কেবল মনোরঞ্জনের জন্য। উদ্দেশ্য ছিলো এতে করে যাতে তারা ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাদের ইমান হয় অধিকতর বলিষ্ঠ। কিন্তু এ কথাটি প্রণিধানীয় যে, রসুল স. এ ধরনের দান জাকাত থেকে প্রদান করেননি। প্রদান করেছিলেন গণিমতের পঁচিশতম অংশ থেকে— যা রসুল স. এর জন্য ছিলো সুনির্দিষ্ট। আতা বলেছেন, মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের দ্বিতীয় প্রকারে ওই সকল মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মুকাবিলা করা সহজ নয়। তারা নেতৃস্থানীয়, তাই তাদেরকে বশীভূত না করা পর্যন্ত তাদের অধীনস্থদেরকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এমতোক্ষেত্রে মুসলিম শাসক প্রয়োজনানুসারে কখনো মুজাহিদগণের গণিমতের অংশ থেকে, আবার কখনো জাকাতের অর্থ থেকে দান করতে পারবেন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আদি বিন হাতেম তাঁর সম্প্রদায়ের তিনশত জাকাতী উট নিয়ে হজরত আবুবকরের খেদমতে উপস্থিত হন। হজরত আবুবকর ওই উটগুলো থেকে তিরিশটি উট তাঁকে প্রদান করেন।

অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব ওই সকল ব্যক্তি যারা অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে বলে মনে করা হয় এবং যাদের পাপমুক্তি কামনা করা হয়। রসুল স. এ ধরনের লোককে মালে গণিমতের পঁচিশতম অংশ থেকে কিছু প্রদান করেছিলেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া ছিলেন তাদের অন্যতম।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে কোনো অমুসলিমকে জাকাতের অর্থ দেয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ্তায়ালা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। সুতরাং জাকাত দানের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়োজন আর নেই। হজরত ইকরামা, শা'বী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াইহ্ ও অন্যান্য আলেমগণের ধারণা এই যে, অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের জাকাতের অংশ এখন অবলুপ্ত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, অবলুপ্ত হয়নি। বিধানটি এখনো প্রবহমান। এ রকম বলেছেন, হাসান বসরী, জুহরী, মোহম্মদ বিন আলী, জয়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাইন এবং আবু সাওয়ার। ইমাম আহমদ বলেছেন, যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে এখনো অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের মাল দেয়া যাবে। অধিকাংশ গ্রন্থে এই মাসআলাটির বিষয়ে আলেমগণের মতপার্থক্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশ এখন নেই। কারণ বিষয়টি এখন অপ্রয়োজনীয়। ইমাম মালেক বলেছেন, কোনো জনপদে অথবা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদেরকে প্রয়োজনানুসারে এখনো মনোরঞ্জনের জন্য জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। কারণ প্রয়োজন দেখা দিলে অকার্যকর বিধান পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে। এক বর্ণনানুসারে এসেছে, ইমাম আহমদও এই মতের সমর্থক। অন্য বর্ণনানুসারে এসেছে, এ ব্যাপারে ইমাম আহমদের অভিমত ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণও এই মত পোষণ করেছেন। অভিমতটি হচ্ছে— মিনহাজ গ্রন্থে রয়েছে, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ প্রদান করার বিধানটি এখনো সক্রিয়। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, দুর্বল বা সবল ইমানের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে দান করলে যদি বহু লোক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে ওই ধরনের লোকদেরকে জাকাতের সম্পদ দান করা যেতে পারে। এই অভিমতা-নুসারে অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের সম্পদ দান করা নাজায়েয হবে। সুতরাং অমুসলিম ফকির ও মিসকীনকেও দান করা হবে নাজায়েয। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীগণ দরিদ্র মুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের মাল দেয়াকে নাজায়েয বলেননি। তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন কেবল ধনী মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদানের ব্যাপারে। ইমাম শাফেয়ী ধনী মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদান করাকে জায়েয বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন নাজায়েয। তাঁর নিকট জাকাত দেয়ার সময় জাকাত গ্রহিতা প্রকৃতই দরিদ্র কিনা তা দেখে নিতে হবে। এতে করে বুঝা যায় যে, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ প্রদান করার বিধানটি রহিত হয়নি। কারণ রহিতকারী কোনো বিধানের অস্তিত্ব এক্ষেত্রে নেই। সুতরাং রহিত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। তাই ইমাম আবু হানিফার অভিমতের উদ্দেশ্য এখানে এই যে, কেবল অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে জাকাতের অর্থ দেয়ার প্রসঙ্গটি এখন অবলুপ্ত।

একটি সন্দেহঃ হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে মুসলিম এবং তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলেছেন, তখন রসুল স. এর পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি ছিলাম ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি স. আমাকে সম্পদ প্রদান করেন এবং মাঝে মাঝে এ রকম করতে থাকেন। এভাবে তিনি স. আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়ভাজন হন। এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, রসুল স. অমুসলমানদেরকে দান করতেন। ইবনে আসির তাঁর 'আস্‌সাহাবা' গ্রন্থে দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে দান করতেন। ইমাম নববী লিখেছেন, রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে হুনায়েনের মালে গণিমত থেকে দান করেছিলেন। অথচ সাফওয়ান তখন ছিলেন অমুসলিম।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, হজরত রাফেয়ের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত সাফওয়ানকে দান করেছিলেন জাকাতের সম্পদ থেকে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, জাকাতের অর্থ থেকে নয়, রসুল স. দান করেছিলেন গণিমতের সম্পদ থেকে। অর্থাৎ গণিমতের খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) থেকে। বায়হাকী, ইবনে সাইয়েদুন্‌নাস এবং ইবনে কাসিরও এ কথা বলেছেন।

ইবনে হুম্মাম তাঁর 'বায়ানুন নাসেখ' গ্রন্থে লিখেছেন, স্বসূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, উয়াইনিয়া বিন হাসিনকে হজরত ওমর বলেছিলেন— আলহাক্কু মির্‌রব্বিকুম ফামান শা-আ ফাল ইউমিম ওয়া মান শা-আ ফাল ইয়াক্‌ফুর (তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে, এখন যে ইচ্ছে হয় মানবে, যে ইচ্ছে হয় মানবে না)। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য ছিলো এখন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে প্রদান করার বিধান আর নেই।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, শা'বী বলেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের নিয়মটি ছিলো রসুল স. এর জামানায়। হজরত আবু বকরের জামানায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত আবু বকরের খেলাফতের সময় হজরত উয়াইনিয়া এবং হজরত আকরা' তাঁর নিকট একটি জমি চেয়েছিলেন। হজরত আবু বকর তাঁদেরকে ওই জমির দলিল লিখে দিলেন। কিন্তু হজরত ওমর ওই দলিল হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, রসুল স. এ রকম দান করতেন ইসলামের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। এখন আল্লাহ্‌পাক ইসলামকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানদেরকে করেছেন অমুখাপেক্ষী। এখন যদি তোমরা ইসলামের উপর কায়েম থাকো তবে উত্তম। না হলে ফয়সালা হবে তলোয়ারের মাধ্যমে। উয়াইনিয়া এবং আকরা' তখন বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! খলিফা কে? আপনি না ওমর? হজরত আবু বকর বললেন, সে যদি ইচ্ছা করে তবে সে-ই খলিফা। এ কথা বলে তিনি হজরত ওমরের সিদ্ধান্তকেই

বহাল রাখেন। কোনো সাহাবী এই সিদ্ধান্তটিকে অস্বীকার করেননি। আমি বলি, হজরত ওমরের কথায় কোরআনের আয়াত রহিত হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি যে আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন, সেই আয়াতেও মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশ রহিত হওয়ার ইঙ্গিত নেই। ফামান শা-আ ফাল ইউ'মিন ওয়ামান শা-আ ফাল ইয়াক-ফুর— হজরত ওমর কর্তৃক উচ্চারিত এই আয়াত সুরা কাহাফের অন্তর্ভুক্ত। সুরা কাহাফ অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় আর সুরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছে অনেক পরে মদীনায়। আর সুরা তওবাতেই মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব এর প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে। সুতরাং পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত পরে অবতীর্ণ আয়াতকে রহিত করতে পারে না। তাছাড়া উয়াইনিয়া ও আকরা' চেয়েছিলেন একটি ভূখণ্ড। জাকাতের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে জাকাত। কাকে কাকে জাকাত দেয়া যাবে, সেই তালিকায় উল্লেখিত হয়েছে মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের কথা। আর রসুল স. কখনো কোনো অমুসলিমকে জাকাত প্রদান করেছেন এ রকম কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিধানটি মুসলমান মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের সঙ্গে বিশষভাবে সম্পৃক্ত। অমুসলিম মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার সম্পদশালীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ সম্পদশালীদের জন্য জাকাত হালাল না হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত মুয়াজ সম্পর্কিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে যে, রসুল স. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন— জাকাত গ্রহণ করতে হবে তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে এবং তা বন্টন করে দেয়া হবে তাদেরই দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে। এতে করে প্রমাণ হয় যে, জাকাত গ্রহীতা হিসেবে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবকে হতে হবে দরিদ্র। এভাবে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবেরাও হয়ে গিয়েছে ফুকারাদের (দরিদ্রদের) একটি শাখা। এভাবে আল ফুকারার সঙ্গে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের সম্পর্ক সাধারণের সঙ্গে বিশেষের সম্পর্কের মতো।

এরপর বলা হয়েছে 'দাস মুক্তির জন্য' (ওয়াফীর্ রিক্বাব্)। এখানে 'ফী' শব্দটি গুরুত্ব প্রকাশক। 'রিক্বাব্' এর পূর্বে 'ফী' উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী তিনটি খাত (ফকির, মিসকীন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব) অপেক্ষা এই খাতটি (দাস মুক্তি) অধিকতর উপযুক্ত। অর্থাৎ এই খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় অত্যন্ত জরুরী।

'আর্ রিক্বাব' অর্থ মুকাতিব্ ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এ রকম বলেছেন। ইবনে ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেকও এই অভিমতের প্রবক্তা। মুকাতিব্কে হতে হবে নিশ্চিতরূপে নিঃস্ব। এ ধরনের দাসমুক্তির ক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ সম্পদও প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। এ রকম হলেও দাস মুক্তির ক্ষেত্রে নেসাব পরিমাণ

মাল প্রদান করা জায়েয। কারণ মুক্তি নিশ্চিত করাই এখানে প্রধান ব্যাপার। অন্য বর্ণনায় এসেছে— ওয়াকাতিবুহুম ইন্ আলিমতুম ফিহিম খইরাঁও ওয়া আতুহুম মিম্ মালিল্লাহিল্লাজী আতাকুম (এবং তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তাদেরকে মুকাতিবা করো। আর তোমরা তাদেরকে ওই সম্পদ দান করো যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন)।

শক্তিশালী একটি সূত্রে এসেছে, ইমাম মালেক বলেছেন, এখানে 'আর্ রিক্বাব' অর্থ খাঁটি গোলাম বা বাঁদী (মুকাতিব্ গোলাম বা বাঁদী নয়)। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে। এক বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমদও এ রকম বলেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এই অভিমতটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

আবু উবায়দা তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে আবুল আশরাস সূত্রে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আপন সম্পদের মাধ্যমে হজ করা, জাকাত দেয়া কিংবা বাঁদী খরিদ করে আযাদ করে দেয়ায় কোনো অসুবিধে নেই। আমাশ সূত্রে আবু মুয়াবিয়াও মুজাহিদের এ রকম উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। আবু নজিহ্ থেকে আমাশের মধ্যস্থতায় আবু বকর ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস জানিয়েছেন, আপন সম্পদের জাকাতের মাধ্যমে বাঁদী ও গোলাম ক্রয় করে স্বাধীন করে দাও। আবু মুয়াবিয়া সূত্রে উবাদা বিন সুলায়মানও এ রকম বর্ণনা এনেছেন।

উবাদা—আমাশ—আবুল আশরাস সূত্রে এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস জাকাতের মাল বের করে নিয়ে আমাদেরকে হজের সামান প্রস্তুত করতে বলতেন।

মায়মুনার বর্ণনায় এসেছে, আমি আবু আবদুল্লাহ্কে একবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি কেউ সম্পদের জাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেয় অথবা মুসাফিরদের জন্য খরচ করে, তবে কি হবে? আবু আবদুল্লাহ্ বললেন, জায়েয হবে। হজরত ইবনে আব্বাস এ রকম করতেন। এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই।

জালালী বলেছেন, আমার নিকট আহমদ বিন হাশেম বলেছেন, একবার ইমাম আহমদ আমাকে বললেন, প্রথম প্রথম আমিও মনে করেছিলাম জাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রীতদাসী মুক্ত করা যায়। পরে আমি এ ধারণাটি পরিত্যাগ করেছি। তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলো, কেনো? হজরত ইবনে আব্বাস তো এ রকম করা জায়েয বলেছেন। ইমাম আহমদ বললেন, হজরত ইবনে আব্বাসের কথা আবেগপ্রবণ। অথবা তাঁর কথার অর্থের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের মত্ততা ও উদ্বিগ্নতা।

ইমাম মালেক বলেন, জাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী মুসলমানদের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত (বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত)। কথাটির অর্থ— এভাবে স্বাধীন হয়ে যাওয়া ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর মৃত্যুর পর যদি তাদের কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি জমা করতে হবে বায়তুল মালে। অপর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম মালেক বলেন, যে স্বাধীন করে দিয়েছে সে-ই হবে তার সম্পদের মালিক।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, আর রিক্বাবের তাফসীরে এ সম্পর্কে আলেমগণের আর একটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। অভিমতটি এই যে— জাকাতের মালকে ভাগ করতে হবে দু'টি ভাগে। একটি ভাগ দ্বারা মুসলমান মুকাতিব্দেরকে আযাদ করতে হবে। অপর ভাগ দ্বারা মুসলমান ক্রীতদাসী খরিদ করে স্বাধীন করে দেয়া যাবে। ইবনে আবী হাতেম এবং 'কিতাবুল আমওয়াল' রচয়িতা আবু উবায়দা যথাসূত্রে বর্ণনা করেছেন, জুহুরী ওমর বিন আবদুল আজিজকে এ কথাই লিখে পাঠিয়েছিলেন।

আমি বলি, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. হজরত মুয়াজকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে— জাকাত সংগ্রহ করতে হবে তাদের বিত্তবানদের নিকট থেকে এবং বণ্টন করে দিতে হবে তাদেরই দরিদ্র জনতাকে। এই বিবরণটির মাধ্যমে ইমাম মালেকের অভিমত খণ্ডন হয়ে যায়। গোলাম খরিদ করে স্বাধীন করার নিয়মটি রদ্দে আলাল ফুকারা (ফকির ছাড়া অন্যকে দেয়া অর্থে) হবে না। আর হজরত ইবনে আব্বাসের কথা তো ইমাম আহমদের ভাষ্যানুযায়ী আবেগ তাড়িত। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাসের একটি অভিমত রয়েছে। কিন্তু সেই অভিমতটি বর্ণনা করা হয়নি। আমরা এখানে আর রিক্বাব্ এর তাফসীর করেছি মুকাতিবের অনুকূলে। অর্থাৎ আর্ রিক্বাবের উদ্দেশ্য হবে মুকাতিবই। এই মতের পৃষ্ঠপোষকতায় মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী একদিন জুমআর নামাজের খুত্বা পাঠ করছিলেন। ওই সময় এক মুকাতিব নিবেদন করলেন, লোকদেরকে আমার মুক্তির জন্য চাঁদা দিতে বলুন। হজরত আবু মুসা উপস্থিত মুসল্লিদেরকে চাঁদা প্রদানে উৎসাহিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লিবৃন্দ বিভিন্ন সামগ্রী ছুঁড়ে দিতে শুরু করলো। এভাবে জমা হলো পাগড়ী, হার, আংটি— অনেক কিছু। হজরত আবু মুসা সেগুলোকে একত্র করতে বললেন। নামাজ শেষে সেগুলো বিক্রয় করে মুকাতিবের মুক্তিপণ প্রদান করলেন। যা বেঁচে গেলো তা জমা রাখলেন অন্যান্য গোলাম আজাদের খাতে। চাঁদা দাতাদেরকে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দিলেন না। বললেন, লোকেরা তো এগুলো দিয়েছে তাদের প্রতিবেশীদেরকে মুক্ত করার জন্যই।

সুতরাং এ বিষয়ে ইমাম আহমদের অভিমতের প্রতি কীভাবে সন্দেহ পোষণ করা যায়। তাঁর ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এসেছে, এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জান্নাতকে নিকটবর্তী করে এবং দূরবর্তী করে দোজখকে। রসুল স. বললেন, বন্দী জীবনকে স্বাধীন করো এবং শৃঙ্খলিত স্কন্ধকে মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! কথা দু'টো কি এক কথা নয়? রসুল স. বললেন, না। বন্দী জীবনকে স্বাধীন করার অর্থ একক উদ্যোগে ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দাও। আর 'শৃঙ্খলিত স্কন্ধকে মুক্ত করো' অর্থ দাস-দাসী মুক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করো।

আমি বলি, এই বর্ণনাটি ইমাম মালেকের অভিমতের পরিপোষক নয়। অর্থাৎ 'আর রিক্বাব' অর্থ দাস-দাসী ক্রয় করে স্বাধীন করে দেয়া নয়। কারণ এখানে রসুল স. 'আর রিক্বাব' কথাটির তাফসীর উপস্থাপন করেননি। বর্ণনা করেছেন একটি পুণ্যময় আমলের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য' (ওয়াল গরিমীন)। আলেম-গণের ঐকমত্য এই যে, এখানে ঋণগ্রস্তদেরকে জাকাতের অর্থ থেকে দান করার নির্দেশনা এসেছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেম ওই সকল ঋণগ্রস্তদেরকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে— ১. ওই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণের অর্থ কোনো পাপকর্মে ব্যয় করেনি। ২. ওই করজদার, যে ঋণের টাকায় পুণ্যকর্ম (মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয় ইত্যাদি) সম্পাদন করেছে। এ ধরনের ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। ৩. যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় খরচ করে অথবা পাপকর্মে অর্থ ব্যয় করে ঋণী হয়েছে, তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ঋণ পরিশোধের অর্থ যার নেই, তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে, যে কোনো কারণে সে ঋণপীড়িত হয়ে পড়ুক না কেনো (সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে অথবা অসৎকাজে)। কারণ আলোচ্য বাক্যে কেবল বলা হয়েছে ওয়াল গরিমীনা (এবং ঋণ জর্জরিতদের জন্য)। কথাটি একটি সাধারণ অর্থবোধক শব্দ। বিশেষভাবে এখানে কোনো প্রকার ঋণভারাক্রান্তকে চিহ্নিত করা হয়নি। যার নিকট ঋণ পরিশোধের মতো অর্থ নেই, সে ফকির। সে সম্পদশালী হলেও সফরের সময় ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রেও অন্যান্য ইমামগণের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন মতপার্থক্য ঘটেছে সফরের নামাজ এবং রোজার ক্ষেত্রে। ইমাম আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে— বৈধ অবৈধ সকল সফরেই নামাজ কসর করা যাবে এবং রমজানের রোজা ইচ্ছা করলে ভাঙ্গা যাবে। কিন্তু অন্যান্য ইমাম বলেছেন,

বৈধ সফরের ক্ষেত্রেই কেবল এ রকম করা যাবে। অবৈধ সফরের ক্ষেত্রে নয়। তাই তাদের কথা হচ্ছে— অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় করে কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। এমনকি মুসাফির অবস্থাতেও নয়।

ঋণ পরিশোধের পরেও নেসাব পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ যদি কারো থাকে (যার উপর জাকাত অত্যাবশ্যক হয়) তবে তাকে জাকাত দেয়া যাবে না। এ রকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম ব্যক্তি যদি সংকাজে ব্যয় করার কারণে ঋণী হয়, তবে তাকেও জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী।' এখানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপের জন্য 'সাবীলিল্লাহ' এর পূর্বে 'ফী' অব্যয়টি বসানো হয়েছে। এভাবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারীদেরকে জাকাত গ্রহীতা হিসেবে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী এবং জমহুরের মতে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী অর্থ— মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা), যারা তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে আল্লাহ্‌র পথে বের হয়েছে। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে এখানে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী অর্থ হজযাত্রী। ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত উম্মে মা'কাল বলেছেন, আমার স্বামী আবু মা'কাল রসুল স. এর সঙ্গে হজে যেতে ইচ্ছে করলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি তো জানেন আমার উপর হজ অত্যাবশ্যক (সুতরাং আমাকেও নিয়ে যান)। তিনি আমাকে রসুল স. এর নিকটে নিয়ে গেলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার উপরে হজ অত্যাবশ্যক হয়েছে। আর আবু মা'কালের নিকট রয়েছে একটি প্রাপ্তবয়স্ক উট (উটটি বাহন হিসেবে আমাকে দেয়া হোক)। আবু মা'কাল বললেন, উটটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছি। এখন তো এটা সদ্‌কা (জাকাত)। রসুল স. বললেন, ওই উটের পিঠে চড়েই সে হজ করতে পারবে। হজও ফী সাবীলিল্লাহ্‌ (হজও ফী সাবীলিল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত অথবা ফী সাবীলিল্লাহ্‌ অর্থই হজ)। এই হাদিসের বর্ণনা-সূত্রভূত ইবরাহিম বিন মুহাজির বর্ণনাকারী হিসেবে বলিষ্ঠ কিনা, সে সম্পর্কে বিভিন্ন কথা রয়েছে। ভিন্ন সূত্রে আবু দাউদ এবং ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে— হজরত উম্মে মা'কাল বলেছেন, রসুল স. এর বিদায় হজের সময় আমার নিকট ছিলো একটি উট। আবু মা'কাল সেটিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছিলেন। এরপর আবু মা'কাল পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পরপারে পাড়ি দিলেন। ইত্যবসরে রসুল স. হজে চলে গেলেন। প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁর নিকটে গমন করলে তিনি বললেন, মা'কালের মা! আমাদের সঙ্গে হজে গেলেন না কেনো? আমি বললাম, আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম। কিন্তু মা'কালের বাপ হঠাৎ করেই চলে গেলেন।

একটি উট ছিলো তার। ওই উটে চড়ে তিনি হজে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু সন্নিকটবর্তী দেখে উটটিকে আল্লাহ্‌র পথে দান করার অসিয়ত করে গিয়েছেন। রসুল স. বললেন, ওই উটে চড়ে তুমি হজে যেতে পারবে না কেনো? হজও তো আল্লাহ্‌র পথ (ফী সাবীলিল্লাহ্)।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদিসকে প্রমাণরূপে পেশ করেছেন। ওই হাদিসে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন তোমরা খালেদের প্রতি অন্যায় আচরণ করছো। সে তো তার অস্ত্রশস্ত্রসহ উৎসর্গীকৃত।

আমি বলি, নিঃস্ব হওয়া যখন জাকাতের সকল খাতের একটি সাধারণ উপযুক্ততা, তখন 'ফী সাবীলিল্লাহ্' কথাটিকে সাধারণভাবে রেখে দেয়াই সমীচীন। কথাটিকে জেহাদ বা হজ— কোনোটির সঙ্গেই সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। দরিদ্র কোনো তালেবে এলেমকে (শিক্ষার্থীকে) জাকাতের অর্থ প্রদান করাও 'ফী সাবীলিল্লাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং পর্যটকদের জন্য।' এ কথার অর্থ ওই সকল মুসাফিরকে জাকাত দেয়া যাবে, যারা জাকাত গ্রহীতা হিসেবে অনুপযুক্ত নয় (সম্পদশালী নয়)। অর্থাভাবে যারা সফর করতে পারে না, তারাও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত।

যদি কারো এতটুকু অর্থ থাকে যার কারণে সে জাকাত গ্রহণের অযোগ্য হয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়, এমতোক্ষেত্রে তাকে জাকাত দেয়া যাবে না। সে ভ্রমণাবস্থায় থাক অথবা না থাক।

বাড়ীতে অনেক সম্পদ থাকলেও ভ্রমণাবস্থায় যদি সম্পদের স্বল্পতা দেখা দেয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর সামর্থ্য যদি না থাকে তবে তাকে ঐকমত্যসম্মতভাবে জাকাত দেয়া যাবে। ইমাম আবু হানিফা 'ইবনি সাবিল' (পর্যটক, মুসাফির) বলতে এ ধরনের লোককেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আপন সম্পদের কর্তৃত্বহারা ব্যক্তিরাও জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। সফরে সম্পদশালীরাও অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ তখন তার সম্পদ তার কর্তৃত্বাধীন থাকে না। এ ধরনের ব্যক্তিরাও ফকিরের (নিঃস্বদের) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দেশে ফিরে আসার সামর্থ্য যদি তার থাকে তবে সে জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমত এ রকম। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম অবস্থায়ও মুসাফির জাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নিঃস্বরাই জাকাত গ্রহণের যোগ্য। কিন্তু সম্পদশালী মুসাফির যদি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্য রাখে তবে তাকে নিঃস্ব বলা যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এ রকম শর্ত আরোপ করলে জাকাতের খাত হিসেবে মুসাফিরদেরকে উল্লেখ করার প্রয়োজন আর অবশিষ্ট থাকে না।

আমি বলি, জাকাতের খাত আটটি। তার মধ্যে সাতটি খাতের সাধারণ যোগ্যতা এই যে, তাদেরকে নিঃস্ব হতেই হবে। অবশিষ্ট একটি খাতের নিঃস্ব হওয়া না হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা হচ্ছে জাকাত আদায়কারী। তারা যা পায় তা আসলে পারিশ্রমিক। আর বিত্তহীন, বিত্তশালী সকলেই পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য। তারা জাকাতদাতা যেমন নয় তেমনি জাকাত গ্রহীতারও সম-যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। কেবল অধিকার প্রকাশের জন্য তাদেরকে জাকাত গ্রহীতাদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট সাতটি খাতের সাধারণ যোগ্যতা হচ্ছে নিঃস্বতা। সেই নিঃস্বতার কারণ সমূহ এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে সাতটি পৃথক শিরোনামে। জাকাত গ্রহীতাদের অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। তাদের পারস্পরিক অগ্রগণ্যতার বিষয়টিও বিবেচ্য। যেমন মিসকীন কারো নিকট কিছু চায় না। তাই মিসকীনেরা জাকাত গ্রহণের ব্যাপারে ফকির অপেক্ষা অগ্রগণ্য। মুসাফির ফকির অগ্রগণ্য মুকিম ফকির অপেক্ষা। এভাবে মুজাহিদ, হজযাত্রী, মুকাতিব, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, মুয়াল্লাফাতিল কুলুবও কম অগ্রগণ্য নয়। হাজী-দেরকে বাহন প্রদান করলে তা হজ সম্পাদনে সহায়তা করে। হজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। আবার মুজাহিদকে সাহায্য করার অর্থ জেহাদে সাহায্য করা। জেহাদও মহান ইসলামের একটি অত্যুচ্চ শিখর। দাসমুক্তিও উন্মোচন করে কল্যাণের বহুবিধ তোরণ। যে সকল অগ্রগণ্যতার গুরুত্বের উল্লেখ আমি করলাম, সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে। ওই দানই সর্বোত্তম দান, যা শুরু করা হয় আপন পরিবার থেকে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী এবং হজরত হাকিম বিন হাজ্জাম থেকে মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার আর এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক লোক আল্লাহ্র রাস্তায়, ক্রীতদাস মুক্তিতে, মিসকীনকে এবং আপন পরিবারের জন্য এক দিনার করে ব্যয় করলো— এ রকম দানের মধ্যে সর্বোত্তম দান হিসেবে গৃহীত হবে ওই দিনারটি— যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করেছে। মুসলিম।

হজরত মায়মুনা বিনতে হারেস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর জামানায় আমি এক ক্রীতদাসীকে মুক্ত করলাম এবং এ কথা রসুল স.কে জানালাম। তিনি স. বললেন, ওই অর্থ তোমার মাতুলবর্গকে দান করলে অধিক সওয়াব লাভ করতে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত সুলায়মান বিন আমের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মিসকীনকে দান করলে পাবে একগুণ সওয়াব। আর আত্মীয়স্বজনকে দান করলে পাবে দ্বিগুণ। একগুণ দানের জন্য, আর একগুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য। আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার আবু তালহা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বীরেহার বাগানটি আমার খুবই প্রিয়। ওই বাগানটি আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করতে চাই এবং আশা রাখি ওই দানের সওয়াব যেনো আমার

আমলনামায় জমা থাকে। আপনি দয়া করে আপনার ইচ্ছে মতো ওই সম্পদ ব্যয় করুন। রসুল স. বললেন, আমার ইচ্ছা, তুমি ওই বাগান তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দাও। আবু তালহা তাই করলেন। বাগানটি বণ্টন করে দিলেন তাঁর চাচাতো ভাইদের মধ্যে। বোখারী, মুসলিম।

ইমাম আবু হানিফার মতে জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রের স্বজনদেরকে জাকাত দেয়া যাবে না। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিরা পিতামাতাকে, পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে, স্ত্রী তার স্বামী এবং স্বামী তার স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে না। কারণ এরা একে অপরের সম্পদের স্বাভাবিক অংশীদার। নিয়ম হচ্ছে জাকাত গ্রহীতারা হবে প্রাপ্ত অর্থের পরিপূর্ণ মালিক। কিন্তু এমতোক্ষেত্রে সেরকম নির্ভেজাল মালিকানা অকল্পনীয়। আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন— ওয়া ওয়াজাদাকা আয়েলান ফা আগনা। আয়াতটির অর্থ— তিনি আপনাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। হে আমার রসুল! খাদিজার সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহ্ আপনাকে বিত্তবান করেছেন। আবার রসুল স. স্বয়ং আজ্ঞা করেছেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার (অধিকারভূত)। কিন্তু ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, জন্মসূত্রের আত্মীয়দেরকে জাকাত দেয়া যাবে। বরং এ রকম ঘনিষ্ঠজনকে জাকাত প্রদান করা উত্তম। এতে পরিবার পরিজনের প্রতিপালন সহজতর হবে। সাথে সাথে দান করাও হবে। অতএব, ভাই- বোন, চাচা, ফুফী, মামা, খালা— সকলেই জাকাতের হকদার।

যদি কারো প্রতিপালনাধীনে এতিম স্বজন থাকে এবং বিচারক যদি তার জন্য হকের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকেন, তবে ওই ব্যক্তি জাকাতের অর্থ দিয়ে ওই ব্যয় নির্বাহ করলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বিচারক যদি প্রতিপালন ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো অংককে বেঁধে দিয়ে থাকেন, তবে জাকাতের অর্থ দিয়ে ওই অংক পূরণ করা যাবে না। কেননা এই অবস্থায় যে কোনো একটি ওয়াজিব (হয় প্রতিপালন ব্যয় অথবা জাকাত) আদায় হবে। দায়িত্বে রয়ে যাবে আর একটি ওয়াজিব। তবে প্রতিপালন ব্যয়ের অংক পূরণ না করে যদি আলাদা করে জাকাত দেয়া হয়, তবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ এমতোক্ষেত্রে জাকাতের উপর জাকাত গ্রহীতার মালিকানা পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের মতে এ ধরনের নিকটাত্মীয়কে জাকাত দান দুরস্ত নয়। কারণ এ ধরনের পোষ্যদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব তো প্রতিপালনকারীর উপরে আগে থেকেই বহাল। এ বিষয়ে বিস্তারিত মাসআলা আমরা লিখে দিয়েছি সুরা বাকারায় একটি আয়াতের তাফসীরে। আয়াতটি এই— 'ওয়া আ'লাল মাওলুদিলাহু রিজকুহুন্না ওয়া কিস্ওয়াতুহুনা বিল মা'রুফি ওয়া আ'লাল ওয়ারিছি মিছলু জালিকা।' এ বিষয়ে সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের)

অভিমতও ইমামে আজমের (ইমাম আবু হানিফার) অনুকূল। পারস্পরিক সম্পদগত সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তাঁদের নিকটও বিবেচ্য। কিন্তু তাঁরা একটি হাদিসের কারণে এ রকম বলেছেন যে, স্ত্রী তার স্বামীকে জাকাত দিতে পারবে। হাদিসটি এই—

হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী হজরত জয়নাব বর্ণনা করেছেন, আমি দেখতে পেলাম রসুল স. মসজিদের অভ্যন্তরে বলে যাচ্ছেন, হে রমণীকুল! দান করো। তোমাদের অলংকারগুলো থেকে দান করো। আমি ভাবলাম আমি তো আমার স্বামী আবদুল্লাহ্র জন্য এবং কিছু এতিম পোষ্যদের জন্য খরচ করে থাকি। এতে করে আমি কি দানের সওয়াব পাবো? আমি আমার স্বামীকে বললাম, আপনি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার জন্য এবং এতিমের জন্য ব্যয় করি— তাতে করে আমার দান করা হবে কিনা? তিনি বললেন, তুমিই বলো। আমি একটু অগ্রসর হতেই সাক্ষাত পেলাম এক আনসারী রমণীর। শুনলাম, তিনিও আমার মতো আমল করেন। আমাদের সামনে দিয়ে গমন করছিলেন হজরত বেলাল। আমরা দু'জনে তাঁকে বললাম, রসুল স.কে আমাদের কথা বলুন। আমরা আমাদের স্বল্পবিত্ত স্বামীদের জন্য এবং এতিম পোষ্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকি। এতে করে আমরা দানের সওয়াব পাবো কিনা। আপনি কিন্তু আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না। হজরত বেলাল রসুল স. এর নিকটে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। রসুল স. বললেন, কারা এ রকম জানতে চেয়েছে? হজরত বেলাল বললেন, জয়নাব। তিনি স. বললেন, কোন্ জয়নাব? হজরত বেলাল বললেন,আবদুল্লাহ্র স্ত্রী। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। একগুণ দানের জন্য। আরেকগুণ আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য। বোখারীও হাদিসটির বর্ণনাকারী। তবে তাঁর বর্ণনায় বক্তব্য বিষয়ের কিছুটা অদলবদল ঘটেছে। আবু দাউদ ও তায়ালুসীর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— এতিম পোষ্যরা ছিলো হজরত জয়নাবের ভাইয়ের ও বোনের সন্তান। আলকামা সূত্রে নাসাঈর বর্ণনায় এসেছে, হাদিসে বর্ণিত রমণী দু'জন ছিলেন বিত্তশালিনী। তাঁদের একজনের অধীনে ছিলো কিছু এতিম। অন্যজনও ছিলেন এতিমের প্রতিপালনকারিণী। আর তাঁর স্বামী ছিলো বিত্তহীন।

উপরোক্ত হাদিসের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হজরত জয়নাব জানতে চেয়েছিলেন তাঁর দান যথেষ্ট হয়েছে কিনা। এতে করে মনে হয় তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এভাবে দান করলে তাঁর জাকাত আদায় হবে কিনা। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, বর্ণিত হাদিসে উল্লেখিত সদ্কা ছিলো নফল সদ্কা। রসুল স. তখন নফল সদ্কার ব্যাপারেই রমণীগণকে উৎসাহ দান করেছিলেন।

এটা ছিলো তাঁর উপদেশ— নির্দেশ নয়। আর যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টিকে দু'ভাবে গ্রহণ করা যায়। ওয়াজিব এবং নফল উভয় ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ওই হাদিসে উল্লেখিত 'আজযা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ— যথেষ্ট গুণসম্পন্ন। এভাবে জিজ্ঞাস্যটি ছিলো এ রকম— যে অর্থ দান করা হয়েছে তা মূল্যগত দিক থেকে যথেষ্ট কিনা। অর্থাৎ এতে করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য, দোজখ থেকে পরিত্রাণ লাভ হবে কিনা। আগেই বলা হয়েছে, ইমাম আবু হানিফার মতে ওই দান ছিলো নফল দান। এই অভিমতের সমর্থনে তাহাবী একটি বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। বর্ণনাটি এই—

রাবেতা বিন্‌তে আবদুল্লাহ্ ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি হাতের কাজ করে কিছু কিছু উপার্জন করতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন দরিদ্র। রাবেতা তাঁর স্বামীর পরিবারের খরচ চালাতেন। একদিন তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, আপনার পরিবারের খরচ চালাতে গিয়ে আমি আর কাউকে দান খয়রাত করার সুযোগ পাই না। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, আমি চাই না যে, তুমি আমার জন্য খরচ করে দানের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হও। এ বিষয়ে নির্দেশনা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা দু'জনে রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হলেন। হজরত রাবেতা বললেন, আমি কিছু কিছু হাতের কাজ করি। সেগুলো বিক্রয় করে আমার কিছু আয় হয়। আমার স্বামী উপার্জনহীন। ফলে তাঁর এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের খরচ আমাকেই চালাতে হয়। এ কারণে আমি দান খয়রাত করতে পারি না। স্বামীর সংসারে আমি যা খরচ করি, তার জন্য কি আমি দানের সওয়াব পাবো? রসুল স. বললেন, অবশ্যই পাবে। তুমি সঠিক কাজই করেছো। তাহাবী লিখেছেন, রাবেতার আরেক নাম জয়নাব। আর তিনি ছিলেন হজরত ইবনে মাসউদের পত্নী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন ফজরের নামাজ শেষে রসুল স. মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রমণীকুল! তোমাদের জ্ঞান অপূর্ণ। তোমাদের ধর্ম অপূর্ণ। তোমাদের বুদ্ধিমত্তা অনিষ্টকর। আমি দেখেছি আখেরাতে দোজখীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তোমরা দান খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করো। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে হজরত ইবনে মাসউদের পত্নীও ছিলেন। তিনি রসুল স. এর এই ঘোষণা শুনে তৎক্ষণাৎ হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে উপস্থিত হলেন এবং কিছু অলংকার চাদরে বেঁধে নিয়ে রওনা হলেন রসুল স. এর পবিত্র দরবারের দিকে। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? তিনি বললেন,

এগুলো আমি দান খয়রাত করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবো। আশা করি এভাবে দান করলে আল্লাহ্পাক আমাকে দোজখ থেকে বাঁচাবেন। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এগুলো আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে দান করে দাও। আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে সওয়াব দান করবেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রসুল স. এর নিকট থেকে না জেনে এ রকম করবো না। এ কথা বলে তিনি হাজির হলেন রসুল স. এর দরবারে। সব শুনে রসুল স. বললেন, এগুলো তোমার স্বামী ও সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করো। তাহলেই দানের সওয়াব পাবে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে রসুল স. ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আজহার দিন ঈদগাহে গমন করলেন। নামাজের পর উপস্থিত জনতাকে বিভিন্ন বিষয়ে সদুপদেশ দিলেন। বিশেষভাবে বললেন দান খয়রাতের কথা। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে নারী সম্প্রদায়! দান খয়রাত করো। আমি দেখেছি দোজখে তোমাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এমন হলো কেনো? রসুল স. বললেন, তোমরা কথায় কথায় অভিসম্পাত দিতে থাকো। স্বামীদের প্রতি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। এই হাদিসে আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদের সহধর্মিণী তখন বললেন, আমার কিছু অলংকার রয়েছে। আমি সেগুলোকে দান করতে চাই। হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, এর জন্য আমি ও আমার সন্তানেরাই তো রয়েছি। রসুল স. বললেন, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে। তোমার স্বামী সন্তানেরাই তোমার দানের অধিক হকদার।

উপরের হাদিসগুলো বর্ণনা করার পর তাহাবী লিখেছেন, উদ্ধৃত হাদিস সমূহের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সেগুলোতে বলা হয়েছে নফল সদ্কার কথা। প্রথমোক্ত হাদিসে এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেছিলেন, আমি হাতের তৈরী কিছু জিনিস বিক্রী করে কিছু উপার্জন করি। এ কথায় বুঝা যায়, জাকাত ফরজ হয় এ রকম সম্পদের অধিকারিণী তিনি ছিলেন না। তাঁর উপার্জনের মাধ্যমে সংসারের প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহ করা যেতো মাত্র। অতএব এ কথাটি নিশ্চিত যে, তিনি যে দান করতে চেয়েছিলেন তা নফল দান। আর সম্পূর্ণ অলংকার দান করাকে কখনো জাকাত বলা যায় না (জাকাত দিতে হয় জমানো সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। অতঃপর এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, নফল সদ্কা দরিদ্র স্বামী ও সন্তানদেরকে দেয়া জায়েয। আর আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, স্বামী ও সন্তানকে জাকাত দেয়া নাজায়েয। সুতরাং এ কথাটি স্পষ্ট যে, বর্ণিত হাদিসে যে দানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে নফল দান। ফরজ জাকাত নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার তাহাবীর অভিমতের জবাব দিয়েছেন এভাবে— মহিলারা তাদের স্বামী ও সন্তানকে জাকাত দিতে পারবে। কিন্তু কোনো লোক তার স্ত্রী ও সন্তানকে জাকাত দিতে পারবে না। এর কারণ হচ্ছে, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণ করা স্বামী এবং পিতার উপর ফরজ। কিন্তু স্বামী ও সন্তানদের ভরণ পোষণ করা স্ত্রী এবং মাতার উপর ফরজ নয়। বর্ণিত হাদিসে স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ও সন্তানকে দান করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তা ফরজ জাকাত হতে পারবে না কেনো? এ রকম হওয়া সম্ভব যে, হজরত ইবনে মাসউদের স্ত্রী যে অলংকারগুলো চাদরে বেঁধেছিলেন, সেগুলোই ছিলো জাকাতের অংশ (সম্পূর্ণ অলংকারের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

আমি বলি, হজরত ইবনে মাসউদ ও তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। কারণ বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন রসুল স. এর ঈদগাহে যাওয়া এবং নামাজের শেষে বক্তৃতা করার ঘটনাটি একটি ভিন্ন ঘটনা। আবার মসজিদে ফজরের নামাজের পরে নসিহত প্রদান করার ঘটনাটিও পৃথক। আবার এতিমদের প্রতিপালন বিষয়ক বিবরণটিও নিশ্চয় অন্য একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে কারণে ভিন্ন সূত্রে এসেছে— ওই এতিমেরা ছিলো হজরত ইবনে মাসউদের বোনের ছেলে এবং মেয়ে। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে মাসউদ বললেন, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে দান করো। এক বর্ণনায় এ কথাও এসেছে— তুমি আমাকে দান করলে দানের সওয়াব পাবে না। এতে করে বুঝা যায় ফরজ জাকাত দিতে চেয়েছিলেন বলেই হজরত ইবনে মাসউদ তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন— সওয়াব পাবে না। আর নফল দানের ব্যাপারে বলেছিলেন, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে দান করো। আর বর্ণিত ঘটনা দু'টোও নিশ্চয়ই পৃথক দু'টো ঘটনা। এ ছাড়াও এ কথাটি লক্ষ্যণীয় যে হজরত জয়নাব বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি যদি আমার স্বামীকে দান করি তবে কি তা যথেষ্ট হবে? রসুল স. বলেছিলেন, হ্যাঁ। এ রকম করলে সওয়াব পাবে দ্বিগুণ। রসুল স. এর এ কথায় বুঝা যায় ওই দান ছিলো সাধারণ দান। ফরজ জাকাত নয়।

জাকাত গ্রহীতা হিসেবে প্রতিবেশীরাও অগ্রগণ্য। হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে হজরত জিবরাইল আমাকে এতো বেশী উপদেশ দিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছিলো সম্ভবতঃ প্রতিবেশীকেও শেষ পর্যন্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। আহমদ, বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি। জননী আয়েশা থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং সুনান রচয়িতাবৃন্দ।

হজরত আবু জর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তরকারী রান্নার সময় ঝোল বেশী করে রাখার চেষ্টা কোরো এবং তা প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রেখে কোরো।

ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানোও একটি অত্যুত্তম কর্ম। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ক্ষুধার্তদেরকে খুঁজে খুঁজে পরি-তৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো হচ্ছে সর্বোত্তম সদ্‌কা। বায়হাকী।

প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পূর্ণ করাও সদ্‌কা বা দান। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন— ওয়া আম্মাস সায়িলা ফালা তান্‌হার (যাচঞাকারীকে বিমুখ কোরো না) রসুল স. বলেছেন, যাচঞাকারীদের হক রয়েছে— যদিও সে অশ্বারোহী হয়ে আসে। বিশুদ্ধ সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও আবু দাউদ। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হজরত আলী থেকে। আর তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত হেরমাস বিন জিয়াদ থেকে।

হজরত উম্মে বুজাইদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় কোরো— যদিও রিক্ত হস্ত হও। মালেক, নাসাঈ, তিরমিজি, আবু দাউদ। আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন মুরসাল হিসেবে।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কে? ওই ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট, যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যাচঞাকারীকে কিছুই দেয় না।

দান গ্রহীতা হিসেবে এতিম ও বন্দীরাও অগ্রগণ্য। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— ওয়া ইউত্ ইয়ুমুনাত ত্বোয়ামা আলা হুব্বিহি মিসকীনাও ও ইয়াতিমাও ওয়া আসিরা (এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে অন্নদানকে ভালোবেসে যারা মিসকীন, এতিম এবং বন্দীকে আহার করায়)।

এতক্ষণ ধরে গ্রহীতাদের অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে কোরআন মজীদের আয়াত এবং হাদিস শরীফের উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করা হলো। এর মধ্যে আমরা নিঃস্বদের সাতটি শ্রেণীকে বিষয়ীভূত করেছি। আর আমাদের এই আলোচনাটি ইমাম আবু হানিফা এবং অধিকাংশ ইমামের অভিমতের অনুরূপ। এই ইমামগণের অভিমত হচ্ছে জাকাত গ্রহীতাদের সাতটি শ্রেণীর একটি সাধারণ যোগ্যতা হচ্ছে নিঃস্ব হওয়া।

ইমাম শাফেয়ী ফকিরদেরকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসেবে গণ্য করেছেন। আরো বলেছেন, জাকাত গ্রহীতাদের আটটি খাত সম্পূর্ণ পৃথক। একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলানো যাবে না। তাই তাঁর মতে মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব, মুকাতিব, ঋণগ্রস্ত মুজাহিদ ও মুসাফির বিত্তবান হলেও তাদেরকে জাকাত প্রদান করা জায়েয। নিঃস্বদেরকে যেহেতু একটি পৃথক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়েছে, সেহেতু অন্য খাতগুলো নিঃস্ব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি ধর্তব্য নয়। তিনি তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে আতা বিন ইয়াসারের একটি মুরসাল বর্ণনা উপস্থিত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, পাঁচ ধরনের ব্যক্তি ধনী হলেও জাকাত গ্রহণ করতে পারবে। তারা হচ্ছে— ১. মুজাহিদ ২. জাকাত সংগ্রাহক ৩. ঋণপ্রপীড়িত ৪. জাকাতের সম্পদের ক্রেতা এবং ৫. জাকাত গ্রহীতার ওই ধনী প্রতিবেশী যাকে জাকাত গ্রহীতা জাকাতলব্ধ অর্থ থেকে কিছু হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। মালেক, আবু দাউদ।

আমি বলি, এই হাদিসের সনদ এবং মতন উভয়টিই দ্বন্দ্বপূর্ণ। এখানে বর্ণনাকারী জায়েদ বিন আসলামের কথায় রয়েছে বৈসাদৃশ্য। একবার বলা হয়েছে, জায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেছেন আতা থেকে এবং কোনো সাহাবীর নামোল্লেখ ছাড়াই মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন আতা। এভাবে ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। মুয়াত্তা থেকে সংকলন করেছেন আবু দাউদ। আরেকবার বলা হয়েছে, জায়েদ বর্ণনা করেছেন লাইস সূত্রে। পুনরায় বলা হয়েছে, জায়েদ বর্ণনা করেছেন আতা থেকে এবং আতা বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ থেকে। আবু দাউদের গ্রন্থে এই বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে আতার মুরসাল বর্ণনাটি। আর আবু দাউদ এমরান বারকীর মধ্যস্থতায় আতার বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। সেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাকাত কোনো ধনী ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। ব্যতিক্রম কেবল ধর্মযোদ্ধা, পর্যটক এবং ওই ধনী ব্যক্তি যাকে তার দরিদ্র প্রতিবেশী জাকাতের অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে হাদিয়া প্রেরণ করে অথবা দাওয়াত দেয়। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, কোনো কোনো আলেমের মতে হাদিসটি দৃঢ়সূত্রবদ্ধ নয়। আর হাদিসটি হজরত মুয়াজের হাদিসের অনুরূপ বলিষ্ঠও নয়। বলিষ্ঠ হিসেবে যদি মেনে নেয়াও যায়, তবুও হজরত মুয়াজের হাদিসটি হবে অধিকতর অগ্রগণ্য। আর ওই হাদিসে ধনীদেরকে জাকাতের অর্থ প্রদান করা স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হয়েছে। এই হাদিসে আবার ধনীদের কোনো কোনো শ্রেণীকে জাকাতের সামগ্রী গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানতে হবে যে, হুকুম নিশ্চয় অনুমতি অপেক্ষা অগ্রগণ্য। মুজাহিদ জাকাতের মাল গ্রহণ করতে পারবে তখন, যখন সে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু পাবে না এবং ফায় এর মধ্য থেকে কিছু গ্রহণ করবে না। সুতরাং ঢালাওভাবে তারা জাকাতের হকদার নয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আর ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় অপেক্ষা ওই হাদিস অধিকতর অগ্রগণ্য, যা ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের প্রমাণরূপে আরো একটি হাদিস উপস্থিত করা হয়েছে। হাদিসটির বর্ণনাকারী জিয়াদ বিন হারেস সাদায়ী। তিনি রসুল স. এর

খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। এই দীর্ঘ হাদিসের এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, এক আগন্তুক এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে সদ্কার মাল থেকে কিছু দান করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ ইচ্ছামত সদ্কা (জাকাত) প্রদানের অধিকার কোনো নবী অথবা অনবীকে দান করেননি। ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন আটটি। তুমি ওই আটটি খাতের কোনো একটি খাতের মধ্যে যদি পড়ো, তবেই আমি তোমাকে জাকাত দিতে পারবো। আবু দাউদ।

আমি বলি, হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। এর বর্ণনাপরম্পরাভূত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিন গানেম আফ্রিকীকে জাহাবী বলেছেন, মাজহুলিল হাল (বিপর্যস্ত)। ইবনে হাব্বান বলেছেন, মুত্তাহিম (অপবাদগ্রস্ত)। তার শায়েখ আবদুর রহমান বিন জিয়াদকেও ইবনে মুঈন এবং নাসাঈ চিহ্নিত করেছেন দুর্বল বর্ণনাকারীরূপে। দারা কুতনী বলেছেন, বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি বলিষ্ঠ নন। আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি দুর্বল।

হানাফীগণের মাসআলাটি সুপ্রমাণিত। অর্থাৎ নিঃস্বতা হতে হবে জাকাতের সাতটি শ্রেণীর সাধারণ যোগ্যতা। এভাবে যে কোনো এক শ্রেণীকে জাকাত দিলে তা অসঙ্গত হয়েছে বলে সন্দেহ করা যাবে না। আবার শ্রেণী নিরূপণ ও ব্যক্তি নিরূপণও বৈধ হওয়া চাই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এক শ্রেণীর উপস্থিতিতে অন্য শ্রেণীকে জাকাতের সমস্ত মাল দেয়াকে জায়েয ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে জাকাত যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্দিষ্ট করা হয় এবং রাষ্ট্রনায়কের উপস্থিতিতে তা বণ্টন করা হয় তবে জাকাত সংগ্রাহক (আমেল) ছাড়া অন্য সাতটি শ্রেণীকে জাকাত প্রদান করা হবে অত্যাবশ্যক। বাগবী লিখেছেন, মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবের অংশও তখন অবলুপ্ত হবে। জাকাত বণ্টন করতে হবে অবশিষ্ট ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে। তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে সমান অংশ। এটা ওয়াজিব। গ্রহীতাদের মধ্যে যারা উপস্থিত থাকবে কেবল তাদের মধ্যেই জাকাত সমভাবে বণ্টন করতে হবে।

যদি প্রশাসক সংগৃহীত জাকাতের সম্পদ ভাগ করেন, তবে প্রতিটি শ্রেণীর সকল গ্রহীতাকে দান করবেন। আর যদি জাকাত প্রদাতা নিজে বণ্টন করতে চায়, তবে তার শহরের সকল হকদারকে প্রদান করবে। এ রকম সম্ভব না হলে দান করতে হবে প্রতিটি শ্রেণীর তিন ব্যক্তিকে, যদি সেখানে তিন অথবা তিনের অধিক ব্যক্তি উপস্থিত হয়। যদি কোনো শ্রেণীর কেবল এক ব্যক্তি হাজির থাকে, তবে তাকে দিতে হবে ওই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অংশ। কিন্তু দেখতে হবে যে তার অধিকারের সীমা যেনো বজায় থাকে (দেয়া হয় যেনো তার প্রয়োজনানুসারে)। তার প্রয়োজন পূরণের পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকলে অন্যদের মধ্যে দ্বিতীয়বার তা বণ্টন করে দিতে হবে।

শ্রেণী সমূহের অংশ সমান সমান হওয়া চাই। ব্যক্তির অংশ সমান সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে শাসক যদি নিজে জাকাত বণ্টন করেন এবং জাকাত গ্রহীতাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন সমান সমান হয়, তবে তাদেরকে কম বেশী দেয়া হবে নাজায়েয।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'আল উম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, লিল ফুকারায়ি' (নিঃস্ব) কথাটির 'লাম' অক্ষরটি এসেছে অধিকার প্রমাণের জন্য। আল্লাহ্পাক আটটি শ্রেণীকে জাকাতের হকদাররূপে ঘোষণা করেছেন। তাই প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা হবে ওয়াজিব। সে কারণেই প্রতিটি শ্রেণীর উল্লেখে আলিফ লাম ইসতেগ-রাকী (নিমজ্জক লাম) সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা ওয়াজিব। প্রতিটি শ্রেণীর সকল লোককে দেয়া সম্ভব না হলে প্রতিটি শ্রেণীর তিনজন লোককে দিতে হবে। আয়াতে প্রতিটি খাতকে বহুবচনবোধকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কমপক্ষে তিনজনকে দিলে বহুবচনবোধক শব্দরূপের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে।

আমরা বলি, আলোচ্য আয়াতে জাকাত গ্রহীতাদের প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে যে আলিফ লাম উল্লেখিত হয়েছে তা ইস্তেগরাকী নয়। কারণ জাকাতের সম্পদ পৃথিবীর সকল ফকিরদেরকে দেয়া সম্ভব নয়। আপন শহরের ফকিরদেরকেও সবসময় একত্র করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে আলিফ লাম হাকিকী অথবা আহাদী কোনোটাই নয়। সুতরাং কোনো শ্রেণীর তিনের অধিক ব্যক্তিকে প্রদান করাও ওয়াজিব নয়। এখানকার আলিফ লাম লামে ইস্তেগরাকী হলে উল্লেখিত শ্রেণীভুক্ত সকলকেই দান করা জরুরী হতো— যাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় তাদেরকেও। উদাহরণস্বরূপ প্রতিটি শ্রেণীর অংশ যদি এক শত টাকা হয় তবে ওই টাকা ভাগ করে দিতে হবে শহরের সকল ফকিরকে— যাদেরকে পাওয়া সম্ভব। আর 'কমপক্ষে তিন জনকে দিতে হবে' এ রকম বললে বহুবচনকে একটি নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করতে হয়। এতে করে বুঝা যায় এখানকার আলিফ লাম হচ্ছে লামে জিনসি (জাতিবাচক লাম)। আর জিনসিয়াত (জাতিবাচকতা) জামিয়াতের (বহুবচনবোধকতার পরিপন্থী। তাই নিঃস্বদের পুরো দলকে প্রদান করা জরুরী নয়। এক ব্যক্তিকে দিলে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে— সে যে কেউ হোক। এরপরও যদি বলা হয় যে, বহুবচনবোধকতার বিষয়টি অবশিষ্ট রয়েছে, তবে বহুবচনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে বহুবচন এবং একবচনের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে একবচনকে। এভাবে একক বণ্টনই হয়ে পড়বে জরুরী। এছাড়া ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, এখানকার 'লাম' প্রকাশ করেছে ইসতেহাককে (অধিকারকে)। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। এখানে লাম সংযোজিত হয়েছে খাতগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবার জন্য। এই বিশেষত্বটি একটি সাধারণ

বিশেষত্ব। কাজেই মালিকানা অথবা অধিকার অনুসারে 'লাম' প্রকাশ করেছে এই বক্তব্যটিকে যে, এটাই জাকাতের খাত। এছাড়া জাকাতের অন্য কোনো খাত নেই। সাহাবীগণের আমল (হাদিসে আসার) থেকেও আমাদের অভিমতটি পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে বায়হাকী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাসের বক্তব্য এবং ইবনে শায়বা বর্ণনা করেছেন হজরত ওমরের বক্তব্য। বক্তব্যটি এই— যে শ্রেণীকে তুমি প্রদান করো না কেনো, যথেষ্ট হবে (প্রতিটি শ্রেণীকে প্রদান করা জরুরী নয়)। তিবরানী বলেছেন, হজরত ওমর একবার একই শ্রেণীকে দান করেছিলেন জাকাতের সমুদয় অর্থ। আবু উবায়দা তার কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর নিকটে জাকাতের মাল এলো। তিনি স. সেগুলোকে বণ্টন করে দিলেন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুবদের মধ্যে। হজরত মুয়াজ ওই জাকাত প্রেরণ করেছিলেন ইয়েমেন থেকে। সেগুলো ছিলো স্বর্ণমুদ্রা। রসুল স. ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো দান করলেন আকরা বিন হাবেস, উয়াইনিয়া বিন হাসান, আলকামা বিন আলাসা এবং জায়েদ ইবনে লখাইলকে। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুওয়াল্লাফাতিল কুলুব। এরপর পুনরায় জাকাত হাজির হলো। তিনি স. সেগুলো দান করলেন আরেক শ্রেণীকে, ঋণ জর্জরিতদেরকে। কিছু প্রাপ্তির আশায় সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কাবিসা বিন মাখারেক। রসুল স.কে এভাবে দান করতে দেখে তিনি তার চঞ্চলতা প্রকাশ করলেন। রসুল স. বললেন, অপেক্ষা করো। আরো জাকাতের মাল আসবে। এলেই তোমাকে দেয়া হবে। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, এই বর্ণনাটির প্রতিকূলে আমি কোনো বক্তব্য অথবা কোনো আমলের সংবাদ পাইনি। বায়যাবী লিখেছেন, হজরত ওমর , হজরত হুজায়ফা, হজরত ইবনে আব্বাস ও আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বক্তব্য ও আমল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহীতাদের যে কোনো একটি শ্রেণীকে জাকাতের সমুদয় অর্থ প্রদান করা জায়েয। ইমামত্রয়ের অভিমত এ রকম। ইমাম শাফেয়ীর কোনো কোনো অনুসারীও এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। আমার পিতাও এ রকম ফতোয়া প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, এখানে উল্লেখিত আটটি খাত ছাড়া অন্য কোনো খাতে জাকাতের অর্থ খরচ করা যাবে না। কিন্তু এ রকম বলা হয়নি যে, কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীকে জাকাত প্রদান করা ওয়াজিব।

মাসআলাঃ ফকির ও মিসকীন ছাড়া অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত ধনীদেরকেও জাকাত দেয়া জায়েয। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কারা ধনী এবং কারা ধনী নয়, সে সম্পর্কে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধনী, যে জাকাত ওয়াজিব হয়, এমতোপরিমাণ সম্পদের অধিকারী। কোনো কোনো আলেম

বলেছেন, যার নিকট সকাল সন্ধ্যার আহার রয়েছে, তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা জায়েয নয়। রসুল স. বলেছেন, অপরের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, এতটুকু সামর্থ্য যার রয়েছে, সে যাচঞা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে জাহান্নামের আগুন। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ধনী ব্যক্তি তবে কে? তিনি স. বললেন, যে যাচঞা করা থেকে বিরত থাকে (যার রয়েছে দু'বেলা আহারের সংস্থান)। হজরত সুহাইল বিন হানযালা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ। ইবনে হাব্বান বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যারা চল্লিশ দিরহামের মালিক, তারা জাকাত গ্রহণ করতে পারবে না।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, এক আউকিয়ার অধিকারী যদি প্রার্থী হয়, তবে তাকে জাকাত গ্রহীতা হিসেবে গণ্য করা যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করেছিলাম আমার উটনীটি তো এক আউকিয়ার চেয়ে অধিক মূল্যের। এ কথা ভেবে আমি পুনরায় মাসআলা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে রসুল স. এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তাঁকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করিনি। হিশামের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— রসুল স. এর জামানায় এক আউকিয়ার মূল্য নির্ধারিত হয়েছিলো চল্লিশ দিরহাম। আবু দাউদ, নাসাঈ।

আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যার নিকট চল্লিশ দিরহাম থাকবে সে যদি সওয়াল করে, তবে সে অন্যায় করবে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পঞ্চাশ দিরহামের অধিকারীদের জন্য জাকাত হালাল নয়। ইসহাক এবং আবু সওরও এই অভিমতের প্রবক্তা। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আহমদের অভিমতও এ রকম। হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যার নিকট এতটুকু সম্পদ থাকে যার কারণে তাকে সম্পদাধিকারী বলা যায়, সে সওয়াল করলে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে চাঁচা ছোলা মুখমণ্ডল নিয়ে (মুখাবয়বে গোশত থাকবে না, থাকবে কেবল হাড়)। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সম্পদাধিকারী কে? তিনি স. বললেন, পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা অথবা তার সমমূল্যের স্বর্ণের অধিকারী। আবু দাউদ, নাসাঈ। হাদিসটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট।

উপরে বর্ণিত দলিল সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যার নিকট সকাল সন্ধ্যার আহার রয়েছে অথবা দিরহাম রয়েছে চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশটি, তার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হওয়া হারাম। কিন্তু এতে করে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রার্থনায় তার জন্য জাকাত গ্রহণ করা হারাম। তাই আমরা বলি, দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা যাদের রয়েছে, তাদের জন্য হাত পাতা হারাম। কিন্তু বিনা চাওয়ায় তাকে জাকাতের অর্থ প্রদান করলে তা গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, একবার রসুল স.

আমাকে কিছু দান করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার চেয়েও অভাবী লোক রয়েছে। রসুল স. বললেন, তুমি তো যাচঞ্ঞা করোনি। বিনা যাচঞ্ঞায় পেলে দান গ্রহণে বিমুখ হয়ো না। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত ওমরের নিকট দু'বেলা আহারের সংস্থান ছিলো। তাই তিনি বলেছিলেন, আমার চেয়েও অভাবী লোক রয়েছে। রসুল স. তাঁকে দান গ্রহণের হুকুম দিয়েছিলেন। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ জাকাত গ্রহণ করা না করা সম্পর্কে বলেছেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকুক অথবা নাই থাকুক— উভয় অবস্থায় জাকাত গ্রহণ করা জায়েয। উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একটি দিরহামের অধিকারী হলেও তাকে ধনী বলা যাবে। আর বহুপোষ্যধারী উপার্জন-রহিত ব্যক্তি হাজার দিরহামের অধিকারী হলেও তাকে ধনী বলা যাবে না। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসরণে বাগবী বর্ণনা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকটে তার নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পূরণের মতো সংস্থান থাকে তবে তাকে ধনী বলা যায়। হজরত কাবিসা বিন হারেসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আমাকে একবার বললেন, হে কাবিসা! শোনো, কেবল তিন ধরনের লোকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল। তার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার নিকটে রক্ষিত জামানত নষ্ট করার ক্ষতিপূরণরূপে ঋণের বোঝা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভিক্ষা করে (অতিরিক্ত যাচঞ্ঞা করে না)। প্রয়োজন পূর্ণ হলে যাচঞ্ঞা করা থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সে, যার বসতবাটী এবং ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হয়েছে। ওই ব্যক্তিও এতটুকু পরিমাণ ভিক্ষা করতে পারবে, যাতে করে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। তাকেও অতিরিক্ত প্রার্থনা থেকে বিরত থাকতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে দেউলিয়া। তিনজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে তবে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল। কিন্তু তাকেও সংযত হতে হবে। ভিক্ষা করতে হবে কেবল জীবন বাঁচানোর জন্য। মুসলিম।

হজরত ইমাম হোসাইন বিন হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের উপর যাচঞ্ঞাকারীর অধিকার রয়েছে— যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে। আহমদ, আবু দাউদ। লক্ষণীয় যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, ভিক্ষা করতে হবে কেবল জীবন রক্ষার জন্য। আরো বর্ণিত হয়েছে, চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ দিরহামের অধিকারীদের জন্য জাকাত গ্রহণ হালাল নয়। এর পরের হাদিসে বলা হয়েছে, অশ্বারোহী যাচঞ্ঞাকারীরও হক রয়েছে। এ কথাটিও লক্ষ্য করতে হবে যে, অশ্বারোহীও অভাবী হতে পারে। আর সকল প্রকার অভাবগ্রস্তকে জাকাত দেয়া জায়েয। এভাবে প্রমাণিত হয় যে— প্রয়োজন ব্যতীত ভিক্ষা করা হারাম। আর প্রয়োজন দেখা দিলে জায়েয। কারো নিকট চাওয়া যাবে কেবল তখনই, যখন তার দু'বেলা আহারের সংস্থানও থাকবে না। এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে

জাকাত কিন্তু ভিক্ষা নয়। তাই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রার্থী না হলেও তাদেরকে জাকাত পৌঁছে দিতে হবে। তবে তাদের মধ্যে থাকতে হবে একটি সাধারণ যোগ্যতা। আর সেই যোগ্যতাটি হচ্ছে অভাবগ্রস্ততা। আর অশ্বারোহী যাচঞাকারী সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সে আসলেই অভাবগ্রস্ত। তাই তার বাহনে চড়ে সে অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। সে হতে পারে ধর্মযোদ্ধা অথবা ঋণভারাক্রান্ত। এ কথাটিও জেনে রাখতে হবে যে, ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য দ্বারা জাকাতের নেসাব পুরা হয় না (কেবল একটি ঘোড়ার অধিকারীর উপর জাকাত ফরজ হয় না)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, ওই ব্যক্তি ধনী, যার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর এমতোপরিমাণ সম্পদ থাকে যার উপরে জাকাত ওয়াজিব হয়। হজরত মুয়াজকে রসুল স. নির্দেশ দিয়েছিলেন— তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে জাকাত গ্রহণ করে বন্টন করে দিতে হবে তাদেরই দরিদ্র জনতার মধ্যে। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, যাকে প্রদান করা হবে, সে ওই ব্যক্তি নয়— যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়। তাই সাহেবে নেসাবকে জাকাত প্রদান করা নাজায়েয। কারণ সে তো জাকাত প্রদাতা। সে আবার জাকাত গ্রহীতা হতে পারে কিরূপে? হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আউকিয়া হোক অথবা আউকিয়ার সমতুল্য হোক— উভয়ের বিধান একই রকম। স্বনামে বেনামে সকল অবস্থায় সকল যোগ্য ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব হবে। রসুল স. বলেছেন, কৃষিকাজের উপকরণরূপে ব্যবহৃত বাহন, ভারবাহী পশু এবং গৃহপালিত পশুর উপরে জাকাত নেই। এতে করে বুঝা যায় আল্লাহ্তায়ালা কেবল সহজে উৎপাদিত সম্পদের উপর শর্ত সাপেক্ষে জাকাত ফরজ করেছেন। অবশিষ্ট কথা এই যে, প্রয়োজন পূরণের পর যদি কারো নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তা প্রয়োজন পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক হয় তবে ওই সম্পদ না থাকার মতোই হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে— একজনের নিকট কেবল পিপাসা পূরণের মতো পানি আছে। এখন ওই পানি না থাকার মতোই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। তেমনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মালেকে নেসাব হয়, আর ওই নেসাব যদি তার ঋণ অপেক্ষা বেশী না হয়, অথবা সে যদি মুজাহিদ হয়, অথবা মুসাফির হয়— তার ঘোড়ার মূল্য নেসাব পরিমাণ হোক অথবা না হোক, এ ধরনের লোককে জাকাত দেয়া যাবে। তেমনি কোনো শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থীর নিকট যদি কোনো পাঠোপযোগী পুস্তক থাকে, অথবা যদি থাকে বসবাসের স্থান, তবুও তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে। হাদিস শরীফে তাই বলা হয়েছে মুজাহিদ, ঋণগ্রস্ত মুসাফির— এ রকম পাঁচ ধরনের ব্যক্তি সম্পদশালী হলেও তাদেরকে জাকাত দেয়া যাবে।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি উপার্জনের মাধ্যমে তার নিত্যদিনের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম, এতদসত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, তাকেও জাকাত প্রদান করা জায়েয। কেননা সেও আলোচ্য আয়াতের 'ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারায়ি'— এই সাধারণ নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ এ ধরনের ব্যক্তিকে জাকাত দেয়া নাজায়েয বলেছেন। কেননা হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যারা ধনী, ক্ষমতাশালী ও স্বাস্থ্যবান তাদের জন্য সদ্‌কা (জাকাত) হালাল নয়। আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আবু দাউদ, তিরমিজি। হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনে আস থেকে। দারাকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর আল ইলাল গ্রন্থে। আবু ইয়া'লী বর্ণনা করেছেন হজরত তালহা থেকে। হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. এর নিকটে জাকাতের কিছু সম্পদ এলো। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক তাদের বাহনে চড়ে রসুল স. এর দরবারে হাজির হলো। রসুল স. তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! এই সম্পদ ধনীদের জন্য নয়। সরকারী কর্মচারী এবং স্বাস্থ্যবান উপার্জনক্ষমদের জন্যও নয়। আহমদ, দারা কুতনী।

ওবায়দুল্লাহ্ বিন আদী বলেছেন, একবার আমাকে দু'জন লোক বললো, আমরা রসুল স. এর দরবারে কিছু চাওয়ার জন্য হাজির হয়েছিলাম। রসুল স. গভীরভাবে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো। কিন্তু এর মধ্যে ধনীদের কোনো অংশ নেই। স্বাস্থ্যবান ও উপার্জনক্ষমদেরও অংশ নেই (তোমরাতো স্বাস্থ্যবান ও উপার্জনক্ষম)। আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ। 'তানকিহ্' রচয়িতা বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। এর সূত্র পরম্পরা উত্তম। এ বিষয়ের হাদিস সমূহ পরিপূর্ণ বিবরণ সমৃদ্ধ। ইবনে আদীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে ওমর থেকে। সুনানে তিরমিজি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত হাবসী বিন জুনাদা থেকে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু জামিল সূত্রে বনী হেলালের এক ব্যক্তি থেকে এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুর রহমান থেকে।

আমি বলি, 'যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো, কিন্তু এতে ধনীদের ও কর্মক্ষমদের কোনো অংশ নেই' —রসুল স.এর এই বাণীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কর্মক্ষম অভাবী সম্প্রদায়কেও জাকাত দেয়া জায়েয। যদি এ রকম না হতো, তবে রসুল স. 'যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদেরকে দান করবো'— এ রকম বলতেন না। এ সম্পর্কে হজরত ওমরের হাদিসটিও আমাদের পক্ষের দলিল। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাকে নয়,

আমার চেয়েও যারা অভাবী তাদেরকে দান করুন। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিমের বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, রসুল স. তখন বললেন, এগুলো নিয়ে যাও। এগুলোর দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ করো এবং অন্যকেও দান করো। সালেম বলেছেন, হজরত ইবনে ওমর এই হাদিস অনুযায়ী আমল করতেন। তিনি কারো নিকট কিছু চাইতেন না। কিন্তু কেউ কিছু দিলে তা প্রত্যাখ্যানও করতেন না।

একটি সন্দেহঃ রসুল স. হজরত ওমরকে যা দিয়েছিলেন, তা ছিলো পারিশ্রমিক। অভাবী হিসেবে তিনি স. হজরত ওমরকে দান করেননি। তাই বলেছিলেন, এগুলো নিয়ে যাও, খাও এবং খয়রাত করো। রসুল স. এর ওই দান যে পারিশ্রমিক ছিলো, তার প্রমাণ রয়েছে মুসলিমের একটি বর্ণনায়। আবু হুমাইদ সায়েদীও এ রকম বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি এই— হজরত ওমর বিন খাত্তাব আমাকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। জাকাত আদায় করে দেয়ার পর তিনি আমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। আমি বলি, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি তো এ কাজ করেছি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। আমার বিনিময় তো রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার দায়িত্বে। তিনি বলেন, যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে যাও। রসুল স. এর জামানায় আমি জাকাত সংগ্রাহকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। এর জন্য রসুল স. আমাকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। তখন আমি তোমার মতোই আপত্তি তুলেছিলাম। রসুল স. বলেছিলেন, বিনা যাচঞায় যা পাও, তা খাও ও খয়রাত করো।

আমি বলি, পূর্বে বর্ণিত হাদিসের শব্দসমূহ সাধারণ অর্থবোধক। সেখানে বলা হয়েছে, যাচঞা ব্যতিরেকে যা পাও তা গ্রহণ করো। সুতরাং— ওই হাদিসটিকে অন্য কোনো হাদিসের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা সমীচীন নয় (হজরত ওমরকে যে দান করেছিলেন সে দানকে পারিশ্রমিক বলা ঠিক নয়)। হাদিসটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, রসুল স. সুঠামদেহী যাচঞাকারীকেও জাকাতের সামগ্রী প্রদান করেছেন। যেমন মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তখন তাঁর শরীরে জড়ানো ছিলো মোটা জরির পাড়ওয়ালা একটি নাজরানী চাদর। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিলো। ফলে তাঁর গ্রীবাদেশের কাছে চাদরের একস্থান ছিঁড়ে গেলো। লোকটি বললো, মোহাম্মদ! তোমার জমানো সম্পদ থেকে আমাকেও কিছু দান করো। রসুল স. তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, এই অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদিস এ কথার সাক্ষী।

আমি বলি, উদ্ধৃত হাদিস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে এ কথাই বলতে হয় যে, সুঠাম শরীর বিশিষ্ট দরিদ্রকে জাকাত প্রদান করা সিদ্ধ। সে প্রার্থী হোক অথবা না হোক। কিন্তু এ রকম লোকের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অশোভনীয় (মাকরূহ)।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য জাকাত হালাল নয়। এ কথার অর্থ হবে তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়। এ ধরনের লোককে ভিক্ষা দেয়ার পর যদি জাকাত দেয়া হয় তবে তা তার জন্য হালাল হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারীদের জন্য ভিক্ষা হারাম। তবে ভিক্ষা ছাড়া সে যদি কিছু পায় অথবা ভিক্ষার পর যদি কোথাও থেকে কিছু পায় তবে তা তার জন্য হারাম হবে না।

মাসআলাঃ অধিকাংশ ইমামগণের মতে রসুল স. এর জন্য ফরজ নফল কোনো প্রকার সদ্‌কা হালাল ছিলো না। তবে নফল সদ্‌কা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জমহুরের মতে প্রমাণরূপে এসেছে হজরত আনাসের একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে— একদিন পথ চলতে চলতে রসুল স. দেখলেন এক স্থানে পড়ে আছে কিছু ফলমূল। তিনি স. বললেন, এগুলো সদ্‌কা বলে যদি আমার সন্দেহ না হতো তবে আমি এগুলো খেয়ে ফেলতাম। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর খেদমতে কোনো আহার্য দ্রব্য উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন এগুলো কি হাদিয়া না সদ্‌কা? সদ্‌কা বলা হলে তিনি স. তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, তোমরা আহার করো। তিনি স. নিজে ওই আহার্য ভক্ষণ করতেন না। আর হাদিয়া বলা হলে তিনি স. হাত বাড়াতেন এবং সকলের সঙ্গে নিজেও আহার করতেন। বোখারী, মুসলিম। তাহাবীও অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন বাহ্‌জাদ বিন হাকিমের পিতামহ থেকে।

রসুল স. এর বংশধরদের জন্য সদ্‌কা হালাল ছিলো না। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, শিশুকালে একবার হজরত হাসান ইবনে হজরত আলী সদ্‌কার একটি খেজুর মুখে দিলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে খেজুরটি তাঁর মুখ থেকে বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমরা সদ্‌কা খেতে পারি না। বোখারী, মুসলিম।

মাসআলা ঃ রসুল স. এর পরোলোক গমনের পর তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও খয়রাত হালাল কি না, সে সম্পর্কে আলেমগণের চারটি অভিমত রয়েছে। অভিমতগুলো নিম্নরূপ—

১. সম্পূর্ণতই জায়েয। অর্থাৎ রসুল স. এর পৃথিবী পরিত্যাগের পর তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত, সদ্‌কা সবই হালাল। এক বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফারও অভিমত অনুরূপ। অবশ্য এ সম্পর্কে শরিয়তের কোনো

স্পষ্ট দলিল নেই। তাই মুজতাহিদ ইমামগণ শরিয়ত সমর্থিত কিয়াসের (অনুমানের) ভিত্তিতে বিষয়টির সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন এভাবে— রসুল স. এর পৃথিবীর জীবনে তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও নফল সদ্কা হারাম ছিলো। রসুল স. তখন তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করতেন গণিমতের খুমুস (পঞ্চমাংশ) থেকে। যখন তাঁর মহাতিরোধান ঘটলো তখন ওই খুমুস অবলুপ্ত হয়ে গেলো। তাই পরবর্তীতে তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত ও নফল সদ্কা হারাম হওয়ার বিধানটিও অবলুপ্ত হয়েছে।

২. সম্পূর্ণতই নাজায়েয। অর্থাৎ রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পরেও তাঁর বংশধরদের জন্য জাকাত এবং নফল সদ্কা অসিদ্ধ। সাহেবাঈন এই অভিমতের প্রবক্তা। তাহাবী এবং ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বিষয়টি রসুল স. এর বংশধরদের অভিপ্রায় নির্ভর। কেননা রসুল স. বলেছেন, আমরা (আমি ও আমার বংশধররা) সদ্কা ভক্ষণ করি না। — এই ঘোষণাটি একটি সাধারণ ঘোষণা। অন্য বর্ণনায় এসেছে আমাদের জন্য সদ্কা হালাল নয়। মুসলিম, তিবরানী ও তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা এবং হজরত রুশদ বিন মালেক থেকে। হজরত হাসান থেকে ইমাম আহমদ ও তাহাবীর একটি বর্ণনাতেও একথাগুলো এসেছে।

৩. জাকাত জায়েয, কিন্তু খয়রাত জায়েয নয়। এ রকম বলেছেন কেবল ইমাম মালেক। তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— জাকাত একটি ফরজ দায়িত্ব। আর জাকাতে রয়েছে জাকাত গ্রহীতাদের অপরিহার্য অধিকার। সুতরাং এতে অবমাননাকর কিছু নেই। কিন্তু খয়রাত বা নফল দানের মধ্যে রয়েছে করুণা ও অবমাননা। উল্লেখ্য যে এই অভিমত খণ্ডনের জন্য ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস সমূহই যথেষ্ট।

৪. খয়রাত জায়েয, জাকাত জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ অভিমত এটাই। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। এক বর্ণনানুসারে ইমাম মালেকের অভিমতও এরকম। এ সম্পর্কে অবশ্য ইমাম মালেকের চারটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে— যার সবগুলোই প্রসিদ্ধ। আলোচ্য অভিমতের দলিল এই যে, রসুল স. এর বংশধরদের জন্য যে সদ্কা নিষিদ্ধ হয়েছিলো তা হচ্ছে ফরজ সদ্কা (জাকাত)। হজরত মুত্তালিব বিন রবীয়া বিন হারেসের হাদিসে এ কথাই বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, হজরত রবীয়া বিন হারেস এবং হজরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব একবার আমাকে ও

ফজল বিন আব্বাসকে রসুল স. এর নিকটে হাজির করে আবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ দু'জনকে জাকাত সংগ্রাহক হিসেবে নিযুক্তি দান করুন। তাহলে এরাও অন্য সংগ্রাহকদের মতো পারিশ্রমিক পাবে। হজরত আলী বললেন, এ রকম করবেন না। কিন্তু তাঁর কথা কেউ মানলেন না।। আমরা উম্মত জননী হজরত জয়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে অবস্থানরত রসুল স. এর নিকটে হাজির হলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা এখন বিবাহের উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের পরিবার অনেক বড়। তাই পারিবারিকভাবে বিবাহের জন্য অর্থ সংস্থান সম্ভব নয়। তাই আপনি যদি আমাদেরকে জাকাত সংগ্রাহকরূপে নির্বাচন করেন, তবে আমরাও অন্য সংগ্রাহকদের মতো পারিশ্রমিক পাবো। এভাবে বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করতে সমর্থ হবো। আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনও হবে সচ্ছল। রসুল স. আমাদের কথা শুনে দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চুপ রইলেন। এরপর বললেন, মোহাম্মদের বংশধরদের জন্য এ কাজটি অশোভন। তোমরা বরং মাহমিয়া বিন জুযা আসাদী এবং নওফেল বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালেবকে ডেকে আনো। মাহমিয়া ছিলেন, রসুল স. এর খুমুসের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমরা নির্দেশমতো উভয়কে ডেকে আনলাম। রসুল স. মাহমিয়াকে বললেন, এই ছেলেটির (ফজল বিন আব্বাসের) সঙ্গে তোমার মেয়ে বিয়ে দাও। এরপর রসুল স. নওফেল বিন হারেসকে বললেন, তুমি তোমার মেয়ে বিয়ে দাও এই ছেলেটির (রবীয়া বিন হারেসের) সঙ্গে। রসুল স. এর নির্দেশ তাঁরা দুজনেই পালন করলেন। রসুল স. পুনঃনির্দেশ দিলেন, খুমুসের অংশ থেকে দাও এদের মোহরানার অর্থ। মুসলিম। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. এর বংশের (হাশেমী বংশের) কেউ জাকাত সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত হলেও জাকাতের টাকা থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে না।

আর একটি ঘটনা থেকে রসুল স. এর বংশধরদের জন্য জাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বর্ণনাটি এই— মদীনার এক ব্যবসায়ী দল কোনো এক স্থান থেকে কিছু পণ্য সামগ্রী নিয়ে এলো। রসুল স. সেগুলো থেকে কিছু ক্রয় করলেন এবং কিছু লাভে সেগুলোকে আবার বিক্রয় করে ফেললেন। তারপর লাভের টাকা তাঁর বংশের বিধবাদেরকে সদ্‌কা হিসেবে দান করলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে আর কখনো আমি নগদ মূল্য ছাড়া কিছু কিনবো না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, একবার ইমাম জাফর সাদেক মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থলে একটি কূপ থেকে পানি পান করলেন। সেখানে উপস্থিত হজরত ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ বললেন, আপনি সদ্‌কার পানি পান করেছেন (কূপটি সদ্‌কা করা হয়েছে)।

ইমাম জাফর সাদেক বললেন, আমাদের জন্য কেবল সদ্‌কায়ে মাফরুদা (জাকাত) হারাম (আর এই পানি তো সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সদ্‌কা করা হয়েছে)। এই হাদিসটিকে যদি কেউ রসুল স. এর বংশধরদের জন্য নফল সদ্‌কা হালাল হওয়ার প্রমাণরূপে পেশ করেন, তবে তা হবে অযৌক্তিক। কারণ সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করা বস্তুর মধ্যে রসুল স. এর বংশধরগণও স্বাভাবিক-ভাবে অন্তর্ভুক্ত। তাই ইমাম জাফর সাদেক বলেছিলেন, আমাদের জন্য কেবল ফরজ সদ্‌কা হারাম।

বোখারী ও অন্যান্যদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু রেখে যাবো না। যা রেখে যাবো তা হবে সর্ব সাধারণের জন্য সদ্‌কা। রসুল স. তাঁর পরিবার পরিজনকে সারা বৎসরের সংসারিক খরচ প্রদান করতেন এবং এর উদ্বৃত্ত সকল কিছু ব্যয় করতেন আল্লাহ্‌র পথে— জেহাদের প্রয়োজনে, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধাশ্ব ক্রয়ের জন্য। রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আলী এবং হজরত আব্বাস এ সকল বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরাও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু রেখে যাননি। রসুল স. এর মহাতিরোধানের পর নফল খয়রাত অথবা নফল সদ্‌কার বিষয়টি বহাল ছিলো। তিনি স. তাঁর পৃথিবীর জীবনে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে অতিরিক্ত হিসেবে যেমন দান করতেন, তেমনি এ রকম দান জারী ছিলো তাঁর মহাপ্রস্থানের পরেও। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, বনী হাশেমের জন্য প্রথম থেকেই নফল সদ্‌কা হারাম ছিলো না, হারাম ছিলো কেবল ফরজ সদ্‌কা (জাকাত)।

মাসআলাঃ অধিকাংশ ইমামের মতে বনী হাশেমের জাকাতও বনী হাশেমের জন্য হালাল নয়। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ এটাকে জায়েয বলেছিলেন। কেননা সদ্‌কা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগের অবলম্বন। তাই অন্য লোকের সদ্‌কা (জাকাত) বনী হাশেমের জন্য হারাম। কিন্তু তাঁদের নিজেদের বংশের লোকের জাকাত তাঁদের নিজেদের জন্য অবমাননাকর নয়। তাই তা গ্রহণ করাও নাজায়েয নয়।

আমি বলি, বনী হাশেমের সম্মানের দাবি এই যে, সকল গোত্র অপেক্ষা তাঁরা শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁরা অন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবেন। তাই হাশেমীরাও হাশেমীদের জাকাত গ্রহণ করতে পারবেন না।

মাসআলাঃ বনী হাশেমের জন্য জাকাতের অর্থ গ্রহণ হারাম— এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে পাঁচটি বংশধারার উপর। বংশধারাগুলো হচ্ছে— ১. হজরত আলীর বংশধর ২. হজরত আব্বাসের বংশধর ৩. হজরত জাফরের বংশধর ৪. হজরত আকিলের বংশধর ৫. হজরত হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। ইমামে আজম এবং ইমাম মালেক এই অভিমতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর মতে বনী মুত্তালিবও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রসুল স. তাঁদেরকে স্বজন হিসেবে খুমুসের অংশ প্রদান করেছিলেন। ইতোপূর্বে খুমুস প্রসঙ্গে হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েমের বর্ণনা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাঃ ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মোহাম্মদের মতে বনী হাশেমের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের জন্যও জাকাত হারাম হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অভিমতও অনুরূপ। কেউ কেউ আবার বলেছেন, বনী হাশেমের জাকাত বনী হাশেমের জন্য হারাম নয়। ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, বনী হাশেমের জাকাত বনী হাশেম ছাড়া আর কাউকে দেয়া যাবে না। ইমাম আবু হানিফার অভিমতের প্রমাণ এই— রসুল স. মাখজুমী সম্প্রদায়ের এক লোককে জাকাত সংগ্রহকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি হজরত আবু রাফেকে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। তাহলে তুমিও আমার মতো কিছু পাবে। হজরত আবু রাফে বললেন, আমি আগে রসুল স.কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি যেতেই পারবো না। হজরত আবু রাফে রসুল স. এর নিকটে এ কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, আমার বংশের লোকদের জন্য সদ্‌কা হালাল নয়। আমাদের ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের জন্যও হালাল নয়। হাদিসটি হজরত আবু রাফে থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং হাকেম। তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। হজরত আবু রাফের আরেক নাম ছিলো আরকাম বিন আবিল আরকাম।

মাসআলাঃ জাকাতের সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ্। রসুল স. হজরত মুয়াজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে জাকাত গ্রহণ করে তাদেরই দরিদ্রদের মধ্যে জাকাত বণ্টন করে দিয়ো। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের সময়ে একবার খোরাসানের জাকাতের মাল সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তিনি পরে ওই মাল সিরিয়া থেকে পুনরায় খোরাসানে ফিরিয়ে দেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র বিধান' (ফারিদ্বাতাম্ মিনাল্লহ্)। এ কথার অর্থ — এই আয়াতে বর্ণিত বিধান আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে — যা অবশ্য পালনীয়।

শেষে বলা হয়েছে— ওয়াল্লহু আ'লীমুন্ হাকীম (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর ক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী। তাঁর সিদ্ধান্ত হেকমত বিবর্জিত নয়। তাই তাঁর প্রদত্ত এই বিধান অযৌক্তিক নয়। অচিরন্তনও নয়। কারণ তিনি মহাবিজ্ঞানময়।

মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এবং সুদ্দীর উক্তিরূপে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাল্লাস বিন সুবিদ বিন সামেত, মুখসি বিন হুমাইর, ওয়াদিয়া বিন সাবেত প্রমুখ মুনাফিক একবার ঠিক করলো, তারা রসুল স.কে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবে এবং তাঁর প্রতি দোষারোপ করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বললো, এ রকম করা ঠিক নয়। আমার আশংকা হচ্ছে আমাদের এই শলাপরামর্শের সংবাদ মোহাম্মদের নিকট পৌঁছে যাবে। আর এ রকম হলে তা হবে তোমাদের জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ। আরেক জন বললো, মোহাম্মদ তো সকলের কথা মনোযোগের সঙ্গে শোনেন। আমি কসম করে বলতে পারি, তিনি আমাদের কথাও শুনবেন। হাল্লাস বললো, আমি যা খুশী বলবো, শেষে মোহাম্মদের নিকটে যেয়ে সব কিছু অস্বীকার করবো এবং কসমও খাবো। তখন তিনি আমাদের কথা মেনে নিবেন। তিনি তো কেবল শ্রবণকারী। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬১

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❒ এবং উহাদিগের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে 'সে তো যাহা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে।' বলো 'তাহার কান তোমাদিগের জন্য যাহা মঙ্গল তাহাই শুনে। সে আল্লাহে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী সে তাহাদিগের জন্য আশীর্বাদ এবং যাহারা আল্লাহের রসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে 'নবীকে ক্লেশ দেয়'— কথাটির অর্থ, মুনাফিকেরা পরোক্ষে নবীর নিন্দা করে থাকে। তাঁর প্রতি আরোপ করে অনেক কদর্য বিশেষণ। মনে করে এসকল কথাতো তিনি শুনতে পাবেন না। সামনাসামনি কথা বললেই কেবল তিনি শুনতে পান। দূরের কথা কীভাবে শুনবেন? এখানে 'উযুন' শব্দটির অর্থ কান। মর্মার্থ হচ্ছে— স্বকর্ণে যা শোনে তাই বিশ্বাস করে। গুপ্তচরের চোখ সদাসতর্ক থাকে বলে কেবল 'চোখ' বলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়। মুনাফিকেরাও ব্যঙ্গার্থে রসুল স.কে কেবল 'কান' বলে সম্বোধন করে এবং অগোচরে তাঁর নিন্দামন্দ করতে থাকে। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুনাফিক নাবতাল বিন হারেস রসুল স. এর দরবারে বসে তাঁর কথা

শুনতো এবং সব কথা বলে দিতো অন্যান্য মুনাফিককে। তার এই অপকর্ম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বলা হয়েছে— 'এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, সে তো যা শোনে তাই বিশ্বাস করে।'

মোহাম্মদ বিন ইসহাক লিখেছেন, নাবতাল ছিলো লাল চুল ও চক্ষু বিশিষ্ট পুঁতিগন্ধময় ও অনিষ্টকর একটি চরিত্র। রসুল স. বলেছেন, যে শয়তানকে দেখতে চায় সে যেনো নাবতালকে দেখে নেয়। নাবতাল রসুল স. এর কথা শুনে অন্যান্য মুনাফিকদেরকে জানাতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে বলতো এভাবে বোলো না। মোহাম্মদের গোপন কান আছে। ওই কানই তাকে সব কিছু বলে দেবে। সে বলতো, আমি যা খুশী তাই বলবো। ধরা পড়লে তার নিকট মিথ্যা কসম করে বলবো, আমি এ রকম বলিনি। এভাবে কসম করতে দেখলে তিনি আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন। তার এই কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে।' এখানে 'উযুন' শব্দটি কল্যাণ প্রকাশক। যেমন বলা হয় রজুলু সিদ্‌ক্বিন (মঙ্গলের জন্য কান, সত্যবাদীতার জন্য মানুষ)। এখানে তাই অর্থ হবে নিঃসন্দেহে তিনি কর্ণধারী। আর তাঁর কর্ণ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এ রকমও অর্থ হতে পারে যে, তিনি (রসুল) তোমাদের পুণ্যবিষয়ক ও কল্যাণকর কথা কান লাগিয়ে শোনেন। অনৈক্য ও অন্যায়ের কথা শোনেন না। অগোচরে নিন্দাবাদও শোনেন না। শোনেন কেবল অনুযোগ স্থাপনকারীদের প্রয়োজন পূরণের নিবেদন। রসুল স. বলেছেন, মু'মিনেরা সজ্জন ও সচ্চরিত্র। আর কাফেরেরা অসৎ ও হতভাগ্য। আবু দাউদ, তিরমিজি। হাদিসটি হাকেম বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে এবং বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকম হওয়াও সম্ভব যে, রসুল স. শোনেন কেবল সত্য ও কল্যাণ সম্পর্কিত কথা এবং অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা। এর পরিপন্থী তিনি স. কোনো কিছু শোনেন না।

এরপর বলা হয়েছে — 'সে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদেরকেও বিশ্বাস করে।' এ কথার অর্থ— তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণরূপে আস্থা-শীল। যারা তাঁর নিকট তাদের ইমানকে প্রকাশ করে, তিনি তাদেরকে সত্যবাদী বলে জানেন এবং গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কেবল বিশুদ্ধ বিশ্বাসীদেরকেই তিনি সত্যবাদী মনে করেন। মুনাফিকদেরকে সত্যবাদী মনে করেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের আবেদন ও নিবেদন শ্রবণ করেন। এখানে 'ইউ মিনুবিল্লাহি' (আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে) — কথাটি কাফেরদের একগুঁয়েমীর জবাব। তাই এই ইমানকে 'বা' সহযোগে (বিল্লাহ্ রূপে) ঘোষণা করা হয়েছে। পরের 'ইমান' শব্দটিকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— ইউমিনু লিল্ মু'মীনিন। এখানে ইমান অর্থ স্বীকৃতি। তাই ইমান কথাটিকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'লাম' সহযোগে (লিল্ মু'মিনীনা রূপে)। এভাবে প্রথমে উল্লেখিত ইমানের অর্থ হয়েছে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা এবং দ্বিতীয় ইমানের অর্থ হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে মেনে নেয়া।

এরপর বলা হয়েছে — 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী, সে তাদের জন্য আশীর্বাদ।' এ কথার অর্থ— যারা ইমানদার বলে নিজেকে প্রকাশ করে তাদের সকলের প্রতি রসুল স. রহমত বা আশীর্বাদ। তিনি সকলের প্রকাশ্য অবস্থাকেই ধর্তব্য মনে করেন। অন্তরের অবস্থাকে ছেড়ে দেন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। কারো গোপন অবস্থাকে তিনি উন্মোচন করেন না। সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেন সকলের ওজর আপত্তি সমূহকে। কথাটির উদ্দেশ্য এ রকমও হতে পারে যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী, রসুল তাদের জন্য সরাসরি রহমত। তিনি মানুষকে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। কিয়ামতের দিন তিনি বিশ্বাসীদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং তাদেরকে দোজখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবেন বেহেশতে।

শেষে বলা হয়েছে — 'এবং যারা আল্লাহ্‌র রসুলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্‌র রসুল কপট বিশ্বাসীদের ওজর আপত্তি গ্রহণ করলেও তারা যেনো এ কথা মনে না করে যে, এর মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। তাদের এ ধরনের কপটতা রসুলকে ক্লেশ দেয়। যারা এভাবে তাঁকে ক্লেশ দিতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

মুকাতিল ও কালাবী বলেছেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো ওই সকল মুনাফিককে লক্ষ্য করে যারা তাবুক যুদ্ধে যায়নি এবং যারা তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিভিন্ন ওজর আপত্তি নিয়ে রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়েছিলো। বিভিন্নভাবে কসম খেয়ে তারা আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রসন্ন করতে চেয়েছিলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা অবতীর্ণ করেন —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬২, ৬৩

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○

❒ উহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট আল্লাহের শপথ করে। আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূল ইহারই অধিক হকদার যে উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা বিশ্বাসী হয়।

❒ উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেথায় সে স্থায়ী হইবে? উহাই চরম লাঞ্ছনা।

এখানে 'তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য' কথাটির অর্থ হবে রসুলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। মুনাফিকেরা নিতান্তই অজ্ঞ। তাই তারা আল্লাহ্র শপথ করে আল্লাহ্র রসুলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে। তারা এ কথা জানে না যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষ একই। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে পরিতুষ্ট করতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ অন্তর এবং একনিষ্ঠ আনুগত্য। অথচ মুনাফিকেরা কলুষ অন্তর বিশিষ্ট ও অবাধ্য। এখানে 'ইউরদুহু' কথাটির 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্র নামে শপথ করলেও তারা আল্লাহ্কে পরিতুষ্ট করতে সক্ষম হবে না। কারণ তারা আন্তরিক বিশ্বাসহীন ও অবাধ্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'ইউরদুহু' এর 'হু' সর্বনামটি আল্লাহ্ ও রসুল উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতুষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জমিরে ওয়াহেদ (একবচনবোধক সর্বনাম)। এ রকমও বলা হয়ে থাকে যে, সর্বনামটি কেবল রসুল স. এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কেননা রসুল স. এর সন্তোষ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন কানু মু'মিনীন' (যদি তারা বিশ্বাসী হয়)। এ কথার অর্থ— তারা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে তুষ্ট করতে পারতো। কিন্তু তারা এ রকম পারেনি। না পেরেছে আল্লাহ্কে তুষ্ট করতে না তাঁর রসুলকে। না পেয়েছে বিশুদ্ধ বিশ্বাস।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'তারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় সে স্থায়ী হবে। এটাই চরম লাঞ্ছনা।' এখানে 'ইউহাদিদু' কথাটির অর্থ হবে ইউসালিফু (বিরোধিতা করে)। অর্থাৎ জেহাদে অংশগ্রহণ না করে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইউহাদিদু এর ক্রিয়া হবে হাদ্দুন— যার অর্থ পাশ কাটানো। কোনো প্রস্তাবে কারো সায় না থাকলে সে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মুনাফিকেরাও জেহাদকে পাশ কাটিয়ে চলে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, মুনাফিকেরা পাশ কাটিয়ে চলে। এভাবে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াজিদ বিন হারুনের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর একদিন তাঁর ভাষণে বললেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর এমন এক বান্দার হিসাব গ্রহণ করবেন যাকে তিনি দুনিয়ায় দিয়েছিলেন অজস্র নেয়ামত, অফুরন্ত রিজিক। দিয়েছিলেন সুস্বাস্থ্য। আল্লাহ্পাক তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, কী আমল নিয়ে উপস্থিত হয়েছো। ওই ব্যক্তি তখন নিজের ভালোর জন্যে কোনো কিছুই দেখতে পাবে না। কারণ দুনিয়ায় সে কোনো পুণ্য কর্মই করেনি। সে তখন অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করতে থাকবে। এরপর তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে এবং করা হবে অপমানিত। এমতাবস্থায় সে বলে উঠবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দোজখে প্রেরণ করো। দোজখাগ্নি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ো না। এভাবে প্রমাণিত হবে আল্লাহ্তায়ালার এই কালাম— মাঁই য়্যুহাদি দিল্লাহা ওয়া রসুলাহু ফাআন্নালাহু নারা জাহান্নামা খলিদান ফীহা (যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন)।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষ অর্জনের কথা। সেই সন্তোষ অর্জন না করার পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এভাবে উভয় আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সন্তোষের তুলনায় অন্যের সন্তোষ মূল্যহীন। অন্য কেউ অসন্তুষ্ট হলে চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের কোনো সম্ভাবনা নেই। চিরস্থায়ী অগ্নিবাসী হতে হবে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অপ্রসন্ন করলে। জনৈক কবি বলেছেন— আল্লাহ্ না করুন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তোষের অভিলাষী যদি আমি হই, তবে আমার জীবন হবে অন্তহীন দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আল্লাহ্র সন্তোষ যদি আমি পাই, তবে পৃথিবীবাসীদের সন্তোষ থেকে আমি তো বিচ্ছিন্ন হবোই।

কাতাদা ও সুদ্দী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো মুনাফিকদের একটি দল সম্পর্কে। মুনাফিক হাল্লাসও ছিলো ওই দলের অন্তর্ভুক্ত। ওই দলের লোকেরা রসুল স. সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলো। আরো বলেছিলো, যদি মোহাম্মদের কথা সত্য হয় তবে এ কথা নিশ্চিত যে, আমি গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। হজরত আমের বিন কায়েস এ কথাগুলো রসুল স.কে জানিয়েছিলেন। সামনের দিকে এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ আসবে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬৪

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

❒ মুনাফিকেরা ভয় করে এমন এক সুরা না অবতীর্ণ হয় যাহা উহাদিগের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে! বল 'বিদ্রূপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।'

মুনাফিকদের ভয় ছিলো কখন না জানি তাদের বিরুদ্ধে কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর নতুন অবতীর্ণ ওই আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায় তাদের গোপন হীন হিংসা ও শত্রুতা। মুসলমানেরা তাহলে তাদেরকে সহজেই চিনে ফেলবে। ফলে তারা চিহ্নিত হয়ে পড়বে সকলের নিকটে।

বাগবী লিখেছেন, মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে গোপন শলাপরামর্শ করতো। আবার একথা ভেবে ভয়ও করতো যে, নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়ে হয়তো তাদেরকে চিহ্নিত করে ফেলবে। এ রকম বিরতিহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে অতিবাহিত হতো তাদের সময়। আল্লাহ্ ও তার রসুলকে তারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারতো না। আবার প্রকাশ্যে অস্বীকারও করতে পারতো না। তারা ছিলো ঘোর

সন্দেহবাদী। তাই ভাবতো রসুল যদি সত্য হন, তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে চিহ্নিত না করে ছাড়বেন না। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ইয়াহ্জারু (ভয় করে) কথাটি বিধেয়রূপী। কিন্তু আসলে কথাটি নির্দেশসূচক। অর্থাৎ মুনাফিক-দেরকে ভীতির মধ্যে রাখাই সমীচীন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, এমন কোনো সুরা যেনো আবার অবতীর্ণ না হয়, যাতে করে আমাদের গোপন কথাগুলো ফাঁস হয়ে পড়ে। এ রকম বলতো তারা উপহাসছলে। তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে— 'বলো, বিদ্রূপ করতে থাকো; তোমরা যা ভয় করো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মুনাফিকদের বলে দিন, তোমরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেই থাকো। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জেনো যে, তোমরা তোমাদের কার্যকলাপ প্রকাশ হওয়া সম্পর্কে যে ভয় করো, সেই ভয় আল্লাহ্পাক বাস্তবায়ন করবেনই। প্রকাশ করে দিবেন তোমাদের গোপন দূরভিসন্ধি ও শত্রুতাকে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় রসুলকে, সত্তর জন মুনাফিকের নাম এবং তাদের পিতার নাম জানিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিলো মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্তায়ালার অপার মেহেরবাণী। এতে করে ভবিষ্যতে খাঁটি বিশ্বাসীদেরকে এ কথা বলে কেউ লজ্জা দিতে পারবে না যে, তোমার পিতা ছিলো মুনাফিক। বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে ওই বারোজন মুনাফিক সম্পর্কে যারা রসুল স.কে হত্যা করার জন্য এক স্থানে সমবেত হয়েছিলো। পরিকল্পনা করেছিলো, রসুল স. তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। হজরত জিব্রাইল রসুল স.কে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ —

ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছেন হজরত আবু তোফায়েল থেকে ইমাম আহমদ, হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী এবং হজরত যোবায়ের বিন মুতয়েম থেকে ইবনে সা'দ। আরও বর্ণনা করেছেন জুহাক সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ— ওরওয়া ও ইবনে ইসহাকের মধ্যস্থতায় বায়হাকী এবং আপন মাশায়েখ থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর। ঘটনাটি এই— রসুল স. এক সফরে ছিলেন। ওই সময় কয়েকজন মুনাফিক রসুল স.কে হত্যার পরিকল্পনা করলো। তারা ঠিক করলো, রসুল স. যখন কোনো উঁচু টিলা অতিক্রম করবেন তখন তারা তাঁকে হঠাৎ ঘেরাও করে উপত্যকার দিকে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ্পাক রসুল স.কে এই সংবাদ জানালেন। পথ চলতে চলতে একস্থানে পড়লো একটি পাহাড়। তিনি স. পার্বত্য পথে উঠতে শুরু করলেন। তাঁর নির্দেশে জনৈক ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, রসুল স. পার্বত্যপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছেন। অন্য সকলকে তিনি উপত্যকার পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। উপত্যকার পথে অগ্রসর হওয়াই সহজতর। নির্দেশা-নুসারে পুরো দলটি অগ্রসর হতে থাকলো উপত্যকার পথ ধরে। আর রসুল স.

অতিক্রম করতে লাগলেন পাহাড়ী পথ। ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকেরা ভাবলো এইতো সুযোগ। তারা তাদের মুখে কাপড় বেঁধে নিলো এবং অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করতে শুরু করলো রসুল স.কে। হজরত আমমার বিন ইয়াসার রসুল স. এর উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলছিলেন। আর হজরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান চলছিলেন উটের পিছনে। হঠাৎ কানে এলো মৃদু শোরগোল। রসুল স. এর সঙ্গী সাহাবীদ্বয় তাঁর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন। এভাবে দ্রুতগতিতে চলার কারণে উটের পিঠ থেকে কিছু জিনিষপত্র পড়ে গেলো। চতুর্দিকে তখন রাতের ঘোর আঁধার। মৃদু শোরগোল শুনতে পেয়ে হজরত হামযা বিন আমর আসলামী অতি দ্রুত উপস্থিত হন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। হজরত হামযা বর্ণনা করেছেন ঘোর অন্ধকারে পথ দেখতে কষ্ট হচ্ছিলো। হঠাৎ আমার হাতের পাঁচটি আঙ্গুল হয়ে গেলো জ্যোতির্ময়। ওই আলোয় আমি রসুল স. এর উট থেকে পড়ে যাওয়া জিনিষপত্রগুলো (চাবুক, রশি) একত্র করলাম। রসুল স. হজরত হুজায়ফাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ পশ্চাদ্ধাবন করলে ফিরিয়ে দিয়ো। হজরত হুজায়ফার নিকটে ছিলো একটি বড় সড় বল্লম। তিনি ওই বল্লম দিয়ে মুনাফিক আততায়ীদের বাহনগুলোকে তাড়া করলেন এবং আরোহীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, রে আল্লাহ্‌র দুশমনেরা! অন্যত্র গমন করো। এ কথা শুনে পশ্চাদ্ধাবন-কারীরা বুঝতে পারলো রসুল স. নিশ্চয় তাদের পরিকল্পনার সংবাদ পেয়েছেন। তারা দ্রুত সরে পড়লো। মিশে গেলো দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে। রসুল স. বললেন, হুজায়ফা! উটকে প্রহার করো। আর আম্মার তুমি দ্রুত অনুগমন করো। পার্বত্যপথ অতিক্রম করে রসুল স. মিলিত হলেন তাঁর দলের লোকদের সঙ্গে। হজরত হুজায়ফাকে বললেন, পশ্চাদ্ধাবনকারীদের কাউকে কি তুমি চিনতে পেরেছো? হজরত হুজায়ফা বললেন, না। চারদিকে অন্ধকার। আর তাদের মুখগুলো ছিলো কাপড়ে ঢাকা। তবে উটগুলোকে আমি চিনেছি। রসুল স. বললেন, তাদের অভিপ্রায় কি ছিলো তাকি বুঝতে পেরেছো? হজরত হুজায়ফা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌ রসুল— আমিতো কিছুই বুঝতে পারিনি। রসুল স. বললেন, তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা আমাকে পাহাড় থেকে নিচে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে। আল্লাহ্‌পাক ওই লোকগুলোর নাম এবং পিতার নাম আমাকে বলে দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্‌ তোমাকেও আমি তাদের সম্পর্কে জানাবো। হজরত হুজায়ফা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অনুমতি দিন। তারা এসে পড়লে আমরা তাদের শিরচ্ছেদ করবো। রসুল স. বললেন, না। তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছি। (শব্দ ব্যবহারে কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও বাগবীর বর্ণনাটিও এ রকম)। কিন্তু আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। রসুল স. হজরত হুজায়ফা এবং হজরত আমমারকে ওই ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিকদের নাম বলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললেন, অন্য কাউকে এ কথা জানিয়ো না।

রাত শেষ হলো। আলোয় আলোয় ভরে গেলো মরু চরাচর। হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়ের বললেন— হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি গতরাতে উপত্যকার পথ ছেড়ে পার্বত্যপথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন কেনো? উপত্যকার পথই তো ছিলো সহজগম্য। রসুল স. বললেন, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! তুমি কি জানো মুনাফিকেরা আমার বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র করেছিলো? তাদের পরিকল্পনা ছিলো, তারা অতি সন্তর্পণে আমাকে অনুসরণ করে প্রথমে আঘাত হানবে আমার উটের বক্ষস্থলে। কেটে দিবে লাগাম। তারপর আমাকে ফেলে দিবে পাহাড়ের পাদদেশে। হজরত উসায়েদ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! এখন সকলেই সমবেত হয়েছে। আপনি সর্বসমক্ষে ওই আততায়ীদের নাম প্রকাশ করুন তাহলে তাদের গোত্রের লোকেরাই তাদেরকে হত্যা করবে। সর্বসমক্ষে যদি প্রকাশ করতে না চান তবে শুধু আমাকে জানিয়ে দিন। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! আমি ওই মুনাফিকদের কর্তিত মস্তক আপনার সমীপে হাজির না করা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না। রসুল স. বললেন, না। এ রকম করলে লোকেরা বলবে মুনাফিকদের সঙ্গে লড়াই শেষ করে এখন আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছি। হজরত উসায়েদ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা আপনার সংগী হতে পারে কিভাবে? রসুল স. বললেন, তারা তো 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে। হজরত উসায়েদ বললেন, হ্যাঁ, মুখে তো তাই বলে। রসুল স. বললেন, একারণেই আমি তাদেরকে হত্যা থেকে বিরত রয়েছি।

মোহাম্মদ বিন ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, সকাল হলে রসুল স. হজরত হুজায়ফাকে নির্দেশ দিলেন, আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবিস্ সার্রাহ, আবু হাজের আরারী, আমের বিন আবী আমের, হাল্লাস বিন সওবিদ বিন সামেত, মাজমাআ বিন হারেসা, মালিহ তামিমি, হুসায়ের বিন নুমায়ের, তোয়ামা বিন ইবরিক, আবদুল্লাহ্ বিন উয়াইনিয়া এবং মাররা বিন রবীকে ডেকে আনো। মুনাফিক হাল্লাস বলেছিলো, আজ রাতে মোহাম্মদকে পাহাড় থেকে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাবো না। যদি মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীরা আমাদের চেয়ে উত্তম হয় তবে আমরা তো ছাগল এবং সে আমাদের রাখাল। আমরা তাহলে জ্ঞানহীন এবং সে একাই জ্ঞানী।

মালিহ্ তামিমী একবার কাবা গৃহের সুগন্ধিদ্রব্য চুরি করেছিলো এবং ধর্মত্যাগী হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। পরে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলো যে, এভাবে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আর জাকাতের সামগ্রী চুরি করেছিলো হুসায়ের বিন নুমায়ের। রসুল স. তাকে বলেছিলেন, ওহে হতভাগা! তুমি এমন অপকর্ম করলে কেনো? সে বলেছিলো, আমার ধারণা ছিলো আপনি আল্লাহ্র রসুল নন। তাই আমার অপহরণ সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন না। এখন দেখছি আপনি সবই জানেন। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্রই রসুল। এবার আমি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র প্রতি এবং আপনার প্রতি ইমান আনলাম। এ কথা শুনে রসুল স. তাকে মার্জনা করে দিলেন।

আবদুল্লাহ্ উয়াইনিয়া তার সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, আজ রাতে যদি জাগ্রত থাকো, তবে রাত্রি জাগরণ থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি লাভ করবে। আল্লাহ্র কসম! ওই ব্যক্তিকে হত্যা করার চেয়ে উত্তম কোনো কর্মই নেই। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, হে দুর্ভাগা! আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমার কী উপকার হতো? সে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র কসম! আমি তো আপনার উপর্যুপরি বিজয় ও সাফল্যের কারণে লাভ করেছি প্রভূত কল্যাণ। আমি তো আল্লাহ্ এবং আপনার পবিত্র অস্তিত্বের কারণে পূর্ণ নিরাপদ। এ কথা শুনে রসুল স. তাকে ছেড়ে দিলেন।

মাররা বিন রবী ছিলো মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের একান্ত সুহৃদ। একবার সে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের ঘাড়ে হাত রেখে বলেছিলো, এই সমস্যাকে দূর করে দাও। এই একজনকে হত্যা করলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। রসুল স. তাকে ডেকে বললেন, তুমি এ রকম বলেছিলে কেনো? সে বললো— হে আল্লাহ্র রসুল! এমন কথা আমি কখনোই বলিনি। বললে তো আপনি জানতেনই।

উপরে বর্ণিত বারোজন মুনাফিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে রসুল স.কে জানানো হয়েছিলো প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। রসুল স. তাদেরকে ডেকে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মেনে নিয়েছিলেন তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তিকে। কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত করুণ। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধাবস্থায় তাদেরকে বরণ করতে হয়েছিলো অপমানজনক মৃত্যু। 'ওয়াহাম্মু বিমা লাম ইয়ানালু' (যা তারা পায়নি, তাই তারা চেয়েছিলো)— এই আয়াতে ওই সকল মুনাফিকদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হজরত হুজায়ফা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ওই মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। বলেছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে দুম্বলের (অগ্নিকুণ্ডের) মধ্যে একত্রিত কোরো।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমাদের সঙ্গে রয়েছে বারোজন মুনাফিক। সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদের বক্ষ্যাভ্যন্তরে জ্বলতে থাকবে আগুনের শিখা।

বায়হাকী বলেছেন, হজরত হুজায়ফা জানিয়েছেন, ওই সকল মুনাফিকের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দ জন অথবা পনের জন। তারা রসুল স.কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তণের সময়।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ○

❐ এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে?'

মুনাফিকেরা আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও আল্লাহ্‌র রসুলকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-মশ্‌করা করে থাকে। এ কথা তারা অস্বীকারও করে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুনাফিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রায়শই আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল ও কোরআনের আয়াত নিয়ে পরিহাস করে। আপনি তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দেখবেন, তারা ব্যাপারটি অস্বীকারও করবে না। বরং বলবে, আমরা কথাচ্ছলে কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য এভাবে কিছু কিছু ক্রীড়া-কৌতুক করে থাকি। লঘু বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমরা এ রকম করি না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন এবং তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করছিলে?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই বিদ্রূপ-প্রবণ মুনাফিকদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ কি কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল হতে পারে? সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র বিষয় নিয়ে কি কখনো ক্রীড়া-কৌতুক করা যায়?

আমি বলি, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম'— মুনাফিকদের এ কথাটির মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করতো না। বলতো আমরা এ রকম করি কেবল চিত্ত-বিনোদনের জন্য। এরমধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমাদের নেই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, একবার আমাদের এক মজলিশে একলোক বলে বসলো, আমরা কোরআন পাঠকারীদের মতো লোভী, মিথ্যুক ও ভীতু আর কোথাও দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন বলে উঠলেন, তুমিই মিথ্যুক। তুমি মুনাফিক। আমি তোমার কথা রসুল স. কে অবশ্যই জানাবো। তিনি তাই করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

জ্ঞাতব্যঃ শোরাইহ্ বিন ওবায়েদের বর্ণনায় এসেছে, একবার একলোক হজরত আবু দারদাকে বললো— হে কোরআন পাঠকারী তোমরা এতো ভীতু ও কৃপণ কেনো? কিছু চাইলে দিতে চাওনা। আবার আহারের সময় দেখা যায় বড় বড় লোকমা মুখে পুরে দাও। হজরত আবু দারদা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কোনো জবাব দিলেন না। বিষয়টি জানালেন হজরত ওমরকে। হজরত ওমর তার কাপড় ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। তখন সে বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র রসুল— আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। এ প্রসংগে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করলেন আলোচ্য আয়াত।

হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আমি ওই মুনাফিককে দেখেছি, সে রসুল স. এর উটনীর হাওদার সঙ্গে কোনো রকমে ঝুলে ছিলো। পাথরের আঘাতে আহত হয়েছিলো সে। বার বার বলছিলো, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। আর রসুল স. বলছিলেন, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রসুলকে বিদ্রূপ করছিলে? হজরত ইবনে ওমর থেকে ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, ওই মুনাফিকের নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন উবাই। বাগবীও এ রকম বর্ণনা করেছেন হজরত ওমর থেকে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, তাবুক অভিযানের প্রাক্কালে কয়েকজন মুনাফিক বলেছিলো, এরা ভেবেছে কি? এদের পক্ষে সিরিয়া বিজয় কি সম্ভব? এরাতো দেখছি অসম্ভব আশার ফাঁদে পড়ে রয়েছে। আল্লাহ্-তায়ালা তাদের এমতো কথোপকথনের সংবাদ তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিলেন। রসুল স. তাদের নিকটে গিয়ে বললেন, তোমরা এ রকম বলেছো কেনো? তারা বললো, আমরাতো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। তাদের এই অপকথনের সূত্রে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে কালাবী, মুকাতিল এবং কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. তাবুক অভিমুখে চললেন। তাঁর সামনে পথ চলছিলো কতিপয় মুনাফিক। তাদের মধ্যে দু'জন কোরআন মজীদ ও রসুল স. কে নিয়ে কৌতুক করছিলো। আরেকজন হাসছিলো। অপর বর্ণনায় এসেছে, তারা তখন বলাবলি করছিলো, মোহাম্মদ মনে করেছে রোমানদেরকে পরাজিত করবে। দখল করে নিবে তাদের শহরগুলোকে। কিন্তু এটা যে সুদূর পরাহত। আরেক বর্ণনায় এসেছে, তারা তখন বলছিলো আমরা যারা মদীনায় বসবাস করি তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কাজেই কোরআনের আয়াত আসলে মোহাম্মদের কথা, আল্লাহ্র কথা নয়। আল্লাহ্পাক এ কথা তাঁর প্রিয় রসুলকে জানালেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তলব করলেন। বললেন, তোমরা এ রকম বলো কেনো? তারা বললো, আমরাতো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। লঘু বিনোদনে মগ্ন হয়েছিলাম। ঘটনাটি ঘটেছিলো মদীনা হতে তাবুক যাত্রার পথে।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের সময় কতিপয় মুনাফিক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলো। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভই ছিলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। বনী আমর ইবনে আউফ, ওয়াদিয়া বিন সাবেত, হাল্লাস বিন সামেত এবং বনী আশজাআর মাখশী বিন হুমাইরও ছিলো তাদের মধ্যে। মোহাম্মদ বিন ওমর ছা'লাবা বিন হাতেবকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, যুদ্ধক্ষেত্রে এসকল লোককে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হবে। সৈন্যদের মধ্যে ভয় এবং সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা এ রকম বলেছিলো। হাল্লাস বিন ওমর বিয়ে করেছিলো উমাইয়েরের মাকে। তাছাড়া উমায়ের ছিলো তার পোষ্য। সে বললো— যদি মোহাম্মদ সত্য হয়, তবে আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা গর্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। যদি আমার এ কথার কারণে প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেককে একশত করে কোড়া মারা হয়, তবে আল্লাহ্‌র কসম! সে আঘাতও আমার জন্য উত্তম। আমাদের সম্পর্কে তাদের নিকট কোরআন অবতীর্ণ হয়— বিষয়টি আমাদের নিকট অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এর চেয়ে শত বেত্রাঘাতও উত্তম (তবুও কোরআন অসহ্য)। রসুল স. হজরত আম্মার বিন ইয়াসারকে বললেন, জলদি করে ওদের কাছে যাও। জিজ্ঞেস করো তারা এ রকম বলেছে কিনা। যদি অস্বীকার করে, তবে তাদের গোপন আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ো। হজরত আম্মার তাদের নিকটে গিয়ে সব খুলে বললেন। তারা বুঝলো, রসুল স. এর আর কিছুই জানতে বাকী নেই। তাই তৎক্ষণাৎ তারা রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন ওজর আপত্তি উত্থাপন করলো। ওয়াদিয়া বিন সাবেত ধরলো রসুল স. এর উটের হাওদার পিছনের অংশ। সে নিজের হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত ধূলি ধুসরিত করেছিলো। অনর্গল বলে চলছিলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে এ রকম বলিনি। আমরাতো করছিলাম কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতটি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৬৬

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ
نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

❐ 'দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না; তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তোমাদিগের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব — কারণ তাহারা অপরাধী।'

'দোষ স্খলনের চেষ্টা কোরো না' কথাটির অর্থ — হে মুনাফিকেরা! অযৌক্তিক ও অযথার্থ অজুহাত উত্থাপন করে নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে চেয়ো না। 'তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছো' কথাটির অর্থ

— হে মুনাফিকেরা! তোমরা অন্তরে অবিশ্বাসকে লালন করে মুখে মুখে বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকৃতি দিয়েছিলে। এখন আমার রসুলের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবিশ্বাসকে প্রকাশ করে দিয়েছো। এখন তোমাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দিবো, কারণ তোমরা এখন অন্তরে বাইরে নিশ্চিত সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারী।' বিশুদ্ধ তওবা (সত্যের প্রতি আনুগত্য ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন) ব্যতিরেকে পরিত্রাণ লাভের অন্য কোনো উপায় আর নেই। সুতরাং এখন যারা সর্বান্তকরণে তওবা করবে, আমি তাদেরকে মার্জনা করবো। আর যারা এ রকম করবে না, গ্রহণ করবে অবিশ্বাসের উপর অনড় অবস্থান, তাদেরকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিবো। কারণ, তারা অপরাধী।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন, ওই সকল মুনাফিকদের মধ্যে কেবল একজনের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছিলো। তার নাম মাখশি বিন হুমাইর আশ্‌জায়ী। সম্ভবতঃ ইবনে ইসহাক বলতে চেয়েছেন, এখানে 'ত্বাইফাতুন' কথাটির মাধ্যমে যে ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, সেই ক্ষমা লাভ করেছিলেন মাত্র একজন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে মাত্র একজনের ক্ষমাপ্রাপ্তির বিষয়টি সুপ্রমাণিত। অন্যদের ক্ষমাপ্রাপ্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ক্ষমাপ্রাপ্ত মাখশী বিন হুমাইর ওই সকল মুনাফিকের আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেননি। তাদের সব কথায় সায়ও দেননি। সামান্য হেসেছিলেন মাত্র। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করেন এবং এ কথা বলে দোয়া করেন— হে আমার আল্লাহ্! এই আয়াত আমার চোখকে শীতল করে দিয়েছে। শ্রুতিকে করেছে প্রশান্ত। এই আয়াত শুনে খাড়া হয়েছে আমার শরীরের সকল পশম। আর হৃদয়ে জেগেছে প্রকম্পন। হে আমার প্রিয়তম আল্লাহ্! তোমার পথে আমার আত্মদানকে কবুল করো। কেউ যেনো না বলে, একে গোসল দেয়া হোক অথবা দাফন করা হোক। তার এ প্রার্থনা গৃহীত হয়েছিলো। তিনি শহীদ হয়েছিলেন ইয়ামামার যুদ্ধে। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি কোথায় কিভাবে শহীদ হয়েছিলেন তিনি এবং কখন কিভাবে সম্পন্ন হয়েছিলো তার জানাজা ও দাফন।

তওবার পর তিনি রসুল স. এর নিকট নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার নাম এবং আমার পিতার নাম পরিবর্তন করে দিন (অবিশ্বাসী জীবনের অপবিত্র স্মৃতিও যেনো অবলুপ্ত হয়ে যায় আমার এবং আমার পিতার নাম থেকে)। রসুল স. তাঁর নাম রেখেছিলেন আবদুর রহমান বা আবদুল্লাহ্।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ
اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

❒ মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা ব্যয়কুণ্ঠ; উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকেরা তো সত্য-ত্যাগী।

❒ আল্লাহ্ মুনাফিক নর, নারী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদিগের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মুনাফিক পুরুষ এবং নারী সমমানসিকতা-সম্পন্ন। তাদের চিন্তা চেতনা ও কার্যকলাপ মুসলিম পুরুষ এবং নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, বিরত থাকতে বলে অসৎ কাজ থেকে। আর মুনাফিকেরা মানুষকে প্ররোচিত করে অশুভ কর্মের দিকে, আর নিষেধ করে সৎকর্ম করতে। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার জন্য যখন সকলকে আহ্বান জানানো হয় তখন তারা বলে, এই অসহ্য গরমে যুদ্ধযাত্রা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র পথে যখন তাদেরকে অর্থ ব্যয় করতে বলা হয়, তখনও তারা গুটিয়ে নেয় তাদের হাত। কারণ তারা ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্-তায়ালাই যে সকল জীবন এবং সম্পদের একক স্রষ্টা, সেকথা তাদের মনেই নেই। তাই আল্লাহ্‌তায়ালাও তাদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন এভাবে— পৃথিবীর জীবনে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন ইমান ও হেদায়েত থেকে। আর আখেরাতে বঞ্চিত করবেন তাঁর অপার করুণা থেকে। নিক্ষেপ করবেন চিরস্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে। আর কখনো তাদের প্রতি নিবদ্ধ করবেন না দয়ার্দ্র দৃষ্টি।

শেষে বলা হয়েছে— 'ইন্নাল মুনাফিক্বীনা হুমুল ফাসিকুন' (মুনাফিকেরা তো সত্যত্যাগী)। এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা ইমান ও ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত। তারা ফাসেক, সত্য-পরিত্যাগকারী।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুনাফিক নর, নারী ও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে তারা স্থায়ী হবে— এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা মুনাফিক নর-নারী ও কাফেরদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন জাহান্নামের আগুন। ওই আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে অনন্তকাল। আখেরাতের 'এই অনন্ত আযাবই তাদের জন্য উপযুক্ত এবং যথেষ্ট। পৃথিবী তাদের শাস্তিদানের উপযুক্ত স্থান নয়। পৃথিবীর জীবন সাময়িক। তাই এখানকার সাময়িক আযাব তাদের মহা অপরাধের তুলনায় কিছুই নয়। তাই তাদের জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত রয়েছে অনন্ত আখেরাতে।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অশেষ শাস্তি।' এ কথার অর্থ— 'আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম রহমত থেকে তাদেরকে চিরবঞ্চিত করেছেন। তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন সীমাহীন শাস্তি। এভাবে তিনি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে করেছেন অভিসম্পাতগ্রস্ত। পৃথিবীর জীবনও তাদের জন্য সুখকর নয়। ফলে, মুনাফিকেরা বাহ্যিকভাবে হলেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়। আবার সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে, এই বুঝি সদ্য অবতীর্ণ কোনো আয়াতের মাধ্যমে তাদের মনোভাব, কথোপকথন ও কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

সুরা তওবাঃ আয়াত ৬৯, ৭০

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۬ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

❒ তোমরাও তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদিগের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল

তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক, এবং উহারা উহাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; তোমাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে যেমন তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণ উহাদিগের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; উহারা যেরূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনা করিয়াছে; তোমরাও সেরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিল; উহারাই তাহারা যাহাদিগের কর্ম ইহলোকে পরলোকে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

❐ উহাদিগের পূর্ববর্তী নূহ, আ'দ ও সামুদের সম্প্রদায়, ইব্রাহিমের সম্প্রদায় এবং মাদ্য়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদিগের নিকট আসে নাই? উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ জুলুম করিবার জন্য নহেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি জুলুম করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরাও বিগত জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো। তারা যে অপকর্মগুলো করতো তোমরাও তাই করে চলেছো। তারা আল্লাহ্র বিধানকে অস্বীকার করেছিলো, তাই অভিসম্পাতগ্রস্ত হয়েছিলো। তোমরাও আমার রসুলের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছো। ফলে, তোমাদের উপরেও পতিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার লানত। তোমাদের পূর্বসূরীরা ছিলো তোমাদের চেয়ে প্রবল। তারা ছিলো অঢেল ধনসম্পদের অধিকারী ও অনেক সন্তান-সন্ততির জনক। তারা চেয়েছিলো কেবলই দুনিয়া। তোমরাও তাই চাও। তাদের ভাগ্যে দুনিয়ার যে উপভোগ আল্লাহ্তায়ালা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তোমরাও তেমনি দুনিয়ার নেয়ামত উপভোগ করে চলেছো — যতটুকু আল্লাহ্তায়ালা নির্ধারণ করেছেন তোমাদের ভাগ্যে। অনর্থক ও অযথার্থ আলাপ-আলোচনায় সময়াতিপাত করতো তারা। তোমরাও সেরকমই করছো। তাদের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কিছুই ব্যর্থ এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তোমরাও তেমনি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তোমরা তাদেরই একনিষ্ঠ অনুসারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরাও তোমাদের পূর্বসূরীদের পথে চলবে। যে অপকর্মগুলো তারা করতো, তোমরাও তার অনুসরণ করবে। গুঁইসাপ যেমন তার আপন গর্তে ঢুকে যায় তোমরাও তেমনি ঢুকে যাবে বিভ্রান্তির বিবরে। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই পূর্বসূরীরা কি ইহুদী ও নাসারা? তিনি স. বললেন, তারা ছাড়া আর কে? হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, হ্যাঁ, তারাই (ইহুদী ও খৃষ্টানেরাই)। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্বসূরীদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। তারা যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাই করবে। তারা যদি পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে রতিকর্ম করে থাকে, তবে তোমরাও লোক সম্মুখে তেমনই আচরণ করবে।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেন, তোমাদের চালচলন হবে বনী ইসরাইলের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের ছোটখাট সকল আমলের অনুসরণ তোমরা করবে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, অবশ্য এ কথা আমাদেরকে বলা হয়নি যে, এই উম্মত অবশেষে বনী ইসরাইলের মতো গো-বৎসের উপাসনাও করবে কিনা।

পরের আয়াতের (৭০) মর্মার্থ হচ্ছে— হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা কি তোমাদের পূর্বসূরী হজরত নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়, আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়, হজরত ইব্রাহিমের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়, অবিশ্বাসী মাদইয়ানবাসী এবং বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের ঘটনা জানো না? তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার পক্ষ থেকে তাদেরই সম্প্রদায়ভূত রসুল প্রেরিত হয়েছিলো। তারা সেই সকল সত্যবাহী রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সে কারণেই আমি তাদেরকে বিভিন্ন গজবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছি। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়কে। আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি ভয়াবহ তুফানের মাধ্যমে। আর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে নিস্তব্ধ করে দিয়েছি ছামুদ সম্প্রদায়কে। দূরাচার নমরূদ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো রসুল ইব্রাহিমের। তাকেও আমি দিয়েছি যথোপযুক্ত শাস্তি। নিতান্ত অনুল্লেখ্য প্রাণী মশার মাধ্যমে বধ করেছি তাকে। তার সঙ্গী-সাথীদেরকেও করে দিয়েছি নিঃসাড়। আরও শোনো মাদইয়ানবাসীদের কথা। তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম নবী শোয়াইবকে। কিন্তু তাঁকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তাই ঘন মেঘপুঞ্জজাত অগ্নিবৃষ্টির মাধ্যমে আমি তাদেরকে করে দিয়েছি চিহ্নহীন। নবী লূতের সম্প্রদায়ের সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকেও আমি দিয়েছিলাম ভয়ংকর শাস্তি। আমার নির্দেশে জিব্রাইল ফেরেশতা তাদের লোকালয়গুলোকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে উল্টো করে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করেছিলো। অতঃপর শোনো হে মুনাফিকের দল! আমি অবাধ্যদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল এভাবেই দিয়ে থাকি। আল্লাহ্পাক এরূপ নন যে, তিনি কারো উপরে জুলুম করবেন। তারা নিজেরাই তো নিজেদের উপর জুলুম করেছিলো। চরম অবাধ্যতার মাধ্যমে উপযুক্ত হয়েছিলো আযাবের। তারা আমার প্রেরিত পুরুষগণের নির্দেশকে অবজ্ঞা করেছে। করেছে প্রত্যাখ্যান। তাই হয়েছে আল্লাহ্র গজবের লক্ষ্যস্থল। তোমরা এ সকল কাহিনী শোনো, বোঝো এবং বিবেচনা করো। ফিরে এসো সত্যের পথে। নতুবা তোমাদের পরিণতি হবে পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতদের মতোই। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা যেমন পরিত্রাণ পায়নি, তেমনি তোমরাও পাবে না।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۗ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

❒ বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন এবং আল্লাহ্ পরা-ক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❒ আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের— যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, — এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহের সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহা সাফল্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী নর-নারীরা আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে সমুন্নত করবার কাজে একে অপরের সহযোগী ও সহযোগিনী। তারা সৎকাজের নির্দেশদাতা ও দাত্রী এবং অসৎকাজে বিরতকারী এবং বিরতকারিণী। তারা সালাত কায়েম করে। জাকাত দেয়। পরিপূর্ণরূপে নির্দেশানুগত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের। নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে দয়া করবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী। তাই তাঁর বিধান অতিক্রম করবার সাধ্য কারো নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়ও। তাই সকল কিছুর উপর তাঁর রয়েছে যথানিয়ন্ত্রণ।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বিশ্বাসী নর এবং নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের।' এখানে 'জান্নাতি আদ্ন' অর্থ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতম স্থায়ী জান্নাত। অর্থাৎ যে জান্নাত দেখে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসিনীরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

মাদারেক রচয়িতা লিখেছেন, 'আদ্ন' একটি জান্নাতের নাম। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'জান্নাতু আদনি মিল্লাতি ওয়াদার রহমানু' (আদন জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রহমান)। এতে করে বুঝা যায়, আদ্ন একটি জান্নাতের নাম বা জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আমি বলি, হাদিস শরীফেও এ কথার সমর্থন রয়েছে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মোবারক, তিবরানী ও আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে 'ওয়ামাসাকিনা ত্বইয়্যেবাতান ফি জান্নাতি আদনিন' (এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের) --- এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। রসুল স. বললেন, আদ্ন হচ্ছে মোতির একটি মহল। সেখানে থাকবে লাল ইয়াকুত নির্মিত সত্তরটি ভবন। প্রতিটি ভবনে থাকবে সবুজ জমরুদ দ্বারা গঠিত সত্তরটি প্রকোষ্ঠ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে থাকবে একটি করে সিংহাসন আর প্রতিটি সিংহাসনের উপরে বিছানো থাকবে বিচিত্র বর্ণের সত্তরটি শয্যা। প্রতিটি শয্যায় প্রতীক্ষারতা থাকবে একটি করে আয়াতলোচনা হুর। তারা সকলে হবে ওই মহলের অধিকারী জান্নাতি ব্যক্তির পবিত্র সহধর্মিণী। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবে সত্তরজন পরিচারক ও পরিচারিকা। প্রতি প্রভাতে তারা ওই জান্নাতি ব্যক্তির জন্য নিয়ে আসবে পানাহারের অফুরন্ত সামগ্রী।

আবু শায়েখ তাঁর কিতাবুল আজমতে হজরত ইবনে ওমর থেকে লিখেছেন— আল্লাহ্তায়ালা চারটি বস্তুকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। সেই চারটি বস্তু হচ্ছে— আরশ, কলম, আদম ও আদ্ন। এরপর ঘোষণা করেছেন, 'হও' তখন অস্তিত্ব পেয়েছে মহাবিশ্ব।

হজরত আবু দারদা, বায্যার, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া এবং দারা কুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আদ্ন আল্লাহ্পাকের এমন এক সৃষ্টি যা এখন পর্যন্ত কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি। মানুষের অন্তর তার কল্পনা করতেও সক্ষম নয়। সেখানে থাকবেন তিন শ্রেণীর মানুষ— নবী, সিদ্দিক এবং শহীদ। তাঁরা সেখানে প্রবেশ করলে আল্লাহ্তায়ালা ঘোষণা করবেন, হে আদ্ন! তোমার অতিথিদের জন্য আনন্দিত হও।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দু'টি জান্নাত হবে রৌপ্য নির্মিত। ওই জান্নাত দু'টোর সকল তৈজসপত্র হবে রূপার। দু'টো জান্নাত হবে সোনার। সে দু'টোর আসবাবপত্রও হবে স্বর্ণ-নির্মিত। আর জান্নাতে আদ্নে যারা প্রবেশ করবে তাদের সংগে আল্লাহ্-তায়ালার কোনো অন্তরাল থাকবে না। থাকবে কেবল আল্লাহ্তায়ালার 'কিবরিয়াই' সেফাতের (গুণের) এক আবরণ। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র অস্তিত্ব আনুরূপ্য-বিহীনভাবে থাকবে ওই অন্তরালে। কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ এই হাদিসটি বর্ণনা

করেছেন আহমদ। আবু দাউদ, তায়ালাসি এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এ কথাটিও উল্লেখিত হয়েছে যে, জান্নাতুল ফেরদাউস হবে চারটি। তার মধ্যে দু'টি হবে স্বর্ণের। বায়হাকী কিবরিয়াই সেফাতের অন্তরাল সম্পর্কে লিখেছেন, আজমত ও কিবরিয়াই'র ওই অন্তরালের কারণে অনুমতি ব্যতীত কেউই আল্লাহ্‌কে দেখতে সক্ষম হবে না। ওই অন্তরালেই রয়েছে জ্ঞানাতীত ও কল্পনাতীত রহস্যরাজি।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জান্নাতের কেন্দ্রস্থলের একটি অতুলনীয় পুষ্পোদ্যানের নাম আদ্‌ন।

হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, জান্নাতের অভ্যন্তরে একটি মহল রয়েছে তার নাম আদ্‌ন। মহলটির চারপাশে থাকবে মিনার এবং অনন্ত শ্যামলতা। পাঁচ হাজার দরজা থাকবে মহলটির। নবী, সিদ্দিক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ ওই মহলে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাসান বসরী বলেছেন, ওই মহলটি হবে স্বর্ণ নির্মিত। নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছাড়া কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

আতা বিন সায়েদ বলেছেন, আদ্‌ন জান্নাতের মধ্যে রয়েছে একটি জলবতী নদী। ওই নদীর দুই তীরে রয়েছে কুসুম কানন।

মুকাতিল এবং কালাবী বলেছেন, আদ্‌ন জান্নাতের অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সুউচ্চ তোরণ। একটি প্রশান্ত ঝরণা সেখানে প্রবহমান। নিবিড় বৃক্ষরাজি দ্বারা ওই তোরণটি পরিবেষ্টিত। নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যাদেরকে ইচ্ছে করবেন কেবল সেই সকল পুণ্যবানেরা সেখানে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত ওই স্থানটি কারো দৃষ্টিগোচর হবে না। সেখানে রয়েছে মোতি, ইয়াকুত ও স্বর্ণ নির্মিত অনেক প্রাসাদ। আরশের নিম্নদেশ থেকে পবিত্র ও সুবাসিত বাতাস প্রবাহিত হবে সেখানে। বাতাস বয়ে নিয়ে যাবে রাশি রাশি শুভ্র কস্তুরী— যেমন তুফান এক স্থানের বালি বয়ে নিয়ে যায় অন্যস্থানে।

কুরতুবী বলেছেন, লোকে বলে জান্নাত সাতটি— দারুল খুলদ, দারুল জিনান, দারুস সালাম, জান্নাতে আদন, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুন নাঈম এবং জান্নাতুল ফেরদাউস। হজরত আবু মুসা থেকে বর্ণিত হয়েছে চারটি জান্নাতের কথা— জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুল খুলদ, জান্নাতে আদন এবং দারুস সালাম। হাকেম ও তিরমিজি এই বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাকেম বলেছেন, দু'টি জান্নাত রয়েছে মুকাররাবীন (নৈকট্যভাজন) দের জন্য। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে আসহাবুল ইয়ামীনদের (দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্তদের) জন্য। প্রত্যেক জান্নাতে থাকবে অসংখ্য দরজা এবং স্তর।

এখানে 'ওয়া মাসাকিনা ত্বইয়্যেবাতান ফী জান্নাতি আদনিন' কথাটির সংযোগ রয়েছে 'জান্নাতিন তাজরী' এর সঙ্গে। সুতরাং 'মাসাকিন' হবে একবচনবোধক। আবার একে বহুবচনবোধকও বলা যায়। তাই সেখানে প্রত্যেকের বাসস্থান হবে পৃথক পৃথক। আবার একজন হবে বহু বাসস্থানের অধিকারী। এখানে জান্নাতের তিনটি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর মাসাকিন (বাসস্থান)

অপেক্ষা জান্নাতের মাসাকিন অতি উচ্চ, বর্ণাঢ্য ও স্থায়ী। তাই এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে ত্বইয়্যেবাতান (পবিত্র, উত্তম) শব্দটি। তারপরে বলা হয়েছে 'জান্নাতি আদনিন'। এরপর বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের কথা। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি। এই নেয়ামত যারা পাবে, তারাই লাভ করবে মহা সফলতা। তাই সবশেষে বলা হয়েছে— এটা মহা সফলতা। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্-তায়ালা জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! জান্নাতবাসীরা বলবেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা হাজির। আল্লাহ্পাক বলবেন, তোমরা কি আনন্দিত? জান্নাতবাসীগণ বলবেন, কেনো আনন্দিত হবো না। তুমি তো আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছো, যা অন্য কাউকে (অন্য কোনো ফেরেশতাকে) দাওনি। আল্লাহ্পাক বলবেন, একটি নেয়ামত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। জান্নাতবাসীগণ বলবেন, কী? আল্লাহ্পাক বলবেন, আমার সন্তোষ। এবার আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো আমার পরিপূর্ণ সন্তোষ। আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি নারাজ হবো না।

যথাসূত্রে তিবরানী তাঁর আওসাত গ্রন্থে হজরত জাবের থেকে মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতীরা! তোমরা আর কি চাও? জান্নাতীগণ বলবেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সবকিছুই দিয়েছো। আর কি চাইবো? আল্লাহ্পাক বলবেন, আমার পরিতুষ্টিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

সুরা তওবাঃ আয়াত ৭৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

❒ হে নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও মুনাফিকদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর ও উহাদিগের প্রতি কঠোর হও; উহাদিগের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করুন। জাহান্নামই তাদের স্থায়ী আবাস। তাদের পরিণাম কতোই না নিকৃষ্ট।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক বলেছেন, এখানে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অর্থ মুখের কথায় যুদ্ধ করা। তাদের প্রতি কোমল আচরণ প্রদর্শন না করা। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, 'মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন' কথাটির

অর্থ— তাদেরকে শরিয়তের সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আলোচ্য নির্দেশনাটির অর্থ হবে— হাত দ্বারা জেহাদ করুন। সম্ভব না হলে, জেহাদ করুন মুখ দ্বারা। তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা জেহাদ করুন। হজরত ইবনে মাসউদ এ কথাও বলেছেন যে, মুনাফিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে বদ মেজাজের সঙ্গে। কথাবার্তাকে করতে হবে কর্কশ! দুনিয়া নয়, তাদের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে অনন্ত জাহান্নাম। আর এটাই সর্বনিকৃষ্ট পরিণাম।

আতা বলেছেন, এই আয়াতে মুনাফিকদের জন্য নম্রতা ও ক্ষমাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে এটাই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ নির্দেশনা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. উপবিষ্ট ছিলেন একটি বৃক্ষের ছায়ায়। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, একটু পরে এমন এক লোক আসবে, যে শয়তানের চোখ দ্বারা দ্যাখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলো নীলচক্ষু বিশিষ্ট এক লোক। রসুল স. তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমার বিরুদ্ধে কটূক্তি করো কেনো? এ কথা শুনে লোকটি চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে তার সঙ্গী সাথীকে নিয়ে পুনরায় হাজির হয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো কটূক্তি করিনি। এভাবে কসম করতে দেখে রসুল স. তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এরপর অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৪

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْآ اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِى

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

❒ উহারা আল্লাহের শপথ করে যে উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে; উহারা যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা দোষারোপ করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদিগের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদিগের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হাল্লাস বিন সুবিদ্ বিন সামেত ছিলো ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা রসুল স. এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে গমন করেনি। হাল্লাস রসুল স. সম্পর্কে বলেছিলো, যদি ওই ব্যক্তি সত্য হয়, তবে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। হজরত উমায়ের বিন সা'দ এ কথা শুনে ফেললেন এবং রসুল স.কে এ সংবাদ জানালেন। হাল্লাসকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে কসম খেয়ে বললো, না, আমি এ রকম বলিনি। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। ধারণা করা হয় যে, হাল্লাস পরে খাঁটি অন্তরে তওবা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ কথা প্রমাণিতও হয়েছে। ইবনে আবী হাতেম হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন। একই কথা বর্ণনা করেছেন হজরত কা'ব থেকে ইবনে ইসহাক, হজরত ওরওয়া থেকে ইবনে সা'দ।

কালাবী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হাল্লাস বিন সুবিদ সম্পর্কে। তাবুকে প্রদত্ত এক ভাষণে রসুল স. মুনাফিকদের নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, তারা নিকৃষ্ট ও আবর্জনা স্বরূপ। মদীনায় হাল্লাসের কানে এ কথাটি পৌঁছলে সে বলেছিলো, মোহাম্মদ যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। রসুল স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হজরত আমের বিন কায়েস রসুল স.কে জানালেন, হাল্লাস এ রকম করে বলেছে। হাল্লাস উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার নামে মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। রসুল স. হজরত আমের এবং হাল্লাসকে বললেন, তোমরা দু'জনে মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে শপথ করো। আসর নামাজের পর হাল্লাস মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে বললো, কসম ওই আল্লাহ্‌র! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। এরপর মিম্বরের নিকটে দাঁড়ালেন হজরত আমের। বললেন, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্‌র শপথ, আমি হাল্লাসকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিনি। এরপর তিনি আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলন করে বললেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার সত্য নবীর প্রতি সত্য কথা অবতীর্ণ করো। রসুল স. বললেন, বিশ্বাসীরা সত্যবাদী হয়ে থাকে। এরপর সেখান থেকে হজরত আমের ও হাল্লাসের স্থান ত্যাগের আগেই হজরত জিব্‌রাইল অবতীর্ণ হলেন এই আয়াতের প্রথম অংশ নিয়ে— তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে; তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা দোষারোপ করেছিলো। তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভালো হবে।' সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াত শুনে হাল্লাস বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্ তো এখানে স্পষ্ট বলেছেন, 'তারা তওবা

করলে তাদের জন্য ভালো হবে। আপনি সাক্ষী থাকুন আমি বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করছি। আমেরের কথাই সত্য। আমি আপনার বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। রসুল স. হাল্লাসের তওবা গ্রহণ করলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর তওবা বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বিন মালেক বলেছেন, রসুল স. একদিন ভাষণ দান করছিলেন। শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত এক মুনাফিক বলে বসলো, এ লোকের কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা গাধার চেয়েও খারাপ। হজরত জায়েদ বিন আরকাম তার এ কথা শুনতে পেলেন এবং রসুল স. কে এ সম্পর্কে জানালেন। কিন্তু তাকে ডেকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে সে অস্বীকার করে বসলো। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

ইবনে জারীর লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, একবার দু'জন লোকের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেলো। একজন ছিলো জুহ্নিয়া গোত্রের এবং অপরজন ছিলো গিফারী সম্প্রদায়ের। জুহ্নিয়ার লোকটি ছিলো জনৈক আনসারী সাহাবীর মিত্র। গিফারী গোত্রের ওই লোকটি ছিলো প্রভাবশালী। তার নাম ছিলো আবদুল্লাহ্ বিন আউস। সে জুহ্নিয়ার লোকটিকে দাপটের সঙ্গে বললো, নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্য করো। আমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এ রকম— নিজের কুত্তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা করো, দেখবে সে তোমাকেই কামড়াচ্ছে। আমরা মদীনা ছেড়ে গেলে দেখবে অভিজাত লোকেরা ওই নিচ লোকদেরকে বের করে দিবে। জনৈক সাহাবী এ কথা শুনে রসুল স. কে জানালেন। রসুল স. আবদুল্লাহ্ বিন আউসকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে আল্লাহ্র কসম খেতে খেতে বললো, না আমি এরূপ বলিনি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

উল্লেখ্য যে, আবুদল্লাহ্ বিন আউসের এ ঘটনা ঘটেছিলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। সুরা মুনাফিকুনের তাফসীরে আমি ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ বলেছেন, কালিমাতাল কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা) অর্থ রসুল স.কে গালি দেয়া। কারো কারো মতে এর অর্থ হাল্লাসের ওই বাক্যটি (মোহাম্মদ যদি সত্য হয় তাহলে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট)। কারো কারো মতে অভিজাতরা ওই নিচদেরকে বের করে দিবে'— আবুদল্লাহ্ বিন আউসের এই কথাটিকেই বলা হয়েছে কালিমাতুল কুফরী।

'তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি'— এ কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল মুনাফিকদের প্রতি, যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাতের অন্ধকারে রসুল স.কে অতর্কিত আক্রমণের মাধ্যমে হত্যা করতে চেয়েছিলো। পূর্বাহ্নে হজরত জিব্রাইল রসুল স. কে এ কথা জানিয়েছিলেন।

রসুল স. সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তারা সফল হতে পারেনি। ওই ঘটনার দিকে ইশারা করেই এখানে বলা হয়েছে 'তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি'। ইতোপূর্বে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তিবরানী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, আসউয়াদ নামের এক লোক রসুল স. কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু সে সফল হয়নি। তাই আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা যা চেয়েছিলো তা পায়নি। মুজাহিদ বলেছেন, মুনাফিকেরা হত্যা করতে চেয়েছিলো ওই সাহাবীকে যিনি তাদের গোপন কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে তাদের কামনা চরিতার্থ না হওয়ার কথা। কেউ কেউ বলেছেন, বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা রসুল স. এর সাহাবীগণকে মদীনা থেকে বের করে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু সফলতার মুখ তারা দেখেনি। তাদের ওই অচরিতার্থ অভিলাষের কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— তারা যা কামনা করেছিলো তা পায়নি। সুদ্দী বলেছেন, মুনাফিকেরা বলেছিলো মদীনা পৌঁছেই আমরা আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মস্তকে স্থাপন করবো অধিনায়কত্বের মুকুট। কিন্তু তাদের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এখানে এ রকম বলা হয়েছে।

মুনাফিকেরা এতোকিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা দোষারোপ করেছিলো।' ইবনে জারীর এবং আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইকরামা বলেছেন, ইবনে আদি ছিলো ইবনে কা'বের গোলাম। জনৈক আনসারী সাহাবী তাকে হত্যা করেছিলেন। রসুল স. তার রক্তপণ নির্ধারণ করেন বারো হাজার দিরহাম। ইবনে কা'ব ওই অর্থ পেয়ে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। বাগবী লিখেছেন, নিহত হয়েছিলো হাল্লাসের ক্রীতদাস। রসুল স. রক্তপণ হিসেবে বারো হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। হত্যাকারীর নিকট থেকে ওই অর্থ পেয়ে হাল্লাস হয়েছিলো বিত্তবান। তাই এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. নিজ কৃপায় তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন।

কালাবী বলেছেন, মদীনা ছিলো একটি হতশ্রী অঞ্চল। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পর সবদিক থেকে মদীনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু মুনাফিকেরাই ছিলো মদীনার কলংক। তাই ওই অসুন্দর অবস্থা থেকে আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে এভাবে— 'তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভালো হবে।' আমি বলি, আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যটি হাল্লাসকে তওবা করতে বাধ্য করেছিলো। এছাড়া তার কোনো গত্যন্তরও ছিলো না। কারণ এর পর পরই তওবা না করার পরিণতি হিসেবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই কথাগুলো— 'কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ ইহলোকে ও পরলোকে তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে তাদের কোনো অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই।'

বাগবী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তিবরানী এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু উমামা বাহেলী বলেছেন— একবার হজরত সা'লাবা বিন হাতেব আনসারী রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার জন্য প্রার্থনা করুন আল্লাহ্ যেনো আমাকে প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী করে দেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র রসুলের রীতিনীতি কি তোমার জন্য অনুসরণীয় নয়? যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই পবিত্র অস্তিত্বের শপথ! আমি চাইলেই হতে পারি স্বর্ণগিরির মালিক। আর আমি চাইলে ওই স্বর্ণগিরিটি আমার সাথে সাথে চলবে। সা'লাবা নীরবে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তিনি হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! দোয়া করুন আল্লাহ্ যেনো আমাকে অনেক ধনসম্পত্তি দান করেন। আপনি আল্লাহ্র রসুল, তাই আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনার দোয়া কবুল করবেন। ধনসম্পদ পেলে আমি যথাযথভাবে হকদারদের হক পরিশোধ করবো। রসুল স. দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ্! সা'লাবাকে সম্পদশালী করো। বর্ণনাকারী বলেন, সা'লাবার ছিলো অল্প কয়েকটি ছাগল। রসুল স. এর দোয়া করার পর সেগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটলো। সেগুলোর স্থান সংকুলান নিয়ে সৃষ্টি হলো সমস্যা। বাধ্য হয়ে সা'লাবা সেগুলোকে নিয়ে আবাস গড়লো মদীনার বাইরের এক প্রশস্ত স্থানে। কিন্তু তার ছাগলগুলো বেড়েই চললো। সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ভীষণ ব্যস্ত করে রাখতো তাকে। ফলে সে রসুল স. এর সঙ্গে জোহর ও আসর ছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়তে পারতো না। অন্য ওয়াক্তের নামাজগুলো সে আদায় করতো ছাগলের খোয়াড়ের পাশের একস্থানে। দেখতে দেখতে সে হয়ে গেলো এক বিশাল ছাগল বহরের মালিক। স্থান সংকটের কারণে এবার তাকে সরে যেতে হলো আরও অনেক দূরে। মদীনায় এসে সে কেবল পড়তো জুমআর নামাজ। অন্য নামাজে সে আর আসতে পারতো না। পুনরায় দেখা দিলো স্থান সংকুলান সংকট। ফলে, আরো দূরে না যেয়ে তার আর কোনো উপায় রইলো না। জুমআর নামাজেও আসা কষ্ট হয়ে গেলো তার। জুমআর দিন সে মদীনা থেকে আগমনকারী কারো কারো সঙ্গে কথা বলে কেবল সংবাদ জানতে লাগলো মদীনার। একদিন রসুল স. বললেন, সা'লাবার কি হয়েছে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, এখন সে থাকে অনেক দূরে। বিশাল এক উপত্যকা জুড়ে বিপুল সংখ্যক ছাগল নিয়ে তাকে বসবাস করতে হয়। তাই সে আর নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। রসুল স. বললেন, সা'লাবা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কথাটি তিনবার উচ্চারণ করলেন তিনি। এরপর অবতীর্ণ হলো জাকাতের বিধান। রসুল স. বনী সালিম এবং বনী জুহনিয়ার জাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করলেন দুই ব্যক্তিকে। তাদের হাতে দিলেন একটি লিখিত দলিল। ওই দলিলে লেখা ছিলো কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে, জাকাতের জানোয়ারের বয়স কতো হবে ইত্যাদি। মৌখিক নির্দেশ দেন, বনী সালিম ও বনী জুহ্নিয়া সহ সা'লাবারও জাকাত সংগ্রহ করো। নির্দেশ মোতাবেক তারা সা'লাবার নিকটে গেলেন এবং লিখিত দলিলটি পড়ে শোনালেন। সা'লাবা বললো, এ যে দেখছি কাফেরদের মতো কর ধার্য করা হয়েছে। ঠিক আছে। এখন আপনারা যেখানে যেতে চান যান,

পরে আসবেন। জাকাত সংগ্রাহকদ্বয় এবার গেলেন বনী সালেম গোত্রের নিকটে। তারা তাদের পশুপাল থেকে সর্বোত্তম পশুগুলো জাকাত হিসেবে প্রদান করলেন। সংগ্রাহকদ্বয় বললেন, এতো ভালো পশু দেয়াতো অত্যাবশ্যক কিছু নয়। সালেমী বললেন, নিয়ে যান। আমি আনন্দিতচিত্তে প্রদান করেছি। এরপর সংগ্রাহকদ্বয় অন্যান্যদের জাকাত সংগ্রহ করেন। শেষে আগমন করেন সা'লাবার নিকটে। সা'লাবা পুনরায় বলে দলিলটা আবার দেখাও তো? তাঁরা দলিল দেখালেন। সা'লাবা সব দেখে শুনে বললো আরে ভাই, এখানে তো কর ধার্য করার কথা বলা হয়েছে। আর এ কর আদায় করতে হবে অমুসলিমদের নিকট থেকে। ঠিক আছে। তোমরা এখন যাও। আমি ভেবেচিন্তে দেখি কি করা যায়। সংগ্রাহকদ্বয় সংগৃহীত জাকাতের সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হলেন মদীনায়। রসুল স. তাঁদের কথা শুনে তিনবার উচ্চারণ করলেন— সা'লাবা ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে। এরপর সালেমী জাকাত প্রদাতার জন্য তিনি স. দোয়ায়ে খায়ের করলেন। ওই সা'লাবা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

وَمِنْهُم مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اٰتٰىهُم مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

❒ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, 'আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদাকা দিব এবং সৎ হইব।'

❒ অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন তখন উহারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

❒ পরিণামে কপটতা উহাদিগের অন্তরে রহিল আল্লাহের সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল উহা ভঙ্গ করিয়াছিল এবং উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

❒ উহারা কি জানিতনা যে উহাদিগের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদিগের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন?

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ সম্পর্কে আউফ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক আল্লাহ্‌র সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলো যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্পদ দান করলে আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবো। জাকাত দিবো এবং আত্মীয়দের হকও আদায় করবো। এ কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে— 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করেছিলো, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয় সদ্‌কা দিবো এবং সৎ হবো।'

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করলো এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরালো।'

এর পরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'পরিণামে কপটতা তাদের অন্তরে রইলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের শেষ দিন পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অঙ্গীকার করেছিলো তা ভঙ্গ করেছিলো এবং তারা ছিলো মিথ্যাচারী।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার অবাধ্যতা ও কৃপণতার কারণে তাদের অন্তরে সৃষ্টি হলো অনড় কপটতা। তারা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। বলেছে, জাকাত হচ্ছে জিযিয়ার মতো এক ধরনের কর— যা কেবল অমুসলিমদের উপরে প্রযোজ্য। এই অপকথন ও অপবিশ্বাসের অপবিত্রতা (নেফাক) তাদের অন্তরে থাকবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। অথবা কবর আযাব শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যখন তওবা করার সুযোগ আর থাকবে না। আল্লাহ্‌পাকই তাদেরকে তওবার সুযোগ থেকে করেছেন চিরবঞ্চিত। কারণ তারা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও মিথ্যাচারী। তাদের মৃত্যু অবশ্যই হবে ওই অনড় কপটতা ও অপবিত্রতার সঙ্গে।

সকল অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরাই মিথ্যাবাদী। তাই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা দ্বিগুণ অপরাধী। রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের মধ্যে রয়েছে তিনটি বৈশিষ্ট্য— প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, মিথ্যাচার ও বিশ্বাসভঙ্গ (আমানতের খেয়ানত)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো— তারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং মুসলমান হওয়ার দাবীও করে থাকে।

বাগবী, ইবনে জারীর প্রমুখ কর্তৃক হজরত আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় রসুল স. সকাশে উপস্থিত ছিলো সা'লাবার এক আত্মীয়। সে সা'লাবাকে গিয়ে জানালো, দ্যাখো তোমার সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সা'লাবা তৎক্ষণাৎ রসুল স. এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললো,

আমার জাকাত গ্রহণ করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ আমাকে তোমার জাকাত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এ কথা শুনে সা'লাবা নিজের মাথায় নিজেই মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো। রসুল স. বললেন, এটাও তোমার প্রতারণা। তুমি আমার নির্দেশের অবমাননা করেছো। এ কথা বলেই রসুল স. গমন করেন গৃহাভ্যন্তরে। তাঁর মহাতিরোধানের পর সা'লাবা হাজির হলো খলিফা হজরত আবু বকরের নিকটে। নিবেদন করলো, আমার জাকাত গ্রহণ করুন। হজরত আবু বকর বললেন, রসুল স. তোমার জাকাত গ্রহণ করেননি। সুতরাং আমি গ্রহণ করবো কীরূপে? এরপর এলো খলিফা হজরত ওমরের শাসনামল। তাঁর নিকট জাকাত গ্রহণের আবেদন নিয়ে হাজির হলো সা'লাবা। হজরত ওমর বললেন, রসুল স. এবং ইসলামের প্রথম খলিফা তোমার জাকাত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। পরবর্তী খলিফা হজরত ওসমানের নিকটেও একই আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো সা'লাবা। কিন্তু তিনিও তার জাকাত গ্রহণ করেননি। হজরত ওসমানের শাসন কালেই তার মৃত্যু ঘটে।

হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদার বর্ণনায় এসেছে, আনসার সাহাবীগণের এক মজলিশে সা'লাবা একদিন বললো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আল্লাহ্ যদি দয়া করে আমাকে বিত্তবান করেন, তবে আমি হকদারদের হক পরিশোধ করবো, দান খয়রাত করবো এবং নিকটজনদের অভাবও পূরণ করবো। বোখারী, মুসলিম। কিছুদিন পর মারা গেলো তার চাচাতো ভাই। তার বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে গেলো সে। কিন্তু সে তার অঙ্গীকার পূরণ করলো না। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হাসান বসরী ও মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সা'লাবা বিন হাতেব এবং মোতাব বিন কুশাইর সম্পর্কে। তারা দু'জনেই ছিলো বনী আমর ইবনে আউফের গোত্রভূত। একদিন তাদের নেতৃস্থানীয়দের একটি মজলিশের পাশ দিয়ে গমন করার সময় তারা বলে উঠলো, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে কৃপাপরবশ হয়ে বিত্তশালী করেন তবে আমরা (ফরজ, মোস্তাহাব) সকল প্রকার দান খয়রাত করবো। আল্লাহ্পাক কৃপাভরে তাদেরকে বিত্তশালী করেছিলেন। কিন্তু তারা হয়ে গেলো কৃপণ। ভঙ্গ করলো অঙ্গীকার।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি জানতো না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যা অদৃশ্য তা তিনি বিশেষভাবে জানেন।'। এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত (মুখে দান করার কথা বললেও তাদের অন্তরে তো রয়েছে অনড় অস্বীকৃতি— সেই অস্বীকৃতি সম্পর্কে কি তিনি জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন)। আর তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কেও আল্লাহ্তায়ালা অনবহিত নন। তারা বলেছিলো, জাকাত

তো এক ধরনের কর। তাদের এই অপকথন সম্পর্কেও তিনি অবগত। যা কিছু অদৃশ্য, তার সকল কিছুই তো তিনি বিশেষভাবে জানেন। —এ কথাটি কি মুনাফিকেরা জানে না?

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সদ্কা সম্পর্কিত এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা ছিলাম শ্রমজীবি। এরপর থেকে অনেকে জাকাত দিতে শুরু করলো। কেউ দিতো বেশী আবার কেউ দিতো কম। একবার এক মুনাফিক লোক দেখাবার জন্য বেশী দান করে অল্পদানকারী এক সাহাবীকে বললো, এটুকু মাল দান করে আর কতটুকু সওয়াব পাওয়া যাবে। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৭৯

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

❒ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদাকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করুন; উহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

আল মুত্তাওবিয়্যিনা অর্থ স্বতঃস্ফূর্তদাতা। 'ফিস সাদাকাতি' অর্থ প্রচুর দান খয়রাত করা। অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দিতচিত্তে প্রচুর খয়রাত করা। 'জুহ্দা' অর্থ সামর্থ্যানুসারে।

বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, রসুল স. একবার সকলকে দান খয়রাত করতে অনুপ্রাণিত করলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ নিয়ে এলেন চার হাজার দিরহাম। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার কাছে আট হাজার দিরহাম ছিলো সেগুলো থেকে চার হাজার দিরহাম নিয়ে এসেছি। আপনি এগুলোকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করুন। অবশিষ্ট চার হাজার আমি রাখলাম আমার পরিবার পরিজনের জন্য। রসুল স. বললেন, তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে সবগুলোতে আল্লাহ্ বরকত দান করুন। রসুল স. এর এই দোয়ার প্রভাবে হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ হয়েছিলেন বিপুল বিত্তের অধিকারী। ইন্তেকালের পর তাঁর দুই স্ত্রীর প্রত্যেকে পেয়েছিলেন এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম। অপর বর্ণনায় এসেছে, তাঁর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পেয়েছিলেন কমপক্ষে আশি হাজার দিরহাম।

হজরত আসেম বিন আদি ইজলানী আনলেন একশত ওসাক খেজুর। হজরত আবী আকীল আনসারী আনলেন মাত্র এক সা' যব। বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সারা রাত পানি টানার কাজ করে আমি পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছি দুই সা' যব। সেগুলো থেকে এক সা' নিয়ে এসেছি আপনার খেদমতে। রসুল স. ওই এক সা' যবকে সদ্‌কার স্তুপের উপর রাখতে বললেন। মুনাফিকেরা ভর্ৎসনার স্বরে বললো, আবদুর রহমান এবং আসেমের দান লোক দেখানো। আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের এক সা' যবের কোনো প্রয়োজনই নেই। নিজেদের অভাব প্রদর্শন করার জন্য এবং বায়তুল মাল থেকে কিছু পাবার আশায় তারা এ রকম করেছে। মুনাফিকদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। এখানে 'যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয়' কথাটির লক্ষ্য হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও হজরত আসেম। আর 'যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না' কথাটির লক্ষ্য হজরত আবু আকিল।

আমি বলি, উপরের ঘটনাটি হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে মারদুবিয়া। ওই বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফের এক পত্নীর নাম ছিলো তুমাজির। তাঁর অংশের হাজার দিরহাম তাঁর ভাইয়ের হস্তগত হওয়ার ঘটনাটি তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু আকিল থেকে। প্রকৃত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন ইবনে মারদুবিয়া— হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আবু সাঈদ খুদরী, হজরত আবু আকিল এবং হজরত উমায়রা বিনতে সহল বিন রাফে থেকে।

'তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্‌র বিদ্রূপও এক ধরনের শাস্তি। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেন, রসুল স. বলেছেন, মুনাফিকদের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হবে এভাবে— জান্নাতের দরজা খুলে বলা হবে, প্রবেশ করো। তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে অগ্রসর হবে। কিন্তু কাছে যেতে না যেতেই বন্ধ করে দেয়া হবে দরজা। এ ভাবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে। একইভাবে তাদের মুখের উপর বন্ধ করে দেয়া হবে দরজা। এভাবে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে। তখন আহ্বান করলেও তারা আর অগ্রসর হবে না।

বায়যাবী লিখেছেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ছিলো কট্টর মুনাফিক। কিন্তু তার পুত্র আবদুল্লাহ্‌ ছিলেন সাচ্চা ইমানদার। আবদুল্লাহ্‌ বিন উবাই যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তার ইমানদার পুত্র রসুল স. সকাশে পিতার মাগফিরাতের জন্য দোয়ার প্রার্থী হলেন। রসুল স. দোয়া করলেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۟

❒ তুমি উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদিগের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না কর একই কথা; তুমি সত্তর বার উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না, ইহা এই জন্য যে উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মুনাফিকদের জন্য আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করা না করা এক বরাবর। আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা যেমন করবেন না, তেমনি না করলেও করবেন না। আপনি সত্তর বার (অসংখ্যবার) ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে। অস্বীকার করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে। তারা সত্য পরিত্যাগকারী। আর সত্য পরিত্যাগকারীদেরকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন (হেদায়েত) করেন না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, তাহলে আমি তাদের জন্য সত্তরবারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। তখন অবতীর্ণ হয়— 'সাওয়াউন আলাইহিম ইসতাগফারতা লাহুম আম লাম তাসতাগফির লাহুম (আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন — দু'টোই এক বরাবর)। বোখারী ও মুসলিম এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর থেকে। ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন ওরওয়া, মুজাহিদ ও কাতাদা সূত্রে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফের মাধ্যমে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বললেন, আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে মুনাফিকদের জন্য সত্তর বারের অধিক প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম আমি তাই করবো। এবং আশা করবো আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'সাওয়ায়ুন আলাইহিম ইস্তাগফিরতা লাহুম আম লাম তাসতাগফির লাহুম।'

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে উল্লেখিত 'সত্তর' সংখ্যাটিকে গুণে গুণে সত্তর বারই মনে করেছিলেন রসুল স.। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। এতে করে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের

প্রতি তাঁর ছিলো কী অপার দয়া ও ভালোবাসা। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন সকলেই যেনো লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার মাগফিরাত। একারণেই তিনি বলেছিলেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করবো সত্তরবারের অধিক। কিন্তু এখানে সত্তর বারের অর্থ— গুণে গুণে সত্তর বার নয়। শব্দটির অর্থ এখানে— অসংখ্যবার। আরবী ভাষায় অসংখ্য বুঝাতে সাত, সত্তর, সাতশত— এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। তিনের কমকে বলা হয় ক্বালীল (অল্প)। আর তিনের অধিককে বলা হয় 'কাছির' বা অধিক— যার কোনো সীমা নেই।

আরো দু'রকমভাবে আরবীতে সংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে তাক বা বেজোড় আর একটি হচ্ছে জুফ্‌ফাত বা জোড়া। দুই প্রথম জোড় আর তিন প্রথম বেজোড়। যেমন ৩-৫-৭। জোড়ার নিয়ম এ রকম, ৪-৬-৮। আর বেজোড়ের নিয়ম ৩-৫-৭। এভাবে দশ পর্যন্ত গণনা শেষ হয়ে যায়। এর পর গণনা শুরু হয় দশক হিসেবে। যেমন, বিশকে বলা হয় দুই দশ, তিরিশকে বলা হয় তিন দশ, চল্লিশকে বলা হয় চার দশ ইত্যাদি। এভাবে সাত দশ, অর্থাৎ সত্তর অর্থ হবে অনেক, অসংখ্য।

আল্লাহ্তায়ালা গফুরুর রহীম (ক্ষমা পরবশ এবং পরম দয়ালু)। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, রসুল স. মুনাফিকদের জন্য অসংখ্যবার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এতে করে ক্ষমা প্রদর্শনে আল্লাহ্তায়ালার কৃপণতাকে প্রকাশ করা হয়নি। মার্জনা করতে তিনি কখনো কার্পণ্য করেন না। এখানে কেবল প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে মুনাফিক ও কাফেরদের বাস্তব অবস্থাকে। তারা নেফাক ও কুফরী (অপবিত্রতা ও অবিশ্বাস) কে পরিত্যাগ করতে কিছুতেই সম্মত নয়। আল্লাহ্তায়ালার ক্ষমার বৃত্তভূত হওয়ার কোনো রকম ইচ্ছাই তাদের নেই। তারা চির কপট, চির অবিশ্বাসী। তারা সত্যত্যাগী (ফাসেক)। সত্যত্যাগীদেরকে আল্লাহ্ কখনোই পথপ্রদর্শন করেন না (পথপ্রদর্শন করেন কেবল সত্যানু-সন্ধানীদেরকে)।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

❒ যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদিগের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা

আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করিল না এবং তাহারা বলিল 'গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না।' বল, 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম।' যদি তাহারা বুঝিত!

তাবুক যুদ্ধের সময় আবহাওয়া ছিলো প্রচণ্ড তপ্ত। ওই উত্তপ্ততাকে অজুহাত করে মুনাফিকেরা যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত রইলো। বাইরে বাইরে ইমানদার বলে নিজেদেরকে প্রকাশ করলেও অন্তরে অন্তরে তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তাই জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করার মহান আমন্ত্রণে তারা সাড়া দিতে পারলো না। রসুল স. এর সংগ পরিত্যাগ করাকেই তারা মনে করলো বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যান্য মুজাহিদকেও তারা প্রচণ্ড দাবদাহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিরুৎসাহিত করতে লাগলো। এ অবস্থাগুলোই এই আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে— যারা পশ্চাতে রয়ে গেলো, তারা রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকাতেই আনন্দ লাভ করলো এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা পছন্দ করলো না এবং তারা বললো, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. সকলকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড দাবদাহে তখন ঝলসে যাচ্ছে প্রকৃতি। এক লোক বললো, হে আল্লাহর রসুল! এই খরাতপ্ত পরিস্থিতিতে যুদ্ধে যাত্রা করবেন না। খুবই কষ্ট হবে আপনার। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াতের শেষাংশ— বলো উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তারা বুঝতো। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই অজ্ঞ জনতাকে বলে দিন, পৃথিবীর কষ্ট সাময়িক আর আখেরাতের কষ্ট চিরস্থায়ী। জাহান্নামের অনন্ত অনলের তুলনায় পৃথিবীর এই দাবদাহ কিছুই নয়। এই বাস্তব জ্ঞান তোমাদের থাকলে তোমরা এ কথা কিছুতেই বলতে পারতে না। হায়! তোমরা যদি বুঝতে পারতে।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, বনী সালমার জদ্, জব্বার বিন মুনছার ও তার সংগীরা বলেছিলো, এই প্রচণ্ড গরমে যুদ্ধযাত্রা করো না। যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা জদের একেবারেই ছিলো না। সে রসুল স. এবং ইসলাম সম্বন্ধে ছিলো সন্দিহান। তাই গরমের বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলো। তার এই অপআচরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'কুল নারু জাহান্নামা আশাদ্দু হাররান' (বলো, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম)। মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর সূত্রে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের সময় ছিলো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। বনী সালমার এক লোক তখন বলেছিলো, এতো গরমে বের হয়ো না। তার কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়— 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম।'

বায়হাকী লিখেছেন, এক মুনাফিক তখন বলেছিলো, এই প্রচণ্ড খরায় গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ো না। 'উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম'— এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তার কারণেই।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮২

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

❒ অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে তাহাদিগের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— গরমের অজুহাত দেখিয়ে তাবুক অভিযান থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে মুনাফিকেরা খুবই হাসি খুশি। ঠিক আছে, এভাবে তারা কিছুকাল হাসি খুশির সঙ্গে থাকুক। আগামীতে (আখেরাতে) তাদের কান্নার সীমা পরিসীমা থাকবে না। আর অনন্ত ওই কান্না হবে তাদের বর্তমানের এই অপকর্মের পরিণতি।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন 'ফাল ইয়াদ্বহাক্কু ক্বলীলা' অর্থ— কিঞ্চিৎ হেসে নিক। তাদের এ হাসি পৃথিবীর হাসি আর পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই বলা হয়েছে— (এখানে) কিঞ্চিত হেসে নিক। আর 'ওয়ালইয়াবকু কাছীরা' অর্থ প্রচুর কাঁদবে। অর্থাৎ আখেরাতে তারা অনন্তকাল ধরে কাঁদবে।

ইবনে মাজা, আবু ইয়ালী, বায়হাকী ও হান্নাদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, জাহান্নামীদের কান্না প্রবাহিত হবে একটি স্রোতস্বিনী রূপে। কাঁদতে কাঁদতে শেষ হয়ে যাবে চোখের জল। তারপর চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্ত। মুখমণ্ডলে দেখা দিবে গভীর ফাটল। ওই ফাটল এতো বড় হবে যে, অনায়াসে সেখানে নৌকা চলাচল করতে পারবে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস থেকে যথাসূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকবাসীরা এতো অধিক রোদন করবে যে, ওই রোদনস্রোতে অনায়াসে চলতে পারবে তরণী। চোখের জল শেষ হয়ে গেলে চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্তের ধারা।

হজরত জায়েদ বিন রাফে থেকে মারফুরূপে ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া এবং ইবনে জিয়াদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক বিশেষ সময় পর্যন্ত নরকবাসীদের চোখ থেকে ঝরতে থাকবে জলাশ্রু। তারপর তাদের চোখ থেকে ঝরতে থাকবে রক্তাশ্রু। ফেরেশতারা তখন বলবে, হে হতভাগারা ! পৃথিবীতে তো তোমরা

কাঁদতে না (কেবল আনন্দ ফুর্তি করতে), তবে এখন এভাবে কাঁদছো কেনো? নরকবাসীরা চিৎকার করে বলবে, আমাদের পিতা মাতা, পুত্র-কন্যা সকলেই পিপাসিত। কিছু পানি আমাদের দিকে প্রবাহিত করে দাও। চল্লিশ বছর ধরে এভাবে চিৎকার করতে থাকবে তারা। কিন্তু কোনো সাড়া পাবে না। শেষে তাদের উপর নেমে আসবে স্থায়ী নৈরাশ্য।

আমি বলি, এই আয়াতের মূল নির্দেশনা এ রকমও হতে পারে যে, পৃথিবীতে হাসতে হবে কম। বেশী হাসাহাসি করা মাকরূহ। বেশী হাসলে হৃদয় মরে যায়। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে হবে বেশী করে। এ রকম কান্না হবে পাপের ক্ষতিপূরণ।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে রোদন করতে অধিক। হাস্য করতে কম। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা। বোখারী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু হোরায়রা থেকে। আর বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেছেন আবু জর গিফারী থেকে। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটি— তোমরা পানাহারও ছেড়ে দিতে।

হজরত আবু দারদা থেকে তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তবে তোমরা রোদন করতে অধিক। হাসতে কম। আর খোলা প্রান্তরে যেয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীত প্রার্থনা জানাতে। কারণ তোমরা জানো না, তোমাদের অদৃষ্টে পরিত্রাণ রয়েছে কিনা। হজরত আবু হোরায়রা থেকে যথাসূত্রে হাকেম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার যা জানা আছে, তা যদি তোমাদের জানা থাকতো, তবে তোমরা রোদন করতে অত্যধিক, আনন্দ করতে অল্প। শোনো নেফাক (কপটতা) প্রকাশ হয়ে পড়বে, আমানত উঠে যাবে। অবলুপ্ত হবে রহমত। আমানতদারের প্রতি অপবাদ দেয়া হবে খেয়ানতের। কৃষ্ণবর্ণ নিশিথের মতো অচিরেই এসে পড়বে ফেত্‌না।

স্বসূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি রসুল স. তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, হে জনতা! তোমরা অত্যধিক রোদন করো। স্বাভাবিকভাবে রোদন না এলেও রোদনের চেষ্টা করো। দোজখবাসীদের কান্নার সীমা পরিসীমা থাকবে না। তাদের নয়নাশ্রু থেকে প্রবাহিত হবে নদী। অশ্রুপ্রবাহও শেষ হয়ে যাবে এক সময়। তারপর চোখ থেকে শুরু হবে রক্ত প্রবাহ। ওই পানি এবং রক্তের প্রবাহে ইচ্ছে করলে নৌকাও চালানো যাবে।

ইমাম আহমদ ও তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. বলেছেন, আমার জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। রমণীরাও উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে বিলাপ করতে থাকতো।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুমিন বান্দার দু'চোখ থেকে যদি মক্ষিকার মস্তকের পরিমাণ পানিও নির্গত হয়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি দোজখের আগুনকে করে দিবেন হারাম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮৩

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِیَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِیَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِیْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِیْنَ ○

❒ আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি বলিবে 'তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না; তোমরা তো প্রথম বার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদিগের সহিত বসিয়াই থাক।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় কোনো যুদ্ধযাত্রার সময় তাবুক যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ওই সকল মুনাফিকেরা যদি আপনার সঙ্গী হতে চায় তবে আপনি তাদেরকে বলে দিবেন, তোমরা তো আমার সহযোদ্ধা হতেই পারো না, আমার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই পারো না। ইতোপূর্বে তোমরা ঘরে বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, এখনও ওই সকল লোকদের সাথে থাকো যারা রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা যেমন নেই, তেমনি তোমরাও সমরযোগ্যতারহিত।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, মুনাফিকশ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তার পুত্র বিশুদ্ধ বিশ্বাসী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে উপস্থিত হয়ে মৃত পিতার কাফনের জন্য একটি কোর্তা প্রার্থনা করলেন। রসুল স. তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন। হজরত আবদুল্লাহ্ এরপর পিতার জানাযা পড়ানোর নিবেদন করলেন। রসুল স. তাতেও সম্মত হলেন। জানাযার উদ্যোগ নিতেই হজরত ওমর তাঁর পবিত্র পরিধেয় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, হে

আল্লাহ্‌র রসুল! স্মরণ করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে মুনাফিকদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রসুল স. বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, আমি মুনাফিকদের জন্য সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আমার প্রার্থনা গৃহীত হবে না। কিন্তু সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো না, এ রকম আমাকে বলা হয়নি। এ কথা বলে রসুল স. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৮৪, ৮৫

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ۝ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

❒ উহাদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জানাযায় প্রার্থনা করিবার জন্য উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না; উহারা তো আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় উহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

❒ সুতরাং উহাদিগের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্‌ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় উহাদিগের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

এখানে 'সলাত' (তুসাল্লি) অর্থ জানাযার নামাজ। জানাযার নামাজ মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। 'আবাদান' অর্থ— কখনোই নয়। 'আলা ক্ববরিহি' অর্থ কবরের পাশে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাযার প্রার্থনা করবার জন্য তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপরে যাদের মৃত্যু হয়েছে বলে আপনি জানেন, তাদের জানাযা পড়বেন না এবং ক্ষমাপ্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। কারণ এখন তারা হেদায়েত এবং সওয়াব থেকে চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্যুত। আপনার দোয়ার প্রতিক্রিয়া এখন আর তাদের নিকট পৌঁছবে না। চিরস্থায়ী মৃত্যু

ঘটেছে তাদের। তাদের অবস্থা এখন এ রকম— 'লা ইয়ামুতু ফীহা ওয়ালা ইয়াহ্ইয়া' (সেখানে তারা না পাবে জীবন, না পাবে মৃত্যু)।

হজরত ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন, মুনাফিক আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মারা গেলে রসুল স.কে তার জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমি তখন বললাম, ইবনে উবাই খাঁটি মুনাফিক। সে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। রসুল স. বললেন, সত্তর বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও আমার প্রার্থনা কবুল না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। আমি তাই তার জন্য সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। এ কথা বলে তিনি স. ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামাজ পড়লেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পক্ষণ পরেই অবতীর্ণ হলো সুরা বারাআতের দু'টি আয়াত।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে বোখারী লিখেছেন, রসুল স. ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে গিয়ে দেখলেন, ইতোমধ্যে তাকে কবরে শোয়ানো হয়েছে। তিনি কবর থেকে লাশ বের করালেন। তাঁর পবিত্র উরুদেশের উপর স্থাপন করলেন তার মাথা। তারপর তার মুখের উপর মুখ রেখে দোয়া করলেন এবং শেষে নিজের কোর্তাটি পরিয়ে দিলেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, মুনাফিক ইবনে উবাইয়ের পুত্র হজরত আবদুল্লাহ্ ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রসুল স. সকাশে দোয়ার দরখাস্ত করলেন । রসুল স.ও দোয়া করলেন। এই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

বিশুদ্ধ সূত্রে হাকেম এবং দালায়েল পুস্তকে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত উসামা ইবনে জায়েদ বলেছেন, ইবনে উবাই মৃত্যুশয্যায় রসুল স.কে ডেকে পাঠালো। বললো, আপনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আপনার দেহ সংলগ্ন বস্ত্র কাফন হিসেবে দান করুন এবং আমার জানাযার নামাজও পড়িয়ে দিন। রসুল স. তার মৃত্যুর পর কাফন হিসেবে দান করলেন গায়ের জামা এবং তার জানাযাও পড়লেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত।

হজরত জাবের থেকে বোখারী লিখেছেন, বদর যুদ্ধের বন্দীরূপে হজরত আব্বাসকে আনা হয়েছিলো মদীনায়। তখন তাঁর গাত্রাবরণ ছিলো না। তিনি

ছিলেন দীর্ঘদেহী। তাই কারো জামা তাঁর গায়ে লাগলো না। ইবনে উবাইও ছিলো দীর্ঘকায়। তাই তার গায়ের জামা ঠিকমতো লেগে গেলো আব্বাসের শরীরে। প্রিয় পিতৃব্যের প্রতি এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে রসুল স. ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর কাফন হিসেবে দান করেছিলেন তাঁর নিজের গায়ের জামা। বাগবী লিখেছেন, মৃত ইবনে উবাইয়ের সঙ্গে রসুল স. যে আচরণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোনো কোনো সাহাবী জানিয়েছিলেন মৃদু অনুযোগ। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমার জামা ও জানাযা পাঠ তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তবুও আমি বস্ত্র দান ও জানাযা পাঠ করেছি এ কারণে যে, আমার এ আচরণ দেখে তার গোত্রের অন্ততঃ এক হাজার লোক যেনো মুসলমান হয়। তাই হয়েছিলো। রসুল স. এর এই মহান ও বিরল আচরণ দেখে ইবনে উবাইয়ের গোত্রের এক হাজার লোক সর্বান্তঃকরণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

ইমাম বাগবী আরো লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. আর কোনো মুনাফিকের জানাযা পড়েননি। কোনো মুনাফিকের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়াও করেননি।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করেছিলো এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।' মুনাফিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করার এবং তাদের কবরের পাশে না দাঁড়ানোর দু'টি কারণ বিবৃত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে। একটি হচ্ছে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অস্বীকৃতি। আরেকটি হচ্ছে— সত্যত্যাগী (ফাসেক্ব) অবস্থায় মৃত্যুবরণ।

পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেনো বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো তার দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; তারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।' এই আয়াতেও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মুনাফিকদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেনো আপনাকে বিমুগ্ধ না করে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য পার্থিব জীবনের শাস্তি। এভাবে ঘোর পার্থিবতায় নিমগ্ন রেখে তাদের জীবনাবসান ঘটানোই আল্লাহ্‌তায়ালার অভিপ্রায়। এ রকমও হতে পারে যে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত মুনাফিকদের সম্পর্কে নয়, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে অন্য কোনো অবাধ্য সম্প্রদায় সম্পর্কে।

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ
أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ○ رَضُوا بِأَن
يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ○ لَٰكِنِ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ
لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

❒ 'আল্লাহে বিশ্বাস কর এবং রসূলের সঙ্গী হইয়া সংগ্রাম কর' এইমর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শক্তি সামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও, যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদিগের সঙ্গেই থাকিব।'

❒ উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করিয়াছে এবং উহাদিগের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে, উহারা বুঝিতে পারে না।

❒ কিন্তু রসূল এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করিয়াছে; উহাদিগের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

❒ আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে; ইহাই মহাসাফল্য।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমটির মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং রসুলের অনুগামী হয়ে যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত নির্দেশ যখন অবতীর্ণ হয়, তখন শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী মুনাফিকেরাও আপনার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে রেহাই দেয়া হোক। আমরাও তাদের মতো ঘরে বসে থাকবো, যারা ঘরে বসে থাকে।

দ্বিতীয়টির (৮৭) মর্মার্থ হচ্ছে— ওই মুনাফিকেরা গৃহাভ্যন্তরবাসিনীদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। তাদের অন্তরে মোহর করা হয়েছে বলেই তারা এ রকম করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। এখানে 'আল খাওয়ালিফি' শব্দটির অর্থ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীকুল। শব্দটি বহুবচন বোধক। এর একবচন হচ্ছে 'খালিফাতুন।' কেউ কেউ বলেছেন, অপ্রয়োজনীয়, অকর্মণ্য এবং কর্মহীন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'আল খাওয়ালিফি।' 'আরবী প্রবাদে রয়েছে, 'ফুলানুন খালিফাতু কওমিহি' অর্থ— অমুক ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে নিম্নমানের (অকর্মণ্য)। এ রকম হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে — মুনাফিকেরা অকর্মণ্য লোকদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। এ রকম করার কারণ তাদের হৃদয় রুদ্ধ, মোহরাঙ্কিত। তাই তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এবং রসুল স. এর অনুগমনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সৌভাগ্য। আর এর বিপরীতে রয়েছে দুর্ভাগ্য, কেবলই দুর্ভাগ্য।

তৃতীয়টির (৮৮) মর্মার্থ হচ্ছে — আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কারো মুখাপেক্ষী নন। মুনাফিকেরা জেহাদে অংশগ্রহণ না করলেও আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না। ধর্ম রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে একদল বিশুদ্ধচিত্ত ধর্মযোদ্ধা। মহান জেহাদের আমন্ত্রণে কেবল আল্লাহ্র জন্য তারা উৎসর্গ করবে তাদের জীবন ও সম্পদ। ওই সকল সমর্পিতপ্রাণ বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সমূহ কল্যাণ। তারাই সফলকাম। এখানে 'আল খইরাত্' শব্দটির অর্থ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ বেহেশতের হুর সমূহ। আল্লাহ্পাক তাদের সম্পর্কে বলেছেন— ফীহিন্না খইরাতুন হিসানুন (সেখানে রয়েছে অনিন্দসুন্দরী হুর)। 'খইরাত্' শব্দটি 'খইরাহ্' এর বহুবচন। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'খইর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— ফালা তা' লামু নাফসুম্ মা উখ্ফিয়া লাহুম মিন্ কুররাতি আইনিন (কেউ জানে না যে, তারা কিরূপ নয়নের অধিকারিণী, তাদেরকে গোপন রাখা হয়েছে)।

আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাস 'খইর' শব্দটির মধ্যে সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত বলে জেনেছেন। আর আল্লাহ্পাক প্রদত্ত সকল কল্যাণের প্রকৃতি ও পরিমাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন, শব্দটির প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

চতুর্থটির (৮৯) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা আল্লাহ্র পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী ওই সকল মুজাহিদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে ; এটাই মহা সফলতা।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

❐ মরুবাসীদিগের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসিল এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল তাহারা বসিয়া রহিল, উহাদিগের মধ্যে যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবে।

এখানে 'আল মুয়াজ্‌জিরূনা ' কথাটি এসেছে, বাবে ইফতিয়ালরূপে। কথাটির মূল রূপ ছিলো 'মুয়্‌তাজিরূনা'। ফাররা এ রকম বলেছেন। অথবা 'আল মুয়াজ্‌জিরূনা' এসেছে 'বাবে তাফয়িল' থেকে। অর্থাৎ ওই সকল মরুবাসী সঠিক অজুহাত পেশ করেনি। মিথ্যা অজুহাত উত্থাপন করেছিলো তারা। যেমন বলেছিলো, আমি পীড়িত। কিন্তু সে পীড়িত নয়। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করে অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য এলো এবং যারা আল্লাহকে ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা কথা বলেছিলো তারা বসে রইলো।'

মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন , কতিপয় মুনাফিক রসুল স. এর নিকটে এসে জেহাদ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলো। কিন্তু এর পশ্চাতে তাদের কোনো উপযুক্ত কারণ ছিলো না। রসুল স. তাদেরকে অব্যাহতি দান করেন।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইবনে মারদুবিয়া উল্লেখ করেছেন, উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন না করা সত্ত্বেও রসুল স. মুনাফিক জদ্ বিন কায়েসকে জেহাদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন মুনাফিক রসুল স. এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! আমাদেরকেও দয়া করে যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন। এই অসহ্য গরমে আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যাত্রা সম্ভব নয়। রসুল স. তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হলো— তারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রসুলকে মিথ্যা বলেছে। ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ওই লোকগুলো ছিলো বনী গিফার সম্প্রদায়ের। তাদের সংখ্যা ছিলো দশের চেয়েও কম। মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিলো বিরাশি জন। খিফাফ বিন ঈশাও ছিলো তাদের মধ্যে। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়— ওয়া ইজা উনজিলাত্ সুরাতুন ..... ওয়া তারাআল্লাহু আ'লা কুলুবিহিম ফাহুম লা ইয়া'লামুন।

জুহাক বলেছেন, মিথ্যা অজুহাত উপস্থাপন করেছিলো আমের বিন তোফায়েলের গোত্রের লোকেরা। তারা বলেছিলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা যদি যুদ্ধে গমন করি, তবে তাঈ গোত্রের লোকেরা এসে আমাদের পরিবার পরিজন ও পশুপাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। রসুল স. বলেছিলেন, তোমাদের সম্পর্কে আমাকে পূর্বাহ্নে অবগত করানো হয়েছে। ভবিষ্যতেও আর তোমাদের দরকার পড়বে না। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে সকল লোক যুদ্ধে যেতে চায়নি, রসুল স. অতুষ্ট হলেও তাদের মিথ্যা অজুহাত মেনে নিয়েছিলেন।

'ওয়া জায়াল মুয়াজ্জিরূনা ' কথাটির মধ্যে মিথ্যা অজুহাত উত্থাপনকারীরা সহ ওই সকল মুনাফিকেরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা অজুহাত উত্থাপন করেনি, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করেছিলো। উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে তাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হবে। উল্লেখ্য যে, এই শাস্তি তাদের জন্য নয়, যারা অলসতা বশতঃ যুদ্ধ গমন থেকে বিরত ছিলো। কারণ তারা মুনাফিক ও কাফের— কোনোটাই নয়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি ছিলাম রসুল স. এর প্রত্যাদেশ লেখক (কাতেব)। আমি সুরা বারাআতের আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলাম। সেদিন রসুল স. প্রত্যাদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। কানে কলম গুঁজে আমিও বসেছিলাম তাঁর পাশে। ইত্যবসরে এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহর রসুল! আমি অন্ধ। আমার উপরে কী নির্দেশ? তাঁর ওই কথার উপরে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯১

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

❐ আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকিলে যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাহাদিগের কোন অপরাধ নাই। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

'দ্বয়াফায়ি' অর্থ বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অক্ষম, দুর্বল। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ শিশু। আবার কেউ বলেছেন নারী। 'মারদ্বা' অর্থ অন্ধ এবং এ ধরনের পীড়িত ব্যক্তি। 'হারাজুন' অর্থ স্বাধীনতা,

অপরাধ। এ ধরনের ব্যক্তিরা জেহাদে না গেলে তাদের গোনাহ্ হবে না— যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে (প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আনুগত্য থাকে)। এ কথাগুলোই এই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি অবিমিশ্র অনুরাগ থাকলে যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ তাদের কোনো অপরাধ নেই।'

এরপর বলা হচ্ছে— 'যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতি অভিযোগের কোনো হেতু নেই ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— যারা সৎকর্ম প্রিয় তাদেরকে অভিযুক্ত করার কোনো কারণই নেই। আল্লাহ্তায়ালা ক্ষমাপরবশ এবং পরম দয়ার্দ্র। তিনি বিশ্বাসী পাপীদের অপরাধ মার্জনা করে থাকেন এবং তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং যারা সৎকর্মঅন্তপ্রাণ তাদের প্রতি তো ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করবেনই।

বাগবী লিখেছেন, কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবেদ বিন আমর এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে। জুহাক বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে। তিনি ছিলেন অন্ধ। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও ইবনে সা'দ এবং হজরত জাবের থেকে কেবল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে এসে বললেন, তোমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছো, অতিক্রম করেছো দুর্গম পথ, সওয়াবও লাভ করেছো। আর একদল লোক মদীনায় বসে থেকেই তোমাদের সাথী হয়েছে। পেয়েছে যুদ্ধের সওয়াব। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! তারা তো যুদ্ধেই যায়নি (থেকে গিয়েছে মদীনায়)। রসুল স. বললেন, তা ঠিক। কিন্তু তাদের ছিলো উপযুক্ত ওজর। এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯২, ৯৩

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۝ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

❑ উহাদিগের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোন হেতু নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদিগের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছিনা; উহারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

❒ যাহারা অভাবমুক্ত হইয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত থাকাই পছন্দ করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে, উহারা বুঝিতে পারে না।

এই আয়াতেও চলে এসেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। আর্থিক সমস্যার কারণে যে সকল সাহাবী জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাঁদের মনোবেদনার কথা বিবৃত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তাঁদের নিজেদের বাহন ছিলো না। রসুল স.ও তাঁদের বাহনের কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেননি। মহান জেহাদে অংশ গ্রহণ না করতে পারার দুঃখে তাঁরা অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে গিয়েছিলেন। তাই কিছুতেই তাঁদেরকে জেহাদে না যাওয়ার দায়ে দায়ী করা যায় না। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো হেতু নেই, যারা তোমার নিকটে বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসমর্থজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেলো।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কতিপয় বিত্তহীন সাহাবী রসুল স.এর নিকটে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রসুল স. বললেন, তোমাদের বাহনের যোগাড় তো আমি করতে পারলাম না। এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন ওই জেহাদপ্রিয় সাহাবীগণ। জলভরা চোখ নিয়ে প্রস্থান করলেন সেখান থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, হজরত মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর, হজরত ইয়াজিদ বিন রুম্মান থেকে ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, জুহুরী এবং হজরত কাতাদা থেকে আবদুল্লাহ্ বিন আবী বকর ও আসেম বিন মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময়ে রসুল স. এর নিকটে সাহাবীগণের একটি দল বাহনপ্রার্থী হলেন। তাঁরা ছিলেন বিত্তহীন। রসুল স. এর সঙ্গচ্যুত হওয়া তাঁদের জন্য ছিলো মর্মবিদারক। রসুল স. তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা আমি করতে পারলাম না। এ কথা শুনে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। প্রস্থান করলেন অশ্রুবিগলিত নেত্রে।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বলেছেন, ওই সকল সাহাবীগণের নামের তালিকা সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মতপ্রভেদ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বনী আমর বিন আউফ গোত্রের হজরত সালেম বিন উমাইর আউসি, হজরত উলিয়া ইবনে জায়েদ, হজরত আবু লায়লা বিন আবদুর রহমান বিন কা'ব এবং হজরত হরমী বিন আবদুল্লাহ্। এই কয়েকজন সম্পর্কে সকলেই একমত।

হজরত আরবাজ বিন সারিয়ার প্রতি একমত কারাজী। ইবনে ইসহাক ও ওয়াকেদী ইবনে সা'দ বিন হাজাম, আবু ওমর এবং সুহাইলীও এ রকম বলেন। আবু নাঈম কথাটিকে সম্পৃক্ত করেছেন হজরত ইবনে আব্বাসের সঙ্গে। কারাজী ও ইবনে ইসহাকের মতে হজরত আমর ইবনে হাজাম ইবনে জামুহও ছিলেন তাঁদের দলে। ওই দলের একজন যে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল ছিলেন, সে ব্যাপারেও রয়েছে কারাজী, ইবনে উকবা এবং ইবনে ইসহাকের ঐকমত্য।

ইবনে সা'দ, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান এবং ইবনে হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল বলেছেন, যাদের সম্পর্কে কোরআন মজীদে অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, আমিও ছিলাম তাদের একজন।

আউফি সূত্রে ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. জেহাদের জন্য সকলকে প্রস্তুত হতে বললেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল সহ কয়েকজন সাহাবী নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদেরকে যুদ্ধাশ্ব প্রদান করুন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট তো অতিরিক্ত কোনো বাহন নেই। এ কথা শুনে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে করতে চলে গেলেন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

কারাজী ও ইবনে ওমর বলেছেন, সাখারের পুত্র সালমাও ছিলেন ওই দলে। কারাজী সালমাকে উল্লেখ করেছেন সালমান বলে। হজরত ওমর ইবনে আনমা বিন আদী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর মাজানীর নামোল্লেখ করেছেন কারাজী এবং ইবনে উকবা। আর এককভাবে কারাজী নামোল্লেখ করেছেন হজরত আবদুর রহমান বিন জায়েদ হারেসী, হজরত হরমী বিন আমর মাজানীর।

মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, হজরত ওমর ইবনে আউফও ছিলেন ওই সকল সাহাবীর অন্তর্ভূত। ইবনে সা'দ লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত মা'কাল বিন ইয়াসারের কথা। হাকেম উল্লেখ করেছেন হজরত হারকী বিন মোবারক বিন নাজ্জারের নাম। ইবনে আবদ তাঁদের অন্তর্ভূত করেছেন হজরত মাহদী বিন আবদুর রহমানকে এবং মোহাম্মদ বিন কা'ব হজরত সালেম বিন আমর ওয়াকেফিকে।

ইবনে সা'দ লিখেছেন, কোনো কোনো লোক বলেছেন, যারা অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মাকানের সাত পুত্র। তাঁরা সকলেই ছিলেন মাজানী গোত্রের। তাঁরা ছিলেন হজরত নোমান সুবীদ, হজরত মুগাফ্ফাল, হজরত আকিল, হজরত সানান প্রমুখ।

ইউনুস ও ইবনে ওমর সূত্রে ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হজরত উলিয়া বিন জায়েদের কোনো বাহন ছিলো না। তাই তিনি রসুল স. এর নিকটে বাহন চাইলেন। কিন্তু পেলেন না। মনের দুঃখে তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি জেহাদের নির্দেশ দিয়েছো, অথচ আমি বাহনের অভাবে যুদ্ধযাত্রা করতে অসমর্থ। সুতরাং আমার যতটুকু সম্পদ আছে, সবই আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে দান করে দিলাম। পরদিন প্রাতে অন্য আরো অনেকের মতো হজরত উলিয়া উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. বললেন, আজ রাতে যে সদ্‌কা প্রদান করেছে সে কোথায়? হজরত উলিয়া উঠে দাঁড়ালেন। রসুল স. বললেন, তোমার জন্য শুভ খবর। যার অলৌকিক হস্তে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! (অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও) তোমার দান আল্লাহ্‌পাক গ্রহণ করেছেন।

ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, বাহনপ্রার্থীরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। রোদনরত দুই সাহাবী হজরত আবু ইয়ালী ও হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফালের সঙ্গে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটলো হজরত ইয়েমিন বিন আমর নাজারীর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেনো? তাঁরা বললেন, আমরা রসুল স. এর নিকটে বাহন চেয়েও পেলাম না। বাহন ক্রয় করবার সামর্থ্যও আমাদের নেই। এখন আমরা জেহাদে যাবো কেমন করে। মহান জেহাদের পুণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ অসহনীয়। হজরত ইয়েমিন তাঁদেরকে দান করলেন একটি পানি সিঞ্চনের উট এবং দুই সা' যব। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে এই কথাগুলো— হজরত আব্বাস বিন মুত্তালিবও দু'জনের বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান প্রায় পুরো সেনাবাহিনীকে সোয়ারী সজ্জিত করে দেয়ার পরেও ওই দলের তিন সাহাবীকে বাহন প্রদান করেছিলেন।

আমি বলি, বাহনবিবর্জিত সাহাবী ছিলেন মোট ষোলো জন। তাঁদের মধ্যে সাতজনের বাহনের বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণনাকারীর সন্দেহের কারণে ওই সাতজনের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখিত হয়নি। যা হোক, জেহাদের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে অশ্রুভারাক্রান্ত ওই সকল সাহাবীকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, আমি আশয়ার গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে রসুল স. সকাশে বাহনপ্রার্থী হয়েছিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার সঙ্গীরা রসুল স. সকাশে বাহন প্রার্থনার জন্য আমাকে প্রেরণ করলো। যথারীতি আমি আমার প্রার্থনা জানালাম। রসুল স.

ছিলেন রোষতপ্ত অবস্থায় (জালালী হালে)। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে বাহন দিবো না। আমি সরে এলাম। সঙ্গীদেরকে জানালাম এ কথা। চিন্তিত হয়ে পড়লাম এই ভেবে যে, আমি হয়তো রসুল স. এর পবিত্র মর্জিবিরোধী কিছু বলেছি। ইত্যবসরে এক স্থান থেকে গণিমতের কিছু উট এলো। ডাক পড়লো আমার। হজরত বেলাল ডেকে বললেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস কোথায়? আমি তাঁর সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, রসুল স. তোমাকে ডেকেছেন। আমি ভয়ে ভয়ে রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, এই উট দু'টো নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গীদেরকে বলো, আল্লাহ্ এ দু'টোকে প্রেরণ করেছেন। আমি উট দু'টো নিয়ে সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। বললাম, বাহন ছিলো না বলে রসুল স. প্রথমে বাহন দিতে অস্বীকার করেছিলেন। পরে ব্যবস্থা হয়েছে বলে এই উট দু'টো দিয়েছেন। তোমরা এগুলোতে আরোহণ করো। এবার তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো, আমি সত্য বিবরণ দিয়েছি কিনা। সাথীরা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি সত্য বলেছেন। এরপর আমরা সকলে এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এই উট দু'টোর মাধ্যমে আমরা কোনো বরকত মনে হয় পাবো না। কারণ, রসুল স. হয়তো উট দু'টো দিয়েছেন অসন্তোষের সঙ্গে। এ কথা ভেবে আমরা হাজির হলাম তাঁর মহান সাহচর্যে। তিনি স. বললেন, আমি তোমাদেরকে উট দু'টো দিইনি। দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা। তাই আমি আমার কসম ভেঙেছি। ভবিষ্যতেও আমি এ রকম করবো। কসম করার পর কসমবিরোধী উত্তম কিছু পেলে কসম ভাঙতে দ্বিধা করবো না। প্রদান করবো কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা।

পরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— 'যারা অভাবমুক্ত হয়েও অব্যাহতি প্রার্থনা করেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। তারা অন্তঃপুর-বাসিনীদের সঙ্গে থাকাই পছন্দ করেছিলো; আল্লাহ্ তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন, ফলে তারা বুঝতে পারে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, যুদ্ধাযাত্রার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা ক্ষমার্হ নয়। তাদের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হওয়ার কারণ বিদ্যমান। তারা সুমহান জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্দরমহলের রমণীকুল, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অকর্মণ্য, বিত্তহীন, শিশু ও বয়োবৃদ্ধদের সঙ্গেই অবস্থান করাকে ভালো মনে করেছে। তাদেরই অনড় অনানুগত্য ও ঔদাসীন্যের কারণে আল্লাহ্তায়ালা তাদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। তাই তাদের অবরুদ্ধ হৃদয়ে তাদের অপকর্ম সমূহের দূরবর্তী কোনো আত্মবিশ্লেষণ ও অপরাধবোধ একেবারেই নেই। তাই তারা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবিবর্জিত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ○

❒ তোমরা উহাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদিগের নিকট অজুহাত পেশ করিবে; বলিও, 'অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদিগের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদিগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। অতঃপর, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যা-বর্তিত করা হইবে এবং তিনি, তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

❒ তোমরা উহাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহের শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা কর এই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা উহাদিগকে উপেক্ষা করিবে; উহারা ঘৃণ্য এবং উহাদিগের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম উহাদিগের আবাসস্থল।

❒ উহারা তোমাদিগের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদিগের প্রতি তুষ্ট হও এই উদ্দেশ্যে; তোমরা উহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মধ্যেও ওই সকল মুনাফিকের কথা বিধৃত হয়েছে, যারা বিভিন্নভাবে টালবাহানা করে তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলো। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিলো আশিজন। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিকদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হবে তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতত্রয়ে। সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স. সহ সকল সাহাবীগণকে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করবে; বোলো, অজুহাত পেশ কোরো না, আমরা তোমাদেরকে কখনোই বিশ্বাস করবো না; আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন।' এখানে 'আল্লাহ্পাক আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন' অর্থ— পূর্বাহ্নে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সকল অপকথন ও অপকর্ম সম্পর্কে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের রসুল স.কে।

এরপর বলা হয়েছে—'অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল মুনাফিককে জানিয়ে দিন, আল্লাহ্তায়ালা সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য অবস্থার সম্যক পরিজ্ঞাতা। তাই তোমাদের অন্তর বাহিরের কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়। তোমরা যা কিছুই করো না কেনো অবশেষে তোমাদের সকলকে তাঁর নিকটে ফিরে যেতেই হবে। তখন তোমাদের অপকর্মের যথোপযুক্ত শাস্তিদান তিনি করবেনই।

পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা আল্লাহ্র শপথ করবে যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করো এই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা করবে; তারা ঘৃণ্য এবং তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! মুনাফিকেরা নিজেদেরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করে বসবে, যেনো তোমরা তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত না করে বসো। তোমরা কিন্তু তাদের কথা বিশ্বাস কোরো না। তাদেরকে উপেক্ষা কোরো। কারণ তারা ঘৃণিত আর তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ রয়েছে জাহান্নামের আবাস। এখানে মুনাফিকদেরকে ঘৃণিত ও জাহান্নামী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বাসীদের প্রতি এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেনো মুনাফিকদেরকে উপেক্ষা করে এবং তাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করে। এ রকম করলে হয়তো কখনো তাদের শুভবোধ জাগ্রত হতেও পারে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক জদ্ বিন কায়েস, মু'তাব বিন কুশায়ের এবং তাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে। তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিলো আশিজনের মতো। রসুল স. সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ছেড়ে দাও, কথাবার্তাও বন্ধ করে দাও।

মুকাতিল বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিক ইবনে উবাই সম্পর্কে। সে রসুল স.কে বলেছিলো, এযাত্রা আপনি আমার উপর প্রসন্ন হোন। যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেই আল্লাহ্র কসম খেয়ে আমি বলছি আর কোনো যুদ্ধেই আমি আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবো না।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের শেষটিতে (৯৬) বলা হয়েছে— তারা তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও এই উদ্দেশ্যে, তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। এখানে 'আলফাসিক্বীনা' অর্থ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। এ কথার মাধ্যমে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাবুক যুদ্ধ থেকে বিরত মুনাফিকদেরকে। বলা হয়েছে, হে আমার রসুল ও রসুলের অনুচরবৃন্দ! মুনাফিকদেরকে শপথ করতে দেখে তোমরা হয়তো তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যেতেও পারো। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের প্রতি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না। কারণ তিনি সকলের সব কিছু জানেন। জানেন অন্তরের অন্তস্থলের সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সংবাদ। সুতরাং তোমাদের প্রসন্নতা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্র জ্ঞানে তারা খাঁটি মুনাফিক। তাই দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে সীমাহীন অপমান ও লাঞ্ছনা। অতএব হে আমার রসুলের অনুচরকুল! তোমরা মুনাফিকদের প্রতারণার ফাঁদে কিছুতেই পা দিয়ো না।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ○ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ
اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❑ সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমারেখার জ্ঞান লাভ না করার যোগ্যতা ইহাদিগের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❒ মরুবাসীদিগের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহের পথে ব্যয় করে তাহাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদিগের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদিগেরই হউক! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ মরুবাসীদিগের কেহ কেহ আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহের সান্নিধ্যে ও রসূলের আর্শীবাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই উহা উহাদিগের জন্য আল্লাহের সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন; আল্লাহ্ উহাদিগকে নিজ করুণাগ্রাহী করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মরুচারী বেদুইনদের স্বভাব চরিত্রের কথা। বলা হয়েছে, সভ্য সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বড়ই ক্ষীণ। বহু যুগ থেকে তারা নবী রসুল অথবা পুণ্যবানদের সাক্ষাত পায়নি। তাই সত্যপ্রত্যাখ্যান ও কপটতায় (কুফরী ও মুনাফিকিতে) তারা অনড়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, চিহ্নিত করে দিয়েছেন সত্য ও মিথ্যার যে পার্থক্যরেখা, বৈধতা ও অবৈধতার যে সীমারেখা, সে সম্পর্কে তাদের অযোগ্যতা অত্যধিক। আর আল্লাহ্‌তায়ালা সর্বজ্ঞ (আ'লীম) ও প্রজ্ঞাময় (হাকিম)। তাই পৃথিবী ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয় তিনি সম্পন্ন করেন নির্ভুল প্রজ্ঞাময়তার সঙ্গে।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে।'

আতা বলেছেন, 'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে' কথাটির অর্থ— তারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের নিকটে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করেছে। অন্তর থেকে তারা ইসলামকে স্বীকার করেনি। তাই আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয়কে তারা মনে করে বৃথা ব্যয়। ব্যয় করতে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু দান করলে সওয়াব পাওয়া যাবে এবং অত্যাবশ্যক দান না করলে ভোগ করতে হবে আযাব— এ রকম বিশ্বাস নিয়ে তারা দান করে না। আর 'তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে' কথাটির অর্থ— তারা অপেক্ষা করে রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের। আশায় আশায় থাকে, তাঁর মহাতিরোধানের পর তারা পুনরায় হয়ে উঠতে পারবে স্বেচ্ছাচারী। মুক্তিলাভ করবে প্রবৃত্তিবিরোধী বাধ্যবাধকতা থেকে।

এখানে 'তারাব্বাসু বিকুমুদ্ দাওয়াইরা' অর্থ ভাগ্যচক্র বা ভাগ্য বিপর্যয়। 'দায়রা' অর্থ চক্র বা বৃত্ত। শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক। এর ধাতুমূল হচ্ছে 'দাওরুন'। 'দারা'ই হচ্ছে অতীতকালবোধক। আর 'ইয়াদুরু' হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল-বোধক সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উত্থান-পতন ও কল্যাণ অকল্যাণ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অবিশ্বাসী মরুবাসীরা তাই মনে করতো ইসলামের সর্বগ্রাসী প্রভাব নিশ্চয়ই চিরদিন থাকবে না । ইসলামের প্রবক্তা হজরত মোহাম্মদ স. পৃথিবী থেকে চলে যাবেনই। তখন আবার তারা ফিরে পাবে তাদের অবলুপ্ত প্রভাব প্রতিপত্তি। এমতো আশা নিয়েই তারা প্রতীক্ষারত।

এরপর বলা হয়েছে, মন্দভাগ্যচক্র তাদেরই হোক! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এ কথার অর্থ— অবিশ্বাসী কপট মরুবাসীদের আকাঙ্খা কখনোই ফলপ্রসূ হবে না। কারণ আল্লাহ্ চান তাদের মন্দ ভাগ্য চিরস্থায়ী হোক। তিনি সর্বশ্রোতা। তাই তাদের সকল অপকথন রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন শ্রুতির আওতায়। আর তিনি সর্বজ্ঞও। তাই সকলের সকল প্রকার ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে অবগত। তাই তিনি নিশ্চিত করবেন প্রত্যেকের যথোপযুক্ত পরিণতি।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে বনী আসাদের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় বনী ব্যক্তি, গাতফান, বনী তামীম এবং কতিপয় মরুবাসী গোত্র সম্পর্কে। আবু শায়েখ ও কালাবীও এ রকম বলেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যে বনী তামীমের উল্লেখ নেই।

পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— 'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহের সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন; আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ করুণাগ্রাহী করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

বাগবী লিখেছেন, ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মুজায়েনা গোত্রের মাকরানের সন্তানদের সম্পর্কে। ইতোপূর্বেও তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো— 'ওয়ালা আলাল্ লাজীনা ইজা মা আতাওকা লিতাহ্মিলাহুম।' (আর তাদের উপর নয়, যারা আপনার নিকট এসেছিলো আপনার সহগামী হওয়ার উদ্দেশ্যে)। হজরত আবদুর রহমান ইবনে মুগাফ্ফাল মাজানী স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, আমরাই ছিলাম মাকরানের দশ পুত্র। কালাবী বলেছেন, তামীম গোত্রের আসাদ বিন খুজাইমা এবং হাওয়াজেন ও গাতফান গোত্রভূত বনী আসলাম, বনী গিফার ও জুহুনিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী গিফারকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বনী আসলামকে রেখেছেন নিরাপদ। কিন্তু বনী ওসাইয়া করেছিলো আল্লাহ্ ও রসুলের নাফরমানী। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেন, (কুরায়েশ, আনসার, জুহুনিয়া, মুজাইয়েনা, আসলাম, গিফার এবং আশজায়ীরা একে অপরের বন্ধু) আর তাদের সকলের বন্ধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুল ছাড়া আর কেউ নয়।

হজরত আবু বকর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আসলাম গিফার, মুজাইয়েনা ও জুহুনিয়া গোত্র তামীম ও আমের গোত্রের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ ছিলো। তারা আসাদ ও গাতফান অপেক্ষা ছিলো উত্তম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, তামীম, আসাদ, খুজাইমা,

হাওয়াজেন, গাতফান গোত্রগুলো অপেক্ষা আসলাম, গিফার, কতিপয় জুহুনিয়া ও মুজাইয়েনা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকটে অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, 'রসুলের আশীর্বাদ' কথাটির অর্থ রসুলের দোয়া বা ক্ষমাপ্রার্থনা । তিরমিজি ব্যতীত অন্য বিশুদ্ধবর্ণনাকারীরা লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন আউফা বর্ণনা করেছেন, আমি যখন রসুল স. এর নিকটে আমার জাকাতের মাল অর্পণ করলাম তখন তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! আবু আউফা এবং তার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো। 'বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভের অবলম্বন'— কথাটির মাধ্যমে মরুবাসী বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দান নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও রসুলের আশীর্বাদ লাভের অবলম্বন।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ করুণাগ্রাহী করবেন।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে আপন করুণায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। চিরদিনের জন্য ক্ষমা করবেন তাদেরকে। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০০

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

❒ মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যাহারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যাহারা সদনুষ্ঠানের সহিত তাহাদিগের অনুগমন করে আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহাসাফল্য।

এখানে 'ওয়াস্ সাবিক্বুনাল আউয়ালুন' অর্থ— প্রাথমিক অগ্রানুসারী। মুহাজির বলা হয় তাদেরকে যারা ধর্ম রক্ষার জন্য জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মক্কার ওই বিশিষ্ট সাহাবীগণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মদীনার কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী। আনসার বলা হয় তাঁদেরকে।

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সাবেক্বীন কারা?

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সাবেক্বীন বা অগ্রানুসারী কারা সে সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা এসেছে। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কাতাদা, ইবনে সিরিন ও তাবেঈনের একটি দল বলেছেন, যারা উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন তাঁরাই সাবেক্বীন। হজরত আতা বিন আবী রেবাহ্ বলেছেন, সাবেক্বীন হচ্ছে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দ। শা'বী বলেছেন, হুদায়বিয়ায় বায়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারীরা হচ্ছেন সাবেক্বীন। কারো কারো মতে মুহাজিরগণের মধ্যে কেবল আটজন সাহাবী সাবেক্বীনদের অন্তর্ভুক্ত— যারা সকলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ওই আটজন মুহাজির হচ্ছেন হজরত আবু বকর, হজরত জায়েদ বিন হারেসা, হজরত ওসমান বিন আফ্ফান, হজরত যোবায়ের বিন আওয়াম, হজরত আলী বিন আবু তালেব, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ, হজরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্।

বাগবী লিখেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রসুল স. এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী উম্মত জননী হজরত খাদিজাতুল কোবরা। এটা ঐকমত্যসম্মত। এরপর কে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতপ্রভেদ রয়েছে। হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, জননী খাদিজার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত আলী। এ সম্পর্কে হজরত আলীর কবিতাটি উল্লেখ্য। কবিতাটি এই— সাবাকতুকুম ইলাল ইসলামী তুররন গুলামাম মাবালাগতু আওয়ানা হুলমিন। অর্থ— আমি তখন বালকই ছিলাম, তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। কিন্তু আমি সকলের পূর্বে অনুপ্রবেশ করেছিলাম ইসলামে। মুজাহিদ ও ইবনে ইসহাকের মতে হজরত আলী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মাত্র দশ বছর বয়সে। কারো কারো মতে জননী খাদিজার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত আবু বকর। এই অভিমতের প্রবক্তা হজরত ইবনে আব্বাস, ইব্রাহিম নাখয়ী এবং আমের শা'বী। হজরত হাস্সানের কবিতায় এই অভিমতটির সমর্থন রয়েছে। কবি হজরত হাস্সান ওই কবিতায় হজরত আবু বকরের প্রশংসাছলে বলেছেন— রসুল স. তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

জুহরী এবং ওরওয়া ইবনে জুহুরীর মতে জননী খাদিজার পরে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা। মতপৃথকতা নিরসনার্থে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম হানযালী বলেছেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন রমণীগণের মধ্যে জননী খাদিজা, প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে হজরত আবু বকর, বালকদের মধ্যে হজরত আলী এবং মুক্ত ক্রীতদাসদের মধ্যে হজরত জায়েদ ইবনে হারেসা ।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর হজরত আবু বকর তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে দেন এবং অন্য সকলের প্রতি ইসলামের আহ্বান জানান। তিনি ছিলেন সর্বজননন্দিত। মহান চরিত্রাধিকারী। কুরায়েশদের বংশীয় ইতিবৃত্ত এবং সমাজ তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল। ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। ছিলেন দানশীল। বিচক্ষণতা, মানবিকতা ও উন্নততর দিক নির্দেশনাদাতা হিসেবে সকলেই তাঁকে মান্য করতো। শুভ পরামর্শ গ্রহণের জন্য সমবেত হতো তাঁর কাছে। তিনি তাঁর সুহৃদগণকে মহান ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ফলে নির্দ্বিধায় ইসলামের পথে আগমন করেছিলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ। এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করলে হজরত আবু বকর তাঁদের সকলকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে এবং আদায় করেছিলেন নামাজের জামাত। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্যরাও ইসলামের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। সাত বছরের মধ্যে মুসলমান নারী পুরুষের সংখ্যা দাঁড়ায় উনচল্লিশজনে। এরপর মুসলমান হন হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব। তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলিম ব্যক্তিত্ব। তিনি মুসলমান হওয়ার পর অংশীবাদীরা বলেছিলো, আজ আমাদের শক্তিমত্তা অর্ধেক হয়ে গেলো। হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে ইসলামের। মুসলমানেরা হতে থাকেন ক্রমশঃ শক্তিমান। হজরত আলী তখন বলেছিলেন, হে মুসলিম জনতা ! আমি তোমাদের সাত বছর আগে থেকে নামাজ আদায় করে আসছি।

আনসার সাহাবীগণের মধ্যে সাবেক্বীন তাঁরা, যাঁরা রসুল স. এর নিকটে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন আকাবায়। গভীর রাতের ওই বায়াতানুষ্ঠানে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন ছয় সাত জন। পরের বছর ওই আকাবায় বায়াত গ্রহণ করেছিলেন বারো জন। তার পরের বছর সত্তর জন। প্রথম বায়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন হজরত আবু জারারাহ্ এবং হজরত মাসআব ইবনে উমায়ের। তাঁরা মদীনায় পৌঁছেই পূর্ণ উদ্যমে শুরু করেন ইসলামের প্রচার। নবদীক্ষিতদেরকে শিক্ষাদান করেন কোরআন। তাঁদের ওই পূর্ণ উদ্যমের ফলে পুরুষ, রমণী ও শিশুদের একটি বিরাট দল লাভ করেন ইসলামের চিরন্তন আশ্রয়।

কেউ কেউ বলেছেন, সাবেক্বীন সাহাবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল জান্নাতীগণের অনুসরণীয়। অর্থাৎ ইমান, হিজরত ও রসুল স. এর ধর্মের সাহায্যকারীরূপে যারা ওই সাবেক্বীন সাহাবীর একনিষ্ঠ অনুসরণ করে চলবে তারাই হবে সফলকাম।

আমি বলি, সম্ভবতঃ এখানকার 'সাবেক্বীন' কথাটির অর্থ 'মুক্বাররাবীন' (নৈকট্যভাজনগণ)। আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্ সাবেক্বুনাস্ সাবেক্বুন উলায়িকাল মুক্বাররাবুনা। ফী জান্নাতিন নাঈম। সুল্লাতুম মিনাল আওয়ালীন (অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। তারাই জান্নাতুম নাঈমে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবাস করবে। তারা হবে প্রথম দিকের একটি দল)। সুল্লাতুনও একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী। সুল্লাতুনের অন্তর্ভূত রয়েছেন সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈন। এই উম্মত ওই সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এরপরে বলা হয়েছে— 'কালিলুম মিনাল আখিরীন' পরবর্তীগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক। এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ আবির্ভূত হবেন হাজার বছর পর। তাঁরাও হবেন কামালিয়তে নবুয়তের সম্পদে সমৃদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক জামানায় কামালিয়তে নবুয়তের বৈভবে বৈভবিত ব্যক্তিত্বের সংখ্যা ছিলো অনেক। কিন্তু হাজার বছর পর তাঁরা হবেন স্বল্পসংখ্যক। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দি র. বলেছেন, সকল সাহাবী, অধিকাংশ তাবেঈন এবং অল্পসংখ্যক তাবে-তাবেঈন ছিলেন নবুয়তের পূর্ণতার বরকতের অধিকারী।

আমি আরও বলি, এখানে 'মিনাল মুহাজিরীনা ওয়াল আনসার (মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে) কথাটির মিন্ 'মিনে তাবইজিয়াহ্' (আংশিক অর্থ প্রকাশক) নয়। এখানকার মিন্ হচ্ছে বায়ানিয়াহ্ (বর্ণনামূলক)। এর মাধ্যমে আস্‌সাবিক্বুনাল আউয়ালুন (প্রাথমিক অগ্রানুসারী) — এই বিবৃতিটি উল্লেখিত হয়েছে। আর আল্লাজীনা তাবায়ু'হুম বি ইহসানিন (যারা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের অনুগমন করে) — কথাটির উদ্দেশ্য হবে সাবেক্বীনাল আখেরীন (পরবর্তী সময়ের সাবেক্বীন) এবং আস্‌হাবিল ইয়ামীন (দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ)। যাঁদেরকে 'সুল্লাতুম মিনাল আউয়ালীন' বলা হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন প্রথম কুরূনের (প্রথম যুগের) মানুষ। প্রথম কুরূনের সময়সীমা ছিলো প্রথম তিরিশ বছর থেকে এক হাজার বছর পর্যন্ত। আর সুল্লাতুম্ মিনাল আখেরীনের সময় শুরু হবে হাজার বছরের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আতা বলেছেন, 'যারা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাদের অনুগমন করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে যারা সাহাবায়েকেরামকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে এবং তাদের জন্য সৎপ্রার্থনা করে।

আবু সাখার হুমাইদ বিন জিয়াদ বলেছেন, আমি একবার মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর নিকটে গেলাম এবং বললাম, সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? তিনি বললেন, সকল সাহাবীই জান্নাতি— তাঁরা পুণ্যবান অপুণ্যবান যাই হোন না কেনো। আমি বললাম, আপনি এ কথা কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, কোরআন মজীদে। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— 'ওয়াস্ সাবেক্বুনাল আউয়ালুনা মিনাল মুহাজীরিনা ওয়াল আনসার।' এই আয়াতের শেষে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে

'রদ্বিআল্লাহু আনহুম ওয়া রদ্বু আনহু (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট)। আর যারা সাহাবী নন তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতা লাভ করতে গেলে সাহাবীগণেরই অনুগমন করতে হবে। তাই বলা হয়েছে—যাঁরা সদনুষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের অনুগমন করে। এতে করে বুঝা যায় যে, যারা আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতাকামী নয়, তারা সাহাবীগণের অনুসরণ করবে না। আবু সাখার বলেছেন, মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজীর আবৃত্তি শুনে আমার মনে হলো, এই আয়াত এর আগে আমি কখনও পড়িইনি। এই আয়াতের ব্যাখ্যাও আগে আমার জানা ছিলো না।

আমি বলি, সকল সাহাবীর জান্নাতি হওয়ার প্রমাণরূপে অন্য একটি আয়াত আরও অধিক যথার্থ। আয়াতটি হচ্ছে— 'লা ইয়াস্তাবি মিনকুম মান আনফাকা মিন ক্বলিল্ ফাত্হি ওয়া ক্বাতালা উলায়িকা আ'জামু দারাজাতাম মিনাল লাজিনা, আনফাক্ব মিম্বা'দু ওয়া ক্বতালু ওয়া কুল্লাহুওঁ ওয়াদল্লাহুল হুসনা' (যে সকল লোক মক্কা বিজয়ের পূর্বে নিজের সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছিলো এবং জেহাদ করেছিলো — তাদের সমতুল্য ওই সকল লোক হতে পারে না, যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছে এবং জেহাদ করেছে মক্কা বিজয়ের পরে)। এই আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণাপেক্ষা অধিক মর্যাদাশালী। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা উভয় দলকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বোলোনা। যাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্তে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! তোমরা উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও আমার সাহাবীগণের একসের অথবা অর্ধসের শস্য দান করার সমান সওয়াব লাভ করবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, ওই সকল লোককে অগ্নি স্পর্শ করবে না যারা ইমানের সঙ্গে আমাকে দেখেছে এবং দেখেছে তাদেরকে, যারা প্রত্যক্ষ করেছে আমাকে।

হজরত বুরায়দা থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন রসুল স. বলেন, আমার কোনো সাহাবী কোনো গ্রাম অথবা শহরে মৃত্যুবরণ করলে কিয়ামতের দিন সে হবে ওই অঞ্চলের সকল লোকের নেতা এবং জ্যোতি। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে রজিন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রপুঞ্জের মতো— যে তাদের যে কোনো এক জনের অনুসরণ করবে সে লাভ করবে হেদায়েত।

আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন কথাটির অর্থ— আল্লাহ্পাক সাহাবীগণের সত্যানুসরণ এবং আমল সমূহকে পছন্দ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্কে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মোহাম্মদ স. কে নবী হিসেবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গ্রহণ করেছেন। এই নেয়ামত আল্লাহ্তায়ালাই তাঁদেরকে দান করেছেন। তাঁদের অন্তর ভরপুর করে দিয়েছেন আল্লাহ্, ইসলাম ও রসুলের মহব্বতে। দান করেছেন পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। কারণ তিনি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহা সাফল্য।' এ কথার অর্থ— সাহাবায়েকেরাম তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেমিক ও অনুসরণকারীদের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত। তলদেশে প্রবহমান নদী বিশিষ্ট ওই জান্নাতই হবে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা। আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০১

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۚ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ○

❒ মরুবাসীদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদিগের আশ-পাশে আছে তাহাদিগের কেহ কেহ এবং মদীনাবাসীদিগের কেহ কেহ মুনাফিক, উহারা কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জান না, আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে।

এখানে 'মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ও মদীনাবাসীদের মধ্যে কাউকে কাউকে মুনাফিক বলা হয়েছে। ওই মুনাফিকেরা ছিলো জুহুনিয়া, মুজাইয়্যেনা, আশজায়া, আসলাম ও গিফার গোত্রভূত। হজরত ইকরামা সূত্রে এ রকম বলেছেন ইবনে মুনজির। এখানে 'মিম্মান' (তাদের মধ্যে) কথাটির— মিন্ হচ্ছে মিনয়ে তাবইজিয়া (আংশিক অর্থদায়ক মিন)। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত কতিপয় হাদিসে উল্লেখিত গোত্রগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু ওই প্রশংসা আলোচ্য আয়াতের বর্ণনার প্রতিকূল নয়। কারণ এখানে সকলকে মুনাফিক সাব্যস্ত করা হয়নি। বলা হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলো মুনাফিক। আর হাদিস শরীফ সমূহেও ঢালাওভাবে সকলের প্রশংসা করা হয়নি। প্রশংসা করা হয়েছে ওই সকল

ব্যক্তির যাঁরা মুনাফিক ছিলেন না। ছিলেন বিশুদ্ধ বিশ্বাসী। আরো উল্লেখ্য যে, 'মদীনাবাসীদের কেউ কেউ মুনাফিক' — এ কথা বলে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে আউফ ও খাজরাজ গোত্রের মুনাফিকদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে — 'তারা কপটতায় সিদ্ধ।' এ কথার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে মুনাফিকদের প্রকৃত চরিত্র। এখানে 'মারাদ্ব' অর্থ স্বভাব সিদ্ধতা, অভ্যস্থতা অথবা পারদর্শিতা। যেমন, 'তাম্মারাদা জায়িদুল আলা রব্বিহী জায়েদ' (জায়েদ তার প্রভুর অবাধ্যতা করেছে)। অর্থাৎ সে অবাধ্যতায় সিদ্ধ। মারিদ ও মারিদা শব্দরূপ দুটোও বিশেষণ রূপে এসেছে উদ্ধৃত বাক্যস্থিত 'তাম্মারাদা' থেকে। ইবনে ইসহাক আলোচ্য বাক্যটি অনুবাদ করেছেন এভাবে — তারা উত্তোলন করেছে কপটতার অনড় প্রাচীর (নেফাক বা কপটতা ভিন্ন অন্য সকল কিছুর প্রতি তারা জানিয়েছে ঘোর অস্বীকৃতি)।

ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, কথাটির অর্থ হবে তারা নেফাকের (কপটতা বা অপবিত্রতার) উপরে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তারা তওবাও করেনি। কামুস গ্রন্থে রয়েছে মারাদা ও ইয়ামরদু নাসারা শব্দটির অনুরূপ, এবং মারুদা ও ইয়ামরুদু কারুমা শব্দটির অনুরূপ। দুটোরই ধাতুমূল হচ্ছে 'মুরুদুন' ও 'মারাদাতুন।' 'মারিদুন' 'মারেদুন' ও 'মুতামাররেদুন' হয়েছে বিশেষণবাচক। এর অর্থ হবে — গোপন করা অথবা যে অবস্থানে রয়েছে, সে অবস্থান থেকে আরো সামনে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। যেমন 'মারাদা আ'লা শাইয়ি' অর্থ — সে ওই বিষয়ে অভ্যস্ত স্থায়ী।

কোনো কোনো অভিধান বিশারদ বলেছেন, 'মারাদু আ'লান নিফাকি' অর্থ — তারা নেফাকের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং সমস্ত কল্যাণ থেকে হয়েছে সম্পর্কচ্যুত। 'মারিদুন' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে কল্যাণবিচ্যুত, মঙ্গলশূন্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'তুমি তাদেরকে জানো না, আমি তাদেরকে জানি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অতুলনীয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হলেও আমার মতো সর্বজ্ঞ নন। তাই আপনি মুনাফিকদের সকল খবর রাখেন না। কিন্তু আমি তাদের সকল খবর রাখি। তারা আপনাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হলেও, আমাকে প্রতারণা করতে সক্ষম নয়।

এরপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহা শাস্তির দিকে।' এখানে দু'বার শাস্তি দেয়ার কথা বলে কী বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদ রয়েছে। কালাবী এবং সুদ্দী বলেছেন, এক দিন রসুল স. ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বলতে শুরু করলেন, হে অমুক! এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি খাঁটি মুনাফিক। হে অমুক ব্যক্তি! তুমিও চলে যাও। নিঃসন্দেহে তুমি মুনাফিক। এভাবে রসুল স. অনেক

মুনাফিককে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। এটা ছিলো তাদের জন্য চরম অবমাননাকর শাস্তি। আর তাদের জন্য দ্বিতীয়বার আযাব হবে কবরে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে প্রথম শাস্তি অর্থ যুদ্ধ ও বন্দীত্ব। আর দ্বিতীয় শাস্তি অর্থ কবরের আযাব। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে প্রথম আযাবের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর আপতিত মুসিবত সমূহ। আর দ্বিতীয় আযাবের উদ্দেশ্য কবরের আযাব। মুজাহিদের অপর বিবৃতিতে রয়েছে, মুনাফিকেরা দু'বার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়েছিলো। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিবো।' কাতাদা বলেছেন, এখানে দু'বার শাস্তির অর্থ, পৃথিবীতে তাদের উপর আপতিত দুম্বল নামক ব্যাধি কবরের আযাব। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, পৃথিবীতে শরিয়তের শাস্তি ও কবরের বিভিন্ন রকমের শাস্তিকে এখানে বলা হয়েছে, 'দু'বার শাস্তি দিবো।'

ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি হিংসা ও ঘৃণার জ্বলন্ত আগুন হচ্ছে প্রথম আযাব। আর দ্বিতীয় আযাব হচ্ছে কবরের আযাব। কেউ কেউ বলেছেন, রুহ কবজ করার সময় ফেরেশতারা তাদের মুখে, পার্শ্বদেশে ও পশ্চাৎদেশে আঘাত করতে থাকবে— এটাই প্রথম শাস্তি। আর দ্বিতীয়বার শাস্তি হবে কবরে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিরূপে তারা একটি মসজিদ তৈরী করেছিলো। ওই মসজিদকে চিহ্নিত করা হয়েছিলো মসজিদে জেরা (ষড়যন্ত্রের মসজিদ) বলে। রসুল স. হজরত আলীর মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন ওই মসজিদ। এটা ছিলো তাদের প্রথম শাস্তি। আর পরের শাস্তি হবে কবরে এবং জাহান্নামে।

আমি বলি, উপরে বর্ণিত অভিমতগুলোর মূলমর্ম এই যে, মুনাফিকদের শাস্তি দেয়া হবে দু'বার — এক বার পৃথিবীতে আরেক বার কবরে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০২

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

❒ অপর কতক লোকে নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়তো উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতে ওই সকল সাহাবীগণের কথা বলা হয়েছে, যারা আলস্যবশতঃ তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে ছিলেন। তাঁরা যে বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী ছিলেন, এ কথা নিশ্চিত। মুনাফিকেরা যেমন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জেহাদ থেকে সরে পড়েছিলো, তাঁরা সেরকম করেন নি। আজ যাই, কাল যাই

করে যুদ্ধ যাত্রাকে তাঁরা করেছিলেন বিলম্বিত। এটা ছিলো তাঁদের কর্মগত ভুল, বিশ্বাসগত ভুল নয়। তাবুক অভিযান থেকে মুসলিম সেনা বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের আগেই তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। ওই ঘটনাটিকেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে — 'অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে; তারা এক সৎকর্মের সঙ্গে অপর এক অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে।' এ কথার অর্থ— ইমান, নামাজ, তাবুক ছাড়া অন্যান্য জেহাদে অংশগ্রহণ, তাবুকে না যেতে পারার জন্য অনুতাপ, ইত্যাদি সৎকর্মের সঙ্গে তাঁরা মিশ্রিত করেছেন তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিতির অসৎ কর্মটিকে। মুনাফিকদের সঙ্গে এই কর্মটির ছিলো বাহ্যিক সাদৃশ্য। তাই এখানে সৎ ও অসৎ কর্মকে মিশ্রিত করার কথা বলা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এখানে 'হয়তো' বা 'আশা করা যায়' (আ'সা) বলে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমার শুভসংবাদই দেয়া হয়েছে। কারণ পরক্ষণেই উল্লেখিত হয়েছে— আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন দশ জন। হজরত আবু লুবাবাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। রসুল স. যখন তাবুক অভিযান থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ওই দশজন সাহাবী তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। পুড়তে শুরু করলেন অনুতাপের আগুনে। তাঁদের মধ্যে সাতজন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন। রসুল স. তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলেন, এরা এভাবে কেনো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবু লুবাবা ও তার সঙ্গীরা তাবুকে যায়নি। তারা এখন অনুতপ্ত। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, যতক্ষণ আপনি না প্রসন্ন হন এবং স্বহস্তে তাদেরকে বন্ধন মুক্ত না করেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা এভাবে থাকবে। রসুল স. বললেন, আমিও আল্লাহ্র কসম করলাম। তাঁদের বাঁধন আমি খুলবো না — যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাদেরকে বন্ধন মুক্ত করেন। এরপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। রসুল স. তখন, স্বেচ্ছাবন্দী ওই সাহাবীগণকে সদ্য অবতীর্ণ আয়াতটি পড়ে শুনালেন এবং প্রসন্নচিত্তে তাঁদের বাঁধন খুলে দিলেন।

হজরত ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. হজরত আবু লুবাবাকে মুক্ত করার জন্য লোক পাঠালেন, কিন্তু হজরত আবু লুবাবা তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ছাড়া অন্য কারো হাতে আমরা বন্ধন

মুক্ত হবো না। তখন রসুল স.স্বয়ং তাঁদেরকে বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। এরপর মুক্ত সাহাবীবৃন্দ রসুল স. কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সদকা হিসেবে আমরা এগুলো এনেছি। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন এবং আমাদের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রসুল স. বললেন, তোমাদের সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়নি। এর অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৩

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

❒ উহাদিগের সম্পদ হইতে সাদাকা গ্রহণ করিবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে। তোমার আশীর্বাদ উহাদিগের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

'তাদের সম্পদ থেকে 'সদকা' গ্রহণ করবে' কথাটির অর্থ এখানে— হে আমার রসুল! আপনার যে অনুচরেরা তাবুক অভিযান থেকে বিরত থেকে ভুল করেছে, সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাদের প্রদত্ত সদকা আপনি মঞ্জুর করুন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'সাদাকা' অর্থ হবে জাকাত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং তাদেরকে পরিশোধিত করবে।' এখানে 'তুত্বাহ্হিরু' অর্থ পবিত্র করবে। একভাবে কথাটির সর্বনাম (তাদেরকে) স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপে সম্পৃক্ত হয়েছে 'সাদাকা' কথাটির সঙ্গে। আরেকভাবে কথাটি সম্বোধন সূচক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে এভাবে— (হে আমার রসুল) এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। 'তুযাক্‌কীহিম' অর্থ — পরিশোধিত করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আলী ইবনে তালহার পদ্ধতিতে ইবনে জারীর একটি বর্ণনা এনেছেন। ওই বর্ণনাটিতে উল্লেখিত হয়েছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, জুহাক এবং যায়েদ ইবনে যোবায়ের এবং যায়েদ ইবনে আসলাম সূত্রে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতিয়া সূত্রেও বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন বাগবী। বর্ণনাটি এই — মসজিদের খুঁটির সঙ্গে যাঁরা নিজেদেরকে বেঁধেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিলো পাঁচ। হজরত আবু লুবাবাও ছিলেন ওই পাঁচ জনের মধ্যে। হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, আট জনের কথা। আর সাতজনের কথা বলেছেন কাতাদা এবং জুহাক। আউফ সূত্রে ইবনে

মারদুবিয়া ও ইবনে হাতেম লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাবুক অভিমুখে চলে গেলেন। হজরত আবু লুবাবা ও তার পাঁচজন সঙ্গী রয়ে গেলেন মদীনায়। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁদের মধ্যে দু'জন বুঝতে পারলেন, আমরা খুবই অন্যায় করে ফেলেছি। অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হতে লাগলেন তাঁরা। বললেন, আমরাতো রমণীদের সঙ্গে গৃহচ্ছায়ায় বসে আরামে সময়াতিপাত করছি। আর ওদিকে রসুল স. মুজাহিদগণকে নিয়ে মহান অভিযান পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্র কসম! আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখবো। যতক্ষণ না আমাদেরকে মার্জনা করা হবে এবং রসুল স. স্বয়ং আমাদেরকে বন্ধন মুক্ত না করবেন ততক্ষণ আমরা এভাবেই থাকবো। এ কথা বলে দু'জন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধে ফেললেন। অবশিষ্ট তিনজন এরূপ করলেন না।

আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে — কাতাদা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক অভিযান থেকে বিরত সাতজন সাহাবী সম্পর্কে। তাঁদের মধ্যে চারজন মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বেঁধেছিলেন। ওই চারজনের নাম— হজরত আবু লুবাবা, হজরত মারদাস, হজরত আউস ও হজরত জুযাম।

আস্সিহাবা গ্রন্থে ইবনে মানদাহ্ এবং আবু শায়েখ সওরীর পদ্ধতিতে আমাশ ও আবু সুফিয়ান থেকে হজরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যাঁরা তাবুক যুদ্ধে রসুল স. এর সঙ্গী হননি, তাঁরা ছিলেন— হজরত আবু লুবাবা, হজরত আউস, হজরত জুযাম, হজরত সা'লাবা, হজরত ওয়াছিয়া, হজরত কা'ব বিন মালিক, হজরত মুরারাহ্ বিন রবী এবং হজরত হেলাল বিন উমাইয়া। তাদের মধ্যে কেবল হজরত আবু লুবাবা ও হজরত সা'লাবা স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করেছিলেন। মুক্তিলাভের পর তাঁরা তাঁদের সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এগুলো গ্রহণ করুন। এগুলোই আমাদেরকে আপনার নিকট থেকে পৃথক করে দিয়েছিলো। রসুল স. তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, আমি তাদেরকে মুক্ত করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্ত করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হাদিসটির সূত্রপরম্পরা অত্যন্ত মজবুত।

বাগবী লিখেছেন, এ সম্পর্কিত সকল বর্ণনায় হজরত আবু লুবাবার নামোল্লেখ রয়েছে। তাই কেউ কেউ মনে করেন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কেবল হজরত আবু লুবাবা সম্পর্কে।

বাগবী আরও লিখেছেন, হজরত আবু লুবাবার কোন অপরাধের প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন মতামত। মুজাহিদ বলেছেন, তাঁর অপরাধটি ছিলো এই — বনী কুরায়জার লোকেরা তাঁর নিকট

পরামর্শ চাইলো, আমরা কি মুয়াজকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নিবো? তিনি তাঁর কণ্ঠদেশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ইশারায় এ কথা বুঝালেন যে, তোমাদের কণ্ঠচ্ছেদন করা হবে। সুরা আন্‌ফালের তাফসীরে যথাস্থানে এই ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী বলেছেন, বনী কুরায়জার নিকট ইশারায় গোপনে কথা প্রকাশ করে দেয়ার অপরাধটিই ছিলো হজরত আবু লুবাবার স্বেচ্ছাবন্দিত্ব ও আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। জুহরী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে তাবুক যুদ্ধ থেকে হজরত আবু লুবাবার বিরত থাকা।

আমি বলি, সম্ভবতঃ উল্লেখিত দু'টো অপরাধের কারণেই হজরত আবু লুবাবা হয়েছিলেন স্বেচ্ছাবন্দী। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকেদী সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া লিখেছেন, জননী উম্মে সালমা বলেছেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হওয়ার এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আমার গৃহে। অতি প্রত্যুষে আমি রসুল স. কে হাসতে দেখলাম। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আজ যে বড়ই প্রফুল্লচিত্ত। তিনি স. বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে। আমি বললাম আমি কি তাকে এ কথা বলবো? রসল স. বললেন, বলতে পারো। আমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাবন্দী আবু লুবাবাকে শুভ সংবাদ জানালাম। বললাম, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য অনেকে এগিয়ে গেলেন আবু লুবাবার দিকে। তিনি বললেন, থামুন! রসুল স. স্বয়ং আমাকে বন্ধনমুক্ত করবেন। কিছুক্ষণ পর রসুল স. তাঁর বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত।

উম্মত জননী হজরত উম্মে সালমার উপরে বর্ণিত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হজরত আবু লুবাবা বনী কুরায়জার লোকদেরকে ইশারায় গোপন কথা জানিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন, সেই অপরাধের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াত। তাঁর এই বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনাপেক্ষা অগ্রগামী। কেননা তাবুকের অভিযান সংঘটিত হয়েছিলো পর্দা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। অথচ এখানে বর্ণিত হয়েছে, জননী উম্মে সালমা তাঁর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সরাসরি হজরত আবু লুবাবাকে শুভ সংবাদ জানিয়েছিলেন। এতে করে বুঝা যায়, হজরত আবু লুবাবার স্বেচ্ছাবন্দিত্বের ঘটনাটি ঘটেছিলো পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এবং বনী কুরায়জার ঘটনাটিই ছিলো আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ।

এরপর বলা হয়েছে — 'তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করবে।' বাগবী লিখেছেন, সদকার মাল গ্রহণ করার সময় শাসক বা নেতার পক্ষে ওয়াজিব হবে সদকা প্রদানকারীর জন্য দোয়া করা। কোনো কোনো আলেমও এ রকম দোয়াকে

ওয়াজিব বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মোস্তাহাব। কেউ কেউ আবার বলেছেন, ওয়াজিব জাকাত গ্রহণের সময় জাকাত প্রদাতার জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর নফল সদকা গ্রহণের সময় দোয়া করা মোস্তাহাব। কোনো কোনো আলেমের অভিমত এই যে, ইমাম (নেতা) যদি বায়তুল মালের সংরক্ষক হিসেবে সরাসরি জাকাত এবং নফল সদকা গ্রহণ করেন তবে দাতার জন্য দোয়া করা তার উপরে ওয়াজিব। আর অভাবগ্রস্তরা যদি সরাসরি সম্পদশালীদের নিকট থেকে দান গ্রহণ করে তবে দাতার জন্য দোয়া করা ইমামের জন্য মোস্তাহাব।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, হুদায়বিয়ার বায়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আউফা বলেছেন, একবার আমি দেখলাম রসুল স. এর দরবারে লোকেরা জাকাতের মাল জমা করছে। আর রসুল স. তাদের জন্য দোয়া করছেন— আয় আল্লাহ্! এদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো। আমার পিতাও সদকার মাল অর্পণ করলেন। রসুল স. আশীর্বাদ করলেন— হে আল্লাহ্! আবী আউফার বংশধরদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো।

কামুস রচয়িতা লিখেছেন, 'সালাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ — আশীর্বাদ, প্রার্থনা, দয়া, ক্ষমা প্রার্থনা এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রসুল স. এর প্রশংসা। সালাত শব্দটি যখন বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন এর অর্থ হয় দোয়া ও ইস্তেগফার (আশীর্বাদ ও ক্ষমা প্রার্থনা)। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থেই শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে। রসুল স. বলেছেন, যদি কেউ আহারের আমন্ত্রণ জানায়, আর সে আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করতে চাও, তবে তা করতে পারো। আর যদি রোজাদার হও, তবে যেতে না চাইলে আমন্ত্রকের জন্য আশীর্বাদ (সালাত) করতে পারো। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ এবং তিরমিজি।

হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার জনৈকা মহিলা সাহাবী রসুল স. এর নিকটে নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামীর জন্য সালাত করুন (আশীর্বাদ বা ক্ষমাপ্রার্থনা করুন)। রসুল স. তাঁর নিবেদনানুসারে দোয়া করলেন। আহমদ। ইবনে হাব্বান প্রমাণ করেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত। 'সালাত' শব্দটি আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে — আল্লাহ্র সন্তোষ ও রহমত। হজরত আবী আউফার জন্য কৃত দোয়ার মধ্যেও 'সালাত' শব্দটি 'আল্লাহ্র রহমত' অর্থে এসেছে। আবার হজরত কায়েস ইবনে সা'দ থেকে আবু দাউদ ও নাসাঈ লিখেছেন, রসুল স. একবার দোয়া করলেন এভাবে— হে আল্লাহ্ ! তোমার সালাত ও রহমত সা'দ ইবনে উবায়দার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করো। হাদিসটি উত্তম সূত্রবিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফু সূত্রে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা মুমিনদের রূহের উদ্দেশ্যে বলে থাকে, আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক তোমার প্রতি এবং তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি।

উপরে বর্ণিত হাদিস সমূহের উল্লেখিত 'সালাত' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া বিন ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে দোয়া ও ইস্তেগফার। আর এ রকম শব্দ ব্যবহারে কোনো আপত্তিও নেই। তাই মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌গণ বলেছেন, প্রথমে শব্দটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে বিশেষভাবে রসুল স. এর সঙ্গে অথবা অন্যান্য নবী রসুলগণের সঙ্গে কিংবা যাঁরা নবী রসুল নন, তাদের সঙ্গে। তারপর অর্থ করলে সে অর্থ হবে সুসঙ্গত ও যথাযথ। নতুবা বক্তব্য হয়ে পড়বে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই ইমাম মালেক বলেছেন, নবী রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দের ব্যবহার মাকরূহ। কাযী আয়ায বলেছেন, সুফিয়ান সওরীও এ রকম বলেছেন। মুতা-কাল্লিমিন ও ফুকাহাও এই অভিমতের অনুসারী। তাঁরা বলেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্যান্যদের জন্য ব্যবহার করতে হবে 'মাগফিরাত' ও 'রহমত' শব্দ দু'টো। 'সালাত' ব্যবহার করা যাবে না। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বনী উমাইয়ার শাসকদের সময়ে এ রকম ব্যবহার ছিলো না। পরবর্তী সময়ে বনী হাশেমের শাসনকালে নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে 'সালাত' শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। তাই এই রীতিকে বেদাত বলা যায়।

ইমাম আবু হানিফা এবং আলেমগণের একটি দলের অভিমত হচ্ছে — নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'সালাত' প্রয়োগ করা রীতিসিদ্ধ নয়। তবে নবী-রসুলগণের ক্ষেত্রে 'সালাত' উল্লেখের পর আনুসাঙ্গিকরূপে অন্যদের জন্যও 'সালাত' ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা, শরিয়তের পরিভাষায় 'সালাত' বিশেষভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন— লা তাজায়ালু দু আয়ার রসুলি বাইনাকুম কা দু আয়ি বা'দিকুম বা'দান (রসুলের দোয়াকে তোমরা তোমাদের নিজেদের দোয়ার সমতুল মনে কোরো না)। এই এরশাদের পরিপ্রেক্ষিতে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. ছাড়া অন্য কারো জন্য 'সালাত' শব্দ সহযোগে দোয়া করা অনুচিত। বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত এই হাদিসটির পরম্পরাগত বিন্যাস এ রকম, হজরত ইকরামা— হাকেম—ওসমান—তারিক —ইবনে আবী শায়বা।

বায়হাকী বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের উপরে বর্ণিত বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এই যে, সম্মানের ভিত্তিতে নবী-রসুল যারা নন তাদের ক্ষেত্রে 'সালাত' ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু দোয়ার ভিত্তিতে শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে সম্ভবতঃ তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ইবনে কাইয়ুম বলেছেন, পছন্দনীয় কথা এই যে, ফেরেশতা, আম্বিয়া, উম্মত-জনয়িত্রিবৃন্দ, আহলে বাইত এবং তাঁদের একনিষ্ঠ প্রেমিক ও অনুসারীদের ক্ষেত্রে সম্মিলিত রূপে 'সালাত' কথাটি ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু পৃথকভাবে অন্যদের ক্ষেত্রে যাবে না। এককভাবে নবী-রসুল যারা নয়, তাদের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ করলে সৃষ্টি হবে একটি অপরীতি। ফলে এর মাকরূহাত (অপছন্দনীয়তা) উত্তরোত্তর বেড়েই যেতে থাকবে। রাফেজীরা এ রকম করে। বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার।

এরপর বলা হয়েছে—'তোমার আশীর্বাদ তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনার আশীর্বাদ (সালাত) সদকাপ্রদাতাদের জন্য চিত্তসুখকর। হজরত আবু ওবায়দা বলেছেন, এখানে 'সাকানুন্' শব্দটির অর্থ চিত্ত স্বস্তি বা চিত্ত-সুখ। আলোচ্য বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে — রসুল স. এর দোয়া বিশ্বাসীদের অন্তরে আনে প্রশান্তি। তাঁদের আত্মা এ কথা ভেবে স্বস্তি পায় যে, নিশ্চিতরূপে আমাদের তওবা কবুল হয়েছে।

আমি বলি, গোপন পাপের আশংকায় পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারীদের অন্তরে জাগ্রত হয় পাপবোধ। ওই পাপবোধ বড়ই অসহনীয়। রসুল স. এর দোয়ার বরকতে সাহাবীগণের অন্তর থেকে ওই পাপবোধের তমসা মুহূর্তে অপসারিত হয়ে যেতো। অন্তরে প্রবাহিত হতো অনাবিল স্বস্তির স্রোত। ওই অবস্থাই অন্তরের প্রশান্ত অবস্থা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন — 'হৃদয় প্রশান্ত হয় আল্লাহ্র স্মরণে।'

শেষে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা অনুতপ্ত বিশ্বাসীদের ক্ষমা প্রার্থনার নিবেদন খুব ভালো করেই শোনেন। কারণ তিনি সর্বশ্রোতা। আর তারা যে খাঁটি তওবাকারী সে কথাও তিনি ভালো করেই জানেন। কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ।

বাগবী লিখেছেন, আলস্য অথবা অন্য কোনো কারণে যারা তাবুক অভিযানে যাননি তাঁদের মধ্যে যারা হজরত আবু লুবাবার মতো তওবা করেননি তারা বলতে শুরু করেন এ সকল লোকতো গতকাল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিলো। আজ যে দেখি কেউ আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করছে না। আমরাতো এর কারণ বুঝতে পারছিনা। তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো —

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

❑ উহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁহার দাসদিগের তওবা কবুল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু?

❑ বল, 'তোমরা কর্ম কর; আল্লাহ্তো তোমাদিগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূল ও বিশ্বাসীগণও করিবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি ওই সকল নৈরাশ্যাচ্ছাদিত বিশ্বাসীগণকে বলে দিন, তোমরা কি এ কথা জানোনা যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তওবাকারীদের বিনিময় (সদকাও) গ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ্তায়ালা যে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবন সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যারা বৈধ উপার্জনের অর্থ দান করে, কেবল তাদের দানই আল্লাহ্পাকের নিকটে গৃহীত হয়। এমতো দানের মাধ্যমেই লাভ হয় প্রকৃত মর্যাদা। আল্লাহ্তায়ালা ওই দান রেখে দেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন করতলে। তারপর তাকে লালন পালন করেন। ফলে স্বল্পদান শেষ বিচারের ময়দানে আবির্ভূত হবে বিশাল পাহাড়ের আকারে। এরপর রসুল স. আবৃত্তি করলেন— আল্লাহ্ তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন এবং সদ্কা গ্রহণ করেন। শাফেয়ী। বোখারী ও মুসলিম সূত্রেও এ রকম বলা হয়েছে। তবে তাঁদের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে এ কথাগুলো— কেউ তার পরিচ্ছন্ন উপার্জন থেকে একটি খেজুর দান করলে আল্লাহপাক তাঁর আনুরূপ্যবিহীন দক্ষিণ হস্তে তা গ্রহণ করেন।

শেষে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াপরবশ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। আর ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ওই উদাহরণরহিত মর্যাদার একটি নিদর্শন।

পরের আয়াতে (১০৫)বলা হয়েছে— বলো, 'তোমরা কর্ম করো; আল্লাহ্তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীগণ করবে এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন, তোমরা যা খুশী করতে থাকো। তোমাদের ভালো-মন্দ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো কর্মই তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর তিনি তোমাদের গোপন সংবাদ তাঁর রসুলকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। ফলে তোমাদের কর্মকাণ্ডের সংবাদ রসুল স. ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীরাও জানতে পারবে। শেষে তোমাদের কৃতকর্মের সংবাদ তোমাদেরকেও জানিয়ে দেয়া হবে।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতে মুনাফিক ও অসতর্ক বিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। প্রচ্ছন্নভাবে জানানো হয়েছে তওবার উদাত্ত আহ্বান। আরও বলা হয়েছে রসুল স. ও বিশ্বাসীগণের পারস্পরিক সৌহার্দের কথা। তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করে দিবেন গভীর সম্প্রীতি। আর যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রতি সৃষ্টি করে দিবেন আন্তরিক ঘৃণা। তাই তারা আল্লাহ্পাকের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে মুনাফিকদের কার্যকলাপ সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবেন।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৬

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِاللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

❐ এবং অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল — আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন তাঁহার এই আদেশের প্রতীক্ষায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

'এবং অপর কতকের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো' কথাটির অর্থ তাবুক যুদ্ধে যারা গমন করেনি, তাদের কারো কারো তওবা তো আল্লাহ্ কবুল করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ তওবাই করেনি— তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না ক্ষমা করবেন, তাঁর এই আদেশের প্রতীক্ষায়।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন, নাও পারেন। আল্লাহ্তায়ালা যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ক্ষমা করতে তিনি যেমন বাধ্য নন, তেমনি শাস্তি দিতেও বাধ্য নন। সকল প্রকার বাধ্যতা ও অত্যাবশ্যকতা থেকে তিনি চিরমুক্ত। তাই বান্দার অন্তরে জাগ্রত থাকতে হবে ক্ষমার আশা ও শাস্তির ভয়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইম্মা' শব্দটি। শাস্তি না ক্ষমা, এ রকম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয় বান্দার দিক থেকে। সে কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইম্মা' শব্দটি। বান্দাকে শাস্তি দিবেন না ক্ষমা করবেন এ রকম সংশয়, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা আল্লাহ্তায়ালার দিকে একেবারেই নেই। তাঁর অপার জ্ঞানের কারণে তিনি ভালো করেই জানেন, কোন সময়ে কি সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করবেন। সুতরাং এখানে 'ইম্মা' শব্দটির কারণে উৎকণ্ঠা অথবা সিদ্ধান্তহীনতার সম্পর্ক আল্লাহ্র দিকে করা যেতেই পারে না।

শেষে তাই বলা হয়েছে— আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এ কথার অর্থ আল্লাহ্তায়ালা সকলের আদ্যঅন্তের সকল কিছুই জানেন। তাই তাঁর সকল সিদ্ধান্তে রয়েছে প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন।

হজরত কা'ব বিন মালেক থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— 'এবং অপর কতকের সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো।' এ কথা বলা হয়েছে হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত হেলাল বিন উমাইয়া এবং হজরত মারারা বিন রবীয়া সম্পর্কে। তাঁরা তাবুক অভিযান থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু পরে প্রকাশ্যে তাঁরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদেরকে বাঁধেন নি। রসুল স. ওই ত্রয়ী সাহাবীর সঙ্গে অন্যদের কথাবার্তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে 'সিদ্ধান্ত স্থগিত রইলো।' পরে অবশ্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দেন। মোহাম্মদ বিন ইসহাকও এ রকম বর্ণনা করেছেন হুদায়বিয়ার বায়াতে রেদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী হজরত আবু রুহাম কুলসুম বিন হুসাইন গিফারী থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, বায়হাকী— হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে মুনজির এবং ইয়াজিদ বিন রুমমান থেকে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনে আউফের সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি মসজিদ তৈরী করেছিলো। তাঁরা রসুল স. এর নিকট নিবেদন জানালো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মসজিদে একবার নামাজ পড়ুন। গানাম বিন আউফ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ অবস্থা দেখে নতুন মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে হিংসা করতে শুরু করলো। বললো, আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করবো। এ কথা শুনে মুনাফিক

আবু আমের তার সঙ্গীদেরকে বললো, তোমরাও একটি মসজিদ তৈরী করো এবং মসজিদের ভিতরে তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র গোপনে জমা করে রাখো। আমি রোমান শাসকের নিকটে যাচ্ছি। তাদের একটি সেনাদল সঙ্গে নিয়ে এসে আমি মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিবো। এ কথা বলে সে রওনা হয়ে গেলো রোমানদের রাজ্যের দিকে। তার সাথীরা মসজিদ নির্মাণ করতে শুরু করলো। নির্মাণ কার্য শেষ হলে তারা রসুল স. কে তাদের মসজিদে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানালো। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের মসজিদে এসে একবার দয়া করে নামাজ আদায় করুন। পীড়িত ও বয়োবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ করে আমরা ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছি। তাছাড়া প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টিবাদলার রাতে আপনার মসজিদে আসতে আমাদের কষ্ট হয়। সুতরাং দুর্যোগের সময়ে আমরাও সেখানে নামাজ আদায় করে নিতে পারবো। রসুল স. তখন তাঁর তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তাই বললেন, এখনতো আমি জেহাদের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। ইন্‌শাআল্লাহ্ ফিরে আসার পর তোমাদের মসজিদে নামাজ পড়বো। তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার কাছাকাছি এক স্থানে এসে রসুল স. যাত্রাবিরতি করলেন। স্থানটির নাম জিআওয়ান। মদীনা থেকে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত ওই স্থানেই অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত —

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৭

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

❒ এবং যাহারা ক্ষতি সাধন, সত্য-প্রত্যাখ্যান, বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম করিয়াছে তাহাদিগের গোপন ঘাঁটি-স্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি;' আল্লাহ্ সাক্ষী, তাহারাতো মিথ্যাবাদী।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনাকে যে মসজিদে নামাজ পড়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, ওই মসজিদটি আসলে মসজিদই নয়, মসজিদ নামের ওই ঘরটি হচ্ছে মুনাফিকদের একটি গোপন ঘাঁটি। ইতোপূর্বেও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। মসজিদ নির্মাণ করা

হয় শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছে ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানের জন্য এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টির জন্য। তারা মিথ্যা শপথ উচ্চারণকারী। মুখে তারা বলে আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি সদুদ্দেশ্যে। কিন্তু হে আমার রসুল! শুনে রাখুন আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, বারোজন মুনাফিক মিলে গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলো। ওই বারোজন মুনাফিকের নাম— ১. বনী উবায়েদ বিন যায়েদ গোত্রের হুজাম বিন খালেদ ২. বনী উমাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের সা'লাবা বিন হাতেব ৩. বনী সুরাইয়া বিন যায়েদ গোত্রের মো'তাব বিন কুশায়ের ৪. হাবীবা বিন আজআর ৫. নাবতাল বিন হারেস ৬. নাজোদ বিন ওসমান ৭. সহল বিন হানিফের ভ্রাতা ইবাদ বিন হানিফ ৮. হারেসা বিন আমের ৯. হারেসা বিন আমেরের পুত্র মুজমা বিন হারেসা ১০. অপর পুত্র যায়েদ বিন হারেসা ১১. উদিয়া বিন সাবেত এবং ১২. বাখরাজ। তারা সকলে মসজিদ নির্মাণ করেছিলো মসজিদে কোবার ক্ষতি সাধনের জন্য। তাদের মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর মসজিদে কোবায় নিয়মিত নামাজ পাঠকারীদের মধ্যে কেউ কেউ ওই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন। এভাবেই শুরু হয়েছিলো মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও মতপ্রভেদ।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'মান হারাবাল্লাহ্' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে আবু আমের রাহেবের দিকে। সে ছিলো ফেরেশতা কর্তৃক স্নাত বিশিষ্ট সাহাবী হজরত হানযালার পিতা। রসুল স. এর মদীনা আগমনের পূর্বে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সংসার বিরাগী হয়ে গিয়েছিলো। রসুল স. যখন মদীনায় এলেন তখন সে বললো, আপনি কোন ধর্ম নিয়ে এসেছেন? রসুল স. বললেন, বিশুদ্ধ একত্ববাদের ধর্ম— হজরত ইব্রাহিমের ধর্মাদর্শ। আবু আমের বললো, আমিও তো দ্বীনে হানিফের (হজরত ইব্রাহিমের ধর্মের) উপরে রয়েছি। রসুল স. বললেন, না তুমি দ্বীনে হানিফের উপরে প্রতিষ্ঠিত নও। আবু আমের বললো, কেনো নই? আপনিতো দ্বীনে হানিফের সঙ্গে অন্যান্য রীতিনীতি সংযোজিত করেছেন। রসুল স. বললেন, আমি এমন করিনি। আমিতো এনেছি বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ময় ও সুস্পষ্ট শরিয়ত। আবু আমের বললো, ঠিক আছে আমাদের দুজনের মধ্যে যার দাবী মিথ্যা আল্লাহ্ যেনো তাকে গৃহহীন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুদান করেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ যেনো এমনিই করেন। রসুল স. তার নাম রেখেছিলেন ফাসেক আবু আমের। উহুদ যুদ্ধের সময় সে রসুল স. কে বললো, আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করবে আমি সবসময় তাদের পক্ষাবলম্বন করবো। হুনায়েন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে সে এ রকমই করেছিলো। হুনায়েনে হাওয়াজেনরা যখন পরাজিত হলো তখন সে পালিয়ে যায় সিরিয়ায়। সেখান থেকে মুনাফিকদেরকে সংবাদ পাঠায় 'তোমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করো। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হও। ওই মসজিদে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র জমা করতে থাকো। আমি রোমান প্রশাসকের নিকটে যাচ্ছি। সেখান থেকে রোমান সৈন্যদের একটি দল নিয়ে আমি মদীনায় আগমন করবো। মদীনা

থেকে বের করে দেবো মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদেরকে। আবু আমেরের সংবাদ পেয়ে মুনাফিকেরা নির্মাণ করলো একটি মসজিদ। এখানে 'মিন ক্বব্‌লু' (ইতোপূর্বে) বলে বুঝানো হয়েছে— ওই মসজিদ নির্মাণের আগেও তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো। এ রকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর তাবুক অভিযানের পূর্বেই তারা নির্মাণ করেছিলো ওই ষড়যন্ত্রের মসজিদটি। তাই প্রথমোক্ত অভিমতটি ধরলে 'মিন ক্বব্‌লু' (ইতোপূর্বে) কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে হারাবা (বিরুদ্ধে) এর সঙ্গে। আর শেষোক্ত অভিমতটি ধরলে 'মিনক্বব্‌লু' এর সম্পর্ক ঘটবে 'ইত্তাখাজু' (বিভেদ) এর সঙ্গে।

'আল হুসনা' অর্থ— সদুদ্দেশ্যে। অর্থাৎ তীব্র দাবদাহ, ঘোর বৃষ্টি বর্ষণ — এ রকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যাতে মানুষ কাছের মসজিদে সহজে নামাজ পড়তে পারে এবং দুর্বল ও অক্ষমেরাও যেনো জামাতে নামাজ আদায়ের সুযোগ পায়, এ রকম পূণ্যময় উদ্দেশ্যেই আমরা এই নুতন মসজিদটি নির্মাণ করেছি — মুনাফিকেরা হলফ করে এ কথা বলেছিলো।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আউফি সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন মসজিদে কোবা নির্মাণ করলেন, তখন নির্মাণ সহযোগী আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে বাখরাজ নামের এক লোকও ছিলো। পরে সে আয়াতে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের মসজিদ নির্মাণ করে। রসুল স. তাঁকে বলেছিলেন, কী উদ্দেশ্যে তুমি মসজিদ তৈরী করলে? বাখরাজ বলেছিলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কেবল পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। তার ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। আয়াতের শেষে বাখরাজের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে এভাবে — আল্লাহ্ সাক্ষী, তারাতো মিথ্যাবাদী।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৮

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

❑ তুমি সালাতের জন্য ইহাতে কখনও দাঁড়াইওনা; যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য উহাতেই সালাতের জন্য দাঁড়ানো তোমার জন্য সমুচিত। উহাতে, পবিত্র হইতে চাহে এমন লোক আছে এবং যাহারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন।

পূর্ববর্তী আয়াতটির সঙ্গে এই আয়াতটিও অবতীর্ণ হয়েছে জিআওয়ানে। এখানকার নির্দেশনাটি এ রকম — 'হে আল্লাহ্‌র রসুল আপনি ওই ষড়যন্ত্রের মসজিদে কখনো যাবেন না। যে মসজিদ আপনি তাক্বওয়ার ভিত্তিতে স্বহস্তে নির্মাণ করেছেন ওই মসজিদই আপনার নামাজ পাঠের উপযুক্ত স্থান। সেখানে

পবিত্রতাপ্রেমি লোকেরা আপনার নিকট সমবেত হয়। আর পবিত্রতা অর্জনকারী-দেরকে আল্লাহ্তায়ালা ভালোবাসেন। এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস।

ইবনে নাজ্জার বলেছেন, মুনাফিকেরা ষড়যন্ত্রের ওই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলো মসজিদে কোবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে। সেখানে বসে তারা রসুল স. কে নিয়ে হাসি তামাশা করতো।

জুহ্রী সূত্রে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু রহম বলেছেন, রসুল স. বনী সালিম বিন আউফের হজরত মালেক বিন ওখশাম এবং মাআন বিন আদি গোত্রের হজরত মুঈন বিন আবী আদিকে তলব করলেন। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. মালেক বিন ওখশামের সঙ্গে তলব করেছিলেন হজরত আমের বিন আসকান এবং হজরত ওয়াহ্শীকে। হজরত আসেমের উল্লেখ তিনি করেননি। জুহ্রী তাঁর আত্তাজরিদ গ্রন্থে নামোল্লেখ করেছেন হজরত সুবিদ বিন আব্বাস আনসারীর। যাহোক, রসুল স. উপরে বর্ণিত সাহাবীগণকে ডেকে বললেন, যাও মুনাফিকদের ওই মসজিদটি ভেঙে ফেলো এবং ভস্ম করে দাও। নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ক্ষিপ্রগতিতে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সালিম বিন আউফ গোত্রের মহল্লায় পৌঁছে হজরত মালেক তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। এ কথা বলে তিনি অতিদ্রুত তাঁর গৃহ থেকে নিয়ে এলেন কয়েকটি শুকনো খেজুরের ডাল। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ওই জ্বলন্ত ডালগুলো নিয়ে তাঁরা দৌড়ে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন মুনাফিকদের মসজিদে। তখন ছিলো মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। ভিতরে দলবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্ররত ছিলো মুনাফিকেরা। হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে তারা দিক্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করলো। নির্দেশপ্রাপ্ত সাহাবীগণ মসজিদটিকে ভস্মীভূত করে দিলেন এবং মাটিতে মিশিয়ে দিলেন তার ধ্বংশাবশেষগুলোকে। রসুল স. নির্দেশ প্রদান করলেন, ওই স্থানটি নির্ধারিত করা হলো আবর্জনা ফেলবার স্থান হিসেবে। এখন থেকে ওই স্থানটি হবে মৃত পশুর ভাগাড় ও ময়লা ফেলার স্থান। ওদিকে সিরিয়ায় অবস্থানরত পলাতক আবু আমের নিঃস্ব, গৃহহীন ও ভবঘুরে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, জিআওয়ান থেকে রসুল স. মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ষড়যন্ত্রের মসজিদের স্থানে গৃহ নির্মান করতে চাইলেন হজরত আসেম ইবনে আদী। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্তায়ালা এ স্থানে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন, তবে এখানে আমি কীভাবে গৃহ নির্মাণ করবো? আমি বরং সাবেত বিন আকরামকে এখানে বাড়ী করতে বলি। কারণ, তার বাড়ীঘর নেই। হজরত সাবেত সেখানে বাড়ী করেছিলেন বটে, কিন্তু সে বাড়ীতে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। ওই বাড়ীর কোনো কবুতর বা মুরগী সেখানে কোনো বাচ্চাও ফুটাতে পারেনি।

বাগবী লিখেছেন, বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রের লোকেরা মসজিদে কোবা নির্মাণ করেছিলেন। হজরত ওমরের শাসনকালে তাঁরা আবেদন করলেন, হজরত মাজমা বিন হারেসাকে ওই মসজিদের ইমাম বানিয়ে দেয়া হোক। হজরত ওমর বললেন, না। এ রকম সিদ্ধান্ত বড়ই দৃষ্টিকটু হবে। সে কি ষড়যন্ত্রের মসজিদে (মসজিদে জেরায়) ইমামতি করেনি? হজরত মাজমা বললেন, হে বিশ্বাসীদের দলাধিনায়ক! এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি মসজিদে জেরায় ইমামতি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমিতো ওই মুনাফিকদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। জানলে নিশ্চয়ই আমি সেখানে যেতাম না। আমার বয়সও তখন বেশী ছিলো না। পরে কোরআন মজীদ পাঠ করে আমি তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি। হজরত ওমর তাঁর জবাব শুনে প্রীত হন এবং তাঁকে মসজিদে কোবার ইমাম হিসেবে নিযুক্তি দান করেন।

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে ধর্মানুষ্ঠানের জন্য' এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে কোবার মসজিদকে। মদীনার উপকণ্ঠের ওই কোবায় রসুল স. কয়েকদিনের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তারপর মদীনায় এসে শুরু করেছিলেন স্থায়ী বসবাস। ওই কোবার মসজিদকেই চিহ্নিত করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে। এ রকম বলেছেন সুহাইলী। কিন্তু হজরত ইবনে ওমর, হজরত জায়েদ বিন সাবেত এবং হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে মসজিদে নববীকে— মদীনার মসজিদকে। ইমাম আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, তিরমিজি, নাসাঈ, আবু ইয়া'লী, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম,আবু শায়েখ, হাকেম, ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি উম্মত জননীগণের কোনো একজনের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত ছিলাম। তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম দিনের মসজিদ বলে কোন মসজিদকে নির্দেশ করা হয়েছে? রসুল স. একমুঠো কাঁকর নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন, তোমাদের এই মদীনার মসজিদকে।

তিবরানী এবং জিয়া মুকাদ্দেসীর মাধ্যমে এসেছে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেত বলেছেন, রসুল স. এর নিকটে তাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন, আমার এই মসজিদ।

ইবনে আবী শায়বা এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমরের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কোরআন মজীদে উল্লেখিত তাকওয়ার মসজিদ কোনটি? তিনি বলেছিলেন, রসুল স. এর মসজিদ।

মসজিদে নববীর মর্যাদা সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস এসেছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেন, আমার প্রকোষ্ঠ ও

মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের বাগান। আর আমার মিম্বর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে হাউজে কাওছারের উপর। ওয়াল্লাহু আ'লাম। বাগবীর বর্ণনায় 'প্রকোষ্ঠ' এর পরিবর্তে উল্লেখিত হয়েছে 'কবর।'

বোখারী, মুসলিম, আহমদ ও নাসাঈ লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ মাজানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে জান্নাতের একটি বাগান। হজরত আলী থেকে তিরমিজিও এ রকম লিখেছেন।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক রাকাত নামাজ কাবা মসজিদ ব্যতীত অন্যসকল মসজিদের এক হাজার রাকাত নামাজাপেক্ষা উত্তম।

কোনো কোনো আলেম মনে করেন, 'মাসজিদুল উস্‌সিসা আ' লাত্‌তাক্বওয়া' (ত্বাকওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত বা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য মসজিদ) হচ্ছে মসজিদুল কোবা। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাসও এ রকম মনে করেন। হজরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং কাতাদাও এই অভিমতের প্রবক্তা। হিজরতের সময় মদীনায় পৌঁছানোর পূর্বে রসুল স. কোবায় অবস্থান করেছিলেন সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। ওই কয়দিন তিনি সেখানেই মসজিদ বানিয়ে নামাজ পড়েছিলেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী এবং জুহাক সূত্রে আবু শায়েখও এ রকম বলেছেন।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আবদুল্লাহ্ বিন দিনারের মাধ্যমে বোখারী লিখেছেন, রসুল স. প্রতি শনিবার পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে মসজিদে কোবায় গমন করতেন। রসুল স. এর অনুসরণে হজরত ইবনে ওমরও এরূপ করতেন। হজরত ইবনে ওমর থেকে নাফেয়ের বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখিত হয়েছে এই কথাটুকু— তিনি স. দু'রাকাত নামাজ পাঠ করতেন। দাউদী, সুহাইলী এবং ইবনে হাজার বলেছেন, এ কথার মধ্যে কারো মতভেদ নেই যে, মসজিদে কোবা এবং মসজিদে নববী— উভয় মসজিদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তাকওয়ার উপর।

আমি বলি, এই আয়াত বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও এর নির্দেশনাটি একটি সাধারণ নির্দেশনা। অর্থাৎ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী সহ বিশুদ্ধ নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল মসজিদ। আর আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এখানে মসজিদে কোবার কথাই বলা হয়েছে। কেননা মসজিদে জেরা নির্মাণ করা হয়েছিলো মসজিদে কোবার ক্ষতি সাধনের জন্য। পূর্ববর্তী আয়াতে তাই 'ক্ষতিসাধন' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতও

ওই বক্তব্যেরই পরিপুষ্টি সাধন করেছে। এখানে আরও বলা হয়েছে — 'এতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয়, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন।' এখানে 'পবিত্র হতে চায়' কথাটির অর্থ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে চায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী লিখেছেন 'পবিত্র হতে চায়' কথাটি অবতীর্ণ হয়েছে কোবা মসজিদের নামাজীদেরকে লক্ষ্য করে। তিরমিজিও এরূপ বলেছেন।

ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. মুহাজির সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে মসজিদে কোবায় পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে আনসার সাহাবীগণের একটি সমাবেশ। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা কি মুমিন? আনসার সাহাবীগণ নিশ্চুপ রইলেন। রসুল স. পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। এবার হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এদের মুমিন হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। আমিও এদের সঙ্গী। রসুল স. বললেন, তোমরা কি তকদিরের (ভাগ্যলিপির) প্রতি প্রসন্ন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, তোমরা কি বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণ করে থাকো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. পুনরায় বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্র রহমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, কাবার অধিশ্বরের শপথ! তোমরা মুমিন। এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লেন এবং বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেছেন। এবার বলো তোমরা ওজু ও ইস্তেনজা কীভাবে সমাধা করো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা শৌচকর্মের সময় প্রথমে ব্যবহার করি তিনটি পাথর। তারপর ব্যবহার করি পানি। এ কথা শুনে রসুল স. আবৃত্তি করলেন — 'এতে পবিত্র হতে চায় এমন লোক আছে এবং যারা পবিত্র হয় আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন।'

ইবনে খুজাইমা তাঁর সহিহ্ পুস্তকে হজরত উয়াইমির বিন সায়েদা থেকে লিখেছেন, রসুল স. কোবা মসজিদে গমন করলেন। সেখানকার মুসল্লিগণকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমরা কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আল্লাহ্র কসম! আমরাতো এমন কিছু জানিনা। আশে পাশের ইহুদীরা পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পন্ন করে থাকে। আমরাও সেরকম করি। অপর বর্ণনায় এসেছে, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা পাথর ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা শৌচকর্ম সম্পাদন করে থাকি। তিনি স. বললেন, এ কারণেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসেন।

ওমর ইবনে শায়বা তাঁর আখবারুল মদীনা গ্রন্থে ওলিদ আবু মুনজিরের মাধ্যমে লিখেছেন, হজরত ইয়াহ্ইয়া বিন সহল আনসারী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কোবা মসজিদের মুসল্লিদের সম্পর্কে। তাঁরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতেন।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, আতা বলেছেন, কোবাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ পানি দ্বারা পবিত্র হওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে প্রশংসা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১০৯

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

❒ যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহের সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধ্বংসমুখ কিনারায়, ফলে, যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

আয়াতের প্রথমে উল্লেখিত 'আফামান' কথাটির মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর দু'টোই রয়েছে। 'বুনইয়ানাহু' কথাটির অর্থ এখানে গৃহের ভিত্তি। 'আ'লা ত্বাকওয়া' অর্থ আল্লাহ্ভীতি। 'মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ান' অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর। 'শাফাজু-রুফিন্' অর্থ দুর্বল ভিত্তির উপর। শাফা শব্দটি এসেছে শাফির থেকে — যার অর্থ উপত্যকা বা নালার ওই তটভূমি যার অভ্যন্তরে নিরন্তর চলেছে স্রোতের আঘাত, যার ফলে ওই তটভূমির উপরে স্থাপিত ভবন ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হারিন্ (ফাটা) শব্দটি এসেছে হারিরুন থেকে। বাগবীর মতানুসারে 'হাইর' থেকে। এ রকমও বলা যায় যে, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'হারা-ইয়াহারু' থেকে। হারা অর্থ ঢলে পড়েছে, ধ্বসে পড়েছে। এখানে হারিন কথাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই তটভূমি যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অর্থাৎ যে তীরভূমি ধ্বসোন্মুখ।

এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে — যে ব্যক্তি তার (ধর্মীয়) গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, সেই উত্তম, না ওই ব্যক্তি উত্তম যে তার অপবিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণ করে অসত্য ও অপবিত্রতার উপর— যা ধ্বসোন্মুখ যার পরিণতি স্বরূপ সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে? আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তাকওয়া বা আল্লাহ্-ভীতির বিপরীতে রয়েছে শিরিক (অংশীবাদিতা) এবং নেফাক (অপবিত্রতা)। এখানে 'শাফা জুরুফিন' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে শিরিক ও নেফাককে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের নেফাকই তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

বাগবী বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য এই যে, মুনাফিকদের মসজিদ নির্মাণ করা এবং জাহান্নামে গৃহ নির্মাণ করা একই কথা। যে অসৎ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদ নির্মাণ করে, ওই উদ্দেশ্যই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

ইবনে আতিয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, আগের আয়াতে (১০৮) তাকওয়ার উপরে নির্মিত মসজিদের ভিত্তিকে দৃঢ়তা প্রদান করা হয়েছে। আর ওই মসজিদ হচ্ছে রসুল স. এর মসজিদ (মসজিদে নববী)। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্-ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপরে স্থাপিত মসজিদ হচ্ছে— মসজিদুল কোবা এবং ধ্বসোনুখ কিনারায় স্থাপিত মসজিদ হচ্ছে, মসজিদে জেরা (ষড়যন্ত্রের মসজিদ)। এ রকম মসজিদ নির্মাণকারীরা সীমালংঘনকারী এবং বিপথগামী। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে — আল্লাহ্ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

এ সম্পর্কে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন হজরত সা'দ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা এবং জারীহের উক্তি। আর ইবনে আবী হাতেম ও আবু শায়েখ উল্লেখ করেছেন কাতাদার বিবরণ। তাঁদের উক্তি ও বিবরণে রয়েছে, মসজিদে জেরার এক স্থানে খনন করা হলে লোকেরা সেখান থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখেছিলেন। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি মসজিদে জেরা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেছি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১০

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

❒ উহাদিগের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদিগের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে— যে পর্যন্ত না উহাদিগের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এখানে 'রীবাতান্' অর্থ সংশয় বা সংশয়জাত কপটতা। মুনাফিকদের অন্তরের ওই সংশয়াচ্ছন্নতার কারণেই তারা মনে করে, আমরা বোধ হয় পুণ্যকর্ম করেই চলেছি। হজরত মুসার সম্প্রদায়ের লোকদের হৃদয়ে যেমন সৃষ্টি হয়েছিলো গো-বৎসের প্রতি অপ্রতিরোধ্য অনুরাগ, তেমনি মুনাফিকদের অন্তরেও সৃষ্টি হয়েছিলো মসজিদে জেরার প্রতি অদম্য ভালোবাসা। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। কালাবী বলেছেন, রিবাতান কথাটির অর্থ এখানে সংশয়াকীর্ণ অন্তর্দাহ।

মুসলমানদের মসজিদ দেখে তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিলো ওই অন্তর্দাহ। সুদ্দী বলেছেন, এখানে রিবাতান অর্থ গাইজান (ক্ষোভ)। অর্থাৎ মুসলমানদের মসজিদের ক্ষতি সাধনের জন্য তাদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো ক্ষোভাগ্নি। তাদের অন্তরে ওই ক্ষোভাগ্নি বিরতিহীনভাবে জ্বলতেই থাকবে, যতোক্ষণ না তাদের অন্তরের শুভ অনুভূতি চিরতরে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই এখানে বলা হয়েছে— 'যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার অর্থ, মুনাফিকদের নিহত হয়ে যাওয়া অথবা কবরের অভ্যন্তরে কিংবা নরকাগ্নিতে উপনীত হওয়া। জুহাক ও কাতাদা বলেছেন, পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুনাফিকেরা সংশয়াচ্ছন্ন হতেই থাকবে। তাদের সংশয় সন্দেহ দূর হবে মৃত্যুর পর। তখনই কেবল তারা পাবে সত্যের সাক্ষাৎ। কিন্তু তখন সংশোধনের কোনো উপায় আর থাকবে না।

শেষে বলা হয়েছে — 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' এ কথার অর্থ — আল্লাহ্তায়ালা সবকিছু জানেন। মুনাফিকদের অন্তরের বিচিত্র ও বক্র গতিবিধি সম্পর্কে তিনি উত্তম রূপে অবগত। কারণ তিনি যে সর্বজ্ঞ। আর মুনাফিকদের মসজিদে জেরা ধ্বংসের যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন সেই নির্দেশও অযৌক্তিক কিছু নয়। বরং তা আল্লাহ্তায়ালার অপার প্রজ্ঞাময়তার নিদর্শন। কারণ, তিনি আনুরূপ্যবিহীন প্রজ্ঞাময়।

রসুল স. এর জীবনী রচয়িতাগণ লিখেছেন, নবুয়তের দায়িত্ব প্রাপ্তির একাদশতম বৎসর। হজের মওসুম। রসুল স. মক্কা থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। একদিন এক গিরিপথ অতিক্রম করার সময় খাজরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? তারা বললো, আমরা খাজরাজ গোত্রভূত। রসুল স. বললেন, তোমরা কি কিছু সময় দিতে পারো, আমি কিছু বলবো। খাজরাজেরা বললো, নিশ্চয়। এ কথা বলে উপবেশন করলো তারা। রসুল স. তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন। বর্ণনা করলেন ইসলামের রীতিনীতি। আবৃত্তি করে শোনালেন পবিত্র কোরআন।

ইহুদীরা ছিলো খাজরাজদের প্রতিবেশী। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু ইহুদীরা তাদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। বলতো তোমরা মূর্তি পূজারী। আর আমরা আহলে কিতাব। শেষ জামানার নবী আমাদের এই মদীনায় আগমন করবেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটবর্তী। তিনি এলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো।

রসুল স. এর আহ্বান শুনে খাজরাজদের মনে পড়ে গেলো ইহুদীদের কথা। তাঁরা রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলো। সবিস্ময়ে দেখলো, ইহুদীদের কাছে শোনা বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়ে স্বয়ং তাদের সামনে উপস্থিত শেষ জামানার পয়গম্বর স.। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি শুরু করলো, সাবধান,

ইহুদীরা যেনো তোমাদের আগে শেষ নবীর নিকটে পৌঁছে না যায়। এ কথা বলে তারা সকলে রসুল স. এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। খাজরাজ গোত্রের ওই ছয় ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন মুসলমান। তাঁদের নাম— হজরত আস্য়াদ বিন দ্বারারা, হজরত আউফ বিন হারেস, হজরত রাফে বিন মালেক, হজরত কুতবা বিন আমের বিন জাদিদা, হজরত উক্বা বিন আমের বিন নাবী এবং হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ বিন রুবাব। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত জাবেরের স্থলে এসেছে, হজরত উবাদা বিন সামেতের নাম। কেউ কেউ বলেছেন, তখন মুসলমান হয়েছিলেন সাত জন। সুতরাং আগের তালিকায় উল্লেখিত ছয়জনের সঙ্গে যুক্ত হবেন হজরত উবাদা ইবনে সামেত।

রসুল স. বললেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালকের বাণী প্রচার করবো। তোমরা কি এই মহান কাজের সহায়তাকারী হবে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের মধ্যে রয়েছে গোত্রদ্বন্দ্ব। গত বছর আমাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বুগাছের যুদ্ধ। এমতো অন্তর্কলহের পরিস্থিতিতে আপনি যদি আমাদের নিকটে আগমন করেন তবে সম্মিলিত সহায়তা নাও পেতে পারেন। আপনি বরং আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা স্বস্থানে ফিরে যাই। সম্ভবতঃ এবার আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো কাঙ্খিত সম্প্রীতি। আর আমরা আমাদের জনপদ-বাসীকেও একই আমন্ত্রণ জানাতে চাই, যে আমন্ত্রণ আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। আশা করি আমাদের গোত্রের সকলে আপনার আশ্রয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। যদি আমরা সবাই আপনার অনুগত হয়ে যাই, তবে আপনার বিরুদ্ধবাদী হওয়ার সাহস কারো হবে না। ইনশাআল্লাহ্ আগামী বছর আমরা সকলে আবার আসবো। রসুল স. তাঁদেরকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন।

সত্যের আলোয় আলোকিত দলটি মদীনায় উপস্থিত হলো। মদীনার গৃহে গৃহে শুরু হলো ইসলামের আলোচনা । গৃহে গৃহে দেখা দিলো প্রচ্ছন্ন উপপ্লব। পরের বছর ইসলাম গ্রহণ করলেন আরও সাতজন। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন খাজরাজ গোত্রের এবং দু'জন ছিলেন আউস গোত্রের । খাজরাজীগণের নাম— হজরত আউফ ইবনে হারেমের ভ্রাতা হজরত মুয়াজ ইবনে হারেস, হজরত জাকওয়ান, হজরত উবাদা ইবনে সামেত, হজরত ইয়াজিদ ইবনে সা'লাবা এবং হজরত আব্বাস ইবনে উবাদা বিন নাজলা। আর আউস গোত্রভূত বনী আশহালের হজরত আবুল হাইছাম ইবনে তাইহান এবং হজরত উয়াইমির ইবনে সায়েদা।

পরের বছর কয়েকজন মহিলাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না, চুরি করবো না, ব্যভিচার করবো না ইত্যাদি। সুরা মুম্তাহিনার তাফসীরে যথাস্থানে মহিলাদের বায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

নতুন মুসলমানেরা মদীনায় ফিরে গেলেন। হজরত আস্য়াদ ইবনে দ্বারারা সেখানকার সকল মুসলমানকে একত্র করলেন। সকলে পরামর্শক্রমে মক্কায় রসুল স. এর নিকটে এই মর্মে লিখিত নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করুন, যিনি আমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতে

পারেন। রসুল স. প্রেরণ করলেন হজরত মাসআব ইবনে উমায়েরকে। তখন মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশে। হজরত মাসআবের প্রচেষ্টায় আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেন। সমাজপতি হজরত সায়াদ ইবনে মুয়াজ এবং হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরও মুসলমান হয়ে গেলেন। ফলে, বনী আবদ্ ও বনী আশহাল গোত্রের পুরুষ নারী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

নবুয়তের ত্রয়োদশতম বৎসরে হজের সময় সত্তর অথবা তিয়াত্তর জন পুরুষ ও মহিলা ইসলামে বায়াত গ্রহণ করলেন। হাকেম বলেছেন পঁচাত্তর জনের কথা।

মোহাম্মদ বিন কা'ব কারাজী থেকে ইবনে জারীর ও বাগবী উল্লেখ করেছেন, ওই সময় হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা নিবেদন করেছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আপনি যে কোনো শর্তে আপনার প্রভুপ্রতিপালক ও আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করুন। আমরা আপনার সকল শর্ত মানতে প্রস্তুত। রসুল স. বললেন, আমি আমার প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলতে চাই, তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করবে, কাউকে অথবা কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার নির্ধারণ করবে না। আর আমার পক্ষ থেকে বলতে চাই, যেভাবে তোমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করো সেভাবেই আমার নিরাপত্তা বিধান করবে। তাঁরা বললেন, আমরা যদি এরূপ করি, তবে আমাদের কী লাভ হবে? রসুল স. বললেন, জান্নাত। তাঁরা বললেন, জান্নাতের প্রতি রয়েছে আমাদের আন্তরিক অনুরাগ। আমরা এই অনন্য পণ্য প্রত্যাখ্যান করবো না। তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো—

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১১

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

❒ আল্লাহ বিশ্বাসীদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহের পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহাসাফল্য।

এখানে জান্নাতের বিনিময়ে বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা বিষয়টিকে ক্রয় বিক্রয়ের সংগে তুলনা করেছেন।

রসুল স. এর জীবনী রচয়িতাগণ লিখেছেন, আকাবায় সর্বপ্রথম রসুল স. এর পবিত্র হস্ত ধারণ করে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন হজরত বারা বিন মা'রুর অথবা হজরত আবুল হাইছাম কিংবা হজরত আবুল আস্য়াদ। তাঁরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তাঁরা রসুল স. এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন এবং তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। আল্লাহর পথে জেহাদ বা সংগ্রামের কথা এই আয়াতেই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়। এরপর অবতীর্ণ হয় 'উজিনা লিল্লাজিনা ইউক্বাতিলুনা।'

গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনে আকাবা প্রান্তরে সম্পন্ন হয়েছিলো ওই অঙ্গীকার-নামা। এরপর রসুল স. তাঁর মক্কার অনুচরবর্গকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন এবং তিনি স্বয়ং হিজরতের অনুমতির অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।

প্রথম হিজরতকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হজরত আবু সালমা বিন আবদুল আসাদ আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে খুবই কষ্ট দিতে শুরু করলো। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ হিজরত করে চলে গেলেন মদীনায়। তিনিই ছিলেন মদীনায় প্রথম হিজরতকারী। এরপর হিজরত করেন হজরত আমের বিন রবীয়া এবং তার পত্নী হজরত লায়লা। এরপর গেলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। একের পর এক হিজরত চলতে লাগলো। হজরত ওমর ও তাঁর ভ্রাতা হজরত জায়েদ এবং হজরত আব্বাস বিন রবীয়াসহ বিশ জনের একটি দল এক সংগে হিজরত করলেন। এরপর গেলেন হজরত ওসমান বিন আফ্ফান। হজরত আবু বকর পুনঃ পুনঃ রসুল স. এর হিজরতের সাথী হবার আবেদন জানিয়ে চললেন। রসুল স. বললেন, ত্বরা কোরো না। সম্ভবতঃ তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। পরিস্থিতি অতি দ্রুত সঙ্গীন হয়ে পড়লো, কুরায়েশরা শলা পরামর্শ করে ঠিক করলো, রসুল স.কে হত্যা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তারা এক রাতে রসুল স. এর গৃহ ঘেরাও করে ফেললো। ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়।' এখানে 'ইউক্বাতিলুনা' শব্দগত দিক থেকে ইচ্ছানির্ভরতাপ্রকাশক (যদি তোমরা ইচ্ছা করো তবে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করো)। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে শব্দটি নির্দেশসূচক (আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো)।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুতঃ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ।' এখানে 'আলাইহি' কথাটির 'হি' (তিনি) সর্বনামটি 'ইশতারা' (ক্রয় করেছেন) কথাটির দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর ওয়াদান (এই প্রতিশ্রুতি) কথাটির ক্রিয়া এখানে উহ্য। এই কথাটি এখানে এসেছে গুরুত্ব প্রকাশকরূপে। এভাবে 'হাক্কান' কথাটি হয়েছে 'ওয়াদান' এর বিশেষণ। অথবা কথাটি একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কর্ম। তওরাত ও ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ— এ কথা বলে পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয়েছে যে, ইতোপূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকেও জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং তার বিনিময় হিসেবে জান্নাতের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? এই প্রশ্নটি একটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন (ইস্তিফহামে ইনকারী)। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আল্লাহ্তায়ালার পক্ষে অসম্ভব। সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই কেবল যথাযথ-রূপে প্রতিজ্ঞাপালন করে থাকেন। আর আল্লাহ্তায়ালা তো অতুলনীয়রূপে সম্মানিত। সুতরাং প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে?

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে সওদা করেছো সেই সওদার জন্য আনন্দ করো এবং এটাই মহাসাফল্য।' এই বাক্যটির মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম-কারীদেরকে (মুজাহিদদেরকে) সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। মুজাহিদেরাই এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল হলেও ইতোপূর্বের বাক্যগুলোতে তাঁরা এভাবে সম্বোধিত হননি। আল্লাহ্তায়ালা মুজাহিদগণকে সরাসরি শুভ সংবাদ দান করবেন বলেই এ রকম বক্তব্যভঙ্গির প্রয়োগ ঘটেছে। মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা জানমাল দিয়ে যে সওদা (জান্নাত) ক্রয় করেছো তার জন্যে উৎফুল্ল হও, আনন্দ প্রকাশ করো। কারণ এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।

হজরত ওমর বলেছেন— হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্পাক নিজেই তোমাদেরকে জীবন ও সম্পদ দান করেছেন এবং নিজেই তা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। আবার এই ক্রয় বিক্রয়ের উপকারও তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাক মুজাহিদদেরকে বিনিময় প্রদান করেছেন অত্যধিক। হাসান বসরী বলেছেন, শুভসংবাদ শ্রবণ করো, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক মুমিনের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করেছেন এবং মুনাফা তাদেরকেই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে দুনিয়া দান করেছেন। এখন তোমরা ওই দুনিয়া দিয়ে জান্নাত কিনে নাও। এই ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে মহাসফলতার নাম। জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য এটাই।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❐ উহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশ দাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী এবং আল্লাহের সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই বিশ্বাসীদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আত্তায়িবুনা (তারা তওবাকারী)। এর অর্থ— ওই সকল লোক যারা অংশীবাদিতা থেকে ফিরে এসেছে এবং কপটতা থেকে মুক্ত হয়েছে। আত্তায়িবুন এখানে বিধেয়। এর উদ্দেশ্যটি এখানে অনুক্ত। অর্থাৎ যে সকল লোক রসুল স. এর নিকটে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন, শরিয়তের আহকাম সমূহের প্রতি ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে আত্তায়িবুনা হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় হচ্ছে এর পরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। অথবা বলা যেতে পারে বিধেয়টিই এখানে উহ্য। অর্থাৎ তওবাকারীরা জান্নাতী। তারা জেহাদ থেকে ফিরে যাননি, গোয়ার্তুমি করেননি, জেহাদের যোগ্যতা প্রদান করা সত্ত্বেও এ কথা বলেননি যে, আমরা জেহাদ করবো না। জুজায বলেছেন, এভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় সকল বিশ্বাসীকেই আল্লাহ্তায়ালা জান্নাত দানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে— 'ওয়াকুল্লাওঁ ওয়াদাল্লহুল হুসনা' (এবং সকলের সঙ্গে আল্লাহ্ কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন)।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল আ'বিদুন' (ইবাদতকারী)। এ কথার অর্থ— তাঁরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন (জলি ও খফি) অংশীবাদিতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহ্র উপাসনায় মগ্ন থাকে।

এরপর বলা হয়েছে — 'আল হামিদুন' (আল্লাহ্র প্রশংসাকারী)। অর্থাৎ যারা সুখে ও দুঃখে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসারত থাকে। রসুল স. বলেছেন, আনন্দে ও বেদনায় যারা আল্লাহ্তায়ালার অকুণ্ঠ প্রশংসা বর্ণনা করে, তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে সবার আগে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রসম্বলিত এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী, হাকেম ও বায়হাকী। এরপর

বলা হয়েছে— 'আস্ সায়িহুনা' (রোজা পালনকারী)। হজরত উবায়েদ ইবনে ওমর থেকে ইবনে জারীর লিখেছেন, রসুল স.কে একবার আস্ সায়িহুনা শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি স. বললেন, রোজা পালনকারী। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাগবীও এ রকম বলেছেন। জননী আয়েশা থেকে মাওকুফরূপে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত 'সিয়াহাত' এর অর্থ রোজা রাখা।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনিয়া বলেছেন, রোজাদার আহার বিহার এবং স্ত্রী সাহচর্য পরিত্যাগ করে থাকে। তাই তাকে বলা হয় সায়িহ্। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আদম সন্তানদের প্রতিটি পুণ্যকর্মের বিনিময় দেয়া হবে দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত। কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন, রোজা রাখা হয় কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমিই এর যথাপুরস্কার প্রদান করবো। রোজাদারেরা কেবল আমার জন্য পানাহার ও কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে। বোখারী, মুসলিম। আতা বলেছেন, 'আস্সায়িহুনা' অর্থ গাজী (ধর্মযুদ্ধজয়ী)। তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করেন। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে ইবনে মাজা, হাকেম ও বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমার উম্মতের ভ্রমণ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদতুল্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওসমান ইবনে মাসউদ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করুন। তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ। হজরত ইকরামা বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় ভ্রমণকারী অর্থ জ্ঞানানুসন্ধানী (তালেবে এলেম) —যারা জ্ঞানান্বেষণের জন্য দেশ দেশান্তরে পাড়ি জমান। হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, যারা জ্ঞানান্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। আর ফেরেশতারা জ্ঞানানুসন্ধানীদের চলার পথে তাদের পাখা বিছিয়ে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আকাশের ফেরেশতা, পৃথিবীর মানুষ এবং জ্বিন, পানির মৎস সকলেই তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে। জ্ঞানী ও ইবাদতপ্রিয় ব্যক্তির তুলনা হচ্ছে চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। আলেমগণ আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়াগণ উত্তরাধিকারীরূপে দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের উত্তরাধিকার যারা লাভ করবে তারা বড়ই সৌভাগ্যশালী। আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর রাকিউনাস্সাজিদুন (রুকু ও সেজদাকারী)। এ কথার অর্থ, যারা নামাজ পাঠ করে। রুকু ও সেজদা এ দু'টো শব্দের মাধ্যমে এখানে নামাজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে করে বুঝা যায়, অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় নামাজ অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! কোন আমল আল্লাহ্র

নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি স. বললেন, যথাসময়ে নামাজ সম্পাদন। আমি বললাম এরপর? তিনি স. বললেন পিতামাতার আনুগত্য। আমি বললাম, তারপর? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ। মুসলিম, বোখারী। হজরত ফজল বিন দাকাইন থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নামাজ ধর্মের স্তম্ভ।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আসাকের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নামাজ মুমিনের নূর। হজরত আলী থেকে কাজায়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য নামাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অবলম্বন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সেজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হয়। অতঃপর তোমরা সেজদাবনত অবস্থায় অত্যধিক দোয়া প্রার্থনা করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল আমিরুনা বিল মারুফী ওয়ান্‌নাহুনা আনিল মুনকার' (সৎকাজের নির্দেশ দাতা, অসৎ কাজ নিষেধকারী)। এ কথার অর্থ, তারা ইমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং পাপকর্মে বাধা প্রদান করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'আল মা'রূফ কথাটির অর্থ সুন্নত এবং 'আল মুনকার' কথাটির উদ্দেশ্য বেদাত। একই সঙ্গে শব্দ দু'টির উল্লেখ করার কারণ এই যে, একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে উভয় গুণাবলী যেনো প্রস্ফুটিত হয়। অর্থাৎ তারা যেনো হয় আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নের অতন্দ্র প্রহরী।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়াল হাফিজুনা লি হুদুদিল্লাহ্‌' (এবং আল্লাহ্‌র সীমারেখা সংরক্ষণকারী)। কোনো কোনো আলেম লিখেছেন, উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি 'ওয়াও' (এবং) অব্যয় সহযোগে সংযোগ করার কারণ হচ্ছে, সংক্ষেপে সকল গুণাবলীকে একত্রিত করা। অর্থাৎ ইতোপূর্বে বর্ণিত বিস্তারিত গুণাবলীকে সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ করা।

আমি বলি, 'আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী' কথাটির অর্থ এখানে আয়াতের প্রথমে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর মহব্বতে যথানিয়মে সম্পাদন করে। নিজের পক্ষ থেকে কোনো সংযোজন ও বিয়োজন ঘটায় না। তাই এখানে আল্লাহ্‌র সীমারেখা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হবে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ বিশুদ্ধ তা (এখলাস) ও পরিপূর্ণ একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব) সহ সম্পাদন করা। এখলাস ও হুজুরী কলব ছাড়া কোনোক্রমেই আল্লাহ্‌তায়ালার সীমা সংরক্ষণ সম্ভব নয়। যাঁরা এখলাস বা হুজুরী কলবের অধিকারী তাঁদের সংস্পর্শে না এলে এখলাস ও হুজুরী কলব পাওয়াও সম্ভব নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'ওয়া বাশ্‌শিরিল মু'মিনীন (এই বিশ্বাসীদেরকে তুমি শুভসংবাদ দাও)। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, এতক্ষণ ধরে আলোচিত গুণাবলীর অধিকারী বিশ্বাসীরাই পূর্ণ বিশ্বাসী (মুমিনে কামেল)। এখানে কেবল বলা

হয়েছে— শুভ সংবাদ দাও। কিন্তু কোন কোন নেয়ামত দেয়া হবে, তার উল্লেখ নেই। এতে করে বুঝা যায়, ওই নেয়ামতসমূহ হবে সুবিপুল ও বর্ণাঢ্য—যা বিবরণের অতীত, যা কারো জ্ঞান ও আওতায় আসতে পারে না। আল্লাহ্তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের পিতা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবু তালেবের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন রসুল স.। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরাও উপস্থিত ছিলো সেখানে। রসুল স. বললেন, হে আমার পিতৃব্য! অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, যাতে আমি আপনার পক্ষে দাঁড়াতে পারি। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ বললো, হে আবু তালেব! আপনি কি আবদুল মুত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? রসুল স. বার বার তাঁর নিবেদন জানাতে লাগলেন। আর আবু জেহেল আর আবদুল্লাহ বার বার বাধা সৃষ্টি করতে থাকলো। শেষে আবু তালেব বললেন, আমি আবদুল মুত্তালেবের ধর্মমতের উপরেই রইলাম। এক বর্ণনায় এসেছে আবু তালেব তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলতে অস্বীকার করলেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকবো। তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১৩

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

❐ আত্মীয় স্বজন হইলেও অংশীবাদীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে উহারা জাহান্নামী।

এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে বুঝা যায়, জীবিত মুশরিক ও অবিশ্বাসীদের জন্য দোয়া করা যাবে। কিন্তু মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা যাবে না। পৃথিবীবাসী মুশরিকদের জন্য 'হে আল্লাহ! তাদেরকে ইমান দাও' এ রকম দোয়া করা উত্তম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী পিতৃব্যকে বললেন, হে আমার পিতৃব্য! 'লা ইলাহা ইল্লালাহ্' উচ্চারণ করুন। কিয়ামতের দিন আমি আপনার সুপারিশ করবো। তাঁর পিতৃব্য বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! 'আবু তালেব মৃত্যু ভয়ে ভীত এ রকম অপবাদ ছড়িয়ে পড়ার

সম্ভাবনা যদি না থাকতো' তবে নিশ্চয় আমি তোমার নয়নযুগল শীতল করতাম। তখন অবতীর্ণ হলো 'ইন্নাকা লা তাহদী মান আহবাবতা ওয়ালা কিন্নাল্লহা ইয়াহদি মাঁইয়াশাউ' (নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হেদায়েত করতে পারেন না, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করেন)।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে , হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের কিছু ফায়দা আমার চাচা আবু তালেব পাবেন। ফলে অন্যদের চেয়ে তার আযাব হবে কম। গ্রন্থি পর্যন্ত তাঁর দু' পা রাখা হবে আগুনে। আর ওই উত্তাপে টগবগ করে ফুটতে থাকবে তাঁর মাথার মগজ। এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। তিরমিজি ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক উত্তম আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, আমি একবার এক ব্যক্তিকে তার মৃত মুশরিক পিতা মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। বললাম, তাদের জন্য দোয়া করছো কেনো? তারা তো ছিলো মুশরিক। সে বললো, হজরত ইব্রাহিমও তো তাঁর মুশরিক পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি রসুল স.কে ঘটনাটি জানালাম। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াতটি। সম্ভবতঃ এই ঘটনাটিও ঘটেছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে। তাই এই ঘটনাটি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে হতে পারে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রসুল স. এর প্রিয় জননী হজরত আমেনা সম্পর্কে। কিন্তু বর্ণনাগুলো অবিশুদ্ধ। তাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদিস সমূহের সমপর্যায়ভূতও নয়। এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণ না করাই সমীচীন।

হাকেম ও বায়হাকী আইয়ুব ইবনে হানীর পদ্ধতিতে মাসরূক সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন রসুল স. আমাদের কয়েকজনকে সংগে নিয়ে এক কবরস্থানে গেলেন। তিনি এক স্থানে আমাদেরকে বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। তিনি কয়েকটি কবর অতিক্রম করে অনতিদূরের একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত অনুচ্চস্বরে কিছু পাঠ করতে থাকেন এবং কাঁদতে থাকেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও কাঁদতে শুরু করি। কিছুক্ষণ পর তিনি স. আমাদের নিকটে এলেন। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনাকে কাঁদতে দেখে আমরাও কেঁদেছি। তিনি স. বললেন, তোমরা কি বিস্মিত হয়েছো? আমরা বললাম হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, আমি আমার জননী আমেনা বিনতে ওহ্হাবের কবর জিয়ারত করলাম। পূর্বাহ্নে আমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট থেকে জিয়ারতের অনুমতি লাভ করেছি। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলাম না। কারণ আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে— আত্মীয়স্বজন হলেও

অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয়। তাই মায়ের প্রতি স্বভাবজ ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে আমি কেঁদে ফেলেছি। হাকেম এই হাদিসকে সহীহ্ বলেছেন, কিন্তু ইমাম জাহাবী তাঁর শরহে মুস্তাদরাক গ্রন্থে এ কথার সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, ইবনে মুঈন আইয়ুব ইবনে হানীকে বর্ণনাকারী হিসাবে দুর্বল বলেছেন। তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আউফান নামক স্থানে তাঁর জননীর কবরের পাশে দাঁড়ালেন। এর পরের বর্ণনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত ইবনে মাসউদের বর্ণনার অনুরূপ। আল্লামা সুয়ুতি বলেছেন, এই হাদিসের সূত্র পরম্পরা অত্যন্ত শিথিল।

হজরত আবু হোরায়রা এবং হজরত বুরায়দা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের পর রসুল স. তাঁর সম্মানিত জননী হজরত আমেনার কবর জিয়ারত করেন। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। হজরত বুরায়দা থেকে হজরত ইবনে সা'দ এবং ইবনে শাহিন কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুল স. মক্কা বিজয়ের পর তাঁর প্রিয় জনয়িত্রীর সমাধিতে গমন করেন এবং সেখানে বসে পড়েন। হজরত বুরায়দা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন ইতোপূর্বে উল্লেখিত বাগবীর বর্ণনার অনুরূপ। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত পুস্তকে হাদিসটি বর্ণনা করার পর স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন, বর্ণনাটি ভুল। কারণ হজরত আমেনার সমাধি আবওয়া নামক স্থানে, মক্কায় নয়।

ইমাম আহমদ এবং ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত বুরায়দা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সফর সংগী ছিলাম। আসফান নামক স্থানে আমাকে বসিয়ে রেখে রসুল স. ওজু করলেন এবং নামাজ পড়লেন। তাঁর সম্মানিত মাতার সমাধি দর্শন করলেন। তারপর আমার নিকটে এসে বললেন, আমি আমার মাতার শাফায়াতের জন্য আল্লাহ্তায়ালার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আল্লামা সুয়ুতি বলেছেন, এই হাদিসের সকল দিক মাজরুহ (ক্ষতবিক্ষত)।

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, যারা হজরত ইবনে মাসউদের হাদিসকে সহিহ্ বলেছেন, তারা হাদিসটিকে সত্তাগত হিসেবে সহিহ্ বলেননি। সহিহ্ বলেছেন পদ্ধতিগত দিক থেকে। কিন্তু আমি পদ্ধতিগত দিক থেকেও পরীক্ষা করে দেখেছি এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, পদ্ধতিগত দিক থেকেও হাদিসটি ক্ষতবিক্ষত (মাজরুহ)। এছাড়া হাদিসটি অগ্রহণীয় হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, হাদিসটি সহিহাইনের (বোখারী ও মুসলিমের) পরিপন্থী। কারণ বোখারী ও মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর প্রাক্কালে।

কাতাদা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম যেভাবে তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আমিও তেমনি আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছিলাম। এরপর অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। বর্ণনাটি সহিহ্, মুরসাল, জয়ীফ যাই হোক না কেনো সহিহাইনের পরিপন্থীই হবে। সুতরাং এভাবে রসুল স. এর সম্মানিত মাতা পিতাকে মুশরিক সাব্যস্ত করা কিছুতেই ঠিক নয়। পক্ষান্তরে রসুল স. এর মাতা পিতা যে মুমিন ছিলেন সে সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতি কয়েকটি পুস্তিকা লিখেছেন। ওই সকল পুস্তিকায় তিনি হজরত আদম আ. থেকে শুরু করে রসুল স. এর ঊর্দ্ধতন সকল পিতা ও মাতাকে ইমানদার প্রমাণিত করেছেন। আমিও ওই সকল তথ্যপ্রমাণ সহযোগে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। সুতরাং এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করবার আর কোনো অবকাশই নেই।

একটি সন্দেহঃ সহিহাইনের হাদিসে এসেছে, আবু তালেবের মৃত্যুকালে আবু জেহেল বলেছিলো, হে আবু তালেব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? আবু তালেব বলেছিলেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই রইলাম। এতে করে প্রমাণিত হয় আবদুল মুত্তালিব মুশরিক ছিলেন। যদি তাই হয়, তবে এ কথা কিভাবে বলা যেতে পারে যে, হজরত আদম পর্যন্ত রসুল স. এর সকল পিতৃপুরুষ মুমিন ছিলেন?

সন্দেহের জবাবঃ বর্ণিত হাদিস থেকে এ কথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না যে, হজরত আবদুল মুত্তালিব মুশরিক ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন নিশ্চিত ইমানদার। স্বসূত্রে ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত পুস্তকে লিখেছেন, হজরত আবদুল মুত্তালিব একবার রসুল স. এর পরিচর্যাকারিণী উম্মে আয়মানকে বলেছিলেন, হে উম্মে আয়মান! আমার পুত্রের পক্ষ থেকে আশীর্বাদকে অবহেলা করো না। আমি কুল বৃক্ষের নিকটে তাকে দেখেছিলাম। তখন আহলে কিতাবীরা বলেছিলো এর পুত্র এই উম্মতের পয়গম্বর হবেন। প্রকৃত কথা এই যে, হজরত আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মূর্খতার যুগের মানুষ। তাই আসমানী শরিয়তের সংগে তাঁর পরিচয় ছিলো না। ওই জামানা ছিলো ফিতরতের জামানা। অর্থাৎ ওই জামানায় কেবল আল্লাহ্-তায়ালার এককত্বের স্বীকৃতিই ইমানদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কারণ তখন অতীতের সকল পয়গম্বরের শরিয়তের জ্ঞান প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিলো। আর শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. তখনও রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হননি। তাই তিনি শরিয়তের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। আবু জেহেল এই প্রকৃত তত্ত্বটি বুঝতে পারেনি। সে মনে করেছিলো, রসুল স. আবু তালেবের বিরুদ্ধে কোনো ভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তাই সে আবু তালেবকে বলেছিলো, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চান? আবু তালেবেরও প্রকৃত তত্ত্ব জানা ছিলো না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই রইলাম।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

❒ ইব্রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে সে আল্লাহের শত্রু তখন ইব্রাহীম উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

এখানে 'ইব্রাহিম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো'— অর্থ ইব্রাহিম তাঁর পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর ওই লালনপালনকারী পিতৃব্যের নাম ছিলো আজর। আর তাঁর পিতার নাম ছিলো তারিখ। প্রসংগটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সুরা আনআমের তাফসীরে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, 'তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বলে' কথাটির অর্থ হবে এখানে— হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে। 'ইয়্যাহু' কথাটির উদ্দেশ্য এখানে হজরত ইব্রাহিম। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিমের পিতা তাকে মুসলমান হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। সে কারণেই হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো, যখন আপনি মুসলমান হবেন। অধিকাংশ তাফসীরকার এ কথাও বলেছেন যে, এখানে ওয়াদা (প্রতিশ্রুতিদান) কথাটির কর্তা হজরত ইব্রাহিম। আর 'ইয়্যাহু' কথাটির উদ্দেশ্য হবে হজরত ইব্রাহিমের পিতা। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি আপনার জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করবো। এই তাফসীরের সমর্থকরূপে এই আয়াতটি উল্লেখ করা যায়— 'ক্বদ কানাত লাকুম উস ওয়াতুন হাসানাতুন ফী ইব্রাহিম.........লাআসতাগ ফারান্নালাকা' পর্যন্ত (ইব্রাহিমের আদর্শ তোমাদের জন্য প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত........অবশ্যই আমি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হবো)। এই আয়াতে হজরত ইব্রাহিমের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু হজরত ইব্রাহিম তাঁর পিতার যে মাগফিরাত কামনা করেছিলেন, তা এই সাধারণ নির্দেশনাটির অন্তর্ভূত নয়। অর্থাৎ তাঁর পিতা তাঁর অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুশরিক। হজরত ইব্রাহিম তাঁর সংগে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, হজরত আদমের সময় থেকে অতিবাহিত শতাব্দীসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম শতাব্দীতে প্রেরিত হয়েছি আমি। সুতরাং এ কথা বলতে হয় যে, রসুল স. এর পূর্বে অতিবাহিত সকল শতাব্দীই ছিলো উত্তম। আর রসুল স.এর শতাব্দী ছিলো সর্বোত্তম। তাহলে এ কথা কিভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে যে, রসুল স. এর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কেউ অবিশ্বাসী বা মুশরিক ছিলেন?

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক আখে-রাতের সংগে। অর্থাৎ আখেরাতে যখন হজরত ইব্রাহিমের নিকট তাঁর পিতার কাফের হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে তখন তিনি তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন পিতার সংগে সাক্ষাৎ ঘটবে হজরত ইব্রাহিমের। তাঁর পিতার চেহারা হবে তখন ধূলি ধূসরিত। হজরত ইব্রাহিম বলবেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আমার প্রতিপক্ষে দাঁড়াবেন না। পিতা বলবেন, আজ আমি তোমার অবাধ্য হবো না। হজরত ইব্রাহিম প্রার্থনা জানাবেন, হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আপনি আমাকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না। আজ আমার পিতা লাঞ্ছিত (এটা কি আমার জন্য অপমান নয়)। আল্লাহ্পাক বলবেন, কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম। হে ইব্রাহিম! নিচের দিকে তাকাও। হজরত ইব্রাহিম নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবেন, একটি কর্দমাক্ত উদকে পা ধরে দোজখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম তখন প্রকাশ করবেন অসন্তোষ। এ কথাই এখানে এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহিম তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করলো।'

শেষে বলা হয়েছে 'ইব্রাহিম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।' এখানে 'আউয়াহুন' কথাটির অর্থ করা হয়েছে কোমল হৃদয়। আউয়াহুন বলা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহ্পাকের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকেন। হজরত ইব্রাহিম তাঁর জীবনে বহুবার এ রকম হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, পাপের ভয়ে তটস্থ ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন। মোট কথা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন— সে ভীতি আল্লাহ্র হোক, দোজখের হোক অথবা পাপের। আতা বলেছেন, জাহান্নামের ভয়ে ভীত এবং আল্লাহ্তায়ালার অপ্রিয় বিষয় সমূহ থেকে পবিত্র ব্যক্তিকে বলে আউয়াহুন। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আউয়াহুন হচ্ছে অধিক দোয়া নিবেদনকারী। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অধিক সংখ্যক তওবা ইস্তেগফার করেন তাঁরাই আউয়াহুন (কোমল

হৃদয়)। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র বান্দাগণের জন্য যে সুপারিশ করে ও মেহেরবাণী করে, সে আউয়াহুন। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ দৃঢ় বিশ্বাসী। হজরত ইকরামা বলেছেন, শব্দটি আবিসিনীয়। আবিসিনিয়ার ভাষায় আউয়াহুন শব্দটির অর্থ প্রত্যয়ী। হজরত উকবা ইবনে আমের বলেছেন, আউয়াহুন বলা হয় আল্লাহ্কে অত্যধিক স্মরণকারীকে। হজরত সাঈদ বিন যোবায়েরের নিকটে শব্দটির অর্থ অত্যধিক ভ্রমণকারী। আরেক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আউয়াহুন অর্থ 'মুয়াল্লিমুন খাইর' (উত্তম শিক্ষক)। ইব্রাহিম নাখয়ী বলেছেন, এর অর্থ বুদ্ধিমান। কামুস গ্রন্থে রয়েছে আউয়াহুন অর্থ— প্রত্যয়ী, দোয়া প্রার্থী, দয়ার্দ্র, বিবেচক অথবা ইমানদার। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, তিনিই আউয়াহুন, যিনি ভয়ে আহ্ উহ্ উচ্চারণ করেন, দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন এবং আনুগত্যের উপরে অটল থাকেন। জুজায বলেছেন, হজরত আবু উবায়দারকৃত অর্থ ইতোপূর্বে বর্ণিত সকল অর্থকে একত্রিত করেছে।

'হালীম' অর্থ— অন্যের ক্ষতি অপসারণকারী হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হালীম। তার পিতা তাঁকে বলেছিলো, যদি তুমি তোমার ধর্মমত প্রচারে বিরত না হও তবে, আমি প্রস্তর প্রক্ষেপণের মাধ্যমে তোমার মৃত্যু ঘটাবো। এর উত্তরে হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন, হে আমার পিতা! আমি আপনার পরিত্রাণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হালীম অর্থ অধিনায়ক। কামুস গ্রন্থে রয়েছে হালীমুন অর্থ তাহাম্মুল (সহিষ্ণুতা) এবং বিচক্ষণতা। হালীমুন হচ্ছে (বিশেষণের অনুরূপ)। শব্দটি এসেছে 'হিলমুন' থেকে। হজরত ইব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই হজরত ইব্রাহিম ছিলেন 'আউয়াহুন হালীম'(কোমল হৃদয় ও সহনশীল)। তাই তিনি ওভাবে তাঁর পিতার জন্য দোয়া করতে পেরেছিলেন।

মুকাতিল ও কালাবী বর্ণনা করেছেন, মদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের কিছু লোক রসুল স. এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন পর্যন্ত মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি এবং কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হয়নি। ওই সকল লোক ফিরে গেলেন স্বগৃহে। ইতোমধ্যে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে শরাব হারাম করা হলো এবং কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হলো। বেশ কিছুদিন পর ওই লোকেরা পুনরায় মদীনায় এলেন এবং শরাব ও কেবলার বিধান জানতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! শরাব নিষিদ্ধ হয়েছে, কেবলার হুকুমও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আমরা না জানতে পেরে পরিবর্তিত বিধান দু'টোর উপরে আমল করতে পারিনি। এতদিন ধরে আমরা শরাবও পান করেছি এবং পূর্বের কেবলার দিকে (বায়তুল মাকদিসের) দিকে মুখ করে নামাজও পড়েছি। এখন আমাদের উপায় কি হবে? তাঁদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

❐ আল্লাহ্ ইহার জন্য নহেন যে তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করিবার পর উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন— উহাদিগকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে ইহা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

❐ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহেরই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কাউকে সৎপথ প্রদর্শন করার পর পুনরায় পথভ্রষ্ট করা আল্লাহ্তায়ালার রীতি নয়। কোনো কোনো বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা স্পষ্ট করে না জানানো পর্যন্ত তিনি কাউকে অভিযুক্ত করেন না। প্রবর্তিত বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পরেও যারা তা লংঘন করে আল্লাহ্পাক কেবল তাদেরকেই শাস্তি দান করেন।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, রসুল স. তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবকে বলেছিলেন, আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ রসুল স. তাঁর পিতৃব্যের জন্য দোয়া করেছিলেন নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পূর্বে, পরে নয়। নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যারা তাদের অবিশ্বাসী পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তারাও ক্ষমার্হ। মুজাহিদ বলেছেন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের জন্য দোয়া করার যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেই নিষেধাজ্ঞাটি একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ সেখানে কাউকে বা কোনো ঘটনাকে বিশেষায়িত করা হয়নি। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা আরোপনের পূর্বের কোনো আমল ধর্তব্য নয়। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া এবং কেবলার হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বের আমলও ধর্তব্যযোগ্য কিছু নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এ কথার অর্থ— কে জ্ঞাতসারে বিধান লংঘন করে এবং কে অজ্ঞাতসারে বিধান বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। পরের আয়াতে (১১৬) বলা হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই। সাহায্যকারীও নেই। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আল্লাহ্তায়ালাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একক অধীশ্বর। তিনি যেমন জীবন দান করেন, তেমনই ঘটান মৃত্যু। তিনি ব্যতীত তোমাদের কেউ নেই— না অভিভাবক না সাহায্য-কারী। সুতরাং তোমাদের পক্ষে এ রকম করা কিছুতেই সমীচীন নয় যে, তোমরা তোমাদের হৃদয়ে মুশরিকদের জন্য অনুরাগ লালন করবে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা তোমাদের স্বজন হয়। অতএব তোমরা অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে কেবল আল্লাহ্কেই যথেষ্ট মনে করো।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১৭

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

☐ আল্লাহ্ অনুগ্রহ-পরবশ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদিগের প্রতি যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে— এমন কি যখন তাহা-দিগের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। পরে আল্লাহ্ উহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তিনি উহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

মুনাফিকেরা রসুল স. এর নিকটে তাবুক অভিযান থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিলো। দেখিয়েছিলো মিথ্যা অজুহাত। রসুল স. তবুও তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালাও তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সেই ক্ষমাকে রসুল স., মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের সঙ্গে এখানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে— 'আল্লাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা তাঁর অনুগমন করেছিলো সংকটকালে— এমনকি যখন তাদের একদলের চিত্ত-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিলো। পরে আল্লাহ্ তাদেরকে

ক্ষমা করলেন; তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র, পরমদয়ালু।' এ রকম বিবরণভঙ্গির দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য একটি আয়াতেও। সেখানে বলা হয়েছে— লি ইয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লহু মা তাক্বাদ্‌দামা মিন জামবিকা ওয়ামা তা'য়াখ্‌খারা (আল্লাহ্‌ আপনার জন্য ক্ষমা করে দিবেন পূর্বাপর অনবধনতা)।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে তওবার প্রতি। কারণ তওবা এমন একটি আমল, যা সকলের জন্যই প্রয়োজন। রসুল স. এবং সাহাবীগণও এই প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো।' পুণ্যবানদেরকেও অতিক্রম করতে হয় মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। সুতরাং সকলেই উন্নততর স্তরে পৌঁছতে ব্যগ্র। এই অনন্ত অভিযাত্রায় ক্রমঅগ্রসরমানতা কখনো হয় বিফল, আবার কখনো হয় বিলম্বিত। এ কারণে তাদের তওবা হয়ে পড়ে জরুরী। আলোচ্য আয়াতে তওবার এই গুরুত্বটি প্রকাশ করা হয়েছে যে, তওবার মাকামে রয়েছে নবী, রসুল ও পুণ্যবানদের বিশেষ স্থান। কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শুরুতে রসুল স. এর উল্লেখ করা হয়েছে ভূমিকা বা মুখবন্ধরূপে। কারণ তিনিই হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্যদের তওবা কবুল হওয়ার অবলম্বন। এ রকম দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— লিল্লাহি খুমুসুহু ওয়ালির্‌ রসূলি ওয়ালি জিল্‌ কুরবা (এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র এবং রসুলের এবং রসুলের স্বজনদের)। এখানেও আল্লাহ্‌র উল্লেখ এসেছে ভূমিকারূপে।

'তার অনুগমন করেছিলো সংকটকালে। কথাটির অর্থ— তাবুক যুদ্ধে সাহাবীগণ রসুল স. এর প্রশ্নহীন অনুগামী হয়েছিলেন। কিন্তু তখন পরিস্থিতি ছিলো খুবই সংকটাপন্ন। এখানে 'উ'সরাতি' শব্দটির অর্থ সংকটকালে। তাবুক যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকটে নিপতিত ছিলো মুসলিম বাহিনী। আহার্য ও পানীয় ছিলো অপ্রতুল ও দুষ্প্রাপ্য। এ কারণেই তাবুক যুদ্ধকে বলা হয় গাজওয়াতুল উ'সরা (সংকটকালীন যুদ্ধ) অথবা গাজওয়াতুল জাইশিল উ'সরা কিংবা গাজওয়াতুল জহিশ। এ রকম বলেছেন বাগবী।

হাসান বলেছেন, তখন দশ জন যোদ্ধার ভাগে পড়েছিলো একটি করে উট। পালাক্রমে তাঁরা ওই উটগুলোতে আরোহণ করতেন। খাদ্য হিসেবে তাঁদের সঙ্গে ছিলো শুকনো খেজুর এবং নিকৃষ্ট মানের যব। সবাই সেগুলোকে ভাগ করে খেতেন। কিন্তু সে খাদ্যও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হতে শুরু করলো। শেষে অবস্থা দাঁড়ালো এ রকম— একটি খেজুর একজন কিছুটা খেয়ে অপর জনকে দিতেন। এক ঢোকের বেশী পানি পান করতেন না। এ রকম সংকটগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন। একনিষ্ঠ অনুগামী হয়েছিলেন রসুল স. এর।

ইমাম আহমদ, ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান এবং হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমরা প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে তাবুক রওয়ানা হলাম। চলতে চলতে উপস্থিত হলাম একটি দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে। সেখানে আমরা এতো তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম যে, মনে হচ্ছিলো এখনই বুঝি আমাদের কণ্ঠদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কেউ পানির অনুসন্ধানে গেলে মনে হতো সে বুঝি আর ফিরে আসবে না। কেউ কেউ মনে করতো নিজেদের উট জবাই করে উটের কুঁজে রক্ষিত পানি পান করবে এবং অবশিষ্ট পানি বুক দিয়ে আগলিয়ে রাখবে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আল্লাহ্‌তায়ালা তো আপনাকে উত্তম প্রার্থনার জন্য নির্বাচন করেছেন। আমাদের জন্য দোয়া করুন। রসুল স. বললেন, তোমরা সকলেই কি তাই চাও। হজরত আবু বকর বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. তাঁর পবিত্র দুইহাত আকাশের দিকে উঠিয়ে মোনাজাত করতে শুরু করলেন। হাত নামানোর আগেই শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। সকলের পাত্রগুলো ভরে উঠলো কানায় কানায়। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, আমাদের সেনা সমাবেশের সীমানার বাইরে কোনো বৃষ্টিই হয়নি।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় রয়েছে, হজরত আবু হেরজা আনসারী বলেছেন, তাবুক গমনের পথে একস্থানে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রসুল স. নির্দেশ দিলেন, খবরদার! এখানকার পানি কেউ সংগ্রহ করবে না। পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম আমরা। দীর্ঘক্ষণ পথ চলার পর এক স্থানে থামলাম। তখন সকলেই পিপাসার্ত। রসুল স. দুই রাকাত নামাজ পড়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো ঘনঘোর বৃষ্টি। পুরো এলাকা হয়ে গেলো সয়লাব। এক স্থানে অবস্থানরত জনৈক সাহাবী বললেন, রসুল স. এর দোয়ার বরকতে এ বৃষ্টিপাত ঘটলো। এক মুনাফিক বললো, আরে অমুক অমুক নক্ষত্রের গতিবিধির কারণেই তো বৃষ্টিপাত হয়। তার এ কথার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হলো— ওয়া তাজ্‌আলুনা রিজ্‌ক্বাকুম আন্নাকুম তুকাজ্জিবুন (আর তোমাদের জীবনোপকরণগুলোকে স্থাপন করো, নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী)।

'ক্বুলুবু ফারিক্বিন' অর্থ চিত্তবৈকল্য। অর্থাৎ তখন কোনো কোনো লোকের চিত্তবৈকল্যের উপক্রম হয়েছিলো। এখানে 'ইয়াজিগু' অর্থ উপক্রম হয়েছিলো। অর্থাৎ অসহনীয় কষ্টের কারণে মুজাহিদগণের কেউ কেউ প্রত্যাবর্তনের চিন্তা শুরু করেছিলেন।

কালাবী বলেছেন, তখন কেউ কেউ আর অগ্রসর না হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। ইবনে ইসহাক এবং মোহাম্মদ বিন ওমর বলেছেন, তখন কোনো কোনো মুজাহিদের উদ্যম হয়ে পড়েছিলো শ্লথ ও শিথিল। তাই কেউ কেউ আজ

যাবো কাল যাবো করতে করতে সময়ক্ষেপনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত হেলাল বিন উমাইয়া, হজরত মুরারা বিন রবীয়া এবং হজরত আবু জর গিফারী। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কেউ কেউ আবার থেমে গিয়েছিলেন। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! অমুক অমুক ব্যক্তি আপনার অনুগমন থেকে বিরত হয়েছে। রসুল স. বললেন, তাদেরকে ওভাবেই থাকতে দাও। উত্তম বিবেচনা করলে আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে দিবেন না। তাদের সম্পর্কে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। হজরত আবু জর গিফারী যখন সঙ্গ ত্যাগ করলেন, তখন রসুল স. এর নিকটে আবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আবু জর অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। তার উটের গতি অত্যন্ত মন্থর। রসুল স. তাঁর আগের জবাবের পুনরুক্তি করলেন। হজরত আবু জর তাঁর উটকে আঘাত করলেন। কিন্তু পথশ্রান্ত উট অগ্রসর হতে পারলো না। এ অবস্থা দেখে হজরত আবু জর তাঁর মালপত্র আপন পৃষ্ঠদেশে বেঁধে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। পদব্রজে অনুগমন করতে লাগলেন রসুল স. এর। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জর তখন বলতে শুরু করলেন, আমি তাবুক অভিযানের পশ্চাৎবর্তী এক সৈনিক। আমার উট অত্যন্ত শ্রান্ত। ভাবছি, কয়েকদিন এখানেই থাকি। উটকে বিশ্রাম দেই এবং উপযুক্ত পানাহার দিয়ে তাকে সতেজ করে তুলি। তারপর খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করে মিলিত হই রসুল স. এর সঙ্গে। জিল মাওদা নামক স্থানে গিয়ে আমার উটটি থেমে গেলো। সারাদিন ধরে চেষ্টা করেও তাকে ওঠাতে পারলাম না। শেষে মাল-সামান পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলতে শুরু করলাম। পরদিন দ্বিপ্রহরে আমি এমন স্থানে পৌঁছলাম, যেখান থেকে রসুল স. দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলেন। একজন আমার অবস্থা সম্পর্কে রসুল স. কে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একজন আমাদের সঙ্গে চলেছে পদব্রজে। রসুল স. বললেন, ভালো করে দেখো, আবু জর নয়তো! লোকেরা আমার দিকে ভালো করে নজর করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মনে হয় লোকটি আবু জরই হবে। রসুল স. বললেন, আবু জরের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত। সে একাকী চলে। তার মৃত্যুও হবে একাকী অবস্থায়। পুনরুত্থিতও হবে একাকী। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বলেছেন, পরবর্তী সময়ে এ রকমই ঘটেছিলো। হজরত আবু জর মৃত্যুবরণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। হজরত আবু জর বলেন, আমি রসুল স. এর নিকটবর্তী হলাম। জানালাম আমার দুরবস্থার কথা। তিনি স. বললেন, হে আবু জর! তোমার প্রতিটি পদবিক্ষেপে আল্লাহ্ একটি করে গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

হজরত আবু খাইছুমা থেকে তিবরানী এবং আপন মাশায়েখগণের সূত্রে ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর তাবুক যাত্রার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হলো। তখন প্রচণ্ড গরমে যেনো ঝলসে যাচ্ছিলো প্রকৃতি। হজরত আবু খাইছুমা তাঁর বাগান বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর দুই স্ত্রী তাদের আপনাপন কুটিরকে পানি ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে। উভয়ের ঘরেই তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা। তিনি তাঁদের আয়োজন দেখে বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ্! রসুল স. এর অগ্র-পশ্চাতের সকল ভুলকে আল্লাহ্ মার্জনা করে দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি স. এই আগুন ঝরা দিনে আল্লাহ্র পথে বের হয়ে পড়েছেন। আর আবু খাইছুমা এদিকে শীতল গৃহচ্ছায়া, উত্তম আহার্য ও রমণীপ্রেমে মশগুল। এটা কি কখনো ইনসাফ হতে পারে? আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের কারো ঘরেই প্রবেশ করবো না। আমাকে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করে দাও। সমর-সম্ভার নিয়ে আমি এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রা করবো। মিলিত হবো আমার প্রিয়তম রসুলের সঙ্গে। এ কথা বলেই তিনি তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাবুকের পথে ছুটতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাত ঘটলো হজরত উমায়ের বিন ওয়াহাবের সঙ্গে। তিনিও ছিলেন তাঁর মতো বিলম্বিত অভিযাত্রী। তাবুকের নিকটবর্তী হয়ে হজরত আবু খাইছুমা, হজরত উমায়ের বিন ওয়াহাবকে বললেন, আমার দ্বারা একটি গোনাহ্ হয়েছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন না। দু'জনে একত্রে পথ চলতে শুরু করলেন। উপনীত হলেন রসুল স. এর কাছাকাছি। সাহাবীগণ একে অপরকে বললেন, কার বাহন এগিয়ে আসছে? রসুল স. বললেন, নিশ্চয় আবু খাইছুমার। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি নিকটবর্তী হলে রসুল স. বললেন, হে আবু খাইছুমা, খুবই কষ্ট করে এসেছো। হজরত আবু খাইছুমা সবকথা খুলে বললেন। রসুল স. তাঁকে সাধুবাদ জানালেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। আলোচ্য আয়াতে সকলকে তওবা করার প্রচ্ছন্ন আহ্বান জানানো হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতের (১১৮) প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষমা। অথবা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তওবার তৌফিক প্রদানের কথা। আর পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে তওবা কবুল করার কথা।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে লক্ষ্য করে 'আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরবশ হলেন' বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো শাস্তি প্রদান করবেন না।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

❒ এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিন জনকেও যাহাদিগের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের জীবন তাহাদিগের জন্য দুর্বিষহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নাই, পরে তিনি উহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইলেন যাহাতে উহারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমা-পরবশ, পরম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু লুবাবা ও তাঁর সঙ্গীগণ সম্পর্কে। তাঁরা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এজন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। অনুতাপজর্জরিত অবস্থায় তাঁদের কাছে মনে হয়েছিলো এ বিশাল পৃথিবী অত্যন্ত সংকুচিত ও দুর্বিষহ। গভীরভাবে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনোই আশ্রয় নেই। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। কারণ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর দয়ার সীমা পরিসীমা নেই। এটাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ। হজরত আবু লুবাবার সঙ্গীগণ ছিলেন হজরত কা'ব বিন মালেক, হজরত মারারা বিন রবীয়া এবং হজরত হেলাল বিন উমাইয়া। তাঁরা সকলেই ছিলেন আনসার।

বোখারী, মুসলিম, আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে ইসহাক এবং আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব ইবনে মালেক বলেছেন, আমি তাবুক অভিযান ব্যতীত অন্য কোনো অভিযানে পশ্চাৎবর্তী ছিলাম না। অবশ্য বদর অভিযানে আমি অংশগ্রহণ করিনি। কারণ তখন অভিযানে অংশগ্রহণ করার সুযোগও আমার ছিলো না। আর যারা বদরে যাননি তাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তোষও প্রকাশ করেননি। কারণ ওই অভিযানটি পূর্বপরিকল্পিত ছিলো না। রসুল স. মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য বাহিনীটিকে আক্রমণ করার জন্য। তারপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় ঘটনাক্রমে মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে আগত সেনা-বাহিনীর মুকাবিলা করতে হয়। তৃতীয় আকাবার বায়াতের অনুষ্ঠানে অন্যান্য আনসারগণের সঙ্গে আমিও বায়াত গ্রহণ করেছিলাম। আমি মনে করতাম এই বায়াতের চেয়ে বদর যাত্রার মর্যাদা বেশী নয়। এটাও ছিলো আমার বদর অভিযানে অংশগ্রহণ না করার একটি কারণ।

তাবুক অভিযানের সময় সবদিক দিয়ে আমি ছিলাম স্বচ্ছন্দ। ইতোপূর্বে কখনো আমার স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। তখন দু'টো উট ছিলো আমার। রসুল স. এর রীতি ছিলো, তিনি স. কোনো স্থানে অভিযান করতে চাইলে প্রথমে সেকথা প্রকাশ করতেন না। কয়েকদিন পথ চলার পর কোথায় কিভাবে কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় তিনি এরূপ করেননি— কারণ তখন ছিলো গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ। ভ্রমণ পথ ছিলো সুদীর্ঘ ও বন্ধুর। শত্রুসংখ্যাও ছিলো অনেক। তাই রসুল স. যাত্রার পূর্বেই সকল কিছুর স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর ঘোষণা শুনে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন দশ হাজার অকুতোভয় যোদ্ধা। হাকেম তাঁর 'ইকলিল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত মুআয বলেছেন, তাবুক গমনের সময় আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিরিশ হাজারেরও বেশী। আবু জুরআ বলেছেন, ওই সৈন্যদের লিপিবদ্ধকৃত কোনো তালিকা ছিলো না। তাই কেউ কেউ এ কথা ভেবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হননি যে, এই বিশাল সমাবেশে আমার অনুপস্থিতি নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। আমি বাদ পড়লে অন্য কারো পক্ষে এ কথা অনুধাবন করাও সহজ নয়। এ সম্পর্কে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলেই কেবল সর্বসমক্ষে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। অন্যথায় নয়।

রসুল স. যখন যাত্রা শুরু করলেন, তখন ফসলের মৌসুম। খেজুরের বাগানগুলো ফলে ভরপুর। বৃহস্পতিবার দিন রসুল স. যাত্রা শুরু করলেন। এভাবে বৃহস্পতিবার সফর শুরু করা ছিলো তাঁর পবিত্র অভ্যাস। আমিও সকাল সকাল রওয়ানা হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম আমার তো রয়েছে দ্রুতগামী বাহন। আমি পরে রওয়ানা করলেও তাদেরকে ঠিকই ধরতে পারবো। রসুল স. তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম দু'দিন পর রওয়ানা হলেই চলবে। একদিন একদিন করে চলে গেলো বেশ কয়েকদিন। একদিন সত্যি সত্যিই প্রস্তুত হলাম কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। রওয়ানা হতেই আমি দেখলাম কেবল মুনাফিকদের জটলা। আর দেখলাম অকর্মণ্য ও অক্ষম কিছু লোক। বুঝতেও পারলাম অনেক বিলম্ব করে ফেলেছি। ওদিকে তাবুকে উপনীত হওয়া পর্যন্ত রসুল স. আমার খোঁজ করেননি। তাবুকে পৌঁছে তিনি বলেন, কা'ব বিন মালেক কোথায়? সালমা অথবা আমার গোত্রের এক লোক (মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনানুসারে তাঁর নাম আবদুল্লাহ্ বিন আনিস সালাবী) বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! দু'টি চাদরের অধিকারী সে। ওই মূল্যবান চাদরে পরিবৃত হয়ে সে এখন আরামে আয়েশে দিন কাটায়। হজরত মুআয বিন জাবাল অথবা হজরত আবু কাতাদা তাকে বললেন, তুমি ঠিক বলোনি। হে আল্লাহ্‌র রসুল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মধ্যে মন্দ কিছু দেখিনি। এ কথা শুনে রসুল স. মৌন হয়ে গেলেন। হজরত কা'ব ইবনে মালেক আরো বর্ণনা করেছেন, আমি কিছুদূর অগ্রসর হতেই সংবাদ পেলাম রসুল স. তাবুক থেকে ফিরে আসছেন। চিন্তিত হলাম।

ভাবলাম, এখন আমি কিভাবে রসুল স. এর অপ্রসন্নতা থেকে আত্মরক্ষা করবো। ঘরে ফিরে পত্নীদ্বয়ের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলাম। যখন রসুল স. মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন আমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, অযৌক্তিক কোনো অজুহাত আমি প্রদর্শন করবো না। যা সত্য তাই বলবো। নিশ্চয় এর মধ্যেই রয়েছে আমার পরিত্রাণের উপায়।

রসুল স. মদীনায় পৌঁছলেন প্রাতঃকালে। ইবনে সা'দের বর্ণনানুসারে তখন ছিলো রমযান মাস। হজরত কা'ব বলেন, রসুল স. সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন মসজিদে। দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর সেখানেই বসে পড়লেন। একটু পরে গেলেন প্রাণপ্রিয় আত্মজা ফাতেমার গৃহে। সেখান থেকে এলেন তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিকটে। নামাজ পাঠের পর যখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন, তখন অনেকে এসে তাদের তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে বিভিন্ন ওজরাপত্তি পেশ করছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় আশিজন। রসুল স. সকলের ওজর গ্রহণ করেছিলেন, সকলের নিকট থেকে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলের জন্য দোয়াও করেছিলেন। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রকাশ্য দিকটিকে। অভ্যন্তরীণ দিকটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আমিও উপস্থিত হলাম। তিনি স. আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন। কিন্তু সে হাসিতে ছিলো রোষের আভাস। ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, রসুল স. আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এ রকম করছেন কেনো? আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুনাফিক নই। ইমান ও ইসলাম হতে আমি একচুলও এদিক ওদিক সরিনি। রসুল স. বললেন, সঙ্গে গেলে না কেনো? তুমি কি যুদ্ধের জন্য বাহন ক্রয় করতে পারোনি? আমি বললাম, করেছি। হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি অন্যদের মতো ওজরাপত্তি পেশ করলে আপনি হয়তো প্রসন্ন হতেন, যেমন অন্যদের প্রতি হয়েছেন। কিন্তু আমি জানি অনতিবিলম্বে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে আমার প্রতি অপ্রসন্ন করে দিতেন। এ কথাও জানি যে, আমি সত্যকথা বললে আপনি হয়তো সাময়িক রোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু আমি আশা করি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাই আমি সত্যকথা প্রকাশ করছি— আমার আসলে কোনো ওজরই ছিলো না এবং আমি ছিলাম ইতোপূর্বের সকল সময়াপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছন্দ। রসুল স. বললেন, তুমি ঠিক বলেছো। এখন তুমি যাও। হয়তো আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু নির্দেশনা দান করবেন।

আমাকে এ রকম করতে দেখে বনী সালমার কিছু লোক আমাকে বললো, এমন করলে কেনো? একটা কিছু অজুহাত খাড়া করলেই রসুল স. তা গ্রহণ করতেন এবং তোমার জন্য দোয়াও করতেন যেমন আমাদের জন্য করেছেন।

তাঁর দোয়াইতো মাগফিরাতের জন্য যথেষ্ট। কেউ কেউ এ কথা বলে আমাকে এতো উত্যক্ত করলো যে, আমার মনে হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে গমন করে আমি আমার পূর্বের উক্তি প্রত্যাহার করি। পরে ভাবলাম নাহ্। দু'টো পাপকে আমি একত্র করতে পারবো না। একটি অপরাধ করেছি রসুল স. এর সঙ্গে না গিয়ে, এখন মিথ্যা অজুহাত তুলে আর একটি পাপ করবো কেনো? আমি লোকদেরকে বললাম, আর কেউ কি এমন করেছে? জেহাদে যায়নি, অথচ মিথ্যা অজুহাতও দেখায়নি? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। আরো দু'জন এমন করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে কে? লোকেরা বললো, মুরারা বিন রবীয়া ও হেলাল বিন উমাইয়া। হাসান বসরী থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত কা'বের তাবুক অভিযানে না যাওয়ার কারণ ছিলো একটি বাগান। বাগানটি ছিলো অরক্ষিত। তিনি ভেবেছিলেন অনেক জেহাদ তো করলাম। এবার না হয় নাই গেলাম। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি বলেছিলেন, এ বাগানের মোহে আমি যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকেছি। সুতরাং বাগানটি আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিবো। তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীর অবস্থা ছিলো এ রকম— তাঁর স্ত্রী বললো, এ তপ্ত আবহাওয়ায় এতো দূরের সফরে যেয়ো না। ইতোপূর্বের জেহাদগুলোতে তো অংশগ্রহণ করেছোই। অনেক লোক যাচ্ছে, তুমি না হয় নাই গেলে। এবার তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তিনি তাই করেছিলেন। কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধিভূত হতে লাগলেন। বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি আর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবো না (যতক্ষণ না আমার সম্পর্কে নতুন কোনো নির্দেশ নাজিল হয়)।

হজরত কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, লোকেরা আমাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দু'জন সাহাবীর নাম বললেন। শুনলাম তাঁরাও আমার মতো তাবুকে যাননি এবং তাঁরাও আমার মতো সত্যকথা বলেছেন, মিথ্যা অজুহাত তুলে ধরেননি। তাঁরা দু'জন ও আমি— আমাদের এই তিনজনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো। রসুল স. তাঁর সকল সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন, এদের সঙ্গে সালাম কালাম বন্ধ করে দাও। সকলে তাই করলেন। ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, সকালে আমরা কয়েকজনের সাক্ষাৎ পেলাম কিন্তু কেউ আমাদের সাথে কথাবার্তা বললেন না। আমাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তরও দিলেন না।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, তাদেরকে দেখে মনে হতো তাঁরা যেনো আমাদেরকে চিনেনই না। মনে হতো আমরা যেনো বিদেশী। কারো নিকট থেকে সামান্য সহমর্মিতা পাবার যেনো কোনো অধিকারই আমাদের নেই। সবচেয়ে বেদনাদায়ক চিন্তাটি ছিলো এই— এমতাবস্থায় যদি আমি

মৃত্যুবরণ করি, তবে রসুল স. তো আমার জানাযার নামাজও পড়বেন না। আর যদি তাঁর মহাপ্রস্থান ঘটে, তবে আমাদের এই একঘরে অবস্থাটি হবে চিরস্থায়ী। কেউ আর কোনোদিন আমাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখবে না। মরে গেলে জানাযাও পড়বে না। এভাবে আমরা হয়ে পড়বো সকল পৃথিবীবাসীর নিকটে অপাংতেয়। হায়! স্বভূমি আজ আমাদের জন্য প্রবাস। বিস্তৃত পৃথিবী আজ আমাদের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে অতিবাহিত হলো পঞ্চাশ রাত্রি। আমার সঙ্গী দু'জন দুশ্চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। নির্জীবের মতো পড়ে রইলেন আপন গৃহকোণে। কিন্তু আমি ছিলাম শক্তিশালী যুবক। তাই আমি নিয়মিত মসজিদে সকলের সঙ্গে নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতাম এবং বাজারেও গমনাগমন করতাম। কিন্তু আমার দিকে কেউ দৃষ্টিপাতও করতো না, সালাম কালামও করতো না। মসজিদে নামাজের পর রসুল স.যখন সাহাবীদেরকে নিয়ে বসতেন, তখন আমি সালাম প্রদান করতাম কিন্তু কোনো উত্তর পেতাম না। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতাম তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধর থেকে কোনো প্রত্যুত্তর ধ্বনিত হচ্ছে কিনা। কখনো কখনো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নামাজ পাঠ করতাম। ভাবতাম তিনি কি দেখছেন? মনে হতো, হয়তো দেখছেন। নামাজ শেষে যখন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতেন অন্যদিকে। সাহাবীগণও সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। একদিন আমি আবু কাতাদার বাগানের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাগানে প্রবেশ করলাম। তিনি ছিলেন আমার পিতৃব্যপুত্র ও বনী সালমা গোত্রভূত। অর্থাৎ আমার পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র তিনি ছিলেন না। কিন্তু তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিলো অধিক। বাগানে তাকে দেখে আমি সালাম বললাম। কিন্তু তিনি নির্বাক। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! তুমিতো ভালো করেই জানো আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসুলকে কতো ভালোবাসি। তিনি নীরব রইলেন। আমি আবারও আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তবুও তিনি রইলেন বাকহীন। তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার একই কথা উচ্চারণ করার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। এ কথা শুনে আমার চোখ ফেটে কান্না এলো। ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে আমি চলে এলাম সেখান থেকে। আর এক দিনের ঘটনা। বাজারে দেখা হলো এক সিরিয়াবাসীর সঙ্গে। মদীনার বাজারে সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে এসেছিলো। আমার খোঁজ করছিলো সে। কেউ একজন হয়তো ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলো। সে আমাকে একটি চিঠি দিলো। চিঠিটি সিরিয়ার প্রশাসকের পক্ষ থেকে লেখা। ইবনে আবী শায়েবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেন, আমি ভেবেছিলাম সিরিয়া প্রবাসী আমার গোত্রীয় কোনো লোক হয়তো আমাকে চিঠি দিয়েছে। চিঠিটি ছিলো রেশমি বস্ত্রে মোড়ানো। মোড়ক খুলে আমি পড়তে শুরু করলাম— 'আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমার সঙ্গী তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তুমিতো এরূপ অসম্মানের উপযোগী নও। তোমার অধিকারকে পদদলিত করা হচ্ছে।

ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের কাছে চলে আসতে পারো। তোমার জন্য রয়েছে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি।' চিঠিটি পড়ে আমি আরো বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম হায় কোথায় গিয়ে পড়লাম। আমি এখন কাফেরদের লোভ লালসার শিকার। চিঠিটি আমি ফেলে দিলাম জ্বলন্ত উনুনে। ইবনে আবিদের বর্ণনায় এসেছে, চিঠিটি পড়ে হজরত কা'ব রসুল স.কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের সম্পর্কচ্যুতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমরা এখন হয়ে পড়েছি মুশরিকদের লালসার লক্ষ্য।

এভাবে অতিবাহিত হলো চল্লিশ রাত্রি। রসুল স. এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ বাহক প্রেরিত হলো আমার নিকটে। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই সংবাদ বাহকের নাম হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত। তিনি আমার অপর দুইজন সঙ্গী মুরারা ও হেলালের নিকটও গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি রসুল স. এর নির্দেশ— স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, তালাক দিবো, না অন্য কিছু করবো? তিনি বললেন, না তালাক নয়। কেবল সম্পর্কচ্ছেদ। নির্দেশ পেয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমার নিকট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাও। পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকতে হবে আমাদেরকে। ওদিকে হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার স্বামী হেলাল বয়োঃবৃদ্ধ। নিজে নিজে তিনি তার প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন না। আর আমাদের কোনো পরিচারকও নেই। এখন আমি যদি তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেই তবে কি দোষ হবে? ইবনে আবী শায়েবার বর্ণনায় এসেছে, হজরত খাওলা বললেন, তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বল দৃষ্টিধারী। রসুল স. বললেন, তুমি তোমার স্বামীর অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিতে পারো। কিন্তু সে তোমার শয্যাসঙ্গী হতে পারবে না। হজরত খাওলা বললেন, আল্লাহর শপথ! তার তো ওসবের খেয়ালই নেই। যখন থেকে আপনি তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন তখন থেকেই সে অবিরাম কেঁদে চলেছে। হজরত কা'ব বলেন, আমার গৃহবাসীরা আমাকে বলেছিলো, হেলালের স্ত্রীর মতো তুমিও তোমার স্ত্রীর মাধ্যমে তোমার খেদমতের অনুমতি নিয়ে নাও। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি এ রকম করবো না। তিনি হয়তো অপ্রসন্ন হবেন। কারণ আমি হেলালের মতো বৃদ্ধ নই। আমি তো যুবক। এভাবে অতিবাহিত হলো আরো দশটি রাত। পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হলো এভাবে।

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কা'ব বলেছেন, পঞ্চাশতম রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদ সম্বলিত আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি কি কা'বকে সদ্য অবতীর্ণ এই শুভ সংবাদটি জানাবো? রসুল স. বললেন, না। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে ভীড় করবে। ফলে বাকী রাত তুমি আর আরাম করতে পারবে না।

হজরত কা'ব বলেছেন, পঞ্চাশতম রাতের ভোরে নামাজের পর আমি বসেছিলাম আমার ঘরের ছাদে। আমার অবস্থা তখন তেমনি যেমন উল্লেখ করা হয়েছে কোরআন মজীদের আয়াতে এভাবে— পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্য হয়েছিলো দুর্বিষহ। হঠাৎ শুনলাম একজন চিৎকার করে বলছে, হে কা'ব বিন মালেক! তোমার জন্য শুভসমাচার। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর তখন উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, আল্লাহ্ কা'বের প্রতি দয়া করেছেন। হে কা'ব আনন্দিত হও। উকবার বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত কা'বকে সুসংবাদ জানানোর জন্য দৌড়ে গিয়েছিলেন দু'জন সাহাবী। যিনি পশ্চাতে ছিলেন তিনি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বলেছিলেন, হে কা'ব! শুভসমাচার! শুভসমাচার! তোমার তওবা কবুল হয়েছে। তোমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআনের আয়াত। ঐতিহাসিকদের মতে ওই দুইজন ব্যক্তির নাম হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর।

হজরত কা'ব আরো বলেছেন, শুভ সমাচার শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। কাঁদতে শুরু করলাম অসহ্য আনন্দে। ফজরের নামাজের পর রসুল স. আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ প্রচার করেছিলেন। সে কথা শুনেই সংবাদ বাহকেরা দৌড়ে এসে আমাদেরকে সুসংবাদ জানিয়েছিলো। আমার অন্য সঙ্গীদ্বয়কেও সুসংবাদ দানের জন্য লোকেরা ছুটে গিয়েছিলো। একজন তো এসেছিলেন তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে। মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, ওই অশ্বারোহী ছিলেন হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম। আসলাম গোত্রের একলোকও ছুটে এসেছিলেন ঘোড়া নিয়ে। কিন্তু তার আগেই উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ পৌঁছেছিলো আমার কানে। তবু ওই অশ্বারোহীকে (হজরত হামজা আসলামীকে) আমার দুই প্রস্থ কাপড় উপহার দিলাম। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট তখন ওই দুই প্রস্থ কাপড়ের অতিরিক্ত কিছুই ছিলো না।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, কা'ব ওই দুই প্রস্থ কাপড় দিয়েছিলো কর্জ করে। হজরত হেলাল ইবনে উমাইয়াকে তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদ জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ, হজরত হেলাল পানাহার পরিত্যাগ করেছিলেন। একাধারে রোজা রেখে চলেছিলেন তিনি। তার সঙ্গে চলছিলো তার অবিরাম রোদন। মনে হতো তিনি আর কখনো মাথা ওঠাতে পারবেন না। হজরত মুরারা বিন রবীয়াকে শুভ সংবাদ জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন হজরত সুলকান বিন সালাম। তিনি ছিলেন হজরত সালামা বিন ওকাসের পিতা।

হজরত কা'ব কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে দলে দলে লোক আমাকে সাধুবাদ জানালো। করতে লাগলো করমর্দন ও আলিঙ্গন। মসজিদে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম রসুল স. তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ এক লাফে আমার কাছে ছুটে এলেন। করমর্দন করলেন এবং বললেন, স্বাগতম। মুহাজিরদের মধ্যে তালহা ছাড়া আর কেউ দাঁড়ায়নি। আমি তালহার এই শিষ্টাচারের কথা ভুলতে পারবো না। আমি দেখলাম, রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছে। আমি সালাম বললাম। প্রত্যুত্তর দেয়ার পর রসুল স. ঘোষণা করলেন, তোমার জন্মের পরে অতিবাহিত দিবসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিবস হচ্ছে আজকের দিবস। আজ স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে শুভসংবাদ জানিয়েছেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি কি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুভ সংবাদ জানাচ্ছেন, না আপনার পক্ষ থেকে। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তোমরা সত্য কথা বলেছো, তাই আল্লাহ্ও তোমাদের সততার মূল্যায়ন করেছেন। আনন্দিত হলে রসুল স. এর পবিত্র মুখমণ্ডল আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠতো। মনে হতো যেনো কিরণ প্রদানরত পূর্ণ শশী। আমি দেখলাম রসুল স. এর পবিত্র বদনমণ্ডল আনন্দালোকে সমুজ্জ্বল। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! তওবা ও ক্ষমার পরিশিষ্টরূপে আমি আমার পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য উত্থাপন করতে চাই। আমার সকল সম্পদ গ্রহণ করুন এবং তা সদ্কা হিসেবে বিলি বণ্টন করে দিন। রসুল স. বললেন, সম্পূর্ণ নয়, কিছু সম্পদ দান করো। এটাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, ঠিক আছে। অর্ধেক দান করবো। তিনি স. বললেন, না। আমি বললাম, তা হলে দান করবো এক তৃতীয়াংশ। তিনি স. বললেন, উত্তম। আমি বললাম, খায়বর যুদ্ধে যে গণিমত আমি লাভ করেছি, সেগুলো সবই আমি দান করতে চাই। এরপর বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আমার সত্যবাদিতার কারণে আমাকে পরিত্রাণ দান করেছেন। তাই আমি জীবনের কোনো মুহূর্তে কখনোই অসত্যকে প্রশ্রয় দিবো না। এখন থেকে এটাই হবে আমার একমাত্র কর্তব্য। মানুষের প্রতি এর চেয়ে অনুগ্রহ আর কি হতে পারে? ওই প্রতিজ্ঞার পর আমি আর কখনো মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেইনি। আশা করি অবশিষ্ট জীবনেও আল্লাহ্ আমাকে মিথ্যাচার থেকে রক্ষা করবেন। তওবা কবুল হওয়ার শুভ সংবাদের এই অধ্যায়ে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন— লাক্বাদ তাবাল্লহু আলান্নাবিয়্যি ওয়াল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসারী থেকে ওয়াকুনু মায়াস্ সদেক্বীন পর্যন্ত (১১৭ আয়াতের শুরু থেকে ১১৯ আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। হজরত কা'ব বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যখন থেকে আল্লাহ্পাক আমাকে ইসলামের মাধ্যমে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন, তারপর থেকে এ রকম উচ্চ নেয়ামত ও অনুগ্রহ আর কেউ পায়নি। আর ওই নেয়ামত আমি পেয়েছিলাম রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে সত্য ভাষণের জন্য। আমি মিথ্যা বললে

মিথ্যাবাদীদের মতো নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতাম এবং অবতীর্ণ আয়াতে বিবৃত হতো আমার প্রতি ঘোর অসন্তোষ। যেমন অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে— সাইয়াহ্ লিফুনা বিল্লাহি লাকুম ইজান্ কালাবতুম ইলাইহিম.......... ফাইন্নাল্লহা লাইয়ারদ্বা আনিল কওমিল ফাসেক্বীন (অচিরেই তারা আল্লাহ্‌র নামে আপনার নিকটে শপথ করবে যখন আপনি প্রত্যাবর্তন করবেন ...... নিশ্চয় পাপিষ্ঠদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নন)।

হজরত কা'ব বলেন, যারা রসুল স. এর নিকটে কসম খেয়ে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিলো, বায়াত গ্রহণ করেছিলো এবং লাভ করেছিলো রসুল স. এর দোয়া— আমরা ছিলাম তাদের ব্যতিক্রম। আমাদের বিষয়টিকে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় মুলতবী রাখা হয়েছিলো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিন জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো।' এতে করে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনকারীদের তুলনায় আমাদের অবমূল্যায়ন করা হয়নি। বরং আমাদের তিনজনকে বিশেষভাবে মর্যাদায়িত করার জন্য এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করা হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে—'যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিলো এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিলো এবং তারা উপলব্ধি করেছিলো যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই।' কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবী বিস্তৃত ও সংকীর্ণ হওয়া একটি বিশেষ দর্শনের ব্যাপার— যা সর্বজন দৃষ্টিগোচর নয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থাই প্রতিফলিত হয় বাইরে। বিষণ্ন সাহাবীত্রয় এতো বেশী অস্বস্তিতে পড়েছিলেন যে, পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁদের নিকটে হয়ে গিয়েছিলো বিস্বাদময়। ফলে পৃথিবীর বিশাল পরিসরে তাঁরা কোনো আশ্রয়ই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনে হচ্ছিলো, ক্রমসংকোচনশীল এই পৃথিবী অসহ। তাঁরা সত্তাগতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো আশ্রয় তাঁদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হলেন যাতে তারা তওবা করে। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।' এখানে 'তওবা করে' কথাটির অর্থ তওবার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ তারা যেনো তওবাকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবু বকর ওয়ারাক বলেছেন, পাপ করার পর যদি এই বিশাল পৃথিবী সংকুচিত মনে হয়, জীবনকে মনে হয় দুর্বিষহ, তবে তাকেই বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ তওবা। অর্থাৎ এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত তিনজন সাহাবীর মতো তওবাই হচ্ছে প্রকৃত তওবা।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ দিনের তওবাকারীদের তওবা কবুল করার জন্য রাতে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাত

প্রসারিত করেন। আর রাতের তওবাকারীদের তওবা কবুল করার জন্য হাত প্রসারিত করেন দিনে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মটি চলতেই থাকবে। মুসলিম।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক মুসাফির কোনো বিজন প্রান্তরে হারিয়ে ফেললো তার উট। ওই উটের পিঠে বাঁধা ছিলো তার পানাহারের সরঞ্জামসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। হারানো উট খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত মুসাফির শুয়ে পড়লো এক বৃক্ষছায়ায়। শ্রান্তিহারক বাতাসের প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লো সে। দীর্ঘক্ষণ পর নিদ্রা ভঙ্গ হতেই সে দেখলো, চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হারানো উট। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। খুশির চোটে বলে উঠলো, হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। শোনো হে সাহাবীগণ! ওই মুসাফির তার হারানো উট পেয়ে যেমন আনন্দিত হয়, তার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দিত হন আল্লাহ্, তার বান্দা তওবা করলে। মুসলিম। উল্লেখ্য যে, তওবা সম্পর্কে আরো অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১১৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝

❐ হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হও।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ভয় করো এবং বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে সত্যানুসরণের অঙ্গীভূত হও। সংকল্পে হও শুদ্ধ (হও মুসলিম)। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে আশ্রয় করো, সত্যাশ্রয়ী হও।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ভীতি সহ রসুল স. ও তাঁর সাহাবীদের সঙ্গী হও — যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত। তাঁদের অন্তরসমূহ কলঙ্কমুক্ত এবং আমল সমূহ বিশুদ্ধ। তাবুক অভিযানের সময় বিশুদ্ধচিত্ত সাহাবীগণ রসুল স. এর অনুগামী হয়েছিলেন। মুনাফিকদের মতো তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেননি।

হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এখানে আস্সদেক্বীন (সত্যবাদীগণ) এর লক্ষ্য হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের সঙ্গী হও। এক বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও' কথাটির অর্থ— হজরত আলী ইবনে আবী তালেবের সঙ্গে থাকো। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাগুলোর সব কয়টি আলোচ্য আয়াতের মর্মানুসারী।

ইবনে জারীহ বলেছেন, এখানে 'আস্‌সদেক্বীন' অর্থ মুহাজির সাদিক্বীন। আল্লাহ্‌পাক এক স্থানে ঘোষণা করেছেন— লিল ফুক্বরাইল মুহাজিরীনা ...... উলায়কা হুমুস্‌সদিকূন (দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য ...... তাঁরাই সত্যবাদী)। এই আয়াতে মুহাজির সাহাবীগণকে সদেক্বীন বা সত্যবাদী বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আস্‌সদেক্বীন' বলে বুঝানো হয়েছে ওই তিন সাহাবীকে, যারা তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে সত্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, মিথ্যা কৈফিয়ত দেননি।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, মিথ্যা কোনো অবস্থায়ই রীতিশুদ্ধ নয়। পরিহাসছলেও মিথ্যা প্রশ্রয়যোগ্য নয়। সুতরাং কেউ যেনো শিশুদেরকে এ রকম কিছু না বলে যা সে পূর্ণ করতে পারবে না। যদি তোমরা এ কথার প্রমাণ চাও তবে পাঠ করো— ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানুত্‌তাক্বুল্লহা ওয়াকুনু মায়াস্‌ সদেক্বীন (হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও)।

সুরা তওবাঃ আয়াত ১২০

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

❐ আল্লাহের রসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন অপেক্ষা নিজদিগের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদীনাবাসী ও উহাদিগের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদিগের জন্য সংগত নহে; কারণ আল্লাহের পথে উহাদিগের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের ক্রোধ-উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং শত্রুদিগের নিকট হইতে কিছু লাভ করা উহাদিগের সৎকর্মরূপে গণ্য হয়। আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! রসুল স. যখন কোনো অভিযানে বহির্গত হন তখন তাঁর সহগামী না হয়ে স্বগৃহে অবস্থান করা এবং রসুলের জীবনাপেক্ষা তোমাদের নিজের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করা সংগত নয়। বিশেষ করে মদীনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসী (জুহনিয়া, আশজায়া, আসলাম ও গিফার গোত্রভূত) দের জন্য এ রকম করা কিছুতেই সমীচীন নয়। কারণ আল্লাহ্র পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া সৎকর্মরূপে গণ্য। তেমনি শত্রুদেরকে হত্যা করা, বন্দী করা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ক্রোধ-উদ্রেককারী এ রকম পদক্ষেপ গ্রহণও সৎকর্ম। গণিমত হিসেবে শত্রুদের সম্পদ অধিকার করাও সৎকর্ম। আর আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণদের শ্রমফল কখনো নষ্ট করেন না।

জেহাদ একটি কল্যাণকর কর্ম। জেহাদ হচ্ছে মানবতার সত্যপ্রত্যাখ্যানরূপী ব্যাধির অত্যাবশ্যক চিকিৎসা। জেহাদের মাধ্যমেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তনের সর্বশেষ সুযোগ করে দেয়া হয়। যেমন, উন্মাদকে শাস্তি দেয়া কখনো কখনো রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকর করা হয়। শিশুদেরকে প্রহার করা হয় সুশিক্ষা দেয়ার জন্য। এভাবে জেহাদ কাফেরদেরকে সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। এটাই হচ্ছে কাফেরদের জন্য জেহাদের কল্যাণকর দিক। আর মু'মিনদের জন্য কল্যাণকর দিক হচ্ছে— এতে করে ইসলামের অভ্যন্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানের অনধিকার অনুপ্রবেশ প্রতিহত হয়। মুসলমানদের ইমান ও আমল থাকে নিষ্কলুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র পথে যার পদযুগল ধূলি ধূসরিত হবে, আল্লাহ্পাক তার জন্য দোযখ হারাম করে দিবেন। বোখারী, আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যুদ্ধরত মুজাহিদেরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত প্রতিদিন রোজা পালনকারী, প্রতিরাতে নামাজ পাঠকারী এবং কোরআন পাঠকারীদের মতো। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের নির্দেশনাটি বিশেষ না সাধারণ— সে সম্পর্কে আলেমগণের মতপ্রভেদ রয়েছে।

কাতাদা বলেছেন, এই আয়াত রসুল স. এর সশরীরে যুদ্ধ-গমনের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর যুদ্ধ যাত্রার সময় শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা বৈধ ছিলো না। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই আয়াতের নির্দেশনাটির কার্যকারিতা আর নেই। এখন জেহাদের প্রয়োজন দেখা দিলে শাসক অথবা খলিফার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ না করাও জায়েয।

ওলিদ বিন মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আমি ইমাম আওজায়ী, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক ইবনে জাবের এবং সা'দ বিন আবদুল আজিজকে বলতে শুনেছি, আলোচ্য আয়াতের কার্যকারিতা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে যেরূপ ছিলো, সকল যুগে সেরূপই থাকবে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেক যুগের শাসকগণের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, এই আয়াতের কার্যকারিতা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো, যতদিন মুসলমানেরা ছিলো স্বল্পসংখ্যক। ইসলামের ব্যাপক বিস্তারের ফলে আলোচ্য আয়াতের বিধানটি রহিত হয়েছে। এখন কেউ জেহাদে যেতে না চাইলে তাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যাবে না। তাই এক আয়াতে এসেছে— ওয়ামা কানাল মু'মিনুনা লি'ইয়ানফিরু কাফ্ফাতান (বিশ্বাসীদের কী হলো, তারা এখনো সমবেতভাবে বের হচ্ছে না)।

আমি বলি, সকল ইমামের ঐকমত্য এই যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানদের একটি দল জেহাদ করবে। এ রকম করলে অন্য মুসলমানেরা ফরজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, জেহাদ ফরজে আইন। কারণ জেহাদের বিধান একটি সাধারণ বিধান। যারা তাবুক যুদ্ধে গমন করেনি তাদের সম্পর্কে কঠিন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছিলো।

আমি বলি, সাধারণভাবে ব্যাপক ভিত্তিতে যদি জেহাদের প্রচারণা চালানো হয়, তবে আলেমদের ঐকমত্যানুসারে প্রত্যেক মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজ হবে। তাবুক যুদ্ধের বেলায় এ রকমই ঘটেছিলো। যদি ব্যাপক ভিত্তিতে জেহাদের প্রচারণা চালানো না হয়, তবে জেহাদ হবে ফরজে কেফায়া। কেননা আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— লা ইয়াসতাবিল ক্বায়েদুনা মিনাল মু'মিনীন (বিশ্বাসীদের মধ্যে উপবিষ্ট....)। এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া কিল্লাওঁ ওয়াদুল্লহুল হুস্না (প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন)। এখানে স্পষ্ট করে আল্লাহ্তায়ালা সকলের জন্য কল্যাণের অঙ্গীকার করেছেন। সেই কল্যাণের মর্যাদার মধ্যে তারতম্য অবশ্য ঘটতে পারে। কিন্তু এ কথা বলতে হবে যে, সকলেই কল্যাণ লাভের অধিকারী। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে— ওয়ামাকানাল মু'মিনুনা লিইয়ানফিরু কাফ্ফাতান।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২১

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

❑ এবং উহাদিগের ব্যয়, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ এবং উহাদিগের প্রান্তর-অতিক্রমণ, উহাদিগের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়— যাহাতে আল্লাহ্ উহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারেন।

হজরত ওসমান বিন আফ্ফান এবং হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ তাবুক যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং তারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যা কিছু ব্যয় করে।' এরপর বলা হয়েছে— 'যে কোনো প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়।'

এর অর্থ— মুজাহিদগণ যুদ্ধযাত্রার সময় যে পথ-প্রান্তর, উপত্যকা অতিক্রম করে তাও পুণ্যকর্ম হিসেবে পুণ্যের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে আল্লাহ্ তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।' এভাবে পূর্ণ আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা মুজাহিদগণের জন্য অল্পবিস্তর অর্থ-ব্যয় করে এবং মুজাহিদেরা জেহাদের সময় পথের যে কষ্ট সহ্য করে, আল্লাহ্ তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের পুণ্যকর্মের আমলনামায় লিখে রাখেন। তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রদানের জন্যই আল্লাহ্তায়ালা এ রকম করেন।

হজরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নাকে দড়ি লাগানো একটি উট নিয়ে হাজির হলো। বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! উটটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করলাম। রসুল স. বললেন, কিয়ামতের দিন এর বিনিময়ে তোমাকে সাতশত নাকে দড়ি লাগানো উট দেয়া হবে। মুসলিম।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ বর্ণনা করেছেন, খালেদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করে দিয়েছে, সে-ও জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনের খোঁজ খবর নিয়েছে, সে-ও জেহাদে শরীক হয়েছে। বোখারী, মুসলিম। ওয়াল্লহু আ'লাম।

কালাবী উল্লেখ করেছেন— বনী আসাদ বিন খুজাইমা গোত্র দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়লো। তাই তারা এসে আশ্রয় গ্রহণ করলো মদীনার রাস্তাঘাটের পাশে। ফলে রাস্তাঘাট হয়ে পড়লো অপরিচ্ছন্ন। বাজারে জিনিসপত্রের দামও গেলো বেড়ে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২২

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

❑ বিশ্বাসিদিগের সকলের অভিযানে বাহির হওয়া সংগত নহে, উহাদিগের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হউক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক এবং উহাদিগের সম্প্রদায়ের যাহারা ফিরিয়া আসিবে তাহাদিগকে সতর্ক করুক যাহাতে উহারা সতর্ক হয়।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানের বহির্গমন সংগত নয়। একদল জেহাদ করবে। আর একদল করবে জ্ঞানানুশীলন। আর ওই জ্ঞানানুশীলনে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অন্যদেরকে সতর্ক করবে। পথপ্রদর্শন করবে। অর্থাৎ যুদ্ধ অথবা জ্ঞানানুশীলন কোনোটার জন্যই সকল মুসলমান স্বস্থান ত্যাগ করবে না। করলে দেখা দিবে অনেক পারিবারিক, সামাজিক এবং উপার্জনগত বিপর্যয়।

এখানে 'ফাক্বাহ্ ফিদ্‌দীন' অর্থ ধর্মের জ্ঞানানুশীলন। ফেকাহ্ কথাটি এখান থেকেই এসেছে। নেহায়া রচয়িতা লিখেছেন, ফেকাহ্ শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুধাবন করা।

এখানে উল্লেখিত 'ফিরক্বাতিন্' অর্থ বৃহৎ দল। আর 'ত্বাইফাতুন' অর্থ ক্ষুদ্র দল। কামুস গ্রন্থে রয়েছে ফেকাহ্ অর্থ কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। আর সকল জ্ঞান অপেক্ষা ধর্মীয় জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বেশী। তাই ধর্মীয় বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ববর্গের জন্য 'ফকীহ্' শব্দটিকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, জ্ঞানার্জনের কারণ সমূহকে অবলম্বন করে অজানাকে জানার নাম ফেকাহ্। তাই প্রমাণনির্ভর জ্ঞানকে বিশেষভাবে 'ফেকাহ্' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সাধারণ জ্ঞান অর্থে এলেম এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থে ফেকাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌পাক একস্থানে বলেছেন— 'ফামালি হাউলায়িল ক্বাউমি লাইয়াকাদুনা ইয়াফ্‌কাহুনা হাদীসা' (ওই সকল লোকের কী হয়েছে যে, তারা কথাবার্তাও বুঝতে সক্ষম নয়।)। অর্থাৎ ওই সকল লোক কথার অন্তর্নিহিত ভাবকে বুঝতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, প্রবৃত্তিবিরোধী কল্যাণকর দানের বিষয়কে বলে ফেকাহ্। কাজেই চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক অথবা কথা ও কর্মের মাধ্যমে হোক, সকল কল্যাণকর অর্জনকেই বলা যেতে পারে ফেকাহ্। ধর্মের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জ্ঞানকে বিশেষভাবে ফেকাহ্ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে পরবর্তী সময়ে। প্রথম যুগে (রসুল স. এর যুগে) এই বিশেষায়ণটি ছিলো না।

প্রকাশ্যতঃ ফেকাহ্ শব্দটির মধ্যে মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) দের জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মুজতাহিদ (গবেষক) দের গ্রন্থ থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ফরজ দায়িত্বটি প্রতিপালিত হয়ে থাকে, যে ফরজ দায়িত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে এভাবে— 'দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক।'

'এবং তাদের সম্প্রদায়ের যারা ফিরে আসবে তাদেরকে সতর্ক করুক যাতে তারা সতর্ক হয়'— কথাটির অর্থ দূর দেশে জ্ঞানার্জনের পর দেশে ফিরে এসে জ্ঞানীদেরকে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌র বিধান-বিরোধী কিছু হতে দেখলে বিধান লংঘনকারীদেরকে সাবধান করে দিতে হবে। ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তার যথা উত্তর প্রদান করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, কয়েকজন লোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রাম অঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছিলো। সেখানকার এক লোক প্রচারক দলটিকে বললো, তোমরা রসুল স.কে ছেড়ে এলে কী করে? এ কথা শুনে তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং রসুল স.কে সব কথা খুলে বললো, তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। রসুল স. বললেন, তোমরা পেয়েছো স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি— ভালো ও মন্দের জ্ঞান। মূর্খতার যুগে উত্তম ছিলাম কেবল আমি। এখন তোমরাও ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে উত্তম পদবাচ্য হয়েছো। এই বিবরণটি উল্লেখিত হয়েছে বোখারী ও মুসলিমে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জ্ঞানী ও জ্ঞানদানকারী ছাড়া অন্য কেউই উত্তম নয়।

আলোচ্য আয়াতে এই ইঙ্গিতটিও এসেছে যে, খবরে আহাদ (একক বর্ণনা) ও দলিল হিসেবে গ্রাহ্য। কেননা এখানে বলা হয়েছে— কুল্লু ফিরক্বাতিন (প্রত্যেক দলের)। বিধানটি একটি সাধারণ বিধান। এতে করে বুঝা যায় যে, কোনো জনপদে যদি মাত্র তিন ব্যক্তি বসবাস করে তবে তার মধ্যে একজনকে জ্ঞানার্জনের জন্য সফর করতে হবে। শিক্ষা সমাপ্তির পর ফিরে আসতে হবে আপন আবাসে এবং অন্যকে দিতে হবে যথাযথ ধর্মীয় নির্দেশনা। এ রকম না করা হলে কুল্লি ফিরক্বাতিন কথাটি হয়ে পড়বে অনর্থক। ফেকাহ্ শাস্ত্রের কিছু অংশ ফরজে আইন এবং কিছু অংশ ফরজে কেফায়া। বিশুদ্ধ আকিদা এবং অবশ্য পালনীয় আমলসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ফরজে আইন। যেমন তাহারাত, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ ইত্যাদি। আরো কিছু বিদ্যা অর্জন করা ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, ইজারা, শ্রম, চাকুরী, ইত্যাদি। এ সকল পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে তাদের স্ব স্ব পেশার জ্ঞানাহরণ ফরজ। রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানান্বেষণ ফরজ। হাদিসটি হজরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী এবং ইমাম হাসান বিন আলী থেকে বায়হাকী। আরো বর্ণনা করেছেন খতিব ও তিবরানী। তিবরানী বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে। আর খতিব বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। হজরত আলী থেকেও তিবরানী বর্ণনা করেছেন। আর বায়হাকী বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে। হজরত আনাস থেকে ইবনে আবদুল বারের বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাটুকু— জ্ঞানানুসন্ধানীর (তালেবে এলেমের) জন্য সকলেই দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। সাগরভ্যন্তরের মৎস্যও। এক বর্ণনায় এসেছে, 'এবং আল্লাহ্ বিপদগ্রস্তদের ফরিয়াদ পছন্দ করে থাকেন।'

ওই সকল এলেম ফরজে কেফায়া যেগুলো অর্জন না করলে ফতোয়া দেয়া যায় না। এ ধরনের বিজ্ঞ ফকিহ্ কোনো জনপদে না থাকলে ওই জনপদের সকলে গোনাহ্গার হবে। কিন্তু এক ব্যক্তিও থাকলে সকলের মাথা থেকে ফরজ দায়িত্ব সরে যাবে। আর ওই জনপদবাসীর সকলের অবশ্য কর্তব্য হবে ওই বিজ্ঞ আলেমের অনুসরণ (তাকলিদ) করা। তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তাই তাদেরকে মেনে নিতে হবে।

এলেম অর্জন সকল প্রকার নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে 'সনদুল ফেরদৌস' প্রণেতা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট এলেম অন্বেষণ, নামাজ, রোজা, হজ এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে উত্তম। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, কিছুক্ষণ জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকা সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। আর জ্ঞান সংগ্রহের জন্য একদিন নিয়োজিত থাকা তিনদিন রোজা রাখার চেয়ে উত্তম। রসুল স. বলেছেন, আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা এ রকম, যেমন তোমাদের মধ্যে আমার মর্যাদা। নিঃসন্দেহে জ্ঞানানুসন্ধানীদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হয়। আসমানবাসী ফেরেশতাকুল এবং জমিনবাসী সকল সৃষ্টি, এমন কি গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মাছও তাদের জন্য দোয়া করে থাকে। হজরত আবু উমামা থেকে যথাসূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মাজা ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হাজার আবেদ অপেক্ষা একজন আলেম শয়তানের নিকট অধিক বিপদের কারণ। রসুল স. আরো বলেছেন, মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবহমান সওয়াবের সূত্র হিসেবে অবশিষ্ট থাকে কেবল তিনটি সূত্র। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওই এলেম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে। অপর দু'টো হচ্ছে জনহিতকর কর্ম ও পুণ্যবান সন্তান।

সুফিয়ানে কেরামের মাধ্যমে প্রচারিত ইলমে লাদুন্নী বা বাতেনে এলেম অর্জন করাও ফরজে আইন। এই এলেমের মাধ্যমে দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন ১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আকর্ষণ অন্তর থেকে অপসারিত হয়। মুহুর্মুহু আল্লাহ্র স্মরণ জাগ্রত থাকে সত্তায়। তাই হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার, যশাকাঙ্খা, ধর্মীয় বিষয়ে আলস্য ইত্যাদি অসৎ স্বভাব দূর হয়ে যায়। প্রবৃত্তি হয়ে যায় পরিচ্ছন্ন। ২. পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনের (তওবার বিষয়টি হয়ে যায় চিরস্থায়ী। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অন্যান্য শুভবৃত্তি। নফস্ হয় পবিত্র। আরো লাভ হয় বিশুদ্ধচিত্ততা। এই চিত্তবিশুদ্ধতা (এখলাস) অর্জিত না হলে নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ হয়ে পড়ে গ্রহণের অযোগ্য। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ কেবল ওই আমলগুলোকে গ্রহণ করেন, যেগুলো তাঁর সন্তোষ সাধনার্থে কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। হজরত আবু উমামা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের প্রকাশ্য রূপ ও পার্থিব বৈভবের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, দৃষ্টিপাত করেন অন্তরের দিকে।

উল্লেখ্য যে, যে সূত্রে ফরজে আইনের বিদ্যা অর্জিত হয়, সেই সূত্রবদ্ধ হওয়াও ফরজে আইন। তাই ইলমে লাদুন্নী লাভের প্রয়োজনে সুফিয়ানে কেরামের অনুসারী হওয়াও ফরজে আইন।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আরো একটি কারণ রয়েছে। কারণটি এই— বাগবী সূত্রে কালাবী এবং ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইকরামা, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমায়ের এবং হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ মুনাফিকদের দোষত্রুটি বর্ণনা করে বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ করেন। অবতীর্ণ হয়— 'ইনল্লা তানিফিরু ইয়ু আজ্জিব্কুম আ'জাবান আলীমা' (যদি বহির্গত না হও তাহলে তোমাদেরকে দেয়া হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)। রসুল স. জেহাদের ডাক দেন। চতুর্দিক থেকে মুজাহিদেরা সমবেত হয়। কেউ কেউ আবার রসুল স. এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে। হজরত ইকরামা বলেছেন, মরু গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে। মুনাফিকেরা বলতে শুরু করে, এবার মরুবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তখন অবতীর্ণ হয়— মাকানাল্ল মু'মিনুনা লি'ইয়ানফিরু কাফ্ফাতা ফালাওনা নাফারা মিন কুল্লি ফিরক্বাতিন তাইফাতুন লিইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীন (বিশ্বাসীদের সকল অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হোক, অবশিষ্টরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করুক)। এই নির্দেশানুসারে সমগ্র মুসলিম জামাত থেকে বৃহৎ দলকে প্রেরণ করতে হবে সশস্ত্র যুদ্ধে এবং ক্ষুদ্র দলকে রাখতে হবে রসুল স. এর সঙ্গে। তাঁরা বিশেষভাবে দ্বীনের জ্ঞানানুশীলন করবেন। মুজাহিদ বাহিনী ফিরে এলে তাঁরা তাঁদেরকে সদ্য অবতীর্ণ বিধান সম্পর্কে অবহিত করবেন। সেরকমই করা হয়েছিলো। তাই জ্ঞানানুশীলনের প্রবাহ কখনো রুদ্ধ হয়নি।

দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যা চর্চা হচ্ছে জেহাদে আকবর (বড় জেহাদ)। আর সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে জেহাদে আসগর (ছোট জেহাদ)। কারণ রেসালতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বমানবতার সম্মুখে দলিল প্রমাণ পেশ করা। সত্য ধর্মকে যথার্থরূপে উপস্থাপন করা। সশস্ত্র জেহাদের প্রয়োজন সাময়িক। কিন্তু বিদ্যা চর্চার প্রয়োজন সার্বক্ষণিক। তাই ধর্মীয় বিদ্যা প্রচারের মর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে। রসুল স. তাই এরশাদ করেছেন, বিদ্বানগণ নবী রসুলগণের উত্তরাধিকারী। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এই প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় আনলে বলতে হয় 'লি ইয়া তাফাক্কাহু' (জ্ঞানানুশীলন করুক) এবং 'লিইউনজিরু' (সতর্ক করুক) শব্দ দু'টোর সর্বনাম ওই সকল লোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে যারা জেহাদের সফরে রসুল স. এর সাহচর্যে জ্ঞানানুশীলনে রত থাকতেন। আর 'রাজাউ' (তারা ফিরে আসে) কথাটির সর্বনাম সম্পর্কযুক্ত হবে জেহাদে গমনকারীদের সঙ্গে।

আল্লামা সুয়ূতি লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতের বিধান কার্যকর ছিলো ওই সময়ে, যখন রসুল স. এর সহযোদ্ধা হওয়া ছিলো অত্যাবশ্যক এবং তখন জেহাদ পরিত্যাগ ছিলো নিষিদ্ধ।

হাসান বলেছেন, 'লি ইয়াতাফাক্কাহু' এবং 'লি ইউনজিরু' শব্দ দু'টোর সর্বনাম এখানে প্রত্যাবর্তিত হবে সশস্ত্র মুজাহিদদের সঙ্গে। এ রকম হলে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— এমন কেনো হবে না যে, দু'টি বৃহৎ দল থেকে একটি দল যুদ্ধযাত্রা করবে এবং বিধর্মীদেরকে পরাজিত করে ফিরে এসে স্বভূমির কাফেরদেরকে বলবে, আল্লাহ্ তাঁর রসুল এবং বিশ্বাসীগণকে বিজয় দান করেছেন। এভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার উদ্দেশ্য এই হবে যে, কাফেরেরা যেনো সংযত হয় এবং এই ভেবে ভীত হয় যে, রসুল স. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ওই পরাজিত কাফেরদের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদের অবস্থাও হবে সেরকম। তাই আয়াতের সব শেষে বলা হয়েছে 'যাতে তারা সতর্ক হয়'।

উপরে বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ ফরজে কেফায়া। মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক জেহাদ করলে অন্য সকলে দায়মুক্ত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সাধারণভাবে জেহাদের ডাক দেয়া হলে প্রত্যেকের জন্য জেহাদে অংশগ্রহণ করা হবে ফরজ।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২৩

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ○

❐ হে বিশ্বাসিগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদিগের নিকটবর্তী তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা তোমাদিগের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ সাবধানীদের সহিত আছেন।

এখানে নিকটে বসবাসকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জেহাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন। আর সংশোধিত হওয়ার অধিকার স্বজন ও প্রতিবেশীদেরই বেশী। তাই রসুল স.কে নিকট প্রতিবেশী ও স্বজনদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। হিজরতের পর জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো প্রতিবেশী বনী কুরায়জা ও বনী নাজিরের বিরুদ্ধে। এরপর খায়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে। মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড অধিকৃত হলো, তখন আরব জাহানে জেহাদের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেলো। তাই এই আয়াতের মাধ্যমে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হলো পার্শ্ববর্তী রোমানদের বিরুদ্ধে।

পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে সিরিয়াই ছিলো মদীনার অধিকতর নিকটে। সিরিয়া ছিলো রোম রাজ্যের শাসনাধীন একটি অঞ্চল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাই রসুল স. তাবুক অভিযানে বের হয়ে গেলেন। কারণ আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে— (হে আমার রসুল ও রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারী) 'হে বিশ্বাসীগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক।' আলোচ্য আয়াতের এ রকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, মুজাহিদের উক্তিরূপে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনজির এবং হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে ইবনে জারীর।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ফকীহ্গণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এ রকম— পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মুসলমানদের উপরে ওয়াজিব। যদি তারা এই ওয়াজিব দায়িত্ব পালন না করে, তবে ওই মুসলমান-দের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বা অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের উপর জেহাদ ওয়াজিব হবে। তারা যদি শক্তিহীনতা, আলস্য, কাপুরুষতা অথবা অন্য কোনো কারণে ওয়াজিব দায়িত্ব পালনে অনীহ হয়, তবে তাদের পাশের মুসলমানের উপরে এসে পড়বে ওয়াজিব দায়িত্বটি। এভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপরে জেহাদ ফরজ হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন ও জানাযার দায়িত্বটিও এ রকম। মহল্লা বা গ্রামের লোকেরা কাফন-দাফন ও জানাযা না করলে পরের মহল্লা, তারা না করলে তার পরের মহল্লা— এভাবে ফরজ দায়িত্বের বলয়ভূত হবে সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা।

এখানে 'গিলজাতান' শব্দটির অর্থ কঠোরতা। হাসান বলেছেন, গিলজাতান অর্থ জেহাদে ধৈর্য ধারণ। 'লিইয়াজিদু' এখানে নির্দেশসূচক শব্দরূপ। এর সর্বনাম কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দিকে প্রত্যাবর্তিত। তাই কাফেররা এর লক্ষ্য। আর নির্দেশটি প্রযোজ্য হবে বিশ্বাসীদের উপর। অর্থাৎ মুসলমানদেরকেই কঠোরতা দেখাতে হবে কাফেরদের সঙ্গে। তাদেরকে কোমলতা বা দুর্বলতা দেখানো যাবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো আল্লাহ্ সাবধানীদের সঙ্গে আছেন।' এ কথার অর্থ— হে বিশ্বাসীরা! জেনে রাখো, যারা মুত্তাকী (সাবধানী), তাদের সঙ্গেই রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য, কাফেরদের সঙ্গে নয়। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় পাবে কেনো?

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ۭ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ۭ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

❒ যখনই কোন সুরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদিগের কেহ কেহ বলে, 'ইহা তোমাদিগের মধ্যে কাহার বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল?' যাহারা বিশ্বাসী ইহা তো তাহাদিগেরই বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

❒ এবং যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে ইহা তাহাদিগের কলুষের সহিত আরও কলুষ যুক্ত করে এবং উহাদিগের মৃত্যু ঘটে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।

❒ উহারা কি দেখে না যে, উহারা প্রতি বৎসর দুই একবার বিপর্যস্ত হয়? ইহার পরও উহারা তওবা করে না, এবং উপদেশ গ্রহণ করে না,

❒ এবং যখনই কোন সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে কি? অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ উহাদিগের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধ-শক্তি নাই।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথমোক্তটির মর্মার্থ হচ্ছে— যখনই কোরআন মজীদের নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মুনাফিকেরা তাদের বন্ধু-বান্ধবদের বৈঠকে ঠাট্টাচ্ছলে বলে, সদ্য অবতীর্ণ এই আয়াতের মাধ্যমে তোমাদের আবার বিশ্বাস টিশ্বাস বেড়ে টেড়ে গেলো নাকি? তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাবে আল্লাহ্তায়ালা জানাচ্ছেন, কোরআনের অবতারিত আয়াত সমূহ তো বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকেই অধিকতর দৃঢ় ও প্রোজ্জ্বল করে। আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্যোতি ও বক্তব্য বিষয় তাদের বিশ্বাসকে অবশ্যই করে তোলে অধিকতর বলিষ্ঠ। তাদের বিশ্বাসিত আত্মাও এতে করে আনন্দিত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে (১২৫) বলা হয়েছে— 'এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তো তাদের কলুষের সঙ্গে আরো কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।' এখানে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড়, তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যু ঘটার কথাটি বলে দেয়া হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। আরো বলা হয়েছে, কোরআনের আয়াত শ্রবণকারী ও পাঠকারী অবিশ্বাসীদের অন্তরের অপবিত্রতা ক্রমাগত বেড়েই যেতে থাকে। কারণ আগে থেকেই তাদের অন্তরে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানের অটুট অন্ধকার। তার সঙ্গে এবার যোগ হলো সদ্য অবতীর্ণ আয়াতের প্রতি অস্বীকৃতির তমসা।

প্রকৃত কথা এই যে, ইমান হচ্ছে আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিশেষ ও সর্বোত্তম অনুগ্রহ। এই ইমান অন্তরে থাকলেই কেবল কোরআন মজীদের আয়াত সমূহ থেকে উপকার লাভ করা যায়। আয়াত কখনো কাউকে ইমান প্রদান করে না। বরং যাদের অন্তরে ইমান নেই, তাদের অবিশ্বাসকে করে আরো অধিক তমসাচ্ছন্ন।

মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। হজরত ওমর তাঁর সতীর্থদের দু'জন অথবা একজনের হাত ধরে একবার বলেছিলেন, এরা আমাদের ইমান বাড়াবে। হজরত ওমর তাই নতুন অবতীর্ণ আয়াত পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন এই উদ্দেশ্যে যে, এই আয়াত আমার ইমানের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে ইমানকে করবে অধিকতর বৃহৎ। হজরত আলী বলেছেন, হৃদয়াভ্যন্তরে ইমান একটি শ্বেতশুভ্র বিন্দুর মতো সতত সমুদ্ভাসিত থাকে। ইমান যতো বাড়ে, ততই তার শুভ্রতা সমুজ্জ্বলিত হয়। এভাবে তার হৃদয়ের সমগ্র পরিসরে সুবিস্তৃত হয়ে পড়ে ওই শুভ্রতা। পক্ষান্তরে অবিশ্বাস ও সত্যপ্রত্যাখ্যান হৃদয়ে থাকে একটি কৃষ্ণবিন্দুর আকৃতিতে। সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই বিস্তৃত হয় ওই কৃষ্ণবিন্দুটি। এভাবে হৃদয়ের সমগ্র পরিসর হয়ে যায় কৃষ্ণাভ। আল্লাহ্‌র শপথ! বিশ্বাসীদের হৃদয় চিরে দেখা সম্ভব হলে দেখা যেতো তার সম্পূর্ণ হৃদয়ই শ্বেতশুভ্র। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় চিরে দেখা সম্ভব হলে দেখা যেতো তার সম্পূর্ণ হৃদয় কৃষ্ণকায়।

তৃতীয় আয়াতে (১২৬) বলা হয়েছে— 'তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর দুই একবার বিপর্যস্ত হয়?' এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা কেনো অনুধাবন করতে চায় না যে, প্রতি বছর কমপক্ষে একবার দু'বার তাদেরকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করা হয়? ওই সকল ঘটনার মধ্যে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। সুতরাং হঠকারিতা ও উন্নাসিকতা কেনো? সমর্পণই তো শ্রেয়। মুজাহিদ বলেছেন, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে বার বার আক্রান্ত হয়েছিলো মুনাফিকেরা। কাতাদা বলেছেন, আমি রসুল স. এর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতাম এবং যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে অবলোকন করতাম। মুকাতিল বিন হাব্বান বলেছেন, প্রায়শঃ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে মুনাফিকদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়া হতো। যার ফলে তারা হয়ে পড়তো বিব্রত ও বিপর্যস্ত। হজরত ইকরামা বলেছেন, তারা বার বার

লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে ইমানদার বলে প্রকাশ করতো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুনাফিকই থেকে যেতো। হাসান বলেছেন, তারা বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো (পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হওয়া সত্ত্বেও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এর পরও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।' এ কথার অর্থ— বার বার হেয় প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিকেরা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। সদুপদেশকেও মান্য করে না।

রসুল স. এর মজলিশে সাহাবীগণের সঙ্গে মুনাফিকেরাও বসে থাকতো। কারণ তারা ছিলো দৃশ্যতঃ মুসলমান। ওই মজলিশে কোরআনের নতুন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা পড়ে যেতো বিপাকে। তাদের মনে হতো, এই বুঝি সদ্য অবতীর্ণ আয়াতের মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ কপটতাকে চিহ্নিত করা হবে। তাই তারা সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য উশ্‌খুশ করতো। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে উঠতেও পারতো না। ভয়, কৌতুক ও বিদ্রূপ মেশানো দৃষ্টিতে কেবল একে অপরের দিকে তাকাতো। চোখের ইশারায় বলতো, সাবধান! তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে না তো আবার? ইশারায় এভাবে ভাবের আদান প্রদান করে এক সময় মজলিশ থেকে সরেই পড়তো তারা। ভাবতো এখানে বসে থাকলে অপমান ও লাঞ্ছনা নিশ্চিত। এ কথাগুলোই আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের শেষটিতে বলে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'এবং যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞেস করে, তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? অতঃপর তারা সরে পড়ে।'

শেষে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।' এ কথার অর্থ— মুনাফিকেরা একটি শুভবোধ ও বুদ্ধিবিবর্জিত কূটকৌশলপ্রিয় সম্প্রদায়। সরলতার রহস্য সম্পর্কে তারা জানে না। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের হৃদয়কে করেছেন সত্যবিমুখ। আবু ইসহাক বলেছেন, এটাই তাদের চতুরতার শাস্তি।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২৮

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

❑ তোমাদিগের মধ্য হইতেই তোমাদিগের নিকট এক রসূল আসিয়াছে। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদিগের মংগলকামী, বিশ্বাসীদিগের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

'লাক্বদ জাআকুম রসুলুম মিন আনফুসিকুম' অর্থ— হে মানুষ! তোমাদের নিকটে প্রেরিত রসুল তোমাদেরই বংশবিজড়িত। অর্থাৎ তোমাদের মতো তিনিও হজরত ইসমাইলের অধঃস্তন পুরুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরবের

সকল গোত্রের সঙ্গে রসুল স. এর বংশীয় সম্পর্ক ছিলো। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, হজরত আদম থেকে আগত রসুল স. এর সকল উর্ধ্বতন পিতা ও মাতা অশুদ্ধ বিবাহবন্ধন থেকে পবিত্র ছিলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি মূর্খতা ও ব্যভিচারজাত নই। আমার উর্ধ্বতন সকল পিতৃপুরুষগণ ও জননীকুল ছিলেন শরিয়তসম্মত পরিণয়াবদ্ধ।

'আযীজুন আ'লাইহি মা আ'নিত্তুম হারীস্' অর্থ— তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। এখানে 'মা আনিত্তুম' কথাটির মা জায়েদা (অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশক)। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমাদের বিপদগ্রস্ত হওয়া রসুলের জন্য কষ্টদায়ক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— তোমাদের বিপথগামীতা তাঁর জন্য ক্লেশকর। কুতাইবি বলেছেন, এর অর্থ তোমাদের মুসিবত কবলিত অবস্থা তার জন্য অস্বস্তিকর। এমতাবস্থায় 'মা আনিত্তুম' এর মা হবে মায়ে মাওসুলা (সংযোজক)। আর অর্থ দাঁড়াবে— হে মানুষ! হে আরববাসী! তোমরা যদি বিপথযাত্রা স্থগিত করে বিশ্বাসের চিরন্তন আশ্রয়ে স্থিত হতে তবে তোমাদের রসুলের জন্য বিষয়টি হতো চিত্তস্বস্তিকর। তোমরা সত্য ইসলামকে গ্রহণ করো না বলেই তো তাঁর হৃদয় সতত বেদনা ভারাক্রান্ত।

শেষে বলা হয়েছে— হারিসুন আলাইকুম বিল মু'মিনীনা রউফুর রহীম (সে তোমাদের মঙ্গলকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু)। 'রউফ' অর্থ অপরিসীম দয়ার্দ্র। 'রহীম' অর্থ— পরম দয়ালু। 'রউফ' এর মধ্যে রয়েছে অনুরাগসম্ভূত দয়ার্দ্রতা। আর 'রহীম' এর মধ্যে রয়েছে করুণাসঞ্জাত আশীর্বাদ। তাই কেউ কেউ বলেছেন, রসুল স. তাঁর সতীর্থদের জন্য রউফ এবং পাপিষ্ঠদের জন্য রহীম।

সুরা তওবা ঃ আয়াত ১২৯

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

❑ অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যদি সত্য ধর্মের প্রতি আপনার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া না দেয়, যদি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি কেবল আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল, তাই আমার জন্য আল্লাহ্তায়ালাই যথেষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আর তিনি মহা আরশের অধীশ্বর।

মহা বিশ্বের প্রশস্ততম পরিসরের নাম আরশ। তাই আরশকে বলা হয় আরশিল আজীম (মহান আরশ)।

আবদুল্লাহ্ বিন আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবী বিন কা'ব বলেছেন, সুরা তওবায় সর্বশেষ আয়াত (১২৮, ১২৯) দু'টোই কোরআন মজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত আয়াতগুলোর মধ্যে এই আয়াত দু'টোই আমাদের সময়ের সর্বাপেক্ষা নিকটতম।

জ্ঞাতব্যঃ ইয়াহ্ইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতেব বলেছেন, হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় কোরআন মজীদের সকল আয়াত একত্র করতে চেয়েছিলেন। ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, হে জনতা! তোমরা রসুল স. এর নিকটে কোরআনের যে আয়াতগুলো শিক্ষা করেছো, সেগুলো নিয়ে এসো। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন সকলে। যারা কাষ্ঠখণ্ড, চামড়া, বৃক্ষপত্র ইত্যাদিতে কোরআনের আয়াত লিখে রেখেছিলেন, তারা সেগুলো জমা দিলেন হজরত ওমরের কাছে। আয়াতগুলো কোরআনের আয়াত এবং সেগুলো যে রসুল স. এর নিকট থেকে সরাসরি শিক্ষা করা হয়েছে, এই মর্মে দু'জন সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত তিনি সে-গুলোকে গ্রহণ করলেন না। এরপর এলো হজরত ওসমানের জামানা। তিনিও ঘোষণা করলেন, যারা কোরআনের আয়াত সংগ্রহে রেখেছেন, তাঁরা সেগুলো নিয়ে আসুন। সাহাবীগণ হজরত ওসমানের নিকটে কোরআনের আয়াত সমূহ জমা করতে লাগলেন। হজরত ওসমানও দু'জন ব্যক্তির সাক্ষ্য সহযোগে আয়াত-গুলোকে জমা করতে লাগলেন। হজরত খুজাইমা ইবনে সাবেত বলেছেন, আমি দেখলাম, সুরা তওবার শেষ দুই আয়াত তখনও লিপিবদ্ধ হয়নি। আমি এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত বাদ পড়েছে? আমি আয়াত দু'টো পড়ে শোনালাম। বললাম, আমি আয়াত দু'টো রসুল স. এর নিকট থেকে শিখেছি। হজরত ওসমান বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই আয়াত দু'টো আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এখন বলুন আয়াত দু'টো কোন স্থানে সন্নিবেশিত করবো? আমি বললাম, আয়াত দু'টো অবতীর্ণ হয়েছে সকলের শেষে। তাই সর্বশেষে অবতীর্ণ সুরা বারাআতের সঙ্গেই আয়াত দু'টো সংযোজিত করুন। এ কথা বলার পর তিনি সুরা দু'টোকে সংযুক্ত করলেন সুরা বারাআতের শেষে।

পরিশিষ্টঃ সুরা তওবার অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ওই সময়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিলো। প্রকাশিত হয়েছিলো কিছু মোজেজাও। এবার সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বলেছেন, তাবুকের পথে রসুল স. উপনীত হলেন খোলাইজা নামক স্থানে। সাহাবীগণ বললেন, হে

আল্লাহ্র রসুল! যাত্রা বিরতির জন্য এই স্থানটিই উত্তম মনে হয়। এখানে আছে বৃক্ষছায়া ও পানির প্রস্রবণ। রসুল স. বললেন, এটা শস্যভূমি। উটকে থামিও না। আমার উটের পদবিক্ষেপ আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। দেখা যাক সে কোথায় গিয়ে থামে। উট চলতে চলতে দুমা নামক স্থানে থামলো। সেখানে ছিলো জিলমারওয়ার মসজিদ।

মোহাম্মদ ইবনে ওমরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. উপস্থিত হলেন ক্বিরা উপত্যকায়। সেখানে যাত্রা বিরতি করলেন। বনী আরিজের ইহুদীরা বাস করতো সেখানে। তারা হাদিয়া হিসেবে হারিসা (এক প্রকার উৎকৃষ্ট আহার্য) পেশ করলো রসুল স. এর নিকটে। হাদিয়ার খাদ্য রসুল স. নিজে আহার করলেন। চল্লিশ জন ইহুদীকেও দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন। বনী আরিজের এই সৌভাগ্য চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইমাম মালেক, আহমদ, বোখারী, মুসলিম এবং হজরত আবু কাবশা আনসারী, হজরত জাবের ও হজরত আবু হুমাইদ সায়াদী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, পথে পড়লো অভিশপ্ত ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রাচীন জনপদ মাকামে হাজারা। রসুল স. চাদরে মুখ ঢাকলেন। তাঁর উটকে চালাতে শুরু করলেন জোরে শোরে। মাকামে হাজারা অতিক্রম করে দূরে এক স্থানে যাত্রা স্থগিত করলেন। সাহাবীগণের অনেকে মাকামে হাজারার কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করেছিলেন। কেউ কেউ ওই পানি দিয়ে আটার খামির বানালেন। কেউ কেউ পানি দিয়ে গোশত চড়ালেন উনুনে। নামাজের সময় হলো। রসুল স. মুয়াজ্জিনের আহ্বানের মাধ্যমে সকলকে একত্রিত করলেন। নামাজ শেষে বললেন, ছামুদ জাতি ছিলো অবাধ্য। তাই আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের এলাকা দ্রুত অতিক্রম করে এসেছি আমি এজন্যই। আমার ভয় হচ্ছিলো কখন না জানি এসে পড়ে আযাব। ওই এলাকায় আল্লাহ্র রোষের প্রতিক্রিয়া এখনো বর্তমান। সুতরাং সেখান থেকে সংগৃহীত পানি পান কোরো না। ওই পানি দিয়ে ওজুও কোরো না। ওই পানি দ্বারা প্রস্তুতকৃত আহার্যও ভক্ষণ কোরো না। ফেলে দাও আটার খামির। উল্টিয়ে দাও গোশতের হাঁড়ি। ওগুলো খাইয়ে দাও তোমাদের উটগুলোকে। সাহাবীগণ তাই করলেন। রসুল স. পুনরায় বললেন, ছামুদ সম্প্রদায় নবী সালেহের নিকট মোজেজা দেখতে চেয়েছিলো। তাঁর দোয়ার ফলে আল্লাহ মোজেজা প্রকাশ করেছিলেন। প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড থেকে বের হয়ে এসেছিলো এক অলৌকিক উট। ওই উট একদিন পর এক দিন নিঃশেষে তাদের কূপের পানি পান করতো। আর একদিন পর একদিন পানি পান করতো তাদের নিজেদের পশুকুল। এই অবস্থা তারা বেশী দিন মেনে নিতে পারলো না। একদিন তারা উটটির কুঁজ কেটে ফেললো। তারপর হত্যা করলো

উটটিকে। অকস্মাৎ একটি বিকট চিৎকারে ধ্বংস হয়ে গেলো তাদের জনপদের সকলে। একজন কেবল বেঁচে গেলো। সে তখন অবস্থান করছিলো মক্কায়। পরে সেখান থেকে বের হয়ে এলে সেও পতিত হলো একই গজবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রসুল, ওই লোকটির নাম কি ছিলো ? রসুল স, বললেন আবু রেগাল। পুনরায় বললেন, অতএব সাবধান! ওই সকল অঞ্চলে কখনো যেয়ো না, যে অঞ্চল আল্লাহ্‌র গজব কবলিত। জনৈক সাহাবী ছামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ! রসুল স. বললেন, এরচেয়ে অনেক বড় বিস্ময় রয়েছে তোমাদের সামনে। তোমাদেরই এক লোক অতীত কালের কাহিনী বর্ণনা করছেন। আবার তিনি দান করছেন ভবিষ্যতের সংবাদ (কিয়ামত, বেহেশত্‌, দোযখ ইত্যদির সংবাদ)। এটা কি আরো বেশী বিস্ময়কর নয়? সুতরাং হে জনমণ্ডলী! সত্য ধর্মের উপরে অটল থাকো। সরল হও। সোজা পথে চলো। যদি এ রকম না করো তবে তোমাদেরকে আযাব দিতেও আল্লাহ্‌ দ্বিধা করবেন না। ভবিষতে এমন লোকও আসবে যারা কিছুতেই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। শোনো! সাবধান! আজ রাতে প্রবাহিত হবে একটি প্রচণ্ড তুফান। তোমরা কেউ দাঁড়িয়ে থেকো না। রাতে শয্যা গ্রহণের পূর্বে তোমাদের উটগুলোকে ভালো করে বেঁধে রেখো। নিতান্ত প্রয়োজন পড়লে একাকী কেউ তাঁবু থেকে বের হয়ো না। রাত হলো। সকলে উটগুলোকে শক্ত করে বেঁধে শয্যা গ্রহণ করলেন। সারা রাত কেউ তাবু থেকে বের হলেন না। দু'জন লোক বাইরে গিয়েছিলেন। একজন প্রকৃতির ডাকে আর একজন উট খুঁজতে। বাতাস প্রথম জনকে উঠিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেললো। আর যে উট খুঁজতে বেরিয়েছিলো, তাকে তুফান নিয়ে গিয়ে ফেললো অনেক দূরে তাঈ জনপদের পাহাড়ে। সকালে রসুল স. তাদের কথা শুনে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে একাকী বের হতে নিষেধ করে দেইনি? প্রথম জনকে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন সাহাবীগণ। সে তখন প্রায় পঙ্গু। রসুল স. তার জন্য দোয়া করলেন। সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলো। আর তাঈ পাহাড়ে পতিত লোকটি রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলো অনেক দিন পরে— রসুল স. এর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর।

পানির জন্য দোয়া ও পানির সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে আর একটি অলৌকিক ঘটনা। এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন ওমর ও মোহাম্মদ বিন ইসহাক। ঘটনাটি এই— একবার রসুল স. এর নিজস্ব উটটি হারিয়ে গেলো। সাহাবীগণ উটটিকে খুঁজতে শুরু করলেন। বনী কাইনুকার এক ইহুদী যায়েদ বিন লুসাইব প্রকাশ্যতঃ মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ছিলো মুনাফিক। সে বললো, মোহাম্মদ নবুয়তের দাবী করে। অদৃশ্য সম্বন্ধে নাকি অনেক কিছু জানে। অথচ নিজের উট

কোথায় আছে তাই বলতে পারে না। হজরত আবু ওমারা এ কথা শুনলেন। তৎক্ষণাৎ রসুল স.কে গিয়ে এ কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিতো ততটুকু জানি, যা আমাকে জানানো হয়। নিজে থেকে আমি কিছু জানি না। উটের সংবাদ আগে আমাকে জানানো হয়নি। এই মাত্র জানানো হলো। এবার গিয়ে দেখো অমুক উপত্যকায় অমুক গাছের সংগে উটটি আটকে রয়েছে। সাহাবীগণ যথাস্থানে উটটিকে পেয়ে গেলেন। নিয়ে এলেন রসুল স. এর নিকটে। হজরত ওমারা বললেন, আমি সংগে সংগে যায়েদের নিকট গিয়ে তার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বললাম, রে আল্লাহ্‌র দুশমন! এই মুহূর্তে আমাদের মহল্লা থেকে বের হয়ে যা। ইবনে ইসহাক বলেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা যায়েদ খাঁটি নিয়তে তওবা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সে আজীবন মুনাফিকই ছিলো এবং মুনাফিক অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটেছিলো তার।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো তাবুক যুদ্ধের সময়। ঘটনাটি হজরত মুগিরা বিন শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন মুসলিম। ঘটনাটি এই— ফজরের নামাজের সময়। রসুল স. প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করতে গেলেন। সাহাবীগণ নামাজের জামাতের অপেক্ষায় বসে রইলেন। সূর্যোদয়ের উপক্রম হলো। রসুল স. তখনও এলেন না। সাহাবীগণ হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফকে সামনে এগিয়ে দিলেন। অথবা তিনি নিজেই ইমামতি করার জন্য সামনে এগিয়ে গেলেন। প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে এসে ওজু করতে বসলেন রসুল স.। তাঁর কোর্তার আস্তিন ছিলো অপ্রশস্ত। তাই তিনি আস্তিন হাতের উপরে উঠাতে পারলেন না। ভিতরের দিক থেকে হাত বের করে নিয়ে ওজুর সময় হাত ধৌত করলেন। পা ধৌত করলেন না। মোসেহ্ করলেন মোজার উপর। এরপর এসে জামাতে শরীক হলেন। জামাতের সাথে পড়তে পারলেন এক রাকাত। বাকী এক রাকাত পড়ে নিলেন ইমামের সালাম ফিরানোর পর। নামাজ শেষে বললেন, তোমরা উত্তম কাজ করেছো। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়তে হয়। জেনে রেখো, নিজ উম্মতের কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ না পড়া পর্যন্ত কোনো নবী পৃথিবী পরিত্যাগ করেন না। এটাই সকল নবীর আদর্শ।

আহমদ ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত সুহাইল ইবনে বায়জা বলেছেন, একবার রসুল স. তাঁর উষ্ট্রীর পেছনে আমাকে বসিয়ে নিলেন। তারপর উচ্চ কণ্ঠে বললেন, সুহাইল, সুহাইল! আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এই যে আমি। রসুল স. এ রকম বললেন তিনবার। প্রতিবারই আমি বললাম, এই যে আমি। এভাবে উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনে অন্যান্য সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রসুল স. সকলকে সমবেত হতে বলছেন। সবাই জড়ো হলো। রসুল স. বললেন, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, আল্লাহ্ সুহাইলের জন্য দোজখ হারাম করে দিয়েছেন।

মোহাম্মদ বিন ওমর ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে— একবার একটি খুব লম্বা মোটা সাপ চলাচলের রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলো। রসুল স. উষ্ট্রারোহী হয়ে ওই পথে গমন করছিলেন। উষ্ট্রী থেমে পড়লো। উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, সাপটি বাতনে নাখলা থেকে এসেছে। সে সেখানকার আটজন জিনের একজন। সে আমাদের কোরআন পাঠ শুনতে চায়। সে তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছে। সাহাবীগণ জবাব দিলেন ওয়া লাইহিস সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহ্।

হজরত হুজায়ফা থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন — হজরত মুয়াজ বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন, ইনশাআল্লাহ তোমরা কাল সূর্যোদয়ের সময় তাবুকের একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে। আমি সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ওই ঝর্ণার পানি স্পর্শ করবে না। পরদিন সকালে আমরা ঠিকই একটি ঝর্ণার কিনারায় উপস্থিত হলাম। একটু পরেই রসুল স. সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে আমাদের আগেই উপস্থিত হয়েছিলো দু'জন লোক। তাদেরকে লক্ষ্য করে রসুল স. বললেন, তোমরা কি ঝর্ণার পানি স্পর্শ করেছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। তারপর একটি মশকে করে সামান্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন একজনকে। পানি আনা হলো। তিনি ওই পানি দিয়ে হাত ও মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন। কিন্তু কুলির পানি নিক্ষেপ করলেন ওই মশকের মধ্যে। তারপর ওই পানি ফেলে দিলেন ঝরণায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্নার পানি প্রবল তেজে ফুলে ফেঁপে উঠে তীব্র তেজের সাথে প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, পানি বের হচ্ছিলো মাটি ফেটে এবং আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিলো বজ্রনির্ঘোষের মতো। তাবুকে আজও ওই ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। তীব্র তেজে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার পর রসুল স. বললেন, হে মুয়াজ ! বেশী দিন যদি বেঁচে থাকো তবে দেখতে পাবে এখানে হবে পাঁচটি বাগান।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন— রসুল স. তার কুলি মিশ্রিত পানি ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো ঝর্ণাটি। ভরে উঠেছিলো কানায় কানায়। আজও একই রূপে বয়ে চলেছে ওই ঝর্ণা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন— তাবুক যুদ্ধের বছর রসুল স. একদিন এক স্থানে একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো, সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি কে এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিই বা কে? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, ওই ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে বা উটের পিঠে চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে জীবন ভর জেহাদ করে চলে। আর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে কোরআন পড়েছে কিন্তু কোরআনের বিধানের আনুগত্য করেনি।

হজরত ওমর থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন— তাবুক যুদ্ধের সময় রসুল স. এর সামনে বকরি অথবা ভেড়ার সীনার গোশত পেশ করা হলো। তিনি স. ছুরি আনতে বললেন। ছুরি আনা হলে ওই ছুরি দিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তিনি গোশত কাটতে শুরু করলেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে— রসুল স. নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ একটি ছেলে তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলো। তিনি স. বললেন, আয় আল্লাহ! ওর চিহ্ন কেটে দাও। এ কথা বলার ফলে ছেলেটি পঙ্গু হয়ে পড়লো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে— বনী সা'দ গোত্রের এক লোক বলেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় এক স্থানে রসুল স. কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। রসুল স. বললেন, বেলাল আমাকে খেতে দাও। হজরত বেলাল বেশ কয়েকবার খাবার পাত্র নিয়ে এলেন। প্রতি বারই পরিবেশন করলেন ঘি ও পনির মিশ্রিত খেজুর। রসুল স খেলেন। আমরাও খেলাম পেট পুরে। বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আমি তো অনেক বেশী খেয়ে ফেললাম। তিনি স. বললেন, কাফেরেরা খায় সাত পেটে। আর মুমিনেরা খায় এক পেটে। পরে আর একদিন গেলাম রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। তখন তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন দশ জন সাহাবী। তিনি স. বললেন, বেলাল আমাদেরকে খেতে দাও। হজরত বেলাল মুঠো মুঠো খেজুর বের করে পরিবেশন করতে লাগলেন। রসুল স. বললেন, দিতে থাকো। ফুরিয়ে যাওয়ার আশংকা কোরো না। কারণ আরশের মালিক কৃপণ নন। এ কথা শুনে হজরত বেলাল খাদ্যের পুরো থলিটি উপুড় করে ঢেলে দিলেন। আমার অনুমানে ওগুলো দুই সেরের বেশী ছিলো না। রসুল স. তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন ওই খাদ্যে। বললেন, বিস্‌মিল্লাহ্ বলো এবং খাও। আমরা সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। শেষে দেখলাম দস্তরখানায় আগের মতোই খাদ্য মওজুদ। মনে হলো আমরা যেনো সেগুলো থেকে কিছুই খাইনি। আরো একদিন সকালে হাজির হলাম রসুল স. এর পবিত্র সংসর্গে। সেদিনও দেখলাম দশজন বসে রয়েছে তাঁর সঙ্গে। রসুল স. বললেন, বেলাল আহার্য পরিবেশন করো। হজরত বেলাল সেই খাদ্যের থলিটি নিয়ে এলেন এবং সব খাদ্য উপুড় করে ঢেলে দিলেন দস্তরখানায়। রসুল স. খাদ্যে হাত রেখে বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আহার করো। আমরা তাই করলাম। শেষে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, আহার্য দ্রব্য আগে যেমন ছিলো তেমনই আছে।

মোহাম্মদ বিন ওমর, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইরবাজ বিন সারিয়া বলেছেন, আমি, জুয়াল বিন সুরাকা এবং আবদুল্লাহ

বিন মুগাফ্ফাল মাজানী ছিলাম আসহাবে সুফ্ফাদের দলভুক্ত। রসুল স. এর পবিত্র অঙ্গনেই পড়ে থাকতাম আমরা। সেদিন তিনজনেই ছিলাম ক্ষুধার্ত। রসুল স. বুঝতে পেরে জননী উম্মে সালমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেখানে কিছু পেলেন না। বাইরে এসে ডাকলেন, বেলাল, খাবারের কোনো ব্যবস্থা আছে কি? হজরত বেলাল কয়েকটি থলি এনে উপুড় করে ঝাড়তে শুরু করলেন। দুই একটি করে খেজুর পড়তে লাগলো, এভাবে সর্বমোট বের হলো সাতটি শুকনো খেজুর। খেজুরগুলো একটি থলিতে রেখে রসুল স. সেগুলোর উপর তাঁর পবিত্র হাত রাখলেন। বললেন, বিস্মিল্লাহ্ বলে খেতে শুরু করো। আমরা তাই করলাম। খেজুর খেয়ে খেয়ে সেগুলোর আঁটি রেখে দিচ্ছিলাম আমরা বাম হাতে। এভাবে পঁয়তাল্লিশটি খেজুর খেলাম আমি। তিন জনে গড়পড়তায় খেলাম পঞ্চাশটি করে খেজুর। শেষে হাত গুটিয়ে নিলাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, যে কয়টি খেজুর আগে ছিলো এখনও সে কয়টিই আছে। রসুল স. বললেন, বেলাল, এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও। পরদিন সকালে ফজর নামাজের পর রসুল স. উপবেশন করলেন তাঁর প্রকোষ্ঠের বহিরাঙ্গনে। আমরাও একে একে বসে পড়লাম সেখানে। এভাবে জড়ো হলাম দশজন। রসুল স. বললেন, সকালের খাবার কি আছে তোমাদের কাছে? আমরা বললাম না। তিনি বেলালকে খাবার আনতে বললেন। বেলাল আনলো আগের দিনের খেজুরগুলো। রসুল স. সেগুলোর উপর হাত রেখে বললেন, নাও, এবার আল্লাহ্র নাম করে খেতে শুরু করো। আমরা তাই করলাম। যে আল্লাহ্ রসুল স.কে সত্য রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহর কসম! আমরা দশ জন পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। তারপরেও দেখলাম খাবার রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। রসুল স. বললেন, এর চেয়ে বেশী চাইতে আমার লজ্জা হয়। নয়তো এগুলো দিয়ে সকল মদীনাবাসীকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করানো যেতো। হঠাৎ একটি ছোট ছেলে এলো সেখানে। রসুল স. তাকে খেজুর কয়টি দিয়ে দিলেন। সে খেজুর চিবুতে চিবুতে চলে গেলো।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুকে হঠাৎ একদিন একটি প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হলো। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, এক কট্টর মুনাফিকের মৃত্যু হয়েছে। পরে মদীনায় এসে আমরা জানলাম, রসুল স. ঠিকই বলেছিলেন। ওই দিনই মৃত্যু হয়েছিলো একজন কুখ্যাত মুনাফিকের।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় আরো এসেছে, বনী সা'দের সহায়সম্বলহীন কিছু লোক রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হলেন। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা আমাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে একটি কূপের পাড়ে রেখে আপনার পবিত্র সান্নিধ্যে হাজির হয়েছি। কূপটিতে পানিও বেশী নেই। আবার স্থান ত্যাগ করলে কূপটিও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে আমাদের। কারণ

আশে পাশে আছে আমাদের প্রতিপক্ষের অনেক গোত্র। ইসলামের আলো ওই এলাকাগুলোতে পৌঁছেনি। আপনি আল্লাহ্পাকের দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করুন। যদি আমাদের কূপটি পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়, তবে আমাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। রসুল স. বললেন, কয়েকটি পাথর নিয়ে এসো। একজন নিয়ে এলো তিনটি পাথর। রসুল স. ওই তিনটি পাথরের খণ্ড নিলেন হাতের মুঠোয়। তারপর বললেন এগুলো নিয়ে যাও। একটি একটি করে নিক্ষেপ করো কূপের মধ্যে। লোকগুলো চলে গেলো। মিলিত হলো পরিবার পরিজনের সঙ্গে। এরপর রসুল স.এর নির্দেশানুসারে একটি একটি করে পাথর নিক্ষেপ করলো কুয়ায়। পানিতে পরিপূর্ণ হলো কুয়াটি। সেখানেই তারা তাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করলো। পানাহারের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। প্রতিপক্ষদেরকে তাড়িয়ে দিলো দূরে। ওদিকে তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন রসুল স.। তখন বনী সা'দ গোত্রের সকল লোক তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলো। হয়ে গেলো ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক।

হজরত ইবনে ওমর এবং হজরত মুয়াবিয়া থেকে তিবরানী এবং হজরত আনাস থেকে বায়হাকী ও ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— বর্ণনাকারী বলেন, একদিন ভোরে আমি দেখলাম অন্য দিনের চেয়ে সূর্য অধিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। আগে কখনো আমি এরূপ দেখিনি। রসুল স.ও হজরত জিবরাইলকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। হজরত জিবরাইল বললেন, আজ মদীনায় ইন্তেকাল করেছেন মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া মাজানী। সূর্যের তীক্ষ্ণ দীপ্তি এ কারণেই। আল্লাহ্পাক তাঁর জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা প্রেরণ করেছেন। হে সম্মানিত ভ্রাতঃ! আপনি কি তাঁর জানাযা পড়বেন? রসুল স. বললেন, হ্যাঁ। তিনি স. আমাদেরকে নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়লেন। কারণ আমরা ছিলাম মদীনা থেকে অনেক দূরে— তাবুকে। জানাযার নামাজে ফেরেশ্তারাও সকলের পিছনে দুইটি সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। জানাযা শেষে রসুল স. বললেন, ভ্রাতা জিবরাইল! এবার বলুন মুয়াবিয়া এ রকম অসাধারণ মর্যাদা পেলো কী কারণে? হজরত জিবরাইল বললেন, তিনি কুল হুআল্লাহু আহাদ সুরাকে ভালো বাসতেন। উঠতে বসতে হেঁটে বাহনে চড়ে— সর্বাবস্থায় তিনি কুল হুআল্লাহু সুরা পাঠ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এক সূত্র অন্য সূত্রকে পরিপুষ্ট করে।

তিবরানী ও আবু নাঈমের বর্ণনায় এসেছে, ওমর আসলামীর পিতামহ বর্ণনা করেছেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম রসুল স. এর খেদমতগার। আমি তাঁর খাবার তৈরী করে দিতাম। একটি পাত্রে রেখেছিলাম কিছু ঘি। ঘিটুকু জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। তাই গলানোর জন্য ঘি ভর্তি পাত্রটি আমি রোদে রেখে শুয়ে

পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম, ঘিটুকু টগবগ করে ফুটছে। সেই শব্দ শুনে আমি উঠে বসলাম এবং পাত্রের মুখটি বন্ধ করে দিলাম। রসুল স. বললেন, পাত্রের মুখ বন্ধ না করলে সারা প্রান্তরে ছুটতো ঘিয়ের বন্যা।

হারেস ইবনে উসামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত বকর বিন আবদুল্লাহ মাজানী বলেছেন, রসুল স. একবার এরশাদ করলেন, এই চিঠিটি যে রোম সম্রাটের নিকট নিয়ে যেতে পারবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। সঙ্গে সঙ্গে একজন নিবেদন করলো, যদি রোম সম্রাট চিঠিটি না গ্রহণ করেন ? রসুল স. বললেন, করবেন। লোকটি চিঠি নিয়ে রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলো। চিঠি পড়ে রোম সম্রাট কায়সার বললো, তুমি তোমার নবীর নিকটে বোলো, আমি তাঁর অনুগত। কিন্তু আমি রাজত্বহারা হতে চাই না। এরপর কায়সার পত্রবাহককে কিছু আশরাফী দিলেন। বললেন, এগুলো হাদিয়াস্বরূপ তোমার নবীর নিকটে পেশ কোরো। পত্রবাহক ফিরে এলেন। প্রদত্ত হাদিয়া পেশ করে খুলে বললেন সকল ঘটনা। রসুল স. বললেন, সে মিথ্যে কথা বলেছে। এরপর তিনি স. আশরাফীগুলো দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

উত্তম সূত্র পরম্পরায় ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালীর বর্ণনায় এসেছে— হজরত সাঈদ বিন আবী রাশেদ বলেছেন, রসুল স. তাবুকে উপস্থিত হয়ে হজরত দাহিয়া কালবীকে দূত নিযুক্ত করলেন। ইসলামের প্রতি আহ্বান সম্বলিত একটি পত্রসহ দাহিয়া কালবীকে রোমান প্রশাসক হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠালেন। যথাসময়ে চিঠিটি পেয়ে হেরাক্লিয়াস খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আলেম ও পাদ্রীদেরকে তলব করলেন। সকলে উপস্থিত হলে তার পূর্ব নির্দেশ অনুসারে বাহির থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরবারের সকল দ্বার। হেরাক্লিয়াস বললো, হে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ! নিজেকে নবী দাবি করে, এমন একজনের চিঠি পেয়েছি আমি। অনুগামী সৈন্য পরিবেষ্টিত সেই নবী এখন তাবুকে। তিনি আমাকে তিনটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন— ১. ইসলাম গ্রহণ করো। ২. যদি না গ্রহণ করো তবে জিযিয়া দিতে সম্মত হও। ৩. যদি তাও না করো তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোমাদের কিতাবেও আমার অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। ইসলাম গ্রহণ না করলে জিযিয়া তোমাদেরকে দিতেই হবে। নতুবা যুদ্ধের বিকল্প আর কিছু নেই। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো আলেম ও পাদ্রীরা। প্রত্যাগমনোনুখ ধর্মীয় নেতারা বলে উঠলো, তুমি আমাদেরকে যীশূর ধর্ম পরিত্যাগ করে এক অখ্যাত আরববাসীর ক্রীতদাস বানাতে চাও। দরবার থেকে বেরোতে পারলো না তারা। দেখলো সকল দরজা অর্গলিত। হেরাক্লিয়াস জানতো, এ রকমই ঘটবে। ধর্মীয় নেতারা বাইরে যেতে পারলেই জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে তার বিরুদ্ধে। তাই সে বন্ধ করে দিয়েছিলো সকল নির্গমন পথ। হেরাক্লিয়াস এবার নরম সুরে বললো, আপনারা সংযত হোন। শান্ত হোন। খৃষ্টধর্মের প্রতি আপনাদের অনুরাগ কতটুকু তা পরীক্ষা করবার জন্যই

আমি এ রকম বলেছি। হেরাক্লিয়াসের এ কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে ফিরে এলো ধর্মীয় নেতারা। এরপর হেরাক্লিয়াস বললো, এমন এক লোককে আমার নিকট হাজির করা হোক যার স্মৃতি শক্তি প্রখর এবং যার মাতৃভাষা আরবী। আমি তাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করবো। এ কথা শুনে দাঁড়ালো তাজাইয়া নামের এক লোক। সে ছিলো আরবী খৃষ্টানদের মুখপাত্র। বর্ণনাকারী বলেন, তাজাইয়া তখন আমাকে নিয়ে হাজির করলো হেরাক্লিয়াসের সামনে। হেরাক্লিয়াস আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বললো, নবুয়তের দাবিদার ব্যক্তিটির নিকটে চিঠিটি নিয়ে যাও। তিনি যা বলবেন তা স্মৃতিবদ্ধ কোরো। তিনটি বিষয়ে খেয়াল রেখো ১. আমার নিকটে তিনি যে চিঠি প্রেরণ করেছেন তার উল্লেখ তিনি করেন কিনা। ২. আমার চিঠি পড়ে কোনো মন্তব্য করেন কিনা। ৩. তাঁর গ্রীবাদেশের প্রতি লক্ষ্য করে দেখবে সেখানে সন্দেহজনক অথবা প্রশংসনীয় কোনো চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় কিনা। আমি হেরাক্লিয়াসের পত্র নিয়ে তাবুক পৌঁছলাম। রসুল স. তখন তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তাবুকের ঝর্ণার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আমি রসুল স. এর সাথীদেরকে বললাম, আপনাদের অধিনায়ক কোথায়? তাঁরা বললেন, ওই তো। আমি নিকটে গিয়ে তাঁর সম্মুখে উপবেশন করলাম এবং হেরাক্লিয়াসের চিঠিটি তাঁকে দিলাম। তিনি স. চিঠিটি তাঁর কোলের উপরে রেখে দিলেন এবং বললেন, তুমি কোন গোত্রের? আমি বললাম, তানাওয়াখ গোত্রের। রসুল স. বললেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে? ইসলাম হচ্ছে বিশুদ্ধ একত্ববাদের ধর্ম। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দ্বীন। আমি বললাম, আমি একটি দেশের দূত। একটি গোত্রের ধর্মাবলম্বী। আমি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হবো না। রসুল স. মৃদু হাসলেন, বললেন 'ইন্নাকা লা তাহ্‌দি মান আহ্‌বাবতা ওয়ালা কিন্নাল্লহা ইয়াহ্‌দি মাঁইইয়াশায়ু ওয়াহুয়া আ'লামু বিল মুহ্‌তাদিন' (নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে হেদায়েত করতে পারো না। কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাকেই হেদায়েত করেন। আর তিনি হেদায়েতকামীদেরকে ভালো করেই জানেন)। হে তানাওয়াখী! পারস্যের রাজদরবারে আমি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। পারস্যরাজ সেটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে, তার রাজত্বকেও টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। আরেকটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমি আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে। তিনি আমার আহ্বানের যথা সমাদর করেছেন। সাড়া দিয়েছেন সত্যের আহ্বানে। তোমাদের শাসকের নিকটেও আমি একটি চিঠি প্রেরণ করেছি। তিনি অবশ্য আমার চিঠির অবমাননা করেননি। এর পরিনাম শুভ। তার শাসন প্রলম্বিত হবে। আমি বললাম, হেরাক্লিয়াস যে তিনটি কথা আমাকে স্মৃতিবদ্ধ করতে বলেছেন, তার একটি হলো এই। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার শরাধার থেকে একটি শর বের করে শরটির তীক্ষ্ণ ফলা দ্বারা তরবারীর খাপের উপর কথাগুলো লিখে রাখলাম। রসুল স. এবার হেরাক্লিয়াসের চিঠি তাঁর বাঁ পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে দিলেন। আমি বললাম, যাকে চিঠি দেওয়া হলো, তিনি কে? একজন বললেন, মুয়াবিয়া। মুয়াবিয়া চিঠিটি পাঠ করে শোনালেন। চিঠিতে লিপিবদ্ধ ছিলো— আপনি আমাকে জান্নাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

বলেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাত। আর জান্নাতের প্রশস্ততা নাকি আসমান জমিনের প্রশস্ততার সমান। যদি তাই হবে তবে দোযখের অবস্থান কোথায়? রসুল স. এ কথা শুনতেই বলে উঠলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন রাত্রি আসে তখন দিন কোথায় যায়? আমি তাড়াতাড়ি তুন থেকে তীর বের করে তীরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা কথাটি লিখে রাখলাম। সম্পূর্ণ চিঠিটি শুনে রসুল স. বললেন, হে দূত ! তুমি অতিথি। আমাদের উপরে রয়েছে তোমার আতিথ্যের অধিকার। কিন্তু তোমাকে উপহার দেয়ার মতো এখন আমাদের কিছু নেই। আমরা এখন মুসাফির। রসুল স. এর এক সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি উপহার দিবো। এ কথা বলে তিনি তাঁর জিনিসপত্র ঘেঁটে বের করলেন হলুদ বর্ণের এক জোড়া কাপড়। তারপর কাপড় জোড়া রেখে দিলেন আমার কোলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উপহারদাতার নাম কি? লোকেরা বললো, ওসমান। রসুল স. বললেন, মেহমানের দেখাশুনা করবে কে? একজন মদীনাবাসী যুবক বললো, আমি। বলেই উঠে পড়লো যুবক। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই রসুল স. বললেন, তানওয়াখী অতিথি! উপবেশন করো। আমি তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি স. তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগের বস্ত্র উন্মোচন করে বললেন, পিছনের দিকে যাও। আমি তাঁর পশ্চাদ্দিকে গিয়ে বসলাম। সবিস্ময়ে দেখলাম, তাঁর গ্রীবাদেশের মধ্যস্থলে স্পষ্ট জ্বল জ্বল করছে মোহরে নবুয়ত। মোহাম্মদ বিন ওমর লিখেছেন, অতঃপর দূত ফিরে গেলো। আদ্যপান্ত খুলে বললো হেরাক্লিয়াসকে। হেরাক্লিয়াস তার দেশবাসীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু জনতা অস্বীকার করলো। হেরাক্লিয়াস পড়ে গেলো বিপাকে। একদিকে রাজ্য হারানোর ভয়। অন্যদিকে জনতার অস্বীকৃতি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো সে। রোমের মহাসম্রাটের দরবারে এ বিষয়ে কিছু জানালো না। আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও উদ্যোগ নিলো না। হেমস শহরেই বসে রইলো। রসুল স. সংবাদ পেলেন হেরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। পরে জানতে পারলেন তথ্যটি ভুল। হেরাক্লিয়াস যেখানে ছিলো সেখানেই আছে।

সুহাইলি উল্লেখ করেছেন, হেরাক্লিয়াস রসুল স.কে কিছু উপঢৌকন দিয়েছিলো। রসুল স. তা গ্রহণ করেন এবং অন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হেরাক্লিয়াস এক ঘোষকের মাধ্যমে প্রচার করলো, আমি মোহাম্মদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। ঘোষণাটি প্রচার হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে একদল বর্মপরিহিত সৈন্য এসে ঘিরে ফেললো হেরাক্লিয়াসের প্রাসাদ। সৈনিকেরা জানালো, আমরা আপনাকে হত্যা করবো। হেরাক্লিয়াস তাদের সামনাসামনি হয়ে বললো, তোমাদের ধর্মবোধ কতটা দৃঢ় তা পরীক্ষার জন্যই আমি এ রকম ঘোষণা দিয়েছিলাম। এখন তোমাদের ধর্মপ্রীতি ও উচ্ছ্বাস দেখে সত্যই আমি গর্বিত ও আনন্দিত। এ কথা শুনে সৈনিকেরা খুবই খুশি হলো। নিশ্চিত মনে চলে গেলো যার যার জায়গায়। এরপর প্রেরিত দূত হজরত দাহিয়া কালবীকে একটি চিঠি

দিয়ে বিদায় করলো সে। বললো, চিঠিটি তোমাদের রসুলকে দিয়ো। চিঠিতে লেখা ছিলো আমি নিঃসন্দেহে মুসলমান। কিন্তু শাসনাধিকারচ্যুত হবার ভয়ে আমি আমার বিশ্বাসকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছি না। এ কথা শুনেই রসুল স. বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। সে মুসলমান নয়, খৃষ্টান।

আবদুল্লাহ্ বিন বকর—ইয়াজিদ বিন রুমমান—ইসহাক সূত্রে এবং সরাসরি ওরওয়া বিন যোবায়ের থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তাবুক থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে একস্থানে থামলেন রসুল স.। সেদিন ছিলো ৯ই রজব। সেখান থেকে হজরত খালেদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে চার শত বিশ জনের একটি অশ্বারোহী সৈনিকের দলকে পাঠালেন দুমা অভিযানে। সেখানকার শাসক ছিলো উকাইদার বিন আবদুল মালেক। সে ছিলো খৃষ্টান। হজরত খালেদ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এতো অল্প সৈন্য নিয়ে আমরা কি উকাইদারের বিরুদ্ধে টিকতে পারবো? রসুল স. বললেন, অবশ্যই পারবে। তোমরাই হবে বিজয়ী। খুব সহজেই উকাইদারকে বন্দী করতে সক্ষম হবে তোমরা। তাকে কিন্তু হত্যা কোরো না। বন্দী করে হাজির কোরো আমার সামনে।

দুমার দিকে ঘোড়া ছোটালেন হজরত খালেদ। অবস্থান গ্রহণ করলেন উকাইদারের প্রাসাদের দৃষ্টিসীমানার মধ্যে। তখন রাত। প্রবাহিত হচ্ছিলো তপ্ত বাতাস। প্রাসাদের ছাদে স্ত্রী রুবাব বিনতে আনীফকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বসেছিলো উকাইদার। এক ক্রীতদাসী গান গাইছিলো। চলছিলো নৃত্যগীত ও মদ্যপান। হঠাৎ খবর পেলো একটি জংলী নীল গাই এসে প্রাসাদের দরজায় শিঙ দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে যাচ্ছে। উকাইদার ভাবলো, নীল গাইটি বধ করতেই হবে। নিচে নেমে এলো সে। শিকারীর পোশাক পরে বের হলো। গাইটি ততক্ষণে হাওয়া। ঘোড়ায় চড়ে গাইটিকে খুঁজতে বের হলো সে। সঙ্গে রওনা হলো তার ভাই হাসান ও দু'জন ক্রীতদাস। তাদের হাতে ছিলো ছোট ছোট বর্শা। কিছুদূর অগ্রসর হতেই হজরত খালেদের বাহিনী ঘিরে ফেললো উকাইদার ও তার সঙ্গীদেরকে। হাসানের পরনে ছিলো স্বর্ণখচিত পোশাক। তার ওই মূল্যবান পোশাকটি খুলে নেয়া হলো। হজরত খালেদ বললেন, শোনো উকাইদার। আমি তোমাকে হত্যা করবো না। বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাবো রসুল স. এর দরবারে— যদি তুমি দুমার দুর্গ আমার অধিকারভূত করে দাও। উকাইদার বললো, ঠিক আছে, চলো। দুর্গের বাইরে দাঁড়িয়ে উকাইদার দুর্গবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, দরজা খুলে দাও। দুর্গবাসীরা দুর্গের দরজা খুলে দেয়ার উপক্রম করতেই বাধা দিলো উকাইদারের ভাই মুসাদ। উকাইদার বললো, দুর্গবাসীরা বুঝতে পেরেছে আমি বন্দী। তাই এখন তারা আর আমার কথা শুনবে না। সুতরাং আমাকে মুক্ত করে দেয়া হোক। আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি তোমরা আমার

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা দান করতে সম্মত হও, তবে আমি দুর্গের দরজা খুলে দিবো। হজরত খালেদ বললেন, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আমরা এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হবো। উকাইদার বললো, কর নির্ধারণ করবে কে? তুমি না আমি? হজরত খালেদ বললেন, তুমিই করো। উকাইদার ঠিক করলো মুসলিম বাহিনীকে দেয়া হবে দুই হাজার উট, চারশ' শিরোস্ত্রাণ, চারশ' লৌহবর্ম ও চারশ' বর্শা। আর একটি শর্ত করাহলো, উকাইদার ও তার ভাইকে রসুল স. এর দরবারে উপস্থিত হতে হবে। চুক্তির চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন রসুল স. স্বয়ং। উকাইদারকে ছেড়ে দেয়া হলো। এবার নিজেই সে খুলে দিলো দুর্গের দরজা। হজরত খালেদ সহজে দুর্গে প্রবেশ করে বন্দী করলেন উকাইদারের ভাই মুসাদকে। আদায় করে নিলেন নির্ধারিত যুদ্ধ-বিনিময়। এরপর রসুল স. এর নিকট আগে শুভসংবাদ জানানোর জন্য প্রেরণ করলেন আমর ইবনে উমাইয়া জুমাইরীকে। হাসানের স্বর্ণখচিত পোশাকটিও পাঠালেন তাঁর সঙ্গে। হজরত আনাস ও হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর দরবারে হাসানের পোশাকটি পৌঁছলে সেখানে উপস্থিত সাহাবীগণ বহু মূল্যবান পোশাকটি নেড়ে চেড়ে দেখলেন এবং বিভিন্ন কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রসুল স. বললেন, তোমরা পোশাকটি দেখে বিস্মিত হচ্ছো। কিন্তু আমার জীবনাধিকারী সত্তার শপথ! জান্নাতে সা'দ বিন মুয়াজের রুমাল হবে এর চেয়ে অধিক সুন্দর।

হজরত খালেদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বিশেষ বিশেষ কিছু সামগ্রী রসুল স. এর জন্য আলাদা করে রাখলেন। রসুল স. এর জন্য খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) রেখে অবশিষ্ট গণিমত হিসেবে ভাগ করে দিলেন মুজাহিদদের মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমি তখন আমার ভাগে পেয়েছিলাম একটি লৌহবর্ম, একটি শিরোস্ত্রাণ ও দশটি উট। হজরত ওয়াসেলা বলেছেন, আমি পাই দশটি উট। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, মাজানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা চল্লিশজন অংশগ্রহণ করেছিলাম। পেয়েছিলাম লৌহবর্মসহ পাঁচটি করে বল্লম।

আমি বলি, মূল্যের তারতম্যের কারণে ওভাবে (কখনো পাঁচ ভাগে কখনো ছয় ভাগে) বণ্টন করতে হয়েছিলো। ভাগ বণ্টনের পর বন্দী উকাইদার ও মুসাদকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন হজরত খালেদ।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি দেখেছি, তখন বন্দী উকাইদারের পরনে ছিলো বহু মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ। আর গলায় ঝুলছিলো স্বর্ণনির্মিত ক্রুশ। রসুল স.কে দেখেই সে সেজদা করলো। রসুল স. 'না' 'না' বলে বাধা দিলেন। এরপর কিছু হাদিয়া পেশ করলো উকাইদার। ওগুলোর মধ্যে ছিলো মূল্যবান কিছু পরিচ্ছদও। ইবনে আছির

লিখেছেন, হাদিয়ার সামগ্রীগুলোর মধ্যে একটি খচ্চরও ছিলো। রসুল স. জিযিয়া প্রদানের শর্তে উকাইদারের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন। তাকে একটি নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিলেন। জিযিয়া ধার্য করা হলো বাৎসরিক তিন শত দিনার।

ওদিকে আইলার শাসক ইয়াহান্না বিন রুওয়াওবাও ভীত হলো। ভাবলো এবার নিশ্চয় আইলার দিকে সৈন্য প্রেরণ করা হবে। এ কথা ভেবেই সে আগে ভাগে উপস্থিত হলো রসুল স. এর দরবারে। তার সঙ্গে উপস্থিত হলো জারবা ও আজরাজের বাসিন্দারাও। আবু হুমাইদ সায়েদীর বর্ণনায় এসেছে, আইলার শাসক তখন রসুল স.কে উপঢৌকন হিসেবে একটি শাদা খচ্চর দিয়েছিলো। রসুল স.ও তাকে দিয়েছিলেন একটি চাদর। নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিয়েছিলেন তাকে। ইবনে আবী শায়বা ও বোখারীর বর্ণনায় এ রকম এসেছে।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, আমি আইলার শাসক ইয়াহান্না বিন রুওয়াওবাকে রসুল স. এর দরবারে হাজির হতে দেখেছি। তার গলায় ঝুলছিলো সোনার ক্রুশ। মাথার সামনের চুল সে ঝুঁটি বেঁধে রাখতো। মহান দরবারে হাজির হয়েই সে তার মস্তক অবনত করে দাঁড়ালো। রসুল স. ইশারায় মাথা ওঠাতে বললেন। রসুল স. তাকে একটি ইয়েমেনী চাদর উপহার দিলেন। আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ্ বিন মোহাম্মদ চাদরটি কিনে এনেছিলেন তিনশত দিনার দিয়ে। রসুল স. ইউহান্নার দেখা শোনার ভার অর্পণ করেছিলেন হজরত বেলালের নিকটে।

রসুল স. এর পবিত্র জীবনী রচয়িতারা লিখেছেন, তিনি স. জারবাবাসীদের জিযিয়া নির্ধারণ করেছিলেন তিনশত দিনার। নিরাপত্তাপত্রও লিখে দিয়েছিলেন তাদেরকে। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শত। আজরাজবাসীদেরকেও নিরাপত্তাপত্র লিখে দিয়েছিলেন তিনি স.। মেকনাবাসীদের সঙ্গেও তাদের ফসলের এক চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে সন্ধি করে নিয়েছিলেন।

হজরত আবু হুমাইদ সায়েদী থেকে ইবনে শায়বা, আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আইলার শাসকের পক্ষ থেকে সন্ধিপ্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিলো এক দূতের মাধ্যমে। সে হাদিয়া হিসেবে নিয়ে এসেছিলো একটি খচ্চরও। রসুল স. সেটিকে গ্রহণ করেন। একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে দেন। সৌহার্দের নিদর্শন স্বরূপ একটি চাদরও পাঠিয়ে দেন তার কাছে।

হজরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ থেকে ইমাম আহমদ এবং ইয়াহইয়া বিন কাছির সূত্রে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাবুকে ছিলেন। অবস্থানের সময় পূর্ব নির্ধারিত ছিলো না বলে পুরো বিশদিনই তাঁকে নামাজে কসর করতে হয়েছিলো। মোহাম্মদ বিন ওমর, ইবনে সা'দ এবং ইবনে হাজ্জামের মাধ্যমে এ রকম বর্ণনা এসেছে। ইবনে উকবা এবং ইবনে ইসহাক বলেছেন, রসুল স. তাবুকে অবস্থান করেছিলেন দশদিনের কিছু বেশী।

মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক থেকে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে রসুল স. সাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ্পাকই তাঁর নির্দেশানুসারে আপনাকে পরিচালিত করেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করুন। সিরিয়ায় রয়েছে রোমানদের বিশাল সেনানিবাস। আমরা তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। এখন রোমানদেরকে সিরিয়া থেকে এগিয়ে আসতে দিন। যুদ্ধের আগ্রহ থাকলে তারা এটুকু পথ অতিক্রম করে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে। আমাদের আর অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন। আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকাই আমাদের কর্তব্য।

আহমদ, তিবরানী ও তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, তাবুক অভিযানের সময় রসুল স. বলেছিলেন, কোনো স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে সে স্থান ত্যাগ কোরো না। আর অন্যত্র অবস্থান করলে প্লেগ কবলিত এলাকায় যেয়ো না।

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, সম্ভবত: রসুল স. সংবাদ পেয়েছিলেন যে, সিরিয়া অঞ্চলে তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তাই তিনি তাবুক থেকে আর অগ্রসর হননি।

ইবনে আবী হাতেম এবং বায়হাকীর শিথিল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, আপনি যদি সত্যিই নবী হন, তবে সিরিয়ায় আসুন। সিরিয়া হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিচরণভূমি। আর সিরিয়া তো পবিত্র ভূমি হিসেবেও পরিচিত। রসুল স. তাদের কথা স্বীকার করলেন। তাবুক গমন করেছিলেন তিনি সে কারণেই। তাবুকে উপস্থিত হবার পর ইহুদীরা শুরু করে ষড়যন্ত্র। তাদের ষড়যন্ত্র অকার্যকর করবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা রসুল স.কে মদীনা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইসহাক ইবনে রহওয়াইহ, হজরত ওমর থেকে আবু ইয়ালী, আবু নাঈম এবং ইবনে আসাকের এবং আপন শায়েখগণের সূত্রে মোহাম্মদ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন, তাবুকে দেখা দিয়েছিলো খাদ্য সংকট। তাই সাহাবীগণ একদিন বললেন, হে আল্লাহর রসুল! অনুমতি দিন, বাহন হিসেবে ব্যবহৃত উটগুলো আমরা জবাই করে খাই। এমতো কথোপকথনের সময় সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত ওমর। বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি তাদেরকে অনুমতি দিতে চান ? রসুল স. বললেন, কি আর করি। তারা যে ক্ষুধার্ত। হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এ রকম করলে তো বাহনের অভাবে মহাসংকটে পড়বো আমরা। তাই আমার প্রস্তাব এই যে, যার কাছে যতটুকু খাদ্য আছে সবগুলোকে একত্র করতে বলুন। তারপর সেগুলোর বরকতের জন্য দোয়া করুন। রসুল স. বললেন, তাই হোক। একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছানো হলো।

ঘোষণা করে দেয়া হলো, যার যা কিছু খাদ্য আছে, সব এখানে একত্র করো। সকলেই নির্দেশ পালন করলেন। কেউ নিয়ে এলেন এক মুঠো খেজুর। কেউ নিয়ে এলেন রুটির টুকরা। কেউ ছাতু, আটা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে দেখা গেলো খাদ্য বস্তুগুলোর ওজন সাতাশ সা' এর মতো হবে। রসুল স. ওজু করলেন। দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর খাদ্যের বরকত চেয়ে প্রার্থনা জানালেন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। আল্লাহ্‌তায়ালা দান করলেন অফুরন্ত বরকত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, আমরা সকলেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। বিভিন্ন পাত্র পূর্ণ করে নিলাম। তারপরেও দেখা গেলো অনেক অবশিষ্ট রয়েছে। হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাদের পাত্র ভরে ভরে খাদ্য নিয়ে যেতো। পরক্ষণেই খাদ্যগুলো হয়ে যেতো আগের মতো। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি অবশ্যই তাঁর রসুল। যে আল্লাহ্‌র এই অলৌকিকত্বে অবিশ্বাস করবে, সে হবে জান্নাতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

আবু নাঈম ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু কাতাদা বলেছেন, তাবুক যাত্রার সময় এক স্থানে থামলাম আমরা। তখন রাত। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম সকলে। জেগে উঠে দেখলাম সকালের সূর্য প্রখর তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। রসুল স. বললেন ঠিক আছে। শয়তান যেভাবে আমাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করলো, আমরাও তেমনি করে তাকে করবো ক্ষতবিক্ষত। আমার কাছে ছিলো পানির একটি পাত্র। রসুল স. পাত্রটি নিয়ে ওজু করতে বসলেন। ওজু শেষে বললেন, আবু কাতাদা! পাত্রভ্যন্তরের অবশিষ্ট পানি সংরক্ষণ কোরো। তিনি স. আমাদের সকলকে নিয়ে ফজরের কাজা আদায় করলেন। তারপর বললেন, যদি তোমরা আবু বকর ও ওমরের কথা শুনতে তবে এভাবে বিপদে পড়তে না। স্থানটি ছিলো পানি শূন্য। তাই হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর এখানে যাত্রা স্থগিত করতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। পানির অভাবে সকলেরই কষ্ট হচ্ছিলো খুব। পিপাসায় শুকিয়ে গিয়েছিলো সকলের কণ্ঠনালী। ঘোড়া ও উটগুলোর গলা থেকেও আওয়াজ বের হচ্ছিলো না। রসুল স. একটি চামড়ার পাত্র চেয়ে নিলেন। তাতে ঢাললেন তাঁর ওজুর অবশিষ্ট পানিটুকু। তারপর তাঁর পবিত্র হাতের আঙ্গুলগুলো ডুবিয়ে দিলেন ওই পানিতে। তাঁর পবিত্র আঙ্গুলগুলো থেকে শুরু হলো পানির প্রস্রবন। সবাই সেখান থেকে পানি নিতে শুরু করলেন। পিপাসা মিটালেন নিজেদের, পশুদের। এভাবে বাহিনীর তিরিশ হাজার সৈন্য, বারো হাজার উট, বারো হাজার ঘোড়া সকলেই পরিতৃপ্ত হলো।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ বিন ওমরের বর্ণনায় এসেছে, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন রসুল স.। স্থানটি ছিলো মরুভূমি। অদূরে ছিলো ক্ষীণকায়া প্রস্রবন। ওই অপ্রতুল পানি এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য কিছুই নয়। রসুল স. বললেন, আমার আগে কেউ সেখানে যেয়ো না। গেলেও ওই নদীর পানি পান কোরো না। কিন্তু চারজন মুনাফিক এই নির্দেশের তোয়াক্কা করলো না। তারা আগে ভাগে যেয়ে পানি পান করলো। সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানি গেলো শুকিয়ে। রসুল স. সেখানে পৌছে বললেন, কে এসেছিলো আগে? সাহাবীগণ বললেন, মোতাব বিন কুশায়ের, হারেস বিন ইয়াজিদ, ওয়াদিয়া বিন সাবেত এবং জায়েদ বিন ইয়াসির। রসুল স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করে দেইনি? তিনি স. ওই চার মুনাফিকের জন্য বদদোয়া করলেন। অভিশাপ দিলেন তাদেরকে। এরপর শুষ্ক নদীতে নেমে মাটিতে রাখলেন তাঁর পবিত্র হাত। সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে প্রবল বেগে পানি উঠতে লাগলো। রসুল স দোয়া করলেন। পানির গতি হলো আরো তীব্র। হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বর্ণনা করেছেন, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! আমি স্বকর্ণে শুনলাম বজ্রের আওয়াজের মতো প্রচণ্ড আওয়াজ। তারপর ছুটলো তীব্র পানির ফোয়ারা। আমরা সকলে ওই পানি পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। পশুদেরকেও পান করালাম। রসুল স. বললেন, বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে অচিরেই এ অঞ্চল হয়ে যাবে শস্য-শ্যামল।

যুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাগণ সূত্রে মোহাম্মদ বিন ওমর ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর বাহিনী নিয়ে উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। পানি নিঃশেষ হয়ে এসেছিলো। কিন্তু কোথাও কোনো পানির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না। তৃষ্ণার্ত সৈন্যরা তাঁদের কষ্টের কথা জানালেন। রসুল স. হজরত উসায়েদ ইবনে হুদায়েরকে বললেন, যেখান থেকে পারো সামান্য কিছু পানি নিয়ে এসো। হজরত উসায়েদ খোঁজাখুঁজি করে এক রমণীর কাছে পেলেন সামান্য পানি। মশকসহ ওই সামান্য পানি নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে। রসুল স. ওই পানিতে বরকত দানের জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা শেষে বললেন, এসো। আমি তোমাদের সবাইকে পানি পান করাবো। সকলেই তাঁদের পানির পাত্রগুলো পূর্ণ করে নিলেন। পান করলেন পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এরপর রসুল স. বললেন, এবার তোমাদের উটগুলোকে আনো। উট-গুলোকেও পানি পান করানো হলো তৃপ্তির সঙ্গে। এক বর্ণনায় এসেছে— উসায়েদ পানি নিয়ে এলেন। রসুল স. ওই পানি ঢাললেন একটি বড় পেয়ালায়। তারপর ওই পানিতে হাত চুবিয়ে হাত ধৌত করলেন। মুখ ও পা ধুয়ে নিলেন ওই পানিতে। তারপর দুই হাত তুলে দোয়া করতে শুরু করলেন। হাত নামাবার

আগেই পেয়ালা থেকে প্রবল তেজে পানি নির্গত হতে শুরু করলো। রসুল স. বললেন, ইচ্ছেমতো পান করো। বাড়তে লাগলো পানির পরিসর। এত বেশী বেড়ে গেলো যে, এক সঙ্গে দুশ' লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পানি পান করতে পারলেন। সেনাবাহিনীর সকল সদস্য পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করার পর পান করালেন তাঁদের পশুপালকে।

বিশুদ্ধ সূত্রে ফুজালার মাধ্যমে তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত উবায়েদ বলেছেন, রসুল স.এর তাবুক অভিযানের সময় ছিলো ঘোর গ্রীষ্মকাল। ফেরার পথে দেখা দিলো খাদ্য ও পানির সংকট। উট ও ঘোড়াগুলোও যথেষ্ট পানাহারের অভাবে হয়ে পড়লো দুর্বল। রসুল স.কে এ কথা জানানো হলো। তিনি এমন স্থানে দাঁড়ালেন যেখানে পথ অতিক্রম করতে হয় একজনের পিছনে একজন করে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি যাত্রী ও তার বাহনে ফুঁ দিয়ে রসুল স. দোয়া করলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি এদেরকে এবং এদের বাহনগুলোকে শক্তি সামর্থ্য দাও। এদের পথ পরিক্রমণকে করে দাও সহজ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কাফেলা হলো প্রচণ্ড গতিশীল। উটগুলো এত দ্রুত ছুটতে শুরু করলো যে, লাগাম টেনে ধরেও সেগুলোকে থামানো যাচ্ছিলো না। মদীনা পৌঁছানো পর্যন্ত এভাবেই চললো সেগুলো। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী, মুসলিম, আবী হুমাইদ, সায়েদী প্রমুখ। আরো বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় প্রবেশের আগে উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে রসুল স. বলে উঠলেন, এই উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে। আর আমরাও তাকে ভালোবাসি।

জননী আয়েশা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, তাবুক থেকে ফিরে মদীনায় প্রবেশের সময় বালক বালিকারা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলো—

ত্বলায়াল বাদরু আ'লাইনা
মিনসানীয়াতিল বিদায়ী
ওয়াজাবাশ্ শুকরু আ'লাইনা
মাদায়া লিল্লাহি দায়ী।

অর্থঃ বিদা উপত্যকা জুড়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণ শশী। যতকাল প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনারত রইবে ততকাল আমাদের দায়িত্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যাবশ্যক।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসে সৈনিকেরা তাদের যুদ্ধের পোশাক বিক্রয় করতে শুরু করলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগলেন, যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ শেষ। রসুল স. এ কথা জানতে পেরে বললেন, খবরদার! এ রকম কোরো না। দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সত্যাধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে।

রসুল স. তাবুক অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন নবম হিজরীর রজব মাসে। আর সেখান থেকে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন রমজান মাসে। মদীনা থেকে তাবুকের দূরত্ব চৌদ্দ মন্‌জিল। সুরা আন্‌ নূরের তাফসীরে এ রকম লেখা হয়েছে। রসুল স. এর জীবনালেখ্য প্রণেতাগণও এ রকম লিখেছেন। আমরা একবার হজ যাত্রার সময় তাবুক গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি মদীনা থেকে সেখানকার দূরত্ব বারো মন্‌জিল (চৌদ্দ মন্‌জিল নয়)। তাবুক থেকে দামেশকের দূরত্ব এগারো মন্‌জিল (এক মন্‌জিল বলে একদিনের পথকে)।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ

❐ আলিফ-লাম-র। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

এই সুরার আয়াত সংখ্যা ১০৯টি। তিনটি আয়াত ছাড়া বাকী সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। প্রথম আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে আলিফ, লাম, র। এই অক্ষরগুলোকে বলা হয় হরূফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি)। বর্ণগুলো দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাচ্ছন্ন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাফসীরে মাযহারী প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় এবং চতুর্থ খণ্ডের ৩৮১ পৃষ্ঠায়। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিল্‌কা আয়াতুল্‌ কিতাবিল্‌ হাকীম' (এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত)। এখানে 'তিলকা' শব্দটি একটি রূপক অর্থবোধক শব্দ। শব্দটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআন মজীদের দিকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সকল আয়াতের দিকে যা উল্লেখিত হয়েছে ইতোপূর্বে। কিতাবুল হাকীম অর্থ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এখানে হাকীম শব্দটি কিতাব শব্দের বিশেষণ। এই গ্রন্থকে জ্ঞানগর্ভ বা বিজ্ঞানময় বলার কারণ এই যে, এই গ্রন্থের বিধানসমূহ নির্ভুল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর মধ্যে উল্লেখিত কোনো কোনো সামাজিক বিধান কোনো কোনো সময় রহিত হলেও গ্রন্থের মূল মর্ম ও বক্তব্য চিরন্তন— যা কখনো রহিত হতেই পারে না। হাসান বসরী বলেছেন, এই গ্রন্থে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনের জন্য। আর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সকল অতিরঞ্জন ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার জন্য। আরো বলে দেয়া হয়েছে, যারা ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিধানের পূর্ণ অনুগত তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর অবাধ্যদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অগ্নিবাস।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারীর ও জুহাক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌পাক রসুলপাক স.কে রেসালতের দায়িত্ব দান করলেন এবং তা প্রচার করতে বললেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের অধিকাংশই তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্‌ কোনো মানুষকে রসুল বানাতে পারেন না। যদি বানাতেন তবে প্রতাপশালী কোনো নেতাকে বানাতেন। কোনো বিত্তহীন ও অক্ষরবিবর্জিত লোককে নয়। তাদের এ সকল অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ○

❒ মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাহাদিগেরই এক জনের নিকট ওহি প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, 'এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।'

মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে থেকে নবী রসুল প্রেরণ করাই আল্লাহ্‌তায়ালার রীতি। মানুষের নবী কখনো ফেরেশতা, জ্বিন বা অন্য কোনো সম্প্রদায় হতে পারে না। এ রকম করলে পথ-প্রদর্শন ও পথপ্রাপ্তির বিষয়টি হয়ে পড়বে বিশৃঙ্খল, ভারসাম্যহীন ও অসফল। উপকার প্রদান ও প্রাপ্তি সফল হতে গেলে নবী ও তার উম্মতকে সমসম্প্রদায়ভূত হতেই হবে। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের জন্য মানুষের মধ্যে থেকেই নবী নির্বাচন করেন এবং তাদেরকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে পরিচালিত করেন। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই চিরন্তন তত্ত্বটি জানে না। তাই বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে, মানুষ আবার কখনো মানুষের নবী হতে পারে নাকি? আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের এই অজ্ঞজনোচিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে অবতীর্ণ করেছেন এই আয়াত। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওমা আরসালনা মিন ক্বাবলিকা ইল্লা রিজালান' (আমি আগে থেকেই সর্বযুগে পুরুষদেরকে পয়গম্বর বানিয়েছি)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লাও কানা ফিল্‌ আরদ্বি মালায়িকাতুন ইয়ামশুনা মুতমাইন্নিনা লানায্‌যালনা আ'লাইহিম মিনাস্‌সামায়ী মালাকার রসুলা' (যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বিচরণ করতো ও বসবাস করতো তাহলে আমি তাদের প্রতি আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকে রসুলরূপে প্রেরণ করতাম)।

সাধারণ মানুষ মনে করে পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের অধিকারীরাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই তারা এমন কথা বলতো যে, নবী যদি বানাতেই হয় তাহলে ধনী ও প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিকে নবী বানানো হলো না কেনো? অন্য এক আয়াতেও এ রকম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— 'লাওলা নুয্যিলা হাজাল কুরআনু আ'লা রজুলিম মিনাল ক্বারইয়াতাইনি আ'জীম'। এ কথার অর্থ— দু'টি জনপদের (মক্কা ও তায়েফের) কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির উপরে কোরআন নাজিল হলো না কেনো? অর্থাৎ মক্কার মুশরিকেরা মনে করতো মক্কার ওলিদ বিন মুগিরা এবং তায়েফের মাসউদ বিন ওমর সাক্বাফির মতো প্রতাপশালী সমাজপতির উপর কোরআন অবতীর্ণ হলো না কেনো। কারণ, পার্থিব দৃষ্টিতে তারা ছিলো রসুল স. অপেক্ষা প্রভাবশালী। আল্লাহ্পাক মুশরিকদের ওই কথার জবাবে জানিয়েছেন— 'আহুম ইয়াক্বসিমুনা রহমাতা রব্বিকা'। এ কথার অর্থ— তারা কি আল্লাহ্পাকের রহমত (নবুয়ত ও রেসালত) কে নিজেরাই বণ্টন করবে! মুশরিকেরা মূর্খ, অবিবেচক ও স্থূলদর্শী। যদি এ রকম না হতো, তবে তারা দেখতে পেতো রসুল স. এর পবিত্র চরিত্রে ঘটেছে সকল শুভ গুণাবলীর সমাবেশ। পার্থিব বৈভব ও প্রভাব সেসব গুণাবলীর তুলনায় কিছুই নয়। আর পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণও এমনই ছিলেন। দুনিয়ার বৈভব ও প্রভাবকে তাঁরা গ্রাহ্যই করেননি।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের বিকৃত ধারণা ও অপকথনকে প্রত্যাখ্যান করে রসুল স.কে প্রেরণের উদ্দেশ্য বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— 'মানুষের জন্য এটা কী আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের নিকট ওহি প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক করো।' এখানে 'সতর্ক করো' বলে সাধারণভাবে সকল মানুষকে আল্লাহ্র ভয় প্রদর্শন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, সবাই আল্লাহ্কে ভয় করে না, ভয় করে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি। তারাই ইমানদার। তাই পরক্ষণেই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— 'বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা।'

এখানে 'ক্বাদামা সিদক্বিন' এর মর্মার্থ উচ্চ মর্যাদা, যে মর্যাদার দিকে ইমানদারেরা ধাবিত হতে থাকেন। 'ক্বাদাসা সিদক্বিন' কথাটির শাব্দিক অর্থ সত্যের প্রতি পদবিক্ষেপ (সত্য পদক্ষেপ)। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হবে উচ্চ মর্যাদা (উচ্চ মর্যাদার প্রতি পদবিক্ষেপ) অর্থাৎ কারণকেই এখানে উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, 'হাত বড়' অর্থ দানের হাত বড়। দান করা হয় হাতের মাধ্যমে। অতএব হাত হচ্ছে দানের কারণ। তবুও 'দান' বুঝাতে 'হাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দ ব্যবহারের এই রীতিটিই এখানে প্রবর্তিত হয়েছে।

এখানে 'সত্য পদক্ষেপ' কথাটি বসিয়ে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে গেলে প্রয়োজন সত্য কথন ও বিশুদ্ধ সংকল্প (নিয়ত)। আর সেই সত্য কথন হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং জুহাক প্রদত্ত তাফসীরের অনুসরণে আমি এখানে ক্বাদামা সিদক্বিন কথাটির অর্থ করেছি 'উচ্চ মর্যাদা'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারাই সত্য

পদবিক্ষেপকারী উচ্চ মর্যাদাশালী, যারা তাদের পুণ্যকর্মসমূহ পূর্বাহ্নে প্রেরণ করেন। উত্তম প্রতিদান বা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন তাঁরাই। জুহাক বলেছেন, ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ সত্যবাদিতার সওয়াব। অর্থাৎ হজরত ইবনে আব্বাসের নিকটে কথাটির অর্থ 'উত্তম প্রতিদান' এবং জুহাকের নিকটে 'সওয়াব'।

হাসান বসরী বলেছেন, ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ পুণ্যর্কম সমূহ যা বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পূর্বেই অর্জন করে থাকেন। তাঁর নিকট 'ক্বদ্ ক্বাদিম' অর্থ তাকাদ্দুম (পূর্বাহ্নে সম্পাদিত পুণ্যকর্ম সমূহ)। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক এখানে এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, ইমানদার ব্যক্তিরা উত্তম আমলসমূহ মৃত্যুর পূর্বেই প্রেরণ করে থাকেন এবং সেগুলোর সঙ্গেই মিলিত হবেন মৃত্যুর পর।

হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, আরববাসীরা অগ্রগামী হওয়াকে বলে ক্বাদম— তা কল্যাণের দিকে হোক অথবা শিরিকের দিকে। যেমন বলা হয়, ইসলামে অমুক ব্যক্তির পদক্ষেপ (সাবাকাত) অর্জিত হয়েছে। আমার নিকট কথাটির অর্থ— গৃহীত পদক্ষেপ অথবা ক্রম-অগ্রসরমান পদক্ষেপ— তা কল্যাণের দিকে হোক অথবা অকল্যাণের দিকে।

এক বর্ণনানুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের অভিমত এ রকম— ক্বাদামা সিদক্বিন অর্থ অতীত সৌভাগ্য। হজরত জায়েদ বিন আসলাম বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর শাফায়াত। বোখারী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, শাফায়াত তাদের জন্য যারা সত্যের পথে পদবিক্ষেপকারী।

শেষে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, এতো এক সুদক্ষ যাদুকর।' এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন রসুল স. এর মাধ্যমে বিকশিত মোজেজাসমূহ অবলোকন করে তখন হিংসা, ক্ষোভ ও গোঁয়ার্তুমির কারণে বলতে থাকে, এতো দেখছি এক সুদক্ষ যাদুকর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

☐ তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

'ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি', 'আরশে সমাসীন হন'— দু'টো কথাই জটিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল্লাহ্পাক তো এক মুহূর্তে সকল কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাহলে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে ছয় দিন সময় ব্যয় করলেন কেনো? উত্তরে বলা যেতে পারে, মানুষকে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও ধারাবাহিক বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান দানের জন্যই আল্লাহ্পাক এ রকম করেছেন। বলেছেন— 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।'

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।' কথাটির প্রকাশ্য ও সরাসরি অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বজনবিদিত ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্পাক শরীরবিশিষ্ট অথবা সীমানাভূত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই আলোচ্য বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের অন্যান্য আয়াতেরও অর্থ গ্রহণ করতে হবে অন্তর্নিহিত মর্মের প্রেক্ষিতে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের এই রীতি সম্পর্কে জবাব প্রদান করা যেতে পারে দু'রকমভাবে—

১. এ ধরনের আয়াত হচ্ছে আয়াতে মুতাশাবিহাত (রহস্যাচ্ছন্ন আয়াত)। আল্লাহ্তায়ালার আনুরূপ্যবিহীন মর্যাদার আনুকূল্য বজায় রাখতে গেলে এ সকল আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ গ্রহণ করতেই হয়। এ সকল আয়াতের প্রকৃত অর্থ জানেন আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং। আর জানেন তাঁরা যাঁদেরকে—আল্লাহ্তায়ালা এ জ্ঞান দান করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ওলামায়ে রাসিখীন। এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়ামা ইয়া'লামু তাবিলাহু ইল্লাল্লহু ওয়াররসিখুনা ফিল্ ইলমি' (আল্লাহ্ ও যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা ছাড়া এর ব্যাখ্যা কেউ জানে না)। এখানে 'ওয়ার-রসিখুনা' শব্দটি আল্লাহ্পাকের সংগে সংযুক্ত। অর্থাৎ মুতাশা-বিহাত আয়াতের প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্। আর জানেন ওলামায়ে রসিখীন। আল্লাহ্পাকই তাঁদেরকে এ জ্ঞান দান করেছেন। এ জ্ঞান সর্বসাধারণের জন্য নয়। তাই তাঁরা এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করে থাকেন। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা আলে ইমরানের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে ইসতাওয়া (সমাসীন) কথাটির অর্থ দাঁড়াবে ইস্তাওয়াল্লা (অধিকার করা)। অর্থাৎ আরশ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিসর বিশিষ্ট এই সৃষ্টি আল্লাহ্-পাকের এক একচ্ছত্র ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাসন কেন্দ্র। এই আরশের উপরে রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সমাসীন হওয়ার অর্থ এটাই।

জ্ঞাতব্যঃ ইসতাওয়া এর অর্থ যে 'ইসতাওয়াল্লা' (অধিকার করা) এবং 'তাসাল্লাতা' (কুক্ষিগত করা) — এ কথা আরবী গ্রন্থাদির বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন জনৈক কবির কবিতায় বলা হয়েছে— কাদিস্তাওয়া বাশারুন

আ'লাল ইরাকি — মিন গইরি সাইফিন ওয়া দামিন মুহ্‌রাক্বিন (বশির অসি সঞ্চালন ও রক্তপাত ছাড়াই ইরাককে নিয়ে এসেছে তার একচ্ছত্র প্রশাসনাধীনে)।

বাগবী বলেছেন, মুতাজিলাদের মতে ইসতাওয়া অর্থ ইস্‌তী'লা (অধিকার কামিতা) এবং তাসাল্লুত (অধিকার গ্রহণ)।

২. সলফে সলেহীন (পূর্ববর্তী যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ববৃন্দ) এ সকল আয়াতের জটিল ব্যাখ্যার পক্ষপাতি নন। তাঁরা বলেন, এ সকল আয়াত যে আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। মুক্ত থাকতে হবে এ সকলের মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে। বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করতে হবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মোহাম্মদ বিন হাসান বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সকল ফকীহ্‌ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন মজীদ ও সহীহ্‌ হাদিসসমূহে আল্লাহ্‌-পাকের যে সকল গুণ বিবৃত হয়েছে, সেগুলোকে ব্যাখ্যা ও অনুমান ব্যতিরেকেই মেনে নেয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সেগুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাইবে, সে চলে যাবে রসুল স. ও সলফে সালেহীনের ঐকমত্যের বিরুদ্ধে। ইসলামের সঠিক দলের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্যুত। ইমাম মালেক বলেছেন, ইসতাওয়া অর্থ অস্পষ্ট— এ রকম বলা ঠিক নয়। আসল কথা হচ্ছে শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমরা জানি না। সুতরাং এর সোজা সাপটা অর্থ গ্রহণ করা বেদাত।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ রয়েছেন আসমানে, জমিনে নয়। বায়হাকীর বর্ণনাতেও এ রকম এসেছে। এই অভিমতটিও ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে সম্পর্কিত যে, যে ব্যক্তি বলবে 'আমার প্রতিপালক আসমানে না জমিনে, এ কথা আমি জানি না'— সে কাফের। কেননা আল্লাহ্‌পাক স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন— আররহমানু আ'লাল আ'রশিস্‌তাওয়া (দয়াময় আল্লাহ্‌ আরশে সমাসীন)— আর আরশ হচ্ছে আসমানের দিকে। ইমাম আবু হানিফার আরেকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে এ রকম— যে ব্যক্তি আসমানে আল্লাহ্‌র অবস্থান অস্বীকার করে, সে কাফের।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সমাসীন রয়েছেন আকাশে— আরশে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে সৃষ্টির নিকটবর্তী হন, যেভাবে ইচ্ছা অবতীর্ণ হন (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া, সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া এবং অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি বিষয়ই শুদ্ধ। কিন্তু এগুলোর প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের অতীত। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও এ রকম বলেছেন।

ইসহাক বিন রহ্‌ওয়াইহ্‌ বলেছেন, সকল আলেমের ঐকমত্য এই যে, আল্লাহ্‌পাক আনুরূপ্যবিহীন অবস্থায় তাঁর আরশে আসীন এবং তিনি সকল কিছু সম্পর্কে অবগত। মাজানী, জাহবী, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা ইবনে আবী শায়বা, আবু ইয়া'লী, বায়হাকী ও অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্যও

—৩৬

অনুরূপ। আবু জরয়া রজী'র বর্ণনায় এসেছে— এ বিষয়ে রয়েছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য। হাফেজ ওসমান বিন সাঈদ দারেমী লিখেছেন, 'আল্লাহ্পাক আকৃতিবহির্ভূতরূপে তাঁর আরশে সমাসীন'— এ বিষয়টি ঐকমত্যসম্ভূত। সহল বিন আবদুল্লাহ্ তসতরী বলেছেন, 'আরশ আল্লাহ্র সসীম সৃষ্টি, সুতরাং আল্লাহ্ কিভাবে আরশে অধিষ্ঠিত হতে পারেন'— এ রকম বলা জায়েয নয়। যেহেতু কোরআন মজীদে আল্লাহ্র আরশে সমাসীন হওয়ার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু তা মানতে আমরা বাধ্য। আল্লাহ্পাক আরশে সমাসীন— এ কথা রসুল স.ও বলেছেন। মোহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী লিখেছেন, বিশ্বাসীদের জন্য এতোটুকুই জানা জরুরী যে, আল্লাহ্ আরশের উপরে অধিষ্ঠিত। চিন্তাকে এর চেয়ে অধিক অগ্রসর হতে দেয়া উচিত নয়। যারা এ রকম করে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত। মোহাম্মদ ইবনে খুজাইমা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সপ্তম আকাশের উপরে প্রতিষ্ঠিত আরশে সমাসীন বলবে না সে কাফের সাব্যস্ত হবে। যদি সে কল্যাণ চায় তবে তাকে তওবা করতে হবে। অন্যথায় তার মস্তক ছেদন করতে হবে।

তাহাবী লিখেছেন, আরশ ও কুরসী তেমনই, যেমন আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন তাঁর পবিত্র কালামে। আল্লাহ্তায়ালা আরশ এবং অন্য কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। আনুরূপ্যবিহীনভাবে তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সকল কিছুর উর্ধ্বে।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী তাঁর 'ইখতিলাফুল মুদাল্লিন ওয়া মুকালাতিল ইসলামিয়্যীন' গ্রন্থে লিখেছেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ইমাম ও হাদিস বিশারদগণের বক্তব্য এই— আল্লাহ্র প্রতি, আল্লাহ্র ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নবী রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। ওই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে, যেগুলো কোরআন মজীদে এবং সহীহ্ হাদিসের মাধ্যমে এসেছে। এই বিশ্বাসের কোনো হেরফের হতে পারবে না। যেমন, কোরআন মজীদে রয়েছে, আল্লাহ্তায়ালার আরশে সমাসীন হওয়ার কথা, আল্লাহ্পাকের দুই হাতের কথা।

আবু নাঈম তার 'হুলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন, আমাদের পথ হচ্ছে সলফে সালেহীনের পথ। তাঁরা ছিলেন কোরআন, হাদিস ও এজমার (ঐকমত্যের) অনুসারী। তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ্পাক স্বাধিষ্ঠ এবং আত্মজাত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। আবু নাঈম আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাকের আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টিকেও সলফে সালেহীন মান্য করে থাকেন। এ কথাও বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা কখনো সৃষ্টির সীমানাভূত নন। ইবনে আবদুল বার লিখেছেন, জ্ঞানাতীতরূপে আল্লাহ্তায়ালা সাত আকাশের উপরে অবস্থিত আরশে সমাসীন। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত।

খতিব বাগদাদী লিখেছেন, সলফে সালেহীনের রীতি হচ্ছে, আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যকে স্বীকার করতে হবে। এর অনুকূলে ব্যাখ্যাও প্রদান করা যাবে। কিন্তু ওয়াজহুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বদন), ইয়াদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র হাত) এবং ইস্তাওয়া আলাল আরশ (আরশে সমাসীন) — এসকল কথাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আল্লাহ্পাক আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তাঁর এসকল গুণাবলীও ব্যাখ্যা করতে হবে আনুরূপ্যবিহীনতার অনুকূলে। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, সলফে সালেহীনই অনুসরণীয়। তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসী। রহস্যাচ্ছন্ন আয়াতের জটিল ব্যাখ্যা থেকে তাঁরা সবসময় আত্মরক্ষা করেন। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর অর্থগত দিকটি রেখে দেন আল্লাহ্র জিম্মায়।

বাগবী লিখেছেন, আরশে সমাসীন হওয়া আল্লাহ্তায়ালার একটি সেফাত বা গুণ। বিনা ব্যাখ্যায় এ কথার উপর ইমান আনা ওয়াজিব। আল্লামা বায়যাবী লিখেছেন, এ কথার উদ্দেশ্য— আল্লাহ্তায়ালা আরশে সমাসীন ওইভাবে, যেভাবে সমাসীন হওয়া তাঁর অতুলনীয় মর্যাদার অনুকূল। আকৃতি ও সমাসীনতার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।

আবু বকর আলী বিন ঈসা শিবলী ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সুফী ও আলেম। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ আসমানে আছেন, তিনি নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁর সিদ্ধান্ত। শায়খুল ইসলাম আবদুল্লাহ্ আনসারী লিখেছেন, আল্লাহ্পাক সপ্তম আসমানের আরশে অধিষ্ঠিত।

শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী র. তাঁর 'গুনিয়াতুত্ ত্বলেবীন' পুস্তকে এ বিষয়ে অনেক প্রতর্কের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শেষে এইমর্মে সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে, সলফে সলেহীনের বক্তব্য হচ্ছে, বিষয়টির অবগতি সম্ভব কিন্তু এর প্রকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং মর্ম বুঝতে পারলেও বিষয়টি বিবরণের অতীত। আল্লাহ্তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সকল আনুরূপ্য থেকে পবিত্র।

এ সকল বক্তব্য ইমাম জাহবী তাঁর 'কিতাবুল উলুমে' সন্নিবেশিত করেছেন। সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন, মোহাদ্দেসীন, ফুকাহা, ও অধিকাংশ সুফীর অভিমত এ রকমই। আমি সুরা আরাফের 'ছুম্মাসতাওয়া আলাল আরশী ইউগশীল লাইলান্ নাহারা' এবং সুরা বাকারার 'ইয়াতিয়া হুমাল্লহু ফি জুলালিম মিনাল গামামী' এ আয়াত দু'টোর তাফসীর ব্যপদেশে লিখেছি, আসহাবে কুলুব (জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী) গণের কলবে আল্লাহ্তায়ালার তাজাল্লী বিশেষভাবে বর্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে বর্ষিত হয় সমগ্র সৃষ্টির উপর। এই বর্ষণ বিরতিহীন। এ কথাটি মেনে

নিলে আল্লাহ্‌তায়ালার সমাসীন হওয়ার বিষয়টিতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। আল্লাহ্‌পাক অবিনশ্বর ও চিরন্তন। সুতরাং নশ্বরতা ও অচিরন্তনতার বেষ্টনীবদ্ধ হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সমাসীনতা, অবতরণ তাই জ্ঞানাতীত একটি বিষয়। আমি সুরা বাকারার 'ছুম্মাস তাওয়া আলাস্ সামায়ী ফাসাওয়াহুন্না সাবআ সামাওয়াতিন' এর তাফসীরে তাজাল্লীর বিষয়টি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। ওই তাজাল্লী বর্ষণের কারণেই বলা হয় বিশ্বাসীদের অন্তরে, কাবায় এবং আরশে আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষভাবে সমাসীন। আর সাধারণভাবে সমাসীন তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে। কিন্তু সৃষ্টির মুখাপেক্ষী তিনি নন।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন।' এ কথার অর্থ— তিনি স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে অপার প্রজ্ঞাময়তার মাধ্যমে সৃষ্টির সকল সমস্যা সমাধান করেন। নিয়ন্ত্রণ করেন সকল বিষয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করবার কেউ নেই।' এ বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে নজর বিন হারেস সম্পর্কে। সে বলেছিলো কিয়ামতের দিন লাত ও উজ্জা— এই দুই দেবীমূর্তি আমাকে সুপারিশ করবে। কারণ আমি তাদের পূজা করি। তার কথার প্রেক্ষিতেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, কখনই নয়। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই। জড়প্রতিমাদের তো নেইই।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাঁর ইবাদত করো।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী সম্পর্কে এতোক্ষণ ধরে যা বলা হলো, সে সকল গুণাবলীর অধিকারী যিনি, তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত আর কোনো প্রভুপালক নেই। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কারো কোনো অংশও নেই। সুতরাং হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কেবল তাঁরই উপাসনা করো। পরিত্যাগ করো জড় অজড় সকল কিছুর উপাসনা। কারণ কল্যাণ অথবা অকল্যাণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব হে মানুষ! তোমরা এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমা পূজাকে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? এ কথার অর্থ— হে মানুষ এ সকল বিবরণ শোনার পর তোমরা কি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করবে না? এ কথা অনুধাবন করতে কি সক্ষম হবে না যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

☐ তাঁহারই নিকট তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহের প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিত বলিয়া তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

'ইলাইহি মারজিউ'কুম জামীয়াঁ' অর্থ তাঁর নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে সকলকে আল্লাহ্তায়ালা সকাশে উপস্থিত হতে হবে। 'ওয়াদাল্লহি হাক্কা' অর্থ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। এখানে 'ওয়াদাল্লাহি' হচ্ছে মাফউলে মতলক (সাধারণ কর্মপদ)। এই সত্য প্রতিশ্রুতি সেই আল্লাহ্র, যাঁর প্রতি সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এখানে প্রতিশ্রুতিকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে ওয়াদাল্লহ্ (আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি)।

এরপর বলা হয়েছে— 'সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালাই দান করেন পার্থিব জীবন। তারপর এই জীবনের পুনরাবর্তন ঘটান এভাবে— পৃথিবীর জীবন শেষ হবে, পুনরায় তিনি জীবন দান করবেন আখেরাতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের ন্যায়বিচারের সঙ্গে কর্মফল প্রদানের জন্য।' এখানে বিলক্বিসত্ অর্থ ন্যায়বিচারের সঙ্গে। ন্যায়বিচার আল্লাহ্র দিক থেকেও হতে পারে, আবার বান্দার দিক থেকেও হতে পারে। বান্দার দিক থেকে হওয়ার অর্থ— বান্দা তার প্রতিটি কাজে ন্যায়নিষ্ঠ হবে। অথবা মর্মার্থ হবে ইমান। যেহেতু ইমানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠতা। এর বিপরীতে শিরিক হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম। শেষোক্ত মর্মার্থটিই এখানে সুসঙ্গত। কারণ পরবর্তী বাক্যে ঘোষিত হয়েছে কাফেরদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী এভাবে— 'এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতো বলে তাদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।'

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ فِىْ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

❒ তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মঞ্জিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পার। আল্লাহ্ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

❒ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য।

❒ যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান,

❒ উহাদিগেরই আবাস অগ্নি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ্তায়ালাই সূর্য্যকে করেছেন তেজস্কর এবং চন্দ্রকে করেছেন সেই তেজস্কর সূর্যের আলোকে আলোকিত। আর তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন কক্ষপথ। তারা নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে বলে দিবস-রাত্রি, মাস ও বছর গণনা করা যায়। এভাবে গণনা করা হতে থাকে শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী। হে মানুষ! আল্লাহ্তায়ালার এ সকল সৃষ্টি নিরর্থক নয়। তোমরা আল্লাহ্তায়ালার এই বিস্ময়কর দুই সৃষ্টির মাধ্যমে কাল নিরুপণ করতে পারো। নির্ধারণ করতে পারো নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের সময়। এ কথাও সহজে অনুভব করতে পারো যে, সূর্য ও চন্দ্রের এই সুশৃঙ্খল বিবর্তন নিশ্চয় অপার ক্ষমতার অধিকারী কোনো সত্তার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এ সকল নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে সাবধানী সম্প্রদায়ের জন্য।' দিবস ও রাত্রির বিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অভিজ্ঞান। রয়েছে সময়াতিপাতের এক দুর্ভেদ্য রহস্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন রহস্যের মধ্যে রয়েছে বিস্ময় আর বিস্ময়। এই নিদর্শন সমূহের যথামর্যাদা দিতে পারেন কেবল তারাই যারা মুত্তাকী (সাবধানী)। কারণ তাঁরা চিনেছেন এই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টাকে। পূর্ণ সমর্পিত হয়েছেন কেবল তাঁরই নিকটে। তাই তাঁরা সেই মহাক্ষমতাধর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমকক্ষ আনুরূপ্যবিহীন পবিত্র স্রষ্টার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

এর পরের দুই আয়াতে (৭ ও ৮) বলা হয়েছে— 'যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান, তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের জন্য।' এখানে 'যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না' অর্থ যারা আল্লাহ্র নিকটে সওয়াবের আশা করে না। আর আল্লাহ্র দীদার বা সাক্ষাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব।

'পার্থিব জীবনে পরিতৃপ্ত' কথাটির অর্থ— তারা আখেরাতের অনন্ত জীবন অপেক্ষা দুনিয়ার সাময়িক জীবনকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এই নশ্বর পৃথিবীর বিত্ত-বৈভব ও সুখের উপকরণসমূহে তারা আসক্তা নিমজ্জিত। অনন্ত জীবনের কথা তাদের মনে নেই। তাই পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এতেই নিশ্চিন্ত থাকে।'

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে অনবধান, তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের বিনিময়।'

আলোচ্য আয়াত দু'টোতে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের কথা বিবৃত হয়েছে। তারা আল্লাহ্কে ভয় করে না। মুখে মুখে তারা আল্লাহ্কে মানলেও অন্তরে অন্তরে তারা ঘোর পৃথিবীপূজক। তাই তারা পৃথিবীর আরাম আয়েশে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত। আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে তারা বেখবর। চিরস্থায়ী অগ্নিবাস তাদের ললাট লিখন। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে তাদের কৃতকর্মের জন্যই। আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা' (যারা) কথাটির মাধ্যমে এখানে ওই ইহুদী খৃষ্টানদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

বায়যাবী লিখেছেন, এখানে প্রথমে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা (যারা) এর উদ্দেশ্য — যারা কিয়ামতকে স্বীকার করে না এবং আখেরাতের বিনিময়ের আশা যাদের নেই। এরা ভোগোন্মত্ত, পৃথিবীর সাফল্যে পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত।

পরে উল্লেখিত 'আল্লাজীনা (যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে অনবধান) এর উদ্দেশ্য— যারা দুনিয়ার মহব্বতে নিমজ্জিত হয়ে আখেরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে গাফেল। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে দু'বার 'আল্লাজীনা' উল্লেখ করে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে সকল কাফেরকে। তাদের দোষ ত্রুটি অফুরন্ত

তাই সংযোজক অব্যয়ের (হরফে আতফের) মাধ্যমে, অর্থাৎ 'এবং' সহযোগে বাক্য দু'টোকে সংযোজিত করা হয়েছে। যেমন, একটি কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইলাল মালিকিল কারিমি ওয়াব্‌নিল হিমামি ওয়া লাইসাল কুতাইবাতু ফিল মুজদাহাম (মহান প্রাণ প্রিয় ও মহা প্রতাপশালী এবং রণপ্রান্তরে ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কারক নৃপতির প্রতি)। এখানে বিশেষণগুলি একইজনের। অথচ সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'রিজা' অর্থ আশা, ভয় অথবা লোভ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে— তাদের না আছে আমার শাস্তির ভয়, না আছে আমার সওয়াবের লোভ। তাই আখেরাতের কোনো প্রস্তুতিই তাদের নেই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আন আয়াতিনা' (আমার নিদর্শনা-বলী) অর্থ রসুলপাক স. অথবা কোরআন মজীদ। এভাবে 'যারা আমার নিদর্শনা-বলী সম্বন্ধে অনবধান' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— যারা আমার রসুল ও কোরআন সম্পর্কে বেখবর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯, ১০

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

☐ যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের বিশ্বাস হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে।

☐ সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে 'হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র !' এবং সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদিগের শেষ ধ্বনি হইবে 'প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহের প্রাপ্য!'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণগণের শুভ পরিণামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ' তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাস হেতু তাদেরকে পথ নির্দেশ করবেন'। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ করবেন' কথাটির অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে পুলসিরাত অতিক্রমের সময় সঠিক পথের নির্দেশ দিবেন। তখন তাঁদেরকে দেয়া হবে একটি নূর। ওই নূরের আলোকে পথ দেখে দেখে তাঁরা সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন জান্নাতে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ

করবেন' অর্থ যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা সঠিক ধর্মবোধ দান করবেন। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে তার শরীর সহযোগে উত্তম আমল করবে, আল্লাহ্পাক তাকে দান করবেন অজানা জ্ঞান। কথাটি আবু নাঈম উল্লেখ করেছেন তাঁর হুলিয়া পুস্তকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ইয়াহ্‌দিহিম (পথ নির্দেশ করবেন) কথাটির অর্থ আল্লাহ্পাক তাদেরকে দান করবেন পুণ্য ও প্রতিদান। তাঁদেরকে পৌঁছে দিবেন কাঙ্খিত জান্নাতে।

বায়যাবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যের বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, পথপ্রদর্শন বা হেদায়েতের চিরন্তন ভিত্তি হচ্ছে ইমান। আর পুণ্যকর্মসমূহ ওই ইমানের বিস্তার, পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য।

এরপর বলা হয়েছে — 'সুখদ কাননে তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।' এখানে 'তাহাত' (নিচে) শব্দটির অর্থ হবে 'সম্মুখে।' নহর বা নদী সম্মুখভাগেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এখানে 'পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে' কথাটির অর্থ হবে— তাদের সম্মুখভাগে প্রবাহিত হবে নদী।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে—'সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! এবং তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে, প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।' এ কথার অর্থ— জান্নাতে জান্নাতবাসীরা উচ্চারণ করবেন, হে আল্লাহ্! তুমি সকল অসুন্দর অবস্থা থেকে পবিত্র। সকল ক্ষয়ক্ষতি ও বিনষ্টি থেকে তুমি পাক। তুমি মহান। বাগবী লিখেছেন, তাফসীরকারগণ বলেন, বেহেশতবাসীরা পানাহার করতে চাইলে উচ্চারণ করবেন 'সুবহানাকাল্লহুম্মা', পরিচারকেরা তখন বুঝতে পারবে তাঁরা কি চান। তৎক্ষণাৎ তারা বেহেশতবাসীদের কাঙ্খিত খাদ্য সম্ভারের আয়োজন করবে। খাদ্যাধারগুলো হবে এক বর্গমাইল পরিসরের। প্রতিটি খাদ্যাধারের বিভাগ থাকবে সত্তর হাজার। প্রতি বিভাগে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও প্রকৃতির খাদ্য। সেগুলোর স্বাদও হবে পৃথক পৃথক। পানাহার শেষে তাঁরা আল্লাহ্পাকের প্রশংসা করবেন এভাবে— 'ওয়া আখিরু দাওয়া হুম আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (তাঁদের শেষ প্রার্থনা হবে— সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভুপালয়িতা)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বেহেশতবাসীরা আহারের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলবেন, 'সুবাহানাকাল্লহুম্মা।' এতে করে তাঁদের আহার্য হয়ে উঠবে অধিকতর আস্বাদ্য। হজরত জাবের থেকে সর্বোন্নত সূত্রে মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু 'সুবহানাল্লহ্ ও আলহামদুলিল্লাহ্' এলহাম হতে থাকবে।

বেহেশতবাসীদের অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন হবে 'সালাম'। একে অপরের উদ্দেশ্যে বলবে 'সালাম'। ফেরেশতারাও বলতে থাকবে 'সালামুন আ'লাইকুম বিমা সাবারতুম' (তোমাদের উপরে শান্তি যেমন তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে)। আর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সালামবাহী ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহ্পাক আপনাদেরকে 'সালাম' বলেছেন (সুসংবাদের সঙ্গে নিরাপত্তা দান করেছেন)।

হজরত জাবের থেকে ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। অকস্মাৎ ঊর্ধ্বদেশে প্রজ্জ্বলিত হবে একটি নূর। তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে আনুরূপ্যবিহীন সেই পবিত্র সত্তা তাঁর অতুলনীয় সৌন্দর্য নিয়ে জ্যোতিষ্মান। শুনতে পাবে— আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল জান্নাত (হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের উপরে শান্তি)। এ কথার প্রকৃত অর্থ হবে— 'সালামুন ক্বাওলাম মির্রব্বির রহীম' (দয়াময় প্রভুপালকের কথায় তোমাদের উপরে শান্তি)।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ, বায্যার ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে দরিদ্র মুহাজিরবৃন্দ— যারা পৃথিবীতে ইসলামকে মহিমান্বিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো এবং যারা নিজেকে সংরক্ষণ করেছিলো সকল অসুন্দর বিষয়াবলী থেকে। তারা দেখাতে চাইতো ইসলামের প্রতি অপরিসীম ত্যাগ তিতীক্ষা। কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে তারা তাদের হৃদয়ের অভিলাষ বাস্তবায়ন করতে পারতো না। এভাবে পৃথিবী পরিত্যাগ করতো অভিলাষাহত হয়ে। বেহেশতে প্রবেশ করার পর নির্দেশিত ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম পৌছাবে। আল্লাহ্ ওই ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন, মুহাজিরদের নিকটে যাও। তাদেরকে আমার সালাম পৌছাও। ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে করেছো আকাশের অধিবাসী। আমরা কি মর্ত্যবাসীদের নিকটে তোমার সালাম পৌছাবো! আল্লাহ্পাক বলবেন, তারা আমার ইবাদত ছাড়া আর কারো ইবাদত করেনি। আমার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীও সাব্যস্ত করেনি। পৃথিবীতে তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছিলো অনেক সীমাবদ্ধতা। তবুও তারা নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছিলো অযথার্থ বিষয়াবলী থেকে। সত্যের মহিমা সমুন্নত করবার জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করার বাসনা ছিলো তাদের অন্তরে। সেসকল বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আগেই আমি সাঙ্গ করে দিয়েছি তাদের পৃথিবীর জীবন। তাই তাদের অন্তরে রয়েছে সীমাহীন অতৃপ্তি। ফেরেশতারা তখন জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, সালামুন আ'লাইকুম বিমা সবার্তুম ফানি'মা উক্ববাদ্দারি (তোমাদের উপরে শান্তি যেমন তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, কতোইনা উত্তম পরকালের জীবন)।

'ওয়া আখিরু দা'ওয়া হুম আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' অর্থ— এবং তাদের শেষ উচ্চারণ হবে, প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য। অর্থাৎ যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্তায়ালার অনির্বচনীয় মহিমা ও মাহাত্ম অবলোকন করবে, তখন তারা বর্ণনা করতে শুরু করবে, আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ও প্রশংসা। এরপর আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করবে তাদের সম্মান ও প্রশান্তির শুভ সংবাদ। তখন বেহেশতবাসীরা বর্ণনা করবে আল্লাহ্তায়ালার শুভ স্তুতি এবং প্রশস্তি।

বাগবী লিখেছেন, বেহেশতবাসীদের ওই প্রশস্তি শুরু হবে 'সুবহান আল্লাহ্' বলে এবং সমাপ্ত হবে 'আলহামদু লিল্লাহ্' উচ্চারণের সঙ্গে। এর মধ্যে তাঁরা অন্য যা কিছু চান, তা বলতে পারবেন।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১১, ১২, ১৩, ১৪

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ
فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○ وَاِذَا مَسَّ
الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ
مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ○ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○
ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

❑ আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন যেভাবে তাহারা তাহাদিগের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিই।

❑ এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে; অতঃপর যখন আমি তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তাহার পূর্বপথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদিগের কর্ম তাহাদিগের নিকট এইভাবে শোভন প্রতীয়মান হয়।

❑ তোমাদিগের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❑ অতঃপর আমি উহাদিগের পর দুনিয়ায় তোমাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছি, দেখিবার জন্য তোমরা কী প্রকার আচরণ কর।

মানুষ রাগের মাথায় নিকটজন বা প্রতিবেশীকে অভিশাপ দেয়। বলে, তোমার উপর আল্লাহ্র গজব পড়ুক, তুমি ধ্বংস হও ইত্যাদি। এ রকম পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে অবতীর্ণ হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটি। এ রকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতটির অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, মানুষ যখন বদদোয়া করে, তখন সে চায় তাড়াতাড়ি দোয়ার ফল প্রকাশিত হোক— যেমন তাড়াতাড়ি কবুল করা হয় নেক দোয়া। লক্ষ্যণীয় যে, নেক দোয়া দ্রুত কবুল হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু নেক দোয়ার প্রতিফল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। বলা হয়েছে বদ্দোয়া দ্রুত কবুল করলে ধ্বংস নেমে আসবে যদি তা নেক দোয়ার মতো দ্রুত কবুল করা হয়। কিন্তু নেক দোয়া কবুল করলে কি ঘটবে তার উল্লেখ এখানে নাই। এভাবে বাক্যটিকে এখানে করা হয়েছে সংক্ষেপিত।

এক বর্ণনায় এসেছে, নজর বিন হারেস একবার বললো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যে কথাগুলোকে তোমার কথা রূপে প্রচার করছে, সেগুলো যদি সত্যিসত্যিই তোমার কথা হয়, তবে আকাশ থেকে আমার উপরে পাথর বর্ষণ করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো— 'আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেভাবে তারা তাদের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায় তবে তারা ধ্বংস হয়ে যেতো।'

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং যারা আল্লাহ্র সাক্ষাতের ভয় করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেই।' এ কথার অর্থ— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অন্তরে আমার ভয় নেই। তারা 'আমার প্রতি পাথর বর্ষণ করো' এ রকম কথা বললেও আমি তার বাস্তবায়ন ঘটাই না। বরং তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই তাদেরকে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেই (যাতে করে তাদের পেরেশানী ও পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে, পাপের শাস্তি তো নিশ্চিত)।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাকে ডেকে থাকে; অতঃপর আমি যখন তার দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করি, সে তার পূর্ব পথ অবলম্বন করে, যেনো তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিলো তার জন্য সে আমাকে ডাকেইনি।' এখানে 'আদ্দুর্রু' কথাটির অর্থ দুঃখ-দৈন্য। মানুষের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই আয়াতে। বলা হয়েছে, হে মানুষ! তুমি বিপদে পড়লে উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করতে থাকো। বার বার সাহায্যের জন্য হন্যে হয়ে দোয়া করতে থাকো। আর আমি বিপদ দূর করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাও আমাকে। ভাবসাব দেখে তখন মনে হয় তুমি যেনো আমার নিকট কখনোই বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করোনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা সীমালংঘন করে তাদের কর্ম তাদের নিকট এভাবে শোভন প্রতীয়মান হয়।' এ কথার অর্থ— সীমালংঘনকারীরা আপন আকাঙ্খার উপাসক। আপন প্রবৃত্তির পূজক। তাই তাদের সকল কর্ম তাদের চোখে সুন্দর।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তোমাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রসুল এসেছিলো, কিন্তু তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! জেনে রাখো, তোমাদের মতো সীমালংঘনকারী অনেক মানব গোষ্ঠীকে ইতোপূর্বে আমি ধ্বংস করেছি। তোমাদের নিকটে যেমন রসুল প্রেরণ করেছি, তেমনি রসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদের প্রতিও। কিন্তু তারা আমার প্রেরিত রসুলকে মান্য করেনি। এভাবে তারা হয়ে গিয়েছিলো শাস্তির উপযুক্ত। তাই যথাশাস্তিই আমি তাদেরকে দিয়েছি। অবাধ্যদেরকে এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি।

'তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিলো না'— এ ধরনের কথা অন্য এক আয়াতেও বলা হয়েছে এভাবে— 'ওয়ামা কুন্না মুয়াজ্‌জিবীনা হাত্তা নাআসা রসুলা (আমি রসুল প্রেরণ ব্যতীত তাদের শাস্তিদাতা ছিলাম না)। এ কথার অর্থ— তাদের ভাগ্যে ইমান ছিলোই না। তাদের সম্পর্ক ছিলো আল্লাহ্‌পাকের এক নাম আলমুদ্বিল্লুন (গোমরাহ্‌কারী) এর সঙ্গে। আর এই নামের সঙ্গে সম্পর্কধারীরা ইমান আনবে কিভাবে ? কারো পক্ষে স্বসত্তার সূচনাচ্যুত হওয়া কি সম্ভব ? এ রকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আদি অন্তের সকল কিছু জানেন। তাই তিনি এ কথাও ভালো করে জানেন যে, কে ইমান আনবে এবং কে ইমান আনবে না। কে মৃত্যুবরণ করবে অবিশ্বাসী অবস্থায় এবং কে শাস্তির উপযুক্ত। নবী রসুলগণকে অস্বীকার করার শাস্তি হচ্ছে ধ্বংস। সেই ধ্বংসের মধ্যেই নিপতিত করা হয়েছে তাদেরকে। আলোচ্য আয়াতের শেষে তাই বলে দেয়া হয়েছে— এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

এর পরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের পর দুনিয়ায় তোমাদেরকে প্রতিনিধি করেছি, দেখবার জন্য তোমরা কী প্রকার আচরণ করো।' এ কথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করার পর আমি এখন পৃথিবীতে এনেছি তোমাদেরকে। এখন তোমাদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করা হবে যে, তোমরা আমার রসুলের অনুসরণ করো কিনা। আমার রসুলের মাধ্যমে প্রবর্তিত ধর্মকে গ্রহণ করো কিনা। তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের স্থলবর্তী। এখন তোমরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো— কি করবে তোমরা, কোথায় যাবে? সফলতার দিকে? না ধ্বংসের দিকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া সুমিষ্ট ও সতেজ। আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত। এখন আল্লাহ্‌পাক দেখবেন, তোমরা কাকে গ্রহণ করো (ভালো আমলকে না মন্দ আমলকে)?

وَاِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیَاتُنَا بَیِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِیۡنَ لَا یَرۡجُوۡنَ لِقَآءَنَا ائۡتِ بِقُرۡاٰنٍ غَیۡرِ هٰذَاۤ اَوۡ بَدِّلۡهُ ؕ قُلۡ مَا یَکُوۡنُ لِیۡۤ اَنۡ اُبَدِّلَهٗ مِنۡ تِلۡقَآیِٔ نَفۡسِیۡ ۚ اِنۡ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ ۚ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اِنۡ عَصَیۡتُ رَبِّیۡ عَذَابَ یَوۡمٍ عَظِیۡمٍ ○

❒ যখন আমার আয়াত, যাহা সুস্পষ্ট, তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাহারা বলে, 'অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও।' বল, 'নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি তাহারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতি-পালকের অবাধ্যতা করিলে আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।'

কাতাদা বলেছেন, এই আয়াতের লক্ষ্য মক্কার মুশরিকেরা। মুকাতিল বলেছেন, মাকরাজ বিন হাফস, আমর বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবু কাবিস আমেরী, আস বিন আমের বিন হিশাম, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মাখজুমী এবং ওলিদ বিন মুগীরা— এ পাঁচজনকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তারা আল্লাহ্র সাক্ষাতকে ভয় করে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র শাস্তি, হাশর, কিয়ামত কোনো কিছুকেই স্বীকার করতো না । তারা ছিলো মূর্তিপূজক। একদিন তারা রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! তুমি ইচ্ছে করলেই আমরা তোমার উপর ইমান আনতে পারি। যে কোরআন তুমি পাঠ করো সেই কোরআনকে পরিত্যাগ করো। নতুন কোনো কোরআন আনো, যে কোরআনে আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর উপাসনার ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ রকম কোরআন না পাও তবে তুমি তোমার নিজের পক্ষ থেকে নতুন একটি কোরআন তৈরী করে নাও। হারামসমূহকে করো হালাল এবং হালালসমূহকে করো হারাম। আযাবের আয়াতসমূহকে করো রহমতের আয়াত আর রহমতের আয়াতগুলোকে করো আযাবের আয়াত। এ রকম যদি করো তবে তোমার উপরে আমরা সহজেই ইমান আনতে পারবো। পাঁচ মুশরিকের এমতো বাতুল বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক অবতীর্ণ করলেন 'যখন আমার আয়াত, যা সুস্পষ্ট, তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তারা বলে, এটা ছাড়া অন্য এক কোরআন আনো অথবা এটাকে বদলাও।'

আয়াতের শেষাংশে মুশরিকদের কথার জবাব কিভাবে দিতে হবে, সে কথা আল্লাহ্পাক জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে— 'বলো, নিজে থেকে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি তারই অনুসরণ করি। আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে,আমি আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।' এ কথার অর্থ, হে আমার রসুল! আপনি বলে দিন, আমি এই কোরআনের কোনো একটি আয়াতও বদলাতে পারি না। সম্পূর্ণ কোরআন বদলানো তো দূরের কথা। এ রকম কর্ম মানুষের সাধ্যের অতীত। আমি তো কেবল প্রত্যাদেশানুসারে চলি। আমি যে তাঁর রসুল। আর প্রত্যাদেশ ছাড়া স্বমতে চলা কোনো নবী রসুলের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তোমাদের মতো অজ্ঞ, মূর্খ, অপরিণামদর্শী ও অবাধ্য নই। তাই তোমরা যা বলো, আমি তা চিন্তাও করতে পারি না। আমি তো ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১৬

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

❒ বল, 'আল্লাহের সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমি তোমাদিগের নিকট ইহা পাঠ করিতাম না এবং তিনি তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি; তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না?'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! যারা আপনাকে কোরআন বদলাতে বলে ওই সকল মুশরিককে বলে দিন, যদি আল্লাহ্তায়ালা আমার এই কোরআনের প্রচারকে পছন্দ না করতেন তবে আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণই করতেন না। সে রকম হলে আমি তো তোমাদের নিকটে কোরআন পাঠ করার সুযোগও পেতাম না। নিজে নিজে যদি কোরআন প্রস্তুত করে পাঠ করার চেষ্টা করতাম তবে আল্লাহ্তায়ালা আমার কণ্ঠকে করে দিতেন চিরস্তব্ধ। অথবা কোরআন সম্পর্কে আমাকে অবহিতই করতেন না। আমি তো তোমাদের সামনে চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছি। এই চল্লিশ বছর ধরে আমার নিকটে কোনো ওহী (প্রত্যাদেশ) আসেনি। তাই তোমাদেরকে এ সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টাও করিনি। এখন তোমাদের সামনে আমি অবতীর্ণ আয়াতসমূহ পাঠ করি। এটাকি আল্লাহ্তায়ালার অলৌকিক নিদর্শন নয়? তোমাদের মতো অক্ষরের মুখাপেক্ষী আমি নই। অক্ষরের মুখাপেক্ষী কোনো জ্ঞানীর সংস্পর্শ থেকে আমাকে পবিত্র রাখা হয়েছে। আরো স্মরণ করো, আমি কি কখনো কোনো কবিতা রচনা করেছি? তোমাদেরকে অক্ষয় বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছি? করিনি। আজ দ্যাখো আমার মুখে পবিত্র কোরআনের আয়াত উচ্চারিত হয়— যে আয়াতের বাণী-বৈভব অন্য সকল বাণীকে করে দিয়েছে ম্লান, নিষ্প্রভ। এতে রয়েছে অতীত ও

ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্বস্ত বিবরণ। আছে নির্ভুল বিধি-বিধান। এ রকম জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনার সাধ্য কি কারো আছে? নেই। অতএব হে মক্কাবাসী! সুবিবেচক হও। এ কথা স্বীকার করো যে, এই মহাগ্রন্থ কোনো মানব রচিত গ্রন্থ হতেই পারে না। নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে মহাবিশ্বের একক অধীশ্বর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।

দ্রষ্টব্যঃ রসুল স. এর উপরে ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতে শুরু করে তাঁর চল্লিশ বছর বয়সের সময়। এরপর তিনি স. মক্কায় অবস্থান করেছিলেন তেরো বছর। তারপর হিজরত করে মদীনায় যান। সেখানে অবস্থান করেন দশ বছর। পবিত্র মহাপ্রয়াণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো তেষট্টি বছর। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন মুসলিম।

মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর বর্ণনায় এসেছে, সকল আলেম এব্যাপারে একমত যে, হিজরতের পর রসুল স. মদীনায় বসবাস করেছিলেন দশ বছর। প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন মক্কায় চল্লিশ বছর বয়সে। প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পর মক্কায় কত বছর ছিলেন, সে সম্পর্কে অবশ্য মতপ্রভেদ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, ওহী লাভের পর তিনি স. মক্কায় ছিলেন তেরো বছর।

হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, প্রত্যাদেশ লাভের পর রসুল স. মক্কায় ছিলেন দশ বছর। আর তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁর ষাট বছর বয়সে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ, ওমর ইবনে শায়বা এবং হাকেমও এ রকম উল্লেখ করেছেন। বাগবী লিখেছেন, প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক নির্ভরোপ-যোগী। হজরত আনাস থেকে মুসলিম লিখেছেন, ইন্তেকালের সময় রসুল স. এর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বৎসর। হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরও ইন্তেকাল করেছিলেন ৬৩ বৎসর বয়সে।

হজরত মুয়াবিয়া বিন আবী সুফিয়ান থেকে আবু দাউদ ও তা'লাসী লিখেছেন, রসুলপাক স., হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরের পৃথিবীর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। জননী আয়েশা থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. এর মহাতিরোধান ঘটেছিলো ৬৩ বছর বয়সে। আল্লামা নববী বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ, প্রসিদ্ধ ও ঐকমত্যসম্মত।

আহমদ ও মুসলিম লিখেছেন, আম্মার বিন আবী আম্মার বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, হে ইমাম! শেষ যাত্রার সময় রসুল স. এর বয়স কতো ছিলো ? তিনি বললেন, গণনা করো— চল্লিশ বছরে নবুয়ত প্রাপ্তি, তারপর পনেরো বছর মক্কায়, দশ বছর মদীনায়— কতো হলো?

হাকেম তাঁর 'ইকলিল' পুস্তিকায় আলী ইবনে আবী জায়েদের মধ্যস্থতায় ইউসুফ বিন মেহরানের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর পৃথিবীর আয়ু ছিলো ৬৫ বছর। কিন্তু হাকেম ও নববী মন্তব্য করেছেন, ঐকমত্যোৎসারিত অভিমত এই যে, তিনি দুনিয়ায় ছিলেন ৬৩ বছর। ৬৫ বছরের কথাটি অবাস্তব। ৬৫ বছরের বর্ণনাটিও অনুমান নির্ভর। হজরত ইবনে আব্বাসের ৬৫ বছর সম্পর্কিত বর্ণনাটিকে অস্বীকার করেছেন

ওরওয়া। বর্ণনাটিকে তিনি ভুলও প্রমাণ করেছেন। বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস নবুয়তের সূচনাকালে জন্মগ্রহণই করেননি। আবার মোহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহীর মাধ্যমে বর্ণিত হজরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ হাদিসে এসেছে ৬৩ বছরের কথা। এতে করে বোঝা যায়, হজরত ইবনে আব্বাস প্রথম দিকে হয়তো ৬৫ বছরের কথাই বলতেন। পরে তিনি অধিকাংশের বর্ণনাকে জানিয়েছিলেন স্বাগতম।

কাযী আয়াযের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, রসুল স. নবুয়ত লাভ করেছিলেন ৪৩ বছর বয়সে। বর্ণনাটি বিরল। তবে ৪০ বছরে নবুয়ত প্রাপ্তির তথ্যটিই অধিকতর শুদ্ধ।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُوْنَ ○ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَ
يَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ وَمَا كَانَ
النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ
بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

❒ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

❒ উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ইবাদত করে তাহা উহাদিগের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। উহারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহের নিকট আমাদিগের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র।' এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

❒ মানুষ ছিল এক জাতি, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতি-পালকের পূর্বঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে— মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

❒ উহারা বলে, 'তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, 'অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহেরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে এ রকম বলে যে, আল্লাহ্র পরিবার পরিজন ও সন্তান আছে এবং যে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শন? সে তো সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী। আর অপরাধীরা কস্মিনকালেও সফল হয় না।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। তারা বলে, এগুলো আল্লাহ্র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' এ কথার অর্থ— মক্কাবাসী মুশরিকেরা কতই না অজ্ঞ! পাথরের মূর্তির সামনে তারা তাদের মস্তক অবনত করে। কেনো করে? একবার কি তারা এ কথা ভেবেও দেখবে না যে, নিস্প্রাণ কোনো বস্তু কখনোই কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। উপাসনার উপযোগী তো ওই সত্তা যিনি চিরঞ্জীব, যিনি উপকার ও অপকার করতে সক্ষম। যিনি তাঁর উপাসকদের প্রয়োজন পূরণ করেন। তারা আবার এমনও বলে, আমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে— দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো তোমরা কি আল্লাহ্কে আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র। এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি ঊর্ধ্বে।' এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি ভেবেছো, আল্লাহ্পাক সর্বজ্ঞ নন? আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি কি অনবগত? তাই কি তোমরা আকাশের ফেরেশতা এবং পৃথিবীর নিস্প্রাণ বিগ্রহগুলোকে তাঁর অংশী সাব্যস্ত করতে চাও? অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কখনো তার স্রষ্টার অংশ হতে পারে না। তিনি তো তোমাদের অংশীবাদিতাজাত অপবিত্র ও অযথার্থ ধারণা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি তো মহান, পবিত্র।

এর পরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'মানুষ ছিলো এক জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে।' 'ওয়ামা কানান্ নাসু ইল্লা উম্মাতান ওয়াহিদান' অর্থ, মানুষ ছিলো এক জাতি। 'ফাখতালাফু' অর্থ, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। এ কথার

অর্থ, হজরত আদম থেকে হজরত নূহের সময় পর্যন্ত সকল মানুষ ছিলো এক আল্লাহ্‌র উপাসক, পরে সৃষ্টি হয় মতপৃথকতা। অথবা হজরত ইব্রাহিমের পর থেকে আমর বিন লুহাইয়ের জামানা পর্যন্ত সকলে ছিলো এক মুসলিম জাতিভুক্ত। পরে কেউ কেউ মূলস্রোত থেকে পৃথক হয়ে যায়। অথবা এখানে কোনো এক নির্দিষ্ট উম্মতকে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা প্রথমে থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর একতাবদ্ধ। তারপর তাদের নবী-রসুল কেউ আবির্ভূত হলে তাদের সে ঐক্যে দেখা দেয় ফাটল। এক দল স্বীকৃতি দান করে। আর এক দল থেকে যায় পূর্ববৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এভাবে এক জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় বিভেদ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তার মীমাংসা তো হয়েই যেতো।' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনতা! ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্‌পাক তওবা করার জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কিছুদিন অবকাশ দিয়ে থাকেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দয়ার্দ্র নির্ধারণ। অতীত উম্মতদেরকে এ রকম সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখন দেয়া হচ্ছে তোমাদেরকেও। এই অবকাশ দানের বিষয়টি আল্লাহ্‌পাক পূর্বাহ্নে নির্ধারণ না করলে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে যেতো সহজেই। সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসতো আযাব।

হাসান বসরী বলেছেন, এটা আল্লাহ্‌র চিরন্তন সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবীতে তিনি সওয়াব ও আযাবের কার্যকারিতা প্রকাশ করবেন না। দান করবেন না চূড়ান্ত *সিদ্ধান্ত। চূড়ান্ত মীমাংসার সময় হচ্ছে আখেরাত। সেখানেই দেয়া হবে বেহেশত* ও দোজখের চূড়ান্ত ঘোষণা।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেনো? বলো, অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মোহাম্মদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের পছন্দমতো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয় না কেনো'— এ রকম কথা যারা বলে তাদেরকে জানিয়ে দিন, কখন, কার জন্য, কী ভাবে, কোন আয়াত অবতীর্ণ করতে হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। সত্তাগত ও স্বয়ম্ভূরূপে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী কেবল তিনিই। সুতরাং তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানের যথাপ্রতিফলের জন্য অপেক্ষা করো। তোমাদের সঙ্গে আমিও প্রতীক্ষায় রইলাম।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۗ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۗ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ○

❒ এবং আমি মানুষকে, তাহাদিগের দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর, অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বল, আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তিদানে আরও তৎপর। তোমরা যে বিদ্রূপ কর তাহা আমার ফেরেশতাগণ লিখিয়া রাখে।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো। আল্লাহ্ দয়া করে তাদের উপর থেকে দুর্ভিক্ষ অপসারিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রদর্শন করতে লাগলো অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ্‌পাকের দয়াকে নিয়ে শুরু করলো বিভিন্ন প্রকার ঠাট্টাবিদ্রূপ। বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কার অংশীবাদীদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌঁছলে অতিষ্ঠ হয়ে রসুল স. অপপ্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! হজরত ইউসুফের সময় যেমন তুমি একটানা সাত বছর দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে, তেমনি উদ্ধত মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করে আমাকে সাহায্য করো। তাঁর দোয়া কবুল হলো। নেমে এলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন চরমে পৌঁছলো যে, চামড়া ও মৃত জন্তু ভক্ষণ ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। আবু সুফিয়ান রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, মোহাম্মদ! দেখছো কি নিদারুণ অবস্থা। দুর্ভিক্ষ অপসারণের জন্য দোয়া করো। আল্লাহ্‌পাক তো তোমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল স. দোয়া করলেন। দূর হয়ে গেলো জীবনহারক দুর্ভিক্ষ। আর এক বর্ণনায় এসেছে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অংশীবাদীরা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর থেকে এই শাস্তিটি সরিয়ে নাও, আমরা ইমান আনবো। আল্লাহ্‌পাক রসুল স. কে জানিয়ে দিলেন তারা ইমান আনবে না। তাই হলো। দুর্ভিক্ষ অপসারণের পর অংশীবাদীরা শুরু করে দিলো বিভিন্ন রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ। সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আঁকড়ে ধরলো আরো শক্ত করে। আল্লাহ্‌পাক এর জন্য তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধের সময়।

উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'এবং আমি মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তৎক্ষণাৎ আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে।' এখানে উল্লেখিত 'দ্বররাআ' শব্দটির অর্থ, দুঃখ-দৈন্য— দারিদ্র, পীড়া, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জীবনাশংকা ইত্যাদি। আর 'রহমত' অর্থ অনুগ্রহ— স্বচ্ছলতা, সুস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সফলতা ইত্যাদি।

ঠাট্টা বিদ্রূপ বুঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'মকর' শব্দটি। মকরের প্রকৃত অর্থ— গোপনে কারো ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। অংশীবাদীরা প্রকাশ্যতঃ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতো। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতো রসুল স. এর সঙ্গে। আর তাদের এমতো ঔদ্ধত্য তো ছিলো পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিই। এভাবে তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে।

মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে দিয়েছিলেন বৃষ্টি। ফল ও ফসলের সমারোহ জেগে উঠেছিলো শস্যপ্রান্তরে। দুর্ভিক্ষও দূর হয়ে গিয়েছিলো সহজে। কিন্তু তারা এর জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং ঠাট্টা বিদ্রূপের সুরে বলেছে, আরে বৃষ্টি তো বর্ষিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। তাদের এমতো আচরণকেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মকর— প্রতারণা, চালাকী বা বিদ্রূপ।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তি দানে আরো তৎপর।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্‌পাক সকল বিষয়ে তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক পারদর্শী। তোমাদের বিদ্রূপের প্রতিবিদ্রূপ বা শাস্তি দানেও তো তিনি তৎপর। এই তৎপরতা আপাত-দৃশ্যমান না হলেও মনে রেখো, তোমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে শাস্তির বৃত্তে। যথাসময়ে নিশ্চয় তা কার্যকর করা হবে। হজরত আলী বলেছেন, যাকে সুপরিসর পৃথিবী দেয়া হয়েছে, সে বুঝতে পারে না যে, সে বন্দী হয়েছে আল্লাহ্‌র গোপন কৌশলে। আমি বলি, পৃথিবীর বিত্তবৈভব ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পর কেউ যদি আল্লাহ্‌তায়ালার কৃতজ্ঞতাভাজন না হতে পারে, তবে বুঝতে হবে সে জড়িত হয়েছে আল্লাহ্‌র আযাবের ফাঁদে।

কেউ কেউ 'শাস্তি দানে তৎপর' কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সত্যকে ধ্বংস করে দেয়ার যে ষড়যন্ত্র সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা করে, তার চেয়ে অতি দ্রুত তাদের উপরে এসে পড়বে আল্লাহ্‌র শাস্তি। এ রকম করতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম। আল্লাহ্‌র সে শাস্তি অপসারণ করার সাধ্য তাদের নেই। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌র তৎপরতার তুলনায় তাদের তৎপরতা অতি মন্থর। বরং তাদের তৎপরতা তৎপরতাই নয়।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিদ্রূপ করো তা আমার ফেরেশতাগণ লিখে রাখে।' এ কথার অর্থ— হে অংশিবাদীরা শুনে নাও, পরিত্রাণের কোনো পথই তোমাদের জন্য খোলা নেই। আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারা তোমাদের অপতৎপরতা ও অবাধ্যতাগুলো লিখে রাখছে। তাদের নিকটেই তোমরা তোমাদের অপরাধ ঢেকে রাখতে পারছো না। তাহলে আমার নিকটে কীভাবে গোপন রাখবে?

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰىٓ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

❐ তিনি তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমন করান, এবং তোমরা যখন নৌকা-রোহী হও এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আল্লাহের আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া ডাকিয়া বলেঃ তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

❐ অতঃপর, তিনি যখনই উহাদিগকে বিপদ-মুক্ত করেন তখনই উহারা দেশে অন্যায়ভাবে জুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদিগের জুলুম বস্তুতঃ তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে; পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করিয়া লও, পরে আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

'হুওয়াল্লাজী ইউসায়্যিরুকুম ফিল বাররি ওয়াল বাহারি' অর্থ— তিনি তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমন করান। অর্থাৎ তোমাদের সকল ভ্রমনকে আল্লাহ্তায়ালাই নির্বিঘ্ন করেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'হাত্তা ইজা কুনতুম ফিল ফুল্‌ক' (এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও)। এ কথার অর্থ— তোমরা যখন নৌকা কিংবা কোনো জলযানে তোমাদের সফর শুরু করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং এগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে বয়ে যায় এবং তারা তাতে আনন্দিত হয়, অতঃপর এগুলো বাত্যাহত এবং সবদিক দিয়ে তরঙ্গাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ডেকে বলেঃ তুমি আমাদেরকে এ থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— অনুকূল বাতাসে যখন জলযানগুলো চলে, তখন আরোহীরা হয় আনন্দিত। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাঘাতে ভয়ংকরভাবে দুলতে থাকে তাদের তরণী, তখন আরোহীরা যায় ঘাবড়ে। বিপদমুক্তির জন্য বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। বলে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে বাঁচাও। এ যাত্রা আমরা যদি রক্ষা পাই, তবে আমরা অবশ্যই হবো কৃতজ্ঞচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, আরবের অংশীবাদীরা এ রকম করতো। তারা মূর্তিপূজারী হলেও সমুদ্রের ঝড়ে পড়লে তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে ডাকতো না। ডাকতো কেবল আল্লাহ্‌কে। আল্লাহ্‌ইতো একমাত্র পরিত্রাতা। কিন্তু এ কথা তারা বিপদে পড়লে বুঝতো। বিপদ কেটে গেলে পুনরায় শুরু করতো পূজাপার্বন। সেকথাই বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা দেশে অন্যায়ভাবে জুলুম করতে থাকে।' এখানে 'ইউবগুনা ফিল আরদ্বি' অর্থ, দেশে জুলুম করে। 'গইরিল হাক্ক' অর্থ অন্যায়ভাবে। এভাবে 'গইরিল হাক্ক' কথাটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, জুলুম বা ফেত্‌না ফাসাদ অবশ্য অবশ্যই অন্যায়। এখানে এ রকম একটি প্রশ্ন উদ্ভবের সুযোগও থেকে যেতে পারে যে, মুসলমানেরা যে জেহাদের সময় অনেক জনপদ ও সম্পদ ধ্বংস করে। তাদের এসকল কাজ কি জুলুম নয়? উত্তরে বলতে হয়, অবশ্যই নয়। কারণ জেহাদ করা হয় এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিকৃত বিশ্বাসের সংশোধন, অহংকার ও অকৃতজ্ঞতার অবদমন— এ রকম বহুবিধ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পাদিত হয় জেহাদ। আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনই থাকে জেহাদের মূল লক্ষ্য। প্রবৃত্তিপ্রসূত ফেত্‌না ফাসাদ সম্পূর্ণতই জেহাদের বিপরীত ধর্মী একটি বিষয়। সুতরাং বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্য সত্ত্বেও জেহাদ ও ফেত্‌না কখনো এক নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমাদের জুলুম বস্তুতঃ তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে।' এ কথার অর্থ— হে অপরিণামদর্শী মানুষ! তোমরা অন্যের উপর জুলুম করো, কিন্তু এ কথা জানো না যে, তোমাদের জুলুমের আসল প্রতিক্রিয়া পতিত হয় তোমাদেরই উপর। জুলুমের গোনাহ্ ও শাস্তি ভোগ করবে কে? তোমরাই তো।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা থেকে উত্তম সূত্রে তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকে উত্তম কর্ম সমূহের পরিণাম ভোগ করে,

তেমনি ভোগ করে তার অন্যায়ের প্রতিফল। আবু শায়েখ, খতিব ও ইবনে মারদুবিয়া তাঁদের আপনাপন তাফসীর গ্রন্থে হজরত আনাস থেকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কর্ম সম্পাদনকারীর উপরেই পতিত হয় তিনটি কর্ম—নির্যাতন, প্রতারণা ও শোষণ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে লাআলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের উপর নির্যাতন চালাতো তবে, নির্যাতক পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে যেতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও। পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবো তোমরা যা করতে।' এ কথার অর্থ— হে অকৃতজ্ঞ, অপরিণামদর্শী ও অবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী! ঠিক আছে, পার্থিব ভোগ বিলাসের মধ্যেই ডুবে থাকো। মৃত্যু পর্যন্ত দেয়া হলো এই অবকাশ। এরপর মৃত্যু-উত্তর জীবনে পুনরুত্থান দিবসে তো তোমাদেরকে আসতেই হবে কর্মফল গ্রহণের জন্য। তখন আমি তোমাদেরকে ভালো করেই জানিয়ে দিবো— পৃথিবীতে কী জঘন্য অপকর্মে নিয়োজিত ছিলে তোমরা।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৪, ২৫

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْدِىْ مَنْ
يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

❑ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করি এবং যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর, যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারিগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন তখন দিবস অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দিই, যেন ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

❒ আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

পার্থিব জীবন অবক্ষয় প্রবণ ও ধ্বংসোন্মুখ, অথচ মানুষ চিরস্থায়ী জীবনের কথা বিস্মৃত হয়ে পার্থিবতাকেই করে তোলে মূল উদ্দেশ্য— এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতটিতে। প্রথমেই পার্থিব জীবনের উপমা দেয়া হয়েছে এভাবে— 'পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো, যা আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করি এবং যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে।' এখানে 'ফাখতালাতা বিহি' অর্থ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে। 'মা ইয়াকুলুন্নাসু ওয়ালআনআম' অর্থ, মানুষ জীবজন্তু যা আহার করে থাকে। অর্থাৎ শস্য, ফলমূল, সব্জী ও তৃণলতা।

এরপর বলা হয়েছে —'অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের আয়ত্ত। তখন দিবস অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই যেনো ইতোপূর্বে এর অস্তিত্বই ছিলো না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

আমি বলি, উদ্ধৃত বক্তব্যটির মর্মার্থ এরকম— পরিমিত বৃষ্টিপাতের ফলে যখন পরিদৃশ্যমান হয় ফুল, ফল ও ফসলের নয়নাভিরাম সমারোহ, তখন সেই শস্যভূমি বা বাগানের মালিক মনে করে, এ সকল কিছু কেবল আমার। আমার এই বিপুল বৈভবে হস্তক্ষেপ করার সাধ্য কারো নেই। তখন দিবস অথবা নিশীথের যে কোনো সময় আমার নির্দেশ এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফল ও ফসলের সমারোহ হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। হে মানুষ! এই উপমাটির কথা গভীরভাবে চিন্তা করো। ভেবে দেখো, তোমার পৃথিবীর জীবনও এরকম। তোমরা এখানে কতো স্বপ্ন রচনা করো। পার্থিব অর্জনকে মনে করো চিরন্তন। মনে করো তোমাদের ওই অর্জন থেকে বিচ্যুত করবার সাধ্য কারো নেই। অথচ দিবস অথবা রাত্রির যে কোনো সময় আমি প্রেরণ করি মৃত্যুর ফেরেশতাকে। তারা তোমাদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে পার্থিবতা থেকে। তোমাদের পৃথিবীর অর্জন হয়ে যায় বহুদুরের অপসৃয়মান এক স্মৃতি। নির্মূল হয় তোমাদের সব কিছু। এরকম উপমা হচ্ছে আমার পক্ষের বিশেষ নিদর্শন। এভাবে আমি আমার নিদর্শনসমূহকে বিবৃত করি ভাবুকদের জন্য। যারা ভাবে। ভাবে আর ভাবে। বুঝতে চেষ্টা করে জীবনের রহস্য, সত্যের মহিমা।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।' এ কথার অর্থ— 'হে মানুষ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন চির সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে।'

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্পাকের এক নাম সালাম। সুতরাং এখানে 'দারিস্সালাম' কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র আবাস— 'শান্তির আবাস' বা নিরাপত্তা নয়।

হজরত জাবেরের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. নিদ্রিত ছিলেন। কয়েকজন ফেরেশতা এসে দাঁড়ালেন তাঁর শয্যাপাশে। একজন ফেরেশতা বললো, বলো এই ব্যক্তি কোন অবস্থায় রয়েছেন? আর একজন ফেরেশতা বললো, ইনি তো নিদ্রিত। অন্য একজন ফেরেশতা বললো, এই ব্যক্তির চোখ নিদ্রাভিভূত কিন্তু হৃদয় জাগ্রত। আর একজন ফেরেশতা বললো, এই ব্যক্তির দৃষ্টান্তটি এ রকম— অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন একটি সুবিশাল ভবন নির্মাণ করলেন। তারপর সেখানে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বিছিয়ে দিলেন দস্তরখানা। ঘোষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন একজনকে। ওই ঘোষক মানুষকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো এবং তাদের পানাহার সম্পন্ন করলো ওই দস্তরখানায়। কেউ কেউ তাঁর আমন্ত্রণকে করলো প্রত্যাখ্যান। তারা হয়ে গেলো বঞ্চিত। একজন ফেরেশতা বললো, এবার দৃষ্টান্তটি ব্যাখ্যা করো, যাতে ইনি বুঝতে পারেন। একজন বললো, ইনি তো নিদ্রিত। অন্যজন বললো, কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত। আর একজন বললো, তোমার বর্ণিত দৃষ্টান্তটির ব্যাখ্যা এই— এখানে সুবিশাল ভবনের নির্মাতা হচ্ছেন আল্লাহ্। ভবনটি হচ্ছে জান্নাত। আর জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী হচ্ছেন মোহাম্মদ মোস্তফা স., যিনি এখানে এখন নিদ্রিত। সুতরাং যারা মোহাম্মদ স. এর আনুগত্য করবে তারা আল্লাহ্তায়ালারই আনুগত্য করবে। আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে তারা হবে আল্লাহ্তায়ালারই অবাধ্য। বোখারী।

হজরত রবীয়া জারাশী থেকে দারেমী বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করলো। দস্তরখানায় রাখলো পানাহারের সামগ্রী। এরপর একজনকে নিযুক্ত করলো আহ্বায়করূপে। তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানালেন। এখন যে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, সে পানাহার করে তৃপ্ত হবে। আর গৃহের মালিকও হবে তার প্রতি প্রসন্ন। আর যে আসবে না সে বঞ্চিত হবে পানাহার থেকে। আর গৃহস্বামীও হবে তার প্রতি অপ্রসন্ন। বর্ণনাকারী বলেছেন, এখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহ্। আহ্বায়ক হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.। গৃহ হচ্ছে ইসলামের গৃহ এবং দস্তরখানা হচ্ছে জান্নাত।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ইসলাম শব্দের মধ্যে যে অর্থে সালাম সন্নিবেশিত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে সেই অর্থেই সালাম শব্দটির ব্যবহার ঘটেছে। জান্নাতবাসীরা একে অপরকে 'সালাম' উচ্চারণের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাবে। তাই জান্নাতকে বলা হয়েছে 'দারিস্সালাম।' ফেরেশতারাও সেখানে 'সালাম' উচ্চারণের মাধ্যমে অভিবাদন জানাবে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়াল মালায়িকাতু ইয়াদ্খুলুনা আ'লাইহিম মিন কুল্লি বাবিন সালামুন আ'লাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উক্ববাদ্ দারি (আর ফেরেশতারা প্রতিটি

দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে এবং বলবে, 'তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছিলে তার বিনিময়ে আজ তোমাদের প্রতি প্রশান্তি, আর আখেরাত কতই না উত্তম)।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন' কথাটির অর্থ— আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা তাকে দ্বীন ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। এখানে 'সরল পথ' অর্থ দ্বীন ইসলাম, সুন্নত পদ্ধতি ও আল্লাহ্ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পথ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, পথ প্রদর্শন বা হেদায়েত সম্পূর্ণতই আল্লাহ্পাকের ইচ্ছাধীন। আরো প্রমাণিত হয় ইচ্ছা ও নির্দেশ (এরাদা ও আমর) সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিষয়। পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে আমরের কথা। বলা হয়েছে, আল্লাহ্তায়ালা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন। এই আহ্বান বা আমর সকলের জন্য। কিন্তু হেদায়েত সকলের জন্য নয়। তাই বলা হয়েছে, যাকে ইচ্ছা সরলপথে পরিচালিত করেন। তাই বাস্তবে দেখা যায়, মানুষ আল্লাহ্তায়ালার আমর বা নির্দেশের বিরুদ্ধে যেতে পারে কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন (হেদায়েত) করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট (গোমরাহ্) করেন। আল্লাহ্তায়ালার এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারোই নেই। মোতাজিলারা বিভ্রান্ত একটি দল। তারা আল্লাহ্তায়ালার আমর ও এরাদার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তাই তারা বলে, হেদায়েত করা আল্লাহ্র ইচ্ছা কিন্তু গোমরাহ করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ২৬, ২৭

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ
جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝

❒ যাহারা মঙ্গলকর কার্য করে তাহাদিগের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো কিছু। কালিমা ও হীনতা উহাদিগের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

❒ যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে; আল্লাহ্ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ

নাই; উহাদিগের মুখমণ্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

'আহসানুল হুসনা' অর্থ মঙ্গলকর কার্য। 'জিয়াদাতুন' অর্থ আরো কিছু। প্রথমে বলা হয়েছে— 'যারা মঙ্গলকর কার্য করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো কিছু।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসীরা তাদের উত্তম কর্মের যথোপযুক্ত পুণ্য তো পাবেই, তদুপরি পাবে অতিরিক্ত পুরস্কার। রসুলপাক স. ইহ্সান (এবাদতের সৌন্দর্য) সম্পর্কে বলেছেন, ইহ্সান হচ্ছে এমনভাবে ইবাদত করা যাতে আল্লাহ্ পরিদৃশ্যমান হন। সৌন্দর্যের এই সর্বোন্নত স্তরে যে পৌঁছতে পারবে না তাকে অন্ততঃ এতোটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তো আমাকে দেখছেন। বোখারী ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হজরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লিল্লাজিনা আহ্সানু' অর্থ— 'লাইলাহা ইল্লালাহ্' কলেমার সাক্ষ্য প্রদান, আল হুসনা অর্থ জান্নাত এবং জিয়াদাতুন অর্থ আল্লাহ্র দীদার।

হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন— রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্পাকের এক ঘোষক এইমর্মে ঘোষণা করবেন যে, অগ্র-পশ্চাৎ খেয়াল রেখে যারা বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহ্র ইবাদত করেছে, তারা পাবে জান্নাত এবং অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্র দীদার। হজরত উবাই বিন কা'ব থেকে মারফুরূপে ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, লালেকানি এবং ইবনে আবী হাতেমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ রকম আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া, আবু শায়েখ ও লালেকানি এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে মারফুরূপে আবু শায়েখ। ইবনে জারীর, ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখ তাঁদের আপনাপন তাফসীরে এবং লালেকানি তাঁর 'কিতাবে রেওয়ায়েত' গ্রন্থে হজরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে এ রকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আবার হজরত হুজায়ফা থেকে এ রকম বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির, আবু শায়েখ, লালেকানি এবং আজরী। আরো অনেক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে হান্নাদ, ইবনে আবী হাতেম, আবু শায়েখ, লালেকানি— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া— হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু সালেহ ও আবু মালেকের মাধ্যমে সুদ্দীর পদ্ধতিতে ইবনে আবী হাতেম ও লালেকানি এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইকরামা। লালেকানি এ হাদিসটির সূত্র সংযোজিত করেছেন হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, হাসান বসরী, আবদুর রহমান বিন আবী লায়লা, আমের বিন সাঈদ বাজাদী, ইবনে আবী ইসাহাক সাবয়ী, আবদুর রহমান বিন সাবেত, ইকরামা,

মুজাহিদ ও কাতাদার সঙ্গে। কুরতুবী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, উল্লেখিত ব্যাখ্যাটি সাহাবায়েকেরাম ও তাবেয়ীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। আর এ ধরনের ঐকমত্যসম্মত ব্যাখ্যা রসুল স. থেকে না শুনে করা সম্ভবই নয়।

হজরত সুহাইব থেকে ইবনে মাজা, মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স.বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্তায়ালা জান্নাতবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা আর কী চাও? তারা বলবে, আপনি কী আমাদের বদনকে সমুজ্জ্বল করে দেন নি? আপনি কী আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কী আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাননি (তবে আমরা আর কী চাইবো)? আল্লাহ্ সহসা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন বদনের উপর থেকে যবনিকা অপসারিত করবেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে জান্নাতীরা চেয়ে থাকবে তাঁর দিকে। ওই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শনের পর তাদের মনে হবে দীদারের তুলনায় জান্নাতের সকল কিছুই অতি তুচ্ছ। কুরতুবী লিখেছেন, যবনিকা অপসারণ করার উদ্দেশ্য হবে বিরহ বেদনার চির অপসারণ। জান্নাতীরা তখন স্বচক্ষে দেখবে তাদের আল্লাহ্কে। উল্লেখ্য যে, যবনিকা তো দৃষ্টির একটি সমস্যা। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার দিক থেকে যবনিকা থাকা না থাকার কোনো সমস্যাই নেই। কারণ তিনি সকল সমস্যা থেকে চিরমুক্ত, চিরপবিত্র।

এরপর বলা হয়েছে— 'কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না।' এ কথার অর্থ জান্নাতে দুঃখ বেদনা কিংবা বিষণ্ণতার উপস্থিতি নেই। তাই জান্নাতীদের মুখমণ্ডল থাকবে সদা সমুজ্জ্বল। ইবনে আবী হাতেম প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে— হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'ক্বতারুন' অর্থ কালো কুয়াশা। আর জিল্লাত অর্থ হীনতা। অর্থাৎ জাহান্নামীদের মতো জান্নাতীদের চেহারায় কালো কুয়াশার আবরণ থাকবে না। আর সেখানে হীনতা বলতে তো কিছু থাকবেই না।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।'

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে—'ওয়াল্লাজিনা কাসাবুস্ সায়্যিয়াতি জাযাউ সায়্যিয়াতিন্ বি মিছলিহা ওয়াতার হাক্বুহুম জিল্লাতুন্ (যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে)। এখানে আল্লাজিনা কাসাবু (মন্দ কাজ করে) কথাটির সম্পর্ক রয়েছে বিগত আয়াতের 'আল্লাজিনা আহ্সানু' (মঙ্গলকর কাজ করে) এর সঙ্গে অথবা আল্লাজিনা কাসাবু এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে জাযাউ সায়্যিয়াহ্।

এরপর বলা হয়েছে— 'মা লাহুম মিনাল্লাহি মিন্ আ'সিম (আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ নেই) এখানে মিন্আ'সিম এর মিন্ অতিরিক্ত (মিন্ এ জায়েদা)। এরপর বলা হয়েছে— কাআন্নামা উগ্শিইয়্যাত উজুহুহুম ক্বিত্বআ'ম্ মিনাল্লাইলি মুজ্লিমান (তাদের মুখমণ্ডল যেনো অন্ধকার রাত্রির

আস্তরণে আচ্ছাদিত)। এ কথার অর্থ— জাহান্নামীদেরকে দেখলে মনে হবে, তাদের মুখমণ্ডলের ভাঁজে ভাঁজে যেনো অন্ধকার রাতের রাশি রাশি আস্তর লেপন করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'ক্বিত্বআ'ম' (আস্তরণ) শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে কাত্বয়াত।

এরপর বলা হয়েছে— 'উলায়িকা আসহাবুন্নার হুম ফিহা খলিদুন' (তারা অগ্নির অধিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে)। এ কথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীরা আগুনেরই অধিবাসী। আর তাদের ওই অগ্নিবাস চিরস্থায়ী।

একটি সন্দেহঃ মোতাজিলারা বলে, কবীরা গোনাহকারীদের জাহান্নামবাস চিরস্থায়ী। আরো বলে, কেউ কবীরা গোনাহ করলে সে আর মুমিন থাকে না। তাদের এমতো বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তারা আলোচ্য আয়াতটিকেই উপস্থাপন করে।

সন্দেহের অপনোদনঃ আলোচ্য আয়াতে 'মন্দ কাজ করে' বলে বুঝানো হয়েছে সগীরা গোনাহকে। কবীরা গোনাহও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি কেউ 'মন্দ কাজ করে' কথাটিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করে, তবে সগীরা গোনাহ হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু 'প্রতিফল অনুরূপ মন্দ' কথাটি এমতো ধারণার বিরুদ্ধে। কেননা 'অনুরূপ' কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে শ্রেণীগত পার্থক্য। তাই ব্যাপারটা দাঁড়াবে এ রকম— সগীরা গোনাহ্র তুলনায় কবীরা গোনাহ্র শাস্তি হবে বেশী। কিন্তু কুফরের তুলনায় শাস্তি হবে কম। তাই 'যারা মন্দ কাজ করে' কথাটির সম্পর্ক সাধারণভাবে 'তারা অগ্নির অধিবাসী' এর সঙ্গে হতে পারে না। চিরস্থায়ী অগ্নিবাসের সম্পর্ক হতে পারে কেবল কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানের সঙ্গে। যেমন— 'ওয়ালমুতাল্লাক্বাতু ইয়াতারাব্‌বাসনা বি আন-ফুসিহিন্না'। আর 'হিন্না' এর পরে এসেছে 'ওয়া বাউলাতুহুন্না আহাক্কু বি রদ্দিহিন্না'। আর 'হিন্না' এর প্রত্যাবর্তন স্থল সাধারণ তালাকপ্রাপ্তরা নন। বরং এমতো বক্তব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে কেবল ওই রমণীগণ, যাদেরকে রেজয়ি তালাক দেয়া হয়েছে।

এ রকম হওয়া সম্ভব যে, 'আল্লাজীনা কাসাবু সায়্যিয়াতি (যারা মন্দ কাজ করে) কথাটির উদ্দেশ্য হবে যারা কুফরী করে। কেননা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এর বিপরীতার্থক বক্তব্য (যারা মঙ্গলকর কাজ করে)। আর ইমান বা বিশ্বাস হচ্ছে সকল মঙ্গলকর কার্যের শিখর। এভাবে কবীরা গোনাহ্কারীরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে 'যারা মঙ্গলকর কার্য করে' বক্তব্যটির মধ্যে। যদি তাই হয় তবে 'যারা মন্দ কাজ করে' কথাটির অর্থ 'যারা কুফরী করে'-ই তো হবে।

এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'যারা মন্দকাজ করে' বলে রসুল স. এর সময়ের মন্দ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ওই সময়ে সকল মন্দ লোকেরা ছিলো কাফের। আর সৎকর্মশীলেরা সকলেই ছিলেন ইমানদার সাহাবী। সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও পুণ্যবান। ঘটনাক্রমে ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তওবা করে ফেলতেন। আর তওবাকারীরা কখনোই গোনাহ্গার নয়। তাই আমি বলি, আলোচ্য আয়াতে 'যারা মন্দ কাজ করে বলে' ওই সময়ের কাফেরদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

সুরা ইউনুস ঃ ২৮, ২৯, ৩০

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۝ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ۝ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

❒ এবং যেদিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্রিত করিয়া যাহারা অংশীবাদী তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর,' আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিল তাহারা বলিবে 'তোমরা তো আমাদিগের ইবাদত করিতে না,'

❒ আল্লাহ্ই আমাদিগের ও তোমাদিগের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম,'

❒ সেই দিন তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হইবে এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদিগের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'এবং যেদিন আমি তাহাদিগের সকলকে একত্রিত করে যারা অংশীবাদী তাদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক করেছিলে তারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করো।' এ কথার অর্থ— তোমরা ওই দিনের

কথা স্মরণ করো যেদিন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করবো এবং অংশীবাদী ও তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোকে বলবো, তোমরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াও। যে সকল অপকর্ম তোমরা করেছো, সেগুলো আগে দেখে নাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো।' এ কথার অর্থ— সেদিন আমি অংশীবাদী ও তাদের বাতিল উপাস্যগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করে দিবো প্রচণ্ড বিতণ্ডার। বিচ্ছিন্ন করে দিবো পৃথিবীর মধুর সম্পর্কের। তাই বাতিল উপাস্যগুলো তাদের উপাসকদের প্রতি প্রকাশ করবে প্রবল বিরক্তি। আলোচ্য বাক্যটির অর্থ এ রকমও হতে পারে— সেদিন আমি মুমিন ও কাফেরদেরকে পৃথক করে দিবো। অন্য এক আয়াতেও এই পার্থক্যের কথাটি বিবৃত হয়েছে এভাবে— ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়্যুহাল্ মুজরিমুন (হে পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়, তোমরা আজ থেকে পৃথক হয়ে যাও)।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তারা যাদেরকে শরীক করেছিলো তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।' এ কথার অর্থ— বাতিল উপাস্যগুলো তখন তাদের উপাসকদের বলবে, তোমরা তো আমাদের কথা মতো পূজা করতে না। আমরা কি এ রকম কখনো বলেছি যে, তোমরা আমাদের উপাসনা করো? এ রকমও হতে পারে যে, তখন যারা হজরত ঈসাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলতো এবং ফেরেশতাদেরকে বলতো আল্লাহ্‌র কন্যা— তাদেরকে লক্ষ্য করে হজরত ঈসা এবং ফেরেশতারা বলবেন, তোমরা তো আসলে আমাদের ইবাদত করতে না— ইবাদত করতে তোমাদের মনগড়া মতবাদের। কারণ, 'আমাদের ইবাদত করো' এ রকম কথা আমরা তোমাদেরকে কখনোই বলিনি। উল্লেখ্য যে, অংশীবাদীরাও তখন বলবে, আমরা কখনোই তোমাদের উপাসনা করতাম না।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌ই আমাদের ও তোমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এই বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম।' এ কথার অর্থ— বাতিল উপাস্যগুলো তখন উপাসকদেরকে বলবে, তোমরা সত্যবাদী না আমরা, সে বিষয়ে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তোমরা আমাদের উপাসনা করতে কি না সে বিষয়ে আমরা বেখবর। আমরা তোমাদের কথা শুনিনি, তোমাদেরকে দেখিনি, বুঝতেও পারিনি তোমাদের অপকর্ম সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'সেই দিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।' এ কথার অর্থ— সেদিন প্রত্যেককে দেখানো হবে

তার কৃতকর্মের ফিরিস্তি এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে অথবা আল্লাহ্‌র আযাবের দিকে।

একটি সন্দেহঃ কাফেরদের কোনো প্রভু নেই। তবুও আল্লাহ্‌তায়ালা এ রকম বলেছেন কেনো— ওয়া আন্নাল কাফিরিনা লা মাওলালাহুম (আর নিশ্চয় সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের কোনোই অভিভাবক নেই)।

সন্দেহের অপনোদনঃ আলোচ্য আয়াতের 'মাওলা' শব্দটির অর্থ প্রভুপ্রতি-পালক এবং মালিক। আর উদ্ধৃত আয়াতে 'লা মাওলা লাহুম' কথাটির অর্থ হবে সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।' এ কথার অর্থ, অংশীবাদীরা যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছিলো, সেদিন তারা সকলেই হবে ভীতসন্ত্রস্ত। এখানে 'ইয়াফ্‌তারূন' (অন্তর্হিত হবে) কথাটির মাধ্যমে বুঝা যায় অংশীবাদীরা তাদের উপাস্যদেরকে শাফায়াতকারী বা সুপারিশকারী ভেবেছিলো। কিন্তু সেদিনকার বাস্তব অবস্থা দেখে তাদের এই ধারণাটি কর্পুরের মতো উবে যাবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৩১, ৩২, ৩৩

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ○ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ○ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ○

❐ বল, 'কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে?' তখন তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্‌।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

❐ তিনিই আল্লাহ্‌, তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক, সত্যত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

❐ এইভাবে সত্যত্যাগীদিগের সম্পর্কে, 'তাহারা বিশ্বাস করিবে না' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে — হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন আকাশের আলো ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মাটি থেকে রিজিক বা জীবনোপকরণ দান করেন কে? তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দান করেন ও নিয়ন্ত্রন করেন কে? কে নির্গত করেন জীবিত প্রাণী থেকে মৃতবৎ শুক্র অথবা ডিম্ব। মৃতবৎ শুক্র অথবা ডিম্ব থেকে জীবন্ত প্রাণী? এভাবে সমগ্র সৃষ্টির সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? এর জবাবে সকলেই বলবে (বলা উচিত) 'আল্লাহ্।' হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন. তবু কি তোমরা সাবধান হবে না? তবুও কি তোমরা অংশীবাদিতা পরিত্যাগ করবে না? তবুও কি ভয় করবে না আল্লাহ্কে?

পরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য-ত্যাগ করবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো?' এ কথার অর্থ— সকল কিছুর ব্যবস্থাপক, অভিভাবক ও উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্ই তো যথেষ্ট। তিনিই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। তাঁর প্রতিপালকত্ব তোমাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের বিদ্যমানতা দ্বারা সুপ্রমাণিত। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিজিক প্রদান করে চলেছেন, তোমাদের সকল বিষয়কে করেছেন সচল ও সমৃদ্ধ— তাহলে তোমরা সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হও কেনো? সুতরাং শাশ্বত এই সত্যকে তোমরা প্রত্যাখ্যান কোরো না। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলে বিপথগামীতা ছাড়া আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? অতএব, হে মানুষ! ভেবে দেখো, কোন পথে তোমরা পদবিক্ষেপরত।

এর পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এভাবে সত্য-ত্যাগীদের সম্পর্কে 'তারা বিশ্বাস করবে না,' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা আদি-অন্তের সকল কিছুই জানেন। এ কথাও জানেন যে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে কারা। এটাও তাঁর চিরন্তন নির্ধারণ যে, কেউ কেউ প্রবেশ করবে জান্নাতে, কেউ কেউ জাহান্নামে। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই হবে জাহান্নামী। এ কারণেই 'তারা বিশ্বাস করবে না'— সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালার এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হবে। এখানে 'কালিমাতু রব্বি' অর্থ প্রতিপালকের বাণী।

'ফিসক্ব' শব্দটির অর্থ আত্মশুদ্ধির বৃত্ত থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানের বৃত্তে স্থিত হওয়া। আর 'কালিমাতি রব্বি' এর স্থলবর্তী হয়েছে এখানে আন্নাহুম লা ইউ'মিনুন (তারা বিশ্বাস করবে না)। অর্থাৎ প্রতিপালকের বাণী এই যে, তারা বিশ্বাস করবে না। অথবা কলেমার পরিসমাপ্তি এবং তাদের দোজখী হওয়ার কারণে তারা বিশ্বাস করবে না। এটাই হচ্ছে কালেমাতুর রব্বি কথাটির তাত্ত্বিক কারণ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

❒ বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটায়?' বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সুতরাং তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতেছ?'

❒ বল, 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি কেহ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে?' বল, 'আল্লাহ্ই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না সে যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক?'

❒ উহাদিগের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী-দেরকে বলে দিন, তোমরা যাদের উপাসনা করো তাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছে যে সৃষ্টির অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম? মৃত্যুদানের পর পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম? হে আমার রসুল ! তাদের নিরুত্তরতার প্রেক্ষিতে আপনি পুনরায় বলুন, আল্লাহ্তায়ালাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন এবং তিনিই পুনরুত্থান দিবসে জীবনের পুনরাবর্তন ঘটাবেন। সুতরাং হে অংশীবাদী জনতা! তোমরা কীভাবে চিরন্তন সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অংশীবাদিতাকে গ্রহণ করেছো?

পরের আয়াতের (৩৫) মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে মুশরিক জনগোষ্ঠী! নবী রসুলগণের মাধ্যমে সত্যের প্রতি পথ নির্দেশ করতে পারে, তোমাদের উপাস্যদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবও তারা দিতে পারবে না, তাই আপনি বলুন, সত্যের প্রতি পথ নির্দেশ করতে পারেন কেবল আল্লাহ্। তিনি নবী রসুলগণের মাধ্যমে পথ না দেখালে কেউ পথ পায় না। পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা অন্য কারোই নেই। সুতরাং উপাস্য হওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হজরত ঈসাকে বলে আল্লাহ্র পুত্র। কেউ কেউ বলে হজরত উযায়েরকে। আবার কেউ কেউ ফেরেশতাদেরকে বলে আল্লাহ্র কন্যা। অথচ তারা কি জানে না যে, হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতাসহ সমগ্র সৃষ্টি সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণতই এক আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। অতএব হে অংশীবাদী জনমণ্ডলী! তোমাদের হলো কি? কেমন করে তোমরা সত্যের বিরুদ্ধে এবং মিথ্যার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে? কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হেদায়েত (পথনির্দেশ) কথাটির প্রকৃত অর্থ— স্থানান্তরিত হওয়া। এখানে 'তাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে সত্যের পথ নির্দেশ করে' কথাটির মাধ্যমে অংশীবাদীদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর অসহায়ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেখো হে অংশীবাদীরা! তোমাদের উপাস্যসকল কেমন নিষ্প্রাণ। নিজে নিজে তারা স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তোমাদেরকে তারা স্থানান্তরে (সত্যের দিকে) নিয়ে যাবে কীভাবে?

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তারা অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদীদের মতাদর্শ অনুমান নির্ভর। তারা স্বধারণার অনুগামী। আপন স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ও জ্ঞান কোনোটাই নেই। যদি থাকতো, তবে কখনোই তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমান্তরাল ভাবতে পারতো না। তাদের অনুমান কেবলই অনুমান। প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সে অনুমানের কোনোই সম্পর্ক নেই। এ রকম অনুমান ও কল্পনা কোনো কাজেই আসে না।

আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মূর্খদের অনুসরণ বৈধ নয়। কেননা তারা অনুমান করে কথা বলে। আকলী ও নকলী (জ্ঞানগত ও বর্ণনা পরম্পরাগত) কোনো জ্ঞান তাদের নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।' এই বাক্যটির মধ্যে ওই সকল লোককে শাস্তিদানের হুমকি দেয়া হয়েছে, যারা কল্পনা ও অনুমানের অনুসারক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ওই সকল লোককে ভালো করেই জানেন। সুতরাং যথাসময়ে যথাশাস্তি তাদের জন্য অনিবার্য।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

❒ এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নহে, পক্ষান্তরে ইহা, ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার সমর্থন এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধান সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।

❒ তাহারা কি বলে 'সে ইহা রচনা করিয়াছে?' বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ এক সুরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর।'

❒ পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার ব্যাখ্যা উহাদিগের বোধগম্য হয় নাই। এইভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, সুতরাং দেখ, সীমালংঘনকারীদিগের পরিণাম কী হইয়াছে!

❒ উহাদিগের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিঃসন্দেহে এই কোরআন আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে অবতারিত। অন্য কেউ এর রচয়িতা নয়। আর কোরআন পূর্বে অবতারিত কিতাব সমূহের প্রত্যায়ক। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে আল্লাহ্র একত্ব, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, নবী রসুল প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে এই কোরআনে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আরো রয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। যেমন, ফরজ, ওয়াজিব, হালাল,

হারাম ইত্যাদি। সুতরাং এই কোরআনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই নেই।

এখানে 'আল্লাজী বাইনা ইয়াদাইহি' কথাটির উদ্দেশ্য রসুল স. এর পবিত্র সত্তা। আরেকটি অর্থ পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহ— যা বঙ্গানুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বের আয়াতে (৩৬) আনুমানিকতার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। আর আলোচ্য আয়াতে 'এতে কোনো সন্দেহ নেই' বলে কোরআনের অনুসরণকে করা হলো অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা কি বলে, সে এটা রচনা করেছে? বলো, তবে তোমরা এর অনুরূপ এক সুরা আনয়ন করো এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পারো আহ্বান করো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! অংশীবাদীরা কি বলতে চায় আপনি এই কোরআন রচনা করেছেন? আপনি বলুন, আমি যদি এর রচয়িতা হই, তবে তোমরাও তো এ রকম রচনা করতে পারবে। তোমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক পণ্ডিত, কথাশিল্পী ও কবি। তোমরা তবে এই কোরআনের অনুরূপ অন্ততঃ একটি সুরা রচনা করে দেখাও। ব্যক্তিগতভাবে না পারো সমষ্টিগতভাবে এ রকম করে দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তোমরা এ রকম করতে পারবে না। কারণ—

তৃতীয়োক্ত আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'পরন্ত তারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে না তা অস্বীকার করে এবং এখনো এর ব্যাখ্যা তাদের বোধগম্য হয়নি।' এ কথার অর্থ অংশীবাদীরা অবুঝ। কোনো প্রকার শুভবোধ ও বুদ্ধি তাদের নেই। কোরআনের মর্ম তাদের বোধগম্যই হয়নি। তারা কেবল শোনে কিন্তু এর মর্ম বুঝে না। এ কথাও বুঝতে পারে না যে, এই কোরআন মানব রচিত গ্রন্থ হওয়া সম্ভবই নয়। এতে রয়েছে বহু অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, আদি ও অন্তের দিক নির্দেশনা। আরো রয়েছে পুণ্য ও পাপের, স্বস্তি ও শাস্তির সংবাদ। অংশীবাদীদের উচিত ছিলো কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবের কোনো বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হওয়া, যাদের চোখে ধরা পড়বে কোরআনের সত্যতার বিষয়টি। যদি তারা এ রকম করতো, তবে কোরআনের পবিত্র শিক্ষা ও অলৌকিকত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারতো।

এখানে 'লাম্মা ইয়া'তিহিম' কথাটির অর্থ 'এখনো এর তত্ত্ব তাদের বোধগম্য হয়নি'। 'লাম্মা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'তাওয়াক্কায়' (সুস্থিরতা) অর্থে— যা নির্দেশ করেছে কোরআনের বোধগম্যতাকে। তাই বার বার তাদেরকে কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু তারা এদিকে কর্ণপাত না করে তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। অথচ কোরআনের বাণী যে সত্য তা বিভিন্ন ভাবে একের পর এক তাদের সামনে প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন কোরআনের এক আয়াতে দেয়া হয়েছিলো রোমানদের বিজয়ের সংবাদ। পরে সে সংবাদ যথাযথরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। আবু লাহাবের ধ্বংসের সংবাদ পূর্বাহ্নে প্রদান করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো— তাব্বাত্

ইয়াদা আবী লাহাবিঁও ওয়াতাব্ব। সে সংবাদও কার্যকর হয়েছে। এ সকল ঘটনা দেখে অবশ্য কেউ কেউ ইমান গ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকাংশই এখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিলো। সুতরাং দ্যাখো, সীমালংঘনকারীদের পরিণাম কী হয়েছে!' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! স্মরণ করো, বিগত যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের নবী রসুলের মাধ্যমে অবতীর্ণ কিতাবকে তোমাদের মতোই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। এভাবে তারা হয়েছিলো আল্লাহ্‌র গজবের শিকার। এখনো সময় আছে। আগমন করো কোরআনের আশ্রয়ে। স্বীকার করো চিরন্তন সত্যকে। নতুবা তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মতো আল্লাহ্‌র গজবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

চতুর্থোক্ত আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তাদের মধ্যে কেউ এতে বিশ্বাস করে এবং কেউ এতে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল ! শুনুন, আপনি যাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ করবে না। তারা তো তাই করবে যা লেখা রয়েছে তাদের ললাটলিপিতে। আর আল্লাহ্ ওই সকল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে উত্তমরূপে অবগত। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো উপায়ই তাদের নেই।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ○ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ○ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○

❐ এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।'

❐ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে, তাহারা না বুঝিলেও?

❒ উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে, তাহারা না দেখিলেও?

প্রথমে উল্লেখিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি দিনের পর দিন অংশীবাদী সম্প্রদায়কে বিভিন্নভাবে সত্যের স্বরূপ বুঝানোর চেষ্টা করে চলেছেন। এতোকিছু করেও যদি তাদের বোধোদয় না ঘটে, আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য যদি তারা থেকে যায় অনড় অবস্থানে, তবে আপনি তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করুন। বলুন, আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী এবং তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী তোমরা। আমরা প্রত্যেকেই আপনাপন কর্মের প্রতিফল অবশ্যই লাভ করবো। সুতরাং অনাবশ্যক বিতণ্ডা পরিহার করো। আমার কাজের জন্য যেমন তোমাদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না, তেমনি আমিও অভিযুক্ত হবো না তোমাদের কাজের জন্য। মনে রেখো আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলেছি, তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলেছি।

রসুল স. এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বজাতিকে বললো, পর্বতমালার ওধারে আমি দেখে এসেছি তোমাদের একদল শত্রুকে। শেষ রাতে তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তোমরা অতি দ্রুত এ স্থান পরিত্যাগ করো। একদল লোক লোকটির কথা শুনলো। তারা রাত্রির প্রথম প্রহরেই চলে গেলো নিরাপদ স্থানে। অন্যেরা লোকটির কথা বিশ্বাস না করে স্বস্থানেই রয়ে গেলো। শেষ রাতে শত্রুরা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংস করে দিলো তাদেরকে। আমার অবস্থা ওই সতর্ককারী ব্যক্তিটির মতো। এখন আমার কথা যে মানবে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে মানবে না তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম। কালাবী ও মুকাতিল বলেছেন, জেহাদ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' আয়াতটির মতো আলোচ্য আয়াতটিও রহিত হয়েছে।

এরপরে উল্লেখিত আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি কি বধিরকে শোনাবে, তারা না বুঝলেও? এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার কোরআন পাঠ শোনে। কিন্তু সে শোনার সঙ্গে তাদের মনের কোনো যোগ নেই। তাই তারা কোরআনের হকিকত ও হেকমতকে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তারা শুনলেও প্রকৃত শ্রোতার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা বধির। সুতরাং হে রসুল! যে বধির তাকে আপনি শোনাবেন কীভাবে, যদি তারা তাদের বধিরতা সম্পর্কে সচেতন না হয়?

শেষে উল্লেখিত আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু সে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাদের হৃদয়ের কোনো সংযোগ নেই। তাই তাদের সত্যদর্শন ঘটে না। চোখ থাকলেও তারা চক্ষুষ্মানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা অন্ধ। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে পথ দেখাবেন কীভাবে, যদি তারা তাদের অন্ধত্ব সম্পর্কে সজাগ না হয়?

ইতোপূর্বে (আয়াত ৪১) বলা হয়েছে, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের' এ কথা বলে রসুল স.কে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলা হয়েছিলো। আর পরের আয়াত দু'টোতে (৪২,৪৩) তাঁকে দেয়া হয়েছে সান্ত্বনা। মূল কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে এভাবে— আল্লাহ্তায়ালাই জঘন্য মানসিকতাসম্পন্ন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কান থাকতেও বধির এবং চোখ থাকতেও অন্ধ করেছেন। আল্লাহ্তায়ালা নিজেই চান না যে, তারা সত্য পথের পথিক হোক। সুতরাং হে রসুল! আপনি তো তাদের বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতা ঘোচাতে পারবেন না। তা হলে আপনি তাদের জন্য ভেবে ভেবে দুঃখ পাবেন কেনো?

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○

❐ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, বস্তুতঃ মানুষ নিজদিগের প্রতিই জুলুম করিয়া থাকে।

❐ এবং যে দিন তিনি উহাদিগকে একত্রিত করিবেন সেদিন উহাদিগের মনে হইবে যে, উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল; উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহের সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্পাক সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। জুলুম বা অত্যাচার একটি দোষ। সুতরাং জুলুম করা থেকেও তিনি পবিত্র। আল্লাহ্পাক কখোনই কারো প্রতি জুলুম করেন না। বরং মানুষই প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের পথ থেকে সরে যায়। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের উপরে অত্যাচার করে।

রসুল স.বলেছেন, আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত (ধর্মজ্ঞান) সহকারে প্রেরণ করেছেন। এই হেদায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে তারতম্য ঘটে যায়। দৃষ্টান্তটি এ রকম— বৃষ্টিপাতের পর উত্তম মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয় তরুলতা, ফল ও ফসল। পাথরের মতো শক্ত মৃত্তিকায় সে রকম কিছু হয় না। কিন্তু সেখানে পানি জমা হলে অন্যেরা সে পানি থেকে উপকৃত হয়। সেই পানি কেউ পান করে, কেউ বা সেখান থেকে অন্য জমিতে পানি সিঞ্চন করে। কিন্তু ওই শক্ত মাটি ওই পানির মাধ্যমে নিজে উপকৃত হতে পারে না। আমার জ্ঞান বিতরণের কর্মটিও বৃষ্টিপাতের মতো। কারো কারো অন্তর এর দ্বারা সিক্ত হয়। তারা লাভ করে ইমান ও হেদায়েতের ফল ও ফসল। নিজেরা যেমন উপকৃত হয়, তেমনি উপকার প্রদান করতে পারে অন্যকে। আর কেউ কেউ এর দ্বারা কোনোই উপকার লাভ করতে পারে না। কঠিন মাটির মতো থেকে যায় চির বঞ্চিত। হজরত আবু মুসা আশআরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা মানুষের বোধ বুদ্ধি ছিনিয়ে নিবেন, এর পরেও তাদেরকে সত্যপথে চলার নির্দেশ দান করবেন— এ রকম জুলুম আল্লাহ্ করেন না। এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ জ্ঞানকে আল্লাহ্তায়ালা অপসারিত করেন না। মানুষ নিজেই জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে শুভবোধ ও বুদ্ধিকে নষ্ট করে ফেলে। বিশ্বাস ছেড়ে গ্রহণ করে সত্য-প্রত্যাখ্যানকে। সুতরাং জুলুম মানুষই করে। আল্লাহ্ করেন না। এই আয়াতের বক্তব্য পথভ্রষ্ট জাবরিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাসবিরুদ্ধ। তারা বলে, মানুষ জড়পদার্থতুল্য। বোধ ও বুদ্ধি বলে তার কিছু নেই। কিন্তু এখানে প্রমাণিত হলো যে তাদের ধারণাটি ভ্রান্ত।

এ রকমও হতে পারে যে, আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে সেই শাস্তি জুলুম হবে না, হবে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ— এ কথাই আলোচ্য আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। কারণ আখেরাতের আযাব হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিজস্ব অর্জন। পৃথিবীতে সত্য ত্যাগ ও পাপাচরণের কারণেই তারা সেখানে শাস্তির উপযুক্ত হবে। সুতরাং আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে থাকে। পরের উদ্ধৃত আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'এবং যে দিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, তাদের অবস্থিতি দিবসের মূহূর্তকাল মাত্র ছিলো; তারা পরস্পরকে চিনবে। আল্লাহ্র সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিলো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পুনরুত্থান দিবসে সকল মানুষকে একত্র করবেন। তখন তাদের মনে হবে পৃথিবীতে, কবরে এবং কিয়ামতে তারা ছিলো মুহূর্তকাল মাত্র। সেখানে

সবাই সবাইকে চিনতে পারবে। মনে হবে মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। আর তারা একে অপরকে চিনবে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত ভীতসন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। তারা সেদিন এ কথা ভালো করেই বুঝবে যে, যারা এই পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করেছে তারা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা সৎপথ পায়নি।

বাগবী লিখেছেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বিচারের ময়দানে সমবেত হলে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। কিন্তু ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকবে বলে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। ওই সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার এক ফেরেশতা ঘোষণা করবে— যারা আজ এই বিচারের দিনে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের জন্য সমবেত হওয়াকে অস্বীকার করেছিলো তারা ক্ষতিগ্রস্ত, তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিলো না। অথবা এ কথা তারা আক্ষেপের সঙ্গে নিজেরাই নিজেদেরকে বলবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاۤءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

❒ আমি ইহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দিই, উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ্‌ তাহার সাক্ষী।

❒ প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে এক জন রসূল এবং যখন উহাদিগের রসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহিত উহাদিগের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।

❒ এবং উহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলো, 'এই ভীতি প্রদর্শন কবে ফলিবে?"

প্রথমে বর্ণিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক সতত সচেতন। আমার নিকটে তো তাদেরকে ফিরে আসতেই হবে। এখন পৃথিবীতে আপনার চোখের সামনে তাদেরকে আমি শাস্তি দিতেও পারি, অথবা দিতে পারি সাময়িক অবকাশ। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক নিজেই সাক্ষী।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি ভোগ অনিবার্য। তাই এখানে বলা হয়েছে, 'তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করে দেই।' (আপনার সময়ে তাদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেই)।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'ছুম্মা' শব্দটির অর্থ 'অতঃপর' হলেও এখানে শব্দটির অর্থ হবে 'এবং'। এভাবে 'প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকটে' ও 'তারা যা করে আল্লাহ্ তার সাক্ষী'— দু'টো বাক্যকেই সমগুরুত্বসম্পন্ন করা হয়েছে। কোনো একটিকে অপরটি অপেক্ষা অগ্রবর্তী অথবা পশ্চাৎবর্তী করা হয়নি।

মুজাহিদ বলেছেন, 'আমি তাদেরকে যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই'— এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রসুল স.কে অংশীবাদীদের উপরে আযাব কীভাবে হয়, তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়। অন্যান্যদেরকে আযাব দেয়া হবে আখেরাতে।

পরে বর্ণিত আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক জাতির জন্যে আছে এক জন রসুল এবং যখন তাদের রসুল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! শোনো, তোমাদের নিকটে যেমন রসুল প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি রসুল প্রেরণ করা হয়েছিলো বিগত সময়ের জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সেই সকল রসুল তাঁদের স্ব স্ব জাতি গোষ্ঠীকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করেছিলেন। কেউ তাঁদেরকে মেনেছে, কেউ তাঁদেরকে মানেনি। যারা মানেনি তাদের বিষয়টি ফয়সালা করা হয়েছিলো ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গেই। অবাধ্যরা শাস্তির উপযুক্ত— ন্যায়বিচার এ কথাই বলে। তাই তাদেরকে আমি উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছি। রক্ষা করেছি ওই সকল রসুল ও তাদের বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে।

মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— পূর্ববর্তী রসুলগণ তাঁদের আপনাপন জন গোষ্ঠীকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ তাদেরকে মান্য করেছে। কেউ করেনি। কিয়ামতের দিন ওই সকল রসুল এই মর্মে সাক্ষী প্রদান করবেন যে, তাঁদের উম্মতদের মধ্যে কে কে বিশ্বাসী এবং কে কে বিশ্বাসী নয়। এরপর আল্লাহ্তায়ালা বিষয়টিকে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। বিশ্বাসীদেরকে দিবেন নাজাত এবং অবিশ্বাসীদেরকে দিবেন শাস্তি। এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া জিআ বিন্নবিয়্যিনা ওয়াস্ শুহাদায়ি ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম (আর নবী ও সাক্ষ্যদাতাগণ কর্তৃক আনীত হবে এবং মীমাংসা করা হবে তাদের মধ্যে)। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফা কাইফা ইজাজি'না মিন কুল্লি উম্মাতিন বিশাহিদিঁও ওয়া জি'না বিকা আ'লা হা উলায়ি শাহীদা' (তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন সাক্ষ্যদাতাকে নিয়ে আসবো এবং আপনাকে নিয়ে আসবো সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য-দাতারূপে)।

শেষে বর্ণিত আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলো, এই ভীতি প্রদর্শন কবে ফলবে?' এ কথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি ও তোমার সঙ্গীরা প্রায়শঃই বলে থাকো তোমাকে এবং তোমার আল্লাহ্‌কে না মানলে আমাদের উপরে আযাব নেমে আসবে। তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, কখন আযাব আসবে?

মুশরিকদের এই প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, পরবর্তী আয়াত সমূহে এভাবে—

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○ وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

❒ বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালোমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।'

❒ বল, 'তোমরা আমাকে বল, যদি তাঁহার শাস্তি তোমাদিগের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কী ত্বরান্বিত করিতে চাহে?'

❒ তোমরা কি ইহা ঘটিবার পর ইহা বিশ্বাস করিবে? এখন? তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে!

❒ পরে সীমালংঘনকারীদিগকে বলা হইবে, 'স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো; তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেয়া হইতেছে।'

❒ এবং উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে 'ইহা কি সত্য?' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, ইহা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের পরিপূর্ণ অনুসারী। আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া নিজের ভালো মন্দের উপরেও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যেমন জোর জবরদস্তি করে কাউকে কল্যাণের অধিকারী করতে পারি না, তেমনি কাউকে স্বেচ্ছায় শাস্তিও দিতে পারি না। প্রত্যেক অবাধ্য সম্প্রদায়ের শাস্তির জন্য আল্লাহ্পাক কর্তৃক নির্ধারিত সময় রয়েছে। ওই নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হবে তখনই আপতিত হবে শাস্তি। তখন এক মুহূর্তও অগ্র-পশ্চাৎ ঘটবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'ইল্লা মাশাআ'ল্লাহ্' (আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন) কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারেই সকল কিছু ঘটবে। কল্যাণ অথবা অকল্যাণের নির্ধারক আমি নই।

পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে বলো, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা তার কী ত্বরান্বিত করতে চায়?' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে অবোধ জনতা! আল্লাহ্র আযাব কি কোনো আস্বাদ্য কোনো কিছু? দিনে যখন তোমরা কর্মমুখর থাকো তখন যে কোনো মুহূর্তে অথবা রাতে যখন তোমরা নিদ্রামগ্ন থাকো, তখন যে কোনো সময়ে আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তো আযাব অবতীর্ণ করতেই পারেন। তবে তোমাদের এই ত্বরাপ্রবণতার হেতু কি?

এখানে 'মাজা' শব্দটির মাধ্যমে আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে বিস্ময়বোধক প্রশ্নের আকারে। এভাবে এ কথাই বলা উদ্দেশ্য যে, আক্ষেপ! বড়ই আক্ষেপ!! তোমরা এতোই বিকৃতবোধ বুদ্ধি সম্পন্ন যে, নিজের ধ্বংসকে নিজেরাই দ্রুত ডেকে আনতে চাও!

'ইন আতাকুম' (যদি তোমাদের নিকট আসে) কথাটির প্রতিদান এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কথাটি হচ্ছে— দিন অথবা রাতের যে কোনো মুহূর্তে আযাব এসে পড়লে অবশ্যই পাপিষ্ঠ অবস্থায় তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্র নিকট দ্রুত আযাব কামনা করতো। একবার একজন বললো, হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ যা উচ্চারণ করে, তা যদি তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে তুমি আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো। অথবা অন্য কোনো আযাব আপতিত করো। তার এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এই আয়াত।

আমি বলি, এখানে 'মাজা তাসতা'জিলু' কথাটির উদ্দেশ্য হবে এ রকম— যদি আল্লাহ্পাকের আযাব তোমাদের প্রতি এসেই পড়ে তবে তোমাদের কী উপায় হবে? নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া তোমাদের কোনো উপায় তো আর থাকবে না। তবু তোমরা আযাব প্রার্থনা করছো কেনো? বলো কেনো?

এর পরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'তোমরা কি এটা ঘটবার পর এটাকে বিশ্বাস করবে? এখন? তোমরা তো এটাই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে! এ কথার অর্থ— হে উগ্রপন্থী অংশীবাদীরা! তোমাদের প্রার্থনানুসারে আযাব যদি এসেই যায়, তবে ওই আযাবকে অথবা আযাবের সংবাদ প্রদানকারীকে কি তোমরা বিশ্বাস করবে? অথবা আযাব এসে পড়ার পরেও কি তোমরা আযাব ত্বরান্বিত করার জন্য জেদ্ ধরবে? আর মেনে নিবে আযাবের সত্যতাকে ও আযাবের সংবাদ প্রদাতাকে? কিন্তু তখন তোমাদের মান্যতা কোনো কাজে আসবে না।

'আল আ-না' অর্থ এখন? অর্থাৎ এখন তোমাদের এই মৃত্যু যন্ত্রণার সময় অথবা কবরে কিংবা কিয়ামতে আযাব দর্শনের পর তোমরা কি ইমান আনবে? কিন্তু এখন ইমানের প্রয়োজন তো আর নেই।

এর পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'পরে সীমালংঘনকারীদেরকে বলা হবে, স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো; তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।' শেষে উল্লেখিত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এবং তারা তোমার নিকট জানতে চায়, এটা কি সত্য? বলো, হ্যাঁ। আমার প্রতিপালকের শপথ, এটা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা এটা ব্যর্থ করতে পারবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! মুশরিকেরা আপনার নিকট জানতে চায়, তৌহিদ, নবুয়ত, কোরআন, কিয়ামত, আযাব, সওয়াব ইত্যাদি কি সত্য? আপনি বলুন, অবশ্যই। আমার প্রতিপালকের শপথ, আমি যা কিছু তোমাদেরকে জানিয়েছি তার সবকিছুই সত্য। তোমরা এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। ব্যর্থও করতে পারবে না।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○ هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

❑ প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার হইলে সে উহা মুক্তির বিনিময়ে দিত এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে মনের অনুতাপ মনেই রাখিত। উহাদিগের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

❒ সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহেরই। সাবধান! আল্লাহের ভবিষ্যবাণী সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অবগত নহে।

❒ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— ওয়ালাও আন্না লিকুল্লি নাফ্সিন্ জালামাত মা ফিল আরদ্বি লাফ্তাদাত্ বিহি (প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তার হলে সে তার মুক্তির বিনিময়ে দিতো)। এ কথার অর্থ— কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা দেখে অংশীবাদীরা চিন্তা করবে, পৃথিবীর সকল সম্পদ যদি তাদের থাকতো তবে তার সবকিছুই দিয়ে দিতো মুক্তিপণ হিসেবে। এখানে 'মাফিল আরদ্বি' অর্থ পৃথিবীতে যা কিছু আছে। 'জুলুম' শব্দটির অর্থ এখানে শিরিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া আসার্রুন্ নাদামাতা লাম্মা রাআউল আ'জাব' অর্থ— এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে মনের অনুতাপ মনেই রাখতো। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, এখানে 'আসার্রুন নাদামাতা' এর অর্থ— ওই ভয়াবহ দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ইচ্ছা করলেও মনের অনুতাপকে গোপন রাখতে পারবে না। কারণ কিয়ামতের দিন কাল্পনিক ধৈর্য ধারণ করা অসম্ভব। সেদিন কষ্ট এতো কঠিন হবে যে মিথ্যা ধৈর্য ধারণ করা সম্ভবই হবে না।

কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'আসারু' অর্থ গোপন অনুতাপ। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অনুসারীদের নিকটে নিজের মনের আক্ষেপকে গোপন করবে। অন্যান্য আলেম বলেছেন, এখানে আসার্রু শব্দটির মাধ্যমে গোপন অনুশোচনাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ অসহনীয় কষ্টের কারণে তারা হয়ে যাবে বাকরুদ্ধ। অন্তরে জ্বলবে আক্ষেপের আগুন। সে আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকলেও সে কথা তারা মুখে প্রকাশ করতে পারবে না। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, গোপনতাকেই বলা হয় সির। কথাটি 'রাজ' বা 'রহস্য' কথাটির সমার্থক। অর্থাৎ তখন আক্ষেপের ব্যাপারটি থাকবে সংগুপ্ত ও সংরক্ষিত। এভাবে ইসরার (আসার্রু) কথাটির অর্থ হবে বিশুদ্ধ অনুতাপ, অনুশোচনা বা আক্ষেপ।

এরপর বলা হয়েছে— ওয়া কুদ্বিয়া বাইনাহুম বিল ক্বিস্ত্বি ওয়াহুম লা ইউজলামুন (তাদের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সঙ্গে করা হবে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না)। এ কথার অর্থ— সেদিন সম্পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করা হবে। অর্থাৎ অপরাধ করেনি অথচ শাস্তি পাবে এ রকম সেখানে কিছুতেই হবে না। এখানে 'কুদ্বিয়া' বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদের শিরিক বা অংশীবাদিতার শাস্তিকে।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'সাবধান! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নয়।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! উত্তমরূপে অবগত হও যে, আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকল কিছুই আল্লাহ্‌র। তাই তিনিই কেবল সওয়াব ও আযাব দেয়ার একচ্ছত্র অধিকারী। আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁর অধিকার বহির্ভূত নয়। সুতরাং সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি বিশ্বাসীদেরকে পুণ্য এবং অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দানের যে অংগীকার করেছেন, সে অংগীকার বাস্তবায়িত হবেই হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই চিরন্তন সত্যটি অনুধাবন করতে সচেষ্ট হয় না। পার্থিবতা ও প্রাত্যহিকতাকেই করে তোলে মূল উদ্দেশ্য।

এর পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌ই পৃথিবীতে জীবন দান করেন এবং পৃথিবীতেই সেই জীবনের মৃত্যু ঘটান। আখেরাতে পুনরায় জীবন দান করবেন কিন্তু সেখানে আর কখনোই মৃত্যু ঘটাবেন না। এটা হচ্ছে তাঁর অপার ক্ষমতার একটি অতুলনীয় নিদর্শন। আর হে মানুষ! তোমাদের সকলকে আপনাপন সমাধি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতেই হবে।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

❒ হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তাহার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া।

❒ বল,'ইহা আল্লাহের অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়ায়, সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক।' ইহা উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ।' এ কথার অর্থ— হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে মহান উপদেশ। অর্থাৎ তোমাদের রসুলের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মজীদ। এই কোরআন তোমাদেরকে সতর্ক করে। আহ্বান জানায় কল্যাণের দিকে এবং বিরত থাকতে

বলে অন্যায় থেকে। সুতরাং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে পুণ্য-কর্মসমূহ সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন, তা অতি উত্তম এবং তার পরিণতিও অত্যুত্তম। আর যা করতে নিষেধ করেছেন, তা অতি মন্দ এবং তার পরিণতিও অতি মন্দ। জেনে রাখো, উত্তম কর্মের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর মন্দ কর্মের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনে আরো রয়েছে, তোমাদের অন্তরের সকল অপবিশ্বাসের চিকিৎসা, ব্যবস্থাপত্র ও নিরাময়। এখানে 'অন্তরের ব্যাধি' অর্থ ভ্রান্ত বিশ্বাস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি আকর্ষণ, সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণতা, কপটচারিতা ইত্যাদি। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, এক লোক রসুল স. এর মহান সংসর্গে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার বক্ষদেশ অসুন্দর ধারণাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। রসুল স. বললেন, কোরআন পড়ো। কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন— ওয়া শিফাউল্ লিমা ফিস্সুদুর (এবং তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে এর প্রতিকার)। ইমাম বায়হাকীর শো'বুল ইমানে হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ।' এ কথার অর্থ— এই কোরআনে আরো রয়েছে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের বিবরণ। রয়েছে দিক-নির্দেশনা জান্নাতের, আল্লাহ্পাকের নৈকট্যভাজনতার। রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থানের পর কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে— পড়ো ও উন্নততর হও। পৃথিবীতে যেভাবে যত্নসহকারে পাঠ করতে, এখানেও তেমনি সযত্ন পাঠক হও। যতক্ষণ তুমি পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবহমান থাকবে তোমার মর্যাদার ক্রমোন্নতি। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসাঈ।

শেষে বলা হয়েছে— 'এবং দয়া।' এ কথার অর্থ— বিশ্বাসীদের জন্য এই কোরআনে যেমন পথ-নির্দেশ রয়েছে, তেমনি রয়েছে দয়া বা রহমত। এই দয়ার সূত্রে বিশ্বাসীগণ কোরআনের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে। আর এই কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে চিরন্তন আশ্রয় লাভ করে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের সীমানায়।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'বলো, এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়, সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। এটা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।' *এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে* বলুন, আমি এই কল্যাণ লাভ করেছি কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে। আল্লাহ্পাকই আমাকে দয়া করে দান করেছেন এই উপদেশ, নিরাময়, পথ-নির্দেশ

ও দয়া। এটা আমার নিজস্ব সাধনাভূত কিছু নয়। সুতরাং এই কোরআন যারা পেয়েছে তারা এখন আনন্দ প্রকাশ করুক। কারণ, পৃথিবীতে এতো মহৎপ্রাপ্তি আর নেই। পৃথিবীর কোনো প্রাপ্তিই এতো আনন্দের নয়। হতে পারে না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ফজল (অনুগ্রহ) এবং রহমত (দয়া) অর্থ কোরআন মজীদের অবতরণ। মুজাহিদ ও কাতাদা বলেছেন, এখানে ফজল অর্থ ইমান এবং রহমত অর্থ আল কোরআন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, ফজল অর্থ ইমান এবং রহমত অর্থ কোরআনুল করীম।

হজরত আনাস থেকে আবু শায়েখ প্রমুখ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, এ কথা ভেবে তোমাদের আনন্দ প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্পাক আমাদেরকে ফজলস্বরূপ দান করেছেন কোরআন এবং রহমত স্বরূপ করেছেন, কোরআনধারী। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, আল্লাহ্পাকের ফজল হচ্ছে ইসলাম এবং রহমত হচ্ছে ইসলামের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ।

হজরত খালেদ বিন মা'দান বলেছেন, আল্লাহ্পাকের ফজল হচ্ছে ইসলাম এবং আল্লাহ্পাকের রহমত হচ্ছে রসুল স. এর সুন্নত। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ইমান হচ্ছে ফজল এবং জান্নাত হচ্ছে রহমত।

শেষে বলা হয়েছে— 'এটা তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাকের ফজল ও রহমত পৃথিবীর সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৫৯, ৬০

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ○ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

❑ বল, 'তোমরা আমাকে বল— আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করিয়াছ আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতেছ?

❑ যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে কিয়ামত-দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগের কী ধারণা? নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আমাকে বলো— আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু বৈধ ও কিছু অবৈধ করেছো।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, হে বিভ্রান্ত জনতা! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ বা রিজিক দিয়েছেন, সেই রিজিকের কিছু অংশ তোমরা নিজস্ব বিবেচনায় হালাল এবং কিছু অংশ হারাম করে নিয়েছো কেনো? যিনি রিজিকদাতা তিনি কি তোমাদেরকে এ রকম করতে বলেছেন?

'আনজালা' শব্দটির অর্থ— অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে দিয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন। রিজিক সৃষ্টি করাকে অবতীর্ণ করা বলা যায় এ কারণে যে, ঊর্ধ্বদেশ থেকে পতিত বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে উৎপন্ন হয় রিজিক। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, মহাবিশ্বের সকল কিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্পাক সেগুলোর নাম ও বিধান লিখে রেখেছেন লওহে মাহ্ফুজে। সেখানকার বিধানানুসারে সৃষ্টিকূলের রিজিকের বন্দোবস্ত করা হয়। এই অর্থে রিজিক অবতীর্ণ হয় লওহে মাহ্ফুজ থেকে। কিন্তু তা উৎপন্ন হয় চাষাবাদ ও পশুপালনের মাধ্যমে। এখানে 'লাকুম' (তোমাদের জন্য) শব্দটি প্রয়োগ করার ফলে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্পাক কতৃর্ক বৈধ ঘোষিত জীবনোপকরণের কিছু অংশকে হালাল এবং কিছু অংশকে হারাম সাব্যস্ত করেছিলো অংশীবাদীরা। এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, অংশীবাদীরা বলেছিলো— হাজিহিল আনআ'মু খলিসাতুন লিজুকুরিনা ওয়া মুহাররামুন আ'লা আজওয়াজিনা (ওই সকল পশুর পেটের মধ্যে যা কিছু আছে, তা পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম)। তারা বাহিরা, সায়েবা, ওসিলা ও হাম— এ ধরনের উষ্ট্রশাবকগুলোকেও হারাম ঘোষণা করেছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো? এ কথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তো ওগুলোকে হারাম করেননি। হারাম করেছো তোমরা। কিন্তু তোমরা বলো, আল্লাহ্ই এগুলোকে হারাম করেছেন। এভাবে তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছো। কেনো এ রকম করেছো ? পরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— যারা আল্লাহ্ সমন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা ? এ কথার অর্থ, হে পথচ্যুত জনগোষ্ঠী! তোমরা যারা মনগড়া হালাল হারামের বিধানকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত করো, মিথ্যার উদ্ভাবন ঘটাও, তাদের প্রতি প্রশ্ন— মহাপ্রলয় দিবস সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? তোমরা কি ওই ভয়ংকর দিবস সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করো? এখানে আয়াতের শুরুতে 'মা'

শব্দটির উল্লেখের মধ্যে এই ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। শেষে বলা হয়েছে— নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এ কথার অর্থ— মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহপরায়ণতার বিষয়টি সুনিশ্চিত। ওই অনুগ্রহপরায়ণতার সূত্রেই মানুষকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান, নবী, রসুল এবং আসমানী কিতাব। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্তায়ালার এই অযাচিত অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। যদি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তবে তাদের জ্ঞানপ্রবাহ অবশ্যই পরিচালিত হতো শুভবোধের দিকে। আর তখন তারা এভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করতে পারতো না। আলোচ্য বাক্যের এ রকম অর্থও হতে পারে যে— আল্লাহ্পাক মানুষের প্রতি অত্যধিক কৃপাপরায়ণ। তাই তাদের সীমাহীন অবাধ্যতার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এই পৃথিবীতে শাস্তি অবতীর্ণ করেন না। বরং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত করে রাখেন তওবার তোরণ।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬১

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُبِينٍ

☐ তুমি যে-কোন কার্যে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে-কোন কার্য কর, আমি তোমাদিগের পরিদর্শক— যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ— হে আমার রসুল ! আপনি যে কোন কাজ শুরু করেন না কেনো এবং তৎসম্পর্কে কোরআনের যে কোনো আয়াত আবৃত্তি করেন না কেনো এবং হে মানুষ! তোমরা যে কোনো কাজ করোনা কেনো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই আমি পর্যবেক্ষণ করি।

এখানে 'তাকুনু' শব্দটির মাধ্যমে রসুল স.কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 'লাতা'লামুনা' এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সকল মানুষকে। 'শা'নিন্' অর্থ এখানে আমর বা বিধান। জনৈক শুদ্ধচিত্ত আলেম বলেছেন, এখানে 'শান' অর্থ

মহান। অর্থাৎ মহান বিধান। বায়যাবী লিখেছেন এখানে 'শান' অর্থ হবে ক্বাসদুন। 'শা'নাতু শা'নাহু' কথাটির অর্থ— আমি এটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করেছি। এখানে 'মিনহু' এর 'হু' সর্বনাম 'শান' শব্দটির দিকে প্রত্যাবর্তিত। কোরআন আবৃত্তি ছিলো রসুল স. এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য কর্ম। অর্থাৎ রসুল স. মহান কর্তব্য জ্ঞানে কোরআন মজীদ আবৃত্তি করতেন। এখানে 'মিন কোরআন' কথাটির 'মিন' বর্ণনামূলকও হতে পারে। আবার হতে পারে অতিরিক্ত। এর অর্থ— আপনি কোরআনের যা কিছু অথবা যে কোনো অংশ আবৃত্তি করেন। 'ওয়ালা তা'মালুনা মিন আ'মালিন (তোমরা যে কোনো কাজ করো) কথাটির মধ্যে মূখ্যতঃ রসুল স.কে এবং গৌণতঃ অন্য সকলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা রসুল স. সকল মানুষের জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন। তাই আয়াতের শুরুতেই তাঁর মহান কর্তব্য কর্মের কথা প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে উল্লেখ করা হয়েছে অন্য সকলকে। এর পরে বলা হয়েছে— ক্ষুদ্র বৃহৎ অন্যান্য কর্মসমূহের কথা। বক্তব্যের যতিপাত ঘটেছে 'আমি তোমাদের পরিদর্শক' কথাটির শেষে। পরক্ষণেই আবার বক্তব্যটিকে প্রলম্বিত করা হয়েছে এই বলে যে, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও'। 'ইজ তুফিদ্বুনা ফীহ্' অর্থ যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ যখন তোমরা কর্মসমূহের সূচনা করে থাকো। কেউ কেউ বলেছেন, 'ইফাদ্বা' শব্দটির অর্থ বহুসংখ্যক কর্ম। তাই 'তুফিদ্বুনা' কথাটির অর্থ হবে 'তাকছারুনা' (অত্যধিক কর্ম)।

এরপর বলা হয়েছে—'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' এ কথার অর্থ— হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকটে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই গোপন নয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়াত্ব এবং সকল কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে লওহে মাহ্ফুজে।

এখানে 'মাইয়াজুবু' অর্থ অগোচর নয়। 'মিম্মিছক্বালি' (অণু পরিমাণ) কথাটির 'মিন্' এখানে অতিরিক্ত। 'মিছক্বালা' শব্দটি একটি মূল শব্দ। 'জাররাতিন' অর্থ মৃত্তিকা কণা। এখানে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে আকাশের আগে। বলা হয়েছে, 'ফিল্আরদ্বি ওয়ালা ফিস্সামায়ি'। পৃথিবীবাসীদের নিকটে আকাশাপেক্ষা পৃথিবীই অধিকতর নিকটে। তাই এখানে পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে আকাশের আগে। এখানে পৃথিবী ও আকাশ অর্থ সম্ভাব্য জগত (আলমে এমকান) এবং অস্তিত্বের জগত (আলমে হাসতি)। এভাবে মূল বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে এ রকম— ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং বৃহদাতিবৃহৎ কোনো কিছুই আল্লাহ্র দৃষ্টির অগোচর নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার অসীম জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর দর্শনায়ত্ত।

এখানে 'যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' কথাটির অর্থ হবে, যা লওহে মাহফুজে নেই। অথবা যা ওই আমলনামায় নেই, যে আমলনামা সংরক্ষণ করে কিরামান এবং কাতেবিন ফেরেশতাদ্বয়।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

❒ জানিয়া রাখ! আল্লাহের বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে— অলি আল্লাহ্গণের (আল্লাহ্র বন্ধুগণের) কোনো ভয় নেই। পুনরুত্থান দিবসে তাঁদের অন্তরে আযাব গজবের কোনো ভয় তো থাকবেই না, থাকবে না অপ্রাপ্তিজনিত কোনো আক্ষেপ। কারণ তাঁরা তখন হবেন পূর্ণপরিতৃপ্ত।

'ওয়ালায়ি' এবং 'তাওয়ালি' শব্দ দু'টোর আভিধানিক অর্থ— দুই বা ততোধিক বস্তুর সহজ সরল সম্পৃক্তি ও নৈকট্য। রূপক অর্থ এখানে গ্রহণীয়। অর্থাৎ এখানে নৈকট্য শব্দটিই বিবেচ্য। সে নৈকট্য স্থানগত, পরিবারগত, ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, সৌহার্দিক, সাহায্য ও সম্মান সম্পর্কীয়— যাই হোক না কেনো। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'ওয়ালইউন কুরীব ওয়ালিউন।' 'ওয়াল্ইয়ুন' হচ্ছে বিশেষণাত্মক শব্দ। এর অর্থ— নৈকট্য প্রদানকারী, বন্ধু এবং সাহায্যকারী।

বেলায়েত বিষয়ক আলোচনাঃ স্বাভাবিকভাবে সকল ব্যক্তি ও বস্তু আল্লাহ্-পাকের নিকটবর্তী। কিন্তু এই নৈকট্যের ধরন ও তত্ত্ব কারো জানা নেই। আল্লাহ্-পাক এরশাদ করেছেন— নাহনু আকুরাবু ইলাইহি মিন হাব্লিল ওয়ারীদ (আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটে)। এই নৈকট্যের কারণে সৃষ্টি তার অনস্তিত্ব পরিত্যাগ করে অস্তিত্বে স্থিত হতে পেরেছে এবং প্রবহমান রাখতে পেরেছে জীবনকে। এই নৈকট্য ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রাপ্তি ছিলো অসম্ভব। আল্লাহ্র পবিত্র অস্তিত্বের আনুরূপ্যবিহীন আলোয় পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে অনস্তিত্বের দুর্জ্ঞেয় অধ্যায়। আল্লাহ্র সঙ্গে সৃষ্টির এই নৈকট্যটি একটি সাধারণ নৈকট্য। কিন্তু তাঁর বিশেষ দাসদের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ নৈকট্য রয়েছে। ওই নৈকট্য হচ্ছে মহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা। যারা আত্মিক দর্শনধারী (কাশফ্ধারী) তারা আলমে মেসালে (উদাহরণের জগতে) এই নৈকট্যের একটি আনন্দদায়ক আকৃতি অবলোকন করেন। সৃষ্টির স্বাভাবিক নৈকট্য এবং বিশেষ ব্যক্তিগণের বিশেষ নৈকট্যের মধ্যে বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকলেও নৈকট্যের ধরন দু'টো পৃথক। আর বিশেষ নৈকট্যের পথ অন্তহীন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমার বান্দারা নফলের কারণে আমার নৈকট্য অর্জন করতে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায় আমি তাকে ভালোবাসি। যখন ভালোবাসি, তখন আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি, যার মাধ্যমে সে শোনে এবং হয়ে যাই তার দৃষ্টি, যার মাধ্যমে সে অবলোকন করে (তার ওই সময়ের সকল কাজ দৃশ্যতঃ তার, কিন্তু মূলতঃ আমার)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। ভালোবাসাজাত এই নৈকট্যের প্রথম স্তর হচ্ছে ইমান বা বিশ্বাস। আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজীনা আমানু (আল্লাহ্ই বিশ্বাসীগণের অভিভাবক)।

আর এই বিশেষ নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নবী ও রসুলগণের নৈকট্যের স্তর। ওই স্তরের মূল নায়ক হচ্ছেন রসুল মোহাম্মদ স.। তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসার সীমা পরিসীমা নেই।

মহান সুফীগণের অভিমতানুসারে যারা এই বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন তারাই আল্লাহ্‌র অলি। আল্লাহ্‌র জিকিরে সতত সচল থাকে তাঁদের হৃদয়। প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন। প্রেম সাগরে হাবুডুবু খান সারাক্ষণ। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মহব্বত তাঁদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয় না। পিতা-পুত্র, বন্ধু-বধু কারো সঙ্গেই তাঁরা সত্তাগতভাবে সম্পৃক্ত নন। কাউকে ভালোবাসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসেন। ঘৃণা করলেও ঘৃণা করেন আল্লাহ্‌র জন্যই। দান করলেও দান করেন আল্লাহ্‌র জন্যেই। আল্লাহ্‌র জন্যেই সৃষ্টির সঙ্গে কখনো হোন সম্পৃক্ত, কখনো হোন পৃথক। সূফীগণের মতে এই অবস্থার নাম ফানায়ে কলব (হৃদয়ের সমাহিতি)। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায় তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত। আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় বিষয়াবলী থেকে তাঁরা মুক্ত। শিরকে জলী ও শিরকে খফী (স্থূল শিরিক ও সূক্ষ্ম শিরিক) থেকে পবিত্র। পবিত্র শিরকে আখফা (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরিক) থেকে। যে শিরিক পিপীলিকার পদবিক্ষেপের চেয়েও মৃদু সে শিরিককেও তাঁরা পরিত্যাগ করেন। পরিত্যাগ করেন অহংকার, পরিত্যাগ করেন অহমিকা, হিংসা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি অপপ্রবণতাগুলোকে। তখন তাঁদের প্রবৃত্তিও হয় পরিশুদ্ধ। সূফীগণ বলেন, এই অবস্থার নাম ফানায়ে নফস্ (প্রবৃত্তির সমাহিতি)। তাঁরা এ কথাও বলেন, যাঁরা এই স্তরে উন্নীত হোন, সেই সকল অলিআল্লাহ্‌র নিকটে শয়তান হয় চিরদিনের জন্য পরাস্ত।

দ্রষ্টব্যঃ সমানার্হ গ্রন্থকর্তা এখানে (টীকাভাষ্যের স্থানে) একটি ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। ইতোপূর্বে এই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় কবিতাটি উল্লেখ করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেয়া যেতে পারে।

সুরা ইউনুসঃ আয়াত ৬৩

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

❐ যাহারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে,

এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' বলে বুঝানো হয়েছে অলিআল্লাহ্‌গণকে। তাঁরাই পূর্ণ ইমানদার। হৃদয় বা কলব হচ্ছে ইমানের আধার। আল্লাহ্‌পাকের স্মরণে হৃদয় পরিতৃপ্ত রাখাই হচ্ছে পূর্ণ ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য। তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌তায়ালার জিকির থেকে এক মুহূর্ত গাফেল থাকে না। সৃষ্টির প্রতি অন্তরের অন্তস্থলজনিত মনোযোগ তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে, 'ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন'(এবং সাবধানতা অবলম্বন করে)। এ কথার অর্থ— ওইসকল আওলিয়া প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পূর্ণ আনুগত্যকে আশ্রয় করে থাকেন।

জ্ঞাতব্যঃ হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, কোনো কিছু থেকে তুমি নিজেকে উত্তম মনে কোরো না। এটাই তাকওয়া। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. বলেছেন, যে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম মনে করে, তার উপর আল্লাহ্‌র মারেফত হারাম।

হজরত ওমর থেকে আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের বান্দাগণের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা নবী অথবা শহীদ কোনোটাই নয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন ওই সকল লোককে নবী, রসুল ও শহীদগণ সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে দেখে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! তারা কারা? তিনি স. বললেন, যারা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য সকলকে ভালোবাসে (ধন সম্পদ বা অন্য কোনো কারণে নয়)। আল্লাহ্‌র শপথ! কিয়ামতের দিন তাদের নূরই হবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল নূর। আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তখন মানুষ থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত। কিন্তু তাদের সেখানে কোনো ভয়-ডর থাকবে না। মানুষ তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে কিন্তু তারা কোনো দুশ্চিন্তায় পড়বে না। এরপর রসুল স. উচ্চারণ করলেন, আ'লা ইন্না আউলিয়া আল্লহি লা খওফুন আ'লাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্‌জানূন (জেনে রাখো! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না)। হজরত আবু মালেক আশআরী থেকেও বাগবী এ হাদিসটি লিখেছেন। বায়হাকী লিখেছেন তাঁর শো'বুল ইমানে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লহি' সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, তারা ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসে। হজরত জাবের থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বেলায়েত অর্জনের মাধ্যমঃ বেলায়েত বা নৈকট্য অর্জনের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছেন স্বয়ং রসুলে মকবুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। সাহাবায়েকেরাম তাঁর মাধ্যমে বেলায়েত অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী সময় বেলায়েত অর্জনের মাধ্যম হচ্ছেন রসুল স. এর প্রতিনিধিবৃন্দ অর্থাৎ আউলিয়ায়েকেরাম। সুতরাং আউলিয়ায়েকেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ অত্যন্ত জরুরী। তাঁদের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে অন্তর ও বাহির আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়। একেই বলে সিবগাতুল্লহ্ (আল্লাহ্‌র রঙ)। এ সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'সিবগাতুল্লহ্ ওয়ামান আহ্‌সানু মিনাল্লহি সিবগাহ্ (আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্‌র রঙ। রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর)। আউলিয়ায়েকেরামের প্রবর্তিত তরিকার মাধ্যমে বিরতিহীন জিকির অর্জন করা যায়। অপসারিত করা যায় হৃদয়ের অপরিচ্ছন্নতাসমূহকে। হৃদয় হয়ে যায় দর্পণের মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র। রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বস্তু পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে শানযন্ত্র। আর হৃদয় পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র জিকির। বায়যাবী।

আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস থেকে ইমাম মালেক, আহমদ ও বায়হাকী লিখেছেন, হজরত মুয়াজ বিন জাবাল বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে এ রকম বলতে শুনেছি— আল্লাহ্পাক বলেন, দু'জন ব্যক্তি যদি আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, এক সঙ্গে ওঠাবসা করে এবং একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তবে তাদেরকে ভালোবাসা আমার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। হজরত উবাদা বিন সামেত থেকে ইমাম আহমদ, তিবরানী ও হাকেম এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে দূরে থেকে কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে কিন্তু তাদের নিকট পৌঁছতে পারে না। রসুল স. বললেন, ওই লোকের হিসাব হবে তার ওই প্রিয়জনদের সঙ্গে। এখানে উল্লেখিত প্রশ্নটির উদ্দেশ্য ছিলো এ কথা বলা যে, আমলের দিক থেকে ওই ব্যক্তি তার প্রিয়দলের লোকদের নিকটবর্তী নয়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিখেছেন, হজরত আবু রজীন উল্লেখ করেছেন, আমাকে রসুল স. বলেছেন, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, কোন্ পথে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ? প্রকৃত কল্যাণের পথ এই— জিকিরকারীদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের অনুসরণ করো। যখন একাকী থাকবে, তখনও অন্তরে জিকির জারী রাখো। আর মানুষকে ভালোবাসো আল্লাহ্র ওয়াস্তে এবং ঘৃণাও করো আল্লাহ্র ওয়াস্তে।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনের উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও শত্রুতা করা।

আল্লাহ্পাকের মহব্বতঃ আউলিয়ায়েকেরামের একটি দল আল্লাহ্পাকের মাহবুব (প্রিয়ভাজন)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক যখন তাঁর কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত করো। তখন জিবরাইলও তাকে ভালোবাসতে থাকে এবং আসমানের অন্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে, আল্লাহ্ তাঁর অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন, তোমরাও তাকে মহব্বত করো। তখন আসমানের সকল ফেরেশতা ওই লোককে ভালোবাসে। সে তখন পৃথিবীবাসীদের নিকটেও ভালোবাসার পাত্র হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক লোককে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো। জিবরাইলও তখন তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং আকাশের

ফেরেশতাগণকে ডেকে বলে, আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন তোমরাও তাকে ঘৃণা করো। একথা শুনে ফেরেশতারাও ওই লোককে ঘৃণা করতে থাকে। শেষে পৃথিবীবাসীদের নিকটেও সে হয় ঘৃণার পাত্র।

অলি আল্লাহ্গণের বৈশিষ্ট্যঃ রসুল স.কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আউলিয়া কারা? তিনি স. বললেন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্পাকের কথা মনে হয়। রসুল স. আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, আমার বান্দাগণের মধ্যে তারাই আওলিয়া, যাদের কথা স্মরণ হলে আমার কথা স্মরণ হয় এবং আমার কথা স্মরণ করলেও তাদের কথা স্মরণ হয়ে থাকে। হাদিস দু'টো বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি রসুল স. কে বলতে শুনেছি, আমি কি বলবো তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, যাকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। ইবনে মাজা।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম রহস্য। সে সূক্ষ্ম রহস্যটি এই— আল্লাহ্ ও আউলিয়া একে অপরের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা সূত্রে সম্পর্কিত। আর এ রকম সম্পর্কধারীরা আনুরূপ্যবিহীনভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই একজনের স্মরণে অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্ভাসিত হয় স্মৃতিপটে। যেমন, সূর্যরশ্মি সম্মুখে স্থাপিত আয়না। ওই আয়নায় পড়ে সূর্যকিরণের প্রতিফলন। ফলে আয়নার সম্মুখে স্থাপিত বস্তুও সূর্যকিরণের প্রতিবিম্বের প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল হয়। ওই আয়নার খুব কাছে তুলা রাখলে সে তুলোতে ধরে যায় আগুন। অথচ সরাসরি সূর্যকিরণে তুলায় আগুন ধরে না। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্পাক তাঁর আউলিয়াদেরকে দান করেছেন শুদ্ধিকরণের যোগ্যতা এবং সঠিক পরিমাপের ক্ষমতা। আল্লাহ্র নূরে আনুরূপ্যবিহীনভাবে নূরান্বিত হওয়ার কারণে তাঁরা মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। তাই তাঁদের সংসর্গ আল্লাহ্পাকের সংসর্গতুল্য এবং তাঁদের স্মরণ আল্লাহ্র স্মরণের অনুরূপ। তাই তাঁদের দর্শন যাঁদের ভাগ্যে ঘটে এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে উপবেশন করেন, তাঁরা কখনো বঞ্চিত হবেন না। পথভ্রষ্ট হবেন না। আর যারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো হেদায়েতের ফয়েজ লাভ করতে পারবে না। তারা ফাসেক। আর ফাসেক সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেছেন— 'ওয়াল্লহু লা ইয়াহ্দিল কওমাল ফাসিক্বীন।'

রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেন, যারা আমার অলিদের সঙ্গে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী।

একবার হজরত হানজালা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনার সঙ্গে থাকলে মনে হয় জান্নাত ও জাহান্নামকে চাক্ষুষ করছি। আর আপনার সংসর্গচ্যুত হয়ে সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হয়ে গেলে মনে হয় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। রসুল

স. বললেন, আমার জীবনাধিকারী পবিত্র সত্তার শপথ। যদি আমার সংসর্গে সবসময় থাকতে তবে ফেরেশতারা উঠতে বসতে তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতো। কিন্তু হে হানজালা, এটা হচ্ছে পৃথিবী। তাই এখানে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। রসুল স. একথাটি উচ্চারণ করলেন তিনবার। মুসলিম।

দ্রষ্টব্যঃ সাধারণ মানুষ কাশ্‌ফ ও কারামাতকে (আত্মিক দৃষ্টি ও অলৌকিকত্বকে) বেলায়েতের বিশেষ নিদর্শন বলে মনে করে। কিন্তু তাদের এ ধারণাটি যথার্থ নয়। কারণ অনেক আউলিয়ার মধ্যে বিষয় দু'টো বিদ্যমান থাকে না। আবার যারা ইমানদার নয়, তাদের মধ্যেও কখনো কখনো অলৌকিক অনেক কিছু প্রকাশিত হয়। সুতরাং অলৌকিকত্ব কখনো আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজনতার (বেলায়েতের) মাপকাঠি নয়। আউলিয়ায়েকেরামের মাধ্যমে কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশিত হলেও এ দু'টোকে বেলায়েতের প্রধান নিদর্শন বলে মনে করা যাবে না। আল্লাহ্‌পাক তাঁর প্রিয় রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— 'কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিছলুকুম ইউহা ইলাইয়া' (হে রসুল! আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতো মানুষ কিন্তু আমার উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়)। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কুল লাওকুনতু আ'লামুল গইবা লাস্‌তাকসাবতু মিনাল খইরি ওয়ামা মাস্‌সানিইয়াস্‌ সুউ'(হে রসুল! আপনি বলুন, আমি যদি অদৃশ্যের সকল জ্ঞানের অধিকার লাভ করতাম তবে নিজের জন্য সঞ্চয় করতে পারতাম কেবল কল্যাণ এবং কোনো মন্দ আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না)। অন্য আরেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে— 'কুল ইন্নামাল আয়াতু ইনদাল্লহ্‌' (হে আমার প্রিয় রসুল! আপনি বলুন, মোজেজাসমূহ আল্লাহ্‌পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন)।

সম্মানার্হ সুফী সাধকগণ বলেছেন, কারামত গোপন রাখাই সমীচীন। কেবল কারামতের কারণে এক জন অলি আল্লাহ্‌কে অন্যজন অপেক্ষা অধিক মর্যাদামণ্ডিত মনে করা ঠিক নয়। যারা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র ওলি তাঁরা তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশিত কারামতের জন্য লজ্জাবোধ করেন।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬৪

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

❒ তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে ; আল্লাহের বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; ইহাই মহাসাফল্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্যভাজনদেরকে পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে সুসংবাদ দানের কথা বলা হয়েছে। তাই পৃথিবীতে সকল সাহাবীগণকে সাধারণভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো। আর বিশেষভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো বিশেষ সাহাবীগণকে।

হজরত আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ থেকে তিরমিজি এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ থেকে ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যোবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে জায়েদ জান্নাতী এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ জান্নাতী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হে আবু বকর! আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তুমি। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, সর্বপ্রথম সমাধি থেকে উত্থিত হবো আমি। এরপর আবু বকর। তারপর ওমর। হজরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ থেকে তিরমিজি লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একজন প্রিয়জন থাকে। জান্নাতে আমার প্রিয়জন হবে ওসমান। হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. হজরত আলীকে বলেছেন, রসুল মুসার সঙ্গে নবী হারুণের যে সম্পর্ক, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরকম। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে আহমদ ও তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি যার মাওলা (বন্ধু), আলীও তার মাওলা। হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। যারা তাকে কষ্ট দিবে তারা আমাকে কষ্ট দিবে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিরমিজি উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার যুগল দৌহিত্র হাসান ও হোসাইন হবে জান্নাতী যুবকদের সর্দার। আর জান্নাতের রমণীদের মধ্যে সর্বোত্তমা হবে মরিয়ম বিন ইমরান এবং খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। তিনি স. আরো বলেছেন, সকল আহার্যের তুলনায় ছরিদের মর্যাদা যেরকম, সকল রমণীদের তুলনায় আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমনি। তিনি স. আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর পুণ্যবান (সালেহ্)। শেষোক্ত হাদিসটি হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার আনসার সাহাবীগণকে যারা মহব্বত করবে তারা মুমিন এবং যারা তাদেরকে হিংসা করবে তারা মুনাফিক। যারা আনসারগণকে ভালোবাসবে আল্লাহ্পাক তাদেরকে ভালোবাসবেন। আর যারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণা করবেন। তিনি স. আরো বলেছেন, উসায়েদ ইবনে হুদায়ের উত্তম ব্যক্তি, সাবেত ইবনে কায়েস, মুয়াজ ইবনে জাবাল ও মুয়াজ বিন

ওমর জামুহ্ও ভালো লোক। তিনি স. আরো বলেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাত আগ্রহান্বিত— আলী,আম্মার ও সালামান। রসুল স. এভাবে অনেক সাহাবীকে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আর সকল সাহাবীগণকে আল্লাহ্পাক নিজেই সুসংবাদ দিয়েছেন এভাবে— ওয়াকুল্লাও ওয়াদাল্লহুল হুসনা (আর প্রত্যেকের সঙ্গে কল্যাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে)। আল্লাহ্পাক বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকেও (মুখলিসদেরকেও) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সাধারণভাবে এরকম আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ওয়াল্লাজীনা মাআ'হু (আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ আর যারা তার সহচর) শেষ পর্যন্ত।

রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণের দোষচর্চা কোরো না। তোমরা যারা আমার সাক্ষাত পাওনি, তারা আল্লাহ্র রাস্তায় উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা ব্যয় করলেও আমার সাহাবীগণের এক সা অথবা অর্ধ সা যব ব্যয় করার সওয়াব পাবে না। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ওমর থেকে রজীন উল্লেখ করেছেন, রসুল স. ঘোষণা করেছেন, আমার সাহাবীবৃন্দ নক্ষত্রপুঞ্জতুল্য। তাদের যে কোনো একজনকে অনুসরণ করলেও তোমরা হেদায়েত পেয়ে যাবে। হজরত ইমরান বিন হোসাইন থেকে বোখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে আমার সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরবৃন্দ। তারপর তাদের সহচরবৃন্দ।

রসুল স. এর মহাপ্রস্থানের পর আওলিয়ায়েকেরাম সুসংবাদ পেয়ে থাকেন স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় আলমে মেসালের মাধ্যমে। আলমে মেসাল থেকে আসা স্বপ্নই হচ্ছে উত্তম স্বপ্ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এখন সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়তের কোনো প্রতি-বিম্বজাত অংশ নেই। (নবুয়ত বন্ধ, তাই প্রত্যাদেশ আর আসবে না)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! সুসংবাদ তাহলে কী? রসুল স. বললেন, সত্য স্বপ্ন।

হজরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, আমি রসুল স. এর নিকট 'তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে'— এই আয়াতে উল্লেখিত সুসংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি স. বলেছিলেন, এখানে উল্লেখিত সুসংবাদের অর্থ সত্য স্বপ্ন।

হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর নিকটে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলাম। জবাবে তিনি স. বলেছিলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তুমি ছাড়া আর কেউ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চায়নি।

এখানে উল্লেখিত বুশরা বা সুসংবাদ হচ্ছে সত্য স্বপ্ন— যা মুমিনদেরকে দেখানো হয়। এটাই পার্থিব জীবনের সুসংবাদ। আর আখেরাতের সুসংবাদ হচ্ছে জান্নাত। বিভিন্ন সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও সাঈদ ইবনে মনসুর।

এখানে সত্য স্বপ্ন বলে সাধারণ মুমিনদের স্বপের কথা বোঝানো হয়নি। বোঝানো হয়েছে আওলিয়া ও সালেহীনদের স্বপ্নকে। রসুল স. বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার— ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। ২. অপপ্রবৃত্তির পক্ষ থেকে কল্পনা প্রসূত ঘটনা। ৩. শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদ দৃশ্যাবলী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তিরমিজি ও ইবনে মাজা। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ।

একটি সন্দেহঃ স্বপ্ন তো স্বপ্নই। তাহলে আওলিয়া ও পুণ্যবানদের স্বপ্নকে নির্ভরযোগ্য বলা হবে কেনো?

সন্দেহ ভঞ্জনঃ স্বপ্ন যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে শুভ বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকেই বলতে হবে সুসংবাদ। রসুল স. এরশাদ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ ও ইবনে মাজা। হজরত আউফ বিন মালেক থেকেও ইবনে মাজা অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ প্রথম দিকে রসুল স. এর উপর নবুয়তের হাল (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ হতো স্বপ্নে। ছয় মাস ধরে এরকম হয়েছিলো। রসুল স. স্বপ্নে যা দর্শন করতেন তা-ই প্রতিফলিত হতে দেখতেন বাস্তবে। এরপর শুরু হয় ওহীর (প্রত্যাদেশের) প্রকাশ্য ধারাবাহিকতা। এ অবস্থা চলে তেইশ বছর ধরে— মহাপ্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত। এভাবে স্বপ্নজাত সুসংবাদের সময়সীমা (ছয় মাস), তেইশ বছরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগই হয় (ছয় মাস এক বৎসরের দুই ভাগের এক ভাগ এই হিসেবে ছয়মাস তেইশ বৎসরের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর থেকে আহমদ এবং হজরত ওমর থেকে ইবনে মাজা উল্লেখ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে নাজ্জার উল্লেখ করেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের পঁচিশ অংশের এক অংশ।

আল বুশরা (সুসংবাদ) কথাটি সাধারণ অর্থে জান্নাত ও সওয়াবরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সাধারণ সুসংবাদটি সকল ইমানদারদের প্রতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকল বিশ্বাসী সওয়াব ও জান্নাত লাভ করবে— যদি তারা ইমানের সঙ্গে পৃথিবী পরিত্যাগ করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মানুষেরা সাতাশ গুণ সওয়াব

প্রাপ্তিকে সুসংবাদ বলে থাকে। আবদুল্লাহ্ বিন সামেত সূত্রে বাগবী উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু জর গিফারী একবার নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মানুষ তো পুণ্যকর্ম করে তার নিজের জন্য। কিন্তু তবুও মানুষেরা তাকে ভালোবাসে। রসুল স. বললেন, ওই ভালোবাসা হচ্ছে পার্থিব সুসংবাদ। মুসলিমের বর্ণনায় 'ভালোবাসে' কথাটির স্থলে এসেছে 'প্রশংসা করে'। জুহুরী এবং কাতাদা বলেছেন, অন্তিম যাত্রার সময় আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এই সুসংবাদকে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'আল বুশরা'। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন— তাতানায্যালু আ'লাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহ্জানু ওয়া আবশিরূ বিল্ জান্নাতি (তাদের প্রতি ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয়ে বলে, ভীত ও দুঃখিত হয়ো না, গ্রহণ করো জান্নাতের শুভসংবাদ)।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আতাও এরকম বর্ণনা করেছেন। 'ওয়াফিল আখিরাতি' অর্থ পারলৌকিক জীবনে। অর্থাৎ মৃত্যু- উত্তর জীবনে ইমানদারদের রূহ্কে আল্লাহ্তায়ালার নিকটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাকে দেয়া হবে আল্লাহ্তায়ালার প্রসন্নতার সুসংবাদ। কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়েও ইমানদারদেরকে সুসংবাদ দেয়া হবে।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াকে পছন্দ করে, আল্লাহ্ও তাকে সাক্ষাৎ দান করতে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় না, আল্লাহ্ও তাকে সাক্ষাৎ দিতে চান না। জননী আয়েশা অথবা অন্য কোনো উম্মত জননী একবার আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! মৃত্যু তো আমাদের কারো নিকটে পছন্দনীয় নয়। রসুল স. বললেন, মৃত্যুকালে ইমানদারদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও রহমতের সুসংবাদ দেয়া হয়। তাই তারা তখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। কিন্তু মৃত্যুকালে কাফেরদেরকে দেয়া হয় আযাব ও আল্লাহ্‌র অসন্তোষের সংবাদ। তাই তারা মৃত্যুকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারে না। বোখারী ও মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'তে বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময় ভীত হয় না। কবরের মধ্যেও তারা ভয় করে না। তারা তখন নিজের মস্তক থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে, আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহাবা আন্নাল হাযানা (সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা যিনি আমার নিকট থেকে দুর্ভাগ্যকে অপসারণ করেছেন)। তিবরানী। হজরত ইবনে আববাস থেকে মারফু সূত্রে খাত্তালীও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— লাতাব্দীলা লিকালিমাতিল্লাহ্ (আল্লাহ্র বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই)। এ কথার অর্থ— আল্লাহ্র কালাম (সেফাতুল কালাম) অপরিবর্তনীয়, অক্ষয়, চিরন্তন। আর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতিও অপরিবর্তনীয়। শেষে বলা হয়েছে— জালিকা হুওয়াল ফাউজুল আ'জীম (এটাই মহাসাফল্য)। এ কথার অর্থ— পার্থিব ও পারলৌকিক সুসংবাদ প্রাপ্তিই হচ্ছে চরম কৃতকার্যতা বা মহাসফলতা।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬, ৬৭

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

❒ উহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তিই আল্লাহের; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❒ জানিয়া রাখ! যাহারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহেরই। যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীক করে, তাহাদিগকে ডাকে তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

❒ তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিবার জন্য। যে-সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

'ওয়ালা ইয়াহ্যুনকা ক্বাওলুহুম (তাদের কথা তোমাকে যেনো দুঃখ না দেয়)। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদের কটু কথা ও ঠাট্টা পরিহাসের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেনো হবেন? তারা তো অজ্ঞ। আর স্মরণ করুন, 'ইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামীয়া' (সমস্ত শক্তিই আল্লাহ্র)। অর্থাৎ সাময়িক অবকাশের মধ্যে তারা যা কিছুই করুক না কেনো সকল কিছুর উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ তো কেবল আল্লাহ্রই। তিনি তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী, চির বিজয়ী। তিনিই তো আপনার সাহায্যদাতা। সুতরাং আপনি দুঃখিত হবেন কেনো?

হুওয়াস সামিউল আ'লীম (তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। এ কথার অর্থ— তিনি তো ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছুই শোনেন ও জানেন। তাই তিনি যথাসময়ে অবশ্যই তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করবেন।

পরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, যারা আকাশমণ্ডলে আছে এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা আল্লাহ্‌রই।'এ কথার অর্থ— আকাশ পৃথিবী এবং জড় অজড় সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ্‌। সুতরাং জেনে রাখো, হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! কোনো সৃষ্টিই কখনো স্রষ্টার মর্যাদা পেতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে—'যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে শরীক করে, তাদেরকে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে?' এ কথার অর্থ— যারা সম্পূর্ণ অবাস্তবতা ও মিথ্যাচারিতার ভিত্তিতে নিজের হাতে গড়া প্রতিমাগুলোকে উপাস্য স্থির করেছে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করেছে এবং সেগুলোর নিকটে সাহায্যার্থী হয়েছে তারা কোন বিবেচনার অনুসারী? তারা কি বিবেচক?

উদ্ভূত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শেষে বলা হয়েছে— 'তারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদিতা কেবল অনুমান ও মিথ্যাচার মাত্র। আক্ষেপ! অংশীবাদীদের প্রতি। তারা সুনিশ্চিতরূপে অনুমানানুসারী এবং অসত্যভাষী।

এর পরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস সৃষ্টি করেছেন দেখবার জন্য। ' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! দৃষ্টিপাত করো দিবস-নিশিথের বিবর্তনবিন্যাসের প্রতি। আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্মমুখরতাজনিত শ্রান্তি নিবারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রান্তিহারক যামিনী। আর দিবসকে সৃষ্টি করেছেন সূর্যকরোজ্জ্বল শোভিতরূপে— যাতে তোমাদের নিকটে সকল কিছু হয়ে উঠে পরিদৃশ্যমান। যাতে সবকিছু দেখে দেখে তোমরা সম্পাদন করতে পারো তোমাদের প্রয়োজনীয় কর্মাদি।

শেষে বলা হয়েছে— 'যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' এ কথার অর্থ দিবস রাত্রির এই বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নিদর্শন। এই বিশাল সৃষ্টির আলো ও আঁধারের অনুবর্তনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আল্লাহ্‌পাকের অপার পরাক্রম; সামগ্রিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময়তা। এই বিশাল সৃষ্টি ও সময়ের বিবর্তন প্রতিনিয়ত এ কথা প্রমাণ করে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌পাকই এ সকল কিছুর একক স্রষ্টা। সুতরাং তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। যে সম্প্রদায় এই মূলতত্ত্ব কথাটি শোনে, নিশ্চয়ই তারাই বুঝতে পারে এ সকল নিদর্শনরাজির প্রকৃত মহিমাকে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

❐ তাহারা বলে 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অভাবমুক্ত! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে-বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?

❐ বল, 'যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।'

❐ পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু উহাদিগকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

প্রথমে বলা হয়েছে—'তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র। তিনি অভাবমুক্ত।' এ কথার অর্থ— অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে। আর ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। এ রকম জঘন্য বক্তব্য থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। এ রকম মিথ্যা কল্পনা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ আল্লাহ্ মহান। প্রতিদ্বন্দ্বীতাহীন ও সমকক্ষতাহীনরূপে সুমহান। আর তিনি অভাব মুক্ত, চির অমুখাপেক্ষী। সৃষ্টি নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে তাঁরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠে স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং তারা কোনো না কোনো বিষয়ে একে অপরের মুখাপেক্ষী। যোগ্য সন্তান পিতার সম্মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অযোগ্য সন্তান পিতার সম্মানহানি ঘটায়। এভাবে পিতা সম্মান, অসম্মানের প্রশ্নে পুত্রের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রশংসা ও অপ্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কারণ তিনি সকল অভাব থেকে মুক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সনদ নেই।' এ কথার অর্থ— আকাশ পৃথিবীসহ সমগ্র মহাবিশ্বকে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই বিশাল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভুপ্রতিপালক। সুতরাং চির মুখাপেক্ষী সৃষ্টির সঙ্গে চির অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্তায়ালার পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হয় কীভাবে? হে অংশীবাদী

জনগোষ্ঠী! এ সম্পর্কে তোমাদের প্রকৃষ্ট কোনো প্রমাণই নেই। অপবিত্র কল্পনা ও অনুমান ছাড়া তোমাদের কোনো কিছুই নেই।

শেষে বলা হয়েছে— 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?' এ কথার অর্থ— হে অংশীবাদী সম্প্রদায়! শোনো, কোনো কিছুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে গেলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন। কিন্তু সেরকম প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে কিছু জানো না। অথচ এমন কিছু বলো, যা ভিত্তিহীন। কেনো এ রকম বলো? ধিক তোমাদেরকে! পরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— 'বলো, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ওই অজ্ঞ অংশীস্থাপকদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ সম্বন্ধে যারা মিথ্যাচারিতার প্রবর্তন ঘটাবে তারা কখনো সফলকাম হবে না। না জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, না জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পাবে।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই নিকটে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাবো।' এ কথার অর্থ— ঠিক আছে। অংশীস্থাপকদের জন্য পৃথিবীতে কিছু দিনের সুখ-সম্ভোগ নির্ধারণ করা হলো। কারণ মহাজীবনের তুলনায় পৃথিবীর অল্প কয়েকদিনের জীবন তেমন কিছুই নয়। এই সাময়িক অবকাশ শেষে তাদেরকে তো আমার নিকট ফিরে আসতেই হবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের যথোপযোগী শাস্তি আস্বাদন করাবোই।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ
وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ
اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ
فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

☐ উহাদিগকে নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও । সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহের নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ

দান তোমাদিগের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে, আমি তো আল্লাহের উপর নির্ভর করি; তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদিগের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিও না।

❒ তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদিগের নিকট আমি কোন শ্রমফল প্রার্থনা করি নাই, আমার শ্রমফল আছে আল্লাহের নিকট, আমি তো আত্ম-সমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

❒ অতঃপর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে; তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে প্রতিনিধি করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কাবাসীদেরকে রসুল নূহের বৃত্তান্ত শোনান। রসুল নূহ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো দীর্ঘ দিন ধরে তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে চলেছি। এখন যদি আমার উপস্থিতিই তোমাদের নিকট অসহ্য হয় এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা যে সদুপদেশ আমি তোমাদেরকে দান করে চলেছি তা যদি দুঃসহ হয়ে ওঠে, তবে আমার পক্ষ থেকে আর কী করার আছে? আমি তো কেবল আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা রাখি। এখন তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগুলো মিলে যা করতে চাও করতে পারো। দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পড়ে থেকে আর কী হবে? তোমাদের কর্তব্য তোমরা করে ফেলো এবং আমাকে কোনো অবসর দিয়ো না।

এখানে শেষ বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে হজরত নূহের চরম আল্লাহ্ নির্ভরতা। 'কর্তব্য স্থির করে নাও', 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করে ফেলো', 'আমাকে অবসর দিয়ো না'— এ সকল বাক্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নূহ চরম দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, তার সম্প্রদায়ের অংশীবাদী ও বাতিল উপাস্যরা শত চেষ্টা করলেও তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। কারণ কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনো কিছুরই নিয়ন্ত্রক তারা নয়।

উল্লেখ্য যে, হজরত নূহ ছিলেন হজরত শীশের বংশধর। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলো কাবিলের বংশধর। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হজরত নূহ তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন 'হে আমার সম্প্রদায়' বলে। এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, হজরত নূহের সম্প্রদায়ের লোকেরাও হয়তো বা হজরত শীশের বংশধরই ছিলো।

এর পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে কিছু আসে যায় না, কারণ তোমাদের নিকটে আমি কোনো শ্রম-ফল প্রার্থনা করিনি, আমার শ্রম-ফল আছে আল্লাহ্‌র নিকট। আর আমিতো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।' এ কথার অর্থ— হজরত নূহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও করতে পারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমাদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য যে পরিশ্রম আমি করি, তার বিনিময় তো আমি তোমাদের কাছে চাই না। আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন তো আমার আল্লাহ্‌। সুতরাং আমার শুভ নির্দেশনার অনুগামী যদি তোমরা না হও তবে ক্ষতিগ্রস্ত তো হবে তোমরাই। আমার কোনো ক্ষতি এতে নেই। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো সংঘর্ষ রচনা করতে আসিনি। এসেছি কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। অন্যদেরকেও আত্মসমর্পণকারী হতে বলি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যদৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম প্রচারের জন্য মানুষের নিকট বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। অতএব কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দানের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণও নাজায়েয।

এর পরের আয়াতের (৭৩) মর্মার্থ হচ্ছে— দীর্ঘদিন গত হলো কিন্তু অবাধ্যরা হজরত নূহের ডাকে সাড়া দিলো না। বরং বারংবার তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করলো। তখন আমি নূহকে নির্মাণ করতে বললাম একটি তরণী। নির্দেশ দিলাম, তুমি এবং তোমার অনুসারীরা ওই তরণীতে আরোহণ করো। তাহলে আযাবরূপী মহাপ্লাবন থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে। যথাসময়ে শুরু হলো ভয়াবহ প্লাবন। সেই প্লাবনে আমি চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত করলাম আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। আর নূহ্‌ ও তার অনুসারীদেরকে দান করলাম প্লাবন পরবর্তী প্রতিষ্ঠা । ধ্বংসপ্রাপ্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্থলবর্তী হলো তারা। সুতরাং হে মানুষ! দ্যাখো, ওই অবাধ্যদেরকে পুনঃপুনঃ সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানে অনড় কিন্তু তার পরিণাম কি রকম ভয়াবহ হয়েছিলো, হে মানুষ— অনুধাবন করো।

উল্লেখ্য যে, হজরত নূহের তরণীর আরোহী ছিলেন সর্বমোট আশিজন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا
لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ۝٧
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ
مُّبِيْنٌ ۝ قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ۝

❒ অনন্তর, তাহার পরে আমি রসূলদিগকে প্রেরণ করি তাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট; তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। কিন্তু উহারা পূর্বে যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দিই।

❒ পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

❒ অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বলিল 'ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু।'

❒ মূসা বলিল 'সত্য যখন তোমাদিগের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এইরূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নূহের পরবর্তী সম্প্রদায়গুলোর জন্য আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী ও রসুল প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নিকটে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু তারা আগের মতোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকে আঁকড়ে ধরেছিলো। ইমান গ্রহণ করতে চায়নি। আমিও তাই ওই সকল সীমালংঘনকারীদের হৃদয় অবরুদ্ধ করে দিয়েছি, যেনো কোনো দিনও আর সেই হৃদয়ে সত্যের আলো প্রবেশ না করে। অতএব হে আমার রসুল! আপনিও শুনুন, আপনার অবাধ্য উম্মতদের হৃদয়ও আমি অবরুদ্ধ করে দিবো, যেহেতু তারা বারংবার আপনার আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরের আয়াতের (৭৫) মর্মার্থ হচ্ছে— পরবর্তী সময়ে আমি প্রেরণ করলাম মুসা ও হারুনকে । সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আমি তাদেরকে প্রেরণ করলাম ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু তারা নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে মান্য করলো না। প্রদর্শন করলো অহমিকা। কারণ তারা ছিলো স্বভাবগতভাবে অপরাধী। তাই তারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বরদ্বয়কে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে বসলো।

এর পরের আয়াতের (৭৬) মর্মার্থ হচ্ছে— অতঃপর যখন তাদের নিকটে নবী মুসা সত্য মোজেজাসমূহ প্রকাশ করলো, তখন তারা মনে মনে বুঝতে পারলো যে, মুসা সত্য পয়গম্বর। কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করলো না। প্রবৃত্তিপূজক ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন সুস্পষ্ট মোজেজা সম্পর্কে বললো, এগুলো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

এর পরের আয়াতের (৭৭) মর্মার্থ হচ্ছে— মুসা তখন বললো, আল্লাহ্পাক প্রদত্ত এই অলৌকিক নিদর্শনসমূহকে তোমরা এভাবে প্রত্যাখ্যান করছো কেনো? এটা কি যাদু না মোজেজা! যাদুর তো কোনো বাস্তব ভিত্তিই নেই। তাই যাদুকরেরা কখনো সফলকাম হয় না। আমি তো সত্য রসুল। এই মোজেজাসমূহই আমার রেসালতের প্রমাণ।

'যাদুকর তো সফলকাম হয় না'— কথাটি ফেরাউনের কথা হতে পারে। অর্থাৎ হজরত মুসার 'এটা কি যাদু' এই প্রশ্নের জবাবে ফেরাউন তখন বলেছিলো, 'যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।'

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

قَالُوٓا اَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا عَمَّا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوۡنَ لَكُمَا الۡكِبۡرِيَآءُ فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَمَا نَحۡنُ لَكُمَا بِمُؤۡمِنِيۡنَ ○ وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ائۡتُوۡنِىۡ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيۡمٍ ○ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمۡ مُّوۡسٰٓى اَلۡقُوۡا مَاۤ اَنۡتُمۡ مُّلۡقُوۡنَ ○ فَلَمَّاۤ اَلۡقَوۡا قَالَ مُوۡسٰى مَا جِئۡتُمۡ بِهِ ۙ السِّحۡرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبۡطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ ○ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الۡحَـقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوۡ كَرِهَ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ○

❒ উহারা বলিল, 'আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? এবং যাহাতে দেশে তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয় এই জন্য? আমরা তোমাদিগে বিশ্বাসী নহি।'

❒ ফেরাউন বলিল 'তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া আইস।'

❒ অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা বলিল, 'তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর।'

❒ যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল 'তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু, আল্লাহ্ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের কর্ম সার্থক করেন না।'

❒ অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

উদ্ধৃত পাঁচটি আয়াতের মর্মার্থ এ রকম— তখন ফেরাউন ও তাঁর অনুচরেরা বললো— হে মুসা! এবার বলো, তোমার মতলব কি? তুমি কি আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষগণের ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাও, এটাই কি আমাদের নিকট তোমার আগমনের হেতু? নাকি দেশে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তোমরা এ রকম করছো? নাহ্। তোমাদেরকে আমরা বিশ্বাস করতেই পারি না (৭৮)। এ কথা বলেই ফেরাউন শান্ত হলো না। সে ভাবলো, বড় বড় যাদুকরকে এনে মুসার মোকাবিলা করতে হবে। তাই সে তার পারিষদবর্গকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমরা আমার নিকটে সুদক্ষ যাদুকরদেরকে নিয়ে এসো (৭৯)। ফেরাউনের নির্দেশ মতো দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সুদক্ষ যাদুকরদেরকে জড় করা হলো। উন্মুক্ত প্রান্তরে হজরত মুসার মুখোমুখী হলো যাদুকরেরা। যাদুর প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরুর প্রাক্কালে হজরত মুসা বললেন, নিক্ষেপ করো, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও (৮০)। যাদুকরেরা তাদের যাদু দেখানো শুরু করলো। তখন হজরত মুসা বললেন, আল্লাহ্পাক তোমাদের যাদুকে অকার্যকর করে দিবেন। তোমরা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। আর আল্লাহ্ বিশৃংখলাকারীদেরকে কখনো সফল করেন না (৮১)। আরো শোনো, অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্তায়ালা তাঁর বাণী অনুসারে সত্যকে সত্য হিসেবে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করবেন (৮২)।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰىٓ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

❒ ফেরাউন ও তাহার পারিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকা লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফেরাউন পরাক্রমশালী ও ন্যায়লংঘনকারীই ছিল।

❒ মূসা বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহে বিশ্বাস করিয়া থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।'

❒ অতঃপর তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহের উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না।'

❒ 'এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।'

প্রথমে বলা হয়েছে— ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশংকা নিয়ে তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। এ কথার অর্থ— হজরত মুসার মোজেজার নিকটে যাদুকরদের যাদু পরাস্ত হলো। দর্শকেরা বুঝলো যে, হজরত মুসা সত্য পয়গম্বর। কিন্তু তবু তারা ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে হজরত মুসার প্রতি ইমান আনতে পারলো না। কিন্তু নির্যাতনের আশংকা সত্ত্বেও তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক ইমান গ্রহণ করলো। 'ইল্লা জুর্‌রিয়াতুম মিন্ ক্বওমিহি' অর্থ তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত। তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানে 'তার সম্প্রদায়ের' কথাটির অর্থ হজরত মুসার সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ বনী ইসরাইলের। হজরত ইউসুফের শাসন কাল থেকে বনী ইসরাইলেরা মিসরে বসবাস করে আসছিলো। আর মিসরের স্থায়ী অধিবাসীদের বলা হতো কিবতী।

মুজাহিদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'তার সম্প্রদায়ের এক দল' কথাটির অর্থ ওই সকল বনী ইসরাইল যাদের হেদায়েতের জন্য হজরত মুসাকে প্রেরণ করা হয়েছিলো। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মিসররাজ যখন বনী ইসরাইলের সদ্যজাত শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলো তখন কোনো কোনো ইসরাইলী রমণী তাদের শিশু সন্তানদেরকে কিবতী রমণীদের নিকট হস্তান্তর করেছিলো। ওই শিশুরা কিবতী পরিবারেই লালিত পালিত হয়। যাদুকরদের উপরে হজরত মুসার পরিপূর্ণ বিজয় দেখে ইমান এনেছিলো তারাই। প্রকাশ্যে তারা কিবতী বলে পরিচিত হলেও তারা ছিলো বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ভূত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'তাদের সম্প্রদায়ের এক দল' কথাটির অর্থ হবে মিসর সম্প্রদায়ের এক দল। অর্থাৎ কিবতীদের মধ্যে একটি দল। আতিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ফেরাউন গোত্রের কেউ কেউ হজরত মুসার প্রতি ইমান এনেছিলো। তাদের মধ্যে ছিলেন

ফেরাউনের পত্নী হজরত আসিয়া। ফেরাউনের খাজাঞ্চী, খাজাঞ্চীর পত্নী, হজরত আসিয়ার কেশ বিন্যাসকারিণী এবং ওই সকল কিবতী যাদের কথা বলা হয়েছে সুরা ইয়াসিনের এই আয়াতে— ওয়াজায়া মিন আকসাল মাদীনাতি রজুলুঁন ইয়াস আ (আর শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক লোক দৌড়াতে দৌড়াতে এলো)। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসার প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকগুলোর পিতা ছিলো কিবতী এবং মাতা বনী ইসরাইলী। যেমন কোনো কোনো পারস্যবাসী ইয়েমেনে এসে বসবাস করতো। তারা স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করতো। তবু তাদের সন্তানদেরকে বলা হতো পারসিক।

এরপর বলা হয়েছে— 'দেশে তো ফেরাউন পরাক্রমশালী ও ন্যায়লংঘনকারীই ছিলো'। এ কথার অর্থ— মিসরাধিপতি ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী এবং অবশ্যই সীমালংঘনকারী। সে প্রজাসাধারণকে পদানত করে রেখেছিলো। বলেছিলো 'আমি তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক' (সুতরাং আমার উপাসনা তোমাদের জন্য আবশ্যিক)।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'মুসা বলেছিলো, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো, যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও, তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর করো।' এ কথার অর্থ— নবাগত বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে হজরত মুসা বললেন, এখনো তোমরা মিসরাধিকারী ফেরাউনকে ভয় করছো কেনো, তোমরা তো এখন বিশ্বাসী। বিশ্বাসীরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পায়? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পণকারী হয়েই থাকো, তবে যাকে বিশ্বাস করেছো কেবল তার উপর নিভর্রশীল হও। তিনি যে সিদ্ধান্ত দান করেন সেই সিদ্ধান্তকে আনতমস্তকে স্বাগত জানাও।

এখানে ' ইনকুনতুম মুসলিমীন' (যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও)। কথাটির প্রতিদান (জাযা) উহ্য। আর 'ইনকুনতুম আমানতুম' (যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো) কথাটির প্রতিদান হবে এখানে 'ফা আ'লাইহি তাওয়াক্কালু' (তবে তোমরা তারই উপর নির্ভর করো)। আলোচ্য আয়াতের বিবরণভঙ্গি দৃষ্টে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা) ছাড়া পরিপূর্ণ ইমানদার হওয়া যায় না। অথবা যে প্রকৃত বিশ্বাসী তাকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্পাকের সকল সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে

না মেনে নেয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াক্কুল আসবে না। প্রবৃত্তিপরিকীর্ণ বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুল কখনো একত্র হতে পারে না। সুফিগণের তরিকার একটি মাকামকে বিশেষ ভাবে তাওয়াক্কুল বলা হয়েছে।

এর পরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা বললো, আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলাম। হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র কোরো না।' এ কথার অর্থ— নবাগত ইমানদারেরা বিশুদ্ধচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন হজরত মুসার ধর্মমতকে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলোই না। তাই তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর উপরেই নির্ভর করলাম। হজরত মুসাকে এ রকম বলার পর তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা জানালেন— হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গ সীমা-লংঘনকারী ও উৎপীড়ক। তারা আমাদেরকে এবার নিশ্চয় উৎপীড়ন করতে শুরু করবে। অতএব হে আমাদের আল্লাহ্। আমাদেরকে ওই সীমালংঘনকারীর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করো। তাঁদের প্রার্থনার মূলমর্ম এ রকমও হতে পারে যে— হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এমন পরীক্ষায় ফেলবেন না, যাতে আমরা অকৃতকার্য হই। ফেরাউন আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে লোকে বলবে, এই লোকগুলো সত্যপথে থাকলে নিশ্চয় অত্যাচারের শিকার হতো না। হে আমাদের আল্লাহ! আমাদেরকে উৎপীড়নের পাত্র করে ওই সকল অবিশ্বাসীকে এ রকম অপমন্তব্য করার সুযোগ দিয়ো না।

এর পরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করো।' আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনার শেষাংশ। মিসরাধিনায়ক ও তার অনুচরবর্গের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানানো হয়েছে এই আয়াতে। লক্ষ্যণীয় যে, এই প্রার্থনার শুরুতে বলা হয়েছে 'আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম।' এতে করে বুঝা যায়, প্রার্থনাকারীদের প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহর উপর নির্ভর করা বা তাওয়াক্কুল করা। অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনা জানালে সে প্রার্থনা গৃহীত হয়।

আমি বলি, সুফীগণের অভিমত হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে কোনো কিছু প্রার্থনা করা হোক বা না হোক, তওয়াক্কুলের বিষয়টি সার্বক্ষণিক। আর দোয়া করা অত্যাবশ্যক কোনো বিষয় নয়। কিন্তু তাওয়াক্কুল অত্যাবশ্যক।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

❒ আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, 'মিসরে তোমাদিগের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর, এবং তোমাদিগের গৃহগুলিকে ইবাদত-গৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দাও।'

❒ মূসা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদ-বর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দারা, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।'

❒ তিনি বলিলেন, 'তোমাদিগের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদিগের পথ অনুসরণ করিও না।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করলাম, তোমরা তোমাদের মিসরবাসী সম্প্রদায়কে বলো, তারা যেনো নামাজের জন্য বিশেষ ঘর তৈরী করে এবং ওই ঘরে নামাজ পাঠ করে। আর তোমরা তাদেরকে এই সুসংবাদটি দাও। অচিরেই আল্লাহ্পাক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে করবেন তাদের স্থলবর্তী। আর আখেরাতে তোমাদেরকে দান করবেন জান্নাত।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে, বনী ইসরাইলেরা তাদের বাড়ীর পাশে নির্মিত খানকায় নামাজ আদায় করতো। হজরত মুসার আবির্ভাবের পর যখন তারা হজরত মুসার অনুসারী হয়ে গেলো তখন ফেরাউনের

নির্দেশে ওই খানকাগুলো ধ্বংস করে দেয়া হলো। তখন আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশ করলেন, এখন থেকে বাড়ীর সীমানার ভিতরে বিশেষভাবে নামাজের জন্য ঘর নির্মাণ করে সেখানে নামাজ পড়তে হবে। এ রকম বলেছেন ইব্রাহিম নাখয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইকরামা সূত্রেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, তখন ফেরাউনের অত্যাচারের ভয়ে জামাতবদ্ধ হয়ে প্রকাশ্যে নামাজ পাঠ করা হয়ে পড়লো অসম্ভব। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হলো, বনী ইসরাইলেরা অন্দর মহলে নামাজের ঘর নির্মাণ করে গোপনে সেখানে নামাজ পাঠ করবে।

এখানে ' বুয়ুতাকুম ক্বিবলাতান' অর্থ ইবাদত গৃহ। এখানে ক্বিবলা শব্দটির অর্থ হবে নামাজের স্থান। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত মুসা ও তার অনুসারীগণের কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদিস।

আয়াতের শুরুতে নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে নামাজের জন্য বিশেষ গৃহ নির্মাণের নির্দেশ। কারণ তাঁরা যৌথভাবে বনী ইসরাইলদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চলেছিলেন। উল্লেখ্য যে, নামাজের জন্য নির্মিত ওই বিশেষ গৃহগুলোতে নামাজ আদায় করা ছিলো অত্যাবশ্যক। অন্য কোথাও নামাজ পাঠ করা তাদের জন্য বৈধ ছিলো না। আরো উল্লেখ্য যে, আয়াতের শেষে কেবল হজরত মুসাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে— (হে মুসা) বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। এ রকম করার কারণ এই যে, নবী ভ্রাতৃদ্বয় যৌথভাবে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও হজরত মুসা ছিলেন এককভাবে শরিয়তপ্রবর্তক। তাই সুসংবাদ প্রদান করার দায়িত্বটি তাঁরই উপরে বর্তেছিলো।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও' কথাটির অর্থ হবে, হে নবী মুসা! আগামীতে আবির্ভূত হবেন মহানবী মোহাম্মদ স.। তাঁর আবির্ভাবের সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো।

এর পরের আয়াতে (৮৮) উল্লিখিত হয়েছে, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হজরত মুসার একটি অপপ্রার্থনা। হজরত মুসা তাঁর ওই অপপ্রার্থনায় বললেন, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছো যদ্দারা, হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেয়, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো, তাদের হৃদয় মোহর করে দাও, তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না।

এখানে 'জিনাত' শব্দটির অর্থ শোভাবর্ধক সামগ্রী। যেমন সুন্দর পরিচ্ছদ, আভরণ, অশ্ব, গৃহের আসবাবপত্র, যানবাহন, পরিচারক-পরিচারিকা ইত্যাদি। 'লিইউদ্বিল্লু' অর্থ পথচ্যুত করে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার লোকেরা মানুষকে সত্য

পথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন, এক আয়াতে এসেছে— ফালতাক্বাত্বহু আলুফিরআ'উনা লিইয়াকুনা লাহুম আদুওয়ান ওয়া হাযানা (ফেরাউনের লোকেরা মুসাকে পেয়েছিলো যেনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় শত্রুতা ও উৎপীড়ন)। এখানে ইউদ্বিল্লু' কথাটির 'লি' (লাম অক্ষরটি) পরিণতি প্রকাশক। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পরিণতি প্রকাশক নয়, বরং কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! তোমা কর্তৃক প্রদত্ত পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদের কারণে তারা নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি পথভ্রষ্ট করে চলেছে অন্যকে। এ রকমও বলা যেতে পারে যে, ফেরাউন ও তার লোকেরা পার্থিব শোভা ও সম্পদকে নিজেরাই পথভ্রষ্টতার কারণ বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে তারা নিজেরা যেমন গোমরাহ্ হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও গোমরাহ্ করে চলেছে।

আলোচ্য আয়াতে 'রব্বানা' (হে আমার প্রভুপ্রতিপালক) কথাটি উচ্চারিত হয়েছে দু'বার। স্বীয় দোয়াকে অধিকতর বিনয়মণ্ডিত করবার জন্য হজরত মুসা তাঁর দোয়ায় 'রব্বানা' সম্বোধনটি উচ্চারণ করেছেন দু'বার।

শায়েখ আবু মনসুর মাতুরিদী বলেছেন, আল্লাহ্পাক সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে পৃথিবীর বিত্ত-বৈভব দান করেন অসন্তোষের সঙ্গে। বিত্ত-প্রেমে নিমগ্ন হয়ে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হোক এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে আরো বেশী গোনাহ্গার হোক— এটাই আল্লাহ্র ইচ্ছা (কারণ এটা তারাও চায়)। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নামা নুমলী লাহুম লিইয়াযদাদু ইছমান (আমি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি এ কারণে যে, তারা যেনো পাপাচরণে অগ্রগামী হয়)। এই আয়াত মোতাজিলাদের মতবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ। মোতাজিলারা বলে, বান্দাদের জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করা আল্লাহ্পাকের জন্য ওয়াজিব। তাই আল্লাহ্পাক কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। বান্দারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাস এই যে, করা বা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। বান্দারা ইচ্ছা করে। আর আল্লাহও তাঁর ইচ্ছানুসারে তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটান। মানুষ ইচ্ছা করে। আল্লাহ্ও সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন এবং সৃষ্টি করেন। কেউ পুণ্যকর্ম করতে চাইলে আল্লাহ্ও তা চান এবং বাস্তব জগতে পুণ্যকর্ম সৃজন করেন। আবার কেউ মন্দ কর্ম করতে চাইলে আল্লাহ্ও তা চান এবং মন্দ কর্মটি সৃজন করেন। অতএব সৃজনের ইচ্ছা ও সৃজন কেবল আল্লাহর। আর ইচ্ছার সূচনাকারী হিসেবে অর্জন বান্দার।

বায়যাবী লিখেছেন, 'রব্বানা উয়ুদ্বিল্লু আ'ন্ সাবিলিকা' কথাটির 'লি ইয়ুদ্বিল্লু' হচ্ছে নির্দেশ প্রকাশক শব্দরূপ। শব্দটির মাধ্যমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। এরপরে শুরু করা হয়েছে বদ্দোয়া।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেছেন, এখানে 'তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো' কথাটির অর্থ 'তাদের সুন্দর চেহারাকে কুৎসিত করে দাও'। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ 'তাদের সকল সম্পদ পাথরে পরিণত করে দাও'। তাই হয়েছিলো। তাদের মূল্যবান সামগ্রীগুলো পরিণত হয়েছিলো পাথরে। কোনো কোনোটি ফেটে দুই তিন টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। তাদের গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর ডিম বের হতো কিন্তু সে ডিম ফুটতো না। গাছে আখরোট হতো। কিন্তু তা পাথরে পরিণত হয়ে ফেটে পড়ে যেতো। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের কাছে একটি থলিতে সংরক্ষিত ছিলো ওই সময়ের বদ্‌দোয়া-সৃষ্ট কতিপয় বিবর্ণ বস্তু।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত হজরত মুসার অপপ্রার্থনার ফলে আল্লাহ্‌পাক কিবতীদের মূল্যবান সম্পদ, গাছ, ফল, আটা, আহার্য সব কিছুকে পাথর করে দিয়েছিলেন। এই মোজেজাটি হজরত মুসার নয়টি মোজেজার অন্তর্ভুক্ত।

'ওয়াশ্‌দুদ্‌ আ'লা কুলুবিহিম' অর্থ 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও।' হজরত মুসা কিবতীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে তাদের জন্য এ রকম বদ্‌দোয়া করেছিলেন। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের হেদায়েতের জন্য। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন তারা কোনো দিনই ইমান আনবে না তখন তিনি তাদের জন্য আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বদ্‌দোয়াটি করলেন।

একটি সন্দেহঃ হজরত মুসা যদি জেনেই থাকেন যে তারা কোনো দিনই ইমান আনবে না, তবে তিনি আবার 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও' এ রকম বললেন কেনো? তাঁর এই কথাটি একটি অতিরিক্ত কথা ছিলো নাকি?

জবাবঃ সম্ভবতঃ তিনি আল্লাহ্‌পাকের পক্ষ থেকে এ রকম বদ্‌দোয়া করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। আর এরকম করা অযৌক্তিক কিছু নয়। যেমন, ইবলিস আল্লাহ্‌পাক কর্তৃক অভিসম্পাতগ্রস্ত। তৎসত্ত্বেও তিনি নির্দেশ করেছেন— 'ইন্নাশ্‌শাইত্বানা লাকুম আদুওয়ান ফাত্তাখিজুহু আদুওয়ান' (শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা শয়তানকে শত্রু মনে করো এবং তাকে অভিসম্পাত দাও)।

'তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করবে না' এ কথার অর্থ— ফেরাউন ও কিবতীরা গজব কবলিত হলেই কেবল বাধ্য হয়ে ইমান আনবে। কিন্তু তাদের ওই ইমান গৃহীত হবে না। কারণ শাস্তি ভোগ করার সময় অপরাধীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কোনো বিধান নেই।

এর পরের আয়াতে (৮৯) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাকো এবং তোমরা কখনো অজ্ঞদের পথ অনুসরণ কোরো না।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাক নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে বললেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো। তোমরা আমার নিকট থেকে

মানুষের হেদায়েতের যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছো, সেই দায়িত্বের উপরেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। যথাসময়ে তোমাদের প্রার্থনা বাস্তব রূপ লাভ করবে। ওই অবুঝদের মতো তোমরা কখনো হয়ো না, যারা প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে চায়। ত্বরাপ্রবণতা পরিহার করো। অপেক্ষা করো, তোমাদের প্রার্থনার প্রতিফল অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

দোয়া করেছিলেন হজরত মুসা। আর হজরত হারুন তাঁর দোয়ার সমর্থনে আমিন, আমিন বলেছিলেন। তাই তাঁদের দু'জনকেই প্রার্থনাকারী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো।' বাগবী লিখেছেন, নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের দোয়া মঞ্জুর করা হয়েছিলো চল্লিশ বছর পর।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯০, ৯১, ৯২

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ○ ءَآلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ○ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايٰتِنَا لَغٰفِلُونَ ○

❐ আমি বনি-ইস্‌রাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফেরাউন ও তাহার সৈন্য বাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমা লংঘন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনি-ইস্‌রাঈল যাঁহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

❐ 'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।'

❐ 'আজ আমি তোমার দেহ চড়াভূমিতে রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।'

প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমার নির্দেশে নবী ভ্রাতৃদ্বয় বনী ইসরাইল জনতাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে রওয়ানা দিয়ে সমুদ্র তীরে উপনীত হলো। সামনে আর কোনো পথ নেই। নবী ভ্রাতৃদ্বয় আমার সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাকে দু'পাশে সরিয়ে দিলাম। তার মাঝখানে দেখা গেলো শুষ্ক পথ। নবী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের অনুসারীদেরকে নিয়ে সে পথে যাত্রা শুরু করলো। ওদিকে ফেরাউন ও তার লোকেরা সকালে উঠে দেখলো বনী ইসরাইলেরা আর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তারা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে ধরে আনবার জন্য রওয়ানা হলো। পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে পৌঁছে গেলো সেই সমুদ্রের কিনারায়। সাগর অভ্যন্তরে শুকনো পথ দেখে তারাও এগিয়ে চললো সেই পথ ধরে। যখন নবী ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁর অনুসারীরা সমুদ্র অতিক্রম করে অপর পাড়ে গিয়ে উঠলো, তখন সাগর অভ্যন্তরের পথে ধাবমান ফেরাউন ও তার দলবলকে আল্লাহ্তায়ালা সলিল সমাধি দান করলেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ফেরাউন চিৎকার করে বললো আমি বিশ্বাস করলাম, বনী ইসরাইল যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, সেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমিও আত্মসমর্পণকারীদের দলভূত।

এখানে 'আত্বায়া' অর্থ পশ্চাদ্ধাবন করলো। 'ইত্তাবায়া' অর্থ অনুসরণ। শব্দটি বাবে ইফতেয়াল। কেউ কেউ বলেছেন, 'আত্বায়া' হচ্ছে বাবে ইফয়াল এবং 'ইত্তাবায়া' হচ্ছে বাবে ইফতেয়াল। শব্দ দু'টো সমার্থক।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে, 'বাগ্ইয়া' অর্থ সীমালংঘন এবং 'আদ্ওয়ান' অর্থ বিদ্বেষবশতঃ। ঘটনাটি ঘটেছিলো এ রকম— নবীবিদ্বেষী ও ন্যায়ের সীমালংঘন-কারী ফেরাউন ও তার দলবল সাগর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলো, দু'পাশে পানির পাহাড়। আর মাঝখানে শুকনো পথ। এ রকম অলৌকিক দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলো তারা। তখন হজরত জিবরাইল মানুষের রূপ ধরে একটি ঘোড়ায় চড়ে এলেন এবং সকলের আগে নেমে পড়লেন সাগর অভ্যন্তরের পথে। তাঁর ঘোড়ার পশ্চাতে ফেরাউন ও তার লোকদের ঘোড়াও ছুটতে শুরু করলো। এভাবে তার পুরো বাহিনী যখন সাগরের পথে, তখন দু'পাশের বিভক্ত পানির পাহাড়কে আল্লাহ্পাক এক বরাবর করে দিলেন। এভাবে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করলো ফেরাউন ও তার লোকজন।

এক বর্ণনায় এসেছে, মরনোম্মুখ ফেরাউন যখন চিৎকার করে বললো, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, হজরত জিবরাইল তৎক্ষণাৎ তার মুখে কাদা নিক্ষেপ করলেন। আর সে মৃত্যুবরণ করলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়।

পরের আয়াতের (৯১) মর্মার্থ হচ্ছে— মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফেরাউন যখন ইমান আনয়নের ঘোষণা দিলো, তখন আল্লাহ্ বললেন, এখন! এখন কেনো এ কথা

বলছো? সারা জীবন ধরে তোমাকে তওবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। নিঃসন্দেহে তুমি ছিলে অশান্তি সৃষ্টিকারী। যথাসময়ে তুমি সত্যকে স্বীকার করোনি, তাই এ অসময়ে তোমার স্বীকৃতি কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফেরাউন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলেছিলো, 'বনী ইসরাইল যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, সেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয়। ওই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জিবরাইল ফেরেশতা আমাকে বলেছেন, ভ্রাতা মোহাম্মদ! ওই সময় আমি ফেরাউনের মুখে সমুদ্রের কাদা মাখিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহ্র রহমত সর্বত্রগামী। ফেরাউনের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিলো, হয়তোবা সে আল্লাহ্র রহমত পেয়েই যাবে। তাই আল্লাহ্র রহমত যেনো সে না পায়, তার তওবা যেনো গ্রহণ করা না হয়, সে কারণেই আমি তার মুখ ঢেকে দিয়েছিলাম কাদায়।

দ্রষ্টব্য ঃ জালালউদ্দিন দাওয়ানী বলেছেন, ফেরাউন জীবদ্দশায় আল্লাহ্র প্রতি ইমান এনেছিলো। তাই একথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, তার মৃত্যু ঘটেছিলো ইমানদার অবস্থায়। শায়েখ দাওয়ানী এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন শায়েখ মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীকে। শায়েখ আরাবীও ফেরাউনের মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁদের অভিমত কোরআনের অনেক আয়াতের পরিপন্থী। বিশুদ্ধ হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্যের বিরোধী।

দাওয়ানী বলেছেন, ফেরাউনের দোজখী হওয়ার প্রমাণ কোনো আয়াতে নেই। দোজখের আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে ফেরাউনের বংশের লোকদের জন্য। ফেরাউনকে দোজখের আযাবের ভয় দেখানো হয়নি। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে— আদ্খিলু আ'লা ফিরাউনা আশাদ্দাল আ'জাবি (ফেরাউনের বংশকে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও)। অন্যত্র বলা হয়েছে— ফা আওরাদা হুমুন্ নারা' (ফেরাউনের অনুসারীদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে)। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ওয়া হাক্বা বি আ'লি ফির্আউনা সূউল আজাবী (ফেরাউনের বংশধরদেরকে ঘিরে রেখেছে কঠিন আযাব)। এ সকল আয়াতে কোথাও ফেরাউনের আযাব হবে, এ রকম বলা নেই। তবে হ্যাঁ, সে মানুষকে অত্যাচার করতো। তাই অত্যাচারের শাস্তি সে পাবে।

আমি বলি, দাওয়ানীর অভিমতটি যুক্তিযুক্ত নয়। আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন— ফাহাশারা ফানাদা ফাক্বালা আনা রব্বুকুমুল আ'লা ফাআখাজাহুল্লাহু নাকালাল আখিরাতি ওয়াল উলা (ফেরাউন সকলকে একত্র করে বললো, আমি তোমাদের বড় প্রভুপালক। পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করেন এবং তাকে

দুনিয়া ও আখেরাতে দৃষ্টান্ত করা হয়েছে)। এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, কুফুরীর কারণে আখেরাতে ফেরাউনের শাস্তি হবে। এ ছাড়া এই সুরার ৮৮ নম্বর আয়াতে হজরত মুসার যে দীর্ঘ দোয়া উল্লেখিত হয়েছে, সেই দোয়ার এক স্থানে বলা হয়েছে, 'তাদের হৃদয় মোহর করে দাও।' এর প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে (৮৯) আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা দিচ্ছেন 'তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো।' এতে করে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ফেরাউন মৃত্যুবরণ করেছিলো কুফুরী অবস্থায়। কারণ মোহরাঙ্কিত হৃদয়ের অধিকারীরা কখনো ইমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারে না। সুতরাং 'ফেরাউন মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো'— এ রকম বললে কোরআনের আয়াতকেই অস্বীকার করা হবে।

এর পরের আয়াতে (৯২) বলা হয়েছে— 'আজ আমি তোমার দেহ চড়া ভূমিতে রক্ষা করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।'

এখানে 'নুনাজ্জি' শব্দটির অর্থ চড়া ভূমি বা উঁচু টিলা। শব্দটি এসেছে 'নাজওয়া' থেকে। 'নাজওয়া' অর্থও উচ্চস্থান। এখানে বলা হয়েছে, আজ আমি তোমার দেহকে উচ্চ স্থানে রাখবো। এ কথার অর্থ— হে ফেরাউন! তোমাকে সাগর সলিলে নিমজ্জিত করা হলো ও তোমার মরদেহকে আমি পানির নিচে অথবা পানির উপরে ভাসমান অবস্থায় রাখবো না। রাখবো কোনো উচ্চ ভূমিতে। 'যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো' কথাটির অর্থ— তোমার মৃত দেহকে আমি পচতে দেবো না। রেখে দেবো পরবর্তী সময়ের মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে। এখানে 'বি বাদানিকা' অর্থ মৃতদেহ বা লাশ। অথবা শুধুই দেহ। কিংবা অনাবৃত শরীর। আবার কথাটির মাধ্যমে এমতো বক্তব্যও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আমি তোমাকে তোমার কোর্তাসহ পচনহীন অবস্থায় রেখে দিবো। উল্লেখ্য যে, ফেরাউনের একটি দামী পাথর বসানো সোনালী রঙের মহামূল্যবান কোর্তা ছিলো।

বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, ফেরাউনের দলবলকে চোখের সামনে সাগরে নিমজ্জিত হতে দেখেও বনী ইসরাইলেরা বিশ্বাস করতে পারছিলো না যে, ফেরাউনের মৃত্যু ঘটেছে। দীর্ঘ দিন ধরে ফেরাউনের মহা প্রতাপ লক্ষ্য করে বনী ইসরাইলদের কারো কারো ধারণা জন্মেছিলো ফেরাউন অমর। তাই হজরত মুসা, তার সলিল সমাধি হওয়ার সংবাদ জানালেও তাদের মনে সন্দেহ থেকেই যায়। সেকারণেই তাদেরকে ফেরাউনের মরদেহ দেখানো হয়। সমুদ্রোপকূলের একটি উচ্চ স্থানে তারা ফেরাউনের মরদেহ দেখতে পায় এবং তাকে পরিষ্কাররূপে চিনতে পারে। তখন হজরত মুসার কথার উপরে তাদের পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। পরবর্তীদের

জন্য নিদর্শন হিসেবে ফেরাউনের লাশকে রেখে দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, এতে করে যেনো মানুষের নিকটে অতি সহজে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ্পাক কিরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাধর এবং মানুষ কি রকম অক্ষম ও অসহায়।

শেষের কথাটি এই— 'অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।' এ কথার অর্থ— অধিকাংশ মানুষ বিস্মৃতি, বিভ্রান্তি এবং উদাসীনতায় নিমগ্ন। তাই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে তাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯৩

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

❒ আমি বনি ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম, অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিনে তাহার বিচার করিবেন।

এখানে মুবাওওয়াআ সিদ্‌ক্বিন্ কথাটির অর্থ— উৎকৃষ্ট আবাস ভূমি। 'উৎকৃষ্ট আবাস ভূমি' বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে মিসর, জর্দান এবং ফিলিস্তিনের ওই সকল অঞ্চল, যে অঞ্চলগুলো আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধর-দেরকে দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। জুহাক বলেছেন, এখানে উৎকৃষ্ট ভূমি বলে বুঝানো হয়েছে সিরিয়াকে। উৎকৃষ্ট আবাস ভূমির পর বলা হয়েছে উত্তম জীবনোপকরণ দানের কথা। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য শুরু হয়েছে এভাবে— 'আমি বনী ইসরাইলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করালাম এবং আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম।'

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান এলে তারা বিভেদ সৃষ্টি করলো।' এ কথার অর্থ— যখন আখেরী পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. আবির্ভূত হলেন, তখন বনী ইসরাইলেরা (ইহুদীরা) দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলো। কেউ কেউ তাঁকে মেনে নিলো। কিন্তু অধিকাংশই অহংকার ও হিংসাবশতঃ তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করলো। অথচ তারা বহুদিন ধরে রসুল স. এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলো। তওরাতে লিপিবদ্ধ তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করতো। অন্য ধর্মের লোকদেরকে এ কথাও বলতো যে, শেষ নবীর আগমন সমাসন্ন। আমরা অচিরেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদেরকে উচ্ছেদ করবো।

এখানে রসুল স.কেই সরাসরি ইলম বা জ্ঞান বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন 'খালাক' অর্থ মখলুক (সৃষ্টি)। আল্লাহ্পাক এক স্থানে এরশাদ করেছেন, 'হাজা খালকুল্লহি' (এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি)। এরকমও হতে পারে যে, রসুল স. এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে ইহুদীরা ভালোভাবেই জানতো। তাই যাঁর সম্পর্কে তারা স্পষ্ট জ্ঞান রাখতো, সেই রসুল স.কেই এখানে বলা হয়েছে জ্বাআহুমুল ইল্‌ম (তাদের নিকট জ্ঞান এলে)।

শেষে বলা হয়েছে— তারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলো, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তার বিচার করবেন। এ কথার অর্থ— আখেরী জামানার সত্য রসুল সম্পর্কে যে বিতর্ক ও বিসম্বাদ ইহুদীরা সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দান করা হবে পরবর্তী পৃথিবীতে। তখন অনুগত ও অবাধ্য দল দু'টোকে চিরদিনের জন্য আলাদা করে দেয়া হবে। অনুগতদেরকে দান করা হবে চিরন্তন স্বস্তি। আর অবাধ্যদেরকে দেয়া হবে চিরকালিন শাস্তি।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ○

❒ আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধ-চিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

❒এবং তুমি কখনও, যাহারা আল্লাহের নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না— হইলে, তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

❒ যাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য হইয়াছে তাহারা বিশ্বাস করিবে না,

❒ এমন কি, উহাদিগের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসিলেও— যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে রসুল স.কে সম্বোধন করে সাধারণ মানুষকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে— 'আমি তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও, তবে তোমার পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো; তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্যই এসেছে।' এ কথার অর্থ— হে মানুষ! যদি আমার রসুল এবং আমার কোরআন সম্পর্কে তোমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তোমরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। *তোমাদের নিকটে প্রেরিত রসুল ও অবতীর্ণ কোরআন অবশ্যই সত্য।*

জ্ঞাতব্যঃ সম্মানিত গ্রন্থকার বলেছেন, 'কুনতা' কথাটির উদ্দেশ্য সাধারণ জনতা। কারণ রসুল স. এর উপরে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো। এভাবে যে সকল পবিত্র ব্যক্তিত্ববর্গের উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তাঁরা সন্দেহ সংশয় থেকে চিরমুক্ত। যারা নবী নন, কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সন্দেহের অপনোদনের অবকাশ রয়েছে। তাই এখানে প্রকাশ্যতঃ রসুল স.কে লক্ষ্য করে আয়াতে বক্তব্য পেশ করা হলেও সাধারণ জনতাই হচ্ছে আয়াতের লক্ষ্য। অর্থাৎ তাদেরকেই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও জুহাক বলেছেন, এখানে 'পূর্বের কিতাব যারা পাঠ করে' বলে বুঝানো হয়েছে, ওই সকল আহলে কিতাবকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করে রসুল স. এর বিশিষ্ট সাহাবী বলে গণ্য হয়েছিলেন। অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, রসুল স. এর সময়ে ছিলো তিন ধরনের মানুষ— ইমানদার, কাফের ও সন্দিগ্ধচিত্ত। আলোচ্য আয়াতে রসুল স.কে সম্বোধনের মাধ্যমে সন্দিগ্ধচিত্ত জনতাকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্যের মধ্যে এখানে একটি প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় বিধানও রয়েছে। সে বিধানটি হচ্ছে— ধর্মীয় বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ উপস্থিত হলে শরণাপন্ন হতে হবে আলেম বা জ্ঞানীদের।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে রসুল স. এর নিঃসন্দিগ্ধতা প্রকাশার্থেই সোজাসুজি তাঁকে উদ্দেশ্য করে এ রকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতের বক্তব্যভঙ্গিটি এখানে এ রকম— হে আমার রসুল! যদি আপনি আপনার উপরে অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে কিতাব বিশেষজ্ঞদের নিকটে জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু আমি জানি, আপনি তা করবেন না। কেন করবেন? আপনি তো আমার নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, যে প্রত্যাদেশ সংশয়-সন্দেহ থেকে চিরমুক্ত। আবদুর রাজ্জাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পেরেছি, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলেছিলেন, আমি সন্দেহপোষণকারী নই। আর কোনো কিছু জানার জন্য আমাকে কারো নিকটে কিছু জিজ্ঞেস করতেও হয় না।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে রসুল স. এর মাধ্যমে আসলে সম্বোধন করা হয়েছে সন্দেহবাদীদেরকে। আরবী ভাষায় এই নিয়মটি প্রচলিত। অন্যান্য ভাষাতেও এ রকম রীতি রয়েছে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতেও রীতিটির দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন, 'ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইত্তাক্বিল্লাহ্ (হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন)। এখানে সরাসরি নবীকে উদ্দেশ্য করা হলেও নির্দেশটি আসলে অন্যান্য ইমানদারদের প্রতি প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ্‌র ভয় নবীদের সত্তাসম্পৃক্ত একটি বিষয়। সুতরাং নবীর প্রতি আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশদানের প্রয়োজন পড়ে না। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে— ইন্নাল্লহা কানা বিমা তা'মালূনা খাবীর (তোমরা যা কিছু করবে, আল্লাহ্‌পাক তার খবর জানেন)। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে একটি দলকে। অন্য এক আয়াতে এসেছে— ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ইজা তাল্লাক্‌তুমুন্ নিসাআ (হে নবী! যখন আপনি ওই মহিলাদেরকে তালাক দিবেন)। এখানেও রসুল স.কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তালাক সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মুমিনদেরকে।

ফাররা বলেছেন, আল্লাহ্‌পাক তো জানেনই যে, তাঁর রসুল অক্ষয় ও অব্যয় বিশ্বাস এবং প্রজ্ঞার অধিকারী। তাই আরবী ভাষার নিয়মানুসারে এখানে তিনি তরজে কালামের রীতি প্রয়োগ করেছেন। দৃষ্টান্তটি এ রকম— কেউ তার ক্রীতদাসকে বললো, 'তুমি যদি আমার গোলাম হও তবে আমার নির্দেশ অনুসরণ করো।' অথবা কেউ তার আপন পুত্রকে বললো, 'তুমি যদি আমার পুত্র হও, তা হলে তোমাকে অবশ্যই এ কাজ করতে হবে।' এ সকল ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারবে না যে, কেউ তার ক্রীতদাস এবং আপন পুত্রকে ক্রীতদাস ও পুত্র হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। আলোচ্য আয়াতের সম্বোধন রীতিটিও সে রকম।

শেষে বলা হয়েছে— 'তুমি কখনো সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো অতি অবশ্যই সন্দিগ্ধচিত্ত নন। কখনো এ রকম হবেনও না। কিন্তু আপনার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ এ রকম বিপদে পড়তে পারে। সুতরাং তাদেরকে আপনি রক্ষা করুন। তাদেরকেও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে দিবেন না। পরের আয়াতে (৯৫) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি কখনো যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এই আয়াতেও পূর্বের আয়াতের মতো রসুল স.কে লক্ষ্য করে সন্দেহবাদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এ রকম সতর্কবাণীর দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন— ফালা তাকুনান্না জাহিরান লিল্‌কাফিরীন (সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকুন)।

এর পরের আয়াতে (৯৬) বলা হয়েছে— 'যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতি-পালকের বাক্য সত্য হয়েছে তারা বিশ্বাস করবে না।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, যারা চিরভ্রষ্ট, মহা ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানানুসারে চিরস্থায়ী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরূপে যারা চিহ্নিত ও নির্ধারিত, তারা কখনোই ইমান আনবে না।

এখানে 'কালিমাতু রব্বি' (তোমার প্রতিপালকের বাক্য) কথাটির অর্থ চিরন্তন নির্ধারণ। হজরত মুসলিম বিন ইয়াসার থেকে মালেক, তিরমিজি ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমরকে 'ওয়া ইজ আখাজা রব্বুকা মিম্ বানী আদামা মিন্ জুহুরিহিম জুর্‌রিয়াতাহুম' এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, আমিও এ বিষয়ে রসুল স.কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি স. বলেছিলেন, আল্লাহ্পাক আদমকে সৃষ্টি করলেন। তারপর তাঁর পৃষ্ঠদেশের উপর তাঁর অলৌকিক হস্ত স্পর্শ করলেন। তখন সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরের একটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। পৃথিবীতে এরা জান্নাতবাসীদের মতোই আমল করবে। এরপর আল্লাহ্ পুনরায় আদমের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন। এবার সমুদ্ভাসিত হলো আদমের অনাগত বংশধরদের আরেকটি দল। আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য। পৃথিবীতে এরা জাহান্নামীদের মতোই কাজ করবে।

আবু নাসেরার মাধ্যমে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর অলৌকিক ও আনুরূপ্যবিহীন দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলেন, এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জান্নাতী আর এই মুঠোর মধ্যে যারা তারা জাহান্নামী— আমি কারো পরওয়া করি না।

শেষোক্ত আয়াতে (৯৭) বলা হয়েছে— 'এমন কি তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন এলেও যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' পূর্ববর্তী আয়াতের ধারাবাহিকতারূপে বিবৃত হয়েছে এই আয়াতটি। এভাবে আয়াতদ্বয়ের মিলিত বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এ রকম— যারা আল্লাহ্তায়ালার অপার জ্ঞান ও সিদ্ধান্তানুসারে চিরভ্রষ্ট, তারা কখনোই ইমান আনবে না, প্রতিটি নিদর্শন প্রকাশিত হলেও, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি অবলোকন করবে।

'হাত্তা ইয়ারাউল আ'জাবাল আ'লীম' অর্থ, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ চিরভ্রষ্টরা যে সময়ে ইমান গ্রহণ করা হয় না ওই সময় ইমান আনবে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে অথবা কবরের আযাব শুরু হলে কিংবা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান দিবস ইত্যাদি চাক্ষুষ করলে। ফেরাউনও এ রকম করেছিলো। জান কবজের সময় চিৎকার করে তার ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলো। কিন্তু সে ঘোষণা কোনো কাজে আসেনি।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

❑ ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদ-বাসী ছিল না যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং তাহাদিগের বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল। তাহারা যখন বিশ্বাস করিল তখন আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হইতে মুক্ত করিলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের তওবা গৃহীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। সঠিক সময়ে তওবা করেছিলো তারা। অন্যান্য নবীর অবাধ্য সম্প্রদায়গুলো এ রকম করেনি, অর্থাৎ আযাব প্রকাশিত হওয়ার আগে তারা তওবা করেনি, তাই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। ফেরাউনও ছিলো এমনি দুর্ভাগা, যে যথাসময়ে তওবা করেনি।

প্রথমেই বলা হয়েছে—'ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী ছিলো না যারা বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলো।' হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে— রসুল স. বলেছেন, মৃত্যুকষ্ট শুরু না হওয়া পর্যন্ত তওবা কবুল করা হয়। তিরমিজি, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী।

হজরত আবু জর গিফারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত আবরণ না পড়ে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আবরণ আবার কি? তিনি স. বললেন, অংশীবাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ। আহমদ, বায়হাকী।

আয়াতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে 'লাওলা' শব্দটি। শব্দটি উৎসাহবাচক অব্যয়। আর এই উৎসাহব্যঞ্জকতাটি এখানে সম্পৃক্ত হয়েছে ইল্লা ক্বওমা ইউনুসা (ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত) কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্য দাঁড়িয়েছে এ রকম— কেবল হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় যথাসময়ে অর্থাৎ আযাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বক্ষণে তওবা করতে পেরেছিলো। তাই সে তওবা তাদের উপকারে এসেছিলো। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এবং নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন প্রায় অবধারিত আযাব থেকে। এভাবে পৃথিবী ও আখেরাত উভয় জগতের আযাব থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যখন বিশ্বাস করলো, তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' এখানে 'লাম্মা আ'মানু' অর্থ যখন তারা বিশ্বাস

করলো । জননী আয়েশা থেকে ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলেছিলেন, তারা আযাব আসার পূর্বেই ইমান গ্রহণ করেছিলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো। 'কাশাফ্না আ'নহুম আ'জাবাল খিজ্ই ফিল্ হায়াতিদ্দুন্ ইয়া' অর্থ— তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম। 'ফামাত্তা' নাহুম ইলা হীন' অর্থ— মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে আমি পৃথিবীর জীবন উপভোগ করার অবকাশ দিলাম।

বাগবী লিখেছেন, অতীতের সকল অবাধ্য উম্মত পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করেছিলো, তওবা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলো। কেবল হজরত ইউনুসের অবাধ্য উম্মতেরা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলো। তারা শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগেই বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করেছিলো। তাই আসন্ন আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলো। এ সম্পর্কে আলেমগণের দু'টি মত রয়েছে। একটি হচ্ছে, হজরত ইউনুসের উম্মত আযাব প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে ইমান এনেছিলো। আরেকটি হচ্ছে— তারা আযাবের কিছু আলামত দেখেছিলো মাত্র, আযাব দেখেনি। অধিকাংশ আলেম প্রথমোক্ত মতটিকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন। কারণ এখানে বলা হয়েছে— 'কাশ্শাফনা আ'নহুম আ'জাবাল খিজই।' বাগবী আরো বলেছেন, আযাব শুরু হওয়ার পর ক্ষমাপ্রার্থনা, তওবা অথবা ইমান— কোনোটাই গৃহীত হয় না। কিন্তু হজরত ইউনুসের উম্মতের ঘটনাটি একটি ব্যতিক্রম। আযাব দেখার পরে তারা তওবা করা সত্ত্বেও কেবল তাদের তওবা কবুল করা হয়েছিলো।

প্রকৃত কথা এই যে, জান কবজের সময় মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পর ইমান আনলে সে ইমান আর গ্রহণ করা হয় না। কারণ ওই আযাব আখেরাতের আযাব। কিন্তু দুনিয়ার আযাব দেখে ইমান আনলে সে ইমান গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বদর যুদ্ধের সময় হত্যা ও বন্দীত্বের রূপে অংশীবাদীদের উপর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিলো। যারা বন্দী হয়েছিলো তাদেরকে পরে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো এবং তাদের ইমানও গ্রহণ করা হয়েছিলো। হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটিও ছিলো এ রকম। তারাও পার্থিব শাস্তি শুরু হওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ আখেরাতের শাস্তি শুরু হওয়ার পূর্বে ইমান এনেছিলো। তাই দুনিয়ার শাস্তি থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর ফেরাউনের ইমান গৃহীত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে ইমান এনেছিলো আখেরাতের আযাব শুরু হওয়ার পর। তার ইমান গ্রহণ না করার আরো একটি কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ্পাক হয়তো জানতেন তার ইমানী স্বীকৃতি ছিলো মৌখিক, আন্তরিক নয়। তা ছাড়া হজরত মুসা তার কুফরী অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার জন্য বদ্দোয়া করেছিলেন। তার দোয়া কবুলও হয়েছিলো। তাই এ কথা নিশ্চিত যে, ফেরাউন

অন্তর থেকে ইমান আনেনি। আর এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো যে, আযাব এলেই তারা হজরত মুসার নিকটে হাজির হয়ে বলতো, হে মুসা! দোয়া করে আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। তাহলে আমরা ইমান আনবো এবং বনী ইসরাইলদেরকে তোমার সঙ্গে চলে যেতে দিবো। বহুবার তারা এ রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো এবং ভঙ্গও করেছিলো। অতএব এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফেরাউনের ইমানের স্বীকৃতিটি ছিলো মৌখিক, আন্তরিক নয়। মৃত্যু কষ্টের মাধ্যমে আখেরাতের আযাব শুরু হয়ে গেলে ইমান কবুল না হওয়ার বিষয়ে সুরা নিসার একটি আয়াতের তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে— ইন্নামাত্ তাওবাতু আ'লাল্লহি লিল্লাজীনা ইয়া'মালুনাস্ সূয়া বিজ্বাহালাতিন (যারা ভুলে অন্যায় কাজ করে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন)।

হজরত ইউনুসের কাহিনীঃ হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও হজরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ প্রমুখ থেকে বাগবী লিখেছেন— হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় বসবাস করতো মোসেল বন্দরের সন্নিকটে নিনুয়া নামক অঞ্চলে। তারা ছিলো মুশরিক। আল্লাহ্পাক তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করলেন হজরত ইউনুসকে। হজরত ইউনুস তাদেরকে সত্যের প্রতি আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা এ শুভ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলো। দীর্ঘদিন অবকাশদানের পর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় নবী হজরত ইউনুসকে প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! অবাধ্যদেরকে বলে দাও, তিন দিন পর সকালে তোমাদের উপর অবতীর্ণ হবে আযাব। লোকেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলো, ইউনুস তো কখনো মিথ্যা কথা বলেনি। সুতরাং অতিগুরুত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলো তারা। বললো, তিনদিন পূরণ হওয়ার আগের রাতে যদি দেখো ইউনুস আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তবে বুঝতে হবে, সকালে কিছু হবে না। আর যদি দেখো রাতের মধ্যেই সে অন্য কোথাও গমন করেছে, তবে বুঝতে পারবে, পরদিন সকালে অবশ্যই আযাব নেমে আসবে। কথিত আযাব অবতীর্ণ হওয়ার আগের রাতে, রাত দুপুর হওয়ার আগেই হজরত ইউনুস তাঁর লোকালয় ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সকাল হতেই লোকেরা দেখলো ভয়াবহ আযাব শুরু হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ওয়াহাবের বর্ণনায় এসেছে, একটি ঘোর কালো বিশাল অন্ধকার চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে। ধীরে ধীরে গ্রাস করতে চলেছে সমস্ত শহর। গৃহের ছাদগুলোতে চেপে বসেছে চাপ চাপ অন্ধকার। শহরবাসীরা বুঝলো, ধ্বংস ছাড়া সামনে আর কিছুই নেই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে হজরত ইউনুসকে খুঁজতে শুরু করলো তারা। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেলো না। আল্লাহ্পাক তাদের অন্তরে খাঁটি তওবার ইচ্ছা প্রবল করে দিলেন। শহরের সকল পুরুষ-নারী, তাদের সকল

চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ার-সহ শহরের বাইরে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হলো। পরিধান করলো সংসারবিরাগীদের পোশাক। মা ও শিশুদেরকে করে ফেললো আলাদা।

এমনকি পশুগুলোকেও তাদের শাবক থেকে আলাদা করে ফেললো তারা। এ রকম করার ফলে মানব শিশু ও পশু শাবকেরা উচ্চ কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলো। তাদের মায়েরাও কাঁদতে শুরু করলো অঝোর ধারায়। পুরুষেরাও কাঁদতে শুরু করলো ডুকরে ডুকরে। আহাজারি ও বিলাপে ভারী হয়ে গেলো বাতাস। এভাবে একটানা কেঁদে কেঁদে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করলো আল্লাহ্পাকের মহান দরবারে। এই বলে বার বার ঘোষণা করতে লাগলো যে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! আমরা এখন অনুতপ্ত ইমানদার। দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করো। আল্লাহ্পাক তাদের বিশুদ্ধ অনুতাপ ও ইমান গ্রহণ করলেন। ক্ষমা করলেন তাঁদেরকে। ধীরে ধীরে অপসারিত হলো ভয়াবহ ও বিশাল আঁধার। ঘটনাটি ঘটেছিলো দশই মহররমে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির ও আবু শায়েখের বর্ণনায় এসেছে, হজরত কাতাদা বলেছেন, হজরত ইউনুসের সম্প্রদায় বসবাস করতো নিনুয়া অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহরে। আল্লাহ্ তাদের আন্তরিক অনুতাপকে গ্রহণ করেছিলেন। অপসারিত করে দিয়েছিলেন প্রায় অবতীর্ণ আযাবকে।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত ইউনুসের সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হয়েছিলো আশুরার দিন। শহরবাসীরা তখন সকলেই শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলো। আযাবের স্থানে অবস্থান সমীচীন নয় বলে হজরত ইউনুস রাতের মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন জানতে পারলেন, আযাব শুরু হওয়ার উপক্রম হলেও শেষ পর্যন্ত আর আযাব আসেনি। হজরত ইউনুস ভাবলেন, এখন কোন মুখে আমি শহরে ফিরে যাবো। লোকেরা ভাববে, আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীকে হত্যা করাই ছিলো তখনকার রীতি। হজরত ইউনুস তাই ভাবলেন, এখন শহরে ফিরে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। তিনি বিষণ্ন চিত্তে অন্য দেশের দিকে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে পৌঁছলেন এক সমুদ্রের তীরে। দেখলেন, ঘাটে বাধা একটি নৌকায় যাত্রীরা উঠে বসেছে। তাঁকে দেখে যাত্রীরা নৌকায় উঠতে বললো। তিনি নৌকায় উঠলেন। নৌকা চলতে শুরু করলো। কিন্তু থেমে গেলো মাঝ দরিয়ায় এসে। মাঝিরা ও যাত্রীরা শত চেষ্টা করেও সেখান থেকে নৌকাটিকে নড়াতে পারলো না। নৌকার মালিক বললো, এভাবে নৌকা আটকে যাওয়ার কোনো কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। হজরত ইউনুস বললেন, কারণটি আমি জানি। নৌকার আরোহীদের মধ্যে রয়েছে পাপিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি। যাত্রীরা বললো, কে সে? হজরত ইউনুস বললেন, আমি। আমাকে তোমরা সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা বললো, বিনা প্রমাণে আমরা এ রকম করবো কেনো? তার চেয়ে লটারী করা হোক। যার নাম লটারীতে উঠবে, তাকেই আমরা চিহ্নিত

করবো পাপিষ্ঠ বলে। একে একে তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই লটারীতে উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। হজরত ইউনুস বললেন, এবার আমাকে ফেলে দাও। নতুবা তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। নৌকার মালিক, মাঝি ও যাত্রীরা নিরুপায় হয়ে হজরত ইউনুসকে নিক্ষেপ করলো সমুদ্র তরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চলতে শুরু করলো। একটি বিশাল মৎস্য মুখ ব্যাদান করে অপেক্ষা করছিলো হজরত ইউনুসের জন্য। হজরত ইউনুস গিয়ে পড়লেন ওই মাছের মুখে। মাছটি সঙ্গে সঙ্গে হজরত ইউনুসকে গিলে ফেললো এবং চলে গেলো সমুদ্রের গভীর তলদেশে। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্পাকের নির্দেশে একটি বিশাল আকৃতির মাছ নৌকাটিকে থামিয়ে দিলো। যাত্রীরা সবিস্ময়ে দেখলো, বিরাট পাহাড়ের মতো মাছটি মুখ হাঁ করে রয়েছে। মনে হচ্ছিলো মাছটি যেনো কাকে অনুসন্ধান করছে। হজরত ইউনুস এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাছটির দিকে। তাঁর মনে হলো মাছটি যেনো তাঁকেই চায়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর সম্প্রদায়ের উপর অতুষ্ট হয়ে অন্য দেশে যাত্রা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হলেন পারস্য উপসাগরের পাড়ে। দেখলেন, যাত্রী ভর্তি একটি নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। তিনিও নৌকায় উঠে বসলেন। একটু পরে নৌকা ছেড়ে দেয়া হলো। তটভূমি থেকে অনেক দূরে এক স্থানে যেয়ে নৌকা থেমে গেলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো নৌকাটি আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করেছে। মাঝি বললো, নিশ্চয়ই এখানে কোনো গোনাহ্গার লোক রয়েছে অথবা রয়েছে কোনো পলাতক ক্রীতদাস। তাই আমাদের এই দুরবস্থা। এখন যে কোনো একজনকে পানিতে ফেলে দিতেই হবে। না হলে সকলকে ডুবে মরতে হবে এখানে। কেউ যখন অপরাধ স্বীকার করলো না, তখন মাঝি বললো আমাদের জন্য লটারী করাই উত্তম। লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই ফেলে দিতে হবে নৌকা থেকে। তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই উঠলো হজরত ইউনুসের নাম। হজরত ইউনুস দাঁড়ালেন। বললেন, আমিই সেই গোনাহ্গার ব্যক্তি। আমিই পলাতক গোলাম। এ কথা বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাগরের উত্তাল তরঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে একটি মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেললো। একটু পরেই আরো একটি বড় মাছ ওই মাছটিকে গ্রাস করলো। মাছটি বললো, আমি আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। আমাকে বলা হয়েছে, হে সমুদ্রের মৎস! ইউনুস তোমার রিজিক নয়। তোমার উদরকে আমি তার জন্য বানালাম বন্দীশালা। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, মাছটি বললো, আল্লাহ্পাক আমার উদরে হেফাজতে রাখতে বলেছেন নবী ইউনুসকে। বলেছেন, আমার উদর এখন তাঁর উপাসনালয়। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, লটারী শুরু হওয়ার আগেই হজরত ইউনুস দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, আমিই পাপাচারী। আমিই পলায়নপর দাস। যাত্রীরা বললো, আপনার পরিচয়? হজরত ইউনুস বললেন, ইউনুস ইবনে মাতা। কেউ কেউ বলে উঠলো, আপনি তো আল্লাহ্র নবী। আমরা আপনাকে পানিতে ফেলে দিতে পারি না। আপানি নিজে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অপেক্ষমান মাছটি হজরত ইউনুসকে উদরস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো সাগরের গভীর তলদেশে। মৎস্য-উদরের অন্ধকার গহ্বরে বসে হজরত ইউনুস শুনতে পেলেন চতুর্দিকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হচ্ছে আল্লাহ্পাকের পবিত্রতা ও মহিমা। তিনিও চিৎকার করে বলে উঠলেন, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্জলিমীন (তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমিই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি আত্মঅত্যাচারী)। চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলো এভাবে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হজরত ইউনুসের ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্পাকের নির্দেশে মাছটি তাঁকে উগলে দিলো একটি নির্জন বেলাভূমিতে। মৎস্য-উদরবাসী নবী ইউনুস এবার পেলেন মাটির আশ্রয়। তাঁর অবস্থা তখন পালকবিহীন পক্ষী শাবকের মতো। অসহ্য মনে হচ্ছিলো সূর্যের তাপ। হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটি লাউ গাছ অঙ্কুরিত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে পরিণত হলো একটি ছায়াময় মালঞ্চে। হজরত ইউনুস আশ্রয় নিলেন ওই লাউ গাছটির ছায়ায়। এরপর অকস্মাৎ সেখানে এলো পাহাড়ী বকরী। তিনি ওই বকরীর দুধ পান করলেন। কিছুদিন কেটে গেলো এভাবে। লাউ গাছটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে গেলো। মৃত গাছটির দিকে তাকিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেললেন হজরত ইউনুস। আল্লাহ্পাক প্রত্যাদেশ করলেন, হে আমার নবী! তুমি একটি গাছের শোকে কাঁদছো। অথচ তোমার সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক লোকের বিপদ দেখে কাঁদোনি। তুমি তো চেয়েছিলে তারা ধ্বংস হোক। হজরত ইউনুস সেখান থেকে অন্যত্র যাত্রা করলেন। এক স্থানে দেখা হলো একজন ক্রীতদাসের সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? সে বললো, আমি নবী ইউনুসের সম্প্রদায়ভূত। হজরত ইউনুস বললেন। তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গেলে বোলো, আমি নবী ইউনুসের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সে বললো, সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া এ রকম বললে আমাকে হত্যা করা হবে। হজরত ইউনুস বললেন, এখানকার মাটি ও বৃক্ষ আমার নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করবে। ক্রীতদাসটি বললো, মাটি ও বৃক্ষকে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিন। হজরত ইউনুস বললেন, এই ক্রীতদাস যখন তোমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে বলবে তখন তোমরা সত্য সাক্ষ্য দিয়ো। মাটি ও বৃক্ষ বললো, তাই করবো। ক্রীতদাস চলে গেলো। তাদের সম্প্রদায়ের শাসককে গিয়ে বললো, আমি নবী ইউনুসের দেখা পেয়েছি। শাসক বললো, তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে কে? ক্রীতদাস বললো, সেখানকার বৃক্ষ ও মাটি। আমার সঙ্গে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন। তারা স্বকর্ণে শুনে আসবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকার সাক্ষ্য। কয়েকজনকে নিয়ে ক্রীতদাস হাজির হলো নির্দিষ্ট স্থানে। বললো, হে মৃত্তিকা! হে বৃক্ষ! বলো, নবী ইউনুসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো কিনা? মৃত্তিকা ও বৃক্ষ বললো, হ্যাঁ। হয়েছিলো। আপন সম্প্রদায়ের লোকদের নিকটে ফিরে যাওয়ার পর সকলে তারা দেখা করলো শাসকের সঙ্গে। শাসক ক্রীতদাসের হাত চেপে ধরে বললো, এখন থেকে তুমিই আমাদের শাসক। তখন থেকে শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হলো ওই ক্রীতদাস। সে এই দায়িত্ব পালন করলো চল্লিশ বছর ধরে।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○ ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

❒ তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত, তবে কি তুমি বিশ্বাসী হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?

❒ আল্লাহের অনুগত ব্যতীত বিশ্বাস করা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

❒ বল, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর।' নিদর্শনাবলী ও ভীতি-প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

❒ উহারা উহাদিগের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে। বল, 'তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

❒ পরিশেষে, আমি আমার রসূলদিগকে উদ্ধার করি এবং এইভাবে বিশ্বাসীদিগকেও উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনার প্রভুপ্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীবাসী সকলেই ইমান আনতো। কারণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তিনি কাউকে ইমান গ্রহণে বাধ্য করেন না। তবে আপনি এ ব্যাপারে মানুষের উপরে জবরদস্তি করবেন কেনো?

বাতিল ফেরকার লোকেরা বলে, আল্লাহ্তায়ালা চান সকলেই ইমানদার হোক। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইমান আনতে চায় না। তারা ইচ্ছা ও অনুমোদনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা বলে ইচ্ছা অর্থ পছন্দ। সত্যপন্থী আশায়েরা সম্প্রদায়ের অভিমত হচ্ছে, সকলে ইমান আনুক আল্লাহ্পাক এটাই পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর

ইচ্ছা এ রকম নয়। তাই মানুষ আল্লাহ্‌র পছন্দের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাধ্য কারো নেই। অতএব সন্তোষ ও অভিপ্রায় কখনো এক নয়। পথভ্রষ্ট কাদরিয়া সম্প্রদায় বলে, সন্তোষ ও অভিপ্রায় একই। সন্তোষ ও অভিপ্রায় দু'টোই সাধারণ বিষয়। সুতরাং মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তোষ বিরোধী যা কিছু করে তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করে। কিন্তু এই আয়াত তাদের অভিমতের বিরুদ্ধে। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকল মানুষ বিশ্বাস করতো, ইমান গ্রহণ করতে বাধ্য হতো। তবে হ্যাঁ, সকলের ইমান আনা আল্লাহ্‌র পছন্দ— অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুকূল কর্ম। —এ কথার প্রেক্ষিতে কাদরিয়ারা আবার বলে, এখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কথাই বলা হয়েছে, কাউকে বাধ্য করার কথা বলা হয়নি। —এ কথাটিও ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বাধ্যতামূলক। যদি তা না হয় তবে আল্লাহ্ যে ইচ্ছাময়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসীম ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তা প্রমাণ হবে কীভাবে? সৃষ্টি কী কখনো স্রষ্টার ইচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারে?

'তবে কি তুমি বিশ্বাসী হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?' কথাটি একটি অস্বীকৃতিপ্রকাশক প্রশ্ন (ইস্তেফাহামে ইনকারী)। কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি কি তবে মানুষকে বিশ্বাসী হতে বাধ্য করবেন? আল্লাহ্ তো কাউকে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হতে বাধ্য করেন না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কারো পক্ষে ইচ্ছা করাও সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্ ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী। আর মানুষ সর্ববিষয়ে আল্লাহ্‌রই মুখাপেক্ষী। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি কেবল সকলকে সত্যের আহ্বান জানাতে থাকুন। এটাই আপনার কাজ। সত্য গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা আপনার দায়িত্বভূত নয়।

উল্লেখ্য যে, দয়ার রসুল স. চাইতেন সকল মানুষ ইমান গ্রহণ করে নিরাপদ হয়ে যাক আল্লাহ্‌র অসন্তোষ থেকে। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করেছেন আলোচ্য আয়াতটি। আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, হে আমার রসুল! ইমান হচ্ছে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত একটি বিষয়। ইমানের নিকটে আসতে হয় হৃদয়ের টানে। প্রেমভালোবাসা যেমন জোর জবরদস্তি করে হয় না, তেমনি ইমান ও দান করা শোভনীয় নয় জোর করে। তাই হে আমার রসুল! আপনি অকারণে পেরেশান হয়ে নিজের কষ্ট বাড়াবেন না। যারা সৌভাগ্যশালী তারা ইমান গ্রহণ করবেই। আর যারা দুর্ভাগা তারা রয়ে যাবে ইমানহীন। আল্লাহ্‌পাকের জ্ঞান অসীম ও আনুরূপ্যহীন। তাই তিনি ভালো করেই জানেন কারা সৌভাগ্যশালী এবং কারা সৌভাগ্যশালী নয়। আপনি আমার বাণীবাহক মাত্র। সুতরাং চির দুর্ভাগা যারা, তাদের জন্য ভেবে ভেবে আপনি ব্যাথা পাবেন কেনো?

পরের আয়াতে (১০০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত বিশ্বাস করা কারো সাধ্য নয় এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাদেরকে কলুষলিপ্ত

করেন।' এখানে 'রিজসা' অর্থ কলুষ বা অপবিত্রতা অথবা আযাব কিংবা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। কলুষলিপ্ত করেন' অর্থ আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেন। আর যারা বঞ্চিত তারাই শাস্তির যোগ্য। এখানে 'লা ইয়া'ক্বিলুন' কথাটির অর্থ অনুধাবন করে না। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না।

এর পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। 'নিদর্শনাবলী ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, দৃষ্টিপাত করো মহাকাশ ও পৃথিবীর দিকে। দৃষ্টিপাত করো চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড়, সমুদ্র, বৃক্ষরাজি, বহু প্রজাতির প্রাণীকুলের দিকে। এ সকল কিছুর মধ্যে রয়েছে মহাবিশ্বের মহাশক্তিশালী মহাস্রষ্টার অসংখ্য নিদর্শন। কিন্তু যারা চির অবিশ্বাসী তাদের জন্য তো নিদর্শন, নবী রসুলগণের মাধ্যমে ভয় প্রদর্শন— কোনো কিছুই কাজে আসে না। এখানে 'মা তুগনী' (উপকারে আসে না) কথাটির 'মা' নিবারণমূলক। অথবা অস্বীকৃতি প্রকাশক (ইসতেফহামে ইনকারী)।

'আন্নুজুর' (ভীতি প্রদর্শন) কথাটির অর্থ— নবী-রসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। এখানে কথাটির অর্থ মৃত্যুভীতিও হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মানুষের মৃত্যু দর্শন কিংবা মৃত্যুভয়ও ইমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোনো উপকার প্রদান করেনা। এভাবে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্পাকের ইচ্ছার আনুকূল্য লাভ করলেই কেবল ইমানদার হওয়া যায়। আর এই আনুকূল্য না লাভ করলে শত সহস্র নিদর্শন দর্শন এবং ভীতি প্রদর্শন— কোনো কিছুই কাজে আসে না।

পরের আয়াতে (১০২) বলা হয়েছে— 'তারা তাদের পূর্বে যা ঘটেছে তার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে।' এখানে 'আইয়াম' কথাটির মর্মার্থ তিরস্কার ও পুরস্কার দু'টোই। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'জাক্কিরহুম বি আইয়ামিল্লাহি' (তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণ স্মরণ করিয়ে দাও)। এভাবে কল্যাণ অকল্যাণ দু'টোকেই একত্রে প্রকাশ করা হয় 'আইয়াম' শব্দটির মাধ্যমে। আইয়াম অর্থ এখানে— পূর্বে ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটেছে। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— হজরত নূহের সম্প্রদায়ের প্রতি এবং আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল আযাব অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা ওইরূপ আয়াতের অপেক্ষাতেই রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আযাবের জন্য প্রতীক্ষমান

ওই সকল অবিশ্বাসীকে আপনি বলুন, তোমরা আমার ধ্বংসের জন্য যেমন প্রতীক্ষা করছো, তেমনি আমিও প্রতীক্ষা করছি তোমাদের ধ্বংসের জন্য।

এর পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'পরিশেষে আমি আমার রসুলদেরকে উদ্ধার করি এবং এভাবে বিশ্বাসীদেরকেও উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করা।' এ কথার অর্থ— এটা আমার চিরন্তন প্রতিশ্রুত রীতি যে, আমি আমার বাণীবাহকবৃন্দকে এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণকে উদ্ধার করি। সুতরাং শেষ রসুল মোহাম্মদ স. ও তাঁর একাগ্রচিত্ত অনুগামীদেরকেও আমি অবশ্যই রক্ষা করবো। তাদের প্রতি এটা আমার অনুগ্রহসিক্ত দায়িত্ব।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০৪, ১০৫, ১০৬

قُلْ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

❐ বল, 'হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ইবাদত কর আমি তাহার ইবাদত করি না, পরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহের যিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান এবং আমি বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।'

❐ এবং তিনি বলেন, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই অংশীবাদিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না,

❐ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, ওহে লোক সকল! আমি যে সত্যের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি সেই সত্যের প্রতি যদি তোমরা সন্দিহান হও, তবে এখনো সময় আছে সংশয়াচ্ছন্নতা থেকে

মুক্ত হতে চেষ্টা করো। জেনে রাখো, তোমরা যে সকল প্রতিমার উপাসনা করো, আমি সেগুলোকে মান্য করি না। কারণ কোনো প্রকার কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ওগুলোর নেই। আমি উপাসনা করি ওই আল্লাহ্‌র, কল্যাণ ও অকল্যাণ যার মুখাপেক্ষী এবং যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান— তোমাদের। আমাদের। সকলের। সেই মহাশক্তিধর ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ই আমার আরাধ্য। তিনি আমাকে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদেশ করেছেন। তাই আমি সেই নির্ভুল প্রত্যাদেশের (কোরআনের) অনুসারী।

পরের আয়াতে (১০৫) বলা হয়েছে— 'এবং তিনি বলেন, তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনোই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ কথার অর্থ— আমার প্রভুপ্রতিপালক আমাকে এমতো আদেশও করেছেন যে, তুমি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাধিষ্ঠিত হও। বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে যথানিয়মে পালন করো ফরজ দায়িত্বসমূহ এবং বিরত থাকো নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। এখানে 'আক্বিম' (প্রতিষ্ঠিত হও) কথাটির অর্থ 'কেবলামুখী হয়ে নামাজ পাঠ করো'— এ রকম হওয়াও সম্ভব।

এর পরের আয়াতে (১০৬) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ এ রকম করলে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' আলোচ্য আয়াতের মধ্যে চলে এসেছে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা। এভাবে পূর্ববর্তী আয়াতের 'কখনোই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' কথাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোচ্য আয়াতের 'এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না' কথাটি। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি তো আমারই বাণীবাহক। সুতরাং মানুষকে পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে এ কথাটি মনে রাখুন যে, অংশীবাদকে আশ্রয় করা এবং উপকার বা অপকার করতে পারে না, এ রকম কোনো পাষাণ মূর্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ একক উপাস্য আল্লাহ্‌র হককে অবমাননা করা। এমতো অপকর্ম নিঃসন্দেহে সীমালংঘন। আর যারা এরূপ করে তারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী।

সুরা ইউনুস ঃ আয়াত ১০৭

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○

❑ 'এবং আল্লাহ্‌ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ্‌ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাহা রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এখানে 'মাস্‌সুন' অর্থ দেয়া বা পৌঁছে দেয়া। 'দ্বররিন' অর্থ ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, বিপদ ইত্যাদি। 'ফালা কাশিফা' অর্থ মোচনকারী কেউ নেই। 'খইর' অর্থ পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণ। এভাবে প্রথমেই বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই।' এ কথার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ক্লেশ মোচন যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তাই কল্যাণ প্রদান করাই আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র অভিপ্রায়। পরক্ষণেই বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ্ করবার কেউ নেই। এখানে মঙ্গল বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফজল' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌পাক যে মঙ্গল বা কল্যাণ প্রদান করেন তার সম্পূর্ণই তার অপার করুণা থেকে উৎসারিত। কারো কোনো অধিকার সেখানে নেই। অর্থাৎ ওই মঙ্গলের দাবিদার কেউ হতে পারে না। পরের বাক্যেই কথাটি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এভাবে— 'তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকেই মঙ্গল দান করেন।' এ কথার অর্থ— কল্যাণ ও অকল্যাণ দু'টোই আল্লাহ্‌তায়ালার অধীন। তাই কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণের নিরঙ্কুশ অধিকার কেবল তিনিই সংরক্ষণ করেন। অতএব মানুষের উচিত পূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে কল্যাণান্বেষী হওয়া। নিজের পুণ্যকর্মের উপর ভরসা না রাখা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়া। অর্থাৎ একই সঙ্গে হৃদয়ে জাগ্রত রাখা আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় ও আল্লাহ্‌র রহমতের আশা। হজরত আলী থেকে আবু নাঈম লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের এক নবীকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছিলেন যে, তুমি তোমার উম্মতের পুণ্য কর্মশীলদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেনো কেবল তাদের আমলের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। কিয়ামত দিবসে আমি যাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করবো তার নিকট থেকে গ্রহণ করবো কঠোর হিসাব। আর তুমি তোমার পাপী উম্মতকে বলে দাও, তারা যেনো নিরাশ না হয়ে যায়। কারণ পুনরুত্থান দিবসে আমি অনেক বড় বড় পাপীকে ক্ষমা করে দিবো। স্বাধীন সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে কারোর পরোয়াই আমি করবো না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা এবং অন্য কারোর প্রতি নির্ভরশীল হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এ কথার অর্থ— আল্লাহ্‌পাকের রোষ অপেক্ষা দয়া অগ্রগামী। তাই তিনি ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়াবান।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۝ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ۝

❒ বল, 'হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট সত্য আসিয়াছে, সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমাদিগের কর্মবিধায়ক নহি।'

❒ তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্যধারণ কর যে-পর্যন্ত না আল্লাহের বিধান আসে এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

এখানে 'সত্য এসেছে' কথাটির অর্থ— এসেছে বিশুদ্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ কোরআন মজীদ ও রসুল স. এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীসম্ভূত জ্ঞান এবং বিভিন্ন বিধানাবলী। এ রকমও হতে পারে যে, এখানে 'সত্য এসেছে' কথাটির অর্থ হবে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন মজীদ অথবা প্রেরিত হয়েছেন রসুল স.। এভাবে সত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ইমান না আনার কোনো অজুহাত আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এখন যে কল্যাণানুগামী সে সত্যাশ্রয়ী এবং যে ভ্রষ্টতানুসারী সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে। আর আল্লাহ্তায়ালা পাপিষ্ঠদের কর্মনির্ণায়ক নন। এভাবে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে এ রকম— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, হে পৃথিবীবাসী মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকটে এসেছে কোরআন ও হাদিসের সুষ্ঠু জ্ঞান। এখন যারা এ সুষ্ঠু ও সত্য জ্ঞানকে অবলম্বন করে সৎপথ ধরবে, সে নিশ্চিত করবে তার কল্যাণ এবং ধ্বংস ডেকে আনবে সে, যে চলবে বিপথে। তাদেরকে এ কথাও বলে দিন হে আমার রসুল! আমি ওই বিপথগামীদের কর্মনির্ধারক নই।

শেষ আয়াতে (১০৯) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং তুমি ধৈর্যধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহ্র বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।' এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল!

আপনি ওই প্রত্যাদেশের অনুসরণ করুন, যে প্রত্যাদেশ আমি অবতীর্ণ করেছি আপনার উপর। যথাযথরূপে সম্পাদন করুন প্রত্যাদেশিত আদেশ ও নিষেধ-সমূহ। আর আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অন্যান্য অত্যাচারের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন— যে পর্যন্ত না আপনার উপরে অবতীর্ণ হয় জেহাদের নির্দেশ। আর আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা। কারণ তিনি সকল দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

ওয়াল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন— ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'লা খইরি খলক্বিহি মোহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহি আজমাঈন। আমিন।

পঞ্চম খণ্ড শেষ